৪০শ বর্ষ

(১৩৪৪ মাঘ হইতে ১৩৪৫ পৌষ)

সম্পাদক

স্বামী সুন্দরানন্দ

উদ্বোধন কার্য্যালয়

১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

বার্ষিক মূল্য ২॥০]   [প্রতি সংখ্যা ।৪

উদ্বোধন—বর্ষসূচী

(মাঘ ১৩৪৪—পৌষ ১৩৪৫)

বিষয়	লেখক—লেখিকা	পৃষ্ঠা

'উদ্বোধনে'র নববর্ষ

সম্পাদক

'উদ্বোধন পত্রে'ব আব একটি বৎসব অতীত কালের গর্ভে অন্তর্হিত হইল। বর্ত্তমান মাঘ মাসে 'উদ্বোধন' চল্লিশ বৎসব বয়সে পদার্পণ কবিল। "আত্মনঃ মোক্ষার্থং জগদ্ধিতাযচ" তাহার জীবন উৎসর্গীকৃত। এই মহান্ লক্ষ্য-সাধনে জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে দেশেব সকল নবনাবীকে উদ্বুদ্ধ কবিয়া তুলিবাব জন্য তাহাব প্রচ্ছদ-পট হইতে উপনিষদের ওজঃপ্রদ "উত্তিষ্ঠত—জাগ্রত" বাণী উদ্গীত হইতেছে। "কর্ম্মণ্যে বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন" এই গীতোক্ত মতেব অনুসরণে নিষ্কামভাবে কর্ম্ম কবিয়া যাওয়াই 'উদ্বোধনের' জীবন-ব্রত।

যুগ-নাযক স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘ স্থাপন করিয়া ইহার অন্যতম মুখপত্ররূপে 'উদ্বোধন' প্রবর্ত্তন করেন। এই সংঘের উদ্দেশ্য সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়-মূর্ত্তি শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত প্রণালী• অবলম্বনে আত্মার মোক্ষ ও জগতের হিতসাধন এবং "বহুজন হিতায়" এতদুভয়ের মাহাত্ম্য প্রচাব। ত্যাগেব পবিত্র মন্ত্রে দীক্ষিত এক আদর্শে অনুপ্রাণিত একটি বৃহৎ সংঘেব সহায়তা ভিন্ন ব্যাপকভাবে এই উদ্দেশ্য কার্য্যে পবিণত কবা সম্ভব নয়। বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীর সর্ব্বত্র সংহতি-শক্তিব প্রভাব অনন্যসাধাবণ। "সংঘশক্তি কলৌযুগে।" নেশন-প্রতিষ্ঠায় সংঘ অমোঘ শক্তি। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, জগতে যে সকল জাতি সংঘ-সংগঠন ও পরিচালনে যত অধিক কৃতিত্বলাভ করিয়াছে, তাহাবা সকল বিষয়ে তত উন্নত। সমগ্র পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া ইহাব সত্যতা প্রত্যক্ষ দেখিয়া স্বামী বিবেকানন্দ সংহতিকে অভ্যুত্থানেব প্রধান উপায় ও শক্তি-সংগ্রহেব একমাত্র পথ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সমন্বয়াচার্য্য শ্রীবামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া তিনি অরণ্য ও পর্ব্বতের অন্তরালে সাধন-নিরত সন্ন্যাসিগণকে লোকালয়ে আনিয়া সংঘবদ্ধ

করিলেন লোক-সেবায় কৃতার্থ করিতে এবং বলিলেন, "এই সঙ্ঘই তাঁহার (শ্রীরামকৃষ্ণের) অঙ্গস্বরূপ এবং ইহাতে তিনি সদাবিরাজিত। একীভূত সঙ্ঘ যে আদেশ করেন তাহাই প্রভুর আদেশ, সঙ্ঘকে যিনি পূজা করেন তিনি প্রভুকে পূজা করেন, এবং সঙ্ঘকে যিনি অমান্য করেন তিনি প্রভুকে অমান্য করেন।" যাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের পদাংকানুসরণকারী বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করেন, উদ্ধৃত বাক্য তাঁহাদের বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘ মঠ ও মিশন এই দুইভাগে আইনতঃ বিভক্ত বটে কিন্তু উভয়ের মধ্যে আদর্শের কোন পার্থক্য নাই। ধ্যান ধারণা পূজা পাঠ প্রভৃতি মঠ-বিভাগের এবং জগতের হিতার্থ বিবিধ কর্মানুষ্ঠান মিশন-বিভাগের অন্তর্গত হইলেও স্বামী বিবেকানন্দের মতে (পরার্থ) "কর্ম্ম ও পূজা" (work and worship) —তথা শিবজ্ঞানে জীব- সেবা ও তপস্যা উভয়ই মঠের অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত। তিনি মঠকে এমন একটি সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করিতে আগ্রহান্বিত ছিলেন যাহাতে ধর্ম্ম ও দর্শনশাস্ত্রের অনুশীলনের সঙ্গে উন্নত বিজ্ঞান সম্মত কারিকরী শিক্ষার (technology)ও ব্যবস্থা থাকিবে। মঠের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্বামীজি স্বয়ং লিখিয়াছেন, "জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্ম্মের সমবায়ে চরিত্র গঠিত করা এই মঠের উদ্দেশ্য এবং তন্নিমিত্ত যে সকল সাধন করা প্রয়োজন, সেই সকল সাধনই এই মঠের সাধন বলিয়া পরিগৃহীত হইবে। অতএব সকলের মনে রাখা উচিত যে, এই সকল অঙ্গের যিনি একটিতেও ন্যূনতাপ্রদর্শন করেন, তাঁহার চরিত্র রামকৃষ্ণরূপ মূষায় দ্রুত হয় নাই। আরও মনে রাখা উচিত যে, নিজের মুক্তি সাধনের জন্য মাত্র যিনি চেষ্টা করেন তদপেক্ষা যিনি অপরের কল্যাণের জন্য চেষ্টা করেন তিনি মহত্তর কার্য্য করেন।"

যুগাচার্য্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলোকসামান্য জীবনে বিভিন্ন ধর্ম্মমত ও পথের যে অদ্ভুতপূর্ব্ব সমন্বয় প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা জীবনে পরিণত করাই শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘের বিশেষত্ব। শ্রীরামকৃষ্ণ-দেব প্রত্যক্ষভাবে দেখাইয়াছেন যে, ভারতীয় দর্শনের দ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত অদ্বৈত প্রভৃতি মতবাদ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে বিভিন্ন দিক হইতে দর্শনের ফল। তাঁহার আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা সকল মতবাদ—সকল ধর্ম্মের সত্যতা সমানভাবে প্রমাণ করিয়াছে। তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে, অধিকারভেদে জ্ঞান ভক্তি যোগ ও কর্ম্মের মধ্যে একটি পথের উপর জোর দিয়া সাধন করা আবশ্যক হইলেও সকলের সমবায়ে চরিত্র গঠনের মধ্যেই মানবজীবনের পূর্ণতা নিহিত। কারণ, ইহাতে সমভাবে মানুষের মস্তিষ্ক হৃদয় মন ও হস্তপদের সম্যক্ বিকাশ হইয়া থাকে। ভক্তি যোগ ও কর্ম্মহীন দার্শনিক বিচার বা জ্ঞানানুশীলন উন্নত বুদ্ধিবৃত্তি-সংক্রান্ত ব্যায়ামবিশেষে পর্য্যবসিত হইতে দেখা যায়। সদসৎ বিচার, বাহ্য ও আভ্যন্তর সংযম এবং পরার্থ কর্ম্ম ভিন্ন ভক্তি অর্থহীন পূজার্চ্চনা ও ভাবপ্রবণতা আনয়ন করিয়া ইহার উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে। নিত্যানিত্যবিবেক, শ্রদ্ধানুরাগ ও কর্ম্মত্যাগ করিয়া যোগসাধনে মনোনিবেশ করিলে আদর্শভ্রষ্ট দেহসর্ব্বস্ব হইয়া থাকে। ধর্ম্মজ্ঞানের প্রেরণা, প্রেম-ভক্তি ও ধ্যানবর্জ্জিত কর্ম্ম শুষ্ক সমাজ-সেবা মাত্রে পরিণত হয় এবং এই প্রকার উচ্চাদর্শের অনু-প্রেরণাহীন যান্ত্রিক কর্ম্ম মানুষকে বন্ধনের উপর বন্ধনে আবদ্ধ করে। সুতরাং যিনি দর্শনশাস্ত্রচর্চ্চা সমাপন করিয়াই সমাহিত চিত্তে গভীর ধ্যানমগ্ন হইতে পারেন এবং যিনি ধ্যান হইতে উত্থিত হইয়াই একই আগ্রহে নব-নারায়ণ সেবায় আত্মবিনিয়োগ করিতে সমর্থ, তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘের যথার্থ সাধক।

যাঁহারা একটি মত ও একটি পথকে ভগবান লাভের একমাত্র উপায় বলিয়া মনে করেন, এইরূপ সাম্প্রদায়িকতাবাদিগণ বলিয়া থাকেন যে, সকল মত ও পথের উপযোগিতা স্বীকার করিলে ভাবের গভীরতা ও বেগ থাকে না। এই ধারণা ভ্রান্ত। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "সঙ্কীর্ণ সমাজে ধর্ম্মের গভীরতা ও প্রবলতা থাকে, ক্ষীণবপু জলধারা সমধিক বেগশালিনী। উদার সমাজে ভাবের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে গভীরতা ও বেগের নাশ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সমস্ত ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত উল্লঙ্ঘন করিয়া এই শ্রীরামকৃষ্ণ-শরীরে সমুদ্র হইতেও গভীর ও আকাশ হইতেও বিস্তৃত ভাবরাশির একত্র সমাবেশ হইয়াছে। ইহা দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, অতি বিশালতা, অতি উদারতা ও মহাপ্রবলতা একাধারে সন্নিবিষ্ট হইতে পারে এবং ঐ প্রকারে সমাজও গঠিত হইতে পারে। কারণ, ব্যষ্টির সমষ্টির নামই সমাজ।" এই অশ্রুতপূর্ব্ব ঔদার্য্যের আদর্শে সমাজ পরিচালিত করাই 'উদ্বোধনের' লক্ষ্য। কারণ, কেবল এই পথেই মানুষের সকল বিরোধ ও সাম্প্রদায়িকতার অবসান হইয়া সাম্যমৈত্রীপূর্ণ আদর্শ সমাজ গড়িয়া উঠিতে পারে।

কোন মত পথের অনুসরণমাত্র কাহারও লক্ষ্য হইতে পারে না। হিন্দুশাস্ত্র বলেন, সম্প্রদায় বিশেষে জন্মা ভাল, কিন্তু ইহাতে সমগ্রজীবন বদ্ধ থাকা সংকীর্ণতার পরিচায়ক। সম্প্রদায় মত পথ গৌণ; মুখ্য প্রয়োজন, ইহাদের সাহায্যে আত্মার মোক্ষসাধন। মোক্ষ শব্দের সহজ মানে—সর্ব্ব বন্ধনবিমুক্তি। মানুষমাত্রেই জরা ব্যাধি দুঃখ মৃত্যু প্রভৃতির ক্রীতদাস। এইরূপ শত প্রকার দাসত্ব, সহস্র প্রকার অবাঞ্ছিত অবস্থাপ্রাপ্তি ও বাঞ্ছিত বস্তুর অপ্রাপ্তির মধ্যে পঞ্চেন্দ্রিয়াবদ্ধ জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া তাহার সুখ নাই—শান্তি নাই। এই জন্য সে এমন এক অবস্থা লাভ করিতে চায়, যে অবস্থায় তাহার কোন বন্ধন, কোন দুঃখ, কোন অভাব থাকিবে না। সে তাহার প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তনশীল সীমা-শৃংখলিত অপূর্ণ জীবনের গণ্ডি মুক্ত হইয়া পূর্ণত্ব লাভ করিতে—সৎ চিৎ আনন্দ স্বরূপ হইতে চায়। তাহার অন্তরের অন্তস্তলে লুক্কায়িত থাকিয়া কে যেন অবিরত বলিতেছে—"তুমি মুক্ত, তুমি মুক্ত।" প্রতি আঘাতের সঙ্গে মানুষের মনের গভীরতম প্রদেশ হইতে ধ্বনি উঠিতেছে—"আমি মুক্ত।" বেদান্ত বলেন, আত্মা অনন্ত অখণ্ড সর্ব্বব্যাপী সচ্চিদানন্দস্বরূপ এবং কার্য্যকারণ ও দেশ-কালের অতীত বলিয়া মুক্তস্বভাব। নামরূপের মরীচিকায় পড়িয়া খণ্ড ও বদ্ধের ন্যায় প্রতীয়মান হইলেও প্রকৃতপক্ষে আত্মা অখণ্ড ও মুক্ত। মানুষে মানুষে পার্থক্য কেবল আত্মার শক্তি প্রকাশের তারতম্যে। তটস্থ হইয়া বিচার করিলে দেখা যায়, মানুষ প্রতিকার্য্য ও চিন্তার ভিতর দিয়া তাহার এই মুক্তস্বরূপে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সদা-সচেষ্ট। মানুষের প্রতি কামনা—প্রতি পদক্ষেপের অন্তরালে রহিয়াছে তাহার অব্যক্ত ব্রহ্মস্বরূপকে পরিব্যক্ত করিবার ঐকান্তিক প্রয়াস। মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া মানব জীবনকে এই চেষ্টার নামান্তর বলা যাইতে পারে। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ বলেন, "পতির জন্য পতি প্রিয় নয়, আত্মার জন্যই পতি প্রিয়, পত্নীর জন্য পত্নী প্রিয় নয়, আত্মার জন্যই পত্নী প্রিয়; পুত্রের জন্য পুত্র প্রিয় নয়, আত্মার জন্যই পুত্র প্রিয়, বিত্তের জন্য বিত্ত প্রিয় নয়, আত্মার জন্যই মানুষের বিত্ত প্রিয়" (২।৪।৫), ইত্যাদি। বালকবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিরা এই আত্মতত্ত্ব জানে না, এইজন্য আত্মাকে না চাহিয়া তাহারা পতি পত্নী পুত্র বিত্ত প্রভৃতি প্রিয় বস্তু লাভের চেষ্টা করে, এবং ইহাদের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়। সকল ধর্ম্মশাস্ত্রে সমস্বরে বলেন যে, এই আসক্তিই মানুষের সকল দুঃখ—সকল বন্ধনের কারণ।

অন্ধভাবে এই আসক্তির অনুসরণ বা শ্রীরামকৃষ্ণদেব যাহাকে "কাঁচা আমি" বলিতেন, তাহার দাবীপূরণ করাকেই সাধারণতঃ মানুষ সকল দুঃখ—সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার উপায় মনে করে। কিন্তু এই পথে অগ্রসর হইয়া সে দেখিতে পায় যে, অন্তহীন আসক্তি বা "কাঁচা আমি"র সকল দাবী পূর্ণ করা অসম্ভব। আর ইহারা ইন্ধন পাইলে আরও জ্বলিয়া উঠে; সকলকে বঞ্চিত করিয়া বিশ্বের যাবতীয় ভোগ্যবস্তুকে আপনাদের ভোগে নিবেদন করিয়াও ইহারা অতৃপ্ত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, যতদিন মানুষ তাহার অসংযত আসক্তি বা উৎকট "কাঁচা আমি"র দাস হইয়া থাকিবে, ততদিন অসাম্য অনৈক্য স্বেচ্ছাচারিতা সাম্রাজ্যবাদ সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি মানব-সমাজে অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব করিবেই। ধর্ম্ম নীতি সাম্যবাদ আইন বিচারালয় সৈন্য পুলিশ প্রভৃতি এই অনর্থ হইতে মানব-সমাজকে সম্পূর্ণ মুক্ত করিতে পারিবে না। মানুষ স্বার্থসিদ্ধির জন্য পরমহিতৈষীর ছদ্মবেশে অপরের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিবে, বিশ্ব-শান্তির নামে সে মারণাস্ত্র বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা করিবে, জাতীয়তার নামে সে সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বালাইবে, মুখে মধুর হাস্য ফুটাইয়া প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে সে অস্ত্র শাণাইবে, আলাপে মোহিত করিয়া সে শত্রুর খাদ্যে বিষ মাখিবে। কিন্তু ইহাও সত্য যে, মানুষের এই উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়-তর্পণের ভিতর দিয়াও তাহার অন্তর্নিহিত মুক্তির প্রয়াসই প্রকট। তবে সে জানে না যে, আপাতরম্য অসংযত কামনাসমূহ মুক্তির লোভ দেখাইয়া তাহাকে বন্ধনের উপর বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া পরিণামে উহাদের ক্রীতদাসে পরিণত করে!

ধর্ম্মমাত্রই শিক্ষা দেয়—প্রবৃত্তির পথে পরিচালিত হইয়া বন্ধনমুক্ত হওয়া অসম্ভব। মানুষের স্থূল ও সূক্ষ্ম বন্ধনমুক্তির জন্য তাহার বাহ্য ও আভ্যন্তর প্রকৃতি বশীভূত করা অপরিহার্য্য। নিবৃত্তির পথই বন্ধনমুক্ত হইবার একমাত্র উপায়। নীতির ভিত্তিও বন্ধনমুক্তি। নীতি মুক্তির এবং দুর্নীতি বন্ধনের কারণ। দর্শনশিরোমণি বেদান্ত বলেন, গুটিপোকা যেমন তাহার স্বনির্ম্মিত আবরণ ভেদ করিয়া সুন্দর প্রজাপতিরূপে বাহির হইয়া থাকে, মানুষ তেমন তাহার বাসনা-নির্ম্মিত জীবত্ব-পাশ মুক্ত হইলেই শিবস্বরূপে পরিণত হইতে পারেন। ত্যাগের পথে এইরূপ শিবত্বলাভ করাই জীবের সর্ব্ব বন্ধনবিমুক্তির প্রকৃষ্ট পথ। আপনার শিব-স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া মানুষ মেষপালে পতিত সিংহ শাবকের মত আপনাকে মেষ মনে করিতেছে! অমৃতের সন্তান হইয়াও সে আপনাকে দুর্ব্বল দীন হীন কাঙাল মনে করিয়া কষ্ট পাইতেছে। আপনার নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ ভুলিয়া সে যেন এক মহাতামসিক নিদ্রায় অচেতন। মানুষকে এই মোহ-নিদ্রা হইতে উত্থিত করিয়া তাহার ব্রহ্ম-স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন করিবার উদ্দেশ্যে শত নিবন্ধ সহায়ে 'উদ্বোধন' উদাত্ত কণ্ঠে "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"মন্ত্রে আহ্বান করিতেছে।

বন্ধন খোল, বন্ধন খোল, বন্ধন খোল। "আত্মনঃ মোক্ষার্থং" আপনার বন্ধন খোল এবং "জগদ্ধিতায়" সকলের বন্ধন খোল। আপনার সকল প্রকার উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত কর এবং অপরের দ্বার মুক্ত করিয়া দাও। উন্নতি লাভের বিঘ্নের বিরুদ্ধে সিংহবিক্রমে দাঁড়াও এবং অপরকে দাঁড়াইতে প্রবুদ্ধ কর। অর্থনীতিক রাষ্ট্রনীতিক সমাজনীতিক স্বাধীনতা মানুষের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির শ্রেষ্ঠ উপাদান, সুতরাং সর্ব্বাগ্রে এই স্বাধীনতা অর্জ্জনের চেষ্টা কর এবং অপরকে স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত কর। অজ্ঞতা দারিদ্র্য পরাধীনতা দাসত্ব আভিজাত্যের অত্যাচার অস্পৃশ্যতা দুর্ব্বলতা রোগ শোক প্রভৃতি সর্ব্বগুণনাশী অনর্থ হইতে আপনাকে নির্ম্মুক্ত কর

এবং সকলকে মুক্ত হইতে সাহায্য কর। এইরূপে প্রথমে স্থূল বন্ধন হইতে বিমুক্ত হও, পরে যদি হৃদয়ে মহত্ত্ব থাকে এবং সাহসে কুলায় তাহা হইলে স্বার্থপরতা ঈর্ষা দ্বেষ ইন্দ্রিয়পরায়ণতা নাম যশ অভিমান অহংকার প্রভৃতি সূক্ষ্ম বন্ধনের বাহিরে যাইবার চেষ্টা কর এবং অপরকে অনুরূপ সাহায্য কর। এইভাবে "নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী," সিংহ যেমন পিঞ্জর হইতে বহির্গত হয়, তেমনি জগজ্জাল হইতে বাহির হইয়া আপনার নিত্যশুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপ ব্যক্ত কর এবং এই মহান্ প্রচেষ্টায় অপরের সহায় হও। আপনার মধ্যে নারায়ণকে সন্দর্শন কর এবং অজ্ঞ দরিদ্র রুগ্ন পতিত ও অস্পৃশ্যকে নারায়ণ জ্ঞানে শ্রদ্ধা কর—সেবা কর। আপনি মানুষ হও—দেবতা হও এবং অপরকে মানুষ কর—দেবতা কর। নিশ্চয় জানিও, "ন লিঙ্গং ধর্ম্মকারণং, সমতা সর্ব্বভূতেষু এতন্মুক্তস্য লক্ষণম্", 'বাহ্য চিহ্ন ধর্ম্মের কারণ নহে, সর্ব্বভূতে সমভাব—ইহাই মুক্ত-পুরুষের লক্ষণ।' সুতরাং সমভাব অবলম্বন কর এবং সকলকে ইহা শিক্ষা দাও। আপনি মুক্ত হও এবং অপরকে মুক্ত কর। আপন মুক্তি অবহেলা করিয়াও অপরকে মুক্ত করিবার চেষ্টা, আপন সুখ তুচ্ছ করিয়াও সকলের সুখসম্পাদন, মহান্ হৃদয়ের পরিচায়ক। যিনি যত বেশী "আমি ও আমার" গণ্ডির পরিধি বিস্তার করিয়া সকলকে আপনার করিয়া লইতে পারেন, তিনি তত মহান্—তত বিরাট। "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্", তিনিই সকল মানুষের অন্তরাত্মারূপে বিরাজ করিতেছেন। অতএব একমুখে খাইতে লজ্জা বোধ করিয়া শত-মুখে খাও। আপনার ক্ষুদ্র ব্যষ্টিকে অখণ্ড বিরাট সমষ্টির সত্তায় মিশাইয়া দাও। ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আদর্শ মানুষের আর নাই—হইতে পারে না। শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘ এই আদর্শেরই প্রতীক। এই মহান্ আদর্শে সকলকে অনুপ্রাণিত করিবার জন্য নববর্ষে পদার্পণ করিয়া 'উদ্বোধন' তাহার সহৃদয় লেখক গ্রাহক পাঠক ও শুভাকাংক্ষী-দের আন্তরিক সাহায্য ও সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছে।
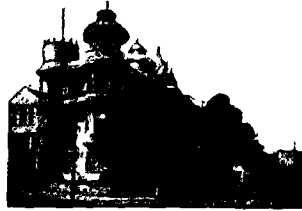
আত্মদর্শন

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায

আমি যে ভুলিয়া যাই শতকোটি নক্ষত্র নিচয
ভুলিয়া কাটাই দিন পৌর্ণমাসী সহস্র রজনী
রজনীর চিরসাথী শুকতারা সপ্তর্ষিমণ্ডলে,
মনের দুয়ারে আসে অরুন্ধতি শুক্লা অনুরাধা
কখন ফিরিয়া যায মনেও পড়ে না কোনো কালে।
শত সূর্য্যে ভুলে থাকি, শত চন্দ্র আসে যায ফিরে,
সিন্ধুবক্ষে সূর্য্যোদয, শৈলপ্রান্তে অস্তমান শশী,
উচ্ছ্বসিত জ্যোৎস্নালোকে উদ্ভাসিত ঊর্দ্ধ নীলাকাশ
—সবারে ভুলিয়া যাই, ভুলে থাকি আলোক-উৎসবে
জীবনের বিড়ম্বনা অন্ধকারে লাগে মোহনীয।

ফুল ফোটে ঝরে যায় গন্ধ তার মন্থর পবনে
ক্ষণেকে চকিত করি উরে যায় খর-রৌদ্রতাপে,
হেলায় ভুলিয়া যাই সমাসন্ন মধু-পুষ্প-মাসে।
বাঁশী বাজে থেমে যায়, সুর থাকে বাতাসে জাগিয়া—
কখন বাজিল বাঁশী ভুলে যাই, ভুলি থেমে যাওয়া,
সুরের মধুরাবেশ মিলাইয়া যায় নভোলোকে।

দিনে রাতে এত ভুল, এত ভুল ঘরে ও বাহিরে,
আমারে ভুলিতে গিয়ে মনে পড়ে আমার আমিরে,
ক্রুদ্ধ ফণা বিস্তারিয়া ছুটে আসে অতৃপ্ত কামনা
অসংযত বাণী হয় স্বার্থলোভে ভীষণ মুখরা।
অপবিতৃপ্তির ক্ষোভ চিত্তে আনে সংশয় বিদ্রোহ;
আত্মার কল্যাণ যদি ভুলিবারে চাহি আপনারে
সহস্র আমির তীব্র প্রলোভন সম্মুখে দাঁড়ায়,
স্বার্থের সংঘাতে দেখি সোনার সংসার চুরমার।

যে হাতে গড়েছি নিজে সমৃদ্ধ সাম্রাজ্যখানি মোর
বিধ্বস্ত হইয়া যায় কখন যে সেই হাতে হায়,
সে কথা ভুলিতে নারি মনে হয় বুঝি মতিভ্রম
যে ভ্রমান্ধ মন নিয়ে ভুলে যাই সুন্দরী ধরারে।

আমার ভুলের মাঝে ভাঙ্গি গড়ি পৃথিবীরে আমি
পুরাতনে মনে হয় একান্ত সে সৃষ্টি নবতন,
রঙীন চোখের নেশা কাটেনাক খরদিবালোকে
যদি বা মনের নেশা কেটে যায় কঠিন আঘাতে।

আমি যে পৃথিবী গড়ি, যে পৃথিবী ভাঙ্গিয়া হেলায়
জনারণ্যে মিশে গিয়ে আপনারে ভুলিবারে চাই,
সেই সে পৃথিবী আসে প্রতি দণ্ডে ছলিতে আমারে
আমার ক্ষুদ্রতা নিয়ে মরে যাই গভীর লজ্জায়।
অহঙ্কার বড় জানি, সৃষ্টির সে আদিম প্রেরণা,
নিজেরে ভুলিয়া কভু হয়নাক শ্রেয়ের সাধনা,—
অপার দুর্ভাগ্য মোর কাটিতে পারিনা মায়াডোর
ভুলিতে পারিনা আমি দুর্গম পঙ্কিল পথরেখা।
চিত্তপটে আঁকি ছবি, সে ছবি বিকৃত রূপ ধরি'
আমার কুশ্রীতা নিয়ে ব্যঙ্গ করে আমারে নিয়ত।
তুমি কি আছ হে প্রভু, ভুল-ভোলা বৈরাগী সন্ন্যাসী
আত্মার কল্যাণে আন মধুময় ভুলের স্বপন
কলঙ্ক ভুলিতে দাও, তোমার করঙ্ক মোর হাতে,
অমৃত ভিক্ষায় দাও নবদীক্ষা সুপ্রসন্ন মনে।

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নের মহাভারত সংগঠন

অধ্যাপক শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্‌-এ

অনাদিকাল প্রবাহিত মানব-সাধনার বিশ্বতো-মুখী মন্দাকিনী কলিযুগের প্রথম হইতে যে একটি বিশাল ধারায় পরিণত হইয়া ক্রমশঃ সমগ্র ভারতকে সংপ্লাবিত করিয়া ফেলিয়াছে, এই ধারার গঙ্গোত্রী-রূপে আমরা একজন মহাজ্ঞানী মহাযোগী মহাপ্রাণ ব্যক্তিকে দেখিতে পাই ;—তিনি মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাস। এই মহাপুরুষের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ভারতীয় সাধনা বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হইয়া আসিতেছিল এবং তাহাদের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়া সময়ে সময়ে উত্তাল তরঙ্গেরও সৃষ্টি হইত। প্রথমতঃ, ভারতীয় সাধনার দুইটী প্রধান বিভাগ ছিল,—আর্য্য সাধনা ও অনার্য্য সাধনা। আর্য্যজাতির বৈদিক সাধনা ও অনার্য্যজাতিসমূহের বেদবিরোধী বিচিত্র সাধনার মধ্যে যে যুগযুগান্তর-ব্যাপী সংঘর্ষ চলিয়া আসিতেছিল, তাহার নিদর্শন বেদে পুরাণে ও প্রাচীন ইতিহাসের সর্ব্বত্রই লক্ষিত হইয়া থাকে। অসুর দৈত্য দানব রাক্ষস প্রভৃতির সহিত আর্য্যগণের যে সংগ্রাম, তাহার মূলে তাহাদের কৃষ্টিগত সংস্কারগত আদর্শগত বৈষম্য বিদ্যমান ছিল। সংগ্রাম ও সন্ধি, রক্তারক্তি ও রক্তসংমিশ্রণ, সবলের নিকট দুর্ব্বলের বশ্যতা স্বীকার এবং পরস্পরের চিন্তাধারা ভাবধারা ও জীবনাদর্শের সহিত সুষ্ঠুতর সৌহার্দ্দ্যপূর্ণ পরিচয়,—এই সকলের ভিতর দিয়া, অনার্য্যগণ ক্রমশঃ আর্য্যভাবাপন্ন হইয়া আসিতেছিল, এবং আর্য্যগণ অনার্য্যগণের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি হইতে অনেক মহামূল্য সামগ্রী আপনাদের সাধনার অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছিল। আর্য্যজাতির ক্রমিক অভ্যুদয়, অনার্য্যজাতিসমূহের ক্রমিক পরাভব, এবং আর্য্যানার্য্যের ভাবের আদান প্রদানের ভিতর দিয়া একটা মহতী ভারতীয় সাধনা ক্রমশঃ গড়িয়া উঠিতেছিল। শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নের পূর্ব্ববর্ত্তী ভারতেতিহাসের এই একটি দিক্।

বৈদিক সাধনার পতাকাবাহীদের ভিতরেও একজাতীয় গুরুতর সমস্যা উত্থাপিত হইয়াছিল ;—বেদের কর্ম্মকাণ্ডই প্রধান, কিংবা জ্ঞানকাণ্ড প্রধান? শাস্ত্রবিচারে বেদের পূর্ব্বভাগেরই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার্য্য, কিংবা উত্তরভাগ, অর্থাৎ আরণ্যক ও উপনিষদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার্য্য? পূর্ব্বভাগ প্রণোদিত যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মই নিষ্ঠার সহিত চিরকাল অনুষ্ঠেয়, কিংবা সমর্থ হইলেই সেই সব কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক উত্তরভাগ প্রতিপাদিত জ্ঞানের অনুশীলনে আত্ম-নিয়োগ করা কর্ত্তব্য? কর্ম্মনিষ্ঠ গার্হস্থ্যই যথার্থ কল্যাণের পথ, কিংবা জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসই অধিকতর বরণীয়? সমগ্র বেদের তাৎপর্য্য কর্ম্মের নিয়ন্ত্রণে (বিধিনিষেধে) কিংবা ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদনে? এই সব সমস্যায় বৈদিক সমাজের শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ—ঋষিমুনিগণ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া নিজ নিজ পক্ষ সমর্থন ও পরমত খণ্ডনে ব্রতী হইয়াছিলেন। আর্য্য-সাধনা ধর্ম্মার্থকামাভিমুখী, প্রবৃত্তিমূলক ও গার্হস্থ্যপ্রধান হইবে, কিংবা মোক্ষাভিমুখী, নিবৃত্তিমূলক ও সন্ন্যাসপ্রধান হইবে, ইহা একটা বড় সমস্যা হইয়া উঠিয়াছিল, এবং ইহা লইয়া বিষম বাদানুবাদ চলিতেছিল। বেদবাদী ও ব্রহ্মবাদী, কর্ম্মবাদী ও জ্ঞানবাদী, স্বর্গবাদী ও মোক্ষবাদী, যজ্ঞবাদী ও সন্ন্যাসবাদী ঋষিমুনি ও

আচার্য্যগণের এই কলহ সুদীর্ঘকাল যাবৎ চলিয়া আসিতেছিল।

তৃতীয়তঃ, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠত্ব লইয়াও একটা সংঘর্ষের সৃষ্টি হইয়াছিল। ক্ষত্রিয়রাজগণের মধ্যে অনেক প্রবলপ্রতাপান্বিত নৃপতি ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া একটা তুমুল দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়াছিল, এবং ব্রাহ্মণগণও অনেকে সমাজের উপর আপনাদের প্রভুত্ব রক্ষা করিবার জন্য কেবলমাত্র শাস্ত্রীয় বিদ্যার উপর নির্ভর না করিয়া শস্ত্রেরও আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন ও পরশুরামের ইতিহাস, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের ইতিহাস এই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় সংঘর্ষেরই কাহিনী।

চতুর্থতঃ, আর্য্য ও অনার্য্য উভয় জাতির মধ্যে অনেক সাধননিপুণবিশিষ্ট ব্যক্তি আপনাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও শক্ত্যৈশ্বর্য্য লাভের জন্য সমাজ-প্রচলিত সাধারণ সাধনপদ্ধতির উপর সম্পূর্ণরূপ নির্ভর না করিয়া, নানাবিধ গুহ্য সাধনপ্রণালী আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এবং সমাজনিয়ন্তা ও শাস্ত্রব্যাখ্যাতাগণ সেই সব প্রণালী ও তাহাদের মতবাদ প্রকাশ্যভাবে স্বীকার না করিলেও এবং অনেকক্ষেত্রে তাহাদের নিন্দাবাদ করিলেও, বহুসংখ্যক লোক তদ্দ্বারা আকৃষ্ট হইতেছিল এবং গোপনে গোপনে ঐসব সাধনমার্গ গ্রহণ করিতেছিল। এই সব বেদবহির্ভূত সাধনমার্গকে তান্ত্রিকমার্গ বলা হইত। এই প্রকারে, সমাজ-প্রচলিত বৈদিক সাধনার সহিত সমাজে গোপনীয় তান্ত্রিক সাধনপদ্ধতি সমূহেরও একটা সংঘর্ষ ছিল।

পঞ্চমতঃ, বৈদিক সাধনার বিরুদ্ধে একটা বিশেষ অভিযোগ ছিল এই যে, দেশের অধিকাংশ লোক এই সাধনায় সাক্ষাৎভাবে যোগদান করিতে অনধিকারী। স্ত্রীলোকগণ, শূদ্রগণ, এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যদের মধ্যেও যাহাদের মেধাশক্তি ও বুদ্ধি অল্প, ও চরিত্র অনুন্নত, তাহারা বৈদিক যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠানেও অনধিকারী, ঔপনিষদিক ব্রহ্মবিচারেও অনধিকারী। অন্ত্যজ চণ্ডালাদি জাতিসমূহের ত কথাই নাই। অথচ ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, মানবমাত্রেরই ধর্ম্মসাধনায় অধিকার আছে, নিম্নকুলে জন্মগ্রহণ করিলেও, বুদ্ধিবিদ্যায় সুপটু না হইলেও এবং জটিল কর্ম্মানুষ্ঠানে অপারগ হইলেও মানুষ ধর্ম্মসাধনে অনধিকারী হয় না, কারণ, ধর্ম্মই মানুষের মনুষ্যত্ব, "ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ"। কিন্তু বৈদিকমার্গে তাহাদের জন্য উপযুক্তরূপ ব্যবস্থা দেখা যায় না, যদিও সমগ্র সমাজের লোকসংখ্যার হিসাবে তাহারাই অধিকাংশ। এতদ্ব্যতীত, আরো বহুসংখ্যক বিভিন্নজাতীয় লোক ভারতবর্ষের অধিবাসী ছিল, যাহারা শূদ্র বলিয়াও আর্য্যসমাজে স্বীকৃত হইত না। বৈদিক চাতুর্ব্বর্ণ্যের লোকসকল তাহাদিগকে দূরেই রাখিত, ব্রাহ্মণগণ তাহাদের ধর্ম্মোপদেষ্টা হইতেন না, তাহারা সনাতন ধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত ছিল। ইহা সহজেই বোধগম্য যে, যে ধর্ম্ম জাতির সকল স্তরের নরনারীর জীবন নিয়ন্ত্রণের ও আধ্যাত্মিকক্ষুধা নিবারণের ভার গ্রহণ না করে, তাহা কখন জাতীয় ধর্ম্মরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না।

ষষ্ঠতঃ, সমাজের উচ্চস্তরের শ্রেষ্ঠ বিচারশীল ব্যক্তিগণের মধ্যে সাধ্যসাধনতত্ত্ব সম্বন্ধে এত মতভেদ ছিল যে, সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ধর্ম্মপিপাসু-গণের তাঁহাতে মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইয়া যাইত, তাহাদের পক্ষে যথার্থ কল্যাণের পথ নিরূপণ করা নিতান্তই কঠিন হইত। তাহারা দেখিত যে, "বেদা বিভিন্নাঃ, স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ, নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।" এরূপ অবস্থায় তাহারা কোন্ পন্থা অনুসরণ করিবে, কোন্ পন্থাকে সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া বরণ করিয়া লইবে, পরস্পর বিবদমান আচার্য্যগণের মধ্যে কাঁহার ব্যাখ্যান তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা সমীচীন বলিয়া জীবনসাধনায় গ্রহণ

করিবে, ইহা আর্য্যসমাজেও গুরুতর সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

এই প্রকার বিভিন্ন সমস্যা যখন ভারতীয় সাধনার ক্ষেত্রে জটিল আকারে সমুপস্থিত, তখন ভারতের প্রাণদেবতাই যেন বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া এই সব সমস্যার সমাধানে আত্মনিয়োগ করিলেন, এবং ভারতীয় সাধনার অন্তর্নিহিত জ্ঞানশক্তি যেন পরাশরপুত্র দ্বৈপায়ন শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইয়া সেই সমাধানকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া চিরস্থায়ী করিতে প্রয়াসী হইলেন। বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে আমরা সর্ব্বজনীন ভারতীয় সাধনার প্রতিষ্ঠাতা এবং পরাশর শ্রীকৃষ্ণকে এই সাধনার সর্ব্বপ্রধান আচার্য্য বলিয়া বর্ণন করিতে পারি। নারায়ণের জ্ঞানাবতার পরাশরতনয় শ্রীকৃষ্ণ তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ঋষি মুনি যোগী তপস্বী কর্ম্মী জ্ঞানী ও ভক্ত সাধকগণের যাবতীয় সাধনার পদ্ধতি ও ফলসমূহ সংগৃহীত করিয়া তাহাদের সমন্বয় সম্পাদনপূর্ব্বক সমগ্র জাতির কল্যাণের জন্য প্রচার করিতে মনোনিবেশ করিলেন, বিভিন্ন আপাতবিরোধী মতবাদসমূহের কেন্দ্রস্থানীয় সুমহান্ প্রাণটী আবিষ্কার করিয়া তাহাদিগকে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে যুক্ত করিতে প্রয়াসী হইলেন, অধ্যাত্মজ্ঞানের ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণীর নরনারীর সর্ব্বপ্রকার কলহ ও দ্বন্দ্বের সুমীমাংসায় প্রবৃত্ত হইলেন, এবং ধর্ম্মতত্ত্বসমূহ নরনারী ব্রাহ্মণ চণ্ডাল নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর মনুষ্যের নিকট উপস্থাপিত করিবার ব্যবস্থা করিলেন।

তাঁহার প্রথম কার্য্য হইল আর্য্যকৃষ্টি ও সংস্কৃতির মূল ভিত্তিকে দৃঢ়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। তদুদ্দেশ্যে তিনি বেদমন্ত্রসমূহ সংকলিত করিলেন, বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হওয়ায় তাহাদের মধ্যে যে সব পাঠান্তর ও ব্যাখ্যান্তর উপস্থিত হইয়া নানাপ্রকার ভেদ ও বিসম্বাদ সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা নির্দ্দেশপূর্ব্বক তাহাদের ঐক্যসূত্র আবিষ্কার করিলেন, বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার আচার্য্য ও অনুবর্ত্তিগণের মধ্যে ঐ সব মন্ত্রের যে সব প্রয়োগ-বিধি প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা পরিজ্ঞাত হইয়া ও স্বীকার করিয়া লইয়া একত্র সংকলন করিলেন, বেদের ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্বের বাণীসমূহকে শ্রেণীবিভাগ করিয়া ও সুনিপুণভাবে সুসজ্জিত করিয়া উপনিবদ্ধ করিলেন, বেদ ব্রাহ্মণ আরণ্যক ও উপনিষৎসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া একই অপৌরুষেয় সনাতন বেদের বিশেষ বিশেষ অঙ্গরূপে প্রচার করিলেন এবং উপনিষৎসমূহকে বেদান্ত অর্থাৎ বেদেরই শিরোভাগ বা অন্তভাগরূপে প্রতিপাদন করিয়া বেদবাদী ও ব্রহ্মবাদীদের—কর্ম্মবাদী ও জ্ঞানবাদীদের—গৃহস্থ ও সন্ন্যাসীদের—সব দ্বন্দ্ব মিটাইয়া দিলেন। স্মরণাতীতকাল হইতে আচার্য্য শিষ্য পরম্পরাক্রমে বেদের শিক্ষা দীক্ষা এবং বেদানুগত কর্ম্মপদ্ধতি, উপাসনা প্রণালী ও তত্ত্ববিচার আর্য্যসমাজে প্রচলিত ছিল, বেদের উপদেশই আর্য্যগণের ব্যক্তিগত সাধন জীবন এবং পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বিধি ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করিত, বেদই ধর্ম্মের ভিত্তি ও মানবজীবনের নিয়ামক বলিয়া তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন। বেদমন্ত্রসমূহের রচয়িতা বলিয়া তাঁহারা কাহাকেও—কোন ঋষিকে—মানিতেন না। আদিম ঋষিগণের চিত্তে বেদমন্ত্রসমূহ স্বয়ং অবির্ভূত হইয়াছিল, এবং তাঁহাদের ভিতর দিয়া সমাজে প্রচলিত হইয়াছিল মাত্র। এই হেতুই সেই সব ঋষিদের নামের সঙ্গে ঐ সব মন্ত্র সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। বস্তুতঃ বেদ অপৌরুষেয়। কিন্তু কালক্রমে বিভিন্ন শাখা উপশাখার ভিতর দিয়া আংশিকভাবে বেদের জ্ঞান প্রবাহিত হওয়ায়, সমগ্র বেদ ও তাহার সম্যক্ তাৎপর্য্য অনেক আচার্য্যেরই অপরিজ্ঞাত হইয়া পড়িয়াছিল। এই কারণেই তাহাদের মধ্যে ক্রমশঃ ব্যবধান ও সংঘর্ষেরও সৃষ্টি হইয়াছিল। এই

ব্যবধান ও সংঘর্ষ দূরীভূত করিয়া সমগ্র আর্য্য-সমাজকে এক প্রাণসূত্রে সংঘবদ্ধ করিবার জন্য সমগ্র বেদের সংকলন, সুনিপুণ বিষয়সন্নিবেশ, সমন্বয়পূর্ণ ব্যাখ্যা এবং বিধিবদ্ধ প্রণালীতে শিক্ষা ও প্রচার নিতান্তই আবশ্যক ছিল। শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নের পূর্ব্বে আরো অনেক মহাপ্রাণ ও মহামনা ঋষি এই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। মহাভারত বিষ্ণুপুরাণাদিতে তাঁহাদের অনেকের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গীণভাবে এই কার্য্য আর কেহই সম্পাদন করিতে সমর্থ হন নাই। এই হেতু পরবর্ত্তী কালে (তাঁহার সময় হইতেই) শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নই 'বেদব্যাস' উপাধিতে সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছেন।

বেদের এই প্রকার বিভাগ ও একীকরণ সম্পাদনপূর্ব্বক তিনি ইহার সুনিপুণ প্রচারের জন্য চারিজন প্রধান শিষ্যের উপর ভার অর্পণ করিলেন। পৈল, জৈমিনি, বৈশম্পায়ন ও সুমন্তু যথাক্রমে ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ববেদের শিক্ষাদান ও প্রচারকার্য্যের দায়িত্বভার প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহারা তাঁহাদের নিজ নিজ শিষ্যগণের মধ্যে এক একজনকে এক এক শাখার বিশেষ শিক্ষাদানে নিয়োজিত করিকরিলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারিবর্ণের মধ্যেই যাহাতে বৈদিক জ্ঞান প্রচারিত হয়, তজ্জন্য শিষ্যদিগকে তিনি বিশেষভাবে নিজেদের জ্ঞান ও সংগঠনীশক্তি প্রয়োগ করিতে উপদেশ দিলেন। এইরূপে দেশের সর্ব্বত্র বেদ প্রচারের ব্যবস্থা হইল।

কিন্তু দেশের অধিকাংশ নরনারী বেদ পাঠ করিতে অসমর্থ। এই বিশাল দেশের অধিকসংখ্যক নরনারীকে বৈদিক ভাষার সহিত সুপরিচিত করাই অসম্ভব ব্যাপার। যাহারা বৈদিক ভাষা আয়ত্ত করিতে সক্ষম, তাহাদের মধ্যেও অধিকাংশের পক্ষে এই বিপুল বৈদিক শব্দরাশির তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণ করা ও জীবনের সাধনায় তাহাদের যথাযথ ব্যবহার করা দুঃসাধ্য। বিভিন্ন ঋষির চিত্তে আবির্ভূত ও বিভিন্ন ঋষির মুখ হইতে প্রকাশিত বেদবাণীসমূহের প্রকরণভেদ, পৌর্ব্বাপর্য্য, অভ্যাস ও অপূর্ব্বতা, অর্থবাদ ও অনুবাদ, লক্ষ্য ও উপপত্তি প্রভৃতি সম্যক্‌রূপে বিচার করিয়া, আপাতবিরোধী বাক্যসমূহের সমন্বয় সাধন করিয়া, স্পষ্টবাক্যসমূহের সহিত অস্পষ্ট বাক্যসমূহের একবাক্যতা করিয়া, কোন্ প্রয়োজনের কি প্রণালীতে কোন্ মন্ত্রের বিনিয়োগ হইবে, তাহা বিশেষরূপে নিরূপণ করিয়া, সমস্ত বেদের যথার্থ তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণ করা এবং যাবতীয় বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড, উপাসনা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম সার্থকতা সম্বন্ধে সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া, অসাধারণ বিচারশক্তি ও অধ্যবসায়সম্পন্ন সংযমী ও আচার্য্যবান পুরুষগণ ব্যতীত অপর জনসাধারণের পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু সেই কারণে এই অসাধারণ বিচারশক্তি ও সাধারণ কর্ম্মশক্তিসম্পন্ন নরনারীদিগকে ধর্ম্মসাধনায় অনধিকারী বলিয়া উপেক্ষার সহিত দূরে সরাইয়া দেওয়া প্রকৃত আচার্য্যের কার্য্য নহে। মানবমাত্রেই ধর্ম্মসাধনায় অধিকারী এবং জীবনের চরম লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইবার যোগ্য। তাহাদের বুদ্ধিগ্রাহ্য করিয়া, তাহাদের কর্ম্মশক্তির উপযোগী করিয়া, তাহাদের দেহেন্দ্রিয় মনের গঠন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাসমূহের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া, সনাতন ধর্ম্মতত্ত্বসকল—সাধ্যসাধন রহস্যসকল—সরলভাবে উপস্থিত করিবার জন্য এবং তাহাদের জ্ঞান ও সামর্থ্য ও আবেষ্টনীর অনুকূলভাবে শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করিয়া, তাহাদিগকে ধর্ম্মের নামে আকর্ষণ করিয়া আনিবার জন্য সমাজের আচার্য্যগণ বিশ্বনিয়ন্তা ভগবানের নিকট দায়ী। দেশে উপযুক্ত আচার্য্যের অভাব হইলেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের সাধনালব্ধ জ্ঞানবিজ্ঞানের ধারা নিম্নস্তরের নরনারীগণের নিকট অবাধভাবে

প্রবাহিত হইয়া পৌঁছে না, সমাজের উচ্চশ্রেণী ও নিম্নশ্রেণীসমূহের মধ্যে কৃষ্টিগত দুরতিক্রম্য ব্যবধানের সৃষ্টি হয়, নিম্নশ্রেণীর নরনারীগণ যথোচিত ধর্ম্ম-শিক্ষার অভাবে ক্রমশঃই কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইয়া অবনত হইতে থাকে—বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইতে থাকে, তাহাদের অবনতিতে সমস্ত সমাজেরই অধোগতি হয়, সমগ্র সমাজে ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়। প্রত্যেক যুগের আচার্য্যগণের অপরিহার্য্য দায়িত্ব এই যে, তাঁহারা অপৌরুষেয় সনাতন ধর্ম্মতত্ত্ব আপনারা সম্যক্‌রূপ অধিগত করিয়া, দেশকাল ও অবস্থার অনুকূল আকারে, জনসাধারণের উপযোগী সরল ও সরস ভাষায়, শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিবেন, এবং সনাতন ধর্ম্মের ভিত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সর্ব্ব-জনীনতা বিধান করিবেন।

আদর্শ আচার্য্য শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ভারতীয় সাধনার চিরন্তন ভিত্তিস্বরূপ বেদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া, দেশের সর্ব্বসাধারণের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণের উদ্দেশ্যে 'মহাভারত' রচনা করিলেন। সর্ব্বজন-বুদ্ধিগ্রাহ্য ও সর্ব্বজনচিত্তাকর্ষক ঐতিহাসিক মহা-কাব্যের আকারে এই বিরাট শাস্ত্রগ্রন্থ বিরচিত হইল ইহার মধ্যে বহুসংখ্যক প্রাচীন আখ্যায়িকা উপন্যাস ও খণ্ডকাব্য সন্নিবেশিত হইয়া ইহার ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত করিল। কিন্তু এ সবই হইল বিশ্বমানব কল্যাণকর ধর্ম্মজ্ঞানের বাহনস্বরূপ। এই মহাভারত যথার্থতঃই পঞ্চম বেদ বলিয়া খ্যাতি ও প্রচার লাভ করিয়াছে। এই পঞ্চম বেদে সনাতন বেদের সকল পারিভাষিক অপ্রচলিত শব্দসমূহ বর্জ্জিত হইল, যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকাণ্ডসকলের বাহ্যিক বাহুল্য পরিত্যক্ত হইল, বিশেষ বিশেষ যজ্ঞের বিশেষ বিশেষ মন্ত্র, উপকরণ, উচ্চারণবিধি, প্রয়োগবিধি প্রভৃতি সম্বন্ধে চুলচেরা বিচার পরিহৃত হইল; কিন্তু উপনিষৎশীর্ষক সমগ্র বেদের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে এবং তদঙ্গীভূত প্রায় প্রত্যেক বিদ্যার রহস্য সম্বন্ধে, যাহা কিছু যথার্থ ধর্ম্মসাধনার জন্য সর্ব্বসাধারণের জ্ঞেয়, তাহা ইহার মধ্যে সুখবোধ্য ভাষায় ও চিত্তাকর্ষক গল্পেতিহাসাদির ভিতর দিয়া প্রচারিত হইল। এই মহাগ্রন্থে সকল শ্রেণীর নরনারীর পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ধর্ম্ম, মানবমাত্রের সাধারণ ধর্ম্ম, প্রত্যেক বর্ণ ও প্রত্যেক আশ্রমের বিশেষ ধর্ম্ম, স্বাভাবিক অবস্থোচিত ধর্ম্ম ও আপৎকালীন ধর্ম্ম—সবই সুষ্ঠুরূপে নানাবিধ দৃষ্টান্ত, ইতিহাস ও যুক্তিবিচারের সাহায্যে নিরূপিত হইয়াছে। কূট-রাজনীতি, জটিল সমাজনীতি, বিচিত্র পারিবারিক নীতি—সবই ইহা হইতে শিক্ষা করা যায়। শুধু তাহাই নয়। বেদবাহ্যজাতিসমূহের মধ্যে যে সব বিদ্যা বিকাশ পাইয়াছিল, এবং বৈদিক সমাজ যে সব বিদ্যা সম্বন্ধে পশ্চাৎপদ ছিল, সেই সব বিদ্যাও শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন আহরণ করিয়া মহাভারতে আর্য্য-ধর্ম্মের অঙ্গীভূতরূপে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। তান্ত্রিক গুহ্যসাধনাসমূহেরও তাত্ত্বিক রহস্যসমূহ ইহাতে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। সাংখ্য, যোগ, পাশুপত মত, পাঞ্চরাত্র মত, একান্তী মত—এই প্রকার যত মতবাদ ও সাধনপ্রণালী ভারতের আর্য্য-সমাজে ও আর্য্যবহির্ভূত সমাজে প্রসারলাভ করিয়াছিল, সবই মহাভারতে ব্যাখ্যাত ও আলোচিত হইয়াছে এবং তাহাদিগকে এক সূত্রে গাঁথিবারও প্রচেষ্টা হইয়াছে। আরো লক্ষ্য করিবার বিষয় এই, একদিকে যেমন বৈদিক চিন্তা-ধারার আনুগত্যে বর্ণাশ্রমবিভাগাদির মূলনীতি ও তদনুযায়ী স্বধর্ম্মাচরণের বিধিব্যবস্থা প্রভৃতির গৌরব ও সৌন্দর্য্য অতিশয় যুক্তিযুক্তভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে, অন্যদিকে তেমনি অসাধারণ পুরুষকার-সম্পন্ন নরনারীদের অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সলাভ যে জাতিবর্ণাশ্রমাদির উপর নির্ভর করে না, একজন ব্যাধের পক্ষেও যে নারদের উপদেষ্টা হওয়া অসম্ভব নয়, এক পতিসেবানিষ্ঠা সতীর আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও শক্তি যে এক মহাতপস্বীকে পরাভূত করিতে

পারে, ইহা বিশদভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। এমন কোন সমস্যা নাই, যাহা মহাভারতে আলোচিত হয় নাই, যাহার সমাধানের একটা পথ ইহাতে নির্দ্দেশ করা হয় নাই।

এই মহাভারতের কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত শ্রীমদ্-ভগবদ্‌গীতা। ভগবান্ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ যে বিশ্বজনীন ধর্ম্মের আদর্শ অর্জ্জুনের নিকট সংক্ষেপে উপদেশ করিয়াছিলেন, মহর্ষি পরাশর শ্রীকৃষ্ণ সেই আদর্শকেই মহাভারতে একটি বিচিত্রাবয়বসম্পন্ন দেহ প্রদান করিয়াছেন এবং বিচিত্র বেশভূষায় অলঙ্কৃত করিয়া প্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই মহাভারতই বস্তুতঃ মহাভারত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, এই বিশাল মহাদেশে এক কৃষ্টি, এক সংস্কৃতি, এক জীবনাদর্শ, এক ভাবধারা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, অসংখ্য পরস্পরবিরোধী জাতি ও সম্প্রদায়কে এক সুমহান্ আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত করিয়াছে এবং তাহাদের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে আঘাত না করিয়াও তাহাদিগকে এক জাতিভুক্ত করিয়াছে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এই মহাভারতকেই হিন্দুসভ্যতার প্রধান সংগঠক বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শুধু তাহাই নয়, মহাভারতীয় কৃষ্টির প্রভাব ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম করিয়া দেশদেশান্তরে বিস্তার লাভ করিয়াছে।

কিন্তু এই মহাভারত রচনা ও প্রচার করিয়াও আচার্য্যপ্রবর মহামুনি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন আপনার আচার্য্যত্ব সম্যক্‌সার্থকামণ্ডিত মনে করিতে পারিলেন না। ভারতীয় সাধনার প্রাণের কথা সমাজের নিম্নতম স্তর পর্য্যন্ত দ্বারে দ্বারে পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিতে না পারিলে এই মহাপ্রাণ আচার্য্যের প্রাণ শান্তিলাভ করিবে কিরূপে? মহাভারতে বর্ণিত তত্ত্বসমূহ আরো সরল, আরো সরস, আরো কৌতূহলোদ্দীপক, আরো হৃদয়স্পর্শী করিয়া দেশের সর্ব্বত্র প্রচার করা আবশ্যক। মহাভারত প্রচারের পরেও তাঁহার প্রাণ কাঁদিতেছিল,—"ঊর্দ্ধবাহু র্বিরৌম্যেষ ন চ কশ্চিৎ শৃণোতি মাম্। ধর্ম্মাদর্থশ্চ কামশ্চ কথং ধর্ম্মো ন সেব্যতে॥" কিন্তু জনসাধারণ ধর্ম্মের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতেছে না দেখিয়া তিনি তাহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন না, তাহাদের সম্বন্ধে হতাশ হইয়া ঔদাসীন্য অবলম্বনপূর্ব্বক নির্ব্বিকল্প সমাধিতেও নিমজ্জিত হইলেন না; তিনি বিবেচনা করিলেন যে, তিনিই তাহাদের প্রাণের সন্নিকটে উপস্থিত হইতে সমর্থ হন নাই, তাঁহারই কর্ত্তব্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হয় নাই, ভারতের প্রাণের কথার সহিত ভারতীয় আপামর সাধারণ সকলের প্রাণের যোগ সংস্থাপনের জন্য তাঁহাকে আরো যোগ্যতর উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

এইরূপ বিচার করিয়া তিনি পুরাণ রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। বেদ ও মহাভারতের কার্য্য পূর্ণ করিবার জন্যই পুরাণ রচনায় প্রবৃত্ত। বেদ ও মহাভারতের তত্ত্বসমূহই এই সব পুরাণে আরো সহজ ও রসাল ভাষায় ব্যাখ্যাত হইল। আরো অনেক ইতিহাস, গল্প, উপন্যাস ইহাতে সংযোজিত হইল। বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন স্তরের নরনারীর মধ্যে যে সব 'রূপ-কথা' প্রচলিত ছিল, সে-গুলিকেও আধ্যাত্মিকতামণ্ডিত করিয়া তত্ত্বের বাহনরূপে ব্যবহার করা হইল। এই সব তত্ত্ব সমন্বিত পৌরাণিক আখ্যানসমূহ সঙ্গীতাকারে সুরতাল মূর্চ্ছনা সহকারে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে গান করিবার ব্যবস্থা হইল। আরো বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, শূদ্রজাতীয় আচার্য্যদের দ্বারাও এই সব পুরাণের পাঠ, ব্যাখ্যান ও গানের রীতি প্রচলিত হইল। বেদের উচ্চশিখরে যে সব তত্ত্ব নিহিত ছিল, শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নের কৃপায় সেই সব তত্ত্ব সমাজের নিম্নতম স্তরের নিরক্ষর নরনারীগণও নিতান্ত স্বাভাবিকভাবে ঘরোয়া জিনিষের মতই পাইতে লাগিল। ভারতীয় সাধনা সত্য সত্যই ভারতীয় জনসাধারণের সাধনার বিষয় হইয়া আবাল-

বৃদ্ধবনিতা সকলের চিত্তকে আবিষ্ট করিবার সুযোগ লাভ করিল।

এই প্রকারে যেমন ভারতীয় সাধনার বিশ্বজনীনত্ব সম্পাদিত হইল, তেমনি বিভিন্ন মতাবলম্বী আচার্য্যগণের ও তাঁহাদের অনুবর্ত্তী সাম্প্রদায়িক সাধনপন্থীদিগের সংকীর্ণতা-প্রসূত দ্বন্দ্ব মিটাইবার জন্য তিনি বেদান্ত দর্শন প্রণয়ন করিলেন। এই দর্শনে যাবতীয় প্রচলিত মতবাদ আলোচনা করিয়া তাহাদের কোন্ কোন্ অংশ ভ্রান্ত ও পরিহার্য্য এবং কোন্ কোন্ অংশ গ্রহণীয়, তাহা প্রদর্শন করিলেন, বৈদিক বাক্যসমূহ বিচার করিয়া তাহাদের তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণ করিলেন, স্মৃতিবাক্য ও নৈয়ায়িক যুক্তিদ্বারা তাঁহার সিদ্ধান্তসমূহ সমর্থন করিলেন, এবং এইরূপে ভারতীয় সাধ্য-সাধনতত্ত্বসমূহ দার্শনিক মীমাংসার উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া সুদৃঢ় করিলেন। দার্শনিক সমাজে তদবধি বেদান্ত দর্শনই ভারতীয় তত্ত্ববিজ্ঞানের দার্শনিক ভিত্তিরূপে গৃহীত হইয়া সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে।

এই ভাবে সকল দিক দিয়া ভারতীয় কৃষ্টিকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সর্ব্বজনীন করিবার ব্যবস্থা করিয়া মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বিশ্রামলাভের জন্য, বদরিকাশ্রমে গমনপূর্ব্বক আত্মসমাধানে মনোনিবেশ করিলেন।

বর্ত্তমান যুগ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীকালীপদ চক্রবর্ত্তী, বি-এ

আজ পৃথিবীব্যাপী বিপ্লব। মানবজাতি আজ পরস্পরের বিদ্বেষে জর্জ্জরিত, চারিদিকে রণবহ্নি ধূমায়িত ও স্ফুলিঙ্গায়িত। জাতিতে জাতিতে শ্রেণীতে শ্রেণীতে আজ দ্বন্দ্বের অন্ত নাই। সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতন্ত্রবাদের অত্যাচারে লোক-সমাজ আজ বিমর্দ্দিত ও বিপর্য্যস্ত। ইহার উপর নাস্তিকতাও সন্দেহবাদে লোকচিত্ত অস্থির ও শান্তি-ভ্রষ্ট। এই পৃথিবীতেই আজ আমাদের বাস। এই-পৃথিবীব্যাপী দুর্দ্দিনে আজ আমরা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবকেই চাই। তাঁহাকে কেন চাই? তিনি কি এই কঠোর দুঃখ ও পঙ্কিল মৃত্যুর হাত হইতে উদ্ধার করিয়া অমৃতের পথে,—শান্তির পথে আমা-দিগকে টানিয়া নিবেন?

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব ত্যাগী, নিস্পৃহ, একান্ত সাধুপুরুষ, তবে তিনি আমাদের জীবনোপযোগী এমন কি ধন দান করিয়া গিয়াছেন যে, যাহার জন্য আজ এই বিশ্বব্যাপী মহোৎসবের আয়োজন? কেন ভোগ-বিলাসী পাশ্চাত্যদেশসমূহ হইতেও শ্রদ্ধার উৎস স্বতঃ উৎসারিত হইয়া প্রাচ্যের অঙ্গন উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিয়াছে? রামকৃষ্ণ আমাদের দান করিয়াছেন অমৃতমন্ত্র, দেখাইয়া গিয়াছেন আমাদের মুক্তির পথ। অন্যান্য সাধু সন্ন্যাসীর মত তিনি লৌকিক জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আপনাকে 'বিশ্ববিহীন বিজনে' গোপন রহস্যে আচ্ছন্ন করিয়া রাখেন নাই। পৃথিবীময় দুঃখের মধ্যে তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন 'জীব শিব'। আমরা জানি, তিনি তাঁহার বিশ্ববরেণ্য শিষ্য বিবেকানন্দকে চিদানন্দরসে ডুবিয়া থাকিতে দেন নাই, জীবকে শিবজ্ঞান করিতে উপদেশ দিয়া তাহার ধর্ম্মজীবন নিষ্কাম কর্ম্মের মহিমায়

সার্থক করিয়া তুলিয়াছিলেন। ‘আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়’—তিনি নিজের জীবনে ইহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি বলিতেন—মনের শান্তি চাও তো অন্যের সেবা কর, ভগবানকে পাইতে চাও তো মানুষের সেবা কর।

মানুষের মহত্ত্ব ত্যাগে, বিশ্বপ্রেমের উদার মহিমায়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ত্যাগ ও প্রেমের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। পাশ্চাত্য ভাষায় যাঁহাকে Great Soul বলি, রামকৃষ্ণ তাহাই। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যে মানবধর্ম্মকে সর্ব্বোচ্চ আসনে স্থান দিয়াছিলেন, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেই মানব-ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ নিদর্শন। তিনি ধর্ম্মকে শাস্ত্র-কারাগারে বন্দী রাখিয়া দুর্ব্বিগম্য করিয়া তোলেন নাই। সকল ধর্ম্মের সারতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া সহজ ও সরল ভাষায় আমাদের উপযোগী করিয়া দান করিয়া গিয়াছেন। তাই তিনি প্রায়ই বলিতেন—কেবল লেক্‌চার দেওয়া, আর বুঝিয়ে দেওয়া, আপনাকে কে বুঝায় তার ঠিক নেই। তুমি বুঝাবার কে? যাঁর জগৎ তিনিই বুঝাবেন, তাঁকে লাভ করো, তিনি শক্তি দিলে তবেই সকলের হিত কর্‌তে পারো, নচেৎ নয়। মানুষের শক্তিতে লোকশিক্ষা হয় না, যে লোকশিক্ষা দেবে তার শক্তি ঈশ্বরের কাছ থেকেই আসবে, আর ত্যাগী না হলে লোকশিক্ষা হয় না। রামকৃষ্ণ ভারতীয় সাধনা ও সংস্কৃতির মূর্ত্তপ্রতীক। ভারতের সনাতন আদর্শকে উজ্জীবিত করিয়া ভারতেতি-হাসের নূতন এক অধ্যায়ের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রথম বন্যাবেগে যখন আমাদের ধর্ম্ম-সমাজ আন্দোলিত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট, মরীচিকার মোহে সনাতন আদর্শকে পদদলিত করিয়া বিপথগামী হইয়া পড়িয়াছিল, তিনি আসিলেন ধর্ম্ম ও সমাজ-তরণীর কর্ণধার রূপে। কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য দেখাইয়া সর্ব্ব-ধর্ম্মের সমন্বয়াচার্য্যরূপে তিনি জীবনের উপর বিস্তার করিয়া গিয়াছেন এক অখণ্ড প্রভাব। মনে হয়, শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের পর জনমতের উপর এমন প্রভাব বিস্তার করিতে অন্য কেহই সক্ষম হন নাই। এক এক করিয়া ধীরে ধীরে সমস্ত ধর্ম্মের অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়া তিনি মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিলেন যে, সকল ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব এক—বিভিন্ন মত বিভিন্ন সোপান মাত্র। মুসলমানেরা জলকে বলে ‘পানি’, ক্রীশ্চানেরা বলে (Water) ‘ওয়াটার’ হিন্দুরা বলে ‘জল’,—সবই কিন্তু আসলে এক—একই সত্য স্বরূপের বিভিন্ন বিকাশকে আমরা বিভিন্ন নামে অভিহিত করি মাত্র, কিন্তু আসলে পরম সত্য এক এবং অদ্বিতীয়।

“ত্রয়ী সাঙ্খ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল-নানাপথজুষাম
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥”

ইহাই ভারতধর্ম্মের স্বরূপ। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবে এই ভারতীয় ধর্ম্মের শরীরী মূর্ত্তি, নিখিল-ধর্ম্মের শান্তোজ্জ্বল বিগ্রহ এখানে দীপ্যমান, এখানে সর্ব্ব-ধর্ম্মের সমন্বয় ও সর্ব্বভাবের মহামিলন।

বর্ত্তমান জগতে অন্ধবিশ্বাসের আর স্থান নাই। বিতর্ক ও বিচার মানুষের হৃদয়ক্ষেত্র জুড়িয়া বসিয়াছে। রামকৃষ্ণ বর্ত্তমান যুগপ্রগতি লক্ষ্য করিয়াই তাঁহার ধর্ম্মমতকে সুযুক্তিদ্বারা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ‘Rational outlook over things’ সকল জিনিষের উপরই এই যে যুক্তিপূর্ণ দৃষ্টি—ইহার জন্যই অতি আধুনিক সভ্যতাদীক্ষিত জাতি পর্য্যন্তও তাঁহার প্রচারিত সত্যে আস্থা স্থাপন করিতে পারিয়াছে। বর্ত্তমান জগতে এই ‘rational doctrine’ বা যুক্তিযুক্ত ধর্ম্মমতের মূল্য যে কত অধিক তাহা বেশী করিয়া লিখিতে হইবে না। এখানে স্বামীজীর কথাই উদ্ধৃত করিতেছি—“ভারতকে কেন্দ্র করিয়া যে অভিনব শক্তিপ্রবাহ

পুনঃ শতধারে উৎসারিত হইয়াছে, অদূর ভবিষ্যতে তাহা জগতের চরমপ্রান্তে পৌঁছিবে। অতীতের সমষ্টিভূত এই বাণী আজ অতীতকে তুচ্ছ করিয়া অভিনব বেশে বিশ্ববাসীর কর্ণে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। এই মহাবাণীর উদ্গাতা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব।" রামকৃষ্ণের সার্ব্বভৌমিকতা সম্বন্ধে স্বামীজীর বাণী উদ্ধৃত না করিলে আমরা তাঁহাকে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব না।—"ভারতে এমন এক লোকোত্তর মহাপুরুষের আবির্ভাবের প্রয়োজন হইয়াছিল, যিনি একাধারে শঙ্করের অদ্ভুত প্রতিভা, চৈতন্যের অদৃষ্টপূর্ব্ব বিশাল হৃদয়বত্তার অধিকারী হইবেন—যাঁহার মধ্যে এই উভয়ের মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের অমূল্য সম্পদরাজি বিরাজমান থাকিবে—যিনি দেখিবেন সকল সম্প্রদায় সেই একই আত্মা সেই একই ঈশ্বরের শক্তিতে অনুপ্রাণিত, ব্রহ্ম হইতে কীট পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে সেই একই আত্মা নিত্য বিদ্যমান, যাঁহার বিশাল হৃদয় ভারত তথা ভারতেতর সকল দেশের দরিদ্র, ঘৃণিত ও পতিতের দুঃখে বিগলিত হইয়া উঠিবে। অথচ যাঁহার সুতীক্ষ্ণ বিশাল বুদ্ধি এমন মহৎ তত্ত্বসমূহের উদ্ভাবন করিবে যাহা ভারতীয় তথা ভারত বহির্ভূত সকল বিরোধী সম্প্রদায়ের মধ্যে অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধন করিয়া হৃদয় ও মস্তিষ্কের পূর্ণ পরিণতিসূচক এক সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিবে। বলা বাহুল্য ভারতকৃষ্টির মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণদেবই সেই লোকোত্তর মহাপুরুষ।"

সত্যই রামকৃষ্ণের জীবন তাঁহার সারগর্ভ উপদেশ অপেক্ষা শতসহস্রগুণে মধুর ও বলপ্রদ। তাই তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবন বেদান্তের সমুজ্জ্বল ভাষ্যরূপে বিরাজ করিতেছে।

এমন অদ্ভুত পরিপূর্ণতা, এমন অপূর্ব্ব সৌসামঞ্জস্য, এমন অহেতুকী করুণা, জগতের ইতিহাসে বিরল। বর্ত্তমান যুগে সাম্যমৈত্রী স্বাধীনতার বাণী চারিদিকে উদ্ঘোষিত হইয়াছে, একদিকে যেমন রাষ্ট্রজগতে গণতন্ত্র, অন্যদিকে ধর্ম্ম ও সমাজ ক্ষেত্রে সাম্যবাদের বাণী ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমানে এই রাষ্ট্র ও সমাজ-বিপ্লবের দিনে সাম্যমৈত্রীর বার্ত্তাবহ রামকৃষ্ণের সাধনা ও সংস্কৃতির ধারা কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি ইহুদী, কি খৃষ্টান সকল ধর্ম্মের আপাতবিরোধ ও পার্থক্য নিরাকরণ করিয়া মানব-সমাজকে চির-চরিতার্থতায় মণ্ডিত করিয়া দিয়াছে। তাঁহার বাণীর মধ্যে এক মহামিলনের মহৎ আভাস আজ সমস্ত বৈষম্যের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে। একদিন যে সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ কবি কিপলিং (Kipling) গাহিয়াছিলেন—'The East is East, the West is West, the twain shall never meet' তাঁহার সে কথা আজ মিথ্যা প্রমাণিত হইতে চলিয়াছে। রামকৃষ্ণের মিলনমন্ত্র আজ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের কৃষ্টির সমন্বয় সাধন করিয়া এই দুই মানবজাতিকে এক সুদৃঢ় প্রেম-বন্ধনে যুক্ত হইবার সুযোগ আনিয়া দিয়াছে। সত্যই মনে হয়, এমন উদার ও অদ্ভুত সমন্বয়াচার্য্য ইতিপূর্ব্বে জগতে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। স্বামীজীকে যাঁহারা ভাল করিয়া জানেন, তাঁহারা ইহা অন্তর দিয়া বিশ্বাস করেন যে, তাঁহার জীবনের মূল প্রেরণা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব। স্বামীজীই হইতেছেন রামকৃষ্ণ সাধনার আশুস্ত ফল। রামকৃষ্ণের বাণী ও উপদেশ স্বামীজীর জীবনে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা তাঁহার নিজের কথা হইতেই উপলব্ধি করা যায়। তিনি বলিতেন যে তিনি যাহা করিতেছেন ও বলিতেছেন সমস্তই তাঁহার আচার্য্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের, কিছুই তাঁহার নিজের নহে। যে অস্পৃশ্য পতিত মানবজাতিকে আমরা মনুষ্য সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছি, তাহাদিগকে দরিদ্র নারায়ণ বলিয়া সেবার প্রেরণা স্বামীজী রামকৃষ্ণের নিকট হইতেই পাইয়াছিলেন। স্বামীজী

যখন একদিন নির্বিকল্প সমাধি লাভের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করেন, তিনি তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিয়াছিলেন—ছিঃ তুই হবি বট গাছের মত শত শত তাপিত জীবের আশ্রয়, তা না চেয়ে তুই চাচ্ছিস্ কি না আত্ম সুখ, ধিক্ তোকে। তাই স্বামীজীর—

বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর॥

রামকৃষ্ণ অনুপ্রেরণা লব্ধ মন্ত্র আজ আমাদের জাতীয় জীবনের মুক্তি-মন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

রামকৃষ্ণের পূর্ববর্ত্তী যুগ সংস্কারের যুগ, খৃষ্টধর্ম্মের প্রসার, ভারতে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তন, তাহার বিরুদ্ধে রামমোহন রায় প্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুত্থান। এই আঘাত ও প্রত্যাঘাত, বিপ্লব ও সংঘাতের সমন্বয়াচার্য্যরূপে ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অভ্যুদয়। স্বামীজী নিজেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে পরমহংসদেবের পর হইতেই নব্য ভারতের সূত্রপাত হইয়াছে। এই যে Renaissance of Indian culture ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুত্থান, ইহার মূল উৎস হইতেছেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। স্বামীজীই এই বেদান্তের বাণী পাশ্চাত্য জগতে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। ইউরোপের কৃষ্টিগত বিজয় বা cultural conquest-এর বিরুদ্ধে ইহাই ভারতের বিজয় অভ্যুত্থান। রামকৃষ্ণের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সমাজে ধর্ম্মে ও চিন্তাধারায় এক অভিনব স্রোত প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। সুদীর্ঘ দুঃখ রজনী অবসান প্রায়, ভারতের জড়তা আজ অতীতের কাহিনী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বিশেষ বিশেষ যুগের একটী বিশিষ্ট সাধনা আছে,—তাহাকে পিছন করিয়া অগ্রসর হওয়া যায় না। বর্ত্তমান যুগ গণতান্ত্রিকতার যুগ। ধর্ম্মেই হউক, সমাজেই হউক বা রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রেই হউক, সর্ব্বত্রই আজ গণতান্ত্রিক সাধনা। ব্যক্তিত্ব সাধনা যখন সীমা ছাড়াইয়া উঠে, যখন ক্ষুধিতের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতে উদ্যত হয়, তখনই আসে বিদ্রোহ। তাই আজ দিকে দিকে গণতন্ত্রের অভ্যুদয়। সমাজ বা রাষ্ট্রক্ষেত্রে সমষ্টির জন্য ব্যষ্টির স্বার্থ বিসর্জ্জন করিতেই হইবে—ইহাই জাগতিক নিয়ম। আজ যে জগতে শোষণের অভিনয় চলিয়াছে, মনুষ্যত্বের এই নিষ্ঠুর অপমানের বিরুদ্ধে শুধু একমাত্র প্রেমের অভিযানই ফলপ্রদ। রামকৃষ্ণের বার্ত্তা এই প্রেমেরই বার্ত্তা। সেই জন্যই পাশ্চাত্য দার্শনিক মহামনীষী রোঁমা রোঁলা বলিয়াছেন যে, রামকৃষ্ণের আদর্শই আজ এই বিভীষিকাগ্রস্ত জগৎকে শান্তির প্রলেপে স্নিগ্ধ করিতে পারে। মানুষ যত ভোগের ক্ষুধা বাড়াইবার জন্য যন্ত্র-দানবের উদ্ভাবন করিবে, ততই তাহার নিত্য নব নব ক্ষুধা বাড়িয়াই যাইবে। ইহা হইতে মুক্তির উপায় কি? মুক্তির উপায় অভাব-বোধের হ্রাস। চিত্তকে অন্তর্মুখী করিয়া আত্মোপলব্ধি। তাই তিনি বলিতেন—তাঁর উপর বিশ্বাস এলেই সব হয়ে গেল। আমরা আমাদের সেই অসীমের দৃষ্টি হারাইয়া সীমার বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি, সেই জন্যই তো দুঃখের নিবৃত্তি হয় না। সম্মুখে অজস্র ভোগের উপকরণ, কিন্তু ভোগ করিয়া তো তৃপ্তি হয় না। 'ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।' তাই রামকৃষ্ণ বলিতেন—তোরা অমন ছোট হ'বি কেন, তোদের ছোট হ'তে দেখ্‌লে আমার ভয়ানক লাগে। রাজার ছেলের মাটীর ঢেলায় লোভ কেন?—ইহাই তো মনুষ্যত্বের দিব্য মন্ত্র। আমরা মানুষ, মানুষের মত আমাদের বাঁচিতে হইবে—ইহাই ধর্ম্মের সার কথা। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের এই বিশাল সার্ব্বজনীন মানব ধর্ম্মের উদ্গাতা। বর্ত্তমান যুগের সঙ্গে ইহার অপূর্ব্ব মিল ও সামঞ্জস্য আছে বলিয়াই, ইহা আজ জীবনের পক্ষে কল্যাণকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শুধু ভারতে নহে সমগ্র জগতে আজ রামকৃষ্ণের আদর্শ স্বীকৃত ও শ্রদ্ধাভরে গৃহীত হইতেছে। তাঁহার 'কথামৃত' আজ শুধু জাতীয় সম্পদ নহে, সমগ্র জগৎ ইহা হইতে জীবনের মূলমন্ত্র খুঁজিয়া পাইতেছে। সেই জন্যই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকে যুগপ্রবর্ত্তক বা যুগগুরু বলিয়া আখ্যা দিলে অশোভন হয় না।

স্বামীজী

রাজা শ্রীপূর্ণেন্দু রায়, বাণী-বিনোদ

হে সন্ন্যাসি ! আনিয়াছি আজি তব পূজা-অর্ঘ্য-ভার
পুণ্যময় স্মরণের প্রাতে চিরপূজ্য তোমার চরণে ;
অন্তরের সুধা সুরভিত প্রাণ-প্রেম-পুষ্প-উপচার
রচিয়াছি ভাষাহারা কী সে পুলকের স্বপ্ন-শিহরণে ।
তোমার নীরব প্রেম ভিখারী কবির অন্তর-প্রদেশে
নিরন্তর দিলো আসি' দোলা, দিলো এক নূতন সন্ধান ;
জানাইতে পরাণের নতি আসিয়াছি আনন্দ-আবেশে
নাহি প্রিয়, ঘটা-আয়োজন কিছু উৎসব-জয়গান ।
একদিন ভারত যখন মুহ্যমান অসাড়তা-মাঝে,
হেরেছিলে হেরীর সন্ন্যাসি ! আপনার আঁখিযুগ মেলি' ;
করুণার্দ্র অন্তরের তলে ঘনীভূত ব্যথা বড়ো বাজে,
বেদনায় নীল হ'য়ে গেলে গুপ্ত এক উষ্ণশ্বাস ফেলি' ।
কোথা' কন্যাকুমারীর বুকে দেবতার মন্দির-সোপানে,
কোন্ দূর দিগন্ত-সীমায় ভারতের শেষ শিলা-'পরে,
গর্জমান পারাবারে চাহি' কতো সকরুণ সজল নয়ানে—
'আমার ভারত হায় !'—বলি' ফুকারিলে ব্যাকুলিত স্বরে ।
নিপীড়িতা ভারত তখন অরণ্যের অন্ধ অন্তস্তলে—
অজ্ঞের ধূলি-ধূসরিত বিষবাষ্প সম্পৃক্ত সন্ধ্যায় ;
কুণ্ঠাহীন লোল-লালসার শুচিহীন পঙ্কিল পল্বলে,
ঊর্দ্ধপানে আকণ্ঠ ডুবায়ে নিঃশ্বসিয়া কেঁদে ফিরে চায় ।
সীমাহীন মহাসাগরের উদ্বেলিত অনন্ত-প্রসার—
আলেখ্য আঁকিলো তব দিশাহারা আয়ত আঁখির তটে ;
ক্রন্দসী সে অন্তরের দ্বার উন্মোচিত হ'লো একবার,
হেরিলে হীরক-রচা গৌরব-লিপিকা স্বপনের পটে ।
কে বলে ভারত তুচ্ছ ! ভারত আমার নহে ক্ষুদ্র—হীন—
ভালে যা'র বালার্ক-তিলক, পদ-যুগ সিন্ধু চলে চুমি',
এখনো প্রণব মন্ত্র গগনে-পবনে শুনি অনুদিন ;
এ যে বেদ-বিশ্বামিত্র-ভারতের-মহাভারতের ভূমি ।

হ'তে পারে আজি' এ ভারত হারা'য়েছে স্বচ্ছন্দ-বিকাশে,
দুরবল—হ'য়েছে দরিদ্র, কিন্তু তবু নহেকো ভিখারী ;
ম্রিয়মান—মৃত নহে কভু পাশ্চাত্যের উগ্রতম শ্বাসে
অত্যাচারে, অযুত আঘাতে চিত্ত-ক্ষোভ উঠে হাহাকারি' ।
অব্যাহত চিন্তা-চলচ্চিত্র সিন্ধু-বুকে হ'য়ে গেল লীন,
যুবন্ পরাণে তব পড়ে যুগান্তের কালোমেঘ-ছায়া ;
বেদনার শিলালিপি হৃদয়ে ক্ষোদিত হ'লো সীমাহীন,
অজেয় আত্মারে বেড়ি' নামি' আসে মত্ত বিক্ষোভের মায়া ।
বিক্ষোভিত অন্তর-নিতলে প্রজ্বলিলো বিপ্লবের শিখা,—
যাত্রা তব আরম্ভিলে : বিলুপ্ত করিতে চাও কলঙ্ক কালিমা,
শ্রীগুরুর শুভ আশীর্ব্বাণী ললাটে দীপ্ত জয় টীকা,
পদতলে কাঁপে শুধু পথে—চরণের মুক্তির মহিমা ।
তোমার দুরন্ত চলা দানবের দুর্গ-তোরণের কোলে—
বিলাইতে প্রাণ-প্রেম বিঘোষিতে নব যুগের বারতা,
শুনাইতে সত্য-সাম-গান গভীর কল্লোল-রোলে
সর্বহারা ভারতের অমৃতের নীতি, মঞ্জু কল-কথা ।
তোমার মোহনমন্ত্রে হে চিরমোহন ! কণ্ঠমেঘমন্দ্রে
বিশ্বসারা বিস্ময়-বিমূঢ় অনিমেষে রহিলো চাহিয়া ;
পাশ্চাত্যের কলেবর হ'লো রোমাঞ্চিত, প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে
চলে অপরূপ শিহরণ বিদ্যুতের প্রবাহ-বাহিয়া ।
সন্ন্যাসীর কল্যাণের গীতা, বিজয়ীর বোধনের বাণী
অধ্রুবের প্রান্তপারে জাগাইলো এক ধ্রুব জ্যোতির্ময় ;
মৃত্যু-মাঝে অমরত্ব সুপ্ত নয়নে চেতনা দিলো আনি',
মরু পেলো মরুদ্যান—শ্যাম-স্নিগ্ধতার অনন্ত আশ্রয় ।
দেখিলো নিশ্চয় বটে দলিত ভারত চির গরীয়সী,
মহীয়সী—নহে হীন, পূর্বাশার পরম তীরথ থল ;
জগতের জীবনের লক্ষ্য, সাধনার সমুজ্জল শশী,
মুক্তি-ভূমি কোথা' যদি থাকে, তাহা এই মহাপীঠতল ।
কেন্দ্র এবার ভারতবর্ষ' অপরূপ ভাব-মিলনের,
হে দরদি, দিগ্বিজয়ি, শুধু বারেকের অঙ্গুলি-হেলনে—
প্রমত্ত প্রতীচ্য আজি' লক্ষ্য আপনার লভিয়াছে ফের,
লভিয়াছে মঙ্গল-আশিষ নবতম অমৃত-লগনে ।
এতোদিন যা'র তরে বন্ধু, ছিলে তুমি উতলা-উদ্‌গ্রীব,
তোমার জীবন-স্বপ্ন, প্রাণধর্ম সকল আজিকে, তুয়ে—

পাশ্চাত্যের শিবহীন শক্তি, প্রাচী-বশকতিহীন শিব
মিলিয়াছে পরস্পর পরাণ-প্রয়াসে ভারত-মিলন-ভুঁয়ে।
কঠিন পাষাণে প্রেমে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা দিয়াছো আদরে,—
মূক মুখ ভাষণ-মুখর—ফুটায়েছো শতমধুচ্ছন্দ ;
জেনেছিলে কর্মকামহীন—ধর্মমাত্র জগতের তরে ;
'জীবে শিব'—মূলমহামন্ত্র দিযাছিলে হে বিবেকানন্দ !
ধরণীতে ধর্ম যদি থাকে প্রেম তা'র সকলের মূল,
—'জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর'—
সত্যসার ; আর যতো সমুদায় ভূয়ো, সমুদায় ভুল,
আত্মার মুকতি ? দীনের মাঝারে সে তো রহে নিরন্তর।
লাঞ্ছনা সহিলো যদি মাতা, ব্যথায় ফেলিলো আঁখিজল,
বুভুক্ষু রহিলো যদি ভ্রাতা—দুনিয়ার দীননারায়ণ,
পূজা-পুষ্প-অনুরাগ ল'য়ে নিভৃত সাধনে কিবা ফল।
এতো যাগ, যজ্ঞ, পুণ্য, এতো তীর্থের ও কিবা প্রয়োজন !
বুকের ঘোষণা ওই আজি', জাগা'য়েছে জীবনের গতি,
তুমি শুধু নহতো একার—ভারতের—বিশ্বের জীবন ;
তরুণ কবির এই হে মরমীমিতা। লহো লহো নতি—
সার্থক করিয়া তোলো প্রভাতের মধু মঙ্গল স্মরণ ॥

সাঙ্গীতিকী

দিলীপকুমার

গতবারে লিখেছি টকির গানের কথা। জীবনে গান খারাপ লেগেছে বহুবার—কিন্তু এত খারাপ লেগেছে খুবই কম। বোধ করি আট বছর বাদে হঠাৎ টকি শুনতে গিয়েছিলাম ব'লেই এমনটা ঘটল। তবু টকির গান কেন এত খারাপ লাগল সে নিয়ে অনেক ভেবেছি। তেবে কয়েকটি কথা মনে হয়েছে—বলি।

আজকের দিনে সঙ্গীতের বহুল প্রচার হয়েছে ও হচ্ছে দুটি যন্ত্রের অভ্যুদয়ে: গ্রামোফোন ও রেডিও। এদের কথা আগে একটু ব'লে নেই।

গ্রামোফোনে আমরা ছেলেবেলা থেকে অভ্যস্ত। যন্ত্রের যে-সঙ্কীর্ণতা তা গ্রামোফোনের' থাকবেই একথা বলাই বেশি। কিছুদিন একান্ত নির্জনবাসের পর মনে হ'ত গ্রামোফোন বড় মন্দ—ওতে আর গান দেব না। সেই সময়ে ওডিয়নে ৺আবদুল করিমের গান শুনি ভৈরবী "যমুনাকে তীর"। তবে এত মুগ্ধ হই যে তাবল্লে হ'ল। মনে প্রশ্ন জাগল :

মানলাম—গ্রামোফোনে গানের অনেক রসকষই মাঠে মারা যায়, মানলাম—গ্রামোফোনে জীবন্ত কণ্ঠস্বরের মাধুর্যকে অনেক সময়ে যেন ব্যঙ্গই করা হয়; মানলাম—অতি অল্প সময়ের মধ্যে মাইক্রোফোনের সামনে গান করবার সময় গানের ভাবাবেগের যে সুকুমার সুষমা তার অনেকখানিই নষ্ট হ'য়ে যায়;—কিন্তু সব মেনেও এই প্রশ্ন জাগে—(গত মাসে ৺আবদুল করিমের মৃত্যুর পর থেকে আরও বেশি ক'রে)—যে তাঁর এতগুলি গান গ্রামোফোনে রইল এতে থতিয়ে আমাদের জীবনে রসসম্পদ বেড়েছে কি না? উত্তরটা এত অপ্রতিবাদ্য যে গ্রামোফোনকে আর নামঞ্জুর করার পথ রইল না। এখন প্রায়ই গ্রামোফোনে ৺আবদুল করিমের অনুপম ভীমপলশ্রী, আনন্দ-ভৈরবী, শুদ্ধ কল্যাণ, পিলু, ভৈরবী, বসন্ত, দেবগান্ধার, দেশ প্রভৃতি রাগ শুনি আর মনে হয় গ্রামোফোন না থাকলে এ-আনন্দ থাকত তো শুধু স্মৃতিতেই—অন্য কোথাও তো মিলত না এ-কে। তবে? যন্ত্রের যান্ত্রিকতার দোষটুকুই বা বড় ক'রে দেখব কেন?

এ ছাড়া গ্রামোফোনের আরো একটা ভালো দিক আছে। আমরা রোজ যা গাই তাতে প্রায়ই খুঁৎ থাকে। কান সে সবকে ক্ষমা করে, কিন্তু যন্ত্র ক্ষমা করে না। কাজেই নিখুঁৎ হবার দাবি যদি আদর্শবাদের একটা বড় কথা হয় তবে গ্রামোফোনকে নামঞ্জুর করা চলে না কোনোমতেই। উদাহরণত, সম্প্রতি গ্রামোফোনে গান গেয়ে অনেকবারই মনে হয়েছে গাওয়া বেশ ভালোই হয়েছে, কিন্তু রেকর্ডের যখন নমুনা এল শুনে কতবার যে মন খারাপের চূড়ান্ত হয়েছে তা বলতে পারি না। অবশ্য সব সময়েই যে গাওয়ার দোষে হয়েছে একথা বলি না—কিন্তু অনেক সময়ে সে গাওয়ার ভঙ্গিতে স্বরবিন্যাসের ঢঙে, তানের কলাকাকুতে, তালের যথান্যাসে আরও নানান্ সূক্ষ্ম খুঁটিনাটিতে ভুল হয়েছে তা তো কই টের পাই নি আগে। বস্তুত এবার কলকাতায় গ্রামোফোনে অনেকগুলি গান দিয়ে ও অধিকাংশই ব্যর্থ হওয়ার ফলে অনেক শিখেছি। নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা জানাতেই যে একথা বলছি তা নয়। বলছি শুধু দেখাতে যে নিখুঁৎ হওয়ার আদর্শ যদি বড় হয় তবে গ্রামোফোন আমাদের অনেক বিষয় সহায় হ'তে পারে। বিশেষ ক'রে কণ্ঠস্বরের এতটুকু ক্লান্তি, এতটুকু অবসাদ গ্রামোফোন ধ'রে দেয় যেমন ভালো তালমান যন্ত্রের পায়া ধ'রে দেয় এতটুকু তালের ইতর বিশেষ।

অবশ্য এখনকার দিনে গ্রামোফোনের—বিশেষ ক'রে কলকাতার রেকর্ডিংএর দোষ হচ্ছে এই যে মোটে তিন মিনিটে গাইতে হয়। তিন মিনিটে ভালো গান অসম্ভব। অন্ততঃ সাত আট মিনিটের কমে একটা গান সন্তোষজনক ভাবে গাওয়া যায় না। কিন্তু এক্ষেত্রে স্মরণীয় যে, এটা গ্রামোফোনের দোষ নয়—এর জন্যে দায়ী প্রধানত ক্রেতা। তাঁরা যদি বলেন সাত আট মিনিটের রেকর্ড ছাড়া রেকর্ড কিনবেনই না তা'হলে ব্যবসায়ীরাও সাত আট মিনিটের রেকর্ড সরবরাহ করতে বাধ্য হবেন। বিলেতে দশ মিনিট এমন কি পনের মিনিটের রেকর্ডও আছে। অতএব এখনি এখনি এ-মস্ত ত্রুটির নিরাকরণ হ'তে পারে: শুধু লোকমত গ'ড়ে ওঠার অপেক্ষা।

কাজেই গ্রামোফোনকে আদর্শ হিসেবে থতিয়ে মন্দ বলা চলে না—তার ত্রুটি সব স্বীকার ক'রে নেওয়া সত্ত্বেও। রেডিও সম্বন্ধেও ঐ কথা। রেডিওতেও ভালো গান অনেকেই শুনেছেন: আবদুল করিমের, ভীষ্মদেবের, রেণুকা দেবীর, শ্রীমতী হাসি দেবীর—আরো অনেকের। তবে ভারতবর্ষে যে-রেডিও আমরা শুনি তার একটা মস্ত ত্রুটি এই যে রেডিওর লাউড স্পীকারে গলার স্বর প্রায়ই তেমন খোলে না—জানিনা কেন। গ্রামোফোনের সঙ্গে এদিক দিয়ে রেডিওর তুলনাই হয় না। মানি গ্রামোফোনেও কণ্ঠস্বরের মাধুর্যকে

অনেকখানি জরিমানা দিতে হয়—কিন্তু তবু যেটুকু থাকে তার দাম কম নয়। কিন্তু আমাদের দেশে রেডিওতে অতি সুমিষ্ট কণ্ঠও কেন যেন মিষ্ট শোনায় না। কখনো বা ঝনঝন করে—কখনো মোটা শোনায়—কখনো খনখনে সুরে বেজে ওঠে—অম্‌নি রসের ভরাডুবি। রেডিওর গান শুনে তাই সাড়ে পনের আনা ক্ষেত্রে তৃপ্তি মেলে না।

কিন্তু তবু খুব ভালো গান হ'লে তৃপ্তি যে পাওয়া যায় এ-ও সত্য। তাই রেডিওর বর্তমান অবস্থাকেই তার চরম ব'লে মেনে না নিয়ে তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা ভেবে তাকে অভিনন্দন করতেই হয়—বিশেষ যখন রেডিওর সুবিধা অবিসংবাদিত।

অবশ্য সামনা সাম্‌নি জীবন্ত মানুষের গান শোনা আর যন্ত্রমধ্যস্থে গান শোনার মধ্যে তফাৎ আকাশ পাতাল সন্দেহ নেই—কিন্তু এ-জীবনে "হয় সমস্তটাই রাখব, নয় সমস্তটাই ছাড়ব" এ-ধরণের ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা করলে পরিণামে শরশয্যা না হোক উপবাস-পথ্য লাভের সম্ভাবনাই ষোলো আনা। তাই গ্রামোফোন রেডিও থেকে যেটুকু সত্য আনন্দ আদায় করা যেতে পারে, যেটুকু শেখা যেতে পারে সেটুকুকে স্বীকার ক'রে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ, বিশেষ ক'রে এই কথা ভেবে যে ভবিষ্যতে সব যন্ত্রেরই বহু উন্নতি হওয়া যখন অবশ্যম্ভাবী তখন গ্রামোফোন রেডিওকে বাতিল ক'রে দেওয়াটা ভুল হবে। গ্রামোফোন রেডিওর স্বপক্ষে সবচেয়ে বড় কথা অবশ্য এই যে ভালো গান শিক্ষার ওরা খুবই সহায়তা করতে পারে, এবং শ্রোতা ও শিক্ষার্থীর রুচি উন্নত হ'লে ওরা আশুফলদায়ী হ'তে পারে। অবশ্য গ্রামোফোন ও রেডিও যে বহুক্ষেত্রেই বাজে গানের সরবরাহ ক'রে মানুষের রুচিকে নিচু দিকেই টান্‌ছে এ-ও এক শোচনীয় সত্য—কিন্তু এজন্যে দায়িক বিশেষ ক'রে গ্রামোফোন রেডিওর কর্তৃপক্ষ নয়—এজন্যে দায়িক হ'ল বেশির ভাগ লোকের নিকৃষ্ট রুচি। গলসওয়র্দি তাঁর একটি বইয়ে লিখেছেন: "It is a vulgar age."

এ তর্ক একটা মস্ত তর্ক: মানুষের রুচি, নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতার উন্নতি হচ্ছে—না অবনতি? এ তর্কের অর্থই জলে হাবুডুবু খেতে আমার সাধ নেই। কাজেই এ-চিন্তাকে আমি পাশ কাটিয়ে যাব শুধু এই ব'লেই ক্ষান্ত হব যে, বদল ঢের হচ্ছে, ভালো মন্দ মিশেল থাকবে বহুদিন, এবং মন্দের অনুপাতে ভালো যে রাতারাতি ওজনে ভারিক্কি হ'য়ে পড়বে এমন কোনো চিহ্নই দেখা যায় না। তাই এসব বিষয়ে "হায়রে সেকাল" ব'লে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তৃপ্তি হয়ত একটু মিলতে পারে—কিন্তু সেকালের গরিমা সে-দীর্ঘনিশ্বাসের এজাহারে প্রকাশ করা যাবে না। কেন না সেকালেও নানান গলদ ছিলই ছিল—একথা সেকালকে না দেখেও অকুতোভয়ে বলা যায়। তাদের যেকাল চ'লে গেছে সেকাল যখন আর ফিরবে না তখন তার দোহাই দিয়ে একালকে বরখাস্ত করায় লাভও দেখি না। সেকালের সঙ্গে অবশ্য কিছু ভালো জিনিষ অন্তর্হিত হ'য়ে গেছে সত্য, কিন্তু একালের নতুন কোনো ভালো জিনিষের আমদানিতে সে-ক্ষতির পূরণ হয় নি এমনতরো কথা ক্রিটিকের মুখে হয়ত মানাতে পারে কিন্তু সত্যিকার ভূয়োদর্শীর মুখে মানাবে না।

কিন্তু টকি? সমস্যা ঐখানেই। তাই টকির ব্যাপক আবেদনের প্রসঙ্গ এড়িয়ে শুধু গানের কথাই বলি। বর্তমানে টকির গানে স্বর আজও খারাপ শোনায়—এই হ'ল প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা—গান হ'তে না হ'তে শেষ হয়। তৃতীয়—দর্শকরা শুনলাম টকিতে গান একটু দীর্ঘ হ'লেই উসখুস উসখুস করেন, বলেন তাঁরা টকিতে এত গান সইতে পারেন না। শুনলাম টকিতে নাচেরও নাকি এই ব্যবস্থা—অতি সংক্ষেপ। কি জানি কেন টকির খরিদ্দাররা নাকি সবদেশেই বলেন: "হায় সময় যে নাই!"

কারণ শুধাতে জানলাম—সারাদিন আপিস জীবনসংগ্রাম দলাদলি গুঁতোগুঁতি দাম্পত্যকলহ মেয়ের বিয়ে এই সবের পর তাঁরা ছবিঘরে আসেন। কাজেই সেখানে গান বা নাচ হ'য়ে ওঠে গৌণ—ছবির সংলাপ গতি ঘটনা—এককথায় নাটকীয় ওঠাপড়া ও বৈচিত্র্যের চমকই তাঁদের শ্রান্তি দূর করে—এককথায় আমোদ দেয়।

ফলে হয় এই যে, টকিতে আর যাই হোক নাচ গান ভালো হয় না। যেখানে মনপ্রাণ চায় অন্য জাতীয় আমোদ সেখানে নাচগান খানিকটা বাহ্য হয়ে পড়বে বৈ কি।

অবশ্য এরও নিরাকরণ আছে ঐ এক পথেই টকি-রক্ষকদের রুচির উৎকর্ষ। কিন্তু মুস্কিল এই যে টকি এমন একটা বিশেষ অঙ্ক—atmosphere—সৃষ্টি করে যেখানে ভালো গান জমবার সুযোগই পায় না। যেখানে বাজি পোড়ানো হচ্ছে সেখানে বীণা বাজালে যে-রকম ফল হয় টকি-প্রেক্ষাগৃহে গানবাজনার প্রায় সেই অবস্থা। তবে আশা করি ভবিষ্যতে টকি সঙ্গীতের এ-দুরবস্থা থাকবে না। আজকের দিনে টকির গানের একান্ত শোচনীয়তা দেখে লজ্জা হয় বটে যে এমন গান গায়করা গাইছেন ও শ্রোতারা শুনছেন—কিন্তু ভবিষ্যতে যে এর বদল হবে না এমন কথা বলা চলে না। তাই মেনে নেব যে ভবিষ্যতে টকিতে এত হীনশ্রেণীর গান গাওয়ার দরুণ গায়ক ও শ্রোতা উভয়েই যার-পরনাই লজ্জিত হবেন। সেদিন হয়ত টকিতে গিয়ে গান শুনে এত যন্ত্রণা পেতে হবে না। গ্রামোফোন রেডিও টকি প্রভৃতির—বিশেষ ক'রে টকির—কথা মনে হ'তেই খচ্ খচ্ ক'রে বাজে আলডুস হাক্সলির বিদ্রূপ—"labour-saving devices for cheap diversion"—অর্থাৎ মানুষ নিজের আমোদ প্রমোদের জন্যেও আর চাইবে না আগেকার মতন শ্রমস্বীকার করতে। এ কথাটা ভাববার। তাই এ-প্রসঙ্গ যখন তোলাই হ'ল বলি এ সম্পর্কে যা মনে হয়েছে এবার কলকাতায় গিয়ে। সমস্যার সমাধানের জন্যে মাথা বকাব না' শুধু সমস্যাটি কি একটু আভাস দিতে চেষ্টা করব—সংক্ষেপে।

সবাই জানেন যে গানের নাচের একটি আদিম উৎস বরাবরই ছিল লোকসঙ্গীত। এনসাইক্লো-পিডিয়া বৃটানিকায় গীতাতিক লিখছেন যে গান দুই শ্রেণীর : লোকসঙ্গীত (folk-song) ও শিল্প-সঙ্গীত (art-song)। দেখা গেছে যে গ্রামাঞ্চলে গ্রামোফোনের অভ্যুদয় যেই হয় সেই লোকসঙ্গীত হয় অন্তর্হিত। কেন ?—কারণ খুব সাফ্ : বিনা কষ্টে যদি গানের উপকরণগুলি ধর্না দেয় তবে কে আর কষ্ট ক'রে গান রচনা করে ? আগে আগে গ্রামবাসীদের নিজেদের গীততৃষ্ণা নৃত্যতৃষ্ণা মেটাবার খোরাক চাইতে হ'ত নিজেদেরই উদ্ভাবনী শক্তির কাছে হাত পেতে—কেননা আনন্দ নইলে মানুষ বাঁচবে না বলে আনন্দের পথে বাধা এলে তার উদ্ভাবনী শক্তি উদ্বুদ্ধ হয়, অভাবই সৃজনী প্রতিভাকে উস্কে দেয় : Necessity is the mother of invention প্রবচনটি তো আর কথার কথা নয়। কিন্তু যে-ই আমোদ কণ্ট্রাক্টর দেখা দেন সবাই তাঁকে বলে ওঁ আয়াহি আয়াহি দেব ! অমনি দেখা যায় মানুষ আর কষ্ট স্বীকার করতে চায় না। একথা শুধু যে গানের বেলায় খাটে তাই নয়। পেশাদার হাস্যরসিক টাকা নিয়ে হাসাতে সুরু করতে না করতে বৈঠকে আসরে জলসায় তাঁদের কাছেই আমরা হাসির তুবড়ি চাই—নিজেরা আর নিজেদের হাসাতে পারি না তেমন ক'রে। এবার কলকাতায় একটি সঙ্গীতজ্ঞ বন্ধু তাই দুঃখ ক'রে আমাকে বলেছিলেন : "আড্ডা গান হাসির হররা বৈঠক প্রভৃতি সব কলকাতা থেকে উঠে গেল বুঝি দিলীপ বাবু, আজকাল গান শুনতে হ'লে যেতে হয়—হয় গ্রামোফোন কোম্পানীর কাছে নয় রেডিওর টকির দোরে।"

সব সভ্যতারই একটা মস্ত কর্ত্তব্য হ'ল নিজের আনন্দ নিজের কাছে পাওয়ার ক্ষমতা ও প্রেরণাকে জীবন্ত রাখা। গ্রীক সভ্যতায় সক্রেটিস প্রমুখ তর্ক প্রমোদীরা বুদ্ধির আলো কি ভাবে জ্বালিয়ে রাখতেন সবাই জানেন। তার পরে ইতালীয়ান ও ফরাসী রেনেস াঁসে ঘরে ঘরে অভিজাত শিল্পানুরাগিণীরা (dames de salons) গুণী জ্ঞানীকে নিয়ে কি আনন্দ সভা গঠন করতেন সে-ও সর্ব্বজনবিদিত। এমন কি আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতায়ও গল্পের আসর, গানের বৈঠক, ক্লাব প্রভৃতি স্থানে সভ্যরা এমনো সবাই আনন্দ শুধু যে চান তাই নয় নিজেরাও যোগান কম বেশী। আমাদের আমোদ প্রমোদে ও কথকতা যাত্রা প্রভৃতিতে গ্রহীতা ও স্রষ্টার মধ্যে সীমারেখা এত স্পষ্টাঙ্কিত ছিল না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বোধ করি জীবন সংগ্রামের দরুণই—হয় এই যে আমোদ প্রমোদের কপালেও পড়ে আমোদ-জোগানদারদের, গানের কন্‌ট্রাক্টরদের হাসির-রসদদারদের ছাপ—শীলমোহর। তাঁরা বলেন: "হে আমোদ পিপাসুবৃন্দ, আর ভয় নেই—আমি এনেছি —যন্ত্রের চরম টকি—সর্ব্বাধার:

আলোর মশাল নিয়ে হাতে আর নেইক ভয়,
গানের নাচের হাসির তুফান সবেই আমার জয়।
এই মশালের দীপ্তিশ্বালে জ্বলবে ভোবের বাতি,
আশাহীনের মিলবে আশা—সাথীহীনের সাথী।
যা কিছু চাস দেব জোগান—ভরা আমার ঝুলি:
রঙে রসে রূপে রাগে করছে কোলাকুলি।
সুরের উৎস যন্ত্র আমার, রূপের উৎস ছবি,
যেমন গানের দিবি হুকুম আমার তাঁদের কবি
করবে তামিল—অর্কেষ্টায় যেমন দাপাদাপি
চাইবি তোরা—মিলবে,চম্‌কে উঠবি সবাই কাঁপি'।
নৃত্য!—সেও আমার কাছেই মিলবে, মোহিনীরা
যতটুকু চাইবি নেচেই হবেন সুগম্ভীরা।
হুকুম মতন হেসেই আবার হুকুম মতন কেঁদে
হাসিয়ে তোদের ফের কাঁদাবেন—আর তাঁদেরও শেষে
মন জোগাতে হবে না ভাই ধর্ণা দেবেন তাঁরাই
সত্যযুগের রীতি হবে এম্‌নি ধ্রুবধারাই।
মিথ্যে কেন শ্রম আর তাই?—আমার টিকিট কিনে
বাবেক শুধু বোস্ চেয়ারে—মন নেবে তোর জিনে
গাইয়ে আমার বাজিয়ে আমার নর্ত্তকী রূপসী:
ডাকছি তোরে মুগ্ধ ওরে, থাক্ তোরা সব বসি'
অকর্ম্মরা পারিস নে যে কিছুই "টকি" আমি
সর্ব্বনিপুণ, তাই জোগাব সবই দিবস যামি
তোরা শুধু মাশুলটি দে—বাকি ভার সব আমার
করবি না কি জয়ধ্বনি এমন উদার দাতার!"
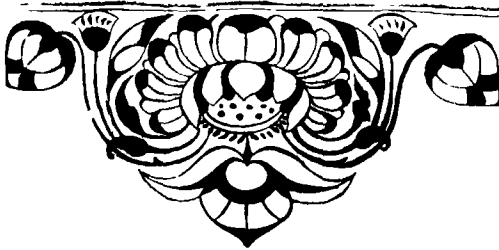
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শাঙ্কর বেদান্ত

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রভাবে পড়িয়া সার্ব্বভৌম মোক্ষ শব্দের বিরোধী হইয়া উঠিলেন। তিনি ভুলিয়াও এ শব্দটী আর উচ্চারণ করেন না। কবি কর্ণপুর লিখিতেছেন—

যতোঽয়মধ্যাত্ম পথৈক পান্থঃ
স বিপ্রমুখ্যঃ প্রভুপাদ সবর্য্যঙ্গাৎ।
মোক্ষস্য নামাপি ন কর্ণবর্ত্ম
নয়ত্যসৌ গৌর বিভোঃ কৃপৈষা। ৯০

এই বিপ্রশ্রেষ্ঠ প্রভুপাদের সঙ্গ লাভ করিয়া অধ্যাত্ম পথের একমাত্র পথিক হইলেন। এখন তাঁহার কর্ণপথে মোক্ষের নামও প্রবেশ করে না— ইহা গৌরপ্রভুর কৃপা।

সার্ব্বভৌম ভাগবতের একটী শ্লোকে "মুক্তিপদে স দায়ভাক্" স্থলে "ভক্তিপদে স দায়ভাগ" পাঠ করিলেন। মহাপ্রভু ইহা শুনিয়া মুক্তিপদের ভক্তি-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। তখন সার্ব্বভৌম বলিল, "এই মুক্তিপদের অর্থ আপনার প্রভুতায় অভিষিক্ত হইয়াছে। কিন্তু—

তথাপ্যসভ্য স্মৃতি হেতুকত্বা-
দশ্লীল দোষোঽয়মিতি ব্রবীমি।
ইত্যাদি যস্যোক্তি মধু প্রসিদ্ধং
স সার্ব্বভৌমঃ কথয়া ন কথ্যঃ॥ ৯৩

তথাপি অসভ্য স্মৃতির কারণ হেতু—ইহাকে অশ্লীল দোষযুক্ত বলিতেছি। যাঁহার এই সব উক্তি মধুরূপে প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে সেই সার্ব্বভৌমের কাহিনী কথায় ব্যক্ত করা যায় না। 'মুক্তি' সার্ব্ব-ভৌমের মতে অশ্লীল এবং তাঁহার স্মৃতিও অসভ্য।

"চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য" যদিও কর্ণপুরের রচিত বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে তবুও কোনও প্রাচীন সমসাময়িক বৈষ্ণব গ্রন্থে ইহার উল্লেখ নাই। ইহার প্রকাশক—শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয় ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শিষ্য শ্রীকবি কর্ণপুর গোস্বামী তদীয় মধুরলীলা সাধারণ জনগণকে আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মহাকাব্য নামে একখানি গ্রন্থ প্রনয়ণ করেন, ইহাতে সমুদায় শ্রীচৈতন্য লীলা বর্ণিত আছে। ভারত ভূমিতে এ যাবৎ এ গ্রন্থের প্রকাশ নাই। শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু এই গ্রন্থ স্বয়ং অবলোকন করিয়াছেন, ইহাতে যে সমুদায় লীলা বর্ণিত হইয়াছে, ইহা প্রামাণ্য স্বরূপ, সকলে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবেন, ইহা কাল্পনিক নহে। অমৃতবাজার পত্রিকা সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচরণারবিন্দাশ্রিত শিশিরকুমার ঘোষ, শ্রীরামপুরস্থ ডিপুটীম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীচৈতন্যচরণানুরক্ত বৈষ্ণববর কেদারনাথ দত্ত ও ভবানীপুরস্থ বৈষ্ণব চূড়ামণি মহাত্মা দুর্গাদাস দত্ত আমাকে অনুরোধ করায় এই সুমহদ্ গ্রন্থ অনুবাদসহ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোপদিষ্ট পথাবলম্বী বৈষ্ণবগণ ইহা পাঠ করিলে যথেষ্ট উপকার বোধ করিবেন।" ইহা বঙ্গাব্দ ১২৯৮ সালের ভাদ্রমাসে সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।

এই মহাকাব্যগ্রন্থ শেষে রচনাকাল দেওয়া হইয়াছে—

বেদা রসাঃ শ্রুতয় ইন্দুরিতি প্রসিদ্ধে
শাকে তথা খলু শুচৌ শুভগে চ মাসি।
বারে সুধাকিরণনাম্যশিত দ্বিতীয়া
তিথ্যন্তরে পরিসমাপ্তিরভূদমুষ্য।২০।৪৯

কেহ বলে ছয় রস, আবার কেহ বলে নয় রস,

ইহা লইয়া মতভেদের বিবাদ। যাহা হউক, প্রথম মতে ১৪৬৪ শকাব্দায় রচিত এবং দ্বিতীয় মতে ১৪৯৪ শকাব্দায়। শুক্লা দ্বিতীয়া তিথি সোমবার দিন ইহা পরিসমাপ্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর লীলাবসান হইয়াছে ১৪৫৫ শকাব্দায়। সুতরাং এই গ্রন্থ যে মহাপ্রভু স্বয়ং অবলোকন করিয়াছেন তাহা প্রমাণ হয় না। কোনও সমসাময়িক—এমন কি কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থেও এই মহাকাব্য হইতে কোন শ্লোক উদ্ধৃত হয় নাই। সুতরাং প্রকাশক মহাশয় যতটা প্রামাণ্য বলিয়া ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছেন—তাহা ঠিক নহে। আমরা এখানে গ্রন্থকার সম্বন্ধে কোন বিচারে প্রবৃত্ত হইব না। শুধু দেখিব, গ্রন্থকার শাঙ্কর বেদান্ত সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কি অভিমত প্রকাশ করিতেছেন। যাহা হউক, আমরা এই মহাকাব্যের আলোচনায় দেখিলাম যে, মহাপ্রভু ষষ্ঠসর্গে ব্রহ্মের নিত্যত্ব ও জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। এখানে শাঙ্করানুগামী বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার কোনপ্রকার মতভেদ নাই। নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্ম, সোপাধি ব্রহ্ম ও নিরুপাধি ব্রহ্ম দুই সত্য বলিয়া তিনি ভক্তবৃন্দকে বুঝাইতেছেন। ইহাতে একটা উদারতা দেখিতে পাওয়া যায়। নির্গুণবাদী সগুণবাদীকে ঘৃণা করিবে না, এবং সগুণবাদী নির্গুণবাদীকে ঘৃণা করিবে না, কেননা ইহারা অঙ্গাঙ্গীভাবে বিদ্যমান। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সতেজে জোর করিয়া বলিতেছেন—

"যদ্ ব্রহ্মণো ভবতি নৈব কদাপি মুক্তি
রেকত্বমেতদবরোধমৃতে হি সা স্যাৎ ৬।৬৫

ব্রহ্মের একত্ব জ্ঞান ব্যতীত কখনও মুক্তিলাভ হয় না। একাদশ সর্গে মহাপ্রভু আত্মজ্ঞান ও আত্মতত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন। সুতরাং ষষ্ঠ ও একাদশ সর্গে যাহা মহাপ্রভুর ব্যাখ্যা বা উক্তিরূপে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা শাঙ্কর বেদান্তের অনুমোদিত সিদ্ধান্ত।

দ্বাদশ সর্গে সার্ব্বভৌমের নিকট মহাপ্রভু কি বেদান্ত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন এবং সার্ব্বভৌমই বা তাঁহার নিকট কি ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন তাহার কিছু উল্লেখ নাই। আমরা শুধু জানিতে পারিতেছি যে, মহাপ্রভু প্রথম দোষ ধরিলেন—তোমার পূর্ব্বপক্ষ কোথায়? কিংবা তোমার সিদ্ধান্তই বা কি? তুমি যাহা ব্যাখ্যা করিতেছ তাহা বেদান্তশাস্ত্রের অর্থ নয়।

মহাপ্রভু ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, পূর্ব্ব পক্ষ ও উত্তর পক্ষ দুইটী ভাব লইয়া এবং সেই বিচারে তাৎপর্য্য, লক্ষণা গৌণী, মুখ্যা, জহল্লক্ষণা, অজহল্লক্ষণা এবং জহদজহল্লক্ষণা দেখাইয়া ছল ও নিগ্রহ ও বিতণ্ডাদির নিরস্ত করিয়া তিনি ভক্তি সংস্থাপক মত স্থাপন করিলেন। ইহাতে শাঙ্কর বেদান্তের বিরুদ্ধে কোন কটাক্ষ নাই বা শাঙ্করভাষ্য লইয়াও কোন আলোচনা নাই। সার্ব্বভৌম এই বিচারের কোন পক্ষই অবলম্বন করেন নাই এবং স্তব্ধভাবে ও শ্রোতারূপে মহাপ্রভুর পাণ্ডিত্য ও বিচার দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। এখনও তিনি তাঁহার ঠিক ভক্ত হন নাই। সার্ব্বভৌমকে অদ্বৈতবাদীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মহাকাব্য প্রণেতা বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু তাহা নিতান্তই কবিকল্পনা। পরবর্ত্তী ব্যবহারে তাঁহাকে কৃষ্ণভক্ত বলিয়াই বোধ হয়। তিনি অর্দ্ধনিদ্রা ও অর্দ্ধজাগরিত অবস্থায় কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতেছেন, এবং মহাপ্রভু নিত্যকর্ম্ম সমাপনান্তে তাঁহার আনীত মহাপ্রসাদান্ন ভোজন করিতে বলিলেও সার্ব্বভৌম তাহা করেন নাই। প্রসাদগ্রহণে কালাকাল নাই বিচার করিয়া ভক্তিভাবে তাহা গ্রহণ করিলেন।* ইহা কি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদী, না দ্বৈতবাদী ভক্তের লক্ষণ? তাঁহার ঈদৃশ ভক্তি দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আনন্দোদ্বেল চিত্তে আলিঙ্গনবদ্ধ হইলেন এবং উভয়ে ভাববিহ্বল হইয়া কিয়ৎকাল সেইরূপে অবস্থান করিলেন। ইহা কি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদীর পরিচয়?

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যও তাঁহাকে প্রথমে শুষ্ক জ্ঞানমার্গী বলিয়া ভ্রম করিয়াছিলেন; তাই তাঁহার রচিত স্তবে কৃষ্ণনামের উল্লেখ দেখিয়া তিনি নিজ অপরাধ ক্ষালনের জন্য দক্ষিণদিকে তীর্থপর্য্যটন করিতে বহির্গত হইয়াও আবার ফিরিয়া আসিলেন। তিনি প্রকাশ্যভাবেই বলিলেন, সার্ব্বভৌম পরম ভাগবত, তাঁহার সেবা করিলে ঈশ্বরের সেবা হইবে, এখন ইহাই তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য।

যাহা হউক, এই মহাকাব্যে একাদশ সর্গ পর্য্যন্ত মহাপ্রভু এক নির্গুণ ব্রহ্মের প্রচার এবং জগতের অস্তিত্ব মিথ্যা, অলীক ও ইন্দ্রজাল বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। সগুণ ও নির্গুণ অঙ্গাঙ্গীভাবে রহিয়াছে—কেহ কাহাকে ঘৃণা করা কর্ত্তব্য নয় এবং নির্ব্বিশেষ নিরুপাধি ব্রহ্মই যে একমাত্র সত্য তাহাও মহাপ্রভু বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। সার্ব্বভৌম-সংবাদে দ্বাদশ সর্গে আমরা ষড়ভুজ অথবা সার্ব্বভৌমের বক্ষে মহাপ্রভুর পদস্থাপনাতে ভাববিহ্বল ভট্টাচার্য্যের স্তোত্র রচনা দেখিতে পাইলাম না। শ্রীমদ্ ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের শ্লোকের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে সংশয়াপন্ন ভাবে মহাপ্রভুর নিকট সার্ব্বভৌম জিজ্ঞাসু হইয়া ব্যাখ্যা করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছেন। মহাপ্রভু প্রত্যেক শ্লোকের নয় প্রকার অর্থ করিয়া বুঝাইলেন দেখিয়া তিনি তাঁহাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুল্য জ্ঞান করিলেন*। এই ব্যাখ্যা শুনিয়াই সার্ব্বভৌম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পরম ভক্ত হইলেন এবং দুইটী শ্লোক রচনা করিয়া তাঁহার মনোভাব মহাপ্রভুকে জানাইলেন। উক্ত শ্লোক দুইটী গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের কণ্ঠহার। এই মহাকাব্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য বা তাঁহার বিরুদ্ধে মহাপ্রভুর কোন দোষ বা ভ্রান্তি প্রদর্শন করেন নাই বরং সন্ন্যাসগ্রহণের সময় পর্য্যন্ত তিনি শঙ্করানুগামী বৈদান্তিকের মত "ব্রহ্ম সত্য—জগন্মিথ্যা" তাঁহার ভক্তদের নিকট প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছেন। আমরা শ্রীচৈতন্য ভাগবত, শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক এবং শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মহাকাব্য আলোচনা করিয়া দেখিলাম যে, কোথাও মহাপ্রভু শ্রীশঙ্করাচার্য্যের বিরুদ্ধে কোন মন্তব্য করেন নাই এবং সার্ব্বভৌমের সহিত তাঁহার বেদান্ত বিচারও হয় নাই। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মহাকাব্য রচয়িতা কবি কর্ণপূরও তাঁহাকে শাঙ্কর বৈদান্তিকরূপেই ষষ্ঠ ও একাদশ সর্গে বর্ণনা করিয়াছেন। বারান্তরে অন্যান্য প্রামাণিক গ্রন্থের আলোচনা করিব।
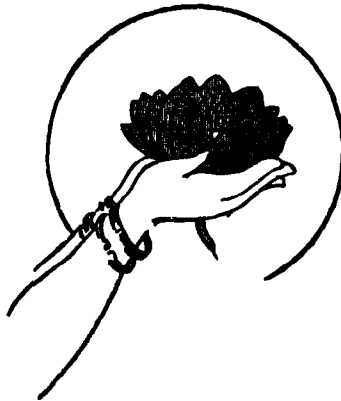
প্রেমানন্দ-প্রসঙ্গ

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের অন্যতম নায়ক, প্রেম ও পবিত্রতার মূর্ত্তবিগ্রহ, যিনি শ্রীমার কথায় "প্রাণের জিনিষ" ছিলেন এবং একাধারে "মঠের শক্তি, ভক্তি, মুক্তি রূপে গঙ্গাতীর আলো করে বেড়াতেন" সেই সন্ন্যাসিকুলতিলক আচার্য্য স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ, ভক্তদের বাবুরাম মহারাজ, প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে নশ্বর দেহ ত্যাগ করিলেও তাঁহার পুণ্য স্মৃতি সকলের হৃদয়েই জাগ্রত হইয়া আছে। তাঁহার কথা স্মৃতি পথে উদয় হইলে আজও ভক্তজনসমূহের হৃদয়ে ভক্তি ও ধমনীতে শক্তি সঞ্চার হয় বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। যাঁহারা এই প্রেমাবতারের পূত সঙ্গ বা সান্নিধ্য লাভের সুযোগ মুহূর্ত্তের জন্যও পাইয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই তাঁহার অনুপম জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মময় জীবনের অমায়িক ব্যবহার, স্বজন-সুলভ অকৃত্রিম আদর যত্ন ও ভালবাসা এবং সর্ব্বোপরি অহৈতুক কৃপার কথা ভাবিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া থাকেন। তাঁহার অমৃতময়ী বাণী এত স্বচ্ছ সরল ও সুন্দর, এত উদার ও গম্ভীর যে উহা জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টিয়ান শ্রোতৃবৃন্দের অতীব হৃদয়গ্রাহী হইত। যখনই যেখানে তিনি ধর্ম্ম-প্রসঙ্গ করিতেন সেখানে শত সহস্র নরনারীকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন উপস্থিত হইয়া অতুলনীয় ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে উহা শ্রবণ করিতে দেখা যাইত। বাবুরাম মহারাজের ধর্ম্ম-প্রসঙ্গ শ্রবণ করিলে মনে হইত যেন শ্রীশ্রীঠাকুরই তাঁহার কণ্ঠে বসিয়া কথা কহিতেছেন। সার্থক শ্রীশ্রীমায়ের বাণী, "ভয় কি বাবুরাম, ভয় কি, ঠাকুর তোমার কণ্ঠে বসে কথা কইবেন।"*

সার্থক বাবুরামের ধর্ম্মপ্রসঙ্গ এবং ততোধিক সার্থক তাঁহাদের জীবন যাঁহাদের উহা মন্ত্রমুগ্ধবৎ শ্রবণ করিবার সুযোগ ও সৌভাগ্য হইয়াছিল।

আজ তাঁহারই কোন কোন দিনের ধর্ম্ম-প্রসঙ্গের কিঞ্চিৎ আভাস পাঠকবর্গের নিকট উপস্থাপিত করিতেছি। এ প্রসঙ্গের ভিতর দিয়া আমরা যে বাবুরাম মহারাজেরই পূত স্পর্শ কথঞ্চিৎ পাইতে সমর্থ হইব তাহাতে আর কি সন্দেহ থাকিতে পারে?

বাবুরাম মহারাজের দৈনিক জীবন-চিত্র যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা সকলেই জানেন তিনি শ্রীশ্রীঠাকুর সেবার কাজ হইতে আরম্ভ করিয়া বাগান গো-সেবার কার্য্যাদি পর্য্যন্ত স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিতেন এবং যখনই যে কাজে লোকাভাব হইত তখনই সে কাজে অকাতরে নিজেকে নিয়োগ করিতেন। ফলে কি দিন, কি রাত্রি, সকল সময়েই তাঁহাকে কখনো শ্রীশ্রীঠাকুর সেবা, কখনো তরকারী কাটা, কখনো ভক্তদের আদর অভ্যর্থনা ও তাহাদের সহিত ধর্ম্ম-প্রসঙ্গ, কখনো বা সাধু

* শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহকারী সভাপতি হইলেও বাবুরাম মহারাজ কোথাও যাইতে হইলে কলিকাতায় শ্রীশ্রীমার অনুমতি বা শরৎ মহারাজের অনুমোদন না হইলে এক পা-ও অগ্রসর হইতেন না। একবার পূর্ব্ববঙ্গের ভক্তবৃন্দের আগ্রহাতিশয্যে তথায় যাওয়া স্থির হওয়ায় শ্রীশ্রীমার শ্রীচরণে নিবেদন করেন, "মা, আমি মুর্খ মানুষ, আমায় নানাস্থানের লোক এসে টানাটানি করে, আমি গিয়ে কি করব মা।" শ্রীশ্রীমা তদুত্তরে বলেন, "ভয় কি বাবুরাম ভয় কি, শ্রীশ্রীঠাকুর তোমার কণ্ঠে বসে কথা কইবেন।"

ব্রহ্মচারীদিগকে লইয়া শাস্ত্রপাঠ ও আলোচনা প্রভৃতি কোন না কোন কাজে ব্যস্ত থাকিতে হইত। মঠের যে সকল নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম ছিল তাহা যথোচিত ভাবে যথা সময়ে সম্পন্ন না হইলে তিনি খুবই অসন্তুষ্ট হইতেন। অসামান্যা স্নেহময়ী জননীর ন্যায় "মঠের মা" বাবুরাম মহারাজ এক দিকে যেমন সকল সাধু ব্রহ্মচারিগণকে তাঁহার অপার স্নেহ দ্বারা আপন হইতেও আপনার করিয়া লইতেন, অপর দিকে কাহারও কখনো কর্ত্তব্যে ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটিলে তাহাকে যথোচিত শাসন করিয়া উহা সংশোধন করিয়া দিতেও পরাঙ্মুখ হইতেন না।

সন্ধ্যাগমে শ্রীশ্রীঠাকুরের আরাত্রিক স্তবপাঠ প্রভৃতি শেষ হইলে বাবুরাম মহারাজ জপধ্যানে বসিতেন। মঠের সকলেও তাঁহাকে অনুসরণ করিতেন। জপ ধ্যান শেষ হইলে দর্শক কক্ষে (Visitors' Room) সঙ্গীত ভজন পাঠ আলোচনাদি রাত্রিকালীন আহারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চলিত।

১৫ই পৌষ ১৩২১ সন, আরাত্রিক ও জপ ধ্যানান্তে বাবুরাম মহারাজ ঠাকুর ঘর হইতে নামিয়া তাঁহার স্বাভাবিক দ্রুতপদবিক্ষেপে পূর্ব্ব দিকের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন এবং দেখিতেছেন দর্শক কক্ষে সাধু ব্রহ্মচারীদিগের মধ্যে কেহই নাই, এমন কি একটী আলো পর্য্যন্ত আনা হয় নাই। তিনি প্রচলিত নিয়ম লঙ্ঘন হইতেছে দেখিয়া খুবই বিরক্ত হইলেন এবং উচ্চৈস্বরে—"কইরে তোরা সব কোথায়? কেউ নেই যে? এখন পর্য্যন্ত একটা আলোও এখানে আসে নি। ব্যাটাদের যখনকার কাজ তখন করবার মোটেই যে খেয়াল নেই? .." বলিতে না বলিতেই চারিদিক হইতে সাধু ব্রহ্মচারীরা মুহূর্ত্তের মধ্যেই শশব্যস্তে দর্শক কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাদের মধ্যে জনৈক ব্রহ্মচারী একটী হ্যারিকেন লণ্ঠন হাতে করিয়া দৌড়াইয়া আসিয়া সকলের আগেই দর্শক কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

সকলে বসিলে পর বাবুরাম মহারাজও গিয়া আলোটীর উত্তর দিকে দক্ষিণাস্য হইয়া বসিলেন। জনৈক ব্রহ্মচারী পাঠারম্ভ করিতে প্রস্তুত হইলেন। বাবুরাম মহারাজ তখন জিজ্ঞাসা করিলেন--"হ্যাঁরে তোদের আজ এত দেরী হ'ল কেন? রোজ রোজ এমনি ভাবে ডেকে বসাতে হবে নাকি?" সকলে নির্ব্বাক হইয়া শুনিতেছেন এমন সময় সমবেত সাধুদের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিলেন—"সময় মত আসব কি মহারাজ, এখানে যত বাইরের লোক আসে, থাকে। তাদের মধ্যে এমন সময় কেউ কেউ বা শুয়ে থাকে, কেউ বা ঘুমিয়েও থাকে।"

বাবুরাম মহারাজ—আহা! আহা! এরা ঘুমাবে না? এখানেও ঘুমাবে না তো কোথায় ঘুমাবে? এমন ঘুম আর কোথায় হবে? এমন মুক্ত বায়ু, গঙ্গার হাওয়া কোথায় আছে? জানিস্, সংসারে এদের কত চিন্তা ভাবনা, কত জ্বালা যন্ত্রণা? জ্বলে পুড়ে এখানে আসে একটু প্রাণ জুড়াতে, শান্তি পেতে। এমন শান্তির স্থান আর কোথায় আছে? বলছিস্ এরা সব ঘুমোয়। আর ঘুমোলই বা। তোরা সব আছিস্ কি করতে? তোরা সব বাড়ী ঘর ছেড়ে, সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে এসেছিস্ যে জাগাতে রে। ঠাকুর স্বামীজি এসেছিলেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে জাগাতে। তোরা যে সব তাঁদেরই কাজ করতে এসেছিস। তোরা যে এই মোহনিদ্রাগ্রস্ত দেশকে জাগাবি—এই জগৎকে জাগাবি। আর এই কয়জন লোককে জাগাতে পারবি না? তোদের জাগ্রত দেখ্‌লেই যে এদের সব ঘুম ভেঙ্গে যাবে।

কথাগুলি বলিতে বলিতেই মহারাজের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল আরক্তিম হইয়া উঠিল। সকলে নির্ব্বাক ও অধোমুখ হইয়া শ্রবণ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত কক্ষ ও তৎচতুষ্পার্শ্ব যেন এক অভিনব নিস্তব্ধতায় অভিভূত হইয়া মহারাজের ওজস্বিনী

বাণীর গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্য শতগুণ বৃদ্ধি করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে "নে, কি পড়বি পড়—" বলিয়া বাবুরাম মহারাজ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিলেন। ভগবদ্গীতা পাঠ আরম্ভ হইল। বাবুরাম মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজির জীবনালোকে শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতে লাগিলেন। এইভাবে শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজির জীবনের কতিপয় ঘটনাবলী বিশেষভাবে আলোচিত হইল এবং বলিতে লাগিলেন—"গীতাই ঠাকুরের জীবন, ঠাকুরের জীবনই গীতা। ঠাকুর এ যুগের জীবন্ত গীতা। আহা কে বুঝবে রে।" দুই তিনটী শ্লোক পাঠ হইতে না হইতেই প্রসাদ পাইবার ঘণ্টা পড়িল। সেদিনকার মত ক্লাস শেষ হইল।

বাংলা ১৩২২ সনের ২৯শে আশ্বিন, শারদীয়া পূজার মহাষ্টমী। বাবুরাম মহারাজ চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া পূর্ব্বদিক্‌কার বারান্দার বেঞ্চির উপর বসিয়াছেন। তাঁহাকে উপবিষ্ট দেখিয়া চারিদিকে লোক আসিয়া জড় হইতে লাগিল; কেহ কেহ প্রণাম করিতে লাগিল। তিনিও কাহাকে—"কি কেমন আছিস্?" কাহাকে বা "কেমন ভাল ত?" বলিয়া কুশল প্রশ্নাদি করিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে তাঁহার কণ্ঠ হইতে গম্ভীর স্বরে "জয় গুরু, শ্রীগুরু" ধ্বনি নির্গত হইয়া সমবেত ভক্তগণের মনকে স্থির ও শান্ত করিতে লাগিল। কথাপ্রসঙ্গে সংসারের সুখ দুঃখ, ভগবান কি ইত্যাদি প্রশ্নও উত্থাপিত হইল। বাবুরাম মহারাজ বলিতে লাগিলেন—"ভগবান কি জানিস্? পবিত্রতাই সাক্ষাৎ ভগবান। ভগবানে ভক্তি ও বিশ্বাস যদি থাকে, তবে আর ভয় নেই। যা কিছু দরকার সব এসে যায়।

"সংসারটা কি রকম জানিস্? কুকুরের লেজের মত। তাকে যতই টানাটানি কর না কেন, সিধে করতে পারবে না। যত চেষ্টাই কর না কেন, সংসারের দুঃখ দৈন্য অশান্তি কখনো একেবারে দূর হবে না। সংসারে মিথ্যাচরণ, হিংসা, দ্বেষাদ্বেষী রেষারেষি লেগেই আছে। আহা, মহামায়ার কি খেলা! কেমনটী করে বাহ্যিক চাক্‌চিক্য দিয়ে সকলকে মায়ার মোহে আচ্ছন্ন করে রেখেছেন। মায়ার ডোরে সব বাঁধা তাই সকলে ভুলে আছে। কিন্তু একজনকে বাঁধতে পারেননি, কাকে জানিস্? স্বামীজিকে।

"শ্রীশ্রীঠাকুর যখন অসুস্থ অবস্থায় কাশীপুর বাগানে ছিলেন, স্বামীজি (তখন নরেন) একদিন শ্রীশ্রীঠাকুরকে জিজ্ঞেস্ করলেন—আপনার কত স্নেহ কত কৃপা পাচ্ছি, কিন্তু কি লাভ হলো কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর করলেন—কিছুকাল থাক, ধীরে আস্তে সময়ে বুঝবি কি লাভ হলো।'

নরেন বললেন—সময়ে বুঝব? আমি যদি কাল মরে যাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন—যা তোর কাল থেকেই হবে।

"শ্রীশ্রীঠাকুরের কত কৃপা স্বামীজির উপর। এ জন্যই কত করেও মহামায়া তাঁর ধার কাছ দিয়েও এগুতে পারেন নি। স্বামীজির কাছে এসে যেন তিনি কেঁচোটীর মত থাকতেন।"

জনৈক ভক্ত—তাঁর কৃপা লাভ হয় কি করে, মহারাজ?

বাবুরাম মহারাজ—ভিতর বাইর এক করতে হয়, সত্য ও সরল হ'তে হয়, তা'হলেই তাঁর কৃপা হয়।

৩০শে আশ্বিন, নবমী ১৩২২ সন, বেলা প্রায় বারটা হইবে। বাবুরাম মহারাজ ভক্তজন পরিবৃত হইয়া বসিয়া আছেন। বিবিধ বিষয় আলোচনার পর ধর্ম্মপ্রসঙ্গ হইতেছে। বাবুরাম মহারাজ বলিতেছেন—"রামায়ণে ভূষণ্ডি কাকের গল্প আছে। তাঁর কোন যুগেই মৃত্যু নেই। মহিষাসুর বধই

বল, ত্রেতার রাবণ বধই বল, আর দ্বাপরে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধই বল, সকলই সে দেখেছে। চিরকালই সে আছে। আমাদের ধর্ম্মও সেরূপ। আমাদের ধর্ম্মের আদি নেই, অন্ত নেই, নিত্য শাশ্বত, পরম পবিত্র, অশেষ মঙ্গলকর এবং চির শান্তির আকর। ধর্ম্মের আশ্রয় যে গ্রহণ করে ধর্ম্মই তাকে রক্ষা করে।—যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ। ধার্ম্মিকের আবার ভয় কি? স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।" এ প্রসঙ্গ শেষ হইতে না হইতেই প্রসাদ পাইবার ঘণ্টা পড়িল। সকলে প্রসাদ পাইতে গেলেন।

বীরেশ্বর কয়দিন যাবৎ বাবুরাম মহারাজের সহিত আলাপ করিবার সুযোগ খুঁজিতেছে। আজ রাত্রিতে আরাত্রিকাদির পর সেই সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া বাবুরাম মহারাজের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—মহারাজ, কিভাবে থাকব একটু দয়া করে বলে দিন।

বাবুরাম মহারাজ—কি ভাবে থাকবি? খুঁটি ধরে থাকবি, পবিত্রতা রূপ খুঁটি। নামের সঙ্গেই নামী থাকেন। ভগবানকে সম্বল করে থাকবি। ঠাকুরই তোদের খুঁটি।

বীরেশ্বর—মাঝে মাঝে আমি, আমার, অভিমান, অহঙ্কার কত কিছু যে উঁকি মারে।

বাবুরাম মহারাজ—কেন? ফোস্ ফোস্ ভাব একটু থাকবে না? নইলে যে কাজ হয় না। তবে ভেতরটা খুব নরম কোমল রাখা চাই। বাইরে একটু শক্ত থাকবেই। জানবি আর বলবি—'আমি প্রভুর দাস, আমায় মঠের সকলে ভাল বলে জানেন, আমি কি করে এর বিরোধী ভাব নিব? আমি ঠাকুরকে ডাকি, তাঁর কথা ভাবি, তবু শালা খারাপ ভাব আসবি?' এভাবে আবার নিজেকেও ফোস্ ফোস্ করতে হয়।

বীরেশ্বর—আজকাল পুলিশের হাঙ্গাম এত বেড়ে গেছে যে একটা ভাল কাজেও political colour (রাজনীতিক আকার) আছে বলে সন্দেহ করে। কাজেই আশ্রমের কাজ কর্ম্মাদি করবার যাদের বেশ ইচ্ছা আছে, তারাও করতে ভয় পায়।

বাবুরাম মহারাজ—Sincerely (অকপটে) কাজ করলে কিসের ভয়? Policy (চতুরতা) থাকলে ভয় থাকে, জানিস। ঠাকুরের কাজে তো কোন policy নেই, সব খোলা, যেমন ভিতর তেমন বাইর। যেমন ভাবা তেমনই বলা এবং তেমনই কাজ। এতে কোনই ভয় থাকতে পারেনা। মাভৈঃ মাভৈঃ, ভয়ই পাপ, পাপই মৃত্যু।

তৎপর দিবস সকালে বীরেশ্বর কলিকাতা ফিরিয়া যাইবে স্থির করিয়াছে। বাবুরাম মহারাজের নিকট হইতে বিদায় লইবার জন্য—এদিক ওদিক খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিতে পাইল, বাবুরাম মহারাজ শ্রীশ্রীস্বামীজির মন্দিরের সমীপস্থ বেলতলায় একা পূর্ব্বাস্য হইয়া নিভৃতে কি যেন ভাবিতেছেন। তাঁহার গৈরিকবসনভূষিত উজ্জ্বল কান্তি প্রভাতের সূর্য্যকিরণে স্নাত হইয়া যেন এক অনির্ব্বচনীয় প্রভায় উদ্ভাসিত হইতেছে। একটু ইতস্ততঃ করিয়া সে তাঁহাকে প্রণাম করিল। মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি যাচ্ছিস্?"

বীরেশ্বর—আজ্ঞা হাঁ। তবে আসি মহারাজ, একটু কৃপাদৃষ্টি রাখবেন।

মহারাজ—ভয় কি? কৃপাদৃষ্টি ঠাকুরের আছে জানবি। বহরমপুর কবে যাচ্ছিস্?

বীরেশ্বর—চার তের দিন বাদ যাব।

মহারাজ—যাবার সময় একবার এখান হ'য়ে যাবিতো?

বীরেশ্বর—খুবই ইচ্ছা রইল মহারাজ।

২০শে কার্ত্তিক শনিবার চতুর্দ্দশী। মঠে অপরাহ্ণ ৩-৩০ ঘটিকার সময় পৌঁছিয়া বীরেশ্বর সকলের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়াছে। বাবুরাম মহারাজ পূর্ব্বাস্য হইয়া বারান্দায় বসিয়া আছেন,

কয়েকজন ভক্ত ও কয়েকটী ছাত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। নানাকথা আলোচনার পর ঢাকা মঠ ও মিশনের সাত বিঘা জমি ক্রয় করার প্রস্তাব উঠিলে জনৈক ভক্ত বলিলেন—"সাত বিঘা জমি তো যথেষ্ট।" বাবুরাম মহারাজ উত্তরে বলিতে লাগিলেন—"আমাদের মঠে ২০ বিঘা * জমি। তাহাতেই সকল সময় কুলিয়ে উঠতে চায় না। উৎসবের সময় কি কম লোক আসে—হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টিয়ান। ঠাকুর ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মেছিলেন বটে কিন্তু কেবল ব্রাহ্মণদের জন্য আসেন নি, মুসলমানদেরও পীর ছিলেন।"

জনৈক ছাত্র—ঠাকুরের লীলার কথা যা শোনা যায়, এসব ব্যাপার না দেখলে যেন বিশ্বাস হতে চায় না। আর বিশ্বাস না হলে ত সবই মিথ্যা।

বাবুরাম মহারাজ—জজ তো ভাল সাক্ষীকে—বিশিষ্ট ভদ্রলোক সাক্ষীকে বিশ্বাস করেন? মনে কর, তুই জজ্—আর আমি সাক্ষী। আমি বলছি, আমি স্বচক্ষে দেখেছি, ঠাকুরের কি অপূর্ব্ব ভাব, কি তীব্র ত্যাগ, কি অনুপম জ্ঞান, কি অদ্ভুত কর্ম্ম। সবই কি সকলে দেখতে পায়বে? কেউ দেখে, কেউ শুনে, কেউ বা পড়েও বিশ্বাস করে। চাই, বিশ্বাস অচল অটল। সবল বিশ্বাস না হলে কিছুই হয় না। একটী ছেলে বি-এ পড়ে বীরভূম জেলায় বাড়ী। সে থা করেছে। আমায় মাঝে মাঝে পত্র দেয়। কয়েকদিন হলো আমায় লিখেছিল তার ভয়ানক ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়েছে। খুব অশান্তি ভোগ করছে। কাতর হয়ে আমায় আশীর্ব্বাদ করতে লিখে। আমি তাকে 'তুমি ঠাকুরের শরণাপন্ন হও, আমি ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করছি, তিনি তোমায় শান্তি দিন'—লিখি। পত্র পেয়ে কি সুন্দর উত্তর দিয়েছে। বলিয়া এক জন ব্রহ্মচারীকে স্বামীজির টেবিলের উপর থেকে পত্রখানা আনিতে বলিলেন এবং 'দেখবি' বলিয়া ব—কে উহা পড়িয়া দেখিতে বলিলেন। পুনরায় বলিতে লাগিলেন—'কেমন সুন্দর লিখেছে। উপদেশ অনুযায়ী ঠাকুরের শরণাপন্ন হয়ে তাঁকে ডাকা অবধি দেখছি চাঞ্চল্য কোথায় দূর হয়ে গেছে—সব ইন্দ্রিয়গুলি যেন কেঁচো হয়ে আছে। ইত্যাদি। চাই বিশ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্বাস। বিশ্বাসে মিলয়ে হরি তর্কে বহুদূর। বুঝলি।'

জনৈক ভক্ত—মহারাজ, সহজে ঈশ্বরের ধারণা কি করে হয়?

বাবুরাম মহারাজ—ঈশ্বর ফিশ্বরের হোম্‌রা চোম্‌রা একটা ধারণা না করে ঠাকুরকে ডাক। তাঁকে স্মরণ মনন কর, তাঁকে ধ্যান কর। ঠাকুরের শরণাপন্ন হোস্ না কেন? তিনি যে কল্পতরু। বাবা! ঠাকুর স্বামীজিরই অন্ত পাইনা, তা আবার ঈশ্বর। ঠাকুরের বিষয়ে স্বামীজিই বা কি কম গোঁড়া ছিলেন। কৃষ্ণই বল, চৈতন্যই বল, বুদ্ধই বল, আর যার যার কথাই বল না কেন, এমনটী আর হয় নি। ঠাকুর সর্ব্ববস্তুতে চৈতন্য দেখতেন। দূর্ব্বার উপর দিয়ে কোন কিছু নিয়ে গেলে, দাগ পড়লে তিনি কষ্ট পেতেন, নূতন কাপড় চড়্ চড়্ করে ছিড়লে তাঁর প্রাণ পড়্ পড়্ করে উঠত। সমাধি অবস্থায় কোন অপবিত্র লোক ছুঁতে পারত না।

এই সব কথা বলিতে বলিতে মহারাজ নিস্তব্ধ হইয়া যেন কোন এক দিব্য লোকে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত সকলেই অবাক্ হইয়া এতক্ষণ যাহা শুনিয়াছেন তাহা ভাবিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহারাজ পুনরায় বলিতেছেন—"আহা! প্রভুর কি অপার দয়া।" নিজের মাকে (গর্ভধারিণীকে) লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—"মাকে ঠাকুর একদিন বলছেন—'যদি কিছু মানত করতে হয় তবে এখানে (ঠাকুরের নিজ শরীর দেখাইয়া)

* ইহা ১৯১৫ সনের কথা। এখন মঠের জমির পরিমাণ প্রায় ৬০ বিঘা।

মানত করলেই সব হবে। চাই বিশ্বাস। বিশ্বাস শেষ জন্মের লক্ষণ'।"

এভাবে যখন প্রসঙ্গ চলিতেছিল তখন স্বামী শুদ্ধানন্দজী (বর্ত্তমানে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহকারী অধ্যক্ষ) তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, "দেখছ, এদের গোঁড়া হবার উপদেশ দিচ্ছি।"

স্বামী শুদ্ধানন্দজী বলিলেন, তা বেশ, আপনি যা বলবেন তাতেই এদের কল্যাণ হবে।

র—বলিল—একথা-কটী শুনে আমাদের খুবই ভাল হয়েছে।

স্বামী শুদ্ধানন্দ—ভাল হয়েছে মুখে শুনতে চাই না। আমরা প্রত্যক্ষবাদী আমরা দেখ্‌তে চাই।

র—আশীর্ব্বাদ করুন যেন এ সব উপদেশের সার্থকতা সাধন এ জীবনে হয়।

স্বামী শুদ্ধানন্দ চলিয়া গেলেন। বাবুরাম মহারাজ কিছুক্ষণ নীরব ছিলেন। সকলেই কিছুক্ষণ নীরব রহিল। পরে গম্ভীর স্বরে—

আরাধিতো যদি হরিঃ তপসা ততঃ কিম্।

নারাধিতো যদি হরিঃ তপসা ততঃ কিম্॥

বলিয়া নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিলেন ও বলিতে লাগিলেন—তোদের এই শেষ জন্ম জান্‌বি। কেবল ঠাকুরকে ডাক্, তিনি যে কল্পতরু, যে যা চায়, সে তাই পায়। সকল শাস্ত্রের মূর্ত্তবিগ্রহ তিনি। আহা, এমনটী কে কোথায় পাবে ?

জনৈক ভক্ত—এরা খুব ভাগ্যবান, নইলে কি এদের উপর আপনার এতদূর কৃপা হতো ?

সূর্য্যাস্ত হইয়াছে। অনেকক্ষণ যাবৎ ধর্ম্মপ্রসঙ্গ চলিতেছে দেখিয়া স্বামী অরূপানন্দ (তখন ব্রঃ রাসবিহারী) বলিলেন—এখন একটু বাইরে বেড়িয়ে আসুন মহারাজ! আপনার শরীর তো তত ভাল নয়।

বাবুরাম মহারাজ—আর এ শরীর যাক না তবু ভাল কাজে। এত অতি তুচ্ছ জিনিস।

ব্রঃ রাসবিহারী—এতক্ষণ বক্‌লেন, খুব ক্লান্ত হয়েছেন।

বাবুরাম মহারাজ—খারাপ কথা নিয়ে তো আর বকাবকি হয় নি। ঠাকুরের কথা কইলে শরীর খারাপ হয় না।

এ সব কথা হইতে হইতেই আরাত্রিকের ঘণ্টা পড়িল। সকলে আরাত্রিক দর্শনে যাইতে লাগিলেন। আরাত্রিকান্তে র—পুনরায় মহারাজের নিকট গেল এবং বাবুরাম মহারাজের পদসেবার অধিকার লইয়া খুব আনন্দানুভব করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পর ডাঃ কাঞ্জিলাল আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বাবুরাম মহারাজের সহিত কথা কহিতে কহিতে সেবায় যোগ দিলেন। তখন বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, "ডাক্তার সব জানে কি না? ডাক্তারের কাছে শেখ্, কি করে সেবা করতে হয়।"

যথাসময় প্রসাদ পাইবার ঘণ্টা পড়িল। র—সে রাত্রি মঠে কাটাইয়া তৎপর দিবস সকাল ৮টায় বাবুরাম মহারাজকে প্রণাম করিয়া বহরমপুর যাইবে বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। বাবুরাম মহারাজের ওজস্বিনী বাণী পুনঃ পুনঃ তার হৃদয়ে উদয় হইতে লাগিল এবং মনে হইতে লাগিল আচার্য্য শঙ্করের সেই চিরস্মরণীয় অমোঘ বচন—

ক্ষণমপি সজ্জনসঙ্গতিরেকা,

ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা॥

পথ ও মন

শ্রীঅভীশ্বর সেন

রাজনগরীর কালো রঙের পথ—
নদীর পাশে,—নাই যে তাহার শেষ
কত লোকের নিত্য যাওয়া আসা।
জড়িয়ে আছে নানা দেশ বিদেশ।
সকাল হ'লে রাজপ্রাসাদের রথ
রাজায় নিয়ে নদীর ঘাটে যায়,
বিদেশ থেকে নানান দেশের লোক
ভিড় করে যে পথের কিনারায়।
নগর মাঝে যারা সবার বড়
তাদের স্বজন, তাদের ছেলে দল
কালো পথের সারা বুকটি ভ'রে,
বেড়ায় ক'রে হর্ষ কোলাহল।
রাত্রি যখন গভীর হ'য়ে আসে
একটি ক'রে কমে লোকের পিছু
নিশীথ রাতে একলা পথের পরে
দেখা যায় না কোন রকম কিছু।
গাছের তলে একলা থাকে শুয়ে
ভিখারী এক সারাদিনের পর
এ যেন তার অনেক দিনের চেনা
এ যেন তার অনেক দিনের ঘর।

আমার বুকে, আমার মনের কোণে
নানান কথা নিত্য যে হয় জড়,
ভাব্‌তে থাকি দাম যে এদের বহু
এরাই যেন চিরদিনের বড়।
দিন বেলা যে রয়না বহুক্ষণ
দুঃখ আসে রাত্রি বেলার মত
সেদিন মনে থাকে না কেউ আর
তোমার কথাই ভাবি অবিরত।
তোমার কথা সম্পদেরি দিনে
মনের মাঝে পায়নি কোন স্থান
রাত্রিবেলা সে যে আপন হ'য়ে
ভ'রে আছে মোর নিরালা প্রাণ।
সেদিন মনে ভাবনা নাই কোন
শান্ত হ'য়ে আছে আমার মন
পথের বুকে রাত-ভিখারীর মত
তোমার কথাই জাগে অনুক্ষণ।
সেদিন মনে ভাবতে থাকি আমি
তুমি আমার আপন হও শুধু
তুমি যে মোর অনেক দিনের চেনা
তুমি যে মোর অনেক দিনে বঁধু।

মোহেন্-জো-দরোর কথা

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

সিন্ধু-প্রদেশের লারকানা জেলার অন্তর্গত মোহেন্-জো-দরো নামক স্থানে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের খননের ফলে পাঁচ ছয় হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে অদ্ভুত নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তাহা শিক্ষিত বঙ্গবাসী অনেকেই শুনিয়াছেন। বর্ত্তমান শতাব্দীর এই অভূতপূর্ব্ব আবিষ্কার পৃথিবীর ইতিহাসে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে এবং উহাতে ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব্বতন ধারণা আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এতদিন পণ্ডিতেরা আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর ঋগ্বেদের যুগকেই ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনতম কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন, কিন্তু মোহেন্-জো-দরোতে আবিষ্কৃত প্রত্ন-সম্পদ ও পুরাকীর্ত্তি খ্রীষ্টের জন্মের তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতে প্রাগ্বৈদিক যুগে যে বিশাল সভ্যতা ছিল তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়াছে। পণ্ডিতগণ মনে করেন, এই সভ্যতা বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতেই আরব্ধ হইয়াছিল এবং উহার উৎকর্ষ দীর্ঘকালের ক্রমোন্নতির ফলস্বরূপ।

সিন্ধিভাষায় 'মোহেন্-জো-দরো' শব্দের অর্থ মৃতের স্তূপ (mound of the dead)। ২৪০ একর ভূমি ব্যাপী এই বিরাট ধ্বংস স্তূপের আবিষ্কার কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের ন্যায় দৈবাৎ সংঘটিত হইয়াছে। ভারতবিজয়ী আলেকজাণ্ডার নিজের বিজয়বার্ত্তা গ্রীক ও ভারতীয় ভাষাযুক্ত দ্বাদশটী শিলামঞ্চ উত্তোলন দ্বারা ঘোষণা করিয়াছিলেন বলিয়া ইতিহাসে উল্লেখ আছে। পশ্চিম ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের তদানীন্তন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এগুলি আবিষ্কার করিতে ইচ্ছা করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৯১৭ হইতে ১৯২২ সাল পর্য্যন্ত পাঁচটী শীত ঋতুতে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের নানাস্থান ভ্রমণ করেন। ১৯১৭ সালের শেষভাগে তিনি একদিন হরিণ শিকারে গিয়া জঙ্গলের মধ্যে পথভ্রান্ত হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ মোহেন্-জো-দরোতে উপস্থিত হন। তথায় তিনি চক্‌মকি পাথরের একটী ছুরিকা দেখিয়া স্থানটীকে অতি প্রাচীন বলিয়া মনে করেন। প্রাচীন স্তূপের সন্ধানে ইতঃস্তত ভ্রমণ করিয়া রাখালদাস বাবু মোহেন জো-দরোর বৌদ্ধস্তূপযুক্ত স্থানটী খনন কার্য্যের জন্য মনোনীত করেন। তথায় যে, এত প্রাচীন কালের কোন চিহ্ন পাওয়া যাইবে তাহা তিনি কল্পনাও করেন নাই। অতঃপর ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মোহেন-জো দরো নগরের খনন কার্য্য আরম্ভ করিয়া প্রাগৈতিহাসিক যুগের বহু জিনিস প্রাপ্ত হন। স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র যেমন সারনাথ খনন সম্পর্কে অমর হইয়াছেন, সেইরূপ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম মোহেন-জো-দরোর আবিষ্কারে অমর হইয়া থাকিবে।

রাখালদাস বাবুর পরে মিঃ এম্-এস্ বৎস, মিঃ কে-এন্ দীক্ষিত, রায় বাহাদুর দয়ারাম সাহানী, ডাঃ ই-ম্যাকে এবং ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল সার জন মার্শ্যাল বিস্তৃতভাবে খনন কার্য্য করিয়া মোহেন্ জো-দরোর অধুনালুপ্ত উন্নত সভ্যতার বহু নিদর্শন আবিষ্কার করিয়াছেন। সিন্ধুদেশে বা সিন্ধুনদের কাছে উক্ত সভ্যতা জাত ও বর্দ্ধিত হইয়াছিল বলিয়া এই সভ্যতাকে "সিন্ধু-সভ্যতা" আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। মোহেন-

জো-দবোব সভ্যতা 'তাম্র-প্রস্তব' যুগে (chalcolithic age) উৎপন্ন। পৃথিবীব প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা কবিলে দেখা যায়, মিশব, মেসোপোটোমিয়া, পাবস্ত প্রভৃতি দেশ এই যুগেই উন্নত সভ্যতায় উদ্ভাসিত হইয়াছিল। উল্লিখিত দেশসমূহেব সভ্যতা মোহেন্-জো-দবোব প্রায় সমসাময়িক এবং সমকক্ষ। পৃথিবীব প্রাচীন সভ্যতাসমূহ নদীব তীবেই শ্রীবৃদ্ধি লাভ কবিযাছিল। নীলনদেব তীবে প্রাচীন মিশবেব সভ্যতা, তাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস তীবে মেসোপোটোমিয়াব সভ্যতা এবং সিন্ধুতীবে মোহেন্-জো-দবোব সভ্যতা সমৃদ্ধ হইযাছিল। তাই তাম্র-প্রস্তব যুগেব সভ্যতাকে 'নদী মাতৃক সভ্যতা' বলা হয়। ভাবতীয় সভ্যতা-পবাহ বিভিন্ন যুগে কলুষনাশিনী গঙ্গাস্রোতেব সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র-সঙ্গমে যাত্রা কবিযাছে। বৃন্দাবন, অযোধ্যা, কাশী, নবদ্বীপ ও দক্ষিণেশ্বব প্রভৃতি সভ্যতা-কেন্দ্রগুলি গঙ্গাতীবেই উন্নত হইযাছে। যে 'সিন্ধু' শব্দ হইতে 'হিন্দু' নাম আসিযাছে, সেই সিন্ধু নামেব সহিত ভাবতেব প্রাচীনতম সভ্যতা চিবতবে সংযুক্ত হইয়াছে। তাই মোহেন্-জো-দবোব সভ্যতাকে 'সিন্ধু-সভ্যতা' (Indus civilisation) বলা হয়। সাব্ জন্ মার্শ্যালেব এবং ডক্টব ই ম্যাকেব (The Indus civilisation) গ্রন্থদ্বয়ে 'সিন্ধু-সভ্যতাব' বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাব। শ্রীকুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী তাঁহাব "প্রাগৈতিহাসিক মোহেন্-জো-দবো" (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত) নামক উপাদেয় গ্রন্থে মোহেন-জো-দবো-সভ্যতাব যে চিত্তাকর্ষক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিয়াছেন, তাহা সকলেবই পাঠ কবা উচিত। গবেষণা দ্বাবা ইহা নিশ্চিত ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, মেসোপোটোমিয়া ও মোহেন-জো-দরোব সভ্যতার মূলে অতি প্রাচীন একটী উন্নত সভ্যতা ছিল। তাহা এই উভয় স্থানে দেশ কাল ভেদে বিভিন্ন আকাব ধাবণ কবিয়াছিল মাত্র।

মোহেন্-জো-দবোব সভ্যতা উহাব চতুঃসীমাব মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না, উহা ছিল বহুদূর বিস্তৃত। পাঞ্জাবের মণ্টগোমাবী জেলাব অন্তর্গত প্রাচীন হবপ্পা মোহেন্-জো-দবো হইতে চাবিশত মাইল দূরবর্ত্তী। রায় বাহাদুব দয়াবাম সাহানী ১৯২২ খ্রীঃ হবপ্পায় খনন কার্য্য কবিযা তথায় মোহেন্-জো-দবোব অনুরূপ সভ্যতার অস্তিত্বেব প্রমাণ পাইয়াছেন। আমেবিকাব বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ কর্তৃক পরিচালিত (School of Indic and Iranic studies) সমিতি সিন্ধুনদীব পূর্ব্বতীবে চান্-হু-দরো নামক স্থান খনন কবিয়া মোহেন-জো-দবোতে প্রাপ্ত শীলমোহব, বঙ্গীন পাত্র, মাটীর পুতুল ও পাথবেব চিত্রিত মালা প্রভৃতিব অনুরূপ পুবাবস্তু, আবিষ্কাব কবেন। চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত 'প্রাচ্য প্রতিষ্ঠান' (Oriental Institute) পরিচালিত খনন কার্য্যে বাগ্দাদের নিকটবর্ত্তী তেলআস্‌মেব নামক স্থানে ১৯৩২ সালে মোহেন্-জো-দবোব পুবাবস্তুব অনুরূপ বহুদ্রব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভাবতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের বর্ত্তমান সুপাবিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদাব মহাশয় বলেন, প্রাগৈতিহাসিক ভাবতবাসী বেলুচিস্থান, পাবস্য ও মেসোপোটোমিয়াব অতি প্রাচীন সুসভ্য জাতিদেব সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যে একসূত্রে আবদ্ধ ছিল। সাব্ অরেল ষ্টাইনও বেলুচিস্থানেব মধ্যে এরূপ বহু প্রমাণ সংগ্রহ কবিয়াছেন।

মোহেন জো-দবোতে অধুনালুপ্ত সাতটী নগবেব অস্তিত্বেব প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ফ্রাঙ্কট্ ফোর্ট সাহেবেব মতে বিবিধ ও সুনিপুণ স্থাপত্য ও পূর্ত্ত-কর্ম্মে মোহেন-জো-দবোবাসীবা যে সমসাময়িক মিশব ও মেসোপোটোমিয়া অপেক্ষা অধিক কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অন্যান্য প্রাচীন দেশের তুলনায় মোহেন-জো-দবোব গৌবব ও বিশেষত্ব বেশী ছিল। এখানকাব মত এমন চমৎকাব গৃহ অন্য কোথাও দেখা যায় না।

এখানে যে স্নানাগার আছে এইরূপ স্নানাগারও এত প্রাচীনকালে অন্য কোন স্থানে ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। এখানকার শিল্প, সমসাময়িক সুমের ও এলাম প্রভৃতি দেশের শিল্পাপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। মোহেন জো-দরোর মৃৎপাত্র-চিত্রও অতুলনীয়। সাধারণ বয়নকার্য্যের জন্য মিশরে প্রচলিত শণজাত সুতার পরিবর্ত্তে এখানে তুলার সুতা ব্যবহৃত হইত। অধিকন্তু এখানকার লেখার সঙ্গে অন্যান্য দেশের প্রাচীন লেখার সাধারণ সাদৃশ্য থাকিলেও উহা যে অতিশয় উন্নত প্রণালীর তাহা নিঃসন্দেহ। মোহেন-জো-দরোতে মৃৎশিল্পের যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। তত্রত্য অধিবাসীরা কোন কোন বিষয়ে আধুনিক যুগের মতই উন্নত প্রণালীর নাগরিক জীবন যাপন করিত। তাহারা সর্ব্বদা বসবাসের জন্য ইষ্টক নির্ম্মিত মনোরম গৃহ নির্ম্মাণ করিত। দ্বিতল, ত্রিতল গৃহের ছাদ হইতে জল নিকাশের জন্য আধুনিক যুগের মত মৃন্ময় নল নির্ম্মাণ করিয়া খাড়া ভাবে দেওয়ালের সঙ্গে বসাইয়া দিত। স্থাপত্য ও পূর্ত্তকর্ম্মে ইহারা যে কোনরূপে পশ্চাৎপদ ছিল না ইহা তাহাদের নানারূপ গাঁথনীর দেওয়াল, মঞ্চ, ড্রেন ও রাস্তাঘাট ইত্যাদি দেখিলে নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হয়।

মোহেন-জো-দরোর অধিবাসিগণ দ্রাবিড় জাতীয় ছিল। সিন্ধুদেশের অনতিদূরে বেলুচিস্থানে ব্রাহুই জাতির বাস। ইহাদের মধ্যে এখনও দ্রাবিড় ভাষার প্রচলন আছে। অনেকে অনুমান করেন, প্রাগ্বৈদিক যুগে উত্তর ভারতে দ্রাবিড়-ভাষাভাষী লোক বাস করিত। মোহেন জো-দরোর ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত বা বৈদিক ভাষায় কোন সম্পর্ক বা সাদৃশ্য নাই। চীন দেশের ভাবব্যঞ্জক চিত্রাক্ষরের সঙ্গে উহার অক্ষরের মিল দেখিতে পাওয়া যায়। প্রশান্তমহাসাগরস্থিত পোলিনেশিয়ার ইষ্টার দ্বীপের সঙ্গে এখানকার শতাধিক অক্ষরের হুবহু মিল আছে। যদিও তাহাদের লিপিকুশলতা অগ্রসর হইয়াছিল, তথাপি কোন প্রকার বর্ণমালার বোধ হয় উদ্ভব হয় নাই। মোহেন-জো-দরোর লেখা সাধারণতঃ ডানদিক হইতে বামদিকে ছিল। স্যর আলেকজাণ্ডার কানিংহাম, অধ্যাপক ল্যাঙ্গডন্ ও মিঃ কে-পি জয়স্বালের মতে এই লেখা পুরাতন ব্রাহ্মীলিপির অধিকতর সমীপবর্ত্তী। অনেকে মনে করেন, মোহেন-জো-দরোর লেখা হইতেই ব্রাহ্মীলিপির সৃষ্টি হইয়াছে। অবশ্য এই লেখার এখনও সর্ব্ববাদীসম্মত পাঠোদ্ধার হয় নাই। ব্রাহ্মী-লিপির পাঠোদ্ধার কর্ত্তা প্রিন্সেস্ সাহেবের মত একজনকে আমরা শীঘ্র পাইব আশা করি।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মোহেন-জো দরোর সভ্যতা তাম্র-প্রস্তর যুগের। ঋগ্বেদকেও এই যুগের গ্রন্থ বলিয়া ধরা হয়। এখানে লৌহের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই এবং ঋগ্বেদেও লৌহের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। মোহেন-জো দরোতে সোনা, রূপা, তামা ও ব্রোঞ্জের জিনিষপত্র পাওয়া গিয়াছে। ঋগ্বেদেও এই সকলের উল্লেখ আছে। কিন্তু সিন্ধু-সভ্যতা ও বৈদিক সভ্যতা কেহ কাহারো জননী বা ভগিনী নহে। মোহেন-জো-দরোর সভ্যতার সহিত দ্রাবিড়ী সভ্যতার সাদৃশ্য আছে। মোহেন-জো-দরোতে প্রাপ্ত অস্থি কংকাল পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে যে, এই আকৃতিবিশিষ্ট লোক আধুনিক বাঙ্গালী জাতির মধ্যেও কখনও কখনও দৃষ্টিগোচর হয়। বাঙ্গালীদের ন্যায় মৎস্য মোহেন-জো-দরোবাসীদের দৈনন্দিন খাদ্য ছিল বলিয়া মনে হয়; কারণ, এখানে মৎস্য শিকারোপযোগী তামার অনেক বড়শি পাওয়া গিয়াছে। স্তূপীকৃত শরা ও মৃৎ-কপাল (ভগ্ন মৃৎপাত্রখণ্ড) মোহেন-জো-দরোতে পাওয়া গিয়াছে। উহা হইতে মনে হয় এই সব তাহাদের নিত্য প্রয়োজনীয় ছিল। এখনও শরা ও মৃৎকপাল বঙ্গদেশের পল্লীগৃহে পুরাকালের বিলীন স্মৃতি সঞ্জীবিত করিয়া দেয়।

আমাদের এই সকল আচার ব্যবহারের মূলসূত্র কোথায়? সিন্ধু উপত্যকায় সাধারণতঃ মৃৎপাত্রগুলি লাল করিয়া পোড়ান হইত। শতকরা নিরানব্বইটী এইরূপ লাল। পাত্র নির্ম্মাণ সমাপ্ত হইলে ইহার বহির্দ্দেশে লাল কিম্বা ঈষৎ পীত রংয়ের প্রলেপ লাগাইয়া স্বাভাবিক লালকে আরও উজ্জ্বল লাল বা পীতাভ করা হইত। বঙ্গদেশে এবং অন্যত্র পাত্রের উপর ও গলার দিকে এইরূপ রঙ দেওয়ার প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। স্তূপাকার ভগ্ন বা ভাল মৃৎপাত্র দেখিয়া মনে হয়, একবার মাত্র ঐগুলি ব্যবহার করিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইত। আজকাল বঙ্গদেশে বা উত্তর ভারতের অনেক স্থানে এইরূপ মৃৎপাত্র একবার ব্যবহার করিয়াই পরিত্যাগ করা হয়। ইহাদের তলা সরু দেখিয়া মনে হয়, এইগুলি উল্টাইয়া রাখা হইত। এইরূপ উল্টাইয়া রাখিবার নিয়ম কলিকাতা প্রভৃতি অঞ্চলে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

মোহেন-জো-দরোতে প্রাপ্ত অনেক মূর্ত্তি দেখিয়া মনে হয় যে, ঐ সকল স্থানে মূর্ত্তি পূজা প্রচলিত ছিল। সিন্ধু সভ্যতায় শিবলিঙ্গ ও মাতৃকা পূজার বহুল প্রচলন ছিল বলিয়া প্রতীতি হয়। প্রস্তর ও মৃত্তিকা নির্ম্মিত অসংখ্য লিঙ্গ ও অন্যান্য পূজার দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে।

ভূমাতার উপাসনা যে সিন্ধু-সভ্যতার প্রচলিত ছিল, ইহা হরপ্পার একটী লম্বা শীল মোহরের ছাপে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে অঙ্কিত আছে, একটী স্ত্রী-মূর্ত্তির উদর হইতে একটী বৃক্ষের জন্ম হইয়াছে। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের মতে মোহেন-জো-দরোতে যোগবিদ্যা প্রচলিত ছিল। এক শীল মোহরে যোগাসনে উপবিষ্ট এক ত্রিবক্ত্র দেবমূর্ত্তির চতুষ্পার্শ্বে ব্যাঘ্র, হস্তী, গণ্ডার, মহিষ এবং অধোদেশে একটী মৃগ ক্ষোদিত রহিয়াছে। ইহাতে অনুমিত হয় শিবকে এখানে শুধু মহাযোগী বেশে নয়, পশুপতিভাবেও কল্পনা করা হইয়াছে। এইরূপে যোগমগ্ন অপর এক প্রস্তর মূর্ত্তিও পাওয়া গিয়াছে। একটী শীলমোহরে একটী অর্দ্ধনর অর্দ্ধবৃষ মূর্ত্তিকে একটী ব্যাঘ্রীর সহিত যুদ্ধ করিতে দেখা যায়। ইহা সুমের দেশীয় গিলগ্যামেশ নামক বীরের সাহায্যকারী অর্দ্ধনর অর্দ্ধবৃষ আকৃতিবিশিষ্ট হয়বাণ মূর্ত্তির অনুরূপ। সিন্ধু উপত্যকায় নরবৃষ মূর্ত্তি পৌরাণিক যুগের হিরণ্যকশিপু নিধনকারী নৃসিংহ মূর্ত্তির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। হিন্দুদের ন্যায় মোহেন জো-দরোবাসিগণ বোধ হয় নৃসিংহকে ভগবানের অবতার বলিয়া পূজা করিত।

মোহেন-জো-দরোতে শিশুদের খেলা ও আমোদ প্রমোদের জন্য মানুষ, গরু, মহিষ, ভেড়া, বানর, শূকর, মুরগী, পাখী, মার্ব্বেল ও গাড়ী প্রভৃতি মাটীর পুতুল তৈরী হইত। এখানে ব্যবহৃত ইঁটের মাপ অনেকাংশে বর্ত্তমান কালের ইঁটের মতই। সাতটী নগর আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল নগরে কোন কোন গৃহ ৮৫ ফুট পর্য্যন্ত দীর্ঘ এবং ৪।৫ ফুট পুরু দেওয়ালবিশিষ্ট ছিল। এই সকল সুবৃহৎ গৃহের সঙ্গে দারোয়ানের ঘর, স্নানাগার, কূপ, প্রাঙ্গণ ও পয়ঃপ্রণালী পর্য্যন্ত থাকিত। ভৃত্য-নিবাস, অতিথিশালা ও পাকশালা বড়লোকের বাড়ীর নীচের তলায় থাকিত। মোহেন-জো-দরোর অন্যতম আশ্চর্য্য জিনিষ একটী বৃহৎ স্নানাগার। উহা উত্তর দক্ষিণে ১৮০ ফুট দীর্ঘ, পূর্ব্ব পশ্চিমে ১০৮ ফুট প্রস্থ। ইহা চতুর্দ্দিকে পুরু প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। স্নানাগার সংলগ্ন সন্তরণবাপীও খুব বড়। গৃহগুলিতে ইঁটের গাঁথনী এবং স্যাঁৎসেঁতে ভাব দূর করার জন্য এক ইঞ্চি পুরু শিলাজতুর প্রলেপ দেওয়া হইত। ঔষধে ব্যবহারোপযোগী শিলাজতুও এখানে পাওয়া গিয়াছে। যব ও গম বোধ হয় অধিবাসীদের খাদ্য ছিল; কারণ, পাঁচ হাজার বৎসরের পূর্ব্বেকার যব ও গম এখানে পাওয়া গিয়াছে।

মোহেন-জো-দরোতে সুতাকাটার বিশেষ প্রচলন ছিল। মাটী ও শঙ্খনির্ম্মিত নানা প্রকারের অসংখ্য টেকো এবং ভূগর্ভ হইতে লব্ধ পাঁচ হাজার বৎসরের কার্পাস সুতা হইতে তাহা সহজেই অনুমিত হয়। তাহারা বস্ত্র-বয়নও ভালরূপে জানিত। মাথার চুল লম্বা রাখার নিয়ম ছিল। ঐ গুলি পশ্চাৎদিকে সুন্দর খোঁপারূপে বিন্যস্ত করা হইত। মোহেন জো-দরোবাসীদের ন্যায় লম্বা চুল রাখার প্রথা এখনও সিন্ধু প্রদেশের বর্ত্তমান অধিবাসীদের অনেকের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। *স্ত্রীলোকেরা বামহাতে বাহু হইতে কব্জী* পর্য্যন্ত বলয় পরিত। বলয় সাধারণতঃ তামা, ব্রোঞ্জ, শাঁখা ও পোড়া মাটী দিয়া তৈরী হইত। এখানে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জ নির্ম্মিত নর্ত্তকী মূর্ত্তি হইতে এইরূপ জানা যায়। গুজরাট ও রাজপুতানার কোন কোন স্থানে এখনও এইরূপ বলয় ব্যবহারের প্রথা আছে। মোহেন-জো-দরোর মৃৎপাত্র চক্র নির্ম্মিত ও খুব মসৃণ। ডিমের খোলার মতন মসৃণ ও পাতলা পাত্র ও পাওয়া গিয়াছে। মোহেন-জো-দরোর মাটীর গাড়ীর সঙ্গে আধুনিক সিন্ধু দেশীয় যানের এবং এক্কার কোন প্রভেদ দেখা যায় না। খেলার জন্য তাহারা শক্ত ও নরম পাথরের মার্ব্বেল (ছোটগুলি) এবং পাশা (অক্ষ) ব্যবহার করিত। পাশা পাথর বা পোড়া মাটীতে তৈরী হইত। সুতার কাপড, মাথার ফিতা, গলার হার, গায়ের শাল, হাতের বালা ও আংটী প্রভৃতি ব্যবহৃত হইত। এই সব দ্রব্যে সিন্ধু-তীরবাসীদের মার্জ্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। ভাস্করবিদ্যায়ও যে মোহেন-জো-দরোবাসিগণ যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছিল, তাহা চুনা পাথরের ত্রিপত্রযুক্ত উত্তরীয় ধারী বৃহৎ যোগি-মূর্ত্তি, উত্তরীয় পরিহিত ধ্যানিমূর্ত্তি, শ্মশ্রু ও কবরী বিশিষ্ট মস্তক এবং বৃষমূর্ত্তি হইতে প্রমাণ পাওয়া যায়।

ওয়াডেল সাহেব মোহেন-জো-দরোর অক্ষর পড়িবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন, শীল মোহরের ভাষা সংস্কৃত। একটী তাম্রফলকে মানুষের একটী আশ্চর্য্য ছবি পাওয়া গিয়াছে, দেখিলে ব্যাধ বলিয়াই মনে হয়। তাহার হাতে তীর ধনুক, মস্তকে শৃঙ্গ এবং পরিধানে পত্র নির্ম্মিত পরিচ্ছদ। মস্তকে শৃঙ্গ থাকায় উহাকে অনেকে ব্যাধরূপী দেবতা বলিয়া মনে করেন। কারণ, মস্তকে শৃঙ্গ এইযুগে *দেবত্বের পরিচায়ক ছিল।*

মোহেন-জো-দরোতে যে সকল মৃৎপাত্র পাওয়া গিয়াছে সেইরূপ বহু পাত্রই বৈদিকযুগে যাগ যজ্ঞ কিম্বা দৈনন্দিন কার্য্যে ব্যবহৃত হইত। রঞ্জন-শিল্পেও মোহেন-জো-দরোর শিল্পীরা নিপুণ ও সিদ্ধহস্ত ছিল। তথায় স্বর্ণ শিল্পও যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল। এখানে রৌপ্য পাত্রে রক্ষিত সোনার কণ্ঠহার, হাতের বলয়, কানের দুল, মাথার বন্ধনী, চূড়া, সুচ, এবং মালা প্রভৃতি নানা স্বর্ণদ্রব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। মোহেন-জো-দরোতে প্রধানতঃ মৃতব্যক্তিকে দাহ করা হইত। শবদাহ এবং দাহান্তর দগ্ধ অস্থির সমাধি অনুমিত হয়।

সিন্ধু-সভ্যতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। অনুসন্ধিৎসু পাঠক ম্যাকে ও মার্শ্যাল প্রভৃতি গ্রন্থকারের পুস্তক পাঠে ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার রোমাঞ্চকর ইতিহাস জানিয়া আনন্দিত হইবেন। সিন্ধু-সভ্যতার কোন বিবরণ দেশের জনশ্রুতি বা প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায় না। জাতির সুপ্রাচীন অতীতের সহিত পরিচয় আমাদের একান্ত আবশ্যক; কারণ, উহা ব্যতীত ভবিষ্যতের প্রগতির ধারা নিরূপিত হয় না। প্রাচীন সভ্যতার সাধন, সংরক্ষণ ও প্রচারের জন্য আমাদের যত্নশীল হওয়া উচিত।

জাগ্রত জাপান

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সরকার

৮৮০ খৃষ্টাব্দ হইতে কুযাম্যাকুপদ ফুজিওয়াবা গোষ্ঠিব বংশানুক্রমিক পদে পবিণত হয়। ফুজিওয়াবা পরিবাবে স্বকীয় কন্যাদিগকে বাজপবিবারেব সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ কবিয়া, কিম্বা বাজপুত্রগণেব বিলাস-বনিতারূপে নিযুক্ত কবিযা বাজপবিবাবেব উপব এমন প্রভুত্ব অর্জ্জন কবিয়াছিল যে, তাহাদেব বিবদ্ধে কথা বলিবাব মত কেহই বর্ত্তমান ছিল না। প্রত্যেক বাজকুমাবই ফুজিওয়াবাকুলেব দৌহিত্র এবং প্রত্যেক বাজমাতাই ফুজিওয়াবা-দুহিতা। সুতবাং সমুদায বিশিষ্ট বাজকীয পদই ফুজিওযাবা বংশধবগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। ইহাব ফলে পুত্রহস্তে বাজ্যভাব অর্পণ কবিযা বানপ্রস্থ অবলম্বন কবিবাব প্রথা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। এই প্রথা পূর্ব্ব হইতেই জাপানে বর্ত্তমান ছিল। উপযুক্ত পুত্রেব হস্তে বাজ্যভাব অর্পণ কবিয়া জাপ-সম্রাটগণ বৃদ্ধ বয়সে শান্তিপূর্ণ ধর্ম্মজীবন যাপন কবিতেন এবং যুবক সম্রাটকে আবশ্যকমত সদুপদেশ দান কবিতেন। এই প্রথা চীনদেশ হইতে জাপানে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, কিন্তু জাপানেব উর্ব্বর মৃত্তিকায় ইহা এত অধিক পবিমাণে পুষ্টিলাভ কবিয়াছিল যে, বাজ-পবিবাব হইতে আবম্ভ কবিয়া সমাজের প্রতি স্তবে প্রতি সম্ভ্রান্ত গৃহস্থেব মধ্যে পর্য্যন্ত এই প্রথা ন্যূনাধিক প্রবিষ্ট হইয়াছিল। ভাবতীয় চতুবাশ্রম-গত বানপ্রস্থ প্রথার সহিত ইহাব গুণগত মিল না থাকিলেও খানিকটা আনুষ্ঠানিক মিল যে বর্ত্তমান আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতের আশ্রমপ্রথা মানবজীবনকে স্তবে স্তবে উন্নীত করিয়া চবম আদর্শে স্থিত হইবাব সোপান স্বরূপ। ইহার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত একটা অবিচ্ছিন্ন সাধনসূত্র অনুস্যূত বহিয়াছে। কোথাও ছেদ বা বিরাম নাই। ব্রহ্মচর্য্যে গুরুব আশ্রয়ে ভিত্তি স্থাপন করিয়া, সংসাবে সহধর্ম্মিণীব সহাবতায় ভোগবাসনাব তবঙ্গ-সংঘাতেব মধ্যেও লক্ষ্যভ্রষ্ট না হইয়া, বামপ্রস্থে সর্ব্বকর্ম্ম-বিবতিব ক্ষেত্র প্রস্তুত কবতঃ মানব যখন সন্ন্যাসাশ্রমে পদার্পণ কবে, তখন তাহাব জীবন-কমলটী অমল বিভায ফুটিযা উঠে—আলোকেব মহাসমুদ্রে অবগাহন করিয়া সে মুক্তিব আনন্দে বিভোব হয। কিন্তু জাপানেব 'ইন্-সেই'-প্রথা একটা আদর্শ অভিমুখে অভিযান নহে, নিববচ্ছিন্ন সাধনাব অবশ্যম্ভাবী পবিণতি নহে, ইহা জাপানী সংস্কাবপ্রসূত পুত্রেব প্রতি পিতাব কর্ত্তব্য-বুদ্ধিজাত একটী মহাকল্যাণকব সামাজিক বিধি।

এইরূপ কোন বিধি বর্ত্তমান না থাকায় ভাবতীয় মুসলমান সম্রাটকুলে পিতাপুত্রে যে বিসদৃশ সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই অবগত আছেন। কিন্তু জাপানেব বাজকুলে বাজ্য-লোলুপ পুত্র কর্ত্তৃক পিতাব প্রতি বিরুদ্ধাচবণ কবিবাব দৃষ্টান্ত নিতান্তই বিবল। 'ইন্-সেই' প্রথা জাপানী বাজকুলকে পিতৃদ্রোহের মহাপাতক হইতে বক্ষা কবিয়াছে।

মানব-জীবনেব এই অত্যাবশ্যক প্রথাটী ফুজিওয়াবা বংশেব হাতে পড়িয়া এমন বিসদৃশ রূপ পবিগ্রহ কবিয়াছিল যে, কোন সম্রাটই অধিক দিন সিংহাসনে অবস্থিত থাকিতে সমর্থ হন নাই। শক্তিহীন সম্রাট ফুজিওয়ারা কর্ম্মচারিবৃন্দের চক্রান্তে এবং ফুজিওয়াবা কুয়াম্বাকুব ইঙ্গিতে বিনাবাক্যব্যয়ে

অকালে গদী ত্যাগ করিয়া অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেন। সম্রাট 'সিওয়া' (৮৫৯—৮৮০) ৯ বৎসর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ২৬ বৎসর বয়ঃক্রমকালে সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। "সুজুকু" (৯৩১-৯৫২) ৮ বৎসর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া ২৬ বৎসর বয়সে অবসর গ্রহণ করেন। 'টোবা' ৫ বৎসর বয়সে সম্রাট-পদবী লাভ করিয়া ২০ বৎসর বয়সে উহা পরিত্যাগ করেন। 'রোকুকু' ২ বৎসর বয়ঃক্রমকালে সম্রাট পদে অধিষ্ঠিত হইয়া মাত্র ২ বৎসর পর শৈশব অবস্থাতেই সিংহাসন হইতে বিচ্যুত হন। এমনি করিয়া অপ্রাপ্ত বয়স্ক সম্রাটবৃন্দের রাজতক্তে আরোহণ এবং অবরোহণ পর্য্যায়ক্রমে চলিতে থাকে এবং রাজ্যশাসনে রাজার অধিকার সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়।

চীন দেশীয় রাজনীতির অনুকরণে পরিচালন বিভাগ ও সামরিক বিভাগ দুইটী পৃথক বিভাগে পরিণত হইল, এবং এই উভয় বিভাগে পৃথক পৃথক কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইতে আরম্ভ করিল। আয়াসকুণ্ঠ ফুজিওয়ারা বংশধরগণ পরিচালন বিভাগের কাজকেই সহজ এবং সুবিধা মনে করিয়া ঐ বিভাগকে বংশের একচেটিয়া বিভাগরূপে গ্রহণ করিল। ফলতঃ সামরিক বিভাগ অন্যান্য উত্থান-শীল পরিবারের সমরকুশল পরিশ্রমী ও সাহসী ব্যক্তির হস্তে অর্পিত হইল। শক্তি কখনও বিশ্রাম করিতে জানে না। ফুজিওয়ারা পরিবার অসীম শক্তিতে প্রভুত্বের উচ্চশিখরে পদার্পণ করিবার পর যখন নিশ্চিন্ত জীবন যাপনে অবহিত হইল, তখন সকলের অলক্ষ্যে অন্যান্য পরিবার শক্তিসাধনায় বীর্য্যশালী হইয়া ফুজিওয়ারার প্রতি-দ্বন্দ্বী রূপে দণ্ডায়মান হইল। যখনই কোন সামরিক প্রয়োজন উপস্থিত হইত, তখনই কোন না কোন সমরকুশল ব্যক্তির সহায়তা গ্রহণ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িত। এইরূপে 'টায়রা' ও 'মিনামটো' পরিবার বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠিল। প্রথমতঃ 'টায়রা' ও 'ফুজিওয়ারার' বিবাধিতা আরম্ভ হয়; পরে এই বিবাদ পরিবর্ত্তিত হইয়া 'টায়রা' ও 'মিনামেটো' পরিবারের মধ্যে ঘোর শত্রুতার সৃষ্টি হয়। এই দুই শক্তিশালী পরিবারের মধ্যে দীর্ঘ-কালব্যাপী বিবাদের ফলে একশত বৎসরের অধিক-কাল যাবৎ জাপানে যে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতে শুধু যে জাপানের জাতীয় উন্নতি ব্যাহত হইয়াছিল তাহা নহে, জাপানের সারা অঙ্গ রক্তস্রোতে বিধৌত হইয়া সমগ্র জাপানকে একটা ভয়াবহ রণাঙ্গনে পরিণত করিয়া-ছিল। যখনই একজন মিনামটো ও একজন টায়রার সাক্ষাৎ হইত, তখনই ক্রোধবদ্ধ তররারী ঝলসিয়া উঠিয়া ছিন্নশির প্রতিদ্বন্দ্বীর শোণিত-স্রোতে ভূপৃষ্ঠ রঞ্জিত করিত।

১১৫৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট 'কোনোই'র মৃত্যুর পর সিংহাসনের অধিকারী নির্ব্বাচন লইয়া মতদ্বৈধ উপস্থিত হইলে দুই বিরোধী পক্ষের মধ্যে যে যুদ্ধ হয় (১১৫৬ খৃঃ) তাহাতে টায়রা বংশীয় বীর 'কিয়ো-মোরি' জয় লাভ করেন। উদ্ধত প্রকৃতি অসম-সাহসী বীর 'কিয়োমোরি' ফুজিওয়ারা প্রভুত্বের অবসান করতঃ রাজক্ষমতা হস্তগত করিয়া "দেইজো-দেইজিন্" (প্রধান মন্ত্রী) রূপে দীর্ঘকালব্যাপী রাজ্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। মিনামটো নেতা 'যোশিটমো'র মৃত্যুর পর বিজয়ী 'কিয়োমোরি'র নৃশংস তরবারী মিনামটোকুলকে সমূলে ধ্বংস করিতে উদ্যত হইলে 'যোশিটমো'র পুত্রগণ একে একে মৃত্যুর কবলে পতিত হইল। ত্রয়োদশ বৎসর বয়স্ক 'ইয়োরিটমো' 'কিয়োমোরি'র শ্বশ্রূদেবীর কৌশলে 'ঈজু' প্রদেশে পলায়ন করতঃ প্রাণরক্ষা করেন। 'যোশিটমো'র বিলাসবনিতা পরমাসুন্দরী মহাবিদুষী 'টোকিওয়া' 'কিয়োমোরি'র ভয়ে স্বীয় পুত্রগণকে লইয়া অনির্দ্দিষ্ট পথে পলায়ন করতঃ অসহায় অবস্থায় তুষারবৃষ্টিতে সিক্ত হইয়া বনে

জঙ্গলে ঘুরিতে থাকেন। অবশেষে দুইজন মহানুভব টায়রা সৈনিক তাঁহাদিগকে আশ্রয় দান করেন। সেখান হইতে 'টোকিওয়া' জানিতে পারিলেন যে, তাঁহাকে ধরিতে না পারিয়া রক্তপিপাসু 'কিওমোরি' তাঁহার বৃদ্ধা জননীকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। এই সংবাদে কন্যার প্রাণ জননীর দুঃখে কাঁদিয়া উঠিল। তিনি স্বীয় রূপপ্রভায় 'কিয়োমোরি'কে মুগ্ধ করিয়া জননীকে কারামুক্ত এবং সন্তানগণকে রক্ষা করিবেন স্থির করিয়া 'কিয়োমোরি'র নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। অলোকসামান্যা রূপসী 'টোকিওয়া'র রূপের বিজলী 'কিয়োমোরি'র প্রলুব্ধ চক্ষে যে আলোকসম্পাত করিল তাহাতে 'টোকিওয়া'র বৃদ্ধা জননী কারামুক্ত এবং পুত্রগণের প্রাণ রক্ষা হইল।

রমণীর মোহ 'কিয়োমোরি'র ধ্বংসের বীজ বপন করিয়া রাখিল। 'টোকিওয়া'র শিশুপুত্র 'যোশীৎসুন্' বৌদ্ধসংঘে লালিত পালিত হইলেও সন্ন্যাসীর আদর্শে গঠিত হইল না, অন্তর্নিহিত রাজকীয় প্রকৃতি বিকাশ কামনার উন্মাদ হইয়া উঠিল। তাহার দুরন্ত স্বভাব এবং যোদ্ধৃপ্রকৃতি তাহাকে আশ্রম হইতে পলায়ন করিতে উদ্বুদ্ধ করিল। যোশীৎসুন পলাইয়া গিয়া 'মুৎসু' প্রদেশের শাসনকর্ত্তা "ফুজিওয়ারা-নো-হিতে-হিরা"র সেনাবিভাগে কর্ম্মগ্রহণ করিলেন এবং স্বল্পকালমধ্যে রণকৌশলে অগ্রগণ্য হইয়া বিশিষ্ট সামরিক পদে উন্নীত হইলেন। ইতিমধ্যে 'ইয়োরি-টমো' 'কিয়োমোরি'র শত্রুগণকে আহ্বান করিয়া 'কিয়োমোরি'র বিরুদ্ধে যুদ্ধায়োজন করিলেন। ভ্রাতা 'যোশীৎসুন্' অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে অগ্রজের সহায়তায় কামাকুরা নামক স্থানে মিলিত হইলেন। অন্যান্য মিনামটো বংশীয় বীরগণও সত্বর আসিয়া ইওরিটমোর শক্তি বৃদ্ধি করিল। ১১৮০ খৃষ্টাব্দে ইয়োরিটমো কামাকুরাকে কেন্দ্র করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিলেন। ইয়োরিটমোর শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কামাকুরা একটী প্রসিদ্ধ নগরে পরিণত হইল। উত্তরকালে এই কামাকুরা জাপ সভ্যতার একটী বিশেষ কেন্দ্ররূপে পরিণত হইয়াছিল।

দূরদর্শী বিচক্ষণ কিয়োমোরি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, টায়রাকুলের বিরুদ্ধে যে ভীষণ ঘনঘটার সৃষ্টি হইতেছে তাহা উপেক্ষণীয় নহে। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ইয়োরিটমো বাঁচিয়া থাকিতে তাঁহার বংশধরগণ নিরাপদ হইতে পারিবে না। তাই ১১৮১ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমার এক-মাত্র দুঃখ এই যে, মিনামটো বংশীয় ইয়োরিটমোর ছিন্নমুণ্ড দর্শনের পূর্ব্বেই আমি ইহলোক পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছি। আমার মৃত্যুর পর ভগবান বুদ্ধের নিকট প্রার্থনা করিও না, কোন ধর্ম্মগ্রন্থও পাঠ করিও না, শুধু 'ইয়োরিটমো'র ছিন্ন শির আনয়ন করত আমার সমাধির উপর ঝুলাইয়া দিও।"

কিয়োমোরির মৃত্যুতে ইয়োরিটমোর সর্ব্ব-প্রধান অন্তরায় অপসারিত হইল। বিজয় প্রলোভনে তাহার শক্তি শতগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। কিয়োমোরির পুত্র 'মুনেমোরি' টায়রা গোষ্ঠির নেতৃরূপে ইয়োরিটমোর বিপুল আয়োজন ব্যর্থ করিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী প্রতিকূল হইলেন। মিনামটোপক্ষীয় যোশীনাকার সৈন্যদলের নিকট মুনেমোরির সেনাবাহিনী পরাজিত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া পলায়ন করিল। অনন্যোপায় মুনেমোরি ৬ বৎসর বয়স্ক সম্রাটকে সঙ্গে লইয়া সমুদ্র পথে 'সানুকি' নামক স্থানে পলায়ন করিলেন। বিজয়গর্ব্বে এবং রাজ্যপরিচালন প্রলোভনে যোশীনাকার মতিভ্রম ঘটিল। তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া "সেই-ই-শোগুন" পদ স্বয়ং গ্রহণ করতঃ রাজ্যপরিচালনা আরম্ভ করিয়া দিলেন। ইয়োরিটমো কালবিলম্ব না করিয়া তদীয় ভ্রাতা যোশীৎসুনকে যোশীনাকার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়া যোশীনাকাকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিলেন।

পরাজয়ের ভীষণ পরিণাম কল্পনা করিয়া এবং ইয়োরিটমোর নিকট কোনরূপ করুণার প্রত্যাশা নাই বুঝিয়া যোশীনাকা 'হারাকারী' করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। হারাকারী একটী জাপানী 'মাবণ-প্রথা'। বিশেষপ্রকারে উপবেশনপূর্ব্বক স্বহস্তে শাণিত ছুরিকা দ্বাবা তলপেট বিদীর্ণ করিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন কবিবার নাম 'হারাকারী'। এই প্রথা জাপানে অদ্যাবধি প্রচলিত আছে। যোশীনাকাকে পবাভূত কবিবার পর বিজয়ী যোশীৎসুন্ পলায়নপব নৃপতি এবং টায়রা সৈন্যদলের পশ্চাদ্ধাবন কবিয়া "শিমনোসেকি' পল্লীর নিকটবর্ত্তী "ডান্-নো-উরা" নামক স্থানে এক সঙ্কীর্ণ প্রণালীব মধ্যে তাহাদিগেব সাক্ষাৎলাভ করেন। টায়রা পক্ষে ৫০০ এবং মিনামটো পক্ষে ৭০০ সমরপোত ছিল। যুদ্ধ ভীষণ হইতে ভীষণতর হইতে আবম্ভ করিলে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী বোধে কিয়োমোবির বৃদ্ধাপত্নী তদীয়া দৌহিত্র শিশুসম্রাটকে বক্ষে লইয়া সমুদ্রে প্রাণ বিসর্জ্জন কবেন। অবশেষে টায়রা-বাহিনী সম্পূর্ণরূপে পবাজিত হইল। শক্তিস্ফীত 'কিয়োমোরি' মিনামটো বংশ সমূলে নির্ম্মূল করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। কালের পরিবর্ত্তনে মিনামটো বীর ইয়োরিটমো এখন শক্তিকে অঙ্কগত করিয়া কিয়োমোবির ধ্বংসনীতি অনুসরণ করত এমন ভীষণ প্রতিশোধ লইলেন যে, একটী টায়রা বীরও অবশিষ্ট রহিল না। টায়রানেতা মুনেমোবির শিরচ্ছেদ করত কিয়োমোরির অন্তিম বাসনার যথোপযুক্ত প্রত্যুত্তর প্রদান করা হইল। নারী হোক, পুরুষ হোক, শিশু হোক, বৃদ্ধ হোক টায়রা বংশীয় হইলেই মৃত্যুদণ্ড অবশ্যম্ভাবী। অধিকাংশ টায়রাই সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিল; যাহারা অবশিষ্ট ছিল, তাহারা 'কায়সু' দ্বীপের অন্তর্গত 'হিগো' নামক দুরধিগম্য অরণ্যসঙ্কুল উপত্যকা ভূমিতে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে বাধ্য হইল। মরণভীতি টায়রাকুলকে ভীত ও চকিত করিয়া তুলিয়াছিল। অবণ্যে গিয়াও শান্তিতে জীবন যাপন করা সম্ভব হয় নাই। মনুষ্য দেখিলে কিম্বা মনুষ্য পদশব্দ কর্ণগোচব হইলে মিনামটোর আগমন ভয়ে তাহারা দুর বনে পলায়ন করিত এবং নিজদিগকে সযত্নে মনুষ্য সংসর্গ হইতে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিত। কিছুদিন পূর্ব্বে 'হিগো' উপত্যকায় এই টায়বা বংশধরগণকে আবিষ্কার করা হইয়াছে। আজ পর্য্যন্ত মনুষ্যভীতিব দৃঢ়বদ্ধ সংস্কার তাহাদের মধ্য হইতে বিদূরিত হয় নাই।

১১৯০ খৃষ্টাব্দে বিজয়ী ইয়োবিটমো মহাসমারোহে বাজধানী কিয়োটোতে বাজানুগত্য প্রদর্শনেব নিমিত্ত প্রবেশ করিলেন এবং তদানীন্তন সম্রাট 'গো-টোবা' তাঁহাকে 'সেই-ই-টাই' শোগুন উপাধিতে ভূষিত কবিয়া রাজ্য পরিচালনেব ক্ষমতা অর্পণ করিলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি রাজনীতিকুশল দুবদর্শী শোগুন ইয়াবিটমো কিয়োটোব বাজকীয় বিলাসের মধ্যে অবস্থান কবা যুক্তিসঙ্গত নহে বিবেচনায় কামাকুরায় প্রত্যাবর্ত্তন কবিয়া নাকাটোমি বংশেব প্রভুত্ব চিবস্থায়ী কবিবাব নিমিত্ত এবং একটী শক্তিশালী জাতীয় রাষ্ট্র স্থাপনেব জন্য সচেষ্ট হইলেন। তিনি 'ওই-নো-হিবোমোটো' নামক এক বিশ্বস্ত সহচরকে সভাপতি নিযুক্ত করিয়া একটী মন্ত্রিসভা গঠন করিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি সম্রাটের নিকট সনন্দ গ্রহণ কবিয়া পাঁচজন মিনামটো বংশীয় ব্যক্তিকে ৫টী বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্ত্তা পদে নিযুক্ত কবিলেন এবং অন্যান্য প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাকে সামবিক সাহায্য করিবার জন্য প্রত্যেক প্রদেশে একজন কবিয়া সামরিক কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা কবিলেন। ইহার ফলে প্রত্যেক প্রদেশেই শাসন বিভাগের কর্ম্মকর্ত্তা অপেক্ষা সামরিক কর্ম্মচারীর প্রভুত্ব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল এবং কালে ইহারাই বিভিন্ন প্রদেশের প্রভু হইয়া দাঁড়াইলেন।

এইরূপে মিনামটো-প্রভুত্বের ভিত্তি সুদৃঢ়

করিয়া 'ইয়োরিটমো' অন্যান্য ছোট বড় নানা রাজনৈতিক সংস্কারে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি সামরিক বিভাগের ব্যয়নির্ব্বাহের নিমিত্ত সম্রাটের নিকট হইতে কৃষিজাত দ্রব্যের উপর করধার্য্যের অনুমতি গ্রহণ করিলেন এবং সর্ব্বসাধারণ যাহাতে সুবিচার লাভ করিয়া নিরাপদ জীবন যাপন করতে সক্ষম হয়, সেজন্য একটী বিচারালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইয়োরিটমোর কার্য্যপ্রণালীর বিশেষত্ব এই ছিল যে, তিনি রাজানুমতি ব্যতিরেকে কোন কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করেন নাই। যদিও তাঁহার নিজস্ব শক্তি, অপরিমিত কর্ম্মকুশলতা এবং অসাধারণ মনীষাই তদীয় উন্নতির প্রধান কারণ, তথাপি তিনি কখনও কোন কারণে সম্রাটের প্রতি অমর্য্যাদা প্রদর্শন করেন নাই। তিনি বীর ছিলেন, বিচক্ষণ ছিলেন, সুদূরদর্শী রাজনীতিক ছিলেন, কিন্তু দাম্ভিক ছিলেন না। তিনি অসীম বুদ্ধিবলে, অপূর্ব্ব কর্ম্মকুশলতায় যে রাজনৈতিক আবেষ্টনী রচনা করিয়া গিয়াছিলেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 'টকুগাওয়া' শোগুনের আমল পর্য্যন্ত তাহা বর্ত্তমান ছিল। তিনি শক্তিমান হইয়াও শান্তিকামী ছিলেন। প্রজাবর্গের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনের নিমিত্ত তিনি তাঁহার অবশিষ্ট জীবন ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর জাপানের রাজনৈতিক গগনে পুনরায় ঘনঘটার সূত্রপাত হয়। ক্ষমতাপ্রিয় ফুজিওয়ারা বংশ যে কারণে শিশুরাজা নিযুক্ত করিয়া সামান্য অছিলায় তাঁহাদিগকে অবসর গ্রহণে বাধ্য করিতেন, যে দুর্ব্বলতা ফুজিওয়ারা কুলের অধঃপতনের কারণ হইয়াছিল, সেই হীনতা ও দুর্ব্বলতা শোগুনশক্তির মূলোচ্ছেদ করিল। পূর্ব্বে রাজা কুয়াম্বাকুর ক্রীড়াপুত্তলীরূপে পরিচালিত হইতেন, এখন রাজা ও শোগুন উভয়েই অপর শক্তিশালী পরিচালকের অঙ্গুলি সঞ্চালনে পরিচালিত হইতে আরম্ভ করিলেন।

দার্শনিক ভক্তিযোগ

অধ্যাপক শ্রীনিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ

'ভক্তের ভগবান' এই সনাতন প্রবাদটীর অর্থ ভগবান নিজমুখে মহর্ষি দুর্ব্বাসার নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন, "অহং ভক্তপরাধীনঃ।" (শ্রীমদ্ভাগবত)। যে ভক্তির প্রভাবে শিববিরিঞ্চিবাঞ্ছিত ভগবানকে ভক্ত অনায়াসে নিজস্ব করিয়া থাকেন, উহার স্বরূপ ও মহিমা এই প্রবন্ধে কিছু আলোচনা করিব। ভাগীরথীর ত্রিধারার ন্যায় কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তি ভারতীয় সাধনার এই তিনটী চিরন্তন পদ্ধতি। অধিকার ও যোগ্যতাভেদে ঐ তিনটী সাধনার পথ বা উপায় সমান ফলপ্রদ হইলেও বর্ত্তমান কলিযুগে ভক্তিযোগ জীবের পক্ষে যেমন সহজ ও অনায়াসলভ্য তেমনি পরমার্থপ্রদ। অনেকে ভক্তি শব্দটী বড়ই অর্ব্বাচীন মনে করেন। কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত, ভক্তিযোগ আজকালকার অভিনব আবিষ্কার নহে। প্রচলিত বিংশতিশতকের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী বৈদিক গ্রন্থেও ভক্তির প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতার স্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায়। কৈবল্যোপনিষদের ২য় মন্ত্রের ২য় পাদে দেখিতে পাই, "শ্রদ্ধাভক্তিধ্যান-যোগাদবেহি," পিতামহ বলিলেন, 'তুমি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ধ্যানযোগের দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা অবগত হও।'

উক্ত উপনিষদের শঙ্করানন্দ কৃত দীপিকা নাম্নী টীকায় "ভক্তির্ভজনম্" এইরূপ অর্থ দৃষ্ট হয়। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের শেষ প্রমাণ ৬অঃ ২৩শ এ "যস্য দেবে পরাভক্তিঃ" যে ব্যক্তি সচ্চিদানন্দময় পরমেশ্বরে অচলা ভক্তি করে, এইরূপ উক্তি আছে। ভক্তিবাদের প্রধান উপনিষদ্ গোপাল তাপনীতে ভক্তির সবিশেষ পর্য্যালোচনা আছে। উহাতে নিম্নোক্ত প্রকার ভক্তির লক্ষণ লিপিবদ্ধ আছে—"ভক্তিরস্য ভজনং, তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেনামুষ্মিন্ মনঃ কল্পনমেতদেব নৈষ্কর্ম্যম্।" ঐহিক ও পারত্রিক সকল ফলকামনা শূন্য হইয়া শ্রীভগবানে অনুরাগময় মনের প্রগাঢ় অভিনিবেশই ভক্তি। ইহাই আবার নৈষ্কর্ম্য অর্থাৎ কাম্য কর্ম্মাদি সঙ্কল্প বর্জ্জিত হইলে মোক্ষের কারণ হয়। ঐ উপনিষদের স্থানান্তরে উক্ত হইয়াছে—"ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষো, ভক্তিরেব ভূয়সীতি।" অন্যত্র —"বিজ্ঞানঘনানন্দঘন সচ্চিদানন্দরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতীতি" অর্থাৎ ভক্তিই ভক্তজীবকে ভগবদ্ধামে লইয়া যায় এবং শ্রীভগবানের শ্রীচরণ-দর্শনের অধিকারী করেন। ভগবান ভক্তির বশ। "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ।" (শ্রীভগ, ১১)। ভক্তিই ভগবানকে লাভ করিবার পরম সাধন। বিজ্ঞানানন্দ-ঘন মূর্ত্তানন্দস্বরূপ ভগবান সচ্চিদানন্দরূপ ভক্তি-যোগেই প্রতিষ্ঠিত। এস্থলে ভক্তির সচ্চিদানন্দ-ময়ত্ব অর্থাৎ স্বরূপবৃত্তিত্ব স্পষ্টতঃ উল্লিখিত হইয়াছে। এই উপনিষদের প্রামাণ্য সম্পর্কে এ যুগের জনৈক পাশ্চাত্য বিদ্যাবিচক্ষণ বিশিষ্ট বৈদান্তিক স্বর্গীয় যদুনাথ মজুমদার, এম-এ, বেদান্তবাচস্পতি স্বরচিত 'বৈদিক শ্রীকৃষ্ণ' নামক গ্রন্থের পাণ্ডিত্যপূর্ণ মুখ-বন্ধে লিখিয়াছেন—'গোপাল তাপনীতে জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গের সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। স্থির ভাবে গোপাল তাপনী আলোচনা করিলে জ্ঞানবাদ ও অন্ধ ভক্তিবাদের কোলাহল মিটিয়া যায়। সরল জ্ঞানময়ী ভক্তিকেই হৃদয়ের সহিত গ্রহণ করিতে আগ্রহ হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যে "তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে" বলিয়া জ্ঞানী ভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব নিদর্শন করিয়াছেন, গোপাল তাপনীতে সেই জ্ঞানী ভক্তের জ্ঞানময়ী ভক্তির বর্ণনা দীপ্যমান, ইত্যাদি। তাপনীয় উপনিষদ্গুলির প্রামাণ্য বৈদান্তিক আচার্য্যবৃন্দেরও সম্মত। বেদান্তের বিখ্যাত প্রকরণ গ্রন্থ 'পঞ্চ-দশী'র ৯ পরিঃ, ১ম প্রমাণে "উত্তরে তাপনীয়েহতঃ-শ্রুতোপাস্তিরনেকধা" এইরূপ সুস্পষ্ট বর্ণনা আছে। মূলকথা, সত্যের আবিষ্কারে, কালের পূর্ব্ব পশ্চাদ্ ভাব ধরিয়া উপনিষদগুলির উৎকর্ষ ও অপকর্ষ অবধারণ করা যুক্তিসঙ্গত নহে। যাহা সনাতন সত্য তাহা চিরদিনই সমান। শীঘ্র বা বিলম্বে উহার প্রকাশে কিছুই আসিয়া যায় না। কেবলমাত্র বিশ্বাসগ্রাহ্য শ্রুতির প্রমাণ ছাড়িয়া শ্রুতির দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত যুক্তিপ্রধান দর্শনেও ভক্তির উল্লেখ দেখা যাইতেছে। এ বিষয়ে দর্শন সম্রাট বেদান্তের সিদ্ধান্তই প্রথম উল্লেখ্য। উক্ত দর্শনের ৩।২।২৪ সূত্রে "অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানু-মানাভ্যাম্" এর ভাষ্যে আচার্য্যপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"সংরাধনং ভক্তিধ্যানপ্রণিধানাদ্যনুষ্ঠানম্। কথং পুনরবগম্যতে সংরাধনধ্যানাভ্যাং পশ্যন্তীতি, প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং শ্রুতিস্মৃতিভ্যামিত্যর্থঃ। অর্থাৎ অসংস্কৃত বাহ্য ইন্দ্রিয় দ্বারা সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর সাক্ষাৎকৃত না হইলেও শাস্ত্র সংস্কৃত মনের সাহায্যে ভক্তি ধ্যান প্রভৃতি সাধন সহযোগে সাধকগণ তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করেন। ভজন ও ধ্যান কালে দেখিতে পান, তাহার প্রমাণ কি, ইহার উত্তরে পূজ্যপাদ ভাষ্যকার বলিতেছেন, প্রমাণ শ্রুতি ও স্মৃতি। ঐ স্থলে নিজ উক্তির পোষকতার জন্য কঠশ্রুতি ও মহা-ভারতাদি স্মৃতির প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভাষ্যকর্ত্তার সুস্পষ্ট লেখা হইতে বুঝিতে পারা যায়, অন্ধ বিশ্বাসমূলক কেবল শ্রুতি কিংবা শুষ্ক 'তর্ক

মূলক কেবল দর্শনে ভক্তি সিদ্ধান্তিত হয় নাই। পরন্তু যুক্তিসমর্থিত শ্রুতি প্রমাণেও ভক্তি সৌধের ভিত্তি দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। ভগবান্ শঙ্কর তাঁহার বেদান্ত সিদ্ধান্তের অক্ষয় ভাণ্ডার 'বিবেকচূড়ামণি'তেও মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন, "মোক্ষকারণ-সামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী।" মুক্তি লাভের স্বর্ণ সোপান ভক্তি। বরেণ্য রামানুজাচার্য্য লিখিয়াছেন, "ভক্তিস্তু নিরতিশয়ানন্দপ্রয়োজন-সকলেতর বিতৃষ্ণবদ্ধ জ্ঞানবিশেষ এব" (সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ)। অপরাপর সকল বিষয়ে নিস্পৃহতা সহকৃত নিরতিশয় আনন্দপূর্ণ প্রীত্যাত্মক জ্ঞানবিশেষের নাম ভক্তি। এ স্থলে আচার্য্যপাদ রামানুজের মতে ভগবানের স্বরূপানুবন্ধী ধর্ম্ম, তারতম্যহীন, অখণ্ড আনন্দ অনুভূতি, "জ্ঞানবিশেষ ভক্তি"। এ কথাটী বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। কেননা অনেকে, এমন কি, আধুনিক একটি বড় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ধারণা ও প্রচারণা, ভক্তি ও জ্ঞানের অন্য কথায় ভক্ত বনাম জ্ঞানীর মধ্যে অহিনকুল সম্পর্ক। এ মত যে কতখানি ভ্রান্ত, তাহা প্রদর্শিত দুইজন প্রধান বৈদান্তিক আচার্য্যের সিদ্ধান্তেই সুপ্রকট। তাহা ছাড়া প্রাচীন ন্যায়ের অতি দুরূহ ও অতি প্রামাণিক গ্রন্থ 'শব্দশক্তি প্রকাশিকায় জ্ঞানবিশেষকেই ভক্তি বলা হইয়াছে। যথা,—"গৌরবং পুনরবাধ্যত্বাবর-গাহী জ্ঞানপ্রভেদো যেয়ং ভক্তিরিত্যুচ্যতে।" অতঃপর গৌড়ীয় বৈষ্ণবদার্শনিক মুকুটমণি শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ স্বকৃত সিদ্ধান্তের খনি "সিদ্ধান্তরত্ন' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "বিদ্যা বেদন পর্য্যায়ং জ্ঞানং দ্বিবিধম্। একং নির্নিমেষ বীক্ষণবৎ তত্ত্বং পদার্থানুভবরূপং। দ্বিতীয়ন্তু অপাঙ্গবীক্ষণবৎ বিচিত্রং ভক্তিরূপমিতি।" অর্থাৎ, বিদ্যা ও বেদন নামে জ্ঞান দুই প্রকার। একটি অনিমেষ দর্শনের মত তত্ত্বং পদার্থের অনুভবরূপ নির্ব্বিশেষ জ্ঞান বা বিদ্যা। দ্বিতীয়টি অপাঙ্গ বা কটাক্ষ দর্শনের মত বিচিত্র ভক্তিরূপ বেদন। সাধকের অনুভূতিময় সিদ্ধান্ত ভাষায় ব্যাখ্যার অতীত। তথাপি তুলনা মুখে ইঙ্গিতে দুরূহ তত্ত্বটী বুঝিতে যত্ন করিলে এই পর্য্যন্ত বুঝিতে পারা যায়; প্রথমটী বয়স্থা প্রৌঢ়া গৃহিণীর প্রিয় সঙ্গতিজনিত ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্যপূর্ণ আনন্দানুভব, এবং দ্বিতীয়টী হর্ষচঞ্চলা তরুণী ভার্য্যার বল্লভ-সমাগম-সমুচ্ছ্বসিত উদ্বেল আনন্দের অধীর ও বৈচিত্র্যময়ী অনুভূতি। ফলতঃ এ মতেও জ্ঞান ও ভক্তি পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্বদ্ধ। কেবল সাধকের রুচিভেদে সাধনা পদ্ধতির কিঞ্চিৎ ইতর বিশেষ মাত্র। রুচির উপর আইন খাটে না। কারণ রুচি একদিনের এমন কি এক জন্মেরও উপার্জ্জিত নহে। ঐটি প্রাক্তন স্বভাব বা সংস্কার সাপেক্ষ। "স্বভাব যায় না মলে" এই সত্যগর্ভ অমর প্রবাদ ইহার অকাট্য সাক্ষ্য। সহজ কথায়, কেহ 'ঝোল' পছন্দ করে, কেহ বা "ঝাল"। কিন্তু এই পছন্দের মাপকাঠিতে ঐ উভয়ের কাহাকেও ছোট বড় নির্দ্ধারণ করা যায় না। ঐ বিভিন্ন প্রকার পছন্দের মূলে যেমন রুচিরই প্রাধান্য, সাধনা বা উপাসনা জগতেও ঠিক তদ্রূপ রুচিরই একাধিপত্য। ইহার ভূরি ভূরি জীবন্ত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আনুষঙ্গিক বোধে ঐ সকল দৃষ্টান্ত এ স্থলে উদ্ধৃত হইল না।

এখন ভক্তি শব্দের মৌলিক অর্থ কি, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। ভজ ধাতুর অর্থ সেবা। উহার পর ভাববাচ্যে ক্তিন্ প্রত্যয়ে ভক্তিশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং ভক্তি শব্দের যৌগিক বা ধাতুগত অর্থ সেবা। গরুড় পুরাণের ব্যাখ্যা—

"ভজ ইত্যেষবৈধাতুঃ সেবায়াং পরিকীর্ত্তিতঃ।
অস্মাৎ সেবা বুধৈঃ প্রোক্তা ভক্তিসাধনভূয়সী॥"

উদ্ধৃত প্রমাণের সারার্থ, সেবারূপ ভক্তি সর্ব্বসাধন শ্রেষ্ঠা। এই সেবা শব্দে কায়িক, বাচিক, মানসিক ত্রিবিধ আনুগত্যই বুঝিতে হইবে। এতাদৃশ আনুগত্য না থাকায় ভয়, দ্বেষ ও অহংগ্রহ উপাসনার ভক্তিত্ব সিদ্ধ হয় না। ভক্তিশাস্ত্রে ভক্তির লক্ষণ

অসংখ্য। আমি এই প্রস্তাবে মাত্র দুইটি লক্ষণের বিবরণ দিব। একটি জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়াচার্য্য মহর্ষি শাণ্ডিল্যের। অপরটি ভক্তির মূর্ত্তপ্রতীক দেবর্ষি নারদের। আমার মনে হয়, একই ভক্তি সাধনার দুই পথের পথিক ইঁহাদের দুই জনের প্রদর্শিত ভক্তির স্বরূপটী কিঞ্চিৎ বুঝিতে পারিলে ভক্তিতত্ত্ব সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা জন্মিবে। প্রথমে ঋষিপ্রবর শাণ্ডিল্য রচিত ভক্তির লক্ষণটী উদ্ধৃত হইল। "সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।" ২। ভগবানে পরম অনুরাগের নাম ভক্তি। এই সূত্রে সা (ভক্তি), পরা, অনুরক্তি ও ঈশ্বরে এই চারিটী কথা বা শব্দ আছে। ঐ কথা চারিটীর তাৎপর্য্য বুঝিলেই মহর্ষি শাণ্ডিল্যের মতে ভক্তি কি, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। ঈশ্বরে অনুরক্তি এইটি ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ। রক্তি ও রাগ পর্য্যায় বা একার্থক শব্দ। রাগ বা আসক্তি অর্থবোধক রন্জ্ ধাতুর উত্তর যথাক্রমে ভাববাচ্যে ক্তিন্ ও ঘন্ প্রত্যয়যোগে রক্তি ও রাগ শব্দ উৎপন্ন। উহাদের ধাতুগত অর্থ আসক্তি, রাগশব্দের অন্যতম অর্থ রতি। "রতিঃস্মরপ্রিয়ায়াঞ্চ রাগে চ সুরতে স্মৃতা।" (বিশ্বকোষ)।বৈষ্ণবদর্শনে এই রতি বা রাগের স্থান খুব উপরে। ইহার বিবরণে দেখা যায়, 'হৃদয়ে ভগবতী রতি ঈষৎ অঙ্কুরিতা হইলে ঐ ভক্তের নিকট ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থ তৃণাপেক্ষা তুচ্ছবোধ হয়।' "মনাগেব প্ররূঢায়াং হৃদয়ে ভগবদ্রতৌ। পুরুষার্থাস্তু চত্বার স্তৃণায়ন্তে সমন্ততঃ॥ ভ, র, সি। বৈষ্ণবশাস্ত্রের মহাগ্রন্থ 'উজ্জ্বল নীলমণিতে' এই রাগের একটি সুষ্ঠু অর্থ প্রদর্শিত হইয়াছে। উহার মর্ম্ম 'সাধকের হৃদয়ে রাগ সঞ্জাত হইলে প্রিয়তমের (ভগবানের) ক্ষণিক বিরহেও অসহিষ্ণুতা এবং প্রিয়তমসংযোগে চরম দুঃখকেও সুখ মনে হয়।

"দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব ব্যজ্যতে।
যতস্তু প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কথ্যতে॥"

অপ্রাকৃত জগতের হেয় প্রতিফলন আমাদের এই প্রাকৃত জগৎ। ইহাতে রাগ বা আসক্তির দৃষ্টান্ত অবিরল। এই তত্ত্বগুলি কেবল অনুস্বার বিসর্গ কণ্টকিত পুঁথির বাঁধা গদ নহে। ইহার একটী জীবন্ত উদাহরণ ঐতিহাসিক চৈতন্য যুগের প্রধান গ্রন্থ (চৈতন্য চরিতামৃত) হইতে উদ্ধৃত হইল। এই গ্রন্থের অন্ত্যলীলার ৪র্থ পরিচ্ছেদে দৃষ্ট হয়, একদা জ্যৈষ্ঠের প্রখর রৌদ্রে শ্রীচৈতন্য একদিন জনৈক ভক্তগৃহে ভিক্ষা গ্রহণকালে প্রিয়ভক্ত সনাতনকে তথায় আহ্বান করিয়াছিলেন। প্রভুর সদয় আহ্বান জনিত আনন্দে বিহ্বল সনাতন সেই নিদাঘ মধ্যাহ্নে সমুদ্রকূলের রৌদ্রতপ্ত বালুর পথ দিয়া আসায়, তাঁহার পদতলে ফোস্কা পড়িলেও তিনি উহার অনুমাত্র টের পান নাই—

"প্রভু বোলাঞাছে এই আনন্দিত মনে।
তপ্তবালুকাতে পা পোড়ে তাহা না জানে॥"

ভিক্ষাবসানে অন্তর্যামী মহাপ্রভু অন্তরঙ্গ ভক্ত সনাতনকে যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, সিংহ-দ্বারের পথ দিয়া না আসিয়া তপ্ত বালুর উপর দিয়া আমার নিকট আসায় তোমার পায়ে ব্রণ (ফোস্কা) হইয়াছে। এজন্য তোমার পায়ে সমধিক যাতনা হইতেছে। তুমি কেন এরূপ বৃথা ক্লেশভোগ করিতেছ ?

সনাতন উত্তর দিলেন—

"সনাতন কহে দুঃখ বহু না পাইল।
পায়ে ব্রণ হঞাছে তাহা না জানিল॥" চৈ চঃ।

বলা বাহুল্য, এই সনাতনই একদিন গৌড়বাদ্-শাহের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ মন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু তিনি স্পর্শমণির দুর্ল্লভ স্পর্শলাভে এখন কষিত কাঞ্চন। দুঃখের বিষয়, ভারতে আর সেদিন নাই। "তে হি নো দিবসাঃ গতাঃ।" অন্তর্দর্শী মহাকবি ভবভূতির ভবিষ্যদ্বাণী আজ বর্ণে বর্ণে সত্য। মহর্ষি শাণ্ডিল্য প্রোক্ত ভক্তির লক্ষণে এই রাগের কথাই বলা হইয়াছে। এই মনোহর তথ্যটীর আরও সুন্দর ব্যাখ্যা আমরা ঐ চরিতামৃতের অন্ত্যলীলার

বিংশ পরিচ্ছেদে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীকৃষ্ণবিরহ স্ফূর্ত্তিজনিত প্রলাপের মধুর স্বরে শুনিতে পাই,

"না গণি আপন দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ,
তাঁর সুখে আমার তাৎপর্য্য ;
মোরে যদি দিলে দুঃখ, তাঁর হয় মহাসুখ,
সেই সুখে মোর সুখবর্য্য।"

শ্রেষ্ঠ ভক্তের ভক্তি-সাধনায় এই উচ্চতর ভাবের নাম রাগ। আলোচ্য সূত্রে রক্তি (রাগ) কথাটীর পূর্ব্বে অনু শব্দটী বিশেষণ আছে। উহার অর্থ পশ্চাৎ অর্থাৎ রাগের পরবর্ত্তী অবস্থা। ঐ অবস্থাটীর নাম অনুরাগ। "উজ্জ্বল নীলমণি" গ্রন্থে অনুরাগের লক্ষণটী যেমন মধুর তেমনি সমুজ্জ্বল। যথা—

"সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নবনবং প্রিয়ম্।
রাগো ভবন্নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীরিতঃ॥"

চরিতামৃতের টীকা হইতে ইহার সুন্দর ব্যাখ্যাটী উদ্ধৃত হইল ;—"অনুরাগো নাম সদানুভূয়মানেঽপি বস্তুনি অপূর্ব্বতয়া অননুভূতত্বভাণসম্পর্কঃ প্রেম্নঃ পাকরূপ ভাববিশেষঃ, স চ প্রতিক্ষণং বর্দ্ধতে এবেতি।" অর্থাৎ সদা সর্ব্বদা অনুভূয়মান বস্তুতে, পূর্ব্বে কখনও ঐ বস্তু অনুভূত হয় নাই, এই প্রকার প্রতীতির জনক প্রেমের পরিপাকরূপ ভাববিশেষের নাম অনুরাগ। এই অনুরাগ নিমেষে নিমেষে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অনুরাগী ভক্ত কবি বিদ্যাপতি ইহারই ব্যাখ্যায় গাহিয়াছেন—

"সেই পিরীতি অনু রাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়।
জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সেই মধুর বোল শ্রবণহি শুননু
শ্রুতি পথে পরশ না গেল।" ইত্যাদি,

অনুরাগের ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ব্যাখ্যা লেখকের অজ্ঞাত। সূত্রের শেষ কথাটী ঈশ্বরে অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মে। তাহা হইলে সগুণ ব্রহ্মে পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত অনুরাগই ভক্তি, ইহাই সূত্রটীর ফলিতার্থ। লেখা বাহুল্য, সগুণ ব্রহ্মই ভক্তির উপাস্য। সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বাদ দিয়া ভক্তির আলোচনা প্রাণহীন দেহের সৌন্দর্য্য বর্ণনার আড়ম্বর তুল্য। ঈশ্বর শব্দে বিষয়ে সপ্তমী। উহার অন্বিতার্থ ঈশ্বর-বিষয়িণী অনুরক্তি ভক্তি। ঋষি শাণ্ডিল্য জীবের পরম কল্যাণকামী হইয়া ভক্তিসূত্র লিখিয়াছেন। ঐ সূত্রে তিনি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছেন, 'ভ্রান্ত জীব তোমার সহজাত অনুরাগ স্ত্রী পুত্র বিষয়-বৈভবাদিতে ন্যস্ত করিয়া ঐ সকল নশ্বর বস্তুর অবশ্যম্ভাবী অভাবে তুমি দুঃখের নিদারুণ অঘাতে একেবারে জর্জ্জরিত হইতেছ। ঐ সকল ক্ষণিক বৈষয়িক সুখের যিনি অফুরন্ত খনি, সেই শ্রীভগবানের প্রতি তোমার অনুরক্তি বা স্বাভাবিক আসক্তির মোড় ফিরাইয়া দাও, দেখিবে, তোমার অন্তর্নিহিত ভগবৎ প্রেম স্বার্থকে পরার্থে ও ভগবদর্থে, অভিমানকে দৈন্যে, অহমিকাকে পরকীয়তায়, প্রভুত্বকে দাসত্বে, এবং ক্ষুদ্র আমিকে বৃহত্তম আমির সেবায় নিযুক্ত করিবে। তখন তুমি নর্দ্দামার জল গঙ্গাজলে মিশিয়া জীবরূপ শিবের পরম সেবক হইবে।' ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদ, ব্যাখ্যাত শাণ্ডিল্য সূত্রের ভাবের ভাষায় শ্রীভগবানকে বিষয়ী জীব কি ভাবে ভক্তির প্রার্থনা করিবে, তাহা বেশ স্পষ্ট আভাসে শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার প্রার্থনার ভঙ্গী, "হে ভগবন্! মায়ামুগ্ধ বিষয়িগণের বিষয়ের প্রতি যে ঘোরতর আসক্তি সর্ব্ববিষয়ের মূলাধার সর্ব্বদা তোমাকে স্মরণকালে আমার হৃদয় হইতে যেন তুজ্জাতীয় আসক্তি (প্রীতি) কদাপি অন্তর্হিত না হয়।"

"যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥ বিঃ পুঃ।

ভগবান্ ব্যাসদেব ভক্তরাজ প্রহ্লাদের মুখে ভক্তির প্রার্থনাটী এই ভাবে সন্নিবেশিত করিয়া জীবমাত্রকেই উহাদের সহজজাত আসক্তিটি শ্রীভাগবৎপাদপদ্মে

অর্পণমূলক ভজনের সহজ পথটির অনুসন্ধান দিয়াছেন। কেন না, ভক্তির সাধন ভক্তি এবং ভক্তিই ভক্তির ফল। উত্তম অর্থাৎ নিষ্কাম ভক্ত ভক্তির ফলে ধন, জন, স্বর্গ এমন কি মুক্তি পর্য্যন্ত কামনা করেন না। তাঁহাদের সাধনা যেমন ভক্তি উহাদের ফলও তেমনি ভজনানন্দ। কি কর্ম্মী, কি জ্ঞানী, কি ভক্ত ইঁহাদের সকলেরই চরম লক্ষ্য পরমানন্দ। বৈষয়িক আনন্দের বিষয়গত তারতম্য ভেদ থাকিলেও অদ্বয় পরতত্ত্বরূপ পরমানন্দ বা সচ্চিদানন্দ ভগবানের আনন্দস্বরূপ উপলব্ধিতে পনর আনা কিংবা ষোল আনা পার্থক্য আছে কি না, উহা অজ্ঞানী ও অভক্ত লেখক বুঝিতে অক্ষম। দর্শনশাস্ত্রে আমরা ভক্তির ও মুক্তির সাধনা তত্ত্বজ্ঞানের প্রায় একরূপই ফলশ্রুতি দেখি। মহর্ষি শাণ্ডিল্য উদ্ধৃত সূত্রের ঠিক পরবর্ত্তী সূত্রে "তৎসংস্থস্যামৃতত্বোপদেশাৎ ।২। লিখিয়া 'ভগবানে যিনি একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করেন, তিনি অমৃতত্ব লাভ করেন বলিয়াছেন। ভগবানকে ভক্তি করিলে বা মনঃপ্রাণ দেহ গেহ সর্ব্বস্ব দিয়া ভালবাসিলে সাধক-ভক্ত ভগবানের সহিত একাত্ম হইয়া যান, অথবা নিজে অমরত্ব লাভ করেন। ভগবানের ভজন অর্থে ভক্তের হৃদয়ে ভগবত্তত্ত্বকে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা করা এবং ভগবানকে একান্ত আপনার জন করিয়া লওয়া; অন্য কথায় নিজের মধ্যে দেবত্বের ভাব উন্মেষিত করা। এজন্য "দেবতা হইয়া দেবতার পূজা করিবে।" "দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ," এই কথা চির প্রচলিত। ইহার অর্থ সাধক বা ভক্ত যখন সাধনায় কিংবা ভজনে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহার অবস্থা দেখিলেই সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। বস্তুতঃ পশুমূলক ভোগপ্রবৃত্তি লইয়া পূজা বা ভজনা করা পূজা ও ভক্তির প্রহসন মাত্র। এই সূত্রে শাণ্ডিল্য যেমন ভক্তির ফল অমৃতত্ব লাভ বলিয়াছেন, বেদান্ত-দর্শনের ১ম পাদ, ৭ম সূত্রেও তেমনি "তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ।" জ্ঞানী ও ব্রহ্মনিষ্ঠ মোক্ষ লাভ করেন, বলা হইয়াছে। সুতরাং জ্ঞান ও ভক্তির একই ফল অমৃতত্ব লাভ ঐ উভয় সূত্রেরই মূল তাৎপর্য্য। পরবর্ত্তী কালে আর্য্যের স্থানে হিন্দুর ন্যায় অমৃতত্ব স্থলে মোক্ষ বা মুক্তি শব্দের প্রচলন ঘটায় জ্ঞানী ও ভক্তের ভিতর তথাকথিত দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রাচীন ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষদে আমরা "অমৃতত্বং ফলমুপদিশ্যতে।" ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতি।" এইরূপ অমৃতত্ব শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখি। বলিতে কি, যাস্ককৃত অতি প্রামাণিক নিরুক্ত গ্রন্থে মোক্ষ বা মুক্তির স্থান হয় নাই। উহাতে অমৃত শব্দটাই ধৃত হইয়াছে। প্রদর্শিত স্থলসকলে অমৃতত্ব শব্দের অর্থ সাধারণ দেবত্ব নহে। কারণ দেবতারা অমর নহেন, কল্পান্তে উঁহাদের ধ্বংস হইয়া থাকে। শ্রুতিতে দেবতাদেরও মোক্ষাধিকার অর্থাৎ মুক্তির জন্য তত্ত্বজ্ঞান অভ্যাস করার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। উদ্ধৃত সূত্রদ্বয়ে প্রযুক্ত অমৃতত্ব লাভের অর্থ সাধকের সাধনার পরিপাকে শাশ্বত পরমানন্দে অবস্থিতি। এই পরমানন্দই জ্ঞানী ও ভক্ত, এক কথায় জীবমাত্রেরই একমাত্র কাম্য।

এখন দেবর্ষি নারদের সূত্রের কথা। প্রস্তাবের অপরিহার্য্য অঙ্গহিসাবে ঐ সূত্রের সংক্ষেপে যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ দিয়া বক্তব্য শেষ করিতেছি। দেবর্ষির সূত্রটী "ওঁ সা কস্মৈ পরমপ্রেমরূপা। ২। ভগবানে পরম প্রেমই ভক্তি। ঋষি শাণ্ডিল্য যে স্থলে "পরা অনুরক্তি" লিখিয়াছেন, মহর্ষি নারদ সে স্থলে "পরম প্রেম" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। ঐ দুইটী শব্দের যেমন বাহ্য আকার ভেদ আছে, ভক্তিশাস্ত্রে উহাদের অর্থের প্রকারেরও তেমনি কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। ভক্তির পূজ্যপাদ আচার্য্যদিগের সাধনা-লব্ধ অনুভূতিতে প্রেম বস্তুটী রাগ, অনুরাগ, ভাব, এমন কি মহাভাবের উপরেও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহাদের মতে আলোচ্য ভক্তির সাধন, ভাব ও

প্রেম পর পর উৎকর্ষ প্রাপ্ত তিনটি অবস্থা আছে।

"সা ভক্তিঃ সাধনং ভাবঃ প্রেমা চেতিনিগদ্যতে।"

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে অনুদিত সূর্য্য, অরুণোদয়ে অস্পষ্ট কিরণ সম্পাত এবং প্রভাতে সৌরলোক বিচ্ছুরণের সহিত সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তির তুলনা করা হয়। ইহাদের পরিচয়স্থলে বিজ্ঞ চরিতামৃতকার লিখিয়াছেন,—

"সেই ভাব গাঢ় হলে ধরে প্রেমনাম।
সেই প্রেম প্রয়োজন সর্ব্বানন্দ ধাম॥"

সাধকের এই ব্যাখ্যায় প্রেমকে সর্ব্বানন্দধাম অর্থাৎ প্রকারান্তরে ভগবানের স্বরূপ বলা হইয়াছে। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন পাশ্চাত্য মহাকবিও প্রেম ও প্রেমের ভগবানকে অভিন্নই বলিয়াছেন। 'Love is God and God is love" এই প্রবন্ধে এই কথাটী বহুস্থলে বহুভাবে পুনরুক্ত হইয়াছে। ভগবান যেমন, "অবাঙ্মনসগোচর" বিধায় অনির্ব্বচনীয়, তাঁহার স্বরূপবৃত্তি প্রেমও তেমনি অনির্ব্বাচ্য। আদি বিদ্বান্ কপিল যেমন তাঁর আদি দর্শন সাংখ্যে "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" লিখিয়া ভগবানকে প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদি প্রমাণের অগোচর বলিয়াছেন, দেবর্ষি নারদও ঠিক তেমনি ঈশ্বরের মানসী প্রতিমা প্রেমকে "অনির্ব্বচনীয় প্রেমস্বরূপ" বলিয়াছেন। ঐ কথা শুনিয়া পাছে কেহ দেবর্ষির দুর্ব্বলতা কিম্বা অক্ষমতা বুঝিয়া হাসেন, তজ্জন্য তিনি প্রেম প্রেমিকের স্বসংবেদ্য বা নিজ অনুভূতি গ্রাহ্য, প্রেম আকাশকুসুম বা শশশৃঙ্গ নহে, ইহা বুঝাইবার জন্য একটী অকাট্য দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, প্রেম অভাব পদার্থ নহে। উহা মূকজনের মিষ্টান্ন ভোজন জন্য আনন্দ প্রকাশের সদৃশ। 'মূকাস্বাদনবৎ'। ৫৩। দেবর্ষির অনুগত হইয়া আমরাও বলিতে পারি, আমাদের নিজ নিজ শিশুরা শৈশবে সুন্দর সুন্দর বস্তু দেখিয়া—এমন কি "চুষিকাঠি" পর্য্যন্ত বার বার চুষিয়া আনন্দে যে হাত পা নাড়ে, ঐ আনন্দ কি আমরা বুঝিতে পারি না? প্রেম অতি সত্য বস্তু হইলেও উহা হাটে বাজারে বিকায় না। বঙ্গমাতার প্রিয় সন্তান অশ্বিনীকুমার এই প্রেমকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার অমর গ্রন্থ "ভক্তিযোগে" লিখিয়াছেন,—

"হৃদয়ের অন্তস্তলে, যে মাণিক গোপনে জ্বলে,
সে মাণিক কখনও কি বাজারে বিকায়?"

শ্রীভগবানের স্বয়ং উক্তি যেমন 'বহু বহু জন্মের সাধনার ফলে জীব কোনও এক জন্মে আমাকে লাভ করে।' তেমনি এই সুদুর্লভ ভগবৎ প্রেম ও কদাচিৎ দু একটী সুপাত্রে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। "প্রকাশ্যতে ক্বাপি পাত্রে।" ৫৩। সূত্রস্থিত "প্রকাশ্যতে" ক্রিয়াটী কর্ম্মকর্ত্তৃবাচ্যে নিষ্পন্ন। উহার অর্থ প্রেম স্বপ্রকাশ অর্থাৎ সূর্য্যের আলোকে আমরা বিশ্বপ্রপঞ্চ দেখিতে পাই কিন্তু স্বপ্রকাশ সূর্য্যকে দেখিতে হইলে, সেই সূর্য্যেরই আলোকের সাহায্যে দেখি। তেমনি যে প্রেমের অদৃশ্য ও অপরিমেয় শক্তিতে অতীন্দ্রিয় অণু হইতে বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ড সজীব ও ক্রিয়াশীল, সেই স্বপ্রকাশ প্রেম কেবল কঠোর প্রেমের সাধনেই উপলব্ধ হয়। প্রেমেই আমাদের উৎপত্তি, প্রেমেই আমাদের স্থিতি ও পুষ্টি এবং অন্তে প্রেমই আমাদের পরমাগতি। প্রেম আমাদের স্বতঃসিদ্ধ ও সহজাত বলিয়া যত সুলভ, উহা প্রকৃত অনুশীলনের অভাবে ততোধিক দুর্লভ। দেবর্ষি নারদ মহতের সঙ্গই এই প্রেম লাভের মুখ্য উপায় বলিয়াছেন—

"মুখ্যতস্তু মহৎকৃপয়ৈব।"

পঞ্চদশী

অনুবাদক পণ্ডিত শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়

'ব্যাঘাত' দোষ হইতে আরম্ভ করিয়া 'অনবস্থা' পর্য্যন্ত এই দোষগুলি যে কেবল এই বিকল্প সম্বন্ধেই খাটে, এরূপ নহে, এগুলি গুণক্রিয়া প্রভৃতি সমস্ত অনাত্মবস্তু সম্বন্ধেই খাটে। ঐরূপ বিকল্প করিলেই তাহা বুঝা যাইবে। এই কথাই বলিতেছেন :—(সিদ্ধান্তীর সদুত্তর)

ইদং গুণক্রিয়াজাতিদ্রব্যসম্বন্ধবস্তুষু।
সমস্তেন স্বরূপস্য সর্ব্বমেতদিতীষ্যতাম্ ॥৫১

অন্বয়—ইদম্ গুণক্রিয়াজাতিদ্রব্যসম্বন্ধবস্তুষু সমম্। তেন এতৎ সর্ব্বম্ স্বরূপস্য ইতি ইষ্যতাম্।

অনুবাদ—এইরূপ আপত্তি, গুণ, ক্রিয়া, জাতি, দ্রব্য ও সম্বন্ধ বিশিষ্ট সকল বস্তুর পক্ষেই সমান। এইহেতু গুণ প্রভৃতি আপন আপন আশ্রয়—গুণী-প্রভৃতি বস্তুদ্বারা উপহিত চেতনের স্বরূপে বিদ্যমান, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তাহারই লক্ষ্যত্ব, বিকল্প, গুণ, ক্রিয়া ইত্যাদি স্বীকার কর।

টীকা—"ইদম্"—বিকল্প সম্বন্ধে যে এই 'ব্যাঘাত', 'আত্মাশ্রয়' প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া 'অনবস্থা' পর্য্যন্ত দোষগুলি দেখান হইল, সেইগুলি "গুণক্রিয়া জাতিদ্রব্যসম্বন্ধবস্তুষু সমম্"—গুণ, ক্রিয়া, জাতি, দ্রব্য ও সম্বন্ধ, এই পাঁচ বস্তুসম্বন্ধেও তুল্যরূপে খাটে। কেন না দেখ, গুণ কি নির্গুণে বিদ্যমান অথবা সগুণে? ক্রিয়া কি ক্রিয়ারহিতে বিদ্যমান অথবা ক্রিয়াসহিতে বিদ্যমান?

প্রথম পক্ষে ব্যাঘাত দোষ ঘটে, এবং দ্বিতীয় পক্ষে আত্মাশ্রয়াদি চারিটি দোষ ঘটে; তাহা পূর্ব্বের ন্যায় বিচার করিলেই বুঝা যাইবে। এইরূপে জাতি প্রভৃতি সম্বন্ধেও বুঝিয়া লইতে হইবে।

ভাল, বুঝিলাম পূর্ব্বোক্তরূপ প্রশ্নের উত্তরে ঐরূপ পুনঃপ্রশ্ন করিয়া অসৎ উত্তর দেওয়া যাইতে পারে; তাহা হইলে সদুত্তর কি? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া সিদ্ধান্তী সদুত্তর দিতেছেন :—

"তেন"—সেইহেতু অর্থাৎ উক্তরূপে বিকল্প করিয়া প্রশ্ন করিলে, গুণাদি কিছুই ঠিক না কিন্তু ব্যবহারে প্রতীত হয়, এই কারণে, "এতৎ সর্ব্বং স্বরূপস্য ইতি ইষ্যতাম্"—এই গুণাদি সমস্ত ধর্ম্মই আপন আপন আশ্রয় গুণী প্রভৃতি বস্তুদ্বারা উপহিত চেতনের স্বরূপে কল্পিত তাদাত্ম্যসম্বন্ধ দ্বারা বিদ্যমান, এইরূপ মানিয়া লও। ইহাই অভিপ্রায়। ৫১

ভাল, অন্যস্থলে অর্থাৎ অনাত্মবিষয়ে এইরূপ হইতে পারে, কিন্তু প্রসঙ্গাধীন বিষয়ে অর্থাৎ আত্মস্বরূপে কি পাওয়া গেল? তাহাই বলিতেছেন :—

(মহাবাক্যসূচিত অভেদের অনুসন্ধান সমর্থন ও তত্ত্বপলব্ধির অর্থাৎ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের লক্ষণ।)

বিকল্পতদভাবাভ্যামসংস্পৃষ্টাত্মবস্তুনি।
বিকল্পিতত্বলক্ষ্যত্বসম্বন্ধাদ্যাস্তু কল্পিতাঃ ॥৫২

অন্বয়—বিকল্পতদভাবাভ্যাম্ অসংস্পৃষ্টাত্মবস্তুনি বিকল্পিতত্বলক্ষ্যত্বসম্বন্ধাদ্যাঃ তু কল্পিতাঃ।

অনুবাদ—আত্মবস্তু অর্থাৎ জীবাত্মা হইতে অভিন্ন পরমাত্ম বস্তু, বিকল্প ও বিকল্পাভাব উভয়েরই সংস্পর্শরহিত। তাঁহাতে যে বিকল্পিতত্ব অর্থাৎ বাদিকর্ত্তৃক উত্থাপিত পূর্ব্বোক্তরূপ মতদ্বৈধের বিষয় হওয়া, লক্ষ্যত্ব, অর্থাৎ শব্দের লক্ষণাবৃত্তিদ্বারা জ্ঞাপিত হইবার যোগ্যতা এবং 'সংযোগা'দি সম্বন্ধ সকলই কল্পিত।

টীকা—"বিকল্পতদভাবাভ্যাম্"—বিকল্পের ও বিকল্পাভাব এই উভয়ের দ্বারা, "অসংস্পৃষ্টাত্মবস্তুনি"—সংস্পর্শরহিত (জীবাত্মা হইতে অভিন্ন) পরমাত্মবস্তুতে, "বিকল্পিতত্বলক্ষ্যত্বসম্বন্ধাদ্যাঃ"—'বিকল্পিতত্ব'—বিকল্প, নির্ব্বিকল্পে বিদ্যমান, অথবা

সবিকল্পে বিদ্যমান ? গুণ, নির্গুণে বিদ্যমান অথবা সগুণে বিদ্যমান ? ইত্যাদিরূপ পূর্ব্বকথিতপ্রকারে বাদিকর্ত্তৃক উত্থাপিত মতদ্বৈধের বিষয় হওয়া, 'লক্ষ্যত্ব'—শব্দের লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা জ্ঞাপিত হইবার যোগ্যতা, 'সম্বন্ধ'—'সংযোগ' প্রভৃতিরূপ; 'সম্বন্ধের' লক্ষণ (definition)—'অসাধারণ বা একবৃত্তি ধর্ম্ম' এইরূপ বলিতে হইলে, দুইটি পারিভাষিকশব্দের অর্থ মনে রাখা আবশ্যক ; যথা যাহাতে অন্যবস্তুর সম্বন্ধ থাকে, তাহা সেই সম্বন্ধের 'অনুযোগী' এবং যাহার সম্বন্ধ অন্য বস্তুতে থাকে, তাহা সম্বন্ধের 'প্রতিযোগী' ; প্রতিযোগীর প্রতীতিপূর্ব্বক যাহাদের প্রতীতি হয়, 'সম্বন্ধ' তজ্জাতীয় বস্তু। কিন্তু 'অভাব' ও 'সাদৃশ্য' এই দুইটিরও প্রতীতি প্রতিযোগীর প্রতীতিপূর্ব্বকই হইয়া থাকে ; সেইহেতু সেই দুইটি, 'সম্বন্ধের' সজাতীয় হইল। এই হেতু উক্ত ধর্ম্মটি অসাধারণ বা একবৃত্তি হইল না। সম্বন্ধের উক্ত লক্ষণটিতে দোষ রহিয়া গেল। সেই কারণে সম্বন্ধের লক্ষণ এইরূপ করিলে নির্দ্দোষ হইবে—'অভাব ও সাদৃশ্য হইতে ভিন্ন, যাহা প্রতিযোগীর অপেক্ষাসহিত প্রতীতির বিষয় হয় তাহাকে 'সম্বন্ধ' বলে।' এই লক্ষণটি নির্দ্দোষ হইল ; পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, এই লক্ষণটি লক্ষ্যের একাংশমাত্রে বর্ত্তিল না অর্থাৎ "too narrow" হইল না, অর্থাৎ সকল প্রকার 'সম্বন্ধ'ই এই লক্ষণের অন্তর্ভূত হইয়া গেল, এইহেতু এই লক্ষণে অব্যাপ্তিদোষ ঘটিল না। আবার এ লক্ষণটি লক্ষ্যে বর্ত্তিয়াও অলক্ষ্যে বর্ত্তিল না, "too wide" হইল না অর্থাৎ অভাব, সাদৃশ্য ও সম্বন্ধ এই তিনটিকে ছাড়িয়া, ঘটাদিবস্তুতে বর্ত্তিল না, কেননা ঘটাদির প্রতীতি প্রতিযোগীর প্রতীতি সাপেক্ষ নহে। আবার উক্ত লক্ষণটি লক্ষ্যকে ছাড়িয়া অলক্ষ্যেও বর্ত্তিল না বা 'অসম্ভব' (অর্থাৎ altogether missing the thing) হইল না।

সংযোগ, সমবায়, তাদাত্ম্য প্রভৃতি ভেদে এই 'সম্বন্ধ' অনেকপ্রকার ; (অসম্বদ্ধ) বস্তুদ্বয়ের যে প্রাপ্তি (বা সম্বন্ধ) ; তাহাই 'সংযোগ' সম্বন্ধ বলিয়া কথিত। সেই সংযোগ সম্বন্ধ (১) কর্ম্মজ, (২) সংযোগজ, ও (৩) সহজ—ভেদে তিন প্রকার।

(১) যে সংযোগের উৎপত্তিতে ক্রিয়া অসমবায়ি-কারণ হয় অর্থাৎ সেই সংযোগরূপ কার্য্যের সহিত নিত্যসম্বন্ধ থাকে না, তাহাকে কর্ম্মজসংযোগ বলে। কর্ম্মজ সংযোগ দুই প্রকারের হইয়া থাকে, যথা (ক) অন্যতর কর্ম্মজ ও (খ) উভয়-কর্ম্মজ। দুইটি দ্রব্যই সংযোগের উপাদান কারণরূপ আশ্রয়। (ক) তন্মধ্যে একের ক্রিয়া দ্বারা যখন সংযোগ উৎপন্ন হয়, তখন তাহাকে 'অন্যতরকর্ম্মজ সংযোগ' বলে, যেমন পক্ষীর ক্রিয়া দ্বারা বৃক্ষ ও পক্ষীর সংযোগ।

(খ) যখন উভয় আশ্রয়ের ক্রিয়া দ্বারা সংযোগ উৎপন্ন হয়, তখন তাহা 'উভয় কর্ম্মজ।' যেমন দুই ছাগীর ক্রিয়াদ্বারা দুই ছাগীর সংযোগ।

(২) সংযোগরূপ অসমবায়িকারণ দ্বারা যে সংযোগ উৎপন্ন হয়, তাহা 'সংযোগজ সংযোগ' ; যেমন হাত ও স্তম্ভের সংযোগ দ্বারা উৎপন্ন, শরীর ও স্তম্ভের সংযোগ।

(৩) সংযোগীর জন্মের সহিত যে সংযোগ উৎপন্ন হয় তাহাকে সহজ সংযোগ বলে। যেমন সুবর্ণে পীতত্ব ও গুরুত্বের আশ্রয়, তৈজসভাগের সংযোগ বা পার্থিবভাগের সংযোগ, 'সহজসংযোগ।'

নিত্যসম্বন্ধকে সমবায় সম্বন্ধ বলে। ন্যায়মতে গুণগুণীর সম্বন্ধ, জাতিব্যক্তির সম্বন্ধ, ক্রিয়া ক্রিয়াবানের সম্বন্ধ, উপাদান কারণ ও কার্য্যের সম্বন্ধ, এইগুলি সমবায় সম্বন্ধ। কিন্তু পূর্ব্ব-মীমাংসক ভট্টের মতে ও বেদান্তের মতে এইগুলি তাদাত্ম্যসম্বন্ধ, অর্থাৎ কল্পিতভেদযুক্ত বাস্তব-অভেদসম্বন্ধ। ইহাই বেদান্তমতে তাদাত্ম্য সম্বন্ধের লক্ষণ। মীমাংসক মতে কিঞ্চিৎ ভেদযুক্ত অভেদকে অর্থাৎ ভেদাভেদকে তাদাত্ম্য সম্বন্ধ বলে। বেদান্তমতে এই ভেদাভেদ অনির্ব্বচনীয় অর্থাৎ ইহাকে ভেদও বলা যায় না, যেহেতু সেই সেই স্থলে বাস্তব অভেদ ; আবার অভেদও বলা যায় না কেননা সেই কল্পিত ভেদ লইয়া ব্যবহার চলে।

ন্যায়মতে স্বরূপ সম্বন্ধকে তাদাত্ম্যসম্বন্ধ বলে। এই সংযোগ, সমবায় ও তাদাত্ম্য সম্বন্ধ ব্যতীত আরও অনেক সম্বন্ধ আছে। এই বিকল্পিতত্ব, লক্ষ্যত্ব ও সম্বন্ধ, যাহাদিগের আদ্য বা মুখ্য, সেইগুলি হইতেছে, দ্রব্য, গুণ, জাতি ও ক্রিয়া। "তু কল্পিতাঃ" এইগুলি কল্পিতই, 'তু' শব্দের অর্থ অবধারণ। তন্মধ্যে গুণের আশ্রয়কে দ্রব্য বলে। অথবা সমবায়িকারণকে দ্রব্য বলে।

সংবাদ

রেভাণ্ডের উইলমটের বিবৃতি—

"নিউইয়র্ক টাইমসের" সংবাদদাতা রেভারেণ্ড ফ্রেডারিক এ-উইলমট ভারত হইতে প্রত্যাবর্তনের পূর্ব্বে প্রেস-প্রতিনিধির নিকট নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রদান করেন :—

"ভারত আজ সংস্কৃতিজগতে এক বিরাট আন্দোলনের ভিতর দিয়া চলিয়াছে। বিগত সহস্র বৎসরের মধ্যেও এইরূপ ব্যাপক আন্দোলন দেখা যায় নাই।

"কংগ্রেসের কার্য্য-পদ্ধতি যত বৃহৎ হউক না কেন, সকল আন্দোলনের অন্তরালে ভারতীয় সংস্কৃতি-জগতে যে বিবর্ত্তনের আলোড়ন দেখা দিয়াছে, উহার তুলনায় কংগ্রেসের কার্য্যাবলী বিশাল সমুদ্রবক্ষে ক্ষুদ্র বিচিমালাসদৃশ। ভারতে যে পরিবর্ত্তন ও সংস্কারের সূচনা আমি দেখিয়া যাইতেছি, উহা এত ব্যাপক, এত গভীর যে, তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়।" সামান্য কয়েকটি কথায় সেই আলোড়নের কথা আমি কি বলিব? ইহা বুদ্ধদেবের অহিংস ধর্ম্ম প্রচারের ন্যায় শঙ্করের দর্শনে অদ্বৈতবাদ প্রচারের তুল্য।

"ভারত চলিয়াছে দীর্ঘকালের তন্দ্রা ও জড়তা ভঙ্গের পর বর্ত্তমান যুগের বাস্তবতার দিকে। ভারতের আধ্যাত্মিকতা এই বাস্তবতাকে এক নূতন রূপ দিবে। প্রতিক্রিয়াশীল জগতের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভারত দেখিতেছে তাহার অতীতের সংস্কৃতিসম্পদ কিরূপ বিপদের সম্মুখীন। ভারতের এই জাগরণ ও আত্মোপলব্ধি শুধু ৩৬ কোটি ভারতবাসীর নহে—সমগ্র জগতের ভাবধারাকে বদলাইয়া দিবে। ভারতের সর্ব্বত্র আমি পাইয়াছি এই নবজাগরণের সাড়া এবং এই সম্বিতের মূলে রহিয়াছে স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন—অর্থাৎ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের লব্ধজ্ঞান পাশ্চাত্যের বাস্তবতার সহিত মিলিয়া সমগ্র জগৎকে তৃণের ন্যায় ভাসাইয়া লইয়া যাইবে।

"মহাত্মা গান্ধী ও কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে আমি দেখিয়াছি। ভারতের যে আন্দোলনের কথা আমি বলিলাম, একজন হইতেছেন উহার শক্তি এবং একজন উহার ভাব। পণ্ডিত জহরলালের সহিতও আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে। নবীন ভারতের দেহে তিনি রক্তধারা ও প্রাণশক্তি—প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণ্য-প্রতিভা তাঁহার ভিতরে অটুটরূপে বর্ত্তমান। স্বীয় কষ্টলব্ধ অভিজ্ঞতার ফলে মহাত্মাজীর নীতি ও উপদেশ ভারতের পক্ষে মহামূল্যবান হইলেও আমার মনে হয় পণ্ডিত জহরলালের রাজনীতিজ্ঞান মহাত্মার রাজনীতিজ্ঞান অপেক্ষা গভীর। রবীন্দ্রনাথ নবীন ভারতের সংস্কৃতি জগতে ধ্যানমগ্ন ঋষি বিশেষ। ভারতে দেখিলাম, সাম্রাজ্যবাদের প্রতি প্রাণ-বিরোধ। মাদ্রাজীর ন্যায় যুবকবৃন্দ সোশ্যালিজম্ ভাবাপন্ন হইলেও চরমপন্থী নহেন।

"সর্ব্বত্র আমি হিন্দু মুসলমান পার্শী ও শিখদের সহিত আলাপ করিয়া দেখিয়াছি সকলেই উপলব্ধি করিতেছে যে, বিভিন্ন ধর্ম্ম আর তাহাদের মিলনের পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিতে পারিবে না। প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়ে জাতীয়তার তীব্র বহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ভারতের সবগুলি প্রদেশকে অধিকার করিবার জন্য কংগ্রেস চেষ্টা করিতেছে। আমি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া যাইতেছি—অদূর ভবিষ্যতে দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে ভাঙ্গন ধরিবে। তাহাদের পূর্ব্বাহ্নেই এজন্য প্রস্তুত হইয়া থাকা উচিত।"

পুস্তক ও ছায়াচিত্রের সাহায্যে ভারতের বিরুদ্ধে যে প্রচার-কার্য্য বিদেশে চলিয়াছে তৎসম্পর্কে মিঃ উইলমট বলেন, "যাহা দেখিলাম তাহাতে মনে হয় দারিদ্র্য এবং অজ্ঞতাই ভারতের বিরুদ্ধে এই প্রকার প্রচারের সহায়ক। দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা দূর হইলে বিরুদ্ধ প্রচারের আর কোন সুযোগ থাকিবে না। ভারতের সমস্যা সম্পর্কে কংগ্রেস সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অবহিত এবং সামান্য সুযোগ পাইলেও কংগ্রেস যাহা করিতে পারে তাহা দেখিয়া ভারতবাসীর কর্ম্ম ক্ষমতায় জগৎ বিস্মিত হইবে। কলিকাতায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে আমি উপস্থিত ছিলাম। সেখানে নেতৃবৃন্দের ঐকান্তিকতার প্রকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত আমি দেখিয়াছি।

"নবীন ভারতের উজ্জ্বল আশা বক্ষে লইয়া আমি ভারত হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছি। ভারতে যাহা দেখিলাম, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে সে কথা যাইয়া আমি বলিব। যুক্তরাষ্ট্র ভারতের অন্তরঙ্গ বন্ধু, কারণ স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের

আধ্যাত্মিকতায় এক নূতন আলোক দিয়া গিয়াছেন। ভারতের জাতীয় জীবনে যে নূতন আলোকের ছটা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাতে বাস্তবতার সন্ধান আমরা দিয়াছি।

"ভারতের সংস্কৃতি আন্দোলন আমেরিকার নদীতে আটক কাষ্ঠস্তূপের ন্যায়। সেখানে শীতের সময় গাছ কাটিয়া নদীতে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। মাঝপথে আসিয়া একখানি কাঠ আটকাইয়া গেলে পেছনের সমস্ত কাঠ সেখানে আটকাইয়া যায়। তারপর কোন ব্যক্তি হয়তো সেই কাঠের স্তূপগুলিকে ডিনামাইটের সাহায্যে ছড়াইয়া দেয় এবং বিপুল বেগে সমস্ত কাঠ তখন নদীতে গিয়া পড়ে। ভারতের সংস্কৃতিও তদ্রূপ সহস্র সহস্র বৎসরের ব্যবধানে অচল ও স্তূপীকৃত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। একজন পরমহংসদেব ও স্বামী বিবেকানন্দ সেই অচল অবস্থাকে দেখিলেন এবং তৎপর গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ আসিলেন নিজেদের জীবন বিপন্ন করিয়া সেই জড়িত সংস্কৃতির স্তূপে আগুণ ধরাইয়া দিতে। সেই অগ্নি-সংযোগের ফলে ভারতে আরম্ভ হইয়াছে সংস্কৃতির নূতন প্রবাহ। এই সংস্কৃতি-প্রবাহে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু সমস্ত প্রতিবন্ধক দূর করিয়া রাখিতেছেন।"

রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, কনখল

সেক্রেটারী স্বামী অসীমানন্দ নিম্নলিখিত আবেদন প্রচার করিয়াছেন :—

কনখলের সেবাশ্রম রামকৃষ্ণ মিশনের একটি শাখা প্রতিষ্ঠান। হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভ মেলা উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে যে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হইবে, তাহাতে এই সেবাশ্রমকে অনেক দায়িত্ব স্কন্ধে লইতে হইবে। সকলেই জানেন যে, সময়মত ব্যবস্থা অবলম্বন করা না হইলে এই সময় নানা প্রকার সংক্রামক ব্যাধি দেখা দিতে পারে। সুতরাং জনসাধারণকে ইহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য সাহায্য করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

আমরা মেলার সময়ের জন্য সেবাকার্য্যের নিম্নলিখিত কার্য্যক্রম গ্রহণ করিতে চাই :—(১) কনখল সেবাশ্রমকে প্রধান কেন্দ্র করিয়া মেলার বিভিন্নস্থানে শাখা কেন্দ্র খোলা হইবে। ঐ সকল কেন্দ্র হইতে যাত্রীদিগকে ডাক্তারী সাহায্য দেওয়া হইবে। (২) কনখলের সেবাশ্রমে একটি ভ্রাম্যমান সেবাবিভাগ থাকিবে। উহার ডাক্তার ও কর্ম্মীরা প্রত্যেক শাখাকেন্দ্রে ভ্রমণ করিবে এবং যে সকল রোগীকে স্থানান্তরিত করা সম্ভব নয়, তাহাদের সেবা করিবে। (৩) অবৈতনিক ডাক্তার ও কর্ম্মী এবং যাহাদের থাকিবার কোন স্থান নাই, তাহাদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এই কার্য্যক্রম অনুসরণের জন্য অন্ততঃপক্ষে নগদ ৫ হাজার টাকা, প্রচুর পরিমাণে ঔষধপত্র, কাপড় জামা, খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতি আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত ১০জন অবৈতনিক মেডিক্যাল অফিসার, ৫জন কম্পাউণ্ডার এবং বহু কর্ম্মীর প্রয়োজন হইবে। আশা করি, জনসাধারণ এই ব্যাপারে পূর্ণ সাহায্য ও সহযোগিতা করিবেন। যাঁহারা বিনাবেতনে সেবাশ্রমের অধীনে মেলায় কাজ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা তাঁহাদের যোগ্যতা এবং বয়স জানাইয়া সম্পাদকের নিকট আবেদন করিবেন।

কুম্ভ-স্নানের তারিখ :—

১ম স্নান—১৬ই ফাল্গুন, ইং ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮ খৃঃ, (শিবচতুর্দ্দশী)।
২য় স্নান—১৭ই চৈত্র, ইং ৩১শে মার্চ্চ।
৩য় স্নান—৩০শে চৈত্র, ইং ১৩ই এপ্রিল, (প্রধান স্নান)।

বেদান্ত সোসাইটি, স্যান্‌ফ্রান্‌সিসকো

—গত ডিসেম্বর মাসে অধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দ সেঞ্চুরী ক্লাব ও বেদান্ত সোসাইটিতে নিম্নোক্ত বক্তৃতা দান করিয়াছেন :—"আধ্যাত্মিক সাধনার বিশিষ্ট জ্ঞান," 'কোথা হইতে, কেন, কোন স্থানে ?" "সন্ন্যাসীর জীবনের মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্য্য," "স্বর্গীয় মিলন ও সমাধি," "ভাবপ্রবণতার বিজ্ঞান", "মৃতব্যক্তিগণ কোথায় ?" "দৈব অবতার রহস্য," "যিশুর পবিত্র চরিত্র।"

এতদ্ব্যতীত প্রতি শুক্রবার বেদান্ত সোসাইটি হলে সমাগত ভক্তগণকে তিনি ধ্যানধারণাদি ও বেদান্ত-তত্ত্বসাধন সম্বন্ধে শিক্ষাদান করিয়াছেন।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন, ভুবনেশ্বর

—রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ কর্ত্তৃক এই মঠ ১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার ১৯৩৫-৩৬ সালের সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে :—

১৯৩৬ সালে সমগ্র উড়িষ্যা প্রদেশে ব্যাপকভাবে

ও বিপুল সমারোহে শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মঠের সন্ন্যাসিগণ উক্ত উৎসবগুলিতে প্রায় সর্ব্বত্রই যোগদান করিয়াছেন এবং নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের জন্মোৎসব প্রতি বৎসর বিশেষ সমারোহের সহিত মঠে সম্পন্ন হয়। ইহাতে স্থানীয় অধিবাসিগণ সানন্দে যোগদান করিয়া উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত করেন। এই উপলক্ষে কয়েক সহস্র দরিদ্রনারায়ণকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করান হয়।

মঠ কর্ত্তৃক একটি ফ্রি প্রাইমারী স্কুল পরিচালিত হইতেছে। ইহাতে স্থানীয় দরিদ্র ছাত্রগণ অধ্যয়ন করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন স্কুলের কয়েকটি দরিদ্র ছাত্রকে পুস্তক অর্থ প্রভৃতি দ্বারা সাহায্য করা হইয়াছে।

ভুবনেশ্বর মঠের প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই মঠ কর্ত্তৃক একটি দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালিত হইতেছে। প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র তীর্থযাত্রী ও স্বাস্থ্যান্বেষী ভুবনেশ্বর গমন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের ও দরিদ্র অধিবাসিগণের মধ্যে এই চিকিৎসালয়ের প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক অনুভূত হয়। ১৯৩৫ ও ১৯৩৬ সালে চিকিৎসালয়ে মোট রোগীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩৩৫২৯ ও ৩৫৫২৪। দৈনিক গড়পড়তা যথাক্রমে ৯২ ও ৯৭। নিঃস্ব রোগীদিগকে ঔষধ ও চিকিৎসা ভিন্ন পথ্য কাপড় ও আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি দ্বারা সাহায্য করা হইয়াছে।

পূর্ব্ব বৎসরের উদ্বৃত্ত ৪৬৫৮৶০ সহ চিকিৎসালয়ের এই দুই বৎসরের মোট আয় ১২৮৬॥৶০ এবং মোট ব্যয় ৭৮৯।৶৩ পাই।

স্বামী অখিলানন্দ—রামকৃষ্ণ মিশনের আমেরিকার প্রভিডেন্স বেদান্ত সমিতির অধ্যক্ষ স্বামী অখিলানন্দ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া গত ৪ঠা ডিসেম্বর বেলুড় মঠ হইতে ঢাকা অভিমুখে যাত্রা করেন। ৫ই অপরাহ্ণে নারায়ণগঞ্জ রামকৃষ্ণ আশ্রমে নারায়ণগঞ্জবাসী জনসাধারণের পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দন দেওয়া হয়। প্রত্যুত্তরে তিনি একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন এবং জনসাধারণের আগ্রহাতিশয্যে ৬ই তারিখ অপরাহ্ণেও আশ্রম-প্রাঙ্গণে ইংরেজীতে একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন। সন্ধ্যায় মোটরযোগে তিনি ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনে উপনীত হন। তথায় সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় স্থানীয় ভক্তগণের নিকট নানা বিষয়ে ধর্ম্মালোচনা হয়। ৭ই ডিসেম্বর হইতে পূর্ব্ব ব্যবস্থামত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতা আরম্ভ হয় এবং ১০ই পর্য্যন্ত ধর্ম্ম দর্শন মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা দান করেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয় তিনদিন ও শ্রীযুক্ত জুনাবকর মহাশয় একদিন সভাপতিত্ব করেন। ১১ই তারিখ আশ্রম-প্রাঙ্গণে জনসভায় "আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারের আবশ্যকতা" সম্বন্ধে বাংলায় বক্তৃতা দানের পর ঢাকার মুস্‌লিম হলের কর্ত্তৃপক্ষের আগ্রহাতিশয্যে সন্ধ্যা ৭টা হইতে মুস্‌লিম হলে "ইউরোপ ও আমেরিকায় রামকৃষ্ণ মিশনের কার্য্যাবলী' সম্বন্ধে ইংরেজীতে বক্তৃতা হয়। অধ্যাপক ও ছাত্রগণ ইহাতে সন্তোষ লাভ করিয়া তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

১২ই তারিখে স্বামী অখিলানন্দ ঢাকা হইতে ময়মনসিংহ গমন করেন। বৈকাল ৫ ঘটিকায় সূর্য্যকান্ত টাউন হলে ময়মনসিংহের নাগরিকগণের পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দন দেওয়া হয়। সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন ময়মনসিংহের বিশিষ্ট এডভোকেট ও জমিদার শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র রায় মহাশয়। অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে স্বামীজির সুদীর্ঘ ইংরেজী বক্তৃতা শ্রবণে সমবেত সকলেই বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। তৎপর দিবস স্থানীয় রামকৃষ্ণ আশ্রমে আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। ১৪ই প্রাতে ১০টায় তিনি এবং শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অপর দুইজন সন্ন্যাসী নেত্রকোণায় পৌছেন। বৈকাল ৫ ঘটিকায় জনসাধারণ ও স্থানীয় মিউনিসিপালিটির পক্ষ হইতে পৃথক্‌ভাবে স্বামী অখিলানন্দকে অভিনন্দন দেওয়া হয়। নেত্রকোণায় চন্দ্রনাথ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, নিখিলনাথ বালিকা বিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান হইতেও তাঁহাকে অভিনন্দন দেওয়া হয়। প্রত্যুত্তরে সর্ব্বত্রই তিনি মনোজ্ঞ বক্তৃতা দানে শ্রোতৃবৃন্দের মনোরঞ্জন বিধান করেন। পরদিবস ২০শে তারিখে ময়মনসিংহের অন্যতম প্রধান গ্রাম নওপাড়ায় গমন করেন। সন্ধ্যায় স্বামী অখিলানলন্দ এবং অপর সন্ন্যাসিগণকে সমবেত গ্রামবাসীদের পক্ষ হইতে ও স্থানীয় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় হইতে অভিনন্দন দান করা হয়। ২১শে ডিসেম্বর স্বামী অখিলানন্দ ও সন্ন্যাসিগণ কিশোরগঞ্জ গমন করেন। সন্ধ্যা ৬

ঘটিকায় জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে স্থানীয় কালীবাড়ী-প্রাঙ্গণে প্রায় এক সহস্র বিশিষ্ট লোক একত্রিত হইয়া স্বামী অখিলানন্দকে অভিনন্দন দান করেন। পরদিবস ২২শে প্রাতে তাঁহাদিগকে স্থানীয় নব প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ আশ্রমে লইয়া যাওয়া হয়। তথায় প্রায় ২।৩ শত ভক্ত একত্রিত হইয়া স্বামী অখিলানন্দের সঙ্গে কিছুক্ষণ ধর্ম্মপ্রসঙ্গে অতিবাহিত করেন। কিশোরগঞ্জ হইতে ২২শে রওনা হইয়া স্বামীজিগণ ২৩শে প্রাতে বেলুড় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যার্থী ভবন, গৌরীপুর—গত ১৮ই ডিসেম্বর, রবিবার প্রাতে রায় জলধর সেন বাহাদুর রবি বাসরের সম্পাদক শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সহিত দমদমে অবস্থিত 'রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যার্থী ভবন' পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। আশ্রমের ছাত্রাবাসগুলি, মন্দির, ঝিল, ছাত্রদের স্বহস্তরচিত বাগান ইত্যাদি পরিদর্শনের পর তিনি ছাত্রদিগকে কয়েকটি সারগর্ভ উপদেশ দান করেন।

অতঃপর ছাত্রদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও শ্রদ্ধা নিবেদন করা হইলে বেলা প্রায় ১০॥টার সময় তাঁহারা আশ্রম পরিত্যাগ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, নারায়ণপুর (ত্রিপুরা)—নারায়ণপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে বিগত ৯ই পৌষ, শুক্রবার পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর পঞ্চাশীতিতম জন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। উৎসবে প্রায় সাত শত নরনারী যোগদান করিয়াছিলেন। ষোড়শোপাচারে শ্রীশ্রীমায়ের পূজা ভোগরাগাদি পাঠ ও কীর্ত্তন হইয়াছিল। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় মেয়েদের এক মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল, এবং ইহাতে প্রায় ৫০০ পাঁচশত মহিলা উপস্থিত ছিলেন। খিদিরপুরের শ্রীযুক্তা সরোজবালা দাশ-গুপ্তা মহাশয়া সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। কুমারী অণিমার উদ্বোধন সঙ্গীতের পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সভানেত্রী তাঁহার সুচিন্তিত অভিভাষণে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও উপদেশ সুদীর্ঘ কাল আলোচনা করেন। শ্রীমতী মতিবালা পাল শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীশ্রীমায়ের উপদেশ বাণী সকলের মধ্যে বিতরিত হয়। আশ্রমাধ্যক্ষ শ্রীশ্রীমায়ের উপদেশ ও জীবনী সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলেন এবং সভানেত্রীকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। আশ্রমের যুগ্ম সম্পাদক ডাঃ শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন দাশগুপ্ত ও শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের ঐকান্তিক চেষ্টায় উৎসব সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-কল্পতরু উৎসব—গত ১লা জানুয়ারী, শনিবার শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকুমার নাগ মহাশয়ের গোয়াবাগানস্থিত বাসাবাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কল্পতরু উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা ভোগ ও ভজন সংগীতাদির ব্যবস্থা হইয়াছিল। বহু ভক্ত প্রসাদ লাভে ধন্য হইয়াছেন। অপরাহ্ণে একটি সভায় স্বামী ঘনানন্দ ইংরাজীতে এবং স্বামী সুন্দরানন্দ বাংলায় শ্রীশ্রীঠাকুরের কল্পতরু ভাব ধারণ সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া সকলের মনোরঞ্জন বিধান করেন।

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম, শ্যামবাজার—গত ৯ই পৌষ, শুক্রবার শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ-পূজিতা পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীসারদা দেবীর শুভ জন্মতিথি উৎসব কলিকাতা, শ্যামবাজার, ২৬নং মহারাণী হেমন্তকুমারী ষ্ট্রীটস্থ শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই দিবস অতি প্রত্যুষে ভক্তগণ কর্ত্তৃক মাতৃসঙ্গীত গীত হয়। আশ্রম-সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা দুর্গামাতা আশ্রম-মন্দিরে পূজা পাঠ হোমাদি কৃত্য এবং ৺মায়ের সমাধি মন্দিরে শ্রীযুক্তা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পূজা করেন। শ্রীযুক্তা সুজপা দেবী ও সুমিত্রা দেবী চণ্ডী এবং শ্রীযুক্তা অজিতা দেবী ও সুজাতা দেবী গীতা পাঠ করেন। মণ্ডপগৃহে ৺মায়ের প্রতিকৃতি এবং আশ্রমের উভয় মন্দির বিশেষ সমারোহ সহকারে সজ্জিত করা হয়। মাতৃসঙ্গীত বেলা সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত গীত হইবার পর সুপ্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীযুক্ত কালীপদ পাঠক মহাশয় সঙ্গীতালাপনে শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন। দ্বিপ্রহরে কলিকাতা অনাথাশ্রমের বালকগণ কর্ত্তৃক কালীকীর্ত্তন হয়। অতঃপর চোরবাগানের সঙ্গীতসমাজ কর্ত্তৃক শ্রীরাম-কৃষ্ণ পাঁচালী গীত হয়। বেলা সাড়ে দশটা হইতে আশ্রম ভবনে প্রসাদ বিতরণ আরম্ভ হয়। আশ্রমের এই বাৎসরিক উৎসব কার্য্যে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি যোগদান করেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, আড়ারিয়া

(**পূর্ণিয়া**)—গত ২৪শে ডিসেম্বর, শুক্রবার, ভদ্রমহিলাদিগের প্রচেষ্টায় ভক্তজননী শ্রীশ্রীসারদা দেবীর জন্মোৎসব আরারিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রাতে ৫॥টায় মঙ্গলারতি ও ভজন, বেলা ৯॥টা হইতে ১টা পর্য্যন্ত পূজা হোম ভোগ আরতি, ১॥টা হইতে বেলা ৪॥টা পর্য্যন্ত প্রসাদ বিতরণ ও ৪॥টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত মহিলাসভার অধিবেশন হয়। রচনা-প্রতিযোগিতায় বালিকাগণকে পুরস্কার দেওয়া হয়। সভানেত্রীর বক্তৃতা ও অন্যান্য ভদ্রমহিলাগণের প্রবন্ধাদি পাঠে এই সভাটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী মহাদেবানন্দ জ্ঞান ও ভক্তিমূলক বক্তৃতা প্রদানে সকলের মনোরঞ্জন বিধান করেন। তিনশতাধিক ভদ্রমহিলা দরিদ্রনারায়ণ বালক ও বালিকা প্রসাদ গ্রহণ করেন।

সন্ধ্যা ৬॥টায় আরতি স্তবপাঠ ভজন ও প্রার্থনাদি হইলে উৎসব সমাধা হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বরিশাল—গত ২৪শে হইতে ২৬শে ডিসেম্বর দিবসত্রয় বরিশাল শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তজননী শ্রীশ্রীসারদাদেবীর পঞ্চাশীতিতম জন্মোৎসব সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথম দিবস শুক্রবার পূজা চণ্ডীপাঠ ও হোম হইয়াছিল এবং প্রায় শতাধিক ভক্ত অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বাহ্ণে সমবেত ভক্তগণের সুমধুর মাতৃসঙ্গীতে আশ্রম মুখরিত হয়। সন্ধ্যায় আরাত্রিকের পর ব্রহ্মচারী অমূল্যচরণ শ্রীসারদাদেবীর জীবন সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সহরের বিশিষ্ট গায়কগণ কর্তৃক গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত ভজন হয়।

দ্বিতীয় দিবস শনিবার অপরাহ্ণে আশ্রম-প্রাঙ্গণে একটি বিরাট মহিলা সভা হয়। সদর বালিকা বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষয়িত্রী চিরকুমারী শ্রীযুক্তা স্নেহলতা দাস সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। স্বামী জগদীশ্বরানন্দের প্রশস্তির পরে শ্রীযুক্তা হেমলতা রায়, বি-এ ও নিহারকণা ঘোষ, বি-এ ও সুধাংশুকুমারী ঘোষ বক্তৃতা করেন। কুমারী শিবানী রায় স্বামী অভেদানন্দ কৃত সারদাস্তোত্রটি হারমোনিয়ম যোগে আবৃত্তি করিয়া সমস্ত মহিলাগণকে মুগ্ধ করেন। কুমারী ঊষারাণী বসু, অণিমা সেন, ইন্দুবালা রায়, সুষমারাণী ঘোষ, আরতি দত্ত ও বীণাপাণি ঘোষ প্রভৃতি বালিকাগণ ভজন করেন। কুমারী প্রভা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুজাতা গুপ্ত, আভা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তিনটি নবম শ্রেণীর ছাত্রী কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধ সভায় পঠিত হয়। সভানেত্রী মহাশয়া সারদাদেবীকে বৈদিক যুগের মৈত্রেয়ী ও অন্যান্য ব্রহ্মবাদিনী নারীর সহিত তুলনা করিয়া বলেন যে, ভারতীয় নারীর লুপ্তপ্রায় আদর্শ তাঁহার জীবনে মূর্ত্তিগ্রহণ করিয়াছে। প্রসাদ বিতরণান্তে সভাভঙ্গ হয়।

তৃতীয় দিবস রবিবার সন্ধ্যায় ব্রহ্মচারী রেবতীরাম ম্যাজিক্ল্যাণ্টার্ণ যোগে শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন ও বাণী সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব—আগামী ২২শে জানুয়ারী শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব বেলুড় মঠে অনুষ্ঠিত হইবে।
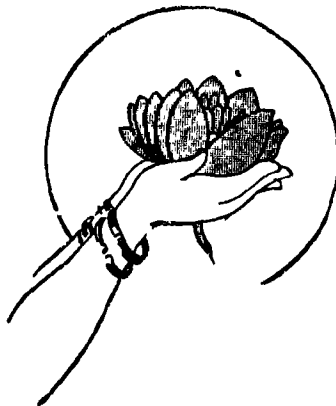
বেলুড়মঠে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্দির
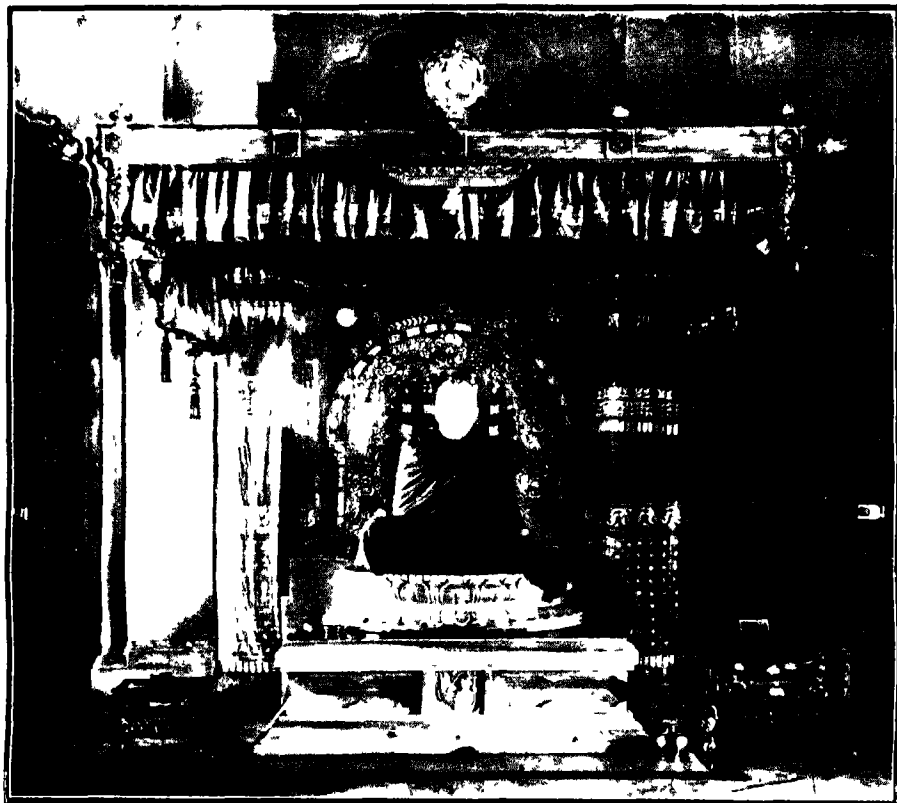
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মর্ম্মর বিগ্রহ

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য মণ্ডলেশ্বর শ্রীমৎ স্বামী কৃষ্ণানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ভূসুর (ব্রাহ্মণ) কুলে অবতীর্ণ হইয়া বেদ আজ্ঞানুসারে জগদম্বা চতুর্থ আশ্রম সন্ন্যাস ধারণ করিয়া লোকোত্তর আত্ম-শক্তির উদ্বোধন করতঃ অজ্ঞানাবৃত অসংখ্য ভারত বাসীর হৃদয় তমঃ নিবারণ করিয়া বোধ-ভানুর প্রকাশ করিয়াছেন এবং মাতৃভূমি ভারতবর্ষের গৌরব-যশঃ সুমেরু শিখরের তুল্য অচল অটল করিয়া গিয়াছেন। হিন্দু সনাতনী জনগণের জন্য বিষ্ণু, শিব, সূর্য্য, দেবী ও গণেশ এই পঞ্চদেব উপাস্যরূপে মানা যায়। এই পঞ্চদেবের মধ্যে আবার শিব ও বিষ্ণু হিন্দুগণের পরম উপাস্যরূপে মানা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে ব্যাসদেব লিখিয়াছেন—

"সন্নিদা সতি নামবৈভব কথা শ্রীশেশয়োর্ভেদধীঃ
শ্রদ্ধা শ্রুতিশাস্ত্রদেশিকগিরাং নামন্যর্থ বাদভ্রমঃ।
নামাস্তীতি নিষিদ্ধ-বৃত্তি বিহিতত্যাগো হি ধর্ম্মান্তরৈঃ
সাম্যং নাম্নি জপে শিবস্য চ হরের্নামাপরাধাদশঃ॥"

এই শ্লোকে, শিব ও বিষ্ণুর সদৃশ তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে কোনও দেবতা নাই, এরূপ লিখিত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সাক্ষাৎ ঐ শিব ও বিষ্ণুরই বিভূতি। এ বিষয়ে গীতায় প্রমাণ—

"যৎ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোংহংশ-সম্ভবম্॥"

—হে অর্জ্জুন যে ব্যক্তি-বিশেষের প্রভাবের সম্মুখে তমঃপ্রধান অতি বড় অভিমানীও নত-মস্তক হয়, সেই ব্যক্তি বিশেষকে আমারই অবতার বলিয়া জানিবে। পরন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ব্যক্তিত্বে রাম, কৃষ্ণ ও শিব—এই তিনের (একত্র) সমাবেশ ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কারণ, শ্রীরামের মনোভিরামতা, ধর্ম্ম-প্রিয়তা, মর্য্যাদা ও পুরুষোত্তমতা, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মনোহরতা, ধৈর্য্য এবং বিপরীত সাধনসম্পন্ন হইলেও জ্ঞানোপদেশ-দ্বারা অর্জ্জুনকে কৃতকৃত্য করিয়া দেওয়া, এবং শ্রীশঙ্কর যেমন কামকে দগ্ধ করিয়া জীবন্মুক্ত হইয়া

বিচরণ করিতেন, এই প্রকার সর্ব্বগুণ শ্রীপরমহংস-দেবে বিদ্যমান ছিল। অতএব অবতারত্রয়ের স্বরূপই পরমহংসদেবের ব্যক্তিত্বে বিদ্যমান।

এক্ষণে আমি আপনাদের দৃষ্টি পরমহংস রামকৃষ্ণ পুরী এই নামের দিকে আকর্ষণ করিতে চাই। সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে এইরূপ প্রথা আছে যে, যখন সন্ন্যাস লওয়া যায় তখন গিরি, পুরী, ভারতী, সরস্বতী, আশ্রম, তীর্থ, বন, অরণ্য, পর্ব্বত, সাগর এই দশ নামের মধ্যে কোনও একটী নাম গুরু-পরম্পরা হইতে নামের শেষে জুড়িয়া দেওয়া হয়। কারণ "অথ সন্ন্যাস-বিধিং প্রবক্ষ্যামঃ" এই বৈদিক বিধির অনুসারে যিনি সন্ন্যাস লইয়া থাকেন তাঁহার নামের অন্তভাগে এই দশ নামের মধ্য হইতে, যেটী গুরু নামের শেষে থাকে সেইটী শিষ্যের নামের সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হইয়া থাকে। এই প্রকার উপনামযুক্ত নামকে সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ে "যোগ-পাট" বলা হয়।

পরমহংসদেবের গুরুজীর নাম শ্রীশ্রীতোতা-পুরীজী মহারাজ। তিনি সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ে সিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। যখন তিনি পরমহংস-দেবকে সন্ন্যাস দিলেন তখন স্বীয় যোগবলদ্বারা জানিতে পারিয়াছিলেন যে, ইনি কোনও ঈশ্বরী বিভূতি নররূপে প্রকট হইয়াছেন এবং শিষ্টাগত বিধির রক্ষার জন্য সন্ন্যাস লইতে আসিয়াছেন; ইনি সাক্ষাৎ শিব ও বিষ্ণুর বিগ্রহ। এইরূপ নিশ্চয় করিয়াই তিনি সন্ন্যাসান্তে পরমহংস 'রামকৃষ্ণ' পুরী নাম রাখিয়াছিলেন।

তাঁহার নামে ছয়টী পদ আছে। এক্ষণে পরমহংসদেবের নামঘটিত পদসমূহের অর্থের দিকে আপনারা একটু দৃষ্টিপাত করুন। পরমহংসদেব রামকৃষ্ণ পুরী—এখানে নামে কর্ম্মধারয় সমাস হইয়াছে। কর্ম্মধারয় তৎপুরুষ সমাসেরই একটী ভেদমাত্র। "অভেদে কর্ম্মধারয়ঃ" এই বাক্য অনুসারে যেখানে পদ-সমুদায়ে অভেদবোধের যোগ্যতা থাকে সেখানে এইরূপ কর্ম্মধারয় হয়। পদসমূহের অর্থ—পাতি রক্ষতি ইতি 'পঃ', রমন্তে জগদস্মিন্ ইতি 'রমঃ'; পশ্চাসৌ রমশ্চ=পরমঃ অর্থাৎ সমস্ত জগতের পালক এবং জগদাধার। হংস=সূর্য্য, সূর্য্য ইব জগদন্ধকার-বিনাশকঃ অর্থাৎ জ্ঞান-স্বরূপঃ। পরমশ্চাসৌ হংসশ্চ=পরমহংসঃ অর্থাৎ জগদ্রক্ষক, জগদাধার ও জ্ঞানস্বরূপ—ইহাই হইল 'পরমহংস' পদের অর্থ। 'রামকৃষ্ণ'পুরী এই পদের অর্থ। রামশ্চাসৌ কৃষ্ণশ্চ রামকৃষ্ণঃ অর্থাৎ যিনি ত্রেতায় রাম ছিলেন, তিনিই দ্বাপরে *কৃষ্ণ হইয়াছিলেন এবং এক্ষণে এই দুই অবতার* কলিতে ভূ-ভার অধিক দেখিয়া অংশাবতীর্ণ রামকৃষ্ণ পুরী পরমহংসদেবরূপে প্রকট হইয়াছেন। রাম শব্দের অর্থ—রমন্তে শিষ্যবর্গাঃ যস্য স্বরূপে ইতি রামঃ। ভক্ত জনানাং পাপান্ কৃষ্যতি নিবারয়তি ইতি কৃষ্ণঃ। অর্থাৎ শরণাগত পুরুষগণের ধ্যান-যোগ্য মূর্ত্তি হইলেন যিনি এবং কৃপাদৃষ্টির পাত্রীভূত ভক্তগণের পাপসমূহের নাশক—ইহাই হইল রামকৃষ্ণ পদের অর্থ। 'পুরী' এই পদের অর্থ—পিপর্ত্তি ভক্ত জন-মনোরথান্ ইতি পুরী, অর্থাৎ শরণাগত ভক্তগণের মনোভিলষিত বাসনা-সমূহের পূর্ণতা বিধায়ক। অতএব সৃষ্টির পালক এবং সর্ব্ব প্রপঞ্চের আধার, যোগিজনের রমণ স্থান, দৃষ্টি-পথারূঢ় জীবসমূহের নিখিল পাপ-নাশক এবং শরণাগতজনের মনস্কামনা পূর্ত্তিকারী—ইহাই হইল পরমহংস রামকৃষ্ণ পুরী এই নামের পদ-সমূহের অর্থ। এই নাম পরমহংসদেবজীর অন্বর্থসংজ্ঞক অর্থাৎ যেমন নাম তেমনই গুণ। এতাদৃশ লোকোত্তর গুণ-সমূহ সেই ব্যক্তিতেই মাত্র সম্ভব যিনি ঈশ্বরা-বতাররূপে প্রকট হইয়া থাকেন।

কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের অংশের পরমহংসদেবের শরীরে আবেশ হইয়াছিল। এরূপ কথন স্বকপোলকল্পিত ও নিরাধার বলিয়া মনে হয়। আর বস্তুর স্বরূপসিদ্ধি

লক্ষণ ও প্রমাণদ্বারা হইয়া থাকে; ঈশ্বরের পাপ-পুণ্যরচিত শরীরে আবেশ হইবার কোনও প্রমাণ নাই। এই শঙ্কার উত্তরে প্রমাণ পদ্মপুরাণ—

"আবিষ্টোহভূৎ কুমারেষু নারদে চ হরির্বিভুঃ।
আবিবেশ পৃথুং দেবঃ শঙ্খী চক্রী চতুর্ভুজঃ॥"

—সনকাদি এবং নারদ, পৃথু, পরশুরাম আদিতে ঈশ্বর আবেশাবতার হইয়াছিলেন। আর পরমহংসদেব তো ব্রহ্মবেত্তা পুরুষই ছিলেন; ব্রহ্ম ও ব্রহ্মবেত্তা পুরুষ সর্ব্বদা অভিন্ন। গীতা—"জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্", শ্রুতি—"ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি", "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" ইত্যাদি প্রমাণসমূহদ্বারাও সিদ্ধ হইতেছে যে, পরমহংসদেব সাক্ষাৎ কল্যাণ স্বরূপ "শিব"ই ছিলেন। এ অর্থ রামকৃষ্ণ পরমহংস এই অক্ষরসমূহ হইতেও পাওয়া যায়। 'রাম' শব্দে দুই অক্ষর আছে—'রা' অক্ষর মায়া সহিত শক্তিবাচী ও 'ম' অক্ষর কল্যাণস্বরূপ শিববাচী; ইহার প্রমাণ পুরাণেও দেখা যায়—"রকারঃ পরমা শক্তিঃ মকারঃ পরমঃ শিবঃ।" এইরূপ 'কৃষ্ণ' শব্দও কল্যাণস্বরূপ শিববাচক। পুরাণে আছে—"কৃষীতি পরমাশক্তিঃ ণকারঃ পরমঃ শিবঃ," অর্থাৎ কৃষ্—বিলেখনে ধাতু। এটী প্রকৃতি—মায়াবোধক শব্দ এবং 'ণ'কার প্রত্যয় কর্ত্তৃ বোধক হওয়ায় মায়ার প্রেরক ঈশ্বর বাচী হইয়া থাকে। প্রকৃতি ও প্রত্যয় দুইটী মিলিয়া জগতের কর্ত্তা শিবার্থ-বোধক হয়; এই অর্থ বেদ-প্রমাণেও পাওয়া যায়। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে আছে—"মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনং তু মহেশ্বরম্", অর্থাৎ 'জগজ্জননী ভগবতী পার্ব্বতীকে জগৎকর্ত্রী মায়ারূপ জানিবে এবং কল্যাণস্বরূপ শিবকে মায়ার প্রেরক ঈশ্বর বলিয়া জানিবে।' এই প্রকার কথনদ্বারা ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, রামকৃষ্ণ এই দুইটী পদ কল্যাণস্বরূপ শিবার্থ-বোধক হওয়ায় পরমহংসদেব সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ ছিলেন, এ কথা সপ্রমাণ হইয়াছে।

পরমহংস শব্দের অর্থ—যদিও হংসে ক্ষীর, নীর বিভাগ করিবার স্বাভাবিক গুণ রহিয়াছে, কিন্তু এগুণ স্থূল পদার্থ-সমূহেরই বিভাগ-কারক হওয়ায় হংস শব্দের সহিত 'পরম' এই উৎকৃষ্টতাবাচী শব্দের প্রয়োগ হয় না। পরন্তু চতুর্থাশ্রমী ব্রহ্মবেত্তা পুরুষের নামের সঙ্গে 'পরম' শব্দের প্রয়োগ এইজন্য হইয়া থাকে যে, জড় ও চেতনকে বিভক্ত করিতে মাত্র ব্রহ্মবেত্তা পুরুষই সমর্থ, হংসের সে সামর্থ্য নাই। এইজন্যই ব্রহ্মবেত্তা চতুর্থাশ্রমী পুরুষেরই নামের সঙ্গে 'পরম' শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। তাই রামকৃষ্ণকে 'পরমহংস' বলা হয়।

অধিকন্তু পরমহংসদেবজী সাক্ষাৎ চল-মূর্ত্তি "বিবেক"কে (স্বামী বিবেকানন্দকে) উৎপন্ন করিয়া পাশ্চাত্যদেশের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত করিয়া গিয়াছেন। এ জন্যও তাঁহার নামের সহিত 'পরম' শব্দের যথাবৎ সার্থকতা হইয়াছে।

এই ঘোর কলিকালে অপর কাহারও মধ্যে এরূপ চরিতার্থ হওয়া অতি দুর্ঘট। কেবল স্বামী বিবেকানন্দজীকেই যে তিনি কৃতকৃত্য করিয়াছিলেন, তাহাই নহে, কিন্তু নিঃস্বার্থভাবে ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য দেশসমূহেও নারায়ণ বুদ্ধিতে সর্ব্বপ্রকার সেবা করিয়া সন্ন্যাস আশ্রমের গৌরববৃদ্ধি করিয়াছেন।

অতএব আমরা তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ কৃতজ্ঞ। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তাঁহার প্রতাপ-ভানুর প্রভাব ভগবান্ ইহা হইতেও অনন্ত গুণ বৃদ্ধি করুন এবং তাঁহার নামীয় মিশন, মঠ ও পরোপকারী কার্য্যসমূহের সর্ব্বথা উন্নতি হউক, কার্য্য-কর্ত্তাদের উৎসাহ ও প্রেম বর্ত্তমান হইতেও সহস্র গুণ বৃদ্ধি হউক।

ওঁ কল্যাণং দিশতু শিবঃ।
ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ॥*

* হিন্দী হইতে স্বামী চিন্ময়ানন্দ কর্ত্তৃক অনূদিত।

উড়িয়া ভক্তদের মুখে শ্রীচৈতন্য-কথা

অধ্যাপক শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার, এম্-এ, পি-আর্-এস, পি-এইচ্-ডি, ভাগবতরত্ন

১। **প্রাক্-চৈতন্য যুগে উড়িষ্যায় বৈষ্ণব ধর্ম্মের দুইটী ধারা।** শ্রীচৈতন্যের পুরী যাওয়ার পূর্ব্বেও উড়িষ্যায় বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচার ছিল। তথায় প্রাক্-চৈতন্য যুগের বৈষ্ণব ধর্ম্মের দুইটী ধারার নিদর্শন পাওয়া যায়। একটী রাধাকৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া বিশুদ্ধ ভক্তি ধর্ম্ম, অপরটী বুদ্ধরূপী জগন্নাথের প্রতি জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি। এই দুইটী ধারাকে শ্রীচৈতন্য আত্মসাৎ করিয়া লন, কিন্তু দ্বিতীয় ধারাটী গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত না হইয়া কিছুকাল স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছিল। পরে শ্রীনিবাস, নরোত্তমের সহচর শ্যামানন্দ ও তাঁহার শিষ্য রসিকানন্দ উড়িষ্যায় ব্রজমণ্ডলে উদ্ভূত ভক্তিবাদ প্রচার করেন।

শ্রীচৈতন্যের নীলাচলে গমনের পূর্ব্বে উড়িষ্যায় যে শ্রীকৃষ্ণ উপাসনা প্রচলিত ছিল তাহার কয়েকটী নিদর্শন পাওয়া যায়। রেমুণার গোপীনাথের মন্দির উক্ত উপাসনার একটী প্রধান কেন্দ্র ছিল। মাধবেন্দ্রপুরী গোপীনাথকে দর্শন করিয়া ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন। প্রতাপরুদ্রের পিতা পুরুষোত্তমদেব কর্ত্তৃক লিখিত ছয়টী শ্লোক শ্রীরূপ গোস্বামী পদ্যাবলীতে সঙ্কলন করিয়াছেন। ইহার মধ্যে একটা শ্লোক উদ্ধার করিলেই দেখা যাইবে যে শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্বে গোপীপ্রেমের বার্ত্তা উড়িষ্যায় অজ্ঞাত ছিল না।

শ্লোকটী এই—

> গোপীজনালিঙ্গিত-মধ্যভাগং
> বেণুং ধমন্তং ভৃশলোলনেত্রম্।
> কলেবরে প্রস্ফুট-রোমবৃন্দং
> নমামি কৃষ্ণং জগদেক-কন্দম্॥ ২৯৩।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায় যে শ্রীচৈতন্যের কৃপা পাওয়ার পূর্ব্বেই রায় রামানন্দ বৈষ্ণবীয় সাধনতত্ত্বে অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার "জগন্নাথবল্লভ নাটকে" শ্রীচৈতন্যের প্রতি নমস্ক্রিয়া বা বন্দনা কিছুই নাই। তাহাতে অনুমান হয় যে শ্রীচৈতন্যের দর্শন পাওয়ার পূর্ব্বেই তিনি ঐ নাটক লিখিয়াছিলেন। উক্ত নাটকের আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য-দ্বারা এই অনুমান সমর্থিত হয়। উহার প্রস্তাবনায় প্রতাপরুদ্রের পরাক্রমের নিম্নলিখিত বর্ণনা আছে—

> যন্নামপি নিশম্য সন্নিবিশতে সেকন্দরঃ কন্দরং
> সুবংবর্গ কলবর্গ ভূমিতিলকঃ সাশ্রং সমুদ্বীক্ষতে।
> মেনে গুর্জ্জর ভূপতির্জ্জর—দিবারণ্য-নিজ-পত্তনং
> বাতব্যগ্র পয়োধিপোত গমিবসঙ্করেদ গৌড়েশ্বরম্॥

শ্লোকে উল্লিখিত সেকন্দর দিল্লীর সুলতান সেকন্দর লোদি (১৪৮৯—১৫০৯)। সেকন্দর ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন, সুতরাং এই শ্লোক ঐ সময়ের পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্য ১৫১০ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যায় গমন করেন। জগন্নাথ বল্লভ নাটকে রাগানুগাভক্তি ও শ্রীরাধার ভাববৈচিত্র্য অশেষ নৈপুণ্যের সহিত বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্বে উৎকলে প্রেমধর্ম্মের একটি ধারা বর্ত্তমান ছিল।

রায় রামানন্দ শ্রীচৈতন্যকে "পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গভেল" গীতটী শুনাইয়াছিলেন। এইটী যে রায় রামানন্দের রচনা তাহা কর্ণপূর মহাকাব্যে ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ চরিতামৃতে বলিয়াছেন। রায় রামানন্দের লেখা ব্রজবুলির পদ দেখিয়া মনে হয় যে তিনি বিদ্যাপতির পদাবলী পাঠ করিয়াছিলেন।

উড়িষ্যার অনেক বৌদ্ধ হিন্দুধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন; কিন্তু তাঁহারা বৌদ্ধপ্রভাব হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইতে পারেন নাই। জগন্নাথদেবই বুদ্ধদেব এই বুদ্ধিতে ইঁহারা জগন্নাথের শ্রীবিগ্রহে ভক্তিশীল হয়েন। ইঁহারা বলেন "দুষ্কৃতের দমনের জন্য" শ্রীকৃষ্ণই বুদ্ধরূপে জগন্নাথ নামে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। (জগন্নাথ দাসের "দারুব্রহ্ম", ও অচ্যুতের "শূন্যসংহিতা", ৩০ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। ইঁহাদের গ্রন্থাদি পাঠ করিলে দেখা যায় যে ইঁহারা "যন্ত্র" সাহায্যে নিরাকার এবং "পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডস্থিত" ব্রহ্মের উপাসনা করিতেন; কিন্তু তৎসঙ্গে রাধাকৃষ্ণের পূজা ও বত্রিশ অক্ষর মন্ত্র জপও করিতেন। এইরূপ মতবাদ জগন্নাথদাসের "রাসক্রীড়া", বলরামদাসের "বটঅবকাশ" ও "বিরাট গীতা", যশোবন্তদাসের "শিব স্বরোদয়" ও অচ্যুতের "অনাকার সংহিতা" ও "শূন্য সংহিতা"য় প্রচারিত হইয়াছে। দিবাকর দাসের "জগন্নাথ চরিতামৃতে" (১) দেখা যায় যে শ্রীচৈতন্য জগন্নাথদাসের শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন (দ্বিতীয় অধ্যায়)। তাহা হইলে প্রমাণিত হইতেছে যে ইঁহারা শ্রীমদ্‌ভাগবতকেও আদর করিতেন। এই সম্প্রদায়ের পাঁচজন ব্যক্তি প্রাধান্য-লাভ করিয়া পঞ্চসখা নামে পরিচিত হইয়াছেন। ইঁহাদের নাম জগন্নাথদাস, বলরাম দাস, অচ্যুতানন্দ, অনন্ত ও যশোবন্ত দাস। ইঁহাদের প্রত্যেকেই উড়িয়া ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন ও শ্রীচৈতন্যের কৃপা পাইয়াছেন। যশোবন্তের প্রশিষ্য সুদর্শন দাস "চৌরাশী আজ্ঞা" নামক অপ্রকাশিত পুথিতে (২) লিখিয়াছেন—

চৈতন্য বোলন্তি বচন মন দেই শুন রাজন
পঞ্চ আত্মাক নাম শুন একে জগন্নাথ দাসেন
দ্বিতীয়ে বলরাম কহি তৃতীয়ে অনন্ত যে হুই
চতুর্থে যশোবন্তক হি পঞ্চমে অচ্যুত বোলই
(৪২ বয়াল্লিশ অধ্যায়)।

২। **পঞ্চসখা।**—অচ্যুতানন্দ পঞ্চসখার সহিত শ্রীচৈতন্যের ঘনিষ্ঠতার কথা লিখিয়াছেন। যথা—

বৈষ্ণবমণ্ডলি খোলকরতাল বজাই বোলন্তি হরি।
চৈতন্য ঠাকুর মহানৃত্যকার দণ্ডকমণ্ডলুধারী॥
অনন্ত অচ্যুত ঘেনি যশোবন্ত বলরাম জগন্নাথ।
এ পঞ্চ সখাহিঁ নৃত্য করি গলে গৌরাঙ্গচন্দ্র সঙ্গত॥
(শূন্য সংহিতা, ১ম অধ্যায়)।

তিনি আরও লিখিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্যের আজ্ঞায় সনাতন গোস্বামী তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন। যথা—

শ্রীসনাতন গোসাইঁ কি চাহিন আজ্ঞা দেলে শচী সুত।
অচ্যুতানন্দকু তুম্ভে উপদেশ কর হে যাই স্থিত॥
আজ্ঞাকু পাই সনাতন গোসাই সঙ্গে সুখে ঘেনি গলে
দক্ষিণ পারুণা বটমূলে বসি কর্ণে উপদেশ দেলে॥
(শূন্য সংহিতা, ১ম অধ্যায়)।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ চরিতামৃতে এ সম্বন্ধে কোন বিবরণ লেখেন নাই। কিন্তু অচ্যুতের নিজের কথা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখি না।

ঈশ্বরদাসের "চৈতন্য ভাগবতের" অপ্রকাশিত পুথিতে পাওয়া যায় যে জগন্নাথদেব (বিগ্রহ) অচ্যুতকে স্বপ্নাদেশ দিলেন যে তিনি যেন শ্রীচৈতন্যর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। যথা—

বোলন্তি প্রভু ভগবান বৌদ্ধরূপমো চৈতন্য
তাঙ্ক চরণ সেবা কর ভক্তিক পথঙ্কু আবোর
এহি স্বরূপ শ্রীচৈতন্য যে পরমহংস দীক্ষা ঘেন
চৈতন্য গুরু অঙ্গ হই নাম প্রকাশ করিবই
শোন অচ্যুত মো বচন চৈতন্য ঠাকু দীক্ষা ঘেন॥
[ঐ, ৬ অধ্যায়]।

(১) জগন্নাথ-চরিতামৃতে উড়িয়া ভাগবতের লেখক জগন্নাথদাসের জীবনী বর্ণিত হইয়াছে।

(২) ঐ পুথি কটকের অধ্যাপক রায় সাহেব আর্ত্তবল্লভ মহান্তির নিকট আছে। অধ্যাপক মহান্তি ও কটকের শ্রীমান্ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এম, এ, উড়িয়া সাহিত্য হইতে উপাদান সংগ্রহে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

অচ্যুতের "শূন্যসংহিতা" ও ঈশ্বরদাসের "চৈতন্য ভাগবত" মিলাইয়া পড়িলে মনে হয় যে অচ্যুত প্রথমে শ্রীচৈতন্যের নিকট দীক্ষা লইতে গিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে সনাতন গোস্বামীর নিকট দীক্ষা লইতে বলেন।

অচ্যুতানন্দের পিতার নাম দীনবন্ধু খুঁটিয়া, মাতার নাম পদ্মাবতী। ইঁহারা জাতিতে গোয়ালা। অচ্যুত কটক জেলার অন্তর্গত ত্রিপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। গোপাল মঠ ইঁহার দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়। উড়িষ্যার গোয়ালা জাতির অধিকাংশই এই মঠের শিষ্য।

ঈশ্বরদাসের মতে বলরামদাস চন্দ্রপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা সোমনাথ মহাপাত্র রাজার একজন পাত্র বা অমাত্য ছিলেন। শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া যাজপুর হইতে কটকে আসিবার পথে তাঁহার সহিত মিলিত হন। বলরামদাস শ্রীচৈতন্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। যথা—

রামতারক পরম ব্রহ্ম কহিলে কর্ণে শ্রীচৈতন্য।
শুনিল বলরামদাস মনেরে হোইল হরষ॥

(ঈশ্বরদাস, চৈঃ ভাঃ, ৪৬ ও ৫৯ অধ্যায়)।

বলরামদাস জগমোহন রামায়ণ লিখিয়া সুপ্রসিদ্ধ হইয়াছেন। দিবাকরদাস লিখিয়াছেন যে বলরাম অনুক্ষণ শ্রীচৈতন্যের নিকট থাকিয়া প্রভুর সেবা করিতেন (জগন্নাথ চরিতামৃত, ২য় অধ্যায়)। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্য জগন্নাথ দাসের ভাগবত পাঠ শুনিয়া এতই আনন্দিত হইয়াছিলেন যে তাঁহার সহিত আড়াই দিন আলিঙ্গনে বদ্ধ ছিলেন। প্রভু জগন্নাথদাসকে মন্ত্র দিবার জন্য বলরামদাসকে অনুরোধ করেন। তখন জগন্নাথের বয়স চব্বিশ বৎসর। সুতরাং জগন্নাথ শ্রীচৈতন্যের প্রায় সমবয়সী। জগন্নাথ-প্রাতঃকালে প্রভুর মুখ ধোয়াইয়া দিতেন ও অন্যান্য সেবা করিতেন (তৃতীয় অধ্যায়)। জগন্নাথ দাসের ভাগবত উড়িষ্যার সর্ব্বত্র আদৃত ও সম্মানিত হয়। ইনি পুরীতে স্বামীমঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইঁহার প্রভাব সম্বন্ধে তারিণীচরণ রথ "উৎকল সাহিত্যের ইতিহাসে", লিখিয়াছেন —"সেই ধর্ম্মের স্থাপয়িতা ভক্ত কবি জগন্নাথদাস ও মহাত্মা শ্রীচৈতন্য অটন্তি। এ উভয় মিলি উৎকলবাসিঙ্ক হৃদয় প্রগাঢ় ভক্তি ও প্রেম রসর সঞ্চার করি যাইথিলে।"

ঈশ্বরদাস বলেন যে অনন্তমহান্তি [দাস] কোণারকে সূর্য্যদেবের নিকট স্বপ্নাদেশ পান যে তাঁহাকে শ্রীচৈতন্যের নিকট দীক্ষা লইতে হইবে। কোণারকেই তিনি শ্রীচৈতন্যের দর্শনলাভ করেন ও তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করেন। শ্রীচৈতন্য অনন্তকে দীক্ষা দিবার জন্য নিত্যানন্দকে অনুরোধ করেন। যথা—

চৈতন্য প্রভু আজ্ঞা দেই শুন নিত্যানন্দ গো ভাই
অনন্ত উপদেশ কর হরিনাম দীক্ষা সার॥

(৪৬ অধ্যায়,)

যশোবন্ত জগন্নাথ বিগ্রহের স্বপ্নাদেশ পাইয়া শ্রীচৈতন্যের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন

(৪৬ অধ্যায়)।

পঞ্চসখা শ্রীচৈতন্যের কৃপা পাইয়াছিলেন একথা সত্য। ইঁহাদের সম্বন্ধে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে কোন বিবরণ পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু তাই বলিয়া এই পাঁচজন মহাপুরুষ ও তাঁহাদের শিষ্যেরা এসম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলিয়াছেন সন্দেহ করিবার কোন হেতু নাই। ইঁহারা পূর্ব্বে বৌদ্ধভাবাপন্ন ছিলেন; শ্রীচৈতন্যের কৃপাপ্রাপ্তির পরও ব্রজের প্রেমধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেন নাই। অচ্যুত তাঁহার মতবাদ নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করিয়াছেন—

কহিলি মুঁ শূন্যমন্ত্র যন্ত্র করন্যাস।
তপি মানে জন্ম জন্ম ফলে যে প্রকাশ॥
দেখিলে যে শূন্য ব্রহ্ম স্বয়ং জ্যোতি হোই।
ঘটে ঘটে বিজে এহি শূন্য কায়া দেহী॥

স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গাদি যেতে।
শূন্য কায়া শূন্য মন্ত্র বিজে ঘটে ঘটে ॥
শূন্য কায়াকু যে নিরাকারমন্ত্র সার।
ভলা দরাকলে দীর্ঘ অনঙ্গ সাদর ॥

(শূন্য সংহিতা, ১০ম অধ্যায়)।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে আমি পুরীর মুক্তি মণ্ডপ গ্রন্থাগারে "কৃষ্ণপ্রেমরসচন্দ্র-তত্ত্ব-ভক্ত লহরী" বা "শ্রীচৈতন্য সার্ব্বভৌম সংবাদ" নামক একখানি তন্ত্র জাতীয় গ্রন্থের পুথি পাই। পুথিখানি একমুঠা হস্তপরিমিত তালপাতায় লেখা; প্রতি পৃষ্ঠায় চার পংক্তি করিয়া লেখা আছে। ৮৫ খানি পাতায় ও ১২টী প্রকরণে গ্রন্থখানি সমাপ্ত। ইহা উড়িয়া অক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত, কিন্তু ইহার প্রতি শ্লোকে অসংখ্য ভুল। পুথিখানি কলিকাতায় লইয়া আসিয়া আমি ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিকে দেখাই। তাঁহারা প্রত্যেকেই বলেন যে পুথির লেখা অন্ততঃ ২৫০ বৎসরের প্রাচীন। ইহা কোন বৌদ্ধগন্ধী শ্রীচৈতন্য ভক্তের রচনা বলিয়া মনে হয়। ইহার প্রথম কয়েকটী শ্লোকেই শূন্য-বাদের কথা আছে।[১]

সার্ব্বভৌম উবাচ—

ব্রহ্মস্য কিমরূপস্য ব্রহ্মো বা পরমোপর।
ব্রহ্মরূপ ন জানামিঃ কথয়স্বি মহাপ্রভো ॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্র উবাচ—

ব্রহ্মস্য সর্ব্বদেবস্য বিষ্ট ব্রহ্ম সমানাচঃ।
তথাস্থি ভেদরূপস্য স্মৃতস্ব সার্ব্বভৌমঃ ॥
শূন্যব্রহ্ম যথারবিঃ তদ্বৎ শ্রী ততপ্রভূ।
আত্মাদেহ সমানসঃ ধৃতস্থাসং ভোবেচ্চুরস্যাপি ॥

ঐ গ্রন্থের অষ্টম প্রকরণে সার্ব্বভৌম বলিতেছেন—

চৈতন্য সর্ব্ব মন্ত্রস্য চৈতন্য সর্ব্ব মঙ্গলং
চৈতন্য সর্ব্ব সুখদং চৈতন্য সর্ব্ব সিদ্ধয়ঃ ॥

এই পুস্তকখানির পাঠোদ্ধার করিতে পারিলে উৎকলে প্রচারিত শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে কিছু তত্ত্ব পাওয়া যাইতে পারে।

পঞ্চসখা প্রভৃতির মতের সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের কোনই সাদৃশ্য নাই। কিন্তু তাই বলিয়া ইঁহাদিগকে অবৈষ্ণব বলা যায় না। ইঁহারা শ্রীচৈতন্যকে বুদ্ধদেবের অবতার বলিয়া পূজা করিয়াছেন (শূন্য সংহিতা, ১০ম ও ১১শ অধ্যায় ও নিরাকার দাসের ঝুমর সংহিতা, ২২শ অধ্যায়)।

১। এই পুথির শ্লোক উদ্ধার করিতে যাইয়া ভাষা সংশোধনের কোন চেষ্টা করি নাই।

ক্রমশঃ

অর্ঘ্যাঞ্জলি

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

হে স্বামী বিবেকানন্দ, ভারতের হে অপূর্ব্ব ঋষি,
হৃদয়ের চিত্রপটে স্মৃতির তুলিকা ক্ষেপি', ওগো অবিনাশী,
রচি' তব ধ্যানমূর্ত্তি, পদ্মাসনে মৌনী তথাগত,
দাঁড়াইনু নতজানু, করিনু মস্তক তব পদে অবনত।
নাহি জ্ঞান, নাহি বুদ্ধি, নাহি মোর কবিত্ব-কল্পনা,
তথাপি বন্দিব তোমা—এই মোর অন্তরের আনন্দ জল্পনা।
কী অমৃতক্ষণে তুমি ভারত-গগনভালে উদিলে, হে প্রজ্ঞার প্রতীক্,
তব পূত জ্যোতিরাশি ভারত আঁধার নাশি' উজলিল বিশ্ব-দশদিক।
চির ঋষি-অধ্যুষিত এই পূত ভারতের পুণ্য যোগক্ষেম
একদা বরিল তারে বিশ্বের আচার্য্যরূপে, ধরণীর হেম!
ভারতের জ্ঞান ঋদ্ধি, ভারতের তপঃ সিদ্ধি, বিত্ত অনুপম—
বিমোহিল বিশ্বজনে, আহবিল জনে জনে ভিক্ষার্থীর সম!
আপনারে ধন্য মানি' ভারত চরণে দানি' ভক্তি প্রণিপাত—
চিত্তের তমসা নাশি' অজ্ঞান ধরণী-বাসী দিকে দিকে জাগাইল
জ্ঞানের প্রভাত।

কিন্তু হায়! সে ভারত, ধরার মুকুট-মণি, বিশ্বের গৌরব—
আপন করম দোষে, বিধাতার রুদ্ররোষে, হারাইল সকল বৈভব!
মিথ্যারে আনিল ডাকি। পরম ঈশ্বররূপী যে সত্য-সম্পদ
একদিন দিল তারে দেবলোক-বাঞ্ছিত রাজৈশ্বর্য্য পদ
সেই সত্যে অবহেলি, হারাইয়া পূর্ব্বার্জ্জিত বিভব-সঞ্চয়।
অনন্ত দৈন্যের মাঝে, ক্লীবত্ব পঙ্কের গর্ভে আপনারে করিল বিলয়।
প্রেমে দিয়া জলাঞ্জলি বরণ করিয়া নিল দ্বেষ, হিংসা ভেদ,
পুণ্যের শুচিতা ত্যজি' সর্ব্বাঙ্গে মাখিল হায় অধর্ম্মের ক্লেদ!
ভারতের জ্ঞান বুদ্ধি, ভারতের শৌর্য্য বীর্য্য গেল রসাতলে
শক্তিমান সিংহশিশু আর্ত্তনাদ করে আজ,—হায় হায় বলে!
কাঁদিল বিশ্বের প্রাণ। নাশিতে ভারত গ্লানি, ভারতের হরি—
চিরপ্রিয় লীলাভূমে 'রামকৃষ্ণ' নাম ধরি' পুনঃ অবতরি—

ভারতের ত্রাণযজ্ঞে দানিলেন তপস্যার যেই মন্ত্রাহুতি,
সেই যজ্ঞভূমি হতে অভ্যুদিত হলে তুমি সৌম্য দিব্যাকৃতি !
সেই মন্ত্রশক্তি হ'তে, হে ঋষি বিবেকানন্দ, ওগো নরোত্তম,
মূর্ত্ত দিব্যবাণী সম ভারত-প্রাঙ্গণে তুমি লভিলে জনম !
জানি মোরা, হে নরেন্দ্র, দুর্য্যোগ-নিশান্তে তুমি পূত নবদ্যুতি,
'সম্ভবামি যুগে যুগে' হে স্বামীজি, তুমি সেই পূর্ণ প্রতিশ্রুতি !
তব পূত-কর-ধৃত দিশি দিশি বিচ্ছুরিত প্রজ্ঞা-দীপালোকে—
হেরিলে ভারত-চিত্র করুণা-কুঞ্চিত ভালে চকিতে পলকে !
বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ তলে ত্রিংশকোটি মানবের অর্দ্ধমৃত প্রাণ—
অন্তহীন ভীতি-ত্রাসে গুমরিছে দেহ-পাশে,—দেবতার নাহি সেথা স্থান!
অন্তরে অনন্ত ব্যাধি, দ্বেষ, হিংসা, ভেদ-ক্লেদ, ধর্ম্মের বিকার
ক্লীবত্ব, কলহ, দ্বন্দ্ব ভারতের সর্ব্ব অঙ্গে করিছে বিস্তার।
সঙ্কট আবর্ত্তে পড়ি' কাণ্ডারী-বিহীন তরি উদ্ধারের না জানি' উপায়
ত্রিংশকোটি মূঢ়প্রাণ সঙ্কটে পাইতে ত্রাণ আছে যেন কার প্রতীক্ষায় ;
হেন যুগ-সন্ধিক্ষণে, হে ঋষি বিবেকানন্দ, অমৃত তনয় !
ভারত-প্রাঙ্গণ-তলে উদিলে তুমি গো ঋষি, করে লয়ে দিব্য বরাভয়।
"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত" মন্ত্র উচ্চারিয়া, তুমি দেব, অশনি-নির্ঘোষে
সম্বিৎ দানিলে প্রাণে, জাগিল ভারত পুনঃ তোমার নির্দ্দেশে।
সঞ্চারিল হৃদে আশা, অন্তরে ধ্বনিল পুনঃ প্রাণের স্পন্দন,
তোমার চরণ-স্পর্শে সহসা টুটিল মোহ, জড়ত্ব বন্ধন !
তোমার বন্দনা গানে ছুটিল তোমার পানে লক্ষ কোটি প্রাণ,
হেনকালে, হায় ঋষি, আসিল ত্রিদিব হতে তোমার আহ্বান !
গন্তব্যের অর্দ্ধপথে, হে সন্ন্যাসী, পথহারা তব শিষ্যগণে
দিকভ্রান্ত পান্থ সম, ওগো গুরু, ডাকে তোমা আকুল ক্রন্দনে।
অসমাপ্ত তব লীলা, মুক্তিকামী ভারতের, ওগো মুক্তিদাতা,
এস তুমি নবরূপে ভারতে দানিতে মুক্তি, হে ভারত-ত্রাতা ;
(আজি) স্মরি' তব পুণ্যস্মৃতি, নিবেদি তোমার পদে কোটি নমস্কার,
ডাকি তোমা, এস গুরু, ভারত চাহিছে তোমা, এস আর বার।

হিন্দু-মুসলমান-সমস্যার সমাধানে স্বামী বিবেকানন্দ

সম্পাদক

ভারতে হিন্দু-মুসলমান-বিরোধ-বহ্নি প্রচ্ছন্নভাবে ধূমায়িত হইতেছিল, আজ স্বগৃহ-বিধ্বংসী আততায়িগণের ইন্ধন প্রদানে ইহা জ্বলিয়া উঠিয়াছে। দেশময় নবজাগ্রত জাতীয়তা সলিল সিঞ্চনেও এই অগ্নি নির্ব্বাপিত হইতেছে না।

বাংলার জাতীয় জীবন-প্রভাতের মাঙ্গলিক মুহূর্ত্তে সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়মূর্ত্তি শ্রীরামকৃষ্ণদেব আবির্ভূত হইয়া অশ্রুতপূর্ব্ব সাধনসহায়ে প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ করিলেন যে, হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি ধর্ম্মমত একই ভগবান লাভের বিভিন্ন পথমাত্র—"যত মত তত পথ।" তিনি নিজ জীবন দিয়া দেখাইলেন—স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণ কেমন করিয়া যথার্থ ভ্রাতৃত্ব প্রেমে আবদ্ধ থাকিতে পারে। তাঁহার অলৌকিক সাধনা আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী ধর্ম্মসম্প্রদায়সমূহকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া ভারতে 'নেশন'-প্রতিষ্ঠার পথ নির্দ্দেশ করিল। যুগ-চিন্তানায়ক স্বামী বিবেকানন্দ এই পথকে হিন্দুর স্বগৃহে সাম্যস্থাপন এবং হিন্দু-মুসলমানের সমবায়ে ভারতে ঐক্যবদ্ধ জাতীয়তা প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায় বলিয়া উদাত্তকণ্ঠে প্রচার করিলেন। তাঁহার অনুপ্রাণনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া শত শত শিক্ষিত বাঙালী যুবক ভারতে সংঘবদ্ধ জাতীয় জীবন সংগঠনের জন্য অক্লান্ত কর্ম্ম-সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। ধর্ম্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রে সংস্কারের বিপুল তরঙ্গে বঙ্গদেশ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। সমাজ-নীতিক, রাষ্ট্রনীতিক ও অর্থনীতিক দাসত্বের প্রতিকারস্বরূপ সকল দেশবাসীকে সংহত করিবার ব্যাপক উদ্যম দিকে দিকে চলিতে লাগিল। সংস্কৃতি, সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতির শ্রীবৃদ্ধিসাধন ও জাতি-বর্ণনির্ব্বিশেষে নিরক্ষর, দরিদ্র, পতিত, অস্পৃশ্য, রুগ্ন, নিরাশ্রয়, বিপদগ্রস্ত দেশবাসীর সেবার ভিতর দিয়া বাংলার জাগ্রত জাতীয়তা দিগ্বিজয় করিতে ছুটিল। যুগযুগান্তের সঞ্চিত অনৈক্য ও অসামঞ্জস্যের আবর্জ্জনা ভাসাইয়া ক্রমে ক্রমে বাংলার এই জাতীয় ভাব-প্রবাহ সমগ্র ভারতকে পরিপ্লাবিত করিল। এইরূপে এক সময়ে যে বাংলাদেশ ভারতকে জাতীয় ভাবের মন্দাকিনী-প্রবাহে স্নাত করিয়াছে, আজ সেই দেশ মুষ্টিমেয় প্রতিক্রিয়াশীল ভাগ্যান্বেষী ব্যক্তির ক্রীড়নকরূপে নিতান্ত জঘন্য সাম্প্রদায়িকতার লীলাক্ষেত্রে পরিণত! সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়াচার্য্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মভূমি'তে—জাতীয়তার জন্মদাতা স্বামী বিবেকানন্দের জন্মক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান-বিরোধ বাঙালীজাতির দুরপনেয় কলঙ্ক!

স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে আলমোড়া হইতে নাইনীতালের জনৈক মুসলমান ভদ্রলোককে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে হিন্দু-মুসলমান-সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত স্পষ্ট। তিনি লিখিয়াছিলেন, "আমাদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও ইসলাম ধর্ম্মরূপ এই দুই মহান্ মতের সমন্বয়ই—বৈদান্তিক মস্তিষ্ক এবং ইস্‌লামীয় দেহ—একমাত্র আশা। * * আমার মাতৃভূমি যেন ইস্‌লামীয় দেহ এবং বৈদান্তিক হৃদয়রূপ এই দ্বিবিধ আদর্শের বিকাশ করিয়া কল্যাণের পথে অগ্রসর হয়েন।" গভীর পরিতাপের বিষয় যে, হিন্দু বা মুসলমান কোন জাতিই এ পর্য্যন্ত এই পথে অগ্রসর

হইয়া ব্যাপকভাবে ভারতের এই স্বগৃহউচ্ছেদকর সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে নাই।

স্বামীজির উল্লিখিত 'বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও বৈদান্তিক হৃদয়' বাক্যের অর্থ—সমদর্শনের সমর্থক বেদান্তদর্শনের নির্দ্দেশ মত 'সমগ্র মানবজাতিকে নিজ আত্মা বলিয়া দেখা এবং সকলের সঙ্গে তদনুরূপ ব্যবহার করা।' 'ইস্‌লামীয় দেহ' বাক্যের অর্থ—'ইস্‌লামপন্থিগণ যেমন তাঁহাদের সমাজের দিক দিয়া পরস্পরকে নিজ আত্মার মত এক বলিয়া দেখেন এবং তদনুরূপ ব্যবহার করেন।' সর্ব্বোচ্চ দার্শনিক তত্ত্বহিসাবে হিন্দুধর্ম্ম-সম্প্রদায় মাত্রই মানুষে মানুষে যে একত্ব ও অভেদত্ব প্রচার করে, ইস্‌লাম-সমাজ ব্যবহারিক জীবনে তাহা কর্ম্মে পরিণত করিয়াছে। ইস্‌লামের এই সামাজিক সাম্যকে লক্ষ্য করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ মুগ্ধান্তকরণে লিখিয়াছেন, "বেদান্তের মতবাদ যতই সূক্ষ্ম ও বিস্ময়কর হউক না কেন, কর্ম্মপরিণত ইস্‌লাম-ধর্ম্মের সহায়তা ব্যতীত তাহা মানব সাধারণের অধিকাংশের নিকট সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক।" আমেরিকায় একটি বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, "মোহাম্মদ দেখাইয়া গিয়াছেন—মুসলমানদের মধ্যে কোন ভেদ না রাখিয়া ভ্রাতৃত্বের দৃঢ় সঙ্ঘবদ্ধতা। তুরস্কের সুলতান আফ্রিকার বাজার হইতে একজন নিগ্রোকে ক্রয় করিলেন, কিন্তু ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করার পর যোগ্যতা, গুণ ও সামর্থ্য থাকিলে সে সুলতানের কন্যাকে বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু আমরা হিন্দুরা ?"

হিন্দুরা অপরকে ধর্ম্মোপদেশ দিতে যাইয়া বলেন, "জীবো ব্রহ্মৈব না পরঃ", "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু" কিন্তু কাজের বেলায়—"ছুঁয়োনা, ছুঁয়োনা!" হিন্দু পণ্ডিত মুখে বলেন, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্", কিন্তু কার্য্যত তাঁহার সমাজ তাঁহার দ্বারাই শত ভেদ সহস্র বৈষম্যের লীলানিকেতনে পরিণত! হিন্দুর পারমার্থিক ও ব্যবহারিক জীবন সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবাপন্ন। ধর্ম্মক্ষেত্রে হিন্দু বেদান্তের সাম্য ও সমত্বকে আদর্শ বলিয়া প্রচার করিয়াও সমাজক্ষেত্রে সে অসাম্য ও অস্পৃশ্যতার সমর্থক। এই জন্য দেখা যায়, ধর্ম্মের দিক দিয়া উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত অস্পৃশ্য শ্রেণীর অবতারকল্প ধর্ম্মাচার্য্যদের মূর্ত্তি গড়িয়া তাঁহাদের উপাস্য দেবতার সঙ্গে একাসনে বসাইয়া মন্দিরে মন্দিরে তাঁহাদিগকে পূজা করিতেও দ্বিধা করেন না* কিন্তু সমাজের দিক দিয়া অস্পৃশ্য জাতি উচ্চবর্ণের নিকট চিরকাল অস্পৃশ্যই থাকিয়া যায়; তাহারা যতই উন্নতিলাভ করুক, তাহাদের উঠিবার উপায় নাই—পালাইবার পথ নাই! এই অস্বাভাবিক সামাজিক বৈষম্যের জন্য হিন্দুদের উচ্চশ্রেণীর সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর অত্যন্ত প্রভেদ। হিন্দুসমাজের এই বৈষম্যের সুযোগ লইয়া "তপশীলভুক্ত" জাতি নামক একটি 'অমুসলমান' (?) শ্রেণী সৃষ্টি করিয়া হিন্দুজাতিকে রাষ্ট্র-ক্ষেত্রে দ্বিধা বিভক্ত করা হইয়াছে। এই শ্রেণীর নেতৃবৃন্দের মধ্যে ইদানীং অধিকাংশই আপনাদের স্বজাতির স্বার্থ-সংরক্ষণের নামে জাতীয়তা-বিরোধী সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার বিষময় ফলস্বরূপ হিন্দু-মুসলমান-বিরোধের ন্যায় হিন্দুদের স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য জাতিবিরোধও ভারতে সংঘবদ্ধ জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠার পথে এক দুর্লংঘ্য বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। এ যেন হিন্দুজাতির স্বখাদ সলিলে নিমজ্জন। যে দরিদ্র নিম্নশ্রেণী হিন্দুসমাজের প্রাণ, তাহাদিগকে অবহেলা করার ফলেই হিন্দুর সমষ্টি জীবন চিরকাল অবহেলিত হইয়াছে। হিন্দুসমাজের এই দৃশ্যে ব্যথিত হইয়া স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "মুসলমানের ভারতাধিকার দরিদ্র পদদলিতদের উদ্ধারের কারণ হইয়াছিল।

* দক্ষিণ-ভারতের বিখ্যাত মন্দিরসমূহে অস্পৃশ্য আচার্য্য নন্দ, চোকামেলা, তিরুপ্পন আলোয়ার, নম্পোদোরান প্রভৃতি পূজিত হইতেছেন।

এই জন্যই আমাদের এক পঞ্চমাংশ ভারতবাসী মুসলমান হইয়া গিয়াছিল। কেবল তরবারির বলে ইহা সাধিত হয় নাই।" আর এই জন্যই শতলাঞ্ছনাবিড়ম্বিত হিন্দুনামধেয় "তপশীলভুক্ত শ্রেণী" সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমানদের সঙ্গে আজ একযোগ হইয়া উচ্চবর্ণের হিন্দুদের হৃদয়হীন ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতেছে।

দুঃখের বিষয় যে, হিন্দুসমাজের এই অনাচরণীয়—অস্পৃশ্য জাতিসমূহের মধ্যেও অসংখ্য শ্রেণী বিভাগ আছে। ইহাদের পরস্পরের মধ্যেও এক-শ্রেণী অপর শ্রেণীর নিকট অনাচরণীয়—অস্পৃশ্য। স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য উভয় শ্রেণীর সামাজিক দৃষ্টিতে মুসলমান অস্পৃশ্য—যবন, খৃষ্টান অস্পৃশ্য—ম্লেচ্ছ। অহিন্দু জাতিভুক্ত কেহ হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিলে তাহাকে একাকী এক নূতন সমাজ সৃষ্টি করিয়া ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ দূরের কথা অস্পৃশ্য বর্ণের নিকটও অস্পৃশ্য হইয়া থাকিতে হয়। ইদানীং হিন্দুদের মধ্যে 'শুদ্ধি' চলিতেছে বটে কিন্তু ধর্ম্মের দিক দিয়া এই 'শুদ্ধি' এক শ্রেণী কর্ত্তৃক সমর্থিত হইলেও সমাজের দিক দিয়া শুদ্ধ ব্যক্তিগণ পরিগৃহীত হইতেছে না। বিরাট হিন্দুসমাজে এই শ্রেণীর কোন স্থান নাই। এই আত্মঘাতী নীতির ফলে ৬০ কোটি হিন্দু ২২ কোটিতে পরিণত হইয়াছে। এই সংকীর্ণ সামাজিক দৃষ্টির জন্য হিন্দু-মুসলমান-মানুষটিকে সামাজিকভাবে খারাপ মনে করে কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম পরধর্ম্ম সহিষ্ণু উদার বলিয়া হিন্দুমাত্রই মুসলমানধর্ম্মের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা দেখায়। হিন্দু মনে করে—মুসলমানধর্ম্ম মন্দ নয় কিন্তু মুসলমান-মানুষটি খারাপ। ধর্ম্মের নির্দ্দেশে হিন্দু-সমাজ নিয়ন্ত্রিত না হইয়া অসাম্য-অনৈক্যবর্দ্ধক কতকগুলি প্রাদেশিক আচার নিয়মদ্বারা পরিচালিত হওয়ার জন্যই হিন্দুর ঘরে বাহিরে অসাম্য দৃষ্টি—হিন্দুর এই অধঃপতন। হিন্দুর ধর্ম্মসাধনায় সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে, এজন্য হিন্দুধর্ম্ম শ্রেষ্ঠধর্ম্ম বলিয়া জগতে সম্মানিত কিন্তু হিন্দুর সমাজে স্বাধীনতা নাই, এজন্য হিন্দুসমাজ হিন্দুর সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির অন্তরায়। প্রত্যেক মানুষের সকল বিষয়ে উন্নতি-লাভ করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও সুযোগ থাকা আবশ্যক। অন্যথা বিরোধ অপরিহার্য্য। হিন্দুকে সমাজের ভেদ, বৈষম্য, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি নষ্ট করিয়া স্বগৃহে সাম্য স্থাপন এবং মুসলমানের সহিত ঐক্যবদ্ধ হইতে হইলে স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশ মত তাহার পারমার্থিকতার নির্দ্দেশে—সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার আদর্শে সমাজকে পুনর্গঠন করিতে হইবে। তাহাকে বুঝিতে হইবে যে, তাহার স্বগৃহে জাতিতে জাতিতে বিরোধ অধিকার-তারতম্যপ্রসূত। সমাজের সকল শ্রেণীর ভোগাধিকার-সাম্যসাধন ভিন্ন এই বিরোধের অবসান অসম্ভব। ইস্‌লাম সমাজের সাম্যও ইস্‌লামপন্থীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, এজন্য এই দিক দিয়া ইহাও সংকীর্ণ। হিন্দুকে এই সংকীর্ণতারও বাহিরে যাইয়া বেদান্ত-ভিত্তিতে চূড়ান্ত সাম্যের আদর্শে তাহার সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। বেদান্তের একত্বকে সমাজ-জীবনে কর্ম্মে পরিণত করিবার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুকে যে পথ দেখাইয়া গিয়াছেন, সে পথে অগ্রসর হয় নাই বলিয়াই আজও ভারতে অস্পৃশ্যতা ও হিন্দু-মুসলমান-সমস্যা গুরুতর।

স্বামী বিবেকানন্দ যেমন পঞ্চমুখে ইস্‌লামীয় সমাজের প্রশংসা করিয়াছেন, তেমন জোরের সহিত একশ্রেণীর মুসলমানের পরধর্ম্ম-অসহিষ্ণুতা ও অনৌদার্য্যের নিন্দা করিয়াছেন। ক্যালিফোর্ণিয়ার সেক্সপীয়ার ক্লাবে একটি বক্তৃতাপ্রদান-প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, "তাঁহাদের (একশ্রেণীর মুসলমানদের) মূলমন্ত্র হইতেছে—ঈশ্বর এক এবং একমাত্র মহম্মদই তাঁহার দূত, এই জন্য বাহিরের যাহাকিছু তাহা যে কেবল মন্দ তাহা নহে, তাহাকে ধ্বংস করা চাই তৎক্ষণাৎ। এ বিশ্বাস যাহার

নাই, তাহাকে হত্যা কর; ইহা ভিন্ন অন্য প্রকারের পূজা যাহারা করে, তাহাদের সে পূজা নাশ কর; এতদ্ব্যতীত অন্য কথা যে পুস্তকে আছে, তাহা দগ্ধ কর। প্রশান্ত মহাসাগর হইতে আটলান্টিক মহাসাগর পর্য্যন্ত পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া পৃথিবীতে রক্তের বন্যা বহিল। এই 'ইস্‌লাম'! অবশ্য ইহা সত্ত্বেও ইস্‌লামের মধ্যে যে মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন—এই নিষ্ঠুরতার প্রতিবাদ। তিনিই পাইয়াছেন দিব্য স্পর্শ, সত্য স্পর্শ।" উল্লেখ বাহুল্য যে, এজন্য ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহম্মদ দায়ী নহেন, দায়ী তাঁহার এক শ্রেণীর অযোগ্য অনুচরবৃন্দ—যাঁহারা ধর্ম্ম লইয়া খেলা করিয়াছেন।

বর্ত্তমানকালেও দেখা যায়, এক দল গোঁড়া মুসলমান ইস্‌লাম ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া আজও স্বীকার করেন না। বিধর্ম্মী হত্যাকারী মুসলমানকে তথাকথিত 'আলেমগণ' 'সহিদ' বলিয়া সম্মান করেন। বর্ত্তমানকালেও এইরূপ বৈরিতাবুদ্ধির দৃষ্টান্তের অভাব নাই। অন্যান্য ধর্ম্মের উপাসনালয়, মঠ, মন্দির, বিহার, দেবদেবী, প্রতীক প্রভৃতি গোঁড়া মুসলমানের চক্ষে পৌত্তলিকতা। এই পৌত্তলিকতা যাঁহারা নাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধর্ম্মান্ধ মুসলমানগণ গৌরবের দৃষ্টিতে দেখেন। এই ধর্ম্মোন্মত্ত ব্যক্তিদের নিকট হিন্দু মানুষ হিসাবে মন্দ নয় কিন্তু ধর্ম্ম হিসাবে সে অবিশ্বাসী—নরকের যাত্রী—কাফের! হিন্দু স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান হইলে ইস্‌লামপন্থীদের আনন্দের সীমা থাকে না, ইস্‌লাম সমাজে তাহাকে সম্মানিত আসন দেওয়া হয়। পাশ্চাত্ত্যজাতির নিকট যেমন খৃষ্টধর্ম্ম + পাশ্চাত্ত্য ভাব = পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা বলিয়া পরিচিত, মুসলমানদের মধ্যে অত্যুগ্র গোঁড়া সম্প্রদায়ের নিকট তেমন ইস্‌লাম ধর্ম্ম + আরবীয়ভাব = ইস্‌লাম সংস্কৃতি বলিয়া পরিগণিত। এই জন্য ভারতের ভাষা, বেশভূষা, সাহিত্য, শিল্প, সংগীত, সংস্কৃতি প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া ইহাদের স্থলে আরবীয়ভাব চালাইতে ইঁহারা এখনও বদ্ধপরিকর। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, নব্য-তুরস্কের রাষ্ট্রনায়ক গাজী মুস্তাফা কামালপাশা যে আরবী ভাষা, বর্ণমালা, বেশভূষা প্রভৃতিকে জাতীয় উন্নতির পরিপন্থী জ্ঞানে নির্ম্মমভাবে বর্জ্জন করিয়াছেন, এমন কি নব্য-আরবের রাষ্ট্রপতি ইবন সাউদ, আমিন রিহানী, ইমাম প্রভৃতি জাতীয় উন্নতির বিঘ্ন বলিয়া যে প্রাচীন আরবীয়ভাব পরিত্যাগ করিয়াছেন, ভারতের সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমানগণ তাহাকেই ইস্‌লামের বিশেষত্ব রক্ষার উপায় মনে করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছেন। হিন্দু—তথা ভারতীয়-ভাবের নাম-গন্ধ যাহার মধ্যে তাহারই বিরুদ্ধে এই ধর্ম্মধ্বজীদের 'জেহাদ' ঘোষণা! ভারতের সর্ব্বজনপ্রিয় জাতীয় সংগীত "বন্দেমাতরম্" ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "শ্রী ও পদ্ম"যুক্ত মনোগ্রাম ও সংস্কৃত প্রভাবাপন্ন ভারতীয় ভাষাসমূহের বিরুদ্ধে এই জন্যই সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমানদের আন্দোলন। মুসলমানদের এই সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি পরিবর্ত্তিত না হইলে "বন্দেমাতরম্", "শ্রী", "পদ্ম" ও "মস্‌জিদের নিকট হিন্দুর বাদ্য"-সমস্যার ন্যায় আরও অনেক সমস্যা আসিয়া উপস্থিত হইবে।

মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা যাঁহাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে, তাঁহারা ভারতের মুক্তি-আন্দোলনের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। ভারতের স্বধর্ম্মিগণকে সংঘবদ্ধ করিয়া আপন সম্প্রদায়ের স্বার্থ-সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ করিতে এবং ইরাণ, তুরাণ প্রভৃতি দেশের ইস্‌লামপন্থিগণের সঙ্গে কুটুম্বিতা পাতাইয়া "প্যান্-ইস্‌লাম" চালাইতে ইঁহারা ব্যস্ত। জগতের উন্নত জাতিসমূহের ন্যায় এই শ্রেণীর মুসলমানদের স্বাদেশিকতা বা নেশনবাদ ভূমি বা স্বদেশগত (territorial) ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। জন্মভূমি বা মাতৃভূমিকে ইঁহারা

স্বদেশ বলিয়া স্বীকার করেন না। ইঁহাদের স্বদেশ-প্রীতি সকল দেশের স্বধর্ম্মিগণকে লইয়া। কয়েক বৎসর হয় ভারতের 'খিলাফৎ' আন্দোলনকারীদের পক্ষ হইতে ইস্‌লাম জগৎমান্য আগা খাঁ বিলুপ্ত খলিফা পদের পুনঃপ্রবর্ত্তন সমর্থন করিয়া নব্য-তুরস্কের একটি বিখ্যাত সংবাদ পত্রে একটি প্রবন্ধ পাঠাইয়াছিলেন। এই প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য সম্পাদক রাজদণ্ডে দণ্ডিত হন। বিচারক রায় প্রদান-প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন, "তুরস্ক সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র, পরাধীন ভারতীয় মুসলমানের এ বিষয়ে উপদেশ দেওয়া ধৃষ্টতা মাত্র।" এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া দেখান যাইতে পারে যে, স্বাধীন মুস্‌লিম রাষ্ট্রসমূহের স্বধর্ম্মাবলম্বীদের সঙ্গে ইঁহারা আত্মীয়তা স্থাপন করিতে আগ্রহান্বিত বটেন, কিন্তু তাঁহারা ইঁহাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করিতে অসম্মানবোধ করেন। তুরস্ক, পারস্য, মিশর, আরব প্রভৃতি দেশের স্বাধীন মুসলমান স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া গর্ব্ব করেন, কিন্তু ধর্ম্মভাবোন্মত্ত ভারতীয় মুসলমানের নিকট ভারতের অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ তিনটিই উপেক্ষিত। নব-প্রবর্ত্তিত শাসনতন্ত্রের "সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের" কৃপায় ধর্ম্ম-ভিত্তিতে ব্যবস্থাপরিষৎ ও ব্যবস্থাপক সভাতে দেশীয় সদস্য নির্ব্বাচন এবং সরকারী চাকুরী প্রদানের ফলে এই শ্রেণীর শিক্ষিত মুসলমানগণ বিশেষ সুবিধা পাইয়া স্ব সম্প্রদায়ের স্বার্থ-সংরক্ষণের নামে আপন স্বার্থ চরিতার্থ করিবার জন্য উৎকট সাম্প্রদায়িকতা বিষে দেশকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিয়াছেন।

এই আলোচনায় স্পষ্ট যে, যে পর্য্যন্ত ভারতীয় মুসলমানগণ পরধর্ম্ম-অসহিষ্ণুতা, অস্বাভাবিক আরবীয়ভাবপ্রীতি, বিশ্ব মুস্‌লিম-সংহতি, সাম্প্রদায়িকতা—এক কথায় মধ্যযুগীয় মনোবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টাননির্ব্বিশেষে সকল ভারতবাসীর উন্নতি-অবনতির সঙ্গে আপনাদের উন্নতি-অবনতিকে এক করিয়া ভারতীয় জাতীয়তায় প্রবুদ্ধ না হইবে, সে পর্য্যন্ত হিন্দু মুসলমান সমস্যার সমাধান সুদূরপরাহত থাকিবে। সুখের বিষয় যে, শিক্ষিত জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ জাতীয়ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহাদের স্বার্থসর্ব্বস্ব স্বধর্ম্মাবলম্বীদের সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করিয়াছেন। ইঁহাদের চেষ্টায় মুসলমানগণ ক্রমেই অধিক সংখ্যায় ভারতের জাতীয় পতাকার নিম্নে সমবেত হইতেছেন।

হিন্দু মুসলমান উভয় শ্রেণীই ভারতের স্থায়ী অধিবাসী, কাজেই রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক স্বার্থ উভয়ের সম্পূর্ণ এক। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়েও উভয়ের স্বার্থ অচ্ছেদ্য সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ। সুতরাং এক সম্প্রদায়কে 'কোণঠেসা' করিয়া অপর সম্প্রদায়ের উন্নতিলাভ অথবা হিন্দু বা মুস্‌লিমরাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা উভয়ের পক্ষে আত্মহত্যার নামান্তর। উভয় শ্রেণীকে বুঝিতে হইবে যে, আজ দারিদ্র্যের গভীরতম পঙ্কে নিমগ্ন ভারতবাসীর নিকট হিন্দু বা মুসলমান কোন নামেরই কোন মূল্য নাই, অন্ন-বস্ত্রের সংস্থানই বর্ত্তমানে সকল ভারতবাসীর সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর সমস্যা এবং ইহার সমাধান সম্পূর্ণ নির্ভর করে উভয় সম্প্রদায়ের সম্মিলিত সংহতিশক্তি প্রতিষ্ঠার উপর। ইহার অভাবেই উভয় জাতির দুঃখ দৈন্য দুর্দ্দশা সমানভাবে চরমে উঠিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "আমার গুরুদেব বলতেন, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি নাম মানুষে মানুষে পরস্পর ভ্রাতৃভাবের বিশেষ প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। আগে আমাদিগকে ঐগুলো ভেঙ্গে ফেলবার চেষ্টা করতে হবে। উহারা নিজেদের শুভকারিণী শক্তি হারিয়ে ফেলেছে—এখন উহারা কেবল অশুভ ফল বিস্তার করছে। উহাদের কুৎসিত কুহকে পড়ে আমাদের মধ্যে যাঁরা বিশেষ গুণী তাঁরা পর্য্যন্ত অসুরবৎ ব্যবহার করে থাকেন।

এখন আমাদিগকে ঐগুলি ভাঙ্গবার জন্য চেষ্টা করতে হবে এবং আমরা এ বিষয়ে নিশ্চয় কৃতকার্য্য হব।" ভারতের নব-প্রবর্ত্তিত জাতীয়তার পুণ্য-সলিলে অবগাহন করিয়া হিন্দু-মুসলমান প্রমুখ সকল ভারতবাসী নামগত বিভেদ ভুলিয়া ভারতীয় নাম গ্রহণ করিবে। কালের নির্দ্দেশে প্রয়োজনের তাড়নায় হিন্দু-মুসলমান এই পথেই চলিয়াছে এবং ইহাই যে ভারতের মুক্তিপথ তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

জগতের আধ্যাত্মিকতার জন্মভূমি ভারতবর্ষের আবহাওয়ার একটি অস্বাভাবিক গুণ আছে। বিভিন্ন ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি এখানকার প্রাকৃতিক প্রভাবে এক আশ্চর্য্য সামঞ্জস্যে সমন্বিত হয়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়—অনেক বিজেতৃ জাতিকে ভারতবর্ষ এই শক্তিদ্বারা জয় করিয়াছে। গ্রীক, শক, হুন, কুশান প্রভৃতি জাতি ভারত বিজয় করিতে আসিয়া ভারতের বিরাট অঙ্গে অঙ্গীভূত হইয়াছে। যে গ্রীকদর্শন প্রতীচ্য দর্শনের মূল উহাও ভারতীয় দর্শনের ছায়া বলিয়া ঐতিহাসিকগণ প্রমাণ করিয়াছেন। বর্ত্তমানকালেও দেখা যায়, বিশ্ববিজয়ী পাশ্চাত্ত্য জাতিসমূহ ভারতের ধর্ম্ম, দর্শন ও সংস্কৃতির দ্বারা ক্রমেই অধিকমাত্রায় প্রভাবান্বিত হইতেছেন। পিথাগোরাস্, প্লেটো, হেগেল প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া নিট্‌জে, কাণ্ট, সোপেন্‌হাওয়ার, ম্যাক্সমুলার, পল্‌ডয়সন্, রোঁমারোঁলা প্রমুখ আধুনিক পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকগণের চিন্তার উপর ভারতের প্রভাব সুস্পষ্ট। ভারতের মাটীতে যিনিই দীর্ঘকাল বাস করিয়াছেন, ভারতের সংস্কৃতি তাঁহারই মনোবৃত্তির উপর একটি স্থায়ী ছাপ দিয়াছে। বিদেশাগত মুসলমানগণ শত শত শতাব্দী যাবৎ ভারতে বাস করিয়া হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ ও পারসিক—তথা ভারতের ধর্ম্ম, দর্শন ও সংস্কৃতির ছোঁয়াচ যথেষ্ট পাইয়াছেন। চেষ্টা করিয়াও এই প্রভাব অতিক্রম করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই এবং হইবেও না। এ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "বেদান্ত ধর্ম্মের উদার ভাব ইস্‌লামকে অনেক প্রভাবান্বিত করিয়াছে। অন্যান্য দেশের মুসলমান ও ভারতের মুসলমান স্বতন্ত্র। বাহির হইতে অন্য মুসলমান আসিয়া যখন বলে যে, সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্ম্মী এক জাতির সঙ্গে তাহারা বাস করিতেছে, তখনই ভারতীয় মুসলমান ক্ষিপ্ত হইয়া থাকে।" হিন্দুধর্ম্মের প্রভাবেই যে মুসলমানদের মধ্যে সুফী, ছেতরামী, পীরপন্থী, পটুয়া, বাহাই, সত্যপীর, দরবেশ, আমেদিয়া, খোঁজা, হানাফী, চিশতিয়া, নকশীবন্দিয়া প্রভৃতি অগণন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে এই সকল সম্প্রদায়ের প্রভাবও কম নহে। পক্ষান্তরে ভারতীয় জাতি—বিশেষ করিয়া হিন্দু, ইস্‌লামের প্রভাবে সমান ভাবেই প্রভাবান্বিত হইয়াছে। ভারতের মধ্যযুগের রামানন্দ, কবীর, রুহিদাস, নানক, দাদু, মধ্ব, নিম্বার্ক, চৈতন্য প্রভৃতি হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর রামমোহন, দয়ানন্দ, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ও আধুনিক সংখ্যাতীত অভিনব ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকগণের মতবাদের উপর ইস্‌লামের প্রভাব যথেষ্ট। বর্ত্তমানে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মকে এই সকল মতবাদের সমষ্টি বলা যাইতে পারে। আধুনিক ভারতের হিন্দু ও ইস্‌লাম উভয়ই যে পারস্পরিক আদান প্রদান সম্ভূত অভিনব ধর্ম্ম সে সম্বন্ধে শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে কোন মতভেদ নাই। কেবল ধর্ম্মের দিক দিয়া নয়, ভারতের সাহিত্য, শিল্প, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রেও হিন্দু-ইস্‌লাম গঙ্গা-যমুনার মত এক হইয়া সমুদ্র অভিমুখে ছুটিয়াছে। ভারতে এই সকল উন্নত বিষয়ের মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, পারসিক, মুসলমান, খৃষ্টানের বৈশিষ্ট্যের ছাপ কাহার কতখানি তাহা বিশেষজ্ঞদের গবেষণার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সকল কাল্‌চার ভারতের মাটীর গুণে

সমন্বিত হইয়া আধুনিক ভারতীয় কাল্‌চার আপন বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বহুত্বের মধ্যে একত্বের সন্ধান দিয়া এই কাল্‌চার আপন মহিমায় আপনি মহিমান্বিত হইয়া জগতের শ্রদ্ধা-দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলন রূপায়িত হইয়াই যে বর্ত্তমান ভারতের সৃষ্টি হইয়াছে সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। সমন্বয়াচার্য্য শ্রীরামকৃষ্ণ এই সম্মিলিত সংস্কৃতির জীবন্ত বিগ্রহ। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "বিক্ষিপ্ত আধ্যাত্মিক শক্তি-সমূহের একত্র সমাবেশের উপর ভারতের জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা নির্ভর করে।" কূট রাজনীতি সহায়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে স্থায়ী ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। প্রকৃত ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য আবশ্যক—হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের বিরোধী মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন। যথার্থ ধর্ম্মজ্ঞানই এই পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে সক্ষম; কারণ, এক ভগবান লাভই সকল ধর্ম্মের লক্ষ্য। এ জন্য হিন্দুকে খাঁটি হিন্দু ও মুসলমানকে খাঁটি মুসলমান হইয়া সকল ধর্ম্মকে অভিন্ন জ্ঞানে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইতে হইবে। বিচিত্র বর্ণের সুদৃশ্য ফুলের তোড়ার মত বিক্ষিপ্ত আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহ নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও সম্মিলিত হইয়া ভারতের জাতীয় ঐক্যের প্রতীক শ্রীরামকৃষ্ণরূপে প্রকটিত। সমগ্র দেশের সমষ্টি জীবনে এই প্রতীককে রূপায়িত করাই হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়।

গৌড়পাদ

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য

গৌড়পাদের আগম শাস্ত্র বা মাণ্ডুক্যকারিকার আমি যা একটু সামান্য আলোচনা করিয়াছি, আমার বন্ধুদের মধ্যে কেহ কেহ তাহার প্রতিকূল সমালোচনা করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ বেদান্তভূষণ মহাশয় অন্যতম। ইনি আনন্দবাজার-পত্রিকায় যাহা লিখিয়াছেন সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য ঐ পত্রিকাতেই প্রকাশিত হইয়াছে।* তিনি উদ্বোধনে (শ্রাবণ, ১৩৪৪) যাহা বলিয়াছেন তাহাতে আমার বলিবার কথা কয়টি এখানে নিবেদন করিতেছি।

প্রথমেই দেখিতেছি বেদান্তভূষণ মহাশয় অত্যন্ত অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছেন, বড় রাগ করিয়াছেন, কটূক্তিও করিয়াছেন অনেক। তিনি যদি ইহাতে কোন লাভ দেখিয়া থাকেন বা আনন্দ পাইয়া থাকেন তো ভাল। আমার কিছু বলিবার নাই। আমি ভাবিব তিনি যেন কটূক্তি করেন নাই, আর আমিও যেন তাহা পড়ি নাই। আর নিজের প্রতি আমার এই আশীর্বাদ, তাঁহার উপরে আমার যে প্রীতি আছে তাহা যেন অব্যাহত থাকে। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী মহাশয়ের (দৈনিক বসুমতী, ২৭শে ভাদ্র, ১৩৪৪) অথবা এইরূপ অপর কোন কোন সমালোচক মহাশয়েরও (যাঁহাদের লেখা আমার চোখে পড়িয়াছে বা পড়ে নাই) সম্বন্ধে আমার এই প্রার্থনা।

বেদান্তভূষণ মহাশয় স্পষ্টই আমাকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন (পৃঃ ৩৭২) 'গৌড়পাদ মাণ্ডূক্যকারিকায় "দ্বিপদাংবরকে" প্রণাম করিতেছেন বলিয়া গৌড়পাদ বৌদ্ধ অথবা বৌদ্ধমতানুসারী।…অতএব গৌড়পাদ

* আনন্দবাজার পত্রিকা, ১১ই মাঘ ১৩৪৪।

বৌদ্ধ।' এ কথা আমি কোথাও বলি নাই, এখনও বলি না। তিনি যে বৈদান্তিক এই কথাই আমি আমার লেখায় অতি স্পষ্টভাবে বলিয়াছি। মাণ্ডূক্য-কারিকার চতুর্থ প্রকরণে তিনি যে, বুদ্ধকে প্রণাম করিয়াছেন, এবং বৌদ্ধ দর্শন আলোচনা কবিয়াছেন, ইহাই আমি বলিয়াছি। এ ধারণা এখনও আমার আছে।

'দ্বিপদাংবর' বলিতে বুদ্ধকে আমি কেন বুঝিতেছি তাহা আমাব মূল লেখায় বলিয়াছি, আনন্দবাজাব পত্রিকাতেও বেদান্তভূষণ মহা-শয়েব প্রতিবাদেব উত্তবেও লিখিয়াছি। এইরূপ স্থলে দ্বিপদ্ অথবা দ্বিপদ শব্দেব অর্থ মানব, আব বব শব্দেব অর্থ শ্রেষ্ঠ, তাই এখানে মানবশ্রেষ্ঠেব কথা বলা হইতেছে। বেদান্তভূষণ মহাশয় মহাভাবতেব বচন তুলিয়া নারায়ণকে বুঝাইতে 'দ্বিপদাং বরিষ্ঠ' শব্দের প্রয়োগ হয় ইহা দেখাইয়াছেন সত্য, কিন্তু এ নারায়ণ হইতেছেন ঋষি, অতএব মানব। তাই তাঁহাব কথা সমর্থিত না হইয়া আমবাই কথা সমর্থিত হইতেছে। আমি যে কেবল ঐ শব্দটিরই অর্থ লইয়া সিদ্ধান্ত কবিয়াছি তাহা নহে। ঐ কবিকাটিতে 'আকাশ' সদৃশ ও জ্ঞেয়েব সহিত অভিন্ন জ্ঞানের দ্বারা আকাশসদৃশ বিষয়সমূহকে যিনি ভাল কবিযা বুঝিয়াছিলেন' এই কথাটিকেও বিচাব কবিয়াছি। উপনিষদে জ্ঞান ও জ্ঞেয়কে কোথাও এইরূপে বর্ণনা কবা হইয়াছে তাহা আমি জানি না, অথচ বৌদ্ধশাস্ত্রে ইহা প্রচুব-ভাবে পাওয়া যায়। এই কারিকার পবেও যে সমস্ত কথা চতুর্থ প্রকরণে বলা হইয়াছে তাহাও ভাবিয়াছিলাম। অন্তত এইরূপে ব্যাখ্যা করা চলে কি না তাহাই বিচার্য। আমি কি করিয়া বলিতে পারি যে, আমি যাহা বলিয়াছি তাহাই হইল গৌড়পাদের অভিপ্রায়। ইহা হইতেও পারে, না-ও পারে। অন্যত্র বলিয়াছি, বেদান্ত সূত্রের যতগুলি ভাষ্য হইয়াছে তাহাদের মধ্যে কোন একটিই বেদব্যাসের সম্মত, সবগুলি নহে। অথবা এমনও হইতে পারে যে, ইহাদের কোনখানিই তাঁহার সম্মত নহে। ব্যাখ্যার কৌশলে কী না হয়।

ভগবান্ পুরুষোত্তম নারায়ণকেই যদি এখানে নমস্কার করা হইয়া থাকে তবে গ্রন্থকাব "তং বন্দে দ্বিপদাং ববম্" এই স্থলে "তং বন্দে পুরুষোত্তমম্" অনায়াসেই বলিতে পাবিতেন, এবং তাহা এই জন্য ভাল হইত যে, সাক্ষাৎভাবে সুস্পষ্টভাবে পুরুষোত্তমকে জানা যাইত, 'দ্বিপদাংবব' শব্দে পুরুষোত্তম, এবং তাহা দ্বাবা নাবায়ণকে বুঝিবার আবশ্যকতা হইত না। তবে ইহাতে আমবা বিশেষ জোব দিতে পাবি না, কাবণ গ্রন্থকার কত সময়ে কত ভাবে শব্দ প্রয়োগ কবেন। আব সব সময় সব গ্রন্থকার খুব খুঁটিনাটি করিয়াও শব্দ প্রয়োগ কবেন না, ইহাও আমরা জানি।

বেদান্তভূষণ মহাশয় "দ্বিপদাংব্রাহ্মণঃ শ্রেষ্ঠঃ গৌর্ববিষ্ঠা চতুষ্পদাম্" এই শ্লোকটি উদ্ধৃত কবিয়া লিখিয়াছেন "ইহা মহাভাবতে অন্ততঃ আট দশ-বাব দেখিতে পাওয়া যায়। সুতবাং আমাদের আর্য্য-শাস্ত্রে দ্বিপদাংবব কথাটী ব্রাহ্মণ অর্থেই ব্যবহৃত।" ইহা আলোচ্য অথবা ইহাব কোন উত্তর আবশ্যক বলিয়া আমার মনে হইতেছে না। এইরূপ "বুদ্ধ ক্ষত্রিয়েব সন্তান, তিনি ব্রাহ্মণের কার্য্য ধর্ম্মপ্রচাবে প্রবৃত্ত হইলে ব্রাহ্মণ পদবী তাঁহাতে আরোপ কবিবার প্রবৃত্তি তাঁহাব সম্প্রদায়েবই মধ্যে উদিত হওয়া স্বাভাবিক। মহাভাবতাদিতে ব্রাহ্মণ অর্থে বহুল প্রযুক্ত দ্বিপদাংববম্ শব্দটী যে তজ্জন্য বুদ্ধে আরোপিত হইবে ইহাই ত স্বাভাবিক।" এই কথারও উত্তর অনাবশ্যক।

বেদান্তভূষণ মহাশয়ের দ্বিতীয় কথা হইতেছে (পৃঃ ৫৭৩)—"মতসাম্য কথনই একের নিকট অপবের ঋণ সাব্যস্ত করিতে পারে না। স্বাধীনভাবে উদ্ভাসিত মতও একরূপ হইতে বহুস্থলে দেখা গিয়াছে।" উভয় কথাই সত্য। মনে রাখিতে হইবে

এ সম্বন্ধে আমি কিছু বলি নাই। তাই এ সম্বন্ধে কিছু বলিয়া পুঁথি বাড়াইতে চাই না। তবে এইটুকু বলিতে পারা যায় যে, যদি উভয়ের মধ্যে পরস্পর আদান প্রদানের সম্ভাবনা থাকে তবে পূর্বের নিকট হইতে পরের নিকটে তাহা আসিয়াছে তাহা সহজেই মনে হয়। তবে এরূপ অবস্থাতেও কোন কোন স্থলে ইহা না হইতেও পারে।

উপনিষদে অদ্বৈতবাদ নাই এ কথা কে বলিল? আমি বলি নাই। অদ্বৈতবাদ বৌদ্ধের দান এ কথাও আমি বলি নাই। তবে শঙ্করবেদান্তে বৌদ্ধপ্রভাব আছে ইহা অন্যান্য অনেকের ন্যায় আমারও মনে করিবার কারণ আছে।

বেদ উপনিষদ্ যে, বুদ্ধের পূর্বে ইহাতে কে আপত্তি করে? বৌদ্ধমতের বহু কথার বীজ উপনিষদে আছে ইহাই বা কে অস্বীকার করিবে? এই হিসাবে বেদ-উপনিষদেরই নিকট বৌদ্ধমত ঋণী, পরের কাছে পূর্বটি ঋণী নহে, ইহাই তো ঠিক কথা। তাই বলিয়া শঙ্কর-বেদান্ত বেদও নহে, উপনিষদও নহে, এবং তাহাতে যে বৌদ্ধপ্রভাব থাকিতেই পারে না, তাহাও নহে।

বেদান্তভূষণ মহাশয় গৌড়পাদ আগে না গৌতম বুদ্ধ আগে ইহা আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য, যদি গৌড়পাদ পূর্ববর্তী হন, তবে বলিতে পারা যায় তাঁহার কারিকার মধ্যে যাহা রহিয়াছে তাহাই লইয়া বুদ্ধদেব নিজের মত গড়িয়াছেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিতেছেন (পৃঃ ৩৭৮)—"গৌড়পাদের মধ্যে যে সব কথা আছে, তাহাই অবলম্বন করিয়া গৌতম বুদ্ধ তাঁহার মতবাদ গঠন করিয়াছেন। আর এতদুভয় অবলম্বন করিয়া বেনামী লঙ্কাবতারসূত্র ও নাগার্জুনের মাধ্যমিক-কারিকা প্রভৃতি গ্রন্থের আবির্ভাব হইয়াছে।" ইহা কতদূর ঠিক তা স্বতন্ত্র কথা। পাঠকেরা ইহা বিচার করিয়া দেখিবেন। কিন্তু এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ইহা দ্বারা বেদান্তভূষণ মহাশয় অজ্ঞাতসারে অন্তত কিছু না কিছু স্বীকার করিয়া ফেলিয়াছেন যে, মাণ্ডূক্যকারিকায় কিছু কিঞ্চিৎ বৌদ্ধ মত বা কথা আছে। তিনি আরও একস্থানে (পৃঃ ৩৭৮) বলিতেছেন—"বিজ্ঞানবাদ ও শূন্যবাদ উক্ত বৌদ্ধগ্রন্থে ("লঙ্কাবতারসূত্র ও মাধ্যমিককারিকাদি গ্রন্থে") বিস্তৃত থাকায় তাহার সার গৌড়পাদের কারিকা না হইয়া, তাহারা গৌড়পাদের কারিকারই বিস্তৃতরূপ—বলিব। কারণ, সূত্র জাতীয় গ্রন্থ ভিন্ন স্থলে বিস্তার হইতে সংক্ষেপ কল্পনা করা অপেক্ষা, সংক্ষেপ হইতে বিস্তারের কল্পনাই সহজ ও স্বাভাবিক।" অপর এক স্থানেও (আনন্দবাজার পত্রিকা) তিনি এই কথা লিখিয়াছেন—"আমরা নানা কারণে ভাবিতে বাধ্য হইয়াছি যে, এই গৌড়পাদকারিকা তৎপরবর্তী গৌতম বুদ্ধ ও তাঁহার অনুগামিগণের মতের মূল। ইহারই শব্দাদি বৌদ্ধগ্রন্থে দৃষ্ট হইয়া থাকে।" ইহার পর তিনি বলিতেছেন—"এ বিষয়ে শাস্ত্রী মহাশয়ের মত হইতে আমাদের মত সম্পূর্ণ বিপরীত।" ঠিক কথা, আমাদের উভয়ের মত সম্পূর্ণই বিপরীত।

গৌড়পাদ যদি বুদ্ধের পূর্ববর্তী হন, তবে তাঁহার কারিকায় কিরূপে বুদ্ধের নাম থাকিতে পারে? তিনি বলেন, সে এক প্রাচীন বুদ্ধ, গৌতম বুদ্ধ নহেন। আচ্ছা, ইহা ধরিয়া লওয়া গেল। তথাপি বেদান্তভূষণ মহাশয় নিজেরই কথায় গৌড়পাদের কারিকায় বুদ্ধমত থাকার কথা যে, অজ্ঞাতসারে স্বীকার করিতেছেন তাহা দেখা যাইতেছে।

বেদান্তভূষণ মহাশয়ের মতে গৌতম বুদ্ধ হইলেন গৌড়পাদের পরে, আর ইঁহার পূর্বে হইল প্রাচীন বুদ্ধ, যাঁহাকে গৌড়পাদ উল্লেখ করিয়াছেন। বৌদ্ধ গ্রন্থেই পাওয়া যায় গৌতম বুদ্ধের আগে আরও অনেক বুদ্ধ হইয়াছিলেন। ঠিক কথা বৌদ্ধদেরই মতে গৌতম বুদ্ধের আগে অনেক বুদ্ধ ছিলেন। কিন্তু ইঁহাদের কোন ঐতিহাসিকতা নাই।

যদি বা থাকে তবুও ইঁহাদের প্রচারিত ধর্মের কোন ভেদ নাই, ইঁহারা সকলেই একই কথা বলিয়া আসিয়াছেন, প্রাচীন বৌদ্ধগণ নিজেই একথা বলেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠক ইচ্ছা করিলে এ সম্বন্ধে চমৎকার আলোচনা মিলিন্দপ্রশ্নে (মূল পৃঃ ২১৭, ইংরাজী অনুবাদ, S. B. E. Part II, pp 13) দেখিতে পাইবেন। আর লঙ্কাবতারের (B. Nanjis, পৃঃ ১৪২) —

কাশ্যপঃ ক্রকুচ্ছন্দশ্চ কোনাকমুনিরপ্যহম্।
ভাষামি জিনপুত্রাণাং সমতায়াং সমুদ্গতঃ॥

এই শ্লোকটি ও ইহার পূর্ববর্তী অংশও দ্রষ্টব্য।

বেদান্তভূষণ মহাশয় গৌড়পাদকে বুদ্ধের পূর্ববর্তী বলিয়া যেরূপে স্থির করিয়াছেন, তাহা নিজের আলোচ্য লেখায় ও অদ্বৈতবাদ গ্রন্থে (বিশ্বকোষ হইতে পৃথক্ মুদ্রিত) দেখাইয়াছেন। এ কথা নিশ্চয়ই বলিতে হইবে তিনি এ বিষয়ে বহু পরিশ্রম করিয়াছেন, বহু তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছেন, পরস্পর বিরুদ্ধ কথার সামঞ্জস্যের জন্য যত্নও করিয়াছেন অনেক। তাঁহার যুক্তির ধারার সম্বন্ধে দুই একটি কথা এখানে উদ্ধৃত করিতে পারা যায় :—

"তাহার পর সাম্প্রদায়িক অন্য প্রবাদ এই যে গৌড়পাদ সিদ্ধযোগী, ব্যাসের মত এখনও বিদ্যমান। তিনিই যোগদেহে আসিয়া শঙ্করের চাক্ষুষ বিষয় হইয়াছিলেন। এই প্রবাদটী গৌড়পাদকে প্রাচীন করিবার পক্ষে অনুকূলই হইবে, প্রবাদ বলিয়া অবিশ্বাস করিলে শঙ্কর-গৌড়পাদসাক্ষাৎকার প্রবাদটীই অবিশ্বাস করিব না কেন? অসম্ভব প্রবাদ বলিয়া আপত্তি উত্থাপন করিলে যোগশক্তিতে অবিশ্বাস করিতে হয়; আমাদের ধর্মকর্মানুষ্ঠানও অসঙ্গত হয়।" পৃঃ ৩৭৫।

"অবশ্য ৬২ বৎসর যদিও এক পুরুষের পক্ষে বর্তমানের পুরুষমানের তুলনায় অত্যন্ত অধিক, তথাপি যোগী ও মুনির পক্ষে ইহা অসম্ভব নহে। ইহা, স্বধর্মবিশ্বাসী বৈদিকধর্মসেবী বিশ্বাস করিতে আপত্তি করিবেন না।" অদ্বৈতবাদ, পৃঃ ২২৮।

"অতএব তাঁহাকে (গৌড়পাদকে) চিরজীবী সিদ্ধযোগী বলা ভিন্ন আর শঙ্করাচার্য্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকারের সম্ভাবনা থাকে না। ... অর্থাৎ বিদ্যার্ণব তন্ত্রানুসারে গুরুশিষ্য গৌড়পাদ এবং শঙ্করাচার্য্যের মধ্যে ৫৫ পুরুষ গুরু বিদ্যমান ছিলেন, এবং শঙ্করবিজয়ানুসারে গৌড়পাদ সিদ্ধযোগী ও চিরজীবী বলিয়া শঙ্করাচার্য্যকে দর্শন দিয়াছিলেন—এই উভয় কথাই সম্ভবপর হইল।" ঐ পৃঃ ২২৯।

"অতএব গৌড়পাদের সহিত শঙ্করাচার্য্যের সাক্ষাৎকার, এবং গৌড়পাদ হইতে শঙ্করাচার্য্যের ৩৭০০ বৎসরের ব্যবধান—এই উভয়ই আমাদের বৈদিক ধর্মাবলম্বীর দৃষ্টিতে অসঙ্গত হয় না। যোগীদিগের দীর্ঘজীবন ও ইচ্ছামৃত্যু প্রভৃতি আমরা বিশ্বাস করি। অবশ্য যাঁহারা নানাকারণে পাশ্চাত্যমতের অনুসরণ করিয়া এই জাতীয় সমাধান অসঙ্গত বিবেচনা করেন, আর তজ্জন্য তাঁহারা যদি আমাদের বৈদিক ধর্মানুমোদিত বুদ্ধিকে উপেক্ষা করেন, আমরাও তাঁহাদের বুদ্ধিকে তাহা হইলে উপেক্ষা করিতে কোনরূপ সঙ্কোচ বোধ করিব না।" ঐ, ২৩০।

এই সব যুক্তির সম্বন্ধে আমি কিছু বলা আবশ্যক মনে করি না। পাঠকেরা নিজেই বিচার করিয়া দেখিবেন।

গৌড়পাদকে বুদ্ধের পূর্ববর্তী করিবার আগ্রহে বিদ্যাভূষণ মহাশয় গৌতম বুদ্ধ ও সুগত বুদ্ধ এই দুই বুদ্ধের উল্লেখ করিয়াছেন (আলোচ্য প্রবন্ধ, পৃঃ ৩৭৬; বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭০৮)। গৌতম বুদ্ধের কথা সকলেরই জানা, কিন্তু সুগত বুদ্ধ কে? ইঁহার উল্লেখ কোথায়? ইঁহার সম্বন্ধে কী জানা যায়? সুগত শব্দ তো সর্বজ্ঞ, তথাগত ইত্যাদির ন্যায় বুদ্ধেরই নামান্তর, তাহারই

একটি পর্যায়। "সর্বজ্ঞঃ সুগতো বুদ্ধো ধর্মরাজ-স্তথাগতঃ"—অমরকোষের এ কথা সকলেরই জানা।

বেদান্তভূষণ মহাশয় এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলিয়াছেন, তাহার উত্তর দেওয়া আবশ্যক মনে হয়। তিনি আলোচ্য প্রবন্ধে (পৃঃ ৩৭৩) লিখিয়াছেন—"মহাপ্রামাণিক অমরকোষ-অভিধান কার বৌদ্ধ অমরসিংহ গৌতম বুদ্ধকে বুদ্ধই বলেন নাই।" বিচারের দ্বারা ইনি ইহা স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন বিশ্বকোষে (১ম খণ্ড, পৃঃ ৭০৮) স্বলিখিত অদ্বয়বাদ নামক প্রবন্ধে। ইনি অমরকোষের

"মুনীন্দ্রঃ শ্রীঘনঃ শাস্তা মুনিঃ শাক্যমুনিস্তু যঃ।
স শাক্যসিংহঃ সর্বার্থসিদ্ধঃ শৌদ্ধোদনিশ্চ সঃ॥"

এই কথা উল্লেখ করিয়া লিখিতেছেন "শাক্যমুনিস্তু যঃ" এই স্থলের "তু" শব্দের দ্বারা গৌতম বুদ্ধকে সুগত বুদ্ধ হইতে পৃথক্ করা হইয়াছে।" এখানে সাধারণ বুদ্ধ হইতে শাক্যমুনিকে (যিনি শাক্যসিংহ প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ তাঁহাকে) পৃথক্ করা হইয়াছে মাত্র। কিন্তু ইহার অর্থ এমন নহে যে, ইঁহাকে বুদ্ধই বলা হয় নাই। অমরকোষের ব্যাখ্যাগুলি দেখিলেই ইহা বুঝা যাইবে। তা ছাড়া, তু-শব্দ ধরিয়া বেদান্তভূষণ মহাশয় যেরূপ ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা যে সঙ্গত নহে, তাহা অমরকোষেরই অন্যান্য স্থান দেখিলে বুঝা যাইবে। কয়েকটি এখানে উল্লেখ করিতে পারা যায়:—

"মৃন্মৃত্তিকা প্রশস্তা তু মৃৎসা মৃৎস্না চ মৃত্তিকা॥"
২-১ ৪।

"অগ্নিঃ°
ঔর্বস্তু বাড়বো বাড়বানলঃ।" ১-১-৫৬।

"বাসঃ কুটী দ্বয়োঃ শালা সভা সংজবনং ত্বিদম্।
চতুঃশালং মুনীনাং তু পর্ণশালোটজোঽস্ত্রিয়াম্॥"
২-২-৬।*

কারিকার চতুর্থ প্রকরণে বুদ্ধ শব্দ বহুবার প্রযুক্ত হইয়াছে। কোথাও একবচনে, কোথাও বা বহুবচনে। বেদান্তভূষণ মহাশয় বলেন (পৃঃ ৩৭৭) —' "নৈতদ্ বুদ্ধেন ভাষিতম্" (৪।৯৯) এই স্থলের বুদ্ধ-শব্দ ভিন্ন সবগুলিই যোগার্থপ্রধান বলিতে হয়, কেবল এই শব্দটী হইতেই এক বুদ্ধকে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন "বুদ্ধস্য" (৪।৯৯) এই একটী এক বচনান্ত বুদ্ধ-শব্দ ভিন্ন সবগুলিই বহুবচনে প্রযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং জ্ঞানা ও জ্ঞানী অর্থে অন্য সবগুলি, এবং "বুদ্ধেন" (৪।৯৯) পদের বুদ্ধ-শব্দটী কেবল ব্যক্তি-বাচক শব্দ বলিতে হয়।' ডক্টর শ্রীযুক্ত সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও এই কথা বলিয়াছেন (উদ্বোধন, কার্তিক, ১৩৪৪, পৃঃ ৬৩৩)।

চতুর্থ প্রকরণে প্রযুক্ত বুদ্ধ-শব্দ, একবচনই হউক আর বহুবচনেই হউক, বুদ্ধকে বুঝায় কি না তাহা ঐ ঐ স্থানগুলি আলোচনা করিয়া দেখাইয়া না দিলে হাঁ বা না কিছুই কেহ গ্রহণ করিবেন না। আমি এখানে সে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি না। তবে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ন্যায় যদি কেবল আমার মতটি প্রকাশ করিতে হয় তবে বলিব প্রত্যেকটি স্থানেই বুদ্ধ-শব্দ যোগরূঢ়, ইহা বুদ্ধকে বুঝাইতেছে, জ্ঞানীকে নহে। বহুবচনে থাকিলেই ঐ শব্দ বুদ্ধকে বুঝাইবে না, আর একবচন থাকিলে বুঝাইবে, বৌদ্ধশাস্ত্রে তাহা দেখা যায় না; তাহাতে নির্বিশেষে এক ও বহু উভয় বচনই বুদ্ধ ও তাহার পর্যায় শব্দে প্রযুক্ত হইয়াছে। পুঁথি বাড়িয়া

* বেদান্তভূষণ মহাশয় শঙ্কর সম্প্রদায়ের গুরুশিষ্য পরম্পরায় নমস্কার-মন্ত্রে স্থিত "নারায়ণং পদ্মভবং বশিষ্ঠং শক্তিং চ তৎপুত্র-পরাশরং চ" এখানে শক্তি শব্দস্থলে নিজের পূর্বোদাহৃত সমস্ত লেখার মধ্যে বারবার শক্ত্রি লিখিয়াছেন। আমি তো শক্তি বলিয়াই জানি। যদি শক্ত্রি পাঠই ঠিক হয় তো তিনি তাহা প্রমাণ দিয়া লিখিলে অনেকেরই উপকার হইবে। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলিতে পারা যায়। নমস্কার মন্ত্রগুলির মধ্যে তিনি লিখিয়াছেন "শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-মথাস্য পদ্মপাদম্ চ হস্তামলকং চ শিষ্যম্." এখানে "শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য" স্থলে "শ্রীশঙ্করাচার্য্য" পাঠ না করিলে ছন্দোভঙ্গ হয়।

যাইবার ভয়ে বেশী উদাহরণ না দিয়া দুই একটি মাত্র দিই—

আত্মেত্যপি প্রজ্ঞপিতমনাত্মেত্যপি দেশিতম্।
বুদ্ধৈরাত্মা ন চানাত্মা কশ্চিদিত্যপি দেশিতং॥

—মধ্যমক কারিকা, ১৮-৬।

আবার

সর্বোপলম্ভোপশমঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবঃ।
ন কচিৎ কস্যচিৎ কশ্চিদ্ধর্মো বুদ্ধেন দেশিতঃ॥

ঐ ২৫-২৪।

শূন্যতা সর্বদৃষ্টিনাং প্রোক্তা নিঃসরণং জিনৈঃ।
যেষাং তু শূন্যতা দৃষ্টিস্তানসাধ্যান্ বভাষিরে॥

—চতুঃশতকটীকা, ৩৮২; সুভাষিতসংগ্রহ, পৃঃ ২৫-২৬।

প্রথম তিন প্রকরণ হইতে বেদান্তশব্দ অথবা বেদান্ত বা শ্রুতি সম্বন্ধে বচনাবলী, কিংবা ব্রহ্মশব্দ-যুক্ত বচনসমূহ উদ্ধৃত করিয়া বেদান্তভূষণ মহাশয় আমার মতের প্রতিকূলে কিছুই বলেন নাই।

মাণ্ডূক্যকারিকার চতুর্থ প্রকরণটিকে স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলিয়া মনে করিতে পারা যায় কি না, তাহা অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতিবাদের আলোচনার সময় বিচার করিবার ইচ্ছা থাকিল। উপযুক্ত যুক্তি পাইলে আমি নিজের মত পরিবর্তন বাপরিবর্জন করিতে সর্বদাই প্রস্তুত আছি। আমার কোন আগ্রহ নাই।

"নৈতদ্ বুদ্ধেন ভাষিতম্" (৪-৯৯) এই কারিকাটি লইয়া আমার সমালোচক বন্ধুগণ অনেক কথা বলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমি ইহার যে অর্থ বুঝিয়াছি, তাহা এক স্বতন্ত্র প্রবন্ধে বলিব।

ত্রিক-দর্শন

(সংক্ষিপ্ত পরিচয়)

অধ্যাপক শ্রীহারাণচন্দ্র শাস্ত্রী, সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা

কাশ্মীর একটী প্রাচীন ভারতীয় বিদ্যাপীঠ। এখানকার পণ্ডিতগণকে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের জন্মদাতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; এখন পর্য্যন্ত কাশ্মীরী পণ্ডিতগণের অলঙ্কার-গ্রন্থই (কাব্যপ্রকাশ প্রভৃতি) সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের সর্ব্বাধিক প্রামাণিক গ্রন্থরূপে সকল দেশীয় পণ্ডিত-সমাজের নিকট আদরণীয় হইয়া আছে। এই কাশ্মীরের সোমানন্দনাথ, উৎপলদেব, অভিনব গুপ্ত প্রভৃতি মহাপণ্ডিত আচার্য্যগণ দার্শনিক বিষয়েও অনেক আলোচনা করিয়া গিয়াছেন।

ত্রিক-দর্শন প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের একটী নাম। এই প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন কাশ্মীরের নিজস্ব সম্পত্তি; কাশ্মীরদেশীয় আর্য্যগণই এই দর্শনের প্রবর্ত্তক। এই দর্শনের আলোচনা যদিও কাশ্মীরেই বিশেষভাবে বিদ্যমান ছিল, তথাপি ইহা কাশ্মীরের সীমার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না; সুদূর কেরলদেশ পর্য্যন্ত এক সময়ে এই দর্শনের আলোচনা পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। কেরলদেশীয় মহেশ্বরানন্দ এই দর্শনের মতবাদের আলোচনা করিয়াছিলেন, তিনি গুরুপরম্পরাক্রমে এই দর্শন অধ্যয়ন করিয়া, এই দর্শনের প্রতিপাদ্য

বিষয়ের সংগ্রহরূপে "মহার্থমঞ্জরী" নামে প্রাকৃত গাথাময় এক নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং তাহার "পরিমল' নামে সংস্কৃত টীকা রচনা করিয়া গাথার প্রতিপাদ্য বিষয়গুলিকে সুস্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত করিয়াছিলেন। "পরিমল" টীকার সহিত এই মহার্থমঞ্জরী" প্রথমে কাশ্মীর সরকার কর্তৃক ও পরে ত্রিবঙ্কুর সরকার কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। কাশ্মীর হইতে প্রকাশিত গ্রন্থে টীকা স্থানে স্থানে খণ্ডিত দেখিতে পাওয়া যায়, ত্রিবঙ্কুর হইতে প্রকাশিত গ্রন্থে "পরিমল" টীকা সম্পূর্ণ আছে।

এই দর্শনের মতে প্রধানতঃ তিনটী পদার্থ স্বীকৃত হইয়াছে, জীব, শক্তি ও পরমেশ্বর। এই দর্শনের পরিভাষায় জীবকে নর এবং পরমেশ্বরকে শিব বলা হয়[১]। এই তিনটী পদার্থের বিচার এই দর্শনে আছে,—এই জন্য এই দর্শনের একটী নাম ত্রিক-দর্শন। এই দর্শনের সিদ্ধান্তানুসারে এই জগৎ নর, শক্তি ও শিবাত্মক, এই তিনটী ছাড়া অন্য কোন বস্তু জগতে নাই[২], এই তিনটী পরস্পর ভিন্ন নহে, এই তিনটী বস্তুই একমাত্র শিবস্বরূপ, এই জন্য সমস্ত জগৎই শিবরূপ।

শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ এই দর্শনে স্বীকৃত হয় নাই, শক্তি ও শক্তিমানের অভেদই এই দর্শনের সিদ্ধান্ত[৩]। এই জন্য শক্তি, তাহার আশ্রয় শিব অর্থাৎ পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন, অতএব শিবের স্বরূপের মধ্যেই সন্নিবিষ্ট। পরমেশ্বর নিজের স্বাতন্ত্র্যময় ইচ্ছাশক্তির বলে মায়ার দ্বারা নিজের শক্তিকে সঙ্কুচিত করিয়া জীবরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন[৪]। এই কারণে শিব (পরমেশ্বর) হইতে নর (জীব) ভিন্ন নহে। এই প্রকারে শিব, শক্তি এবং নরের পরস্পর ভেদ না থাকায় শিব, শক্তি ও নরাত্মক এই জগৎ শিবরূপে পর্য্যবসিত।

জীবের তিনটী মল,—আণব মল, মায়ীয় মল ও কার্ম্মমল। এইগুলিই জীবের বন্ধন, জীবভাবের কারণ। অজ্ঞানের নাম আণব মল। এই আণব মল, মায়ীয় মল ও কার্ম্ম মলের কারণ[৫] প্রকাশ স্বরূপ পরম শিবে স্বতঃসিদ্ধ যে স্বাতন্ত্র্য আছে, মায়াবশে শক্তি সংকুচিত হওয়ায় সেই স্বাতন্ত্র্যের বোধ লুপ্ত হইয়া যায় এবং স্বাতন্ত্র্যের বোধ না থাকিলেই শিবের স্বাতন্ত্র্য থাকে না। সেই অবস্থায় শিব নিজ স্বরূপকেই অণু অর্থাৎ ক্ষুদ্র জীব মনে করে, এইটীই শিবের জীবভাব এবং ইহা হইতেই সাংসারিক নানাপ্রকার অনর্থের উৎপত্তি হয়। এই যে মায়ার প্রভাবে স্বাতন্ত্র্য লোপ, ইহাতেই শিবের স্বরূপ তিরোহিত হইয়া যায়, ইহারই নাম অপূর্ণাভিমান। এই আণব মল, মায়ীয় মলের সাক্ষাৎ কারণ, পূর্ব্ব-বর্ণিত অপূর্ণাভিমান হওয়ায়, সেই অপূর্ণস্বরূপের পরিপূর্ণতার যে আকাঙ্ক্ষা উদয় হয়, তাঁহার মূলে একটা ভেদবুদ্ধি আছে। এই ভেদবুদ্ধিই মায়ীয়

১। নরশক্তিশিবাত্মকং ত্রিকং
হৃদয়ে যা বিনিধায় ভাসয়েৎ।
প্রণমামি পরামনুত্তরাং
নিজভাসাং প্রতিভাচমৎকৃতিম্॥
অভিনবগুপ্তকৃত পরাত্রিংশিকাব্যাখ্যা—উপক্রমশ্লোক, ৩।

২। নরশক্তিশিবাত্মকং হি ইদং সর্ব্বং ত্রিকরূপমেব।
নর শক্তি শিবাবেশি বিশ্বমেতৎ সদা স্থিতম্।
ব্যবহারে ক্রমীণাংচ সর্ব্বজ্ঞানাং চ সর্ব্বশঃ।
অভিনবগুপ্তকৃত পরাত্রিংশিকা ব্যাখ্যা, ৭৩ পৃঃ।

৩। শক্তিশ্চ শক্তিমদ্রূপাদ্ ব্যতিরেকং ন বাঞ্ছতি।
তাদাত্ম্যমনয়োর্নিত্যং বহ্নিদাহিকয়োরিব॥
অভিনবগুপ্তকৃত বোধপঞ্চদশিকা, ৩ শ্লোক।

৪। স্বাঙ্গকল্পেষু ভাবেষু মায়াতত্ত্বং বিভেদধীঃ।
মহাগৃহীতসংকোচঃ শিবঃ পুংতত্ত্বমুচ্যতে।
অয়মেব হি সংসারী জীবো ভোক্তেব দৃশ্যতে॥
আত্মনাথ-কৃত অনুত্তরপ্রকাশপঞ্চাশিকা ২১-২২।

৫। "মলমজ্ঞান মিচ্ছন্তি সংসারাঙ্কুর কারণম্॥
পরাত্রিংশিকা ব্যাখ্যায় অভিনবগুপ্ত কর্তৃক উদ্ধৃত, ১১১ পৃঃ।
মায়ীয়কার্ম্মমলমূলমুশন্তি তাবদ্,
অজ্ঞাননাম মলমাণবমেব তজ্জ্ঞাঃ।
বীজং তদেব ভবজীর্ণতরোঃ পরস্মিন্,
সংবিন্নিশাতদহনে দহ্যতে ক্ষণেন॥
অভিনবগুপ্তকৃত পরাত্রিংশিকা ব্যাখ্যা, ১১১ পৃঃ।

মল। এই ভেদবুদ্ধি হইতেই জীবের শুভ ও অশুভ অর্থাৎ পুণ্য ও পাপকর্ম্মে প্রবৃত্তি আসে; এই প্রবৃত্তির বশে পুণ্য বা পাপের অনুষ্ঠানের ফলে, জীব সেই পাপ ও পুণ্যের ফলভোগের জন্ত দেহ-ধারণ করিতে বাধ্য হয় এবং সেই দেহে নিজের ভালমন্দ কর্ম্মের ফলভোগ করে। এই ভাবে যাহার প্রভাবে জীবকে জন্মগ্রহণ করিয়া কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয়, তাহার নাম কার্ম্মমল[৬]। মায়ীয় ও কার্ম্মমলের কারণ আণব মলরূপ অজ্ঞান জীবের সংসারের কারণ হইলেও তাহার প্রতীকার আছে; জীব নিজ সাধনার প্রভাবে পরম শিবের যথার্থ তত্ত্ব যখন বুঝিতে পারে, যখন তাহার এইরূপ জ্ঞান হয় যে, এই সমগ্র জগৎ পরম শিবের মধ্যেই সন্নিবিষ্ট আছে, পরম শিব হইতে পৃথক্ কিছুই নাই। এই অবস্থাতেই প্রকৃতপক্ষে তাহাকে দীক্ষিত বলিতে পারা যায়। জীবের এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানই প্রকৃত দীক্ষা[৭]। এই জ্ঞানকেই নির্ব্বাণ দীক্ষা[৮] বলে। এইরূপ জ্ঞানী পুরুষ যতদিন জীবিত থাকেন, সেই অবস্থায় তিনি সাধারণ মানুষের ন্যায় সমস্ত ব্যবহার করিলেও, তিনি জীবন্মুক্ত, শরীর নাশের পরে তিনি পরম শিবস্বরূপে স্থিত হন,—ইহাই বিদেহকৈবল্য বা পরামুক্তি[৯]।

এই দর্শনের 'প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন,' এই নামের সার্থকতা আছে। যে বস্তুর প্রত্যক্ষ পূর্ব্বে কখনও ঘটিয়াছিল, সেই বস্তুর পুনরায় কালান্তরে প্রত্যক্ষ-কালে "সেই এই" ("সোঽয়ম্") এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে; এইরূপ জ্ঞানকে দার্শনিক ভাষায় 'প্রত্যভিজ্ঞা' শব্দে অভিহিত করা হয়। প্রত্যভিজ্ঞার এইরূপ লক্ষণ মানসোল্লাসে[১০] প্রদর্শিত হইয়াছে;—

ভাতস্য কস্যচিৎ পূর্ব্বং ভাসমানস্য সাম্প্রতম্।
সোঽহমিত্যনুসন্ধানং প্রত্যভিজ্ঞানমুচ্যতে॥
—মানসোল্লাস, ৩।৩।

জীব স্বয়ং পরমশিবেরই স্বরূপ, এই জীব যে দিন জানিতে পারিবে, আমিই সেই পরমেশ্বর পরমশিব, সেই দিনই সে মুক্তির যোগ্যতালাভ করিবে। জীবের এই যে নিজের যথার্থ স্বরূপের জ্ঞান, ইহাই তত্ত্বজ্ঞান, ইহারই নাম প্রত্যভিজ্ঞা। এই প্রত্যভিজ্ঞা এই দর্শনের প্রতিপাদ্য বলিয়া, এই দর্শন 'প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন' নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানই যে বাস্তবিক দীক্ষা, অন্য দীক্ষা—যাহা আমরা শ্রীগুরুর নিকট হইতে লাভ করি,—সেই দীক্ষা,—এই পরম দীক্ষা লাভের একটা প্রাথমিক উপায়। নির্ব্বাণ দীক্ষারূপ তত্ত্বজ্ঞানের হেতু বলিয়া এই আনুষ্ঠানিক দীক্ষাকেও "দীক্ষা" শব্দে অভিহিত করা হয়।

ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, পূর্ব্ব মীমাংসা, বেদান্ত (উত্তর মীমাংসা)—এই প্রসিদ্ধ দর্শনগুলি বৈদিক দর্শন। ইহার মধ্যে পূর্ব্ব ও উত্তর মীমাংসায় বিশেষভাবে বেদবাক্যের অর্থের বিচার করা হইয়াছে। ন্যায় প্রভৃতি অন্য চারিটী দর্শনে বেদবাক্যের প্রধানভাবে বিচার না থাকিলেও, এই দর্শনগুলিতে বেদকে অবলম্বন করিয়া নিজ নিজ উদ্ভাবিত বিচারপ্রণালীর সাহায্যে সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে যত্ন করা হইয়াছে। এই জন্য এই সমস্ত দর্শনই বৈদিক দর্শনরূপে পরিগৃহীত।

৬। ভিন্নবেদ্যপ্রথাঽত্রৈব মায়াখ্যং জন্মভোগদম্।
কর্ত্তর্য্যবোধে কার্ম্মং তু মায়াশক্ত্যৈব তত্ত্রয়ম্॥

৭। যথা ন্যগ্রোধবীজস্থঃ শক্তিরূপো মহাদ্রুমঃ।
তথা হৃদয়বীজস্থং জগদেতচ্চরাচরম্।
এবং যো বেত্তি তত্ত্বেন তস্য নির্ব্বাণগামিনী।
দীক্ষা ভবত্যসংদিগ্ধা তিলাজ্যাহুতিবর্জ্জিতা॥
পরাত্রিংশিকা, ২৪-২৫।

৮। ইয়মেবামৃত প্রাপ্তিরয়মেবাত্মনো গ্রহঃ।
ইয়ং নির্ব্বাণদীক্ষা চ শিবসদ্ভাবদায়িনী॥
পরাত্রিংশিকা টীকা, ২৫৯ পৃঃ।

৯। ঈদৃশং হৃদয়বীজং তত্ত্বতো যো বেদ সমাবিশতি চ, স পরমার্থতো দীক্ষিতঃ প্রাণান্ ধারয়ন্ লৌকিকবৎ বর্ত্তমানো জীবন্মুক্ত এব ভবতি, দেহপাতে পরম শিবভট্টারক এব ভবতি।
ক্ষেমরাজকৃত পরাপ্রবেশিকা, ১২ পৃঃ।

১০। আচার্য্য শঙ্কর-বিরচিত দক্ষিণামূর্ত্তি স্তোত্রের সুরেশ্বরাচার্য্য কৃত পদ্য বিবৃতির নাম মানসোল্লাস। ইহাকে "দক্ষিণামূর্ত্তিস্তোত্রবার্ত্তিক"ও বলা হয়।

ভারতীয় সভ্যতার একটী স্রোত যেমন বেদ হইতে প্রবাহিত হইয়াছে, সেইরূপ আর একটী ধারা তন্ত্র হইতেও নিঃসৃত হইয়াছে। কেবল বেদ অথবা বৈদিক কৃষ্টিকে জানিলেই ভারতের প্রাচীন সভ্যতার পূর্ণস্বরূপের জ্ঞান হয় না; তন্ত্র ও তান্ত্রিক কৃষ্টিরও জ্ঞান আবশ্যক। এই প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন প্রাচীন ভারতের তান্ত্রিক কৃষ্টির একটী নিদর্শন।

তন্ত্রশাস্ত্র তিনটী আম্নায়ে অর্থাৎ সম্প্রদায়ে বিভক্ত,—কাশ্মীর আম্নায়, কেবল আম্নায় ও গৌড় আম্নায়। এই তিনটী আম্নায়ের তন্ত্রও বিভিন্ন। আমাদের দেশ গৌড়দেশ, এই দেশে গৌড় আম্নায়ের তন্ত্রই প্রচলিত। তন্ত্রের দার্শনিক মতবাদের আলোচনা প্রাচীন সময়ে আমাদের গৌড়দেশে প্রচলিত থাকিলেও, সে আলোচনা বেশীর ভাগ গুরুমুখী ছিল; এই কারণে আমাদের এই দেশে তান্ত্রিক তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য স্বতন্ত্রভাবে কোন দার্শনিক গ্রন্থ লিখিত হয় নাই।

কাশ্মীরে ও দাক্ষিণাত্যে এই সম্বন্ধে অনেক বিখ্যাত আচার্য্য বহু সারগর্ভিত গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। শৈব ও শাক্ত এই উভয় সম্প্রদায়ই তন্ত্রের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া থাকেন। সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবেরা সকলেই পাঞ্চরাত্র সিদ্ধান্তের অনুসরণ করেন; এই পাঞ্চরাত্র, তন্ত্র শাস্ত্রেরই অন্তর্গত। এই কারণে বৈষ্ণবেরাও তন্ত্রকে প্রমাণরূপে স্বীকার করেন, ইহা বলিতে হইবে। কিন্তু আমি এখানে এ বিষয়ে কোন কথা বলিব না, শৈব ও শাক্ত সম্প্রদায়ের কথাই বলিতেছি।

তান্ত্রিকদর্শনেও দ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈতবাদ—এই দুই প্রকার সিদ্ধান্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ে স্বীকৃত হইয়াছে। প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনে অদ্বৈত সিদ্ধান্তই সমর্থিত হইয়াছে। দ্বৈতবাদী তান্ত্রিকগণের দর্শন শৈবদর্শন নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীমৃগেন্দ্রাগম, মতঙ্গাগম প্রভৃতি আগমগ্রন্থে দ্বৈতবাদী তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত প্রতিপাদিত হইয়াছে; কাশ্মীরেও এই বিষয়ে "নরেশ্বরপরীক্ষা" নামে দার্শনিক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থ কাশ্মীর সরকার কর্তৃক মুদ্রিত হওয়ায় সকলেরই সুপ্রাপ্য হইয়াছে।

তান্ত্রিকগণের একটী সম্প্রদায় বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়াছেন। এই সম্প্রদায়ের শ্রীকণ্ঠাচার্য্য বাদরায়ণপ্রণীত ব্রহ্মসূত্রের এক ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন; এই ভাষ্য শৈবভাষ্য নামে প্রসিদ্ধ: এই ভাষ্যের অপ্পয়দীক্ষিতপ্রণীত শিবার্কমণিদীপিকা নামে টীকা আছে; ব্রহ্মসূত্রের শ্রীকরভাষ্যও অধুনা মহীশূর হইতে প্রকাশিত হইয়াছে; এই গ্রন্থ বীরশৈব সম্প্রদায়ে সমাদৃত; এই জন্য ইহাও তান্ত্রিক সিদ্ধান্তেরই প্রতিপাদক।

শাক্তদার্শনিকগণের মধ্যে ভাস্কররায়ের পাণ্ডিত্য অতীব অদ্ভুত। এই ভাস্কররায় নানা গ্রন্থ রচনা করিয়া শাক্তসিদ্ধান্তের প্রচার করিয়াছেন। ইনি পরিণাম-বাদের সমর্থক।

তন্ত্রে ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্ব অর্থাৎ ৩৬টী পদার্থ স্বীকৃত হইয়াছে[১১]। যে সকল দার্শনিক এই ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারাই তান্ত্রিক দার্শনিক নামে প্রসিদ্ধ। উপরে বর্ণিত চারিটী দার্শনিক সম্প্রদায়ই ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন; এই জন্য ইঁহারা সকলেই তান্ত্রিক দার্শনিক নামে আখ্যাত হইয়া থাকেন।

আচার্য্য শঙ্করের অদ্বৈতবাদ ও প্রত্যভিজ্ঞা-সিদ্ধান্ত-সম্মত অদ্বৈতবাদ—এই উভয়ই অদ্বৈতবাদ

১১। ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্ব,—(১) পরম শিব বা শিব (২) শক্তি (৩) সদাশিব (৪) ঈশ্বর (৫) শুদ্ধবিদ্যা (৬) মায়া (৭) কলা (৮) বিদ্যা (৯) রাগ (১০) কাল (১১) নিয়তি (১২) পুরুষ (১৩) প্রকৃতি (১৪) বুদ্ধি (১৫) অহঙ্কার (১৬) মনঃ (১৭) শ্রোত্র (১৮) ত্বক্ (১৯) চক্ষুঃ (২০) জিহ্বা (২১) ঘ্রাণ (২২) বাক্ (২৩) পাণি (২৪) পাদ (২৫) পায়ু (২৬) উপস্থ (২৭) শব্দ (২৮) স্পর্শ (২৯) রূপ (৩০) রস (৩১) গন্ধ (৩২) আকাশ (৩৩) বায়ু (৩৪) বহ্নি (৩৫) জল (৩৬) পৃথিবী।

ক্ষেমরাজপ্রণীত পরাপ্রবেশিকা, ৩ পৃঃ।

হিসাবে এক হইলেও, এই দুই মতের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে।

ভারতীয় দার্শনিক সিদ্ধান্ত প্রধানতঃ তিনটী বাদে বিভক্ত; আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্ত্ত-বাদ। আচার্য্য শঙ্কর দার্শনিক সিদ্ধান্তের মধ্যে বিবর্ত্তবাদের প্রচার করিয়া গিয়াছেন[১২]। আচার্য্য শঙ্করের মতে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মের শক্তি মায়া বা অবিদ্যা (আত্মাহবিদৈরব নঃ শক্তিঃ)। এই মায়ার কোন পারমার্থিক সত্তা নাই। যে বস্তু ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান—এই তিনকালের মধ্যে কোন কালেই নিজের সত্তাকে পরিত্যাগ করে না, তাহার নাম সৎ, আচার্য্য শঙ্করের অদ্বৈত বেদান্ত-সিদ্ধান্তে ব্রহ্ম এইরূপ সৎ পদার্থ। পূর্ব্বোক্ত তিন-কালের মধ্যে কোন কালেই যে বস্তুর সত্তা নাই, তাহার নাম অসৎ; বন্ধ্যার পুত্র, শশকের শৃঙ্গ, আকাশকুসুম প্রভৃতির কোন কালেই সত্তা নাই, এই জন্য এইগুলি অসৎ। মায়া বা অবিদ্যার অন্য কালে সত্তা নাই, কেবল প্রতীতিকালেই সত্তা আছে। এই জন্য মায়া বা অবিদ্যা ব্রহ্মের ন্যায় সৎ নহে এবং আকাশকুসুমের ন্যায় অসৎ বা অলীকও নহে; এইরূপে সৎ এবং অসৎ উভয় হইতে বিলক্ষণ হওয়ায় অবিদ্যাকে অনির্ব্বচনীয় বলা হয়। এই অবিদ্যা অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন এই অবিদ্যার উচ্ছেদের অন্য কোন উপায় নাই। সাংসারিক অবস্থায় অবিদ্যাকে অবলম্বন করিয়াই সমস্ত ব্যবহার নিষ্পাদিত হয়। অবিদ্যার সত্তাকে ব্যবহারিক সত্তা বলা হয়। অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম সদাই নির্ব্বিকার স্বরূপে স্থিত আছেন। এই কারণে ব্রহ্মের সত্তাই পারমার্থিক সত্তা নামে আখ্যাত হয়। মেঘ সূর্য্যকে আচ্ছাদন করিতে পারে না; সূর্য্য মেঘ হইতে অনেক বড়। মেঘ লোকের দৃষ্টি হইতে সূর্য্যকে ব্যবহিত করিয়া দেয়; এই জন্য লোকে মনে করে, মেঘের দ্বারা সূর্য্য আচ্ছাদিত হইয়াছে, বাস্তবিক সূর্য্য আচ্ছাদিত হয় না, লোকের দৃষ্টিই আচ্ছাদিত হয়। এইরূপ অবিদ্যা ব্রহ্মকে আচ্ছাদিত করিতে পারে না, কিন্তু অবিদ্যার আবরণ-শক্তির প্রভাবে ব্রহ্মের জ্ঞান হইতে পারে না, ইহাই ব্রহ্মের আবরণ। এইরূপে অবিদ্যা ব্রহ্মকে আবৃত করিয়া নিজের বিক্ষেপশক্তির প্রভাবে সেই নির্ব্বিকার ব্রহ্মে বিশ্বপ্রপঞ্চের কল্পনা করে। যেমন রজ্জুর অজ্ঞান রজ্জুস্বরূপের যথার্থ জ্ঞান হইতে দেয় না, নিজের আবরণশক্তির দ্বারা রজ্জুকে আবৃত করিয়া বিক্ষেপশক্তির প্রভাবে সেই রজ্জুকে সর্পরূপে কল্পনা করিয়া থাকে; এইরূপ ব্রহ্মের অবিদ্যাশক্তি নিজের আবরণশক্তির প্রভাবে প্রথমে ব্রহ্মকে আবৃত করে এবং পরে বিক্ষেপশক্তির বশে তাহাতে জগতের কল্পনা করে। ব্রহ্মের অজ্ঞান অখণ্ড ব্রহ্মকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিতে না পারিলেও নিজের প্রভাবে ব্রহ্মকে জাগতিক সমস্ত ব্যবহারের আস্পদরূপে কল্পনা করে। অদ্বৈত বেদান্ত সিদ্ধান্তে ব্রহ্ম নির্গুণ এবং নিজে সমস্ত ব্যবহারের অতীত। অবিদ্যার সম্পর্কেই ব্রহ্ম সমস্ত ব্যবহারের পাত্ররূপে কল্পিত হ'ন। এই অদ্বৈত সিদ্ধান্তে এক ব্রহ্ম ব্যতীত অবিদ্যা প্রভৃতি সমস্ত পদার্থই কল্পিত; যেমন রজ্জুর যথার্থ জ্ঞান জন্মিলে রজ্জুসর্পের নিবৃত্তি হয় এবং সেই রজ্জুসর্প-জনিত ভয় কম্পাদিও থাকে না। এইরূপ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের পরে অবিদ্যা ও তাহার দ্বারা কল্পিত সমস্ত পদার্থের নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

প্রত্যভিজ্ঞাচার্য্যগণের সিদ্ধান্তে পরমেশ্বর স্বয়ং

১২। আজকাল কেহ কেহ মনে করেন, আচার্য্য শঙ্কর বিবর্ত্তবাদী ছিলেন না, কিন্তু তিনি পরিণামবাদী ছিলেন, তাঁহাদের এই সিদ্ধান্ত পরম্পরাপ্রচলিত সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। আচার্য্যের গ্রন্থ বিশেষ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলেও, তাঁহাকে বিবর্ত্তবাদের পক্ষপাতী বলিয়াই মনে হয়। আধুনিকযুগে সকলেই নূতনতত্ত্ব প্রচার করিয়া সুধীসমাজকে বিস্মিত করিবার জন্য ব্যগ্র, এই জন্য অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি অনেক কষ্ট কল্পনা করিয়াও কিছু নূতন কথা বলিতে চেষ্টা করেন, ইহা দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রকাশস্বরূপ; এই পরমেশ্বরকে ইঁহারা শিব, পরমশিব, ভৈরব প্রভৃতি শব্দের দ্বারা অভিহিত করিয়া থাকেন। এই পরমেশ্বরই ইঁহাদের মতে মূল তত্ত্ব। এই শিব, নিজ হইতে অভিন্ন বিমর্শ-শক্তির বশে শিব হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত (ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্বরূপ) নিজের স্বরূপকে প্রকাশিত করেন; এইরূপে সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, সংহার এবং অনুগ্রহ,—এই পঞ্চকৃত্যের অভিনয়ের দ্বারা তিনি ক্রীড়া করিয়া থাকেন[১৩]। এই বিমর্শশক্তির নামান্তর স্বাতন্ত্র্যশক্তি,—ইহাই ইচ্ছাশক্তি। পরমেশ্বরের সমস্ত শক্তিই এই স্বাতন্ত্র্যশক্তির ক্রোড়ে শায়িত আছে; এই জন্য সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বকর্তৃতা, তৃপ্তি ও নিত্যতা প্রভৃতি অনন্তশক্তি এই স্বাতন্ত্র্য শক্তি হইতে ভিন্ন নহে।[১৪] ইঁহাদের দর্শনের সিদ্ধান্তে—

চিতিঃ স্বতন্ত্রা বিশ্বসিদ্ধিহেতুঃ।
স্বেচ্ছয়া স্বভিত্তৌ বিশ্বমুন্মীলয়তি॥

—প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয়—সূত্র ১—২।

—স্বতন্ত্র চৈতন্য বিশ্বের সিদ্ধির কারণ, এই চৈতন্য (পরমেশ্বর) নিজের ইচ্ছাশক্তিবশে নিজেতে সমগ্র বিশ্বকে প্রকাশিত করিয়াছেন।

আচার্য্য শঙ্করের মতে জগৎ ব্রহ্মে প্রকাশিত হইলেও এই জগতের কোন পারমার্থিক সত্তা নাই—এই জগৎ কল্পিত,—মিথ্যা। ব্রহ্মের শক্তি মায়া বা অবিদ্যাও কল্পিত পদার্থ,—পারমার্থিক সত্তাহীন। প্রত্যভিজ্ঞাসিদ্ধান্তে পরমেশ্বরের শক্তি পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন এবং এই শক্তি কল্পিত নহে, পারমার্থিক।

এই শক্তির প্রভাবে স্বয়ং পরমেশ্বরই জগৎরূপে আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত হইয়া আছেন। পরমেশ্বরের এই বিশ্বপ্রপঞ্চরূপে প্রকাশ, কল্পিত নয়,—মিথ্যা নয়,—পরমার্থ-সত্য। পরমেশ্বর হইতে এই জগতের কোনও ভেদ না থাকিলেও আমাদের এই যে ভেদ প্রতীতি,—এইটীই ভ্রম,—যথার্থ জ্ঞান নয়।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের সিদ্ধান্ত "বিবর্ত্তবাদ" আখ্যায় প্রসিদ্ধ। প্রত্যভিজ্ঞাসিদ্ধান্ত আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদ,—পূর্ব্বোক্ত এই তিনটী সিদ্ধান্তের কোনটীরই অন্তর্গত নয়। এই মতকে "আভাসবাদ" এইরূপ একটী অভিনব নামে অভিহিত করা হয়।

১৩। আদ্যনাথ-কৃত অনুত্তর প্রকাশপঞ্চাশিকা—১—২।
১৪। ষট্‌ত্রিংশৎতত্ত্ব সন্দোহ বিবরণ—১।
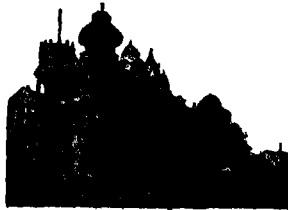
স্বামীজির বাংলা রচনা

স্বামী প্রেমঘনানন্দ

বাংলা ভাষায় কী ভাবে জোর আনতে পারা যায় সে সম্বন্ধে স্বামীজি বলেছেন, খুব বেশী ক্রিয়াপদ ব্যবহার না করে বিশেষণ দ্বারা ভাব প্রকাশ করতে পারলে ভাষায় জোর আসবে।

চলিত ও সাধু বাংলা সম্বন্ধে স্বামীজি বলেছেন, কটমট অপ্রাকৃত কল্পিত ভাষা অপেক্ষা চলিত ভাষা ভাল। স্বাভাবিক যে ভাষায় আমরা মনের ভাব প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, যে ভাষায় ঘরে কথা কই, যাতে সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে করি, যে ভাষায় নিজের মনে দর্শন বিজ্ঞান চিন্তা করি, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই না। সংস্কৃতর গদাই লস্করি চাল ছেড়ে চলিত ভাষার ভাব ভঙ্গি সমস্তই ব্যবহার করে যেতে হবে। যথার্থ প্রাণস্পর্শে ছুটো চলিত কথায় যে ভাবরাশি আসবে, তা দুহাজার ছাঁদি বিশেষণেও নাই। * * * কলকেতার ভাষাই অল্পদিনে সমস্ত বাংলার ভাষা হয়ে যাবে।[1]

স্বামীজির মতামত জানলেই শুধু হবে না। তিনি নিজে কী করেছেন, তাও দেখা উচিত।

স্বামীজির মৌলিক বাংলা গদ্য রচনা তিনখানা পুস্তক ও কতকগুলো প্রবন্ধ। পুস্তকগুলো ধারাবাহিকরূপে উদ্বোধনে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধগুলোর অধিকাংশই উদ্বোধনে প্রকাশিত হয়েছে। কোন্‌টি তিনি কী ভাষায় লিখেছেন এবং কোন্ তারিখে তা উদ্বোধনে প্রথম প্রকাশিত হয়, নীচে দেওয়া গেল। যে সব লেখা উদ্বোধনে প্রকাশিত হয় নি, তারও তারিখ দেবার চেষ্টা করেছি।

ভাষা	লেখা	তারিখ
সাধু	ঈশা অনুসরণ	১২৯৩
"	হিন্দু ধর্ম্ম কি	ফাল্গুন ১৩০৪
"	প্রস্তাবনা (উদ্বোধনের)	মাঘ ১,১৩০৫
"	জ্ঞানার্জন	ফাল্গুন ১,১৩০৫
"	রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উক্তি	চৈত্র ১,১৩০৫
"	বর্ত্তমান ভারত	চৈত্র ১৫,১৩০৫
চলতি	ভাববার কথা	শ্রাবণ ১৫,১৩০৬
"	বিলাত যাত্রীর পত্র	ভাদ্র ১,১৩০৬
"	বাঙ্গালা ভাষা	চৈত্র ১৫,১৩০৬
"	প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য	আষাঢ় ১৫,১৩০৭
"	শিবের ভূত	১৩০৯ অথবা পরে প্রাপ্ত

বিলাত যাত্রীর পত্রই পরে পরিব্রাজক নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান ভারত, পরিব্রাজক ও প্রাচ্য পাশ্চাত্য এই তিন খানা বইয়ের মধ্যে বর্তমান ভারত সাধু ভাষায় লেখা, অপর দুখানা চলতি ভাষায়। এই তিনখানা পুস্তক ছাড়া আর বাকী সবগুলো লেখা একত্র করে 'ভাববার কথা' পুস্তক হয়েছে। স্বামীজি এমেরিকা যাবার অনেক আগে ঈশা অনুসরণ নাম দিয়ে ইমিটেশান অব ক্রাইষ্ট অনুবাদ আরম্ভ করেন। তখনকার সাহিত্য-কল্পদ্রুম নামক একটি পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে ইহার ছয়টি পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হয়েছিল। 'শিবের ভূত' একটি অসমাপ্ত গল্প। স্বামীজির দেহত্যাগের অনেক পরে তাঁর ঘরের কাগজপত্রের মধ্যে তাঁর নিজের লেখা এ গল্পটি

১ বাংলা ভাষা ও স্বামী বিবেকানন্দ (উদ্বোধন, পৌষ ১৩৪৪)

পাওয়া যায়। স্বামীজির পত্রাবলীর মধ্যে অনেক-গুলো তিনি বাংলায় লিখেছেন। এখানে তার আলোচনা করা গেল না।

উপরের তালিকায় আমরা একটা বিষয় দেখতে পাই, ভাববার কথা থেকে পরবর্তী সমস্ত লেখা-গুলোই স্বামীজি চলতি ভাষায় লিখেছেন। ঠিক কোন্ তারিখে কোন্ লেখাটি স্বামীজি লিখেছিলেন, তা ঠিক ঠিক বলা এখন সম্ভব হবে না। তবে একথা সহজেই অনুমান করা যায়, তাঁর লেখা উদ্বোধনে প্রকাশ হতে দেরী হয় নি। উদ্বোধনে প্রকাশের তারিখটাই যদি তার লেখার তারিখ বলে ধরা যায়, তা হলে এ কথা বলা যেতে পারে ১৩০৫ সনের পর থেকে তিনি সব লেখাই চলতি ভাষায় লিখেছেন। বাংলা ভাষা বিষয়ক পত্রে তিনি যেভাবে চলতি ভাষার উপর জোর দিয়েছেন, কাজেও তিনি সেরূপই করেছেন।

১২৯৬ সালের লেখা ঈশা অনুসরণের লেখন-ভঙ্গি দেখলে মনে হয়, তা তখনকার দিনের অতি সুন্দর ও প্রাঞ্জল সাধুভাষা। ক্রিয়াপদ কম ব্যবহার করে বিশেষণের দ্বারা ভাব প্রকাশ করতে পারলে ভাষার জোর হয়। এ বিষয় পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। ১৩০৪ সাল থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর লেখাতে স্থানে স্থানে ক্রিয়াপদের পরিবর্তে বিশেষণ দিয়ে লিখবার চেষ্টা করেছেন। তার পরিচয় আমরা তাঁর সাধুভাষা চলতি ভাষা উভয় ভাষাতে দেখতে পাই।

লেখন-ভঙ্গিকেও এক রকম সংকেত বলা যায়। প্রত্যেক সংকেতের বেলাই দুর্বোধ্যতা সুবোধ্যতার মূলে যেমন অভ্যাস অনেকখানি নির্ভর করে, লেখন-ভঙ্গির বেলাও তাই। আমরা যে লেখন-ভঙ্গিতে অভ্যস্ত নই, তা আমাদের কাছে প্রথম প্রথম দুর্বোধ্যই বোধ হয়। আবার কিছুদিন পর যেমন তাতে খানিকটা অভ্যাস হয়ে যায়, দুর্বোধ্যতাও সেই পরিমাণে কমে যায়। অনভ্যস্ততার জন্যই স্বামীজির বর্তমান ভারতের লেখন-ভঙ্গি কেউ কেউ দুর্বোধ্য মনে করেন।

কেউ কেউ আবার মনে করেন, বাংলা ভাষা ও বাংলা লেখন-ভঙ্গির আদর্শ সম্বন্ধে স্বামীজির মনে যে ধারণা ছিল, তাই তিনি তাঁর বর্তমান ভারত পুস্তকে দেখিয়ে গেছেন। অর্থাৎ বর্তমান ভারতের ভাষা ও লেখন-ভঙ্গিই স্বামীজির মতের আদর্শ।

ক্রিয়াপদের পরিবর্তে বিশেষণ প্রয়োগ বর্তমান ভারতে খুবই দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু বর্তমান ভারত সাধু ভাষায় লেখা। অথচ আমরা দেখতে পাই স্বামীজি চলতি ভাষার উপরই জোর দিয়েছেন। তাঁর পরবর্তী পরিব্রাজক এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পুস্তক দুখানাতে এ বিষয় সুন্দর সামঞ্জস্য দেখতে পাওয়া যায়।

এখানে প্রশ্ন আসে, চলতি ভাষার উপরই স্বামীজি জোর দিয়েছেন এবং ১৩০৫ এর পর থেকে তাঁর সমুদয় লেখাই তিনি চলতি ভাষায় লিখেছেন, তাহলে পূর্ববর্তী লেখাগুলো তিনি সাধুভাষায় লিখেছেন কেন?

ঠিক কোন্ কারণে তিনি লিখেছেন, তা যথার্থভাবে নির্ধারণ করা এখন একরূপ অসম্ভব। দুরকম অনুমান করা যেতে পারে।

(এক) চলতি ও সাধুভাষা সম্বন্ধে স্বামীজির যে সিদ্ধান্ত আগে আলোচনা করা হয়েছে, লেখার প্রথম থেকেই স্বামীজির অন্তরে সেই ধারণা বদ্ধমূল ছিল কি না জানি না। ছিল বলেই যদি অনুমান করা যায়, তা হলে বলা যেতে পারে, তিনি দেশের লোকের মানসিক অবস্থা বিবেচনা করেই তাঁর লেখাগুলো ঐসময় সাধুভাষায় লিখেছিলেন।

যাদের নিয়ে সংস্কার, তাদের উপরই সংস্কারের অনেকটা নির্ভর করে। হঠাৎ আমূল পরিবর্তন করতে গেলে তাতে অনেক সময় বিপরীত ফল হয়। আমানুল্লা কাবুলের ভালই করতে

চেয়েছিলেন, এবং আমানুল্লা যা চেয়েছিলেন বর্তমানে ধীরে ধীরে সেসব সেখানে হচ্ছেও, তবুও আমানুল্লা সফলকাম হতে পারেন নি। কারণ তিনি দেশের লোকের মানসিক অবস্থা না বুঝেই সংস্কার করতে চেয়েছিলেন।

১২৮৮ সালে রবীন্দ্রনাথ তার 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' প্রকাশ করেন। খুব সম্ভব ইহাই বাংলা চলতি ভাষায় মুদ্রিত সর্বপ্রথম পুস্তক। তখনকার দিনে চলতি ভাষায় কেহ কিছু লিখতেন না এবং লেখাও যে সম্ভবপর সে ধারণাও অধিকাংশ সাহিত্যিকেরই ছিল না। বরং প্রায় সকলেই চলতি ভাষাকে একটি ভাষা বলেই গণ্য করতেন না। স্বামীজির লেখার উদ্দেশ্য ভাবপ্রচার। যদি ভাষার দ্বারা ভাবপ্রচারে বাধা হয়, তা হলে সে ভাষা গ্রহণ না করা কিছুই অন্যায় বা অশোভন নয়। এসব ভেবেই হয়তো স্বামীজি ১৩০৫ পর্যন্ত সাধু ভাষায়ই লিখেছিলেন। স্বামীজির পরিব্রাজক অতি সুন্দর জোরাল চলতি ভাষায় লেখা। চলতি ভাষায় লিখে বর্তমানে যাঁরা যশস্বী হয়েছেন, তাঁরাও স্বামীজির প্রায় চল্লিশ বৎসর আগেকার এই লেখা পড়ে আশ্চর্য না হয়ে পারবেন না। কিন্তু ১৩০৬ এর পয়লা ভাদ্র থেকে পরিব্রাজক উদ্বোধনে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হবার পর তদানীন্তন বাংলা সাহিত্যিকদের মধ্যে যথেষ্ট বিরুদ্ধ সমালোচনা আরম্ভ হয়। দেশের অবস্থা বিবেচনা করে হয়তো সেজন্যই স্বামীজি তাঁর পরবর্তী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পুস্তকের ভাষা অপেক্ষাকৃত কঠিন ও সংস্কৃতমূলক করেছিলেন।

(দুই) স্বামীজির লেখন-ভঙ্গির তিনটি ধারা আমরা দেখতে পাই। ১৩০৪ সালের পূর্বের লেখা, ১৩০৪।৫ সালের লেখা, এবং ১৩০৬ থেকে পরবর্তী লেখা। পূর্বেই বলেছি, ১২৯৬ সালে প্রকাশিত স্বামীজির ঈশা অনুসরণের লেখা অতি সুন্দর ও প্রাঞ্জল সাধুভাষা। ১৩০৩ সালের শেষভাগে স্বামীজি এমেরিকা থেকে প্রথমবার ভারতে ফিরে আসেন। সারা ভারতে তখন তিনি বক্তৃতা করেছিলেন। বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করবার ইচ্ছা তাঁর মনে উদয় হওয়া সম্ভব। বাংলা ভাষায় তেমন জোর নেই দেখে স্বামীজি দুঃখ করে বলেছিলেন, বাংলাতে ভাল বক্তৃতা হয় না।[২] এই সময় থেকে তিনি তাঁর লেখায় ক্রিয়াপদের স্থলে বিশেষণ ব্যবহার করে ভাষায় জোর আনবার চেষ্টা করেছেন। সাধু চলতি আন্দোলনের ফলে তাঁর দৃষ্টি এদিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হওয়ায় ১৩০৬ থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি চলতি ভাষায়ই লিখে গেছেন।

১৩০৬ সালের চৌঠা বৈশাখ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের একটি বার্ষিক অধিবেশন হয়। বাংলা ভাষা সংস্কার, ব্যাকরণ ও অভিধান রচনা প্রভৃতি বিষয়ে সভাপতি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় একটি সুচিন্তিত অভিভাষণ পাঠ করেন। তাই থেকে খানিকটা এখানে উদ্ধৃত করছি।

* * * আর তাহার মহৎ দোষ হচ্ছে—চলিত কথোপকথনের ব্যবহারোপযোগী দীন হীন শব্দগুলির প্রতি হতশ্রদ্ধা। * * বঙ্গীয় প্রাকৃত শব্দগুলিকে বর্বর ভাষা বলিয়া উপেক্ষা করা নিতান্তই অজ্ঞ লোকের কার্য; যেহেতু সেগুলা প্রকৃতপক্ষেই সংস্কৃতের সন্তান সন্ততি। * * স্থল বিশেষে সাধুভাষা অপেক্ষা চলিত কথোপকথনের ভাষা মন্তব্য প্রকাশের পক্ষে বেশী কার্যকরী হয়।[৩]

বাংলাভাষা সম্বন্ধে তখন দেশে কিছু কিছু আন্দোলন হচ্ছিল এবং কেউ কেউ চলতি ভাষার পক্ষেও মত প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছিলেন। ঐ সম্বন্ধে উদ্বোধনেও কিছু কিছু আলোচনা হচ্ছিল। এই সব আন্দোলনের ফলে স্বামীজির

২ স্বামি-শিষ্য-সংবাদ, পূর্বকাণ্ড, সং ৩, পৃ ১৫৭।
৩ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, সংখ্যা ২, ১৩০৬।

দৃষ্টিও এদিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে থাকবে। তাঁর অসামান্য দূরদৃষ্টি ও অলৌকিক প্রতিভাবলে যে সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হয়েছিলেন, তাই তিনি তার পত্রে[৪] অতি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছিলেন (১৩০৬ সালের শেষ ভাগ)।

কোন কোন বিষয়ে স্বামীজি তাঁর পূর্বমত পরিবর্তন করেছিলেন, একথা প্রমাণিত হলে স্বামীজির গৌরব ক্ষুণ্ণ হতে পারে, এ ধারণা ঠিক নয়। স্বামীজির মতামত নির্ধারণ করতে গিয়ে যদি কেউ প্রমাণ করে, স্বামীজি তাঁর মত পরিবর্তন করেছেন অথবা কোথাও স্ববিরোধী কথা বলেছেন, তাতে স্বামীজির প্রতি অশ্রদ্ধা বা অসম্মান প্রদর্শন করা হয় না।

কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে স্বামীজির লেখন-ভঙ্গির তিনটি ধারা লক্ষ্য করে এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, তিনি পর পর তাঁর মত পরিবর্তন করেছিলেন অথবা স্ববিরোধী কথা বলেছেন।

সহজেই এরূপ অনুমান করা যায়, ১৩০৪ সালের পূর্বে স্বামীজির দৃষ্টি এবিষয়ে আকৃষ্ট হয় নি। ১৩০৩ সালের পর বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বাংলা ভাষার দুর্বলতা বিষয়ে স্বামীজির দৃষ্টি প্রথম আকৃষ্ট হয় এবং ১৩০৫।৬ সালে বাংলা সাহিত্যিকগণের সাধু-চলতি আন্দোলনের ফলে ঐ সমস্যা বিষয়ে স্বামীজির দৃষ্টি তখন বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল। যেমন যেমন সমস্যা এসেছে স্বামীজির নিকট থেকে তার সমাধানও আমরা পেয়েছি। যদি আমাদের পরম সৌভাগ্যবশত আজ পর্যন্ত স্বামীজির দেহ থাকত, তা হলে বর্তমান বাংলা বানান সমস্যা সম্বন্ধেও হয়তো আমরা তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত জানতে পারতুম।

স্বামীজি কোথাও স্ববিরোধী কথা বলেন নি এবং তাঁর লেখার মধ্যে তিনটি ধারা লক্ষ্য করলেও তাঁর মত পরিবর্তন হয়েছিল, একথাও বলা যায় না। একটি ছোট উদাহরণ দিচ্ছি। বরাবর আমি লিখে এসেছি সর্ব্ব, আজকাল লিখি সর্ব। তাতে একথা বলা চলে না যে, আমি আমার মত পরিবর্তন করেছি। প্রচলিত প্রথায়ই এতদিন লিখে এসেছি, এ বিষয়ে আমার মতামত কিছুই ছিল না। বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বানান আন্দোলনের ফলে এ বিষয় আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। তাতে বিচার করে দেখেছি সর্ব্ব লেখা অপেক্ষা সর্ব লেখাই সমীচীন। যদি কখনও আমি বলতুম, সর্ব্ব লেখাই অধিক যুক্তিযুক্ত, তাহলে বর্তমানে সর্ব লেখাতে আমার মত পরিবর্তন হয়েছে বলা যেতে পারত। পরিবর্তন ও মতপরিবর্তন এক জিনিস নয়।

যদি বলা যায় প্রথম অনুমানই সত্য তা হলেও স্বামীজির মতে স্ববিরোধ বা পরিবর্তন দেখা যায় না।

সময়ের ক্রম অনুসারে স্বামীজির মৌলিক বাংলা লেখাগুলো থেকে কিছু কিছু এখানে উপহার দিচ্ছি। তাতে লেখাগুলো পর পর মিলিয়ে দেখবার সুবিধা হতে পারে।

(এক) খ্রীষ্টের অনুসরণ নামক এই পুস্তক সমগ্র খ্রীষ্টজগতের অতি আদরের ধন। এই মহাপুস্তক কোন "রোমান ক্যাথলিক" সন্ন্যাসীর লিখিত—লিখিত বলিলে ভুল হয়—ইহার প্রত্যেক অক্ষর উক্ত ঈশাপ্রেমে সর্বত্যাগী মহাত্মার হৃদয়ের শোণিত বিন্দুতে মুদ্রিত। যে মহাপুরুষের জলন্ত জীবন্ত বাণী আজ চারিশত বৎসর কোটি কোটি নরনারীর হৃদয় অদ্ভুত মোহিনীশক্তি বলে আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে—রাখিতেছে এবং রাখিবে, যিনি আজি প্রতিভা এবং সাধনবলে কত শত সম্রাটেরও নমস্য হইয়াছেন, যাঁহার অলৌকিক পবিত্রতার নিকটে পরস্পরে সতত যুধ্যমান অসংখ্য সম্প্রদায়ে বিভক্ত খ্রীষ্ট-সমাজ চিরপুষ্ট বৈষম্য পরিত্যাগ করিয়া মস্তক অবনত করিয়া

৪ বাঙ্গালা ভাষা (উদ্বোধন, চৈত্র ১৫, ১৩০৬)।

রহিয়াছে—তিনি এ পুস্তকে আপনার নাম দেন নাই।

(ঈশা অনুসরণ, ১২৯৬)

(দুই) শাস্ত্র শব্দে অনাদি অনন্ত "বেদ" বুঝা যায়। ধর্ম শাসনে এই বেদই একমাত্র সক্ষম।

পুরাণাদি অন্যান্য পুস্তক স্মৃতিশব্দবাচ্য; এবং তাহাদের প্রামাণ্য যে পর্য্যন্ত তাহারা শ্রুতিকে অনুসরণ করে, সেই পর্য্যন্ত।

"সত্য" দুই প্রকার। এক—যাহা মানব-সাধারণ-পঞ্চেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ও তদুপস্থাপিত অনুমানের দ্বারা গ্রাহ্য। দুই—যাহা অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম যোগজ-শক্তির গ্রাহ্য।

(হিন্দুধর্ম কি? ১৩০৪)

(তিন) ভারতের প্রাচীন ইতিবৃত্ত—এক দেব-প্রতিম জাতির অলৌকিক উদ্যম, বিচিত্র চেষ্টা, অসীম উৎসাহ, অপ্রতিহত শক্তিসংঘাত ও সর্বাপেক্ষা অতি গভীর চিন্তাশীলতায় পরিপূর্ণ। ইতিহাস অর্থাৎ রাজা-রাজড়ার কথা ও তাঁহাদের কাম ক্রোধ ব্যসনাদির দ্বারা কিয়ৎকাল পরিক্ষুব্ধ, তাঁহাদের সুচেষ্টা কুচেষ্টায় সাময়িক বিচলিত সামাজিক চিত্র হয়ত প্রাচীন ভারতে একেবারেই নাই।

(উদ্বোধনের প্রস্তাবনা। মাঘ ১৩০৫)

(চার) ব্রহ্মা—দেবতাদিগের প্রথম ও প্রধান, শিষ্য পরম্পরায় জ্ঞান প্রচার করিলেন; উৎসর্পিণী ও অবসর্পিণী কালচক্রের মধ্যে কতিপয় অলৌকিক সিদ্ধপুরুষ—জিনের প্রাদুর্ভাব হয় ও তাঁহাদের হইতে মানবসমাজে জ্ঞানের পুনঃপুন স্ফূর্তি হয়, সেই প্রকার বৌদ্ধমতে সর্বজ্ঞ বুদ্ধনামধেয় মহাপুরুষদিগের বারংবার আবির্ভাব; পৌরাণিকদিগের অবতারের অবতরণ, আধ্যাত্মিক প্রয়োজনে বিশেষ-রূপে, অন্যান্য নিমিত্ত অবলম্বনেও মহামনা স্পিতামা জরতুষ্ট্র জ্ঞানদীপ্তি মর্ত্যলোকে আনয়ন করিলেন; হজরৎ মুসা, ঈশা ও মহম্মদও তদ্বৎ অলৌকিক উপায়শালী হইয়া অলৌকিক পথে অলৌকিক জ্ঞান মানবসমাজে প্রচার করিলেন।

(জ্ঞানার্জন, উদ্বোধন, ফাল্গুন ১, ১৩০৫)

(পাঁচ) অধ্যাপক মোক্ষমূলার পাশ্চাত্য সংস্কৃত-দের অধিনায়ক। যে ঋগ্বেদ সংহিতা পূর্বে সমগ্র কেহ চক্ষেও দেখিতে পাইত না, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বিপুল ব্যয়ে এবং অধ্যাপকের বহুবর্ষ-ব্যাপী পরিশ্রমে, এক্ষণে তাহা অতি সুন্দররূপে মুদ্রিত হইয়া সাধারণের পাঠ্য।

(রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উক্তি, উদ্বোধন,
চৈত্র ১, ১৩০৫)

(ছয়) বৈদিক পুরোহিত মন্ত্রবলে বলীয়ান্, দেবগণ তাঁহার মন্ত্রবলে আহূত হইয়া পান ভোজন গ্রহণ করেন ও যজমানকে অভীপ্সিত ফল প্রদান করেন। ইহলৌকিক মঙ্গলের কামনায় প্রজাবর্গ, রাজন্যবর্গও তাঁহার দ্বারস্থ। রাজা সোম (সোম-লতা) পুরোহিতের উপাস্য, বরদ ও মন্ত্রপুষ্ট আহুতি গ্রহণেপ্সু, দেবগণ কাজেই পুরোহিতের উপর সদয়। দৈববলের উপর মানব বল কি করিতে পারে? মানব-বলের কেন্দ্রীভূত রাজাও পুরোহিত বর্গের অনুগ্রহ-প্রার্থী।

(বর্তমান ভারত, উদ্বোধন, চৈত্র ১৫, ১৩০৫)

(সাত) বলি রামচরণ, তুমি লেখাপড়া শিখলে না, ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্গতি নাই, শারীরিক শ্রমও তোমা দ্বারা সম্ভব নহে, তার ওপর নেশা ভাঙ এবং দুষ্টমিগুলাও ছাড়তে পার না, কি করে জীবিকা কর বল দেখি?

রামচরণ—সে সোজা কথা মশায়, আমি সকলকে উপদেশ করি।

রামচরণ ঠাকুরজীকে কি ঠাওরেছেন?

(ভাববার কথা, উদ্বোধন, শ্রাবণ ১৫, ১৩০৬)

(আট) স্বামীজি ওঁ নমো নারায়ণায়—"মো" কারটা হৃষীকেশী ঢঙের উদাত্ত ক'রে নিও ভায়া। আজ সাত দিন হল আমাদের জাহাজ চলেছে,

রোজই তোমায় কি কি হচ্চে না হচ্চে খবরটা লিখ্‌ব মনে করি, খাতাপত্র কাগজ কলমও যথেষ্ট দিয়েছ, কিন্তু এ বাঙ্গালী "কিন্তু" বড়ই গোল বাধায়।

(বিলাত যাত্রীর পত্র [পরিব্রাজক], উদ্বোধন, ভাদ্র ১, ১৩০৬)

(নয়) এখন বুঝবে যে, জাতীয় জীবনে যেমন যেমন বল আসবে, তেমন তেমন ভাষা শিল্প সঙ্গীত প্রভৃতি আপনা আপনি ভাবময় প্রাণপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে। দুটো চলতি কথায় যে ভাবরাশি আসবে, তা দু হাজার ছাঁদি বিশেষণেও নাই। তখন দেবতার মূর্তি দেখলেই ভক্তি হবে, গহনা পরা মেয়ে মাত্রই দেবী বলে বোধ হবে, আর বাড়ী ঘর দোর সব প্রাণস্পন্দনে ডগ্‌মগ্‌ করবে।

(বাঙ্গালা ভাষা, উদ্বোধন, চৈত্র ১৫, ১৩০৬)

(দশ) সলিলবিপুলা উচ্ছ্বাসময়ী নদী, নদীতটে নন্দন বিনিন্দিত উপবন, তন্মধ্যে অপূর্ব কারুকার্য-মণ্ডিত রত্নখচিত মেঘস্পর্শী মর্মর প্রাসাদ; পার্শ্বে, সম্মুখে, পশ্চাতে ভগ্ন মৃন্ময় প্রাচীর জীর্ণচ্ছাদ, দৃষ্ট-বংশ কঙ্কাল কুটীরকুল, ইতস্ততঃ শীর্ণদেহ-ছিন্নবসন যুগ যুগান্তরের নিরাশাব্যঞ্জিত বদন নরনারী বালকবালিকা; মধ্যে মধ্যে সমধর্মী সমশরীর গো-মহিষ বলীবর্দ, চারিদিকে আবর্জনারাশি—এই আমাদের বর্তমান ভারত। * * * আমরা দেখি, শৌচ করে না, আচমন করে না, যা তা খায়, বাছ-বিচার নাই, মদ খেয়ে মেয়ে বগলে ধেই ধেই নাচ,—এ জাতের মধ্যে কি ভাল রে বাপু!

(প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, উদ্বোধন, আষাঢ় ১৫, ১৩০৭)

(এগার) জর্মানির এক জেলায় ব্যারন "ক"য়ের বাস। অভিজাত-বংশে জাত ব্যারন "ক" তরুণ যৌবনে উচ্চপদ, মান, ধন, বিদ্যা এবং বিবিধ গুণের অধিকারী। যুবতী সুন্দরী বহুধনের অধি-কারিণী, উচ্চ কুলপ্রসূতা অনেক মহিলা ব্যারন "ক"য়ের প্রণয়াভিলাষিণী। রূপে, গুণে, মানে, বংশে, বিদ্যায়, বয়সে, এমন জামাই পাবার জন্য কোন্ মা বাপের না অভিলাষ? কুলীনবংশজা এক সুন্দরী যুবতী, যুবা ব্যারন "ক"য়ের মনও আকর্ষণ করেছেন, কিন্তু বিবাহের এখনও দেরী।

(শিবের ভূত, স্বামীজির দেহত্যাগের বহুকাল পরে প্রাপ্ত)

বাংলা জ্ঞানযোগ রাজযোগ দেববাণী ভারতে-বিবেকানন্দ প্রভৃতি পুস্তকগুলো স্বামীজির মূল ইংলিশ পুস্তক থেকে পূজ্যপাদ শুদ্ধানন্দ মহারাজ কর্তৃক অনূদিত। স্বামীজির শরীর থাকতেই তিনি অনুবাদ করতে আরম্ভ করেছিলেন। স্বামীজি স্বয়ং তাঁকে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছিলেন।

বাংলা লেখা সম্বন্ধে স্বামীজি তাঁকে কখনও কোন উপদেশ দিয়েছিলেন কিনা আমি জিজ্ঞাসা করেছিলুম। স্বামীজি তাঁকে বলেছিলেন, অনুবাদ যেন সহজ ও সরল হয়। আর কোন উপদেশ স্বামীজি তাঁকে দেন নি। স্বামীজি ছিলেন স্বাধীনতার প্রতীক। তিনি কখনও কারো স্বাধীনতায় হাত দিতেন না।

গায়ক লেখক ও শিল্পীদের অনেকের মধ্যেই বাহাদুরি দেখবার ভাব অল্পবিস্তর দেখা যায়। স্বামীজির লেখায় কথাও অনাবশ্যক আলংকারিকতা নেই। সর্বত্রই তিনি প্রাণবন্ত ভাষায় বেশ জোরের সহিত সোজাসোজি বলে গেছেন। স্বামীজির লেখার বৈশিষ্ট্য সাহিত্যিকগণের নিকট ক্রমেই অধিকতর আদর লাভ করবে, সন্দেহ নেই।

চিত্রকূট

"যস্ত অন্তগতির্নাস্তি তস্য বারাণসী গতিঃ," এই শাস্ত্র-বাক্যের অনুসরণে এবার পূজার দিন কয়েক আগে বারাণসী যাত্রা করলাম। তৃতীয় শ্রেণীতে ভিড়ের ভয়ে বেনারস-এক্সপ্রেস ট্রেনে সিট্-রিজার্ভ করেছিলাম। হাওড়া হতে লিলুয়া পর্যন্ত রিজার্ভের সুবিধা ভোগ করা গেল; পরে গাড়ীখানায় ক্রমেই এত বেশী ভিড় হতে লাগলো যে, শেষে প্রাণ ওষ্ঠাগত। একজন যাত্রী গয়া ষ্টেসনে জানালার ভেতর দিয়ে এই রিজার্ভ গাড়ীখানায় এমনই মালপত্র তুললেন যে, গাড়ীশুদ্ধ সকলে অতিষ্ঠ হয়ে হৈ চৈ করে উঠলেন। কিন্তু, যাত্রীটির গায়ে বেশ জোর ছিল, তাঁর দলবলও ছিল ভারী, কাজেই কিছুকাল পরই গোলমাল থেমে গেল—শক্তির নিকট আইন পরাজয় স্বীকার করলো। এভাবে মালপত্রের গাদার মধ্যে অজ্ঞাত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে পরদিন দুপুরের পর বেনারস ক্যান্টনমেণ্ট ষ্টেসনে নেবে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

কাশীর রামকৃষ্ণ-অদ্বৈত আশ্রমে মহামায়ার পূজা সুপ্রসিদ্ধ। কয়দিন বেশ সমারোহে মায়ের পূজা হলো। জনসমাগমে এবং "দীয়তাং ভুজ্যতাং" রবে আশ্রম-প্রাঙ্গণ পূজার কয়দিন মুখরিত ছিল। প্রতিদিন আরতির পর মহামায়ার সম্মুখে সাধুদের ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ ভজন এখানকার পূজার বিশেষত্ব এবং ইহা যথার্থই সম্ভোগ্য হয়েছিল।

ভাগলপুর কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মাখনলাল রায় চৌধুরী মহাশয় একজন ছাত্রকে নিয়ে পূজার সময় কাশী এসে রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রমে আতিথ্যগ্রহণ করেছিলেন। আমি তাঁর পাশের এক ঘরে ছিলাম। অল্প সময়ের আলাপেই এই ভদ্রলোকের অভিমানরহিত পাণ্ডিত্য ও প্রাণ-খোলা সরল ব্যবহার আমার চিত্ত জয় করেছিল। এঁর সঙ্গে কাশীর দর্শনীয় সব ঘুরে ঘুরে দেখা গেল। বহুবার দেখলেও অনেক কিছু নূতন মনে হলো। সকলের চেয়ে উপভোগ্য হয়েছিল কাশীর বিজয়া-বিসর্জন। চন্দ্রালোকিত গঙ্গাবক্ষে আলোকমালামণ্ডিত তরণীর উপর সুসজ্জিত দশভুজামূর্তি, একদিকে গগনস্পর্শী সুদৃশ্য অট্টালিকাশ্রেণী হতে গঙ্গাতট পর্যন্ত প্রস্তর-মণ্ডিত সোপানাবলীর উপর দণ্ডায়মান বিচিত্র বেশভূষাপরিহিত দিদৃক্ষু নরনারীর সম্মেলন, অপর দিকে দিঙ্মণ্ডলবিস্তৃত বৃক্ষবীথিশোভিত নীরব নিস্পন্দ শস্য শ্যামল প্রান্তর, শত শত বিচরণশীল তরিসমাকীর্ণ অর্ধচন্দ্রাকৃতি গঙ্গার এক প্রান্তে হিন্দুর গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যমণ্ডিত মণিকর্ণিকার রক্তিম দীপ্তি এবং অপর প্রান্তে প্রাচীন সূর্য্যবংশোদ্ভব মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের অশ্রুত-পূর্ব ত্যাগ-মাহাত্ম্যপূত হরিশ্চন্দ্রঘাটস্থিত সদা-প্রজ্বলিত শ্মশানের কালবিজয়ী রশ্মি, নবাগত দর্শকের মনকে যথার্থই এক অবর্ণনীয় ভাবে ভরপূর করে তোলে। যিনি এ অপরূপ সৌন্দর্য একবার দেখেছেন, তিনি আর ভুলতে পারবেন না।

চেৎলা উচ্চ ইংরেজী স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার চার মহাশয় কাশী এসে পূজার কয়দিন রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রমে ছিলেন। এই ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ ক্রমে ভাবে পরিণত হলে ইনি চিত্রকূট দর্শনে আমার সঙ্গী হন। সর্বসিদ্ধ ত্রয়োদশী দিন আমরা প্রাতের ট্রেনে মোগলসরাই হয়ে বেলা ১৷৷টায় এলাহাবাদ ষ্টেসনে পৌছি। পরে জি-আই-পি লাইনে কার্ভি বা করুই ষ্টেসনে রওনা হই। এলাহাবাদ হতে কার্ভি পর্যন্ত ভাড়া ১৷৷৵৹ আনা।

কার্ভি হতে চিত্রকূট ৮ মাইল, বাস ভাড়া ।০ আনা। বেলা ১২টার সময় মাণিকপুর জংসনে নেবে শুনলাম, রাত ১টার পূর্বে কার্ভির ট্রেন পাওয়া যাবে না। মাণিকপুর হতে কার্ভি ৩০ মাইল এবং চিত্রকূট ২৫ মাইল মাত্র। যাত্রী সমাগম বেশী না হলে মাণিকপুর হইতে চিত্রকূট বাস চলে না, ভাড়া ॥৶০ আনা। খোঁজ করে জানলাম, আজ চিত্রকূটের বাস আসবে না। খানিকক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরে ষ্টেসনটি দেখলাম। জি-আই-পি লাইনের মধ্যে এ ষ্টেসনটি বিখ্যাত হলেও এখানে যাত্রীদের বিশ্রামের কোন সুবিধা নেই। করোগেটেড্ টিনের চারদিক খোলা বিরাট সেড্, মেজেতে কাল রঙের ধূলিরাশির উপর কয়েকটি ভগ্নপ্রায় বেঞ্চ পড়ে রয়েছে, এক পাশে দুটি নোংরা খাবারের দোকান। অবস্থা দেখে কিছু খেতে ইচ্ছে হলোনা, খাবার যোগ্য কিছু ছিলও না। ষ্টেসন হতে আধ মাইল দূরে মাণিকপুরের বাজারে গেলাম। ধূলিধূসরিত একটি রাস্তার দুপাশে অনেক রকম পণ্যদ্রব্যের ছোট ছোট দোকান। সব দোকানেরই খাবারের উপর এমন ময়লা জমে রয়েছে যে, এগুলিকে মানুষের খাদ্য বলা চলে না। মধ্যাহ্নের প্রখর সূর্যতাপে ঘর্মাক্ত কলেবরে ষ্টেসনে ফিরে এসে জানলাম যে, আমরা যে গাড়ীতে এসেছি, সেই গাড়ীতে বিহার কাউন্সিলের স্পিকার বাবু রামদয়ালু সিংহ এসেছেন; তিনিও চিত্রকূট যাবেন, বাসের জন্য তিনি চিত্রকূটে তার করছেন। তিনি সদলবলে ষ্টেসনেরই একটি গাছ তলায় বসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ করতেই তিনি সানন্দে আমাদের দুজনকে সঙ্গে নিতে স্বীকৃত হলেন। সন্ধ্যার সময় বাসটি আসলো, রওনা হবো—ঠিক এমন সময় ড্রাইভার একজন আরোহীর সঙ্গে ঝগড়া সুরু করলে। গালাগালি ক্রমে অল্পবিস্তর হাতাহাতিতে পর্য্যবসিত হলো। বিবাদে প্রায় আধ ঘণ্টা চলে গেল, পরে বিষম হট্টগোলের মধ্যে বাসটি ছেড়ে দিলে। রাস্তা ভাল। সড়কের দুধারে বড় বড় গাছ। চন্দ্রালোকে মাঝে মাঝে ফাঁকা স্থান দিয়ে দেখলাম, দিগন্তবিস্তৃত গভীর বনানী, উঁচু নীচু পাহাড়, স্থানে স্থানে চাষ বাস, এর মধ্য দিয়ে রাস্তাটি চলেছে। রাস্তায় বড় বড় লাঠি হাতে দুচারজন লোককে এদিক ওদিক যেতে দেখলাম। একজন আরোহী একটি স্থান দেখিয়ে বললেন, এখান হতে ৩ ক্রোশ দূরে অই চওয়ারা নামক স্থানে বাল্মীকি মুনি তপস্যা করে ছিলেন। ওখানে বাল্মীকি-ধারা নামে একটি ক্ষুদ্র-কায় পার্বত্য নদী এবং বাল্মীকির একটি ছোট মন্দির আছে। আর বিশেষ কিছু দেখবার নেই। রামায়ণকার বাল্মীকি মুনি যখন রত্নাকর ছিলেন, তখন এই অঞ্চলেই নাকি দস্যুতা করে বেড়াতেন, তাঁর বাড়ীও নাকি এদিকেই ছিল। শুনলাম, আজকালও এখানে দস্যুভয় যথেষ্ট। পথিকের সর্বস্বলুণ্ঠন এখনও এ অঞ্চলে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। সেই রামায়ণী যুগের রত্নাকর-বৃত্তি এ যুগেও এ স্থানে অব্যাহত আছে জেনে আশ্চর্য হলাম। স্থান মাহাত্ম্য বটে।

রাত প্রায় ১০টার সময় বাস এসে চিত্রকূটে থামলো। আমরা একটি কুলী নিয়ে ডাক্তার শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখার্জি মহাশয়ের বাড়ী উপস্থিত হলাম। সম্পূর্ণ অপরিচিত হলেও তিনি সাদরে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। পরক্ষণেই চা পানের ব্যবস্থা হলো। আমরা তাঁর কথাবার্তা ও সৌজন্যে মুগ্ধ হলাম। ডাক্তার বাবু দীর্ঘকাল যাবৎ এখানে স্থায়ীভাবে সপরিবারে বাস করছেন। পরার্থপরতা, আতিথেয়তা এবং মিষ্টভাষিতার জন্য তিনি এদেশে সর্বজনসম্মানিত। বিদেশে একজন বাঙালীর এরূপ প্রতিষ্ঠা দেখে মনে বিশেষ আনন্দ বোধ করলাম। ডাক্তার বাবু চিত্রকূট-সেবাশ্রম নামে নিজ বাড়ীতে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন। এখান হতে বিনামূল্যে গরীবলোককে

অষুধ দেওয়া হয় এবং দরকার মত তিনি গরীব রোগীদের বাড়ী যেয়েও চিকিৎসা করে থাকেন। এই আশ্রমটি মিশনের হাতে দেওয়া ডাক্তার বাবুর একান্ত ইচ্ছা। শুনলাম, বাংলার কোন ধর্মসম্প্রদায়ের একজন প্রতিনিধি এই প্রতিষ্ঠানটির ভার নেবার প্রস্তাব করেছিলেন, কিন্তু ডাক্তার বাবু ছেড়ে দেন নি। তাঁর বড় ছেলে এখানে কনট্রাক্টরী করে। বয়স কম হলেও সে তার পিতার গুণ এর মধ্যেই অনেক পেয়েছে। ডাক্তার বাবুর সাধ্বী পত্নীর সেবাপরায়ণতাও আমাদের শ্রদ্ধাদৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

চিত্রকূট বুন্দেলখণ্ডের মধ্যে একটি বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র। এর অপর নাম রামগিরি। এখানে ক্ষুদ্রাকৃতি পাঁচটি নেটিভ ষ্টেট আছে,যথা—পালদেও, তরাঁও, ভাঁয়সেঁাধা, চৌবেপুর, কামতা-রজোলা। শুনালাম, সিপাহী বিদ্রোহের সময় ঝাঁসির রাণীর বিরুদ্ধে তাঁর কয়েকজন বিশ্বাসঘাতক কর্মচারী ব্রিটিশ সরকারকে সাহায্য ক'রে পুরস্কার স্বরূপ নাকি এই ষ্টেট্‌গুলি পেয়েছিলেন। ষ্টেট কয়টি নিতান্ত ক্ষুদ্র হলেও অনেক বিষয়ে করদরাজ্যের মত কতকটা স্বাধীন। চারদিকে এলোমেলো ভাবে দণ্ডায়মান পাহাড় এবং মাঝে মাঝে অসমতল বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র চিত্রকূটের প্রাকৃতিক দৃশ্যকে মনোরম করে রেখেছে। শ্রীরামচন্দ্রের পদরজপূত পুণ্যতোয়া গোদাবরী তীরে অবস্থিত এই তীর্থক্ষেত্রটি কাশীধামের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। নদীর এক পাশের প্রায় সবটাই বাঁধানো ঘাট। কতকটা স্থানে উঁচু মন্দির হতে সোপানাবলী এই ঘাটে এসে নেমেছে। ঘাটের স্থানে স্থানে পাণ্ডাদের ছোট ছোট পর্ণকুটির। নদী স্রোতহীন, অনতিপরিসর ও অগভীর এবং ক্রমে ক্ষুদ্রকায় হয়ে সবেগে প্রবাহিতা। কাশীর মত এখানেও দশাশ্বমেধ ঘাট, কেশীঘাট, রামঘাট, লক্ষ্মণঘাট মত্তগজেন্দ্র ঘাট প্রভৃতি আছে। এই ঘাটসংলগ্ন মন্দিরগুলির নাম পর্ণকুটির, যজ্ঞবেদী, মত্তগজেন্দ্র মহাদেব, লঙ্কাপুরী, মহাবীরের মন্দির, তুলসীদাসের মন্দির, ইত্যাদি। নদীর অপর ধারে বিজাউর রাণীর মন্দির। অধিকাংশ মন্দিরেই রাম সীতা লক্ষ্মণ ও মহাবীরের মূর্তি। বাঁধানো ঘাটের উপর একটি ক্ষুদ্র বাজার এবং কয়েকটি ছোট ছোট দোকান। সহরের ভেতর দিয়ে একটি মাত্র প্রধান রাস্তা। অর্ধেক পরিমাণ রাস্তা আগাগোড়া পাথর দিয়ে বাঁধানো, বাকী কাঁচা—ধূলিময়। রাস্তার দুপাশে বেশীর ভাগই পাণ্ডাদের বাড়ী, মাঝে মাঝে ছোট ছোট দোকান। এখানে দুটি বড় ধর্মশালা আছে। এ অঞ্চলের সর্বত্র বানরের উপদ্রব অবর্ণনীয়। বানরের উৎপাত হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য এ অঞ্চলের সব খোলার চাল জংলী কুলকাঁটায় ঘনকরে ছাওয়া। এগুলি প্রতিবৎসর নূতন করে দিতে হয়। বানরের অত্যাচারে শাক সবজী তরকারী ও ফলাদি রক্ষা করা এখানকার গৃহস্থদের পক্ষে এক মহাসমস্যা। স্থানীয় অধিবাসী প্রায় সবই হিন্দু এবং রাম সীতার উপাসক। বানরকে এঁরা রামচন্দ্রের অনুগত ভক্তরূপে সম্মান করেন; কাজেই প্রতিকারের চেষ্টাও নাই। এ অঞ্চলের প্রায় সব লোকই নিরক্ষর এবং দারিদ্রের চরম সীমায় উপনীত। শুনলাম, বেশীর ভাগ লোকেরই দুবেলা খাবার জোটে না। গরীবদের খাদ্য নুন আর রুটি। এখানে রুটির সঙ্গে ডাল বা শাক গরীবদের নিকট বিলাসিতা। দেখলাম, ছেলেপিলে একটা পাই পয়সার জন্য দলে দলে যাত্রীদের পেছনে পেছনে নানা রকম হেঁয়ালি ছড়া আবৃত্তি করে ভিক্ষা মেগে চলছে।

শ্রীরামচন্দ্র তাঁর বনবাসের অধিকাংশ কালই চিত্রকূটে ছিলেন। অযোধ্যা হতে সরযূ পার হয়ে প্রথমে তিনি শৃঙ্গর রাজ্যে যান, সেখানে গুহক চণ্ডালের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। পরে ভরদ্বাজ মুনির আদেশে তিনি চিত্রকূটে অত্রী

মুনির আশ্রমে যান এবং এঁর উপদেশে কাম্যদ বা কামতা পাহাড়ে থাকেন। এই পাহাড়টি বর্তমান চিত্রকূট হতে এক মাইল দূরে। কেবল কামতা পাহাড় নয়, এ অঞ্চলে রামচন্দ্রের লীলাস্থল মাত্রই চিত্রকূটের অন্তর্গত বলে ধরা হয়। চিত্রকূট হতে কামতা পাহাড়ের পথে রামমন্দির, পুরাণ লঙ্কা, অক্ষয় বট, রাজধরের মন্দির, রামনাম বিদ্যালয় ও কয়েকটি গুহা আছে। পুরাণ লঙ্কার মন্দিরে ৪০টি ও রামনাম বিদ্যালয়ে ৫০টি ব্রাহ্মণ শ্রেণীর বিদ্যার্থী সংস্কৃত পড়ে। বিদ্যার্থীদের সকল খরচ মন্দির হতে দেওয়া হয়। কামতা পাহাড়টি কম উঁচু নয়। এর সর্বাঙ্গ গভীর অরণ্যাবৃত। কে জানে এই বনানীর মধ্যে রামসীতার কত নিদর্শন লুক্কায়িত রয়েছে। পাহাড়টির উপরে উঠবার কোন পথ নেই। এই বৃত্তাকার পাহাড়টির পাদদেশের চারদিকে ৩৬০টি ছোট বড় মন্দির। এর প্রদক্ষিণের ৪ মাইল শিলাপথ পান্নার মহারাজ তৈরী করে দিয়েছেন। এই পবিত্র পাহাড়ের অধিষ্ঠাতা দেবতা কামতানাথের মন্দিরটি বিখ্যাত, বিগ্রহের নাম মুখারবিন্দ। মূর্তির হাত পা নেই, কেবল মুখ আছে। এ ছাড়া বিহারীজিকা মন্দির, ভরতমিলন মন্দির, রামকুণ্ড প্রভৃতি দর্শনীয়। অযোধ্যা হতে এসে যেখানে ভরত রামচন্দ্রকে রাজা দশরথের দেহত্যাগের সংবাদ দিয়েছিলেন, সেইখানে ভরত মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে বলে প্রবাদ। এই সুদৃশ্য মন্দিরটির অতি নিকটেই লক্ষ্মণ পাহাড়। এটি অপেক্ষাকৃত ছোট এবং কামতা পাহাড়ের চেয়ে নীচু। এই পাহাড়ে থেকে লক্ষ্মণ রামসীতাকে পাহারা দিতেন বলে পাণ্ডারা বলেন। এই পাহাড়টির শীর্ষদেশে একটি সুদৃশ্য মন্দির আছে। কামতা পাহাড় পরিক্রমা-পথের কতকটা স্থানে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম ও কয়েকঘর দোকান বর্তমান। গ্রামের বেশীর ভাগ লোকই এত দরিদ্র যে গরু ঘোড়ার সঙ্গে এক ঘরে বাস করছে। কামতা পাহাড়ের ধারে স্বর্গাশ্রম পিলী-কোঠি। স্বামী সচ্চিদানন্দ নামক জনৈক দশনামী সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী এই আশ্রমটি স্থাপন করেছেন। শুনলাম, তিনি বিদ্বান ও তপস্বী। এখানে একটি আয়ুর্বেদী দাতব্য ঔষধালয় ও বিদ্যার্থী ভবন আছে। বিদ্যার্থী ভবনে ৭০টি ব্রাহ্মণ ছেলে সংস্কৃত অধ্যয়ন করে। এদের সব খরচ আশ্রম হতে দেওয়া হয়। স্বামী সচ্চিদানন্দ উপস্থিত ছিলেন না। স্বামী সারদানন্দ নামক এখানকার জনৈক সাধুর সঙ্গে আলাপ হলো, তিনি এই আশ্রমে থেকে বেদান্ত পড়েন। এঁর সৌজন্যে আমরা দুজনেই এখানে একদিন দুপুর বেলা ভিক্ষা গ্রহণ করলাম। দেখলাম, প্রকাণ্ড একটি রান্নাঘরের ভেতর অনেক উনুন রয়েছে। বিদ্যার্থীরা সকলেই ব্রাহ্মণ হলেও অধিকাংশই এক জনের হাতে আর এক জন খায় না, প্রায় সকলেই স্বহস্তে রান্না করে। আশ্চর্যের বিষয় যে, অব্রাহ্মণ পর্যন্ত এ ঘরে প্রবেশ করতে পারে কিন্তু কেউ রান্নার ক্ষুদ্র গণ্ডির ভেতর পদক্ষেপ করলেই জাত যায়। পিলীকোঠি হতে দু মাইল দূরে আর একটি পাহাড়ে রামশয্যা দর্শনীয়।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

হোলি-উৎসব

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায, কাব্যতীর্থ, বি-এ

কোন জাতিকে জীবিত রাখিতে হইলে উৎসবাদির প্রয়োজন আছে। হিন্দুজাতির মধ্যে উৎসব কম নহে; কথায় বলে, 'বারমাসে তের পার্ব্বণ'। হিন্দুর প্রধান উৎসবগুলির মধ্যে হোলি উৎসব অন্যতম। ইহা বসন্তকালে অনুষ্ঠিত হয়। বসন্ত ঋতুর রাজা। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায়ও বলিয়াছেন, 'ঋতুনাং কুসুমাকরঃ'। আয়ুর্ব্বেদেও বসন্ত ঋতুর প্রশংসা করিয়াছে। শরীর ও মন উভয়কে সমুন্নত করিবার ইহাই প্রকৃষ্ট সময়। বেদে, ব্রাহ্মণ গ্রন্থে এবং গৃহ্যসূত্রাদিগ্রন্থসমূহেও ফাল্গুনী শুক্লা পূর্ণিমার পর্য্যাপ্ত বর্ণনা রহিয়াছে। এই সময়ে অনেক ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান হইত, বালকদিগকে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে প্রবিষ্ট করান হইত, উপনয়ন সংস্কার সম্পাদিত হইত এবং যজ্ঞাদি শুভ কার্য্যেরও ইহাই ছিল প্রশস্ত সময়। অশ্বমেধ যজ্ঞের পূর্ণাহুতির জন্যও ফাল্গুনী শুক্লা পূর্ণিমা তিথি নির্দ্দিষ্ট ছিল। আবার প্রহ্লাদের বিজয় তিথি বলিয়াও এই দিবস প্রসিদ্ধ। চৈতন্য মহাপ্রভু এই দিবসে মর্ত্তধামে অবতীর্ণ হইয়া ইহার খ্যাতি ও পবিত্রতা রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু কালচক্রে ইহার পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হইবার উপক্রম হইয়াছে। আজকাল জনসাধারণ এই দিনের প্রধান উৎসব হোলির আসল উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া ইহার পবিত্রতাকে নষ্ট করিতেছে। রং, গোময়, কাদা ও ময়লা দ্রব্য লইয়া মাতামাতি করাই অধুনা এই উৎসবের আসল উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পশ্চিমাঞ্চলে পুরুষ ও নারী একত্র হইয়া এই দিন অশ্লীল ব্যবহার ও কুৎসিত অভিনয় করিয়া আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে এবং উহাকেই ধর্ম্মকার্য্যের অঙ্গ মনে করে। ধর্ম্মের আসল উদ্দেশ্য যেন জনসাধারণ ভুলিয়া গিয়াছে।

ধর্ম্ম বলিতে কি বোঝায় তাহা বুঝা উচিত? 'ধরতীতি ধর্ম্মঃ' অথবা 'যেনৈতদ্ ধার্য্যতে স ধর্ম্মঃ'—অর্থাৎ যে ধারণ করে অথবা যাহা দ্বারা বিশ্ব রক্ষিত হয় তাহাকে ধর্ম্ম বলে। আবার মহর্ষি কণাদ বলিয়াছেন, যাহা হইতে অভ্যুদয় ও কল্যাণ হয় তাহাই ধর্ম্ম। মনু মহারাজ বলিয়াছেন—

'বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্য লক্ষণম্॥'

'বেদ, স্মৃতি, সদাচার ও নিজের সন্তোষ—এই চারিটি ধর্ম্মের সাক্ষাৎ লক্ষণ।'

ধর্ম্মের লক্ষণের সহিত মিলাইয়া দেখিলে এখন ভারতে যেভাবে হোলি-উৎসব অনুষ্ঠিত হয় তাহা কখনও ধর্ম্মবিহিত বলা যাইতে পারে না। হিন্দু ধর্ম্মের গ্লানির মূলে রহিয়াছে ক্ষত্রিয় সম্রাটের অভাব। যখন হইতেই ভারতে ক্ষত্রিয় নৃপতির অভাব ঘটিল, তখন হইতেই বর্ণাশ্রমের শিক্ষাপ্রণালী শিথিল হইতে লাগিল, বৈদিক শুদ্ধজ্ঞান লুপ্তপ্রায় হইল মানুষের মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল এবং তৎসঙ্গে শাস্ত্রের ব্যাখ্যাও মনোবৃত্তি অনুযায়ী হইতে লাগিল। তাই পরাধীন হিন্দুজাতির উৎসবেরও এই দুর্দ্দশা। এই উৎসব বর্ত্তমানে শুধু যে মানসিক অপকর্ষের পরিচায়ক তাহা নহে, ইহাতে আর্থিক অবনতিও যথেষ্ট হইতেছে। এই উৎসব উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ টাকা বিদেশীর হাতে চলিয়া

যায়। হোলি-উৎসবে যে আমোদ প্রমোদ হয়, তাহাতে রংয়ের বাবদ কত টাকা বিদেশে যায় তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত নহে কি? এই দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। উৎসবে যাহাতে অশ্লীলতা ও উচ্ছৃঙ্খলা প্রদর্শিত না হয়, এবং ধর্ম্ম কার্য্যের পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ থাকে, তৎপ্রতিও দৃষ্টি রাখা উচিত।

হোলি-উৎসব দোললীলার অঙ্গ। মাধবে মাধবের আরাধনাই দোললীলার উদ্দেশ্য। চির সুন্দর যিনি, একমাত্র রসস্বরূপ যিনি, তাঁহাকে হৃদি-হিন্দোলায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া অনুরাগের রক্তকুঙ্কুমে অনুরঞ্জিত করিয়া প্রণয়ের মৃদু আন্দোলনে আন্দোলিত করাই এই লীলা বা উৎসবের উদ্দেশ্য। সুতরাং জীবনের হিন্দোলা-দোলায় মাধবকে না বসাইয়া যাহারা শুধু কামনাকে বসাইয়া পূজা করে, তাহারা নিশ্চয়ই মরণপন্থী, অসুরভাবাপন্ন ও মাধবী আনন্দ হইতে বঞ্চিত। অতএব এই উৎসবের সময় মনে রাখিতে হইবে যে, আর্য্যজাতির বসন্ত-বাসর প্রজাপতি-বিলাস নহে, উহা শাশ্বত সুন্দরের আরাধনা, উহা শ্রীমাধবের সহিত অনুরাগের ফল্গুবিলাস।

এক্ষণে এই উৎসবের ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। কথিত আছে যে, কংসাসুরের ভাগিনেয় হোলিকাকে বধ করায় দেশমধ্যে 'হোলিয়া হোলিয়া' জয়ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল। আবার কেহ কেহ বলেন, হোলিকার কোলে রক্ষিত ব্যক্তি অগ্নিতে পুড়িয়া মরিত বলিয়া হিরণ্যকশিপু হোলিকাকে প্রহ্লাদের মৃত্যুর জন্য কোলে করিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে প্রহ্লাদের মৃত্যু না হইয়া হোলিকারই মৃত্যু হয়। মোটের উপর হোলিকা হইতে হোলি উৎসবের নাম হইয়াছে ইহা অনেকের ধারণা। এই উৎসবের মধ্যে বহ্ন্যুৎসব, দোলোপরি শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি স্থাপন, ফল্গুচূর্ণ বা আবীর ও মাল্য প্রভৃতি প্রদান এখনও চলিয়া আসিতেছে। হোলি উৎসবের ফল্গু একটি প্রধান অঙ্গ। কথিত আছে, দেবাসুর যুদ্ধের সময় অসুরবধমানসে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ইহা আবিষ্কৃত হয়। উড়িষ্যাধিপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন মহাধুমধামের সহিত দোলযাত্রার অনুষ্ঠান করিতেন। তদবধি পুষ্পদোল, দেবদোল, দেবীদোল প্রভৃতি নানা দোলের উৎসব চলিয়া আসিতেছে। বহ্ন্যুৎসব দোলযাত্রার পূর্ব্বদিন অনুষ্ঠিত হয়। ক্ষার বা পিষ্টুলী দ্বারা একটি পশু (মেষ বা বুড়া) হোলিকা দৈত্যের প্রতিকৃতিরূপে নির্ম্মাণ করিয়া তাহাকে একটি তৃণ নির্ম্মিত ঘরে রাখিয়া হোলিয়া হোলিয়া বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে দগ্ধ করা হয়। দুষ্টের দমনের জন্য এইভাবে পোড়াইবার প্রথা বহু প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত আছে। এই বহ্নি উৎসবের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও আছে। শাস্ত্র মতে জ্ঞানাগ্নির দ্বারা অজ্ঞানকে ভস্মসাৎ করিলে বাসুদেব দর্শন হয়। এই জন্যই পূর্ব্বে বহ্ন্যুৎসব অর্থাৎ অজ্ঞান রিপুনাশ, তৎপরে দোলায় শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি স্থাপন অর্থাৎ বাসুদেব সাক্ষাৎকার লাভ। দোলবেদি তিন থাক বা পাঁচ থাকযুক্ত হইয়া থাকে। এতৎ সম্বন্ধে দার্শনিক ব্যাখ্যা এই যে, ত্রিগুণের উপর ত্রিগুণাতীত শ্রীকৃষ্ণ অথবা দেহের ত্রিতত্ত্ব—যথা মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান ও মণিপুর চক্রের উপর হৃদয়ে বা অনাহতচক্রে শ্রীকৃষ্ণ স্থিত আছেন এবং তিনি সদা ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার শ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা দোলিত হইতেছেন বা জীবকে দোলিত করিতেছেন। অথবা অ+উ+ম=ওঁকে চালিত করিলে তুরীয় ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ অনুভূত হন। আবার পাঁচ থাকের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণকে পঞ্চভূতের অতীত লয়ের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। মহাস্নান, নৃত্যগীত ও বিরাট মিছিলের ব্যবস্থা হোলিকাসুর বিজেতা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে উপযুক্ত হইয়াছিল। পুরাকালে বিজিত রাজা বা তাঁহার প্রধান সেনাপতিকে

বিজয়ী বীরগণ সঙ্গে লইয়া আসিতেন। জ্যোৎস্না রজনীতে এইরূপ উৎসব সুবিধাজনক বলিয়া পূর্ণিমা তিথিতে ইহার অনুষ্ঠান সুশোভন হইয়াছে। যখন কংসের সেনাপতি চানূর বধান্তে এই উৎসব করা হইয়াছিল, তখন ইহা শ্রীবৃন্দাবন লীলা নহে, ইহা তাঁহার মথুরা লীলা। দোলমঞ্চ ও চতুর্দ্দিকে দোলা ঘোবান সম্বন্ধে স্কন্দ পুরাণে, উৎকল খণ্ডে, ব্রহ্ম পুরাণে এবং হরিভক্তিবিলাসে অনেক বিষয় উল্লেখ আছে।

হিন্দুশাস্ত্রবলে, যিনি দোলায় মাধবকে দর্শন করেন তাঁহার পুনর্জ্জন্ম হয় না—

"দোলায়মানং গোবিন্দং মঞ্চাহং মধুসূদনং।
রথাহং বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥"

বাঁধনে মুক্তি দেখা

শ্রীঅহিভূষণ দে চৌধুরী

গত ২৫শে আশ্বিনের আনন্দবাজার পত্রিকায় পরমপূজ্য প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'সাচ্চা দেখা' শীর্ষক প্রবন্ধ পড়ে তাঁর কাছে যে কৃতজ্ঞতাপাশে বাঁধা প'ড়েছি, 'বাঁধনে মুক্তি দেখা' শীর্ষক এই প্রবন্ধ তারই শ্রদ্ধাঞ্জলি।

'সাচ্চা দেখা' প্রবন্ধের অক্ষরে অক্ষরে দেখতে পেলাম, বাঁধনে মুক্তি দেখাই—সাচ্চা দেখা। যে যা নয়, তাকে তাই ব'লে দেখাটাই ঝুঁটো দেখা—'অতস্মিন্ তদ্বুদ্ধিঃ'। দড়িতে সাপ দেখলে, সেইটেই হ'ল ঝুঁটো দেখা; আর ঠিক-ঠিক দেখলে, অর্থাৎ দড়িতে দড়ি দেখলে সেইটেই হ'ল সাচ্চা দেখা। তবেই তো মহা সমস্যার কথা হ'য়ে প'ড়ল—যা নিয়ে সৃষ্টির সুরু হ'তে মহামায়ার প্রতিভাশালী পুত্রেরা তাঁদের সারা জীবনটাই কাটিয়েছেন—কাটাচ্ছেন,—কাটাবেনও। তবে কি এর কোনও মীমাংসা হয় নি? হ'য়েছে বৈকি! হ'য়েছে ব'লেই তো আজ পর্য্যন্তও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মস্তিষ্ক পরম্পরায় এটা স্থান পেয়ে আসছে; তা না হ'লে তো কোন্ দিনই লোপ পেয়ে যেতো—মিথ্যে ক'দিন টেকে? তবে মুস্কিল হ'য়েছে, এটা 'স্বানুভববেদ্য' হ'য়ে। যা স্বানুভববেদ্য, তা স্ব—অনুভব ছাড়া বলা কওয়ায় বুঝবার যো কি;—'নাপি বাচা'। তবুও, 'সাচ্চা দেখা' প্রবন্ধে লেখক যখন 'তা হ'লে তো মুস্কিল! তা হ'লে তো চুপই ক'রতে হয়!' একথা ব'লেও, আবার—'কিন্তু চুপই বা ক'রতে যাব কেন? মা ব'লে, দুর্গা ব'লে, মহামায়া ব'লে ডাকতে ডাকতে ঐ পটের আড়ালে অন্দরের পানে ধাওয়া করি, ব'লেছেন, তখন আমিই বা চুপ করি কেন? যতদূর বলা কওয়া চলে, দৌড়ে নি; তারপর যখন আপনা হ'তেই মুখ বন্ধ হবে, তখন—'কেন কং পশ্যেৎ'। বলি—আসক্তি কি সকলেরই সকল বিষয়ে সমান? তা যখন নয়, আর আসক্তিই বাঁধন—অনাসক্তিই মুক্তি; তখন মুক্তিকে আর বাজে ঝুঁটো, বলা চলে না। এর প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত—ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব—যিনি সারাজীবন সস্ত্রীক

বাস ক'রেও, তাঁর সঙ্গে দেহসম্বন্ধ বর্জ্জিত ছিলেন।

এখন যদি—প্রতি মুহূর্ত্তে, প্রত্যেক কাজে বাঁধনটা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব ক'রছি বা একে এড়াতে পারছিনে ব'লে এটাকে সত্যি ব'লতে যাই, তবে এ নজিরই বা টেকে কৈ? তা হ'লে তো দড়িতে সাপ, ঝিনুকে রূপো, মুড়ো গাছে মানুষ, মরুভূমিতে জল, স্বপ্নে নিজের মরণাদি কত কি, এ সব যা দেখি, তা হ'তেও তখন এড়ান্ পাই নে ব'লে, এগুলোকেও তো সত্যি ব'লতে হয়। আবার মুক্তিও তো আমার অপরিচিত মোটেই নয়। মুক্তির অনুভূতি র'য়েছে ব'লেই না বাঁধন এড়াবার ইচ্ছে, চেষ্টা;—বাঁধন মিষ্টি লাগছে না! আবার যখন অনুভূতি এক—কাজ আর, এ কখনও হ'তে পারে না, তখন মুক্তির অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে তার কাজটাও হ'চ্ছে বৈকি। এখন একই অনুভূতির পরস্পর দুই বিরুদ্ধ ভাবের মধ্যে যখন একটা সত্যি অপরটা মিথ্যে হবেই, তখন বাঁধন আর মুক্তি—এ দুটোর কোন্‌টাকে ঝুঁটো কোন্‌টাকেই বা সাচ্চা ব'লবো?

যা কিছু আমরা জানি—যা আমাদের বিশেষ জ্ঞানের বিষয় হয়, তারই একটা নাম-রূপ আছে। নাম-রূপ নেই এমন জিনিষ আমাদের বিশেষ জ্ঞানের বিষয় হয় না। আবার যার নাম-রূপ আছে, তাই দেশ-কাল-নিমিত্তের ছাঁচে তৈরী। দেশ কাল নিমিত্তই সকলের এক একটা পরিমাণ বা মাপ এনে 'বিশেষ' ক'রে দিচ্ছে ব'লেই না বিশেষ বিশেষ আকৃতির সৃষ্টি হ'চ্ছে আর সেই সঙ্গে তার অনাদি সঞ্চিত নামটাও এসে প'ড়ছে। সুষুপ্তিতে যখন দেশ-কাল-নিমিত্তের কোন পরিচ্ছেদ থাকে না, তখন সেই অপরিচ্ছিন্ন বা অবিশেষ অবস্থায় জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও আমরা 'বিশেষ' কিছুই জানতে পারি নে। তাই সুষুপ্তিতে আমাদের বিশেষ জ্ঞানের কোন পরিচয়ই পাই নে—তবুও অবিশেষ জ্ঞানের পরিচয়ের জন্যে কোন নজিরের অপেক্ষা করে না;—যখন সেটা আমি নিজেই জানছি। আমার জ্ঞানের—জানার মোট হিসেব যখনই আমি জানতে যাই, তখনই একটা জাগ্রত, একটা স্বপ্ন, আর একটা এমন জিনিষ এসে পড়ে, যা জাগ্রত-স্বপ্নের মত তেমন সুস্পষ্ট জ্ঞানের বিষয় না হ'লেও, আমি তাকে অজানা ব'লতে কোন রকমেই পারি নে। জানছি, কিন্তু জাগ্রত স্বপ্নের মত বেশ সুস্পষ্ট হ'চ্ছে না, সেইটেই তো 'অবিশেষ জ্ঞান', —আর তাই তো সুষুপ্তি। এ অবস্থায় দেশ-কাল-নিমিত্তের কোন পরিচ্ছেদ না থাকায় তখন বাঁধনের কোন বালাই থাকে না সত্যি কিন্তু তাই ব'লে, জ্ঞান তখনও বাঁধনের বাইরে যেতে পারে নি। বাঁধনই হোক্ আর মুক্তিই হোক্, আর তা সত্যিই বলো বা মিথ্যেই বলো—তাতে বড় একটা কিছু এসে যায় না; অনুভব করা না করা নিয়েই তো কথা। জ্ঞান যতক্ষণ জ্ঞাতা—যতক্ষণ জ্ঞানের কাজ হ'চ্ছে, ততক্ষণ তার বাঁধনের আশঙ্কা আছে বৈকি! জ্ঞান যতক্ষণ তার জ্ঞেয় তিন অবস্থা অর্থাৎ জাগ্রত-স্বপ্ন সুষুপ্তির ওপিঠে চতুর্থ বা তুরীয়—যাকে জ্ঞানের নিজ স্বরূপে অবস্থান বলে, তা—না পাচ্ছে, ততক্ষণ তাকে স্ব-স্থ বলা আদপেই চলে না। এখন কথা হ'চ্ছে—জাগ্রত স্বপ্ন-সুষুপ্তি এই তিনটেরই ভেতর তো জ্ঞানের খবর পাচ্ছি; কিন্তু যাকে চতুর্থ বা তুরীয় বলা হ'চ্ছে, সেখানে তো জ্ঞানের কোন সন্ধানই পাচ্ছি নে। এখন এ রকম একটা আজব জিনিষ স্বীকারের কি কোন নজির আছে?

যা কিছু আছে নেই সবই যে জানছে—জানার যে অদ্বিতীয় মালিক, তাঁকে জানা যায় না বটে—'বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ' কিন্তু প্রাণ তা মানছে কৈ! এই না দোটানায় পড়া! এই না বাঁধনের তলায় তলায় মুক্তির যোগাড় যন্ত্র! কোন রকমে একবার হাত ক'স্কে ওপিঠে প'ড়তে পারলে'তো কোনই বালাই নেই। কিন্তু যতক্ষণ

তা না পারছি, ততক্ষণ চুপ ক'রে থাকতে পারছি কৈ! তাই এ-পিঠ হ'তে বুদ্ধির দৌড়ে যতদূর পারা যায়, ব্যাপারখানা কি একবার দেখে নিতে হবে বৈ কি! তারপর বুদ্ধি যখন হাঁপ ছেড়ে এসে প'ড়বে, তখন তো হরি ব'লে—আপনা হ'তেই ঘুম এসে প'ড়বে! বলি—জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তির বাইরে জ্ঞানের কোনই সন্ধান না পাওয়া গেলেও, যখন জ্ঞানের দৌলতেই ঐ তিন অবস্থাকে জানতে পারছি, তখন তো আর এ-পিঠের বুদ্ধির হিসেবেও তাকে 'আছে নেই' দুয়ের কিছুই ব'লতে পারি নে! আর এই জন্যেই তো 'সদসৎ তৎপরং যৎ' ব'লতে হ'য়েছে। সত্যিই তো—আছে নেই যা কিছুর হিসেব যাতে ক'রে হ'চ্ছে, তার হিসেব কে দেবে বলতো? এখন জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি ছাড়া যদি আর কোন অবস্থাই না থাকে, তবে যখন কোন গাঢ় চিন্তা ক'রতে ক'রতে এমন এক অবস্থায় গিয়ে পড়া যায় যেখানে তখন কোনই অনুভূতি থাকে না, সেটাকে কি ব'লবো? সেটা তো জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তির কোনটাই নয়! একটা জিনিষ জানার পর আর একটা জিনিষ জানার আগে, মধ্যের যে অবস্থা —অর্থাৎ জ্ঞান তার আগের জিনিষটে জানার দায় হ'তে সম্পূর্ণ মুক্ত হ'য়ে, পরের জিনিষটে জানার বাঁধনে না প'ড়তে—যে অবস্থায় থাকে, সেটাই বা জ্ঞানের কোন্ অবস্থা? বলে পূর্ণ শক্তির কোনই কাজ হয় না। তা হ'লে জ্ঞান কি এ অবস্থায় পূর্ণ? জানতে গেলেই কি জ্ঞানের স্ব-ভাবের কোন রকম ভাবান্তর ঘটে? এ যদি হয়, তবে মহামুনি পতঞ্জলি যাকে '*দৃশ্যশূন্য দ্রষ্টা*' ব'লেছেন—যা তাঁর মতে সমাধি নামে পরিচিত, তা কি বাজে—ঝুঁটো? বুদ্ধি সুষুপ্তির পর্দার এ-পিঠের জিনিষ—দেশ কাল নিমিত্তের ছাঁচে তৈরী। সুষুপ্তির ওপিঠে যেখানে দেশ কাল নিমিত্তের কোনই পরিচ্ছেদ নেই। যা বুদ্ধির সীমানার বাইরে—'যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু' তার খবর বুদ্ধি দেবে কি ক'রে? তাই জ্ঞাতা কখন জ্ঞেয় হ'তে পারে না' বুদ্ধির এই হিসেব নিয়ে, জানা হ'তে সম্পূর্ণ মুক্ত অবস্থায় একে পূর্ণজ্ঞানঘন —'কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব' বলা কতক সঙ্গত হ'লেও, তাঁর সাক্ষাৎ স্বরূপটা 'অবাঙমনস গোচরম্' ব'লে চুপ ক'রতেই হয়। সাচ্চা দেখায় লেখকও তাই ব'লেছেন—'তার মানে ঠিক কি—সে একান্ত অচলের রূপ কি—তা এই অবিরাম চলার পথে চলতে চলতে বুঝবো কেমন করে?' সত্যিই তো, অচল কিছুই নেই—অথবা অচলই সচলের মত দেখাচ্ছে; দ্রব্য ব'লে কিছুই নেই—অথবা দ্রব্যই গুণের মত দেখাচ্ছে;—এ সব চ'লতে চ'লতে, গুণের ভেতর থেকে—বুঝবো কি ক'রে? নিজের চলন্ত অবস্থায় দেখি অচলও সচল দেখায়;— গুণ দেখার সময় দ্রব্যও তখন দেখতে পাওয়া যায় না। তাই লেখক 'সাচ্চা দেখা'য় চরম উপায় ব'লেছেন—'নিজে থামতে পারলে বুঝতাম, জগৎ থেমে যাওয়ার রূপ কি।'

এ বিশ্ব-রঙ্গালয়ে সকলেরই ভেতর এই যে 'আমি আমি' ক'রছে, এই-ই তো দেখি আছে নেই যা কিছু সবই জানছে। এখন এই-ই যদি —যাকে জানার অদ্বিতীয় মালিক বলা হ'চ্ছে, সেই হয়, তবে তো এই 'আমি'কে জানতে পারলেই সব জঞ্জাল মিটে যায়! কিন্তু তা হ'লে তো বহু জ্ঞাতা স্বীকার ক'রতে হয়! আর আমি যখন বহু জ্ঞাতা ছাড়া একজন জ্ঞাতা দেখতে পাইনে, তখন একজন জ্ঞাতা থাকার নজিরই বা কৈ? এই বহু আমি-জ্ঞাতাই যখন সকলেরই পরিচিত, তখন আর একটা 'আজব জ্ঞাতা'ই বা স্বীকার করি কেন? সত্যি, কিন্তু জ্ঞাতা যখন জ্ঞেয় হ'তে পারে না, তখন এ 'আমি তো সকলেরই পরিচিত—কাজেই জ্ঞেয়। যে কোন 'বিশেষ' জানার সঙ্গে সঙ্গে এই আমিও জ্ঞেয় হ'য়ে প'ড়ছে। আগে এই 'আমি'কে জেনে তবে 'বিশেষ'গুলোকে জানা হ'চ্ছে। 'বিশেষ'গুলো

যেন এই 'আমি'কে জানিয়ে দেবার জন্তেই তারাও জ্ঞেয় হ'চ্ছে। তাই 'বিশেষ'গুলোকে ছেড়ে 'কেবল আমি' সুষুপ্তির সেই 'অবিশেষ জ্ঞাতা'র প্রায় সামিলই হ'য়ে পড়ে। আর এই 'আমি' জ্ঞেয় ব'লেই তো সময়ে থাকে—আবার থাকে না! গাঢ় চিন্তার সময় এই 'আমি-হারা' হয়; সুষুপ্তিতে এই 'আমি' থাকে না। আর থাকা না-থাকা যা দ্বারা জানা যাচ্ছে, তা কি ক'রে জ্ঞাতা হবে? আবার এই 'আমি'র স্বরূপ নিয়েও তো গোল দেখি!' তাই কখন দেহকে, মনকে, বুদ্ধিকে, আবার বাইরের স্ত্রী-পুত্রকেও—আমি বলে; এ ছাড়া এই আমিও তো একজন 'আমি'। এ আবার কি হ'ল! এতো ঐ আগেকার গোলেরই জের এসে প'ল দেখছি! এখন কথা এই—আমি জ্ঞাতা না হোক্; কিন্তু এই আমি সকল সময়েই নিজেকে জ্ঞাতা ব'লেই জানে কিনা! আমি দেহাদিকে আমি ব'লেও' সেটা জ্ঞাতারই স্থলাভিষিক্ত ক'রে বলে কিনা! তা যদি হয়, তবে তো জ্ঞাতার স্বরূপ জানি বা নাই জানি, সুষুপ্তির এ-পিঠে জ্ঞাতার পরিচয় এই 'আমি'ই ব'লতে হবে! সুষুপ্তির 'অবিশেষ জ্ঞান' যখন জাগ্রতে এই 'আমি'ই বরণ করে, তখন ব'লতেই হবে, সুষুপ্তির সেই অবিশেষ জ্ঞানের যে জ্ঞাতা, সেই জাগ্রত-স্বপ্নে 'আমি' হ'য়ে এই দুই অবস্থাকেও জানে। একই জ্ঞাতা না হ'লে, পৃথক্ তিন অবস্থার জ্ঞান কখনই তার হ'ত না। তবে জ্ঞাতা কখন জ্ঞেয় হ'তে পারে না ব'লেই, যেমন আসল মুখ দেখা যায় না—আয়না প্রভৃতির সাহায্যে দেখতে হয়, সেই রকম এই জ্ঞাতাও জ্ঞেয় অবলম্বনেই নিজেকে জানে—'প্রতিবোধ বিদিতং'। আর প্রত্যেক জ্ঞেয়তে এই 'আমি'ই জ্ঞাতার প্রতিরূপ। যদিও জ্ঞেয়গুলোর মত জ্ঞাতা নিজে—নিজের জ্ঞেয় হয় না বটে, তবুতো সে তার অজ্ঞেয়ও নয়! জ্ঞাতা, জ্ঞেয়-অজ্ঞেয় হ'তে অন্য কোন কিছু;—'অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি'। জ্ঞাতা জাগ্রত-স্বপ্ন সুষুপ্তিকে যে ভাবে জানে, সে নিজেকে সেভাবে জানতে না পারলেও, যেভাবে সে নিজেকে জানে—সেই ভাবেই সে নিজেকে জ্ঞাত আছে। নিত্য জ্ঞাত কখন নৈমিত্তিক জ্ঞেয়-অজ্ঞেয় হ'তে পারে না। তা হ'লে, জানার যে অদ্বিতীয় মালিক, এই 'আমি' স্বরূপত 'সেই';—'তত্ত্বমসি'।

সুষুপ্তির অবিশেষ জ্ঞানের জ্ঞাতাই যখন স্বপ্ন-জাগ্রতেরও জ্ঞাতা, তখন তো জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা, আর এই তিন অবস্থায় যা কিছু আছে—যায় এই 'আমি' পর্য্যন্তও জ্ঞেয় হ'য়ে প'ড়ল। তবে যে আমি, তুমি, সে ক'রে বহু জ্ঞাতা ব'লে দেখছি, এটা তো ঠিক নয়! এটা যে সামান্য বা জাতি হিসেবে এক, অর্থাৎ মানুষ বহু হ'লেও মানুষ হিসেবে যেমন মনুষ্যকে এক বলা যায়, এই 'আমি জ্ঞাতা'গুলো এ হিসেবে এক নয়। বহু জলভরা ঘটে একই চাঁদের যেমন বহু প্রতিরূপ দেখা যায়, এও সেই রকম। জ্ঞাতার প্রতিরূপ এই 'আমিগুলো' হ'লেও জ্ঞাতা যখন স্বরূপত কখনই জ্ঞেয় হ'তে পারে না, তখন তো জ্ঞাতা সত্যি ক'রে 'আমি' হয় না ব'লে অর্থাৎ জ্ঞাতা কখন জ্ঞেয় হয় না ব'লে জ্ঞাতা সেই অদ্বিতীয়ই আছে। এখন অদ্বিতীয় ব'লতে জ্ঞাতার হিসেবে জ্ঞাতাকে অদ্বিতীয় বললে দোষ হয় না বটে, কিন্তু যদি এই অদ্বিতীয় শব্দ দ্বিতীয় বস্তুর প্রতিষেধক হয়, তবে তো জ্ঞাতাকে অদ্বিতীয় বলা ঠিক হয় না —যখন জ্ঞেয়গুলো রয়েছে। দেখছি ব'লেই যে সেগুলো সত্যি হল, এ নজির এ পর্য্যন্ত টিকলো কৈ? জাগ্রতে জ্ঞাতা—স্বপ্ন সুষুপ্তিকে দেখে না; স্বপ্নে জাগ্রত-সুষুপ্তিকে দেখে না; আবার সুষুপ্তিতে —জাগ্রত-স্বপ্নকেও দেখে না। থাকা না থাকা যখন জানার উপরই ভরসা, তখন তো ঐ অবস্থা তিনটি সব সময় থাকে না ব'লে, আর জ্ঞাতাই

সকল অবস্থায় র'য়েছে ব'লে, ঐ তিন অবস্থাকে তো মিথ্যেও ব'লতে পারি। জ্ঞাতাই কেবল সত্যি! কেন না, জ্ঞাতা তিন কালেই সত্যি; জ্ঞেয়গুলোকে তো আব তিন কালেই সত্যি ব'লতে পারিনে? আবার বুদ্ধির কাঠামখানায় জ্ঞাতার সাক্ষাৎ স্ব-রূপের কোন কূল কিনেবা না পেলেও, আদি-মধ্য-অন্ত এই তিন কালের হিসেব যখন জ্ঞাতার ওপর ভরসা ক'রেই বুঝতে হয়, তখন তো জ্ঞাতা কালের হিসেবের বাইরেও র'য়েছে বৈ কি! জ্ঞাতা কখন জ্ঞেয় হ'তে পারে না ব'লে, আর জাগ্রত-স্বপ্ন-সুষুপ্তি তিনটে জ্ঞাতার জ্ঞেয় হওয়ায়, জ্ঞাতা নিত্য কালই ঐ তিনের বাইরে থেকে—জাগ্রত স্বপ্নে দেশ-কাল নিমিত্তের শিল্পী-আনা আর সুষুপ্তিতে এক অবিশেষ অবস্থাকে জানে বটে, কিন্তু ঐ তিনটি যে নিজ নিজ স্বরূপে কি, তা তো বেশ ধরা যায় না। জ্ঞাতাই তো আছে নেই, যা কিছু সকলেরই অদ্বিতীয় সাক্ষী? এখন সুষুপ্তিতে জ্ঞাতা যখন 'কিছুই জানতে পারিনি' বলে, তখন সেটাকে 'কিছু' ব'লে স্বীকার করাটা কি অজ্ঞানের পরিচায়ক নয়? আবার যে স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ, তারই বা অজ্ঞান কোথায়। দড়িতে সাপ দেখলে তা অজ্ঞানের কাজ বলা হয় বটে, কিন্তু জ্ঞান হ'লে যখন আর তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না, তখন এরকম একটা ভেল্কিকে তো একেবারেই মিথ্যে ব'লতে না পারলেও সত্যি তো কোন রকমেই বলা যায় না। তাই 'অনির্ব্বচনীয়া' বলা হ'য়েছে। আবার জাগ্রত-স্বপ্নে দেশ-কাল-নিমিত্তের যে শিল্পী-আনা দেখা যায়, তা-ও তো ঐ দড়িতে সাপ দেখারই মত একটা ভেল্কিই। দেশ-কাল-নিমিত্তকে কোন সত্যি জিনিষের সঙ্গেই দেখা যায়—পৃথক্ ক'রে দেখতে গেলে আর খুঁজেই পাওয়া যায় না। আবার যে নাম-রূপকে দেশ-কাল-নিমিত্তের শিল্পী-আনায় তৈরী বলা যাচ্ছে, সেই নাম-রূপও তো কোন সত্যি জিনিষের সঙ্গেই দেখা যায়—তা হ'তে পৃথক্ ক'রে দেখতে গেলে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। মাটির ঘট যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ তাতে দেশ-কাল-নিমিত্তও থাকে—নাম-রূপও থাকে। ঘট মাটি হ'লে তখন ঘটের সে দেশ কাল-নিমিত্তকেও খুঁজে পাওয়া যায় না—সে নাম-রূপকেও খুঁজে পাওয়া যায় না। এই দেশ-কাল নিমিত্ত আর নাম-রূপ দুটো পৃথক্ অথবা একেরই দুটো নাম, তাওতো কিছু ঠিক হয় না। যাই হোক্, এই দেশ-কাল নিমিত্ত আর নাম-রূপ ঐ মূলের ভেল্কিরই সামিল। যেমন গুরু, তার শিষ্যও তো তেমি হবে? সুষুপ্তি হ'তে স্বপ্ন, স্বপ্ন হ'তে জাগ্রত, এখন সুষুপ্তির যখন ঐ দশা তখন স্বপ্ন-জাগ্রতের আর তার চেয়ে বেশী কি হবে? এখন এরকম কোন কিছুকে বস্তু ব'লে স্বীকার ক'রে তাকে পারমার্থিক সত্যের অদ্বিতীয়ত্বের বাধক বলা যায় কি? আর জাগ্রত-স্বপ্ন সুষুপ্তি তিনটে যখন জ্ঞাতার দড়িতে সাপ দেখার সামিলই জ্ঞেয় হ'ল, কখন দড়িতে সাপ দেখলে দড়ি সাপ হয় না বলে জ্ঞাতারও তো এতে কিছুমাত্র ভাবান্তর হয় না! একটা জিনিষ জানার দায় হ'তে মুক্ত জ্ঞান আর একটা জিনিষ জানার দায়ে বাঁধা, না প'ড়তে যে 'পূর্ণজ্ঞানঘন' অবস্থায় থাকে, সেখানে সুষুপ্তির সেই অজ্ঞানই বা কোথায় আর স্বপ্ন-জাগ্রতের সেই দেশ-কাল-নিমিত্তের শিল্পী-আনাই বা কোথায়? অজ্ঞানের এই দেশ-কাল নিমিত্তের নাগপাশ তো অজ্ঞানেরই—এতো 'বন্ধনেরি বন্ধন' সত্যি।

সাচ্চা দেখায় লেখক ব'লেছেন—"জ্ঞান-বিচারে" কেমন অজ্ঞানের ঠুলিটে জুৎসই হ'য়ে চোখ দুটোয় চেপে ব'সছে, আর ঘানিগাছে অকাজের বাঁধা পাক খাওয়াটাও কেমন খাসা "কেজো" হ'য়ে উঠছে। অবস্তুতে বস্তু ভ্রম, অকাজে কাজের নেশা নৈলে এ কারবার চলে কি?' খুবই সত্যি, এই 'আমি'টে যে জ্ঞাতার প্রতিরূপ, সে

খাসা নিজের খোস মেজাজে আপন মণিকোঠায় নিত্য নিত্যীয় হ'য়ে ব'সে কেমন মজা দেখছে; আর এই 'আমি' তারই পরিচয় দিতে এসে—'উল্টো বুঝলি রাম' গোছ হ'যে, পাথারে প'ড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে! তাই তো সাচ্চা দেখায় লেখক ব'লেছেন—'"আমি" থাকতেই হবে না, না কাঁচা আমি, কর্ত্তা আমি, ভোক্তা আমি—এসব থাকতে হবে না? হায় রে!—দড়িতে সাপ দেখলে দড়ি যথন আদপেই সাপ হয় না, তখন এই আমি যে আমির প্রতিরূপ, তাকে 'আমি' ব'লে যদি দেখতো, তা হ'লে তো এই আমিতেই—'মার দিয়া কেল্লা'। তাই তো লেখক সাচ্চা দেখায় ব'লেছেন—'তোমার নহবতে রোশন-চৌকি বাজছে। এক্ষুনি সানাইর ভেঁ'তেই ডুব মারতে চাও, না নানান পরদায় গান শোনবার সাধ? যেমনি খুসি।' কিন্তু তা না শুনে—সানাইর ভেঁাতে অবিরাম যে 'তত্ত্বমসি তত্ত্বমসি' গাচ্ছে এটা বুঝতে না পেরে, সাচ্চা না দেখে—ঝুটো দেখায় দেহ-মন-বুদ্ধিকে আমি ব'লে নিজে নিত্য মুক্ত থেকেও বাঁধনে ছট্‌-ফট্‌ ক'রছে। আমিকে বে-সুরে বেঁধে গাচ্ছে ব'লেই না সুর লাগছে না। এর নিজের সুরে একে বেঁধে গাইলে তখন—হয় আনন্দে তন্ময়, আর না হয় সুরের মধুরিমায়— আনন্দ— আনন্দ—আনন্দ কেবল। বাঁধনে এই মুক্তি দেখাই কি সাচ্চা দেখা নয়?

মাধুকরী

হিন্দু মহাসভার ঊনবিংশ অধিবেশনের সভাপতি শ্রীযুক্ত বিনায়ক রাও সাভারকরের অভিভাষণের সারমর্ম্ম

হিন্দুদের সম্পর্কে আমি একথা বলিতে পারি, আমাদের হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক এবং জাতীয় কর্ত্তব্য অভিন্ন; কারণ হিন্দু সম্প্রদায়ের স্বার্থ এবং হিন্দুস্থানের স্বার্থে কোন ভেদ নাই। যতক্ষণ না আমাদের মাতৃভূমি একটি স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্রে পরিণত হয়, যতক্ষণ না দেশের প্রত্যেক লোককে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সমদৃষ্টিতে দেখা হয়, যতক্ষণ না এমন ব্যবস্থা করা হয়, যাহাতে একে অপরের উপর আধিপত্য করিতে না পারে, একে অপরের ন্যায়সঙ্গত নাগরিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে না পারে, ততক্ষণ হিন্দুধর্ম্ম উন্নতি করিতে পারে না, উহার উদ্দেশ্য সার্থক হইতে পারে না। হিন্দু যতই সত্যিকারের হিন্দু হইবে, সে ততই সত্যিকারের জাতীয়তাবাদী হইবে।

আফ্রিকা, আমেরিকা প্রভৃতি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে যে সমস্ত হিন্দু এবং আমাদের দেশবাসী নীরবে বৃহত্তর হিন্দুস্থান গড়িয়া তুলিতেছেন, হিন্দু মহাসভা তাঁহাদিগকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতে আজ যেন না ভুলিয়া যায়। বলীদ্বীপে আজও সেই পুরাতন হিন্দু-সাম্রাজ্যের হিন্দুরা বসবাস করিতেছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও শক্তির উপরে তাহাদের অদৃষ্ট নির্ভর করিতেছে; কারণ ভারতবর্ষই সমগ্র পৃথিবীর হিন্দুদের মাতৃভূমি এবং তীর্থস্থান। তথাকথিত 'ফরাসী অধিকৃত ভারতে' কিংবা 'পর্ত্তুগীজ অধিকৃত ভারতে' যে সমস্ত হিন্দু আছে, আমরা যেন তাহাদের কথাও না ভুলি। 'ফরাসী অধিকৃত', 'পর্ত্তুগীজ অধিকৃত', প্রভৃতি কথাগুলিই অপমানজনক। আমাদিগকে ঘোষণা করিতে হইবে—আমাদের ভবিষ্যতের হিন্দুস্থান অবিচ্ছেদ—কাশ্মীর হইতে রামেশ্বর, সিন্ধু হইতে আসাম পর্য্যন্ত উহা সংযুক্ত এবং একরূপত্ব প্রাপ্ত হইবে। আশা করি, কেবল হিন্দু মহাসভা নয়, কংগ্রেস এবং হিন্দুস্থানের অন্যান্য জাতীয় প্রতিষ্ঠানও পণ্ডিচারী প্রভৃতিকে পাঞ্জাব, বাঙ্গলা এবং

মহারাষ্ট্রের মতই হিন্দুস্থানের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া মনে করিবেন।

হিন্দু শব্দটির প্রকৃত অর্থেরই উপরই হিন্দু মহাসভার উদ্দেশ্য ও কার্য্যক্রম নির্ভর করে সুতরাং প্রথমেই 'হিন্দুত্বে'র অর্থ কি তাহা পরিষ্কারভাবে বলা দরকার। সুখের বিষয়, হিন্দুত্বকে নিম্নলিখিত ভাষায় বর্ণনা করিয়া উহার প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করা সম্ভব হইয়াছে।

—"যে কেহ সিন্ধু নদ হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত এই ভারতভূমিকে ধর্ম্মভূমি মাতৃভূমি বলিয়া বিবেচনা করে—সে-ই হিন্দু।" এখানে আমি উল্লেখ করিতে চাই যে, ভারতভূমির কোন ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেই তাহাকে হিন্দু বলা ঠিক নয়। কারণ উহা হিন্দুত্বের একটি দিক মাত্র। উহাকে হিন্দু শব্দের সংজ্ঞা মনে করিলে ঐ সংজ্ঞা সঙ্কীর্ণতার দোষে দুষ্ট হইবে। হিন্দুস্থানকে ধর্ম্মভূমি মনে করিলেই কাহাকেও হিন্দু বলা সঙ্গত হইবে না। হিন্দুস্থানকে মাতৃভূমি বলিয়াও স্বীকার করিতে হইবে। একমাত্র ধর্ম্মভূমি এক বলিয়াই যে হিন্দু আজ একটা জাতি তাহা নয়, হিন্দুরা একই সংস্কৃতি, ভাষা ইতিহাস এবং মাতৃভূমির বন্ধনে আবদ্ধ। ঐ উভয় বৈশিষ্ট্যই আমাদের হিন্দুত্বের বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর অন্যান্য জাতি হইতে উহাই আমাদিগকে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে। ঐজন্যই জাপানী কিংবা চীনাদিগকে সম্পূর্ণরূপে হিন্দু বলিয়া গণ্য করা যায় না। তাহারা সকলেই ভারতভূমিকে ধর্ম্মভূমি বলিয়া মনে করে—কিন্তু হিন্দুস্থানকে তাহারা মাতৃভূমি বলিয়া মনে করে না। তাহারা আমাদের স্বধর্ম্মী সন্দেহ নাই। কিন্তু স্বদেশবাসী নয়। যে হিন্দুসভা হিন্দুদের জাতীয় জীবনের প্রতিনিধিত্ব করে, হিন্দুদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করে—তাহারা সেই হিন্দুসভায় অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। সুতরাং হিন্দু শব্দের অর্থ এমন হওয়া দরকার যাহা বাস্তব অবস্থার সহিত খাপ খায়। ভারতভূমি ধর্ম্মভূমি হওয়া চাই। এই সর্ত্ত রাখার ফলে যেমন ভারতের মুসলমান, ইহুদী, খ্রীষ্টান প্রভৃতি বাদ পড়ে, অপর দিকে মাতৃভূমি মনে করার সর্ত্ত রাখার ফলে, জাপানী, চীনা প্রভৃতিরাও হিন্দু বলিয়া গণ্য হয় না। নাগপুর, পুনা, রত্নগিরি এবং অন্যান্য স্থানের অনেক হিন্দুসভা হিন্দু শব্দের এই সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছে। হিন্দু মহাসভা যখন তাহাদের সংজ্ঞা গ্রহণ করেন তখনও তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল এই ভাবই ব্যক্ত করা। সুতরাং এখন আমাদিগকে আমাদের সঙ্কীর্ণ পূর্ব্ব সংজ্ঞার স্থানে এই সংজ্ঞাটী গ্রহণ করা দরকার। আমাদের হিন্দুত্বের এই যুক্তিসঙ্গত অর্থ গৃহীত হওয়ার পর যাহাতে 'হিন্দু' শব্দটি ব্যবহারে সঙ্কীর্ণতা প্রকাশ না পায় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আমাদের অনেক বড় বড় নেতা এবং লেখক একদিকে বলেন যে, হিন্দুদের মধ্যে বৈদিক ভিন্ন অন্যান্য সম্প্রদায়ের হিন্দুও গৃহীত হইবে—অপর দিকে তাহারা 'হিন্দু ও শিখ', 'হিন্দু ও জৈন' প্রভৃতি বলিয়া অজ্ঞাতসারে ইহাই বুঝাইতে চান যে, একমাত্র বৈদিক বা সনাতনীরাই হিন্দু। তাহাতে বিভেদের বিষ ছড়াইয়া পড়ে এবং আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কাজে বাধার সৃষ্টি হয়। আমরা যদি হিন্দু বলিতে কেবল বৈদিকদিগকেই না বুঝাই—তাহা হইলে শিখ প্রভৃতি ভাইরা তাহাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে আপত্তি করিবে না। আমরা যখনই বিভিন্ন অংশকে বিভিন্নভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিব তখনই 'বৈদিক এবং শিখ', 'বৈদিক এবং জৈন' প্রভৃতি ভাষায় আমাদের উহা বুঝান দরকার। নতুবা উহাতে হিন্দু শব্দের অপব্যবহার হইবে।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে বুঝা যায় হিন্দুত্বের অর্থ হিন্দু-ধর্ম্ম হইতে অনেক ব্যাপক। হিন্দুধর্ম্ম বলিলে কেবল হিন্দুদের ধর্ম্মমত বুঝায়; কিন্তু হিন্দু মহাসভা উহা ব্যক্তি কিম্বা সম্প্রদায়ের বিশ্বাসের উপর ছাড়িয়া দিতেছেন, হিন্দু মহাসভা বিশেষ

কোন ধর্ম্মমত, কোন পুস্তক কোন বিশেষ দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। কোন হিন্দু ভারতের নিজস্ব কোন ধর্মে বিশ্বাসী হইলে ভারতবর্ষ ধর্ম্মভূমি বলিয়া তাহার যে বিশ্বাস জন্মে, তাহাই হিন্দু মহাসভার বিশ্বাস। সুতরাং যদিও অপ্রত্যক্ষভাবে হিন্দু-ধর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট, হিন্দু মহাসভার প্রধান কাজ মাতৃভূমি সম্পর্কে। মহাসভা হিন্দুধর্ম্ম সভা নয়, ইহা প্রধানতঃ হিন্দু রাষ্ট্র সভা, হিন্দু-জাতির সামাজিক রাজনৈতিক এবং সংস্কৃতিগত উন্নতিসাধনই ইহার প্রধান কাজ। যাঁহারা হিন্দু-মহাসভাকে কেবলমাত্র ধর্ম্মবিষয়ক প্রতিষ্ঠান মনে করেন, তাঁহাদের এই বিষয়টি মনে রাখা দরকার। হিন্দু-মহাসভাকে প্রধানতঃ একটী জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলিয়া দাবী করিলে অনেকে বলিতে পারেন যে হিন্দুদের মধ্যে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে এত বিভিন্নতা তাহারা কি করিয়া একটি জাতি বলিয়া পরিচয় দিতে পারে? তাঁহাদিগকে আমার বক্তব্য এই যে পৃথিবীতে এমন কোন জাতি নাই যাহার ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম্ম প্রভৃতি সম্পূর্ণ এক ধরণের। বৃটেনের কথাই ধরা যাক। তথায়ও কম পক্ষে তিনটী ভাষা আছে। তথায় এখনও বর্ণবৈষম্য আছে। তথাপি এক দেশ, এক ভাষা, এক সংস্কৃতি এবং ধর্ম্মভূমি এক বলিয়া উহাকে একটি জাতি বলিয়া গণ্য করা হয়। হিন্দুদেরও দেশ হিন্দুস্থান, ভাষা হিসাবে সংস্কৃত ভাষা এক, বিবাহাদি অনুষ্ঠান এক, সামাজিক ও সংস্কৃতিগত অন্যান্য অনুষ্ঠানাদি অনেকটা এক। হিন্দুদেরও ধর্ম্মভূমি এক। বৈদিক ঋষি, ব্যাকরণকার পাণিনি, পতঞ্জলি, কবি ভবভূতি এবং কালিদাস, বীরযোদ্ধা শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, শিবাজী, প্রতাপ, গুরুগোবিন্দ এবং বান্দা সকলেরই গর্ব্ব, তাঁহারা সকলের চিত্তেই সমানভাবে প্রেরণা আনয়ন করেন। হিন্দুদের অবতার বুদ্ধ এবং মহাবীর, কণাদ এবং শঙ্কর সকলের সমান শ্রদ্ধা ভক্তির পাত্র। সংস্কৃত ভাষার ন্যায় দেবনাগরীও একমাত্র অক্ষর যাহাতে প্রাচীন ধর্ম্মপুস্তকাদি লিখিত। হিন্দুদের প্রাচীন এবং আধুনিক ইতিহাসও এক। তাহাদের বন্ধু এক, শত্রু এক, বিপদ এক, বিজয়ও এক। জাতীয় গৌরবে তাহারা অভিন্ন, জাতীয় দুর্দ্দিনেও তাহারা অভিন্ন। তাহাদের জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষা এবং নৈরাশ্য একই সূত্রে গাঁথা রাখিয়াছে। সর্ব্বোপরি হিন্দুরা একই মাতৃভূমি এবং একই ধর্ম্মভূমির বন্ধনে আবদ্ধ। ভারতভূমিই তাহাদের প্রিয় ধর্ম্মভূমি এবং মাতৃভূমি। ইহাতে তাহাদের জাতীয় ঐক্য অধিকতর দৃঢ় হইয়াছে। নিগ্রো, জার্ম্মান, এ্যাংলোসাকসন প্রভৃতি পরস্পর বিরুদ্ধ সম্প্রদায়কে লইয়া এবং মাত্র ৪।৫ শত বৎসরের অতীত ইতিহাস লইয়াও যদি যুক্তরাষ্ট্র একটি জাতি বলিয়া গণ্য হইতে পারে, তাহা হইলে হিন্দুরা ত নিশ্চয়ই জাতি বলিয়া গণ্য হওয়ার যোগ্য। হিন্দুদের নিজেদের মধ্যে যত বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য থাকুক না কেন, পৃথিবীর অন্য যে কোন দেশের যে কোন জাতি হইতে তাহারা স্বতন্ত্র। বর্ত্তমানে সংগঠন, সামাজিক আন্দোলন এবং জাতীয় চেতনা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে হিন্দুদের নিজেদের মধ্যেও বিভিন্নতা ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে।

হিন্দু-মহাসভার বর্ত্তমান গঠনতন্ত্র ও কর্ম্ম পদ্ধতি অনুসারে হিন্দু মহাসভা হিন্দু রাষ্ট্রের গৌরববৃদ্ধি ও উন্নতিকল্পে হিন্দুজাতি হিন্দু-সংস্কৃতি ও হিন্দু-সভ্যতা রক্ষার ও প্রতিষ্ঠার গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং হিন্দু-মহাসভা প্রকৃত প্রস্তাবে জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং হিন্দু মহাসভা বলিতে সমষ্টিগতভাবে সমস্ত হিন্দু জাতি ইহার অন্তর্ভুক্ত হয়।

ভারতের শুভাকাঙ্ক্ষী দেশহিতৈষীদিগের মধ্যে অনেকে হিন্দু-মহাসভাকে সাম্প্রদায়িক, সঙ্কীর্ণ ও ভারত বিরোধী বলিয়া অবজ্ঞা করেন। কারণ, তাঁহাদের মতে হিন্দু-মহাসভা কেবলমাত্র হিন্দুদেরই

প্রতিষ্ঠান এবং উহার একমাত্র লক্ষ্য হিন্দুদের স্বার্থরক্ষা করা। কিন্তু তাঁহারা এ সত্য ভুলিয়া যান যে, সাম্প্রদায়িক ও সঙ্কীর্ণ শব্দ দুইটী তুলনা-মূলক। হিন্দু-মহাসভাকে যদি সাম্প্রদায়িক ও সঙ্কীর্ণ-দৃষ্টি বলিয়া নিন্দা করা হয়, তাহা হইলে যাঁহারা সময়ে অসময়ে ভারতের জাতীয়তাবাদের নামে শপথ গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগকেও তো সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি বলা চলে? হিন্দু-মহাসভা যেমন হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি পদবাচ্য, তাঁহারাও তেমনি মাত্র ভারতীয় জাতির প্রতিনিধিস্থানীয়। কিন্তু বিশ্ব-মানবীয় রাষ্ট্রের তুলনায় ভারতীয় জাতি কি সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক নহে? প্রকৃত পক্ষে এই পৃথিবী আমাদের মাতৃভূমি এবং পৃথিবীর সমস্ত মানুষ একটী অখণ্ড জাতি। বৈদান্তিকগণ আরও একটু অগ্রসর হন। তাঁহারা বলেন,—বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহাদের দেশ। গ্রহ নক্ষত্র হইতে প্রস্তর খণ্ড পর্য্যন্ত বিভিন্ন সামগ্রীকে তাঁহারা আত্মার অভিব্যক্তি বলিয়া মনে করেন। সে হিসাবে সমুদ্র ও পর্ব্বতের ব্যবধান ঘটাইয়া কেন আমরা জগতের অন্য জাতি হইতে স্বতন্ত্র হইতে যাই, কেনই বা আমরা অন্যের সহিত বিশেষতঃ ইংরেজের সহিত ঝগড়া দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হই? জগতের সকল জাতি, সকল মানবই তো সমমানবধর্ম্মী? সুতরাং দেখা যাইতেছে, ভারতহিতৈষিগণ কোন সার্ব্বজনীন আন্দোলনের সৃষ্টি না করিয়া বা তাহাতে যোগ না দিয়া এবং সঙ্কীর্ণ ভারতীয় আন্দোলনের গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়াও তাঁহারা হিন্দুসংগঠনকে সঙ্কীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক বলিয়া বিদ্রূপ করিতে দ্বিধাবোধ করেন না। এই প্রকারে তাঁহারা পক্ষান্তরে নিজেরাও হাস্যাস্পদ হন।

ভারত-হিতৈষণা সমর্থন করিয়া যদি তাঁহারা প্রমাণ করিতে অগ্রসর হন যে যাঁহারা ভারতে বসবাস করে, তাহারা যেরূপ বংশ, ভাষা, সংস্কৃতি ইতিহাসের দিক দিয়া পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট, ভারতের বাহিরের অন্য কোনও জাতির সহিত তাহারা সেরূপ ঘনিষ্ঠসূত্রে আবদ্ধ নহে; সুতরাং ভারতবাসী —আমাদের প্রধান কর্ত্তব্যই হইতেছে অ-ভারতীয় জাতির প্রভুত্ব ও আক্রমণ হইতে ভারতীয়দিগকে রক্ষা করা। হিন্দু সংগঠন আন্দোলন সমর্থনেও ঐ প্রকার যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা যাইতে পারে।

কোনও শ্রেণীগত আন্দোলনই অবজ্ঞার বিষয় নহে। অন্যের অবৈধ ও দুর্দ্দমনীয় আক্রমণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া, যতক্ষণ সে আন্দোলন কোনও জাতি বিশেষের, কোনও শ্রেণী বিশেষের বা কোনও সম্প্রদায় বিশেষের ন্যায্য ও মৌলিক অধিকার রক্ষার চেষ্টা করে এবং যতক্ষণ সে আন্দোলন অন্যের ন্যায্য অধিকার ও স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ না করে, ততক্ষণ কেবল দলগত, শ্রেণীগত বা সম্প্রদায়গত বলিয়া কোনও আন্দোলনের প্রতি অবজ্ঞা করা উচিত নহে। সে হিসাবে হিন্দু-সংগঠন আন্দোলনকে জাতীয়, সম্প্রদায়গত বা সঙ্কীর্ণ যাহাই বলা হউক কেন, হিন্দু-সংগঠনেরও স্বার্থকতা আছে।

হিন্দু মহাসভার লক্ষ্য কি? হিন্দুদিগের প্রতি-নিধিমূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে হিন্দু মহাসভা হিন্দু জাতির সর্ব্বতোমুখী উন্নতি কামনা করে। হিন্দু-স্থানের পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা—হিন্দুজাতির পুনর্গঠনের পক্ষে অপরিহার্য্য। ভারতের ভাগ্যের সহিত হিন্দুজাতির ভাগ্য অবিচ্ছিন্নভাবে বিজড়িত। প্রকৃতপক্ষে হিন্দুগণই স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্রের দৃঢ় ভিত্তি।

শত শত বৎসর পরে যাহাই ঘটুক না কেন, হিন্দুস্থানে ধর্ম্ম যে মানুষের মনে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে, বর্ত্তমানের অবস্থা আলোচনায় তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মুসলমানদের মনে ধর্ম্মোন্মাদনা বেশী। মাতৃভূমি হিসাবে ভারতের প্রতি তাহাদের যে অনুরাগ, ভারতের বহির্ভাগস্থ তীর্থ স্থানের প্রতি তাহাদের অনুরাগ

তদপেক্ষা বেশী। মক্কা মদিনার প্রতিই তাহাদেব দৃষ্টি নিবদ্ধ। কিন্তু হিন্দুস্থান হিন্দুদেব মাতৃভূমি ও তীর্থস্থান—উভয়ই। তাই হিন্দুস্থানের প্রতি হিন্দুদের অখণ্ড অনুবাগ। ভারতের অধিবাসীদিগেব মধ্যে হিন্দুবাই সংখ্যাগরিষ্ঠ; হিন্দুবাই তাহাব স্বার্থবক্ষাকারী। মুসলমানগণ ভারত বহির্ভূত স্থানের প্রতি অনুরক্ত; কিন্তু হিন্দুব জাতীয় সত্তা ভাবতেই নিবদ্ধ। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে হিন্দুদিগকে যে আজ সংখ্যাগরিষ্ঠ দেখা যায় উহাই তাহার কারণ।

দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে হিন্দুবাই ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়াছে, শত শত হিন্দু আন্দামানে নির্ব্বাসন দণ্ড বরণ কবিয়াছে, হিন্দুস্থানের স্বাধীনতাব জন্য সহস্র সহস্র হিন্দু অন্যভাবে কাবাবরণ করিয়াছে; ভারতের জাতীয় কংগ্রেস হিন্দুবই মস্তিষ্কপ্রসূত প্রধানতঃ হিন্দুদিগের চেষ্টায়ই কংগ্রেস আজ বর্ত্তমান মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। সুতবাং যাঁহারা প্রকৃতহিন্দুহিতৈষী তাঁহারা ভাবতহিতৈষী না হইবা পারেন না।

স্বরাজ বলিতে সাধাবণতঃ দেশেব রাজনৈতিক স্বাধীনতা বুঝায়। ভূগোলে ভারত বলিয়া যে দেশ চিহ্নিত হয়, সেই দেশের স্বাধীনতা। কোনও দেশ বা কোনও ভৌগোলিক সংস্থানকে জাতি বলা যায় না। ভাবতের স্বাধীনতা বলিতে ভারতবাসীব স্বাধীনতা বুঝায়। সেই হিসাবে হিন্দুজাতির পক্ষে ভারতীয় স্বরাজ বা ভারতীয় স্বাতন্ত্র্য বলিতে হিন্দুদিগের রাজনৈতিক স্বাধীনতা বুঝায়। এ স্বাধীনতা সেই স্বাধীনতা, যাহার প্রভাবে হিন্দুগণের পূর্ণ উন্নতি সাধিত হওয়া সম্ভবপর।

ইহুদী ও পারশিকদিগের ইতিহাস আলোচনায় দেখিতে পাই,—আরবগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, তাহাবা আরবদের অধীনে জাতীয়তা ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করা অপেক্ষা দেশ ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়াছিল। ধর্ম্ম ও জাতি ত্যাগ না করিয়া, ইহুদী ও পাবশিকগণ তাহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ ও সংস্কৃতিসহ নিরাপদ স্থানে চলিয়া গিয়াছিল। স্বরাজ্য বলিতে ভারতবর্ষ নামক পৃথিবীর নগণ্য একটি অংশের স্বাধীনতা নহে। হিন্দুস্থান তখনই প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করিবে, যখন সেই স্বাধীনতা বলে হিন্দু তাহার 'হিন্দুত্ব' অর্থাৎ ধর্ম্ম, জাতি ও কৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে সমর্থ হইবে। যে স্বরাজ্য লাভ কবিতে আমাদের 'সত্তায়' ও 'হিন্দুত্বে' জলাঞ্জলি দিতে হইবে, আমরা সে স্বরাজের জন্য সংগ্রাম করিয়া মৃত্যু বরণ করিতে অগ্রসর হইব না।

ভাবতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এবং অখণ্ড ভারতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় হিন্দুরাই সর্ব্বদা অগ্রণী হইয়াছে। হিন্দুরাই প্রথমে অখণ্ড ভাবতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কল্পনা কবে। অখণ্ড ভারতীয় রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠাকল্পে হিন্দুর বর্ত্তমান সংখ্যালঘিষ্ঠ অহিন্দুদিগেব সহায়তা চায়। হিন্দুরা একটী অখণ্ড ভারতীয় জাতি গঠনে ইচ্ছুক; সেজন্য তাহারা কোনও বিশেষ দাবী পেশ কবিতে চায় না। কিংবা নিজেদেব জন্য কোনও সংরক্ষিত সুযোগ সুবিধা বা অধিকার দাবী করে না। ভারতীয় রাষ্ট্র ভারতীয়গণের দ্বারা গঠিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

পরলোকে

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যের খ্যাতনামা কথাশিল্পী শরৎ-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত ২রা মাঘ রবিবার পূর্ব্বাহ্ন ১০ ঘটিকার সময় নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬১ বৎসর হইয়াছিল। কিছুকাল যাবৎ তিনি পাকস্থলীর ক্ষত রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন। অবস্থা বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে অস্ত্রোপচার করা হয়। অস্ত্রোপচারের পর তাঁহার অবস্থা অনেকটা উন্নতির দিকে দেখা যাইতেছিল। কিন্তু ৪ দিন পর তাঁহার অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় এবং চিকিৎসকদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

সাহিত্যক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র যে অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন তাহা সত্যই দুর্লভ। তাঁহার লিখিত পুস্তকগুলি বহু ভাষায় অনূদিত হইয়া সর্ব্বত্রই বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। ভারতের ন্যায় ভারতের বাহিরেও তাঁহার খ্যাতি ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিতেছে।

তিনি রামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসী পরলোকগত স্বামী বেদানন্দের অগ্রজ। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গজননী যথার্থই একজন কৃতী সন্তান হারাইলেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

স্বামী প্রভানন্দ

গত ২৮শে পৌষ স্বামী প্রভানন্দ (কেতকী মহারাজ) শ্রীহট্টের পাহাড়পুর গ্রামে দেহত্যাগ করিয়াছেন। গত কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি বাতব্যাধি রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন।

স্বামী প্রভানন্দ শিলং ও খাসিয়া পাহাড়ের শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। স্বামী বিবেকানন্দের কর্ম্মযোগাদর্শে অনুপ্রাণিত তাঁহার জীবনের সংস্পর্শে যাঁহারাই আসিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার কর্ম্মশক্তি, ত্যাগ, ঐকান্তিকতা ও মহৎ হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছেন।

ঢাকা মঠে অবস্থানকালীন একবার তিনি জনৈক সন্ন্যাসীসহ খাসিয়া পাহাড়ে গিয়াছিলেন। সেখানে খাসিয়াদের দুরবস্থা, অশিক্ষা ও দলে দলে স্বধর্ম্মত্যাগ দর্শনে তাঁহার অন্তর ব্যথিত হয়। তিনি খাসিয়া জাতির মধ্যে সেবা- কার্য্য করিবার জন্য আত্মনিয়োগ করেন।

সহায় সম্বলহীন হইয়া প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে অবিরত যুদ্ধ করিয়া তিনি শুধু শ্রীগুরুপাদপদ্ম সম্বলে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হন। অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি বহু গ্রামে বহু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার অকৃত্রিম প্রেম, ত্যাগ ও সেবার দ্বারা তিনি পার্ব্বত্য নরনারীর চিত্ত জয় করিয়াছিলেন। যাঁহারাই তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র একবার দেখিয়াছেন, শিক্ষিত অশিক্ষিত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এমন কি খ্রীষ্টান পরিবারগুলির মধ্যেও তাঁহার প্রভূত সম্মান দেখিয়া তাঁহারাই আশ্চর্য্য হইয়াছেন।

তাঁহাকে দিবারাত্রি এত অধিক পরিশ্রম করিতে হইত যে, নিজের শরীরের অত্যাবশ্যক যত্ন-টুকুও তিনি যথারীতি লইতে পারিতেন না। অত্যধিক পরিশ্রম ও শরীরের প্রতি অবহেলা এই উভয় কারণেই তিনি অতি অল্প বয়সে রোগগ্রস্ত হইয়া পড়েন।

এই অদ্ভুত কর্ম্মযোগীর সাধনজীবন সত্যই অনুকরণযোগ্য। স্বামী প্রভানন্দ একটি পার্ব্বত্য জাতির জন্য তাঁহার জীবন দান করিয়াছেন বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না।

সংবাদ

ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেস—গত ১৯শে পৌষ, সোমবার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-কলেজ-প্রাঙ্গণে ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের রজত জয়ন্তী অধিবেশন সমারোহে আরম্ভ হইয়াছিল। এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে ব্রিটিশ বিজ্ঞান সমিতির অধিবেশন হওয়ায় ইহার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। কংগ্রেসের প্রতিনিধি ও দর্শক মিলিয়া প্রায় আড়াই হাজার ব্যক্তি ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। ইউরোপ হইতে শতাধিক বৈজ্ঞানিক এই কংগ্রেসে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মিত্র ও মিঃ বি এম সেন সম্পাদক এবং মিঃ জে এন বসু সাধারণ সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। এই বিজ্ঞান-কংগ্রেসে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক লর্ড রাদারফোর্ডের সভাপতিত্ব করিবার কথা ছিল কিন্তু তিনি হঠাৎ পরলোকগমন করায় তাঁহার স্থলে খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক স্যার্ জেমস্ জীন্স্ সভাপতিপদে বৃত হন এবং রাদারফোর্ডের লিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন। রাদারফোর্ড তাঁহার সুচিন্তিত অভিভাষণে বলেন, "ভারতবর্ষ যদি ভারতীয়দের জীবন-যাত্রা এবং স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে, দুনিয়ার বাজারে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে দিন দিন তাহাকে অধিকতর ভাবে বিজ্ঞানের সাহায্য লইতে হইবে।"

বড়লাট লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো কংগ্রেসের উদ্বোধন-প্রসঙ্গে বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডারে ভারতের দানের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, "আজ পাশ্চাত্যের মনীষিগণ যে সত্য আবিষ্কার করিতেছেন, উহা এই দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্যের মনীষিগণ ভারতে অনাড়ম্বর জীবন এবং আধ্যাত্মিক সম্পদের সন্ধান পাইবেন। আমরা যাহারা ভারতকে জানি এবং ভালবাসি, তাহাদের এই বিশ্বাস আছে যে, ভারত পাশ্চাত্যের ও জগতের ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডারে এই দিক দিয়াই দান করিবে এবং এই কাজে আপনারা ভারতকে সাহায্য করুন।"

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত শ্যামা প্রসাদ মুখার্জ্জি তাঁহার সুচিন্তিত অভিভাষণে বলেন, "ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের জ্ঞান অনেক সঞ্চিত রহিয়াছে, কিন্তু মানুষের দৈনন্দিন জীবনে তাহা কাজে লাগাইবার বিশেষ চেষ্টা হয় নাই। যে দেশে লক্ষ লক্ষ লোক দারিদ্র, রোগ ও অজ্ঞতায় মুহ্যমান, সেখানে কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য প্রভৃতি ব্যাপারে বিজ্ঞানের যথাপ্রয়োগ অবশ্য কর্ত্তব্য।"

মূলসভাপতি স্যার্ জেমস্ জিন্স্ তাঁহার অভিভাষণে বলেন, "বিজ্ঞানের ইতিহাসের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ভারতবর্ষ নীরব দর্শকরূপে দাঁড়াইয়া ছিল না। আপনারা অতি সামান্য সংখ্যক সদস্য লইয়া যে সমিতি আরম্ভ করিয়াছিলেন, আজ তাহা আন্তর্জাতিক গুরুত্বসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক হিসাবে ভারতবাসীরাও বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।"

"গণিতজ্ঞগণ রামানুজের প্রতিভার দিকে দৃষ্টি পাত করিবেন। পদার্থবিদ্যা-বিশারদগণ স্যার্ বেঙ্কট রমনের আবিষ্কার সমূহের প্রতি, গণিত-জ্যোতিষজ্ঞগণ অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার প্রতিভার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন। এতদ্ব্যতীত নক্ষত্রের গতিবিধিসম্পর্কে চন্দ্রশেখর এবং কোঠারীর নাম উল্লেখযোগ্য। তাহার পর কেবল পদার্থবিদ্ বা গণিতজ্ঞ নহেন, পরন্তু সকলেই যে পরলোকগত স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর অপূর্ব্ব প্রতিভা শ্রদ্ধা-সহকারে স্মরণ করিবেন, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই।"

উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান শাখায় প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক বি সাহানী সেন, কৃষি-বিজ্ঞান শাখায় রাও বাহাদুর টি এস্ বেঙ্কট রমন, শারীর বিজ্ঞান শাখায় কর্ণেল আর এন্ চোপরা, গণিত ও পদার্থ-বিদ্যা শাখায় ডাঃ নরম্যাণ্ড, ভূগোল ও ভূপরিমাণ-বিদ্যা শাখায় ডাঃ এ এম্ হেরণ, কীটতত্ত্ব শাখায় মহম্মদ আফজল হুসেন, পশু-চিকিৎসা বিভাগে স্যার এ অলিভার, ভূতত্ত্ব বিভাগে মিঃ ডি এন্ ওয়াদিয়া, জীবতত্ত্ব বিভাগে অধ্যাপক জর্জ্জ মাল্লাই,

নৃতত্ত্ব বিভাগে ডাঃ বি এস্ গুহ, রসায়ন-শাস্ত্র বিভাগে এম্ এস্ ভাটনগর, মনস্তত্ত্ব বিভাগে ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।

কংগ্রেসে কয়েকটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ পঠিত হয়। ইহাদের মধ্যে ডাঃ মেঘনাদ সাহার "ভারতের নদনদীর প্রকৃতি," ডাঃ নলিনী বসুর "ভারতের নদনদী," অধ্যাপক পি সি মহালানবিশের "উড়িষ্যায় বন্যার কারণ," ডাঃ দুর্গাদাস মুখার্জ্জির "জীবতত্ত্বের দিক হইতে পঙ্গপালের উপদ্রব নিয়ন্ত্রণ" বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কংগ্রেসের প্রতিনিধি ও দর্শকদের মধ্যে অনেকে একদিন বেলুড় মঠে উপস্থিত হইলে মঠের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদিগকে যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করেন।

বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির-প্রতিষ্ঠা—গত ৩০শে পৌষ, শুক্রবার, শুভ মকর সংক্রান্তির দিন বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্দির ও মর্ম্মরবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে।

বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি মন্দির এবং তৎসংলগ্ন একটি নাটমন্দির নির্ম্মাণ করা স্বামী বিবেকানন্দের অন্তরের আকাঙ্ক্ষা ছিল। তিনি নিজের তত্ত্বাবধানে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের দ্বারা উহার একটি নক্সাও প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। মন্দিরটি যাহাতে গম্ভীর ভাবোদ্দীপক হয় এবং সংলগ্ন নাটমন্দিরে যাহাতে হাজার লোক একত্র বসিতে পারেন, তৎপ্রতি তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। কিন্তু মাত্র ৩৯বৎসর বয়সে তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের অবসান হওয়ায় তিনি ঐ কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার পরিকল্পিত মন্দিরের নক্সাটি এতদিন তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণের নিকট রক্ষিত ছিল।

মার্কিন যুক্তরাজ্যের প্রভিডেন্স বেদান্ত সমিতির অধ্যক্ষ স্বামী অখিলানন্দের উদ্যোগে এতদিন পর স্বামী বিবেকানন্দের কল্পনা বাস্তবে পরিণত হইল। স্বামী অখিলানন্দের শিষ্যা মিসেস্ য়্যানা উরষ্টার ও মিস্ হেলেন্ রুবেল্ তাঁহাকে প্রায় ৭ লক্ষ দান টাকা দান করেন। তিনি এই টাকা মন্দির-নির্ম্মাণের জন্য বেলুড়মঠের ট্রাষ্টিদের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। কলিকাতার মার্টিন কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে মন্দির-নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হয়। বর্ত্তমানে চূণার প্রস্তর নির্ম্মিত গর্ভমন্দিরটির কার্য্য শেষ হইয়াছে। নাটমন্দিরের কার্য্য এখনও চলিতেছে। আশা করা যায়, আরও ছয় মাসের মধ্যেই মন্দিরের কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়া যাইবে।

মন্দিরটি সম্পূর্ণ হইলে ভাবগম্ভীর এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্য স্থাপত্য-শিল্পের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের সমাবেশে এক অপূর্ব্ব দর্শনীয় বস্তু হইবে। এবং এমন সুদৃঢ় হইবে যে, বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত কালের প্রভাব অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে। বলা বাহুল্য, ইহা বঙ্গদেশের মন্দির-নির্ম্মাণের ইতিহাসে এক যুগান্তর আনয়ন করিবে; কারণ, সমগ্র উত্তর-ভারতে এই শ্রেণীর মন্দির আর একটিও নাই।

এই মন্দির-নির্ম্মাণের সমগ্র ব্যয় নির্ব্বাহের পক্ষে পাশ্চাত্য দেশ হইতে প্রাপ্ত অর্থ পর্য্যাপ্ত নহে। উহা সম্পূর্ণ করিতে এবং আবশ্যকীয় আনুষঙ্গিক গৃহাদির ব্যবস্থা করিতে আরও দেড় লক্ষ টাকার প্রয়োজন। বাংলার বিখ্যাত ভাস্কর শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর পাল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়াছেন এবং শিল্পাচার্য্য শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মর্ম্মর বেদী এবং চন্দ্রাতপ প্রভৃতির নক্সা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন।

গর্ভমন্দিরের উচ্চতা ১১২ ফিট্, প্রস্থ ১০৯ ফিট্, নাটমন্দির সমেত সমগ্র মন্দিরটির দৈর্ঘ্য ২৩২ ফিট্। শুধু নাটমন্দিরের দৈর্ঘ্য ১৫২ ফিট এবং প্রস্থ ৭২ ফিট্।

মন্দির প্রতিষ্ঠা উৎসবে যোগদান করিবার জন্য রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে প্রায় দুইশত সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বহু ভক্ত বেলুড় মঠে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

এই উপলক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্দিরের নিকট একটি বিরাট সভামণ্ডপ ও তাঁহার পাশে বৈদিক রীতি অনুসারে সুদৃশ্য একটি যজ্ঞমণ্ডপ প্রস্তুত করা হইয়াছিল। যজ্ঞমণ্ডপের দক্ষিণে অর্দ্ধবৃত্তাকৃতি যজুর্ব্বেদীয় যজ্ঞকুণ্ড, উত্তরে অথর্ব্ববেদীয় অষ্টদলপদ্মাকার যজ্ঞকুণ্ড, পশ্চিমে সামবেদীয় বৃত্তাকার যজ্ঞকুণ্ড, পূর্ব্বে ঋগ্বেদীয় চতুষ্কোণ যজ্ঞকুণ্ড এবং ঈশানকোণে চতুষ্কোণ আচার্য্যকুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া মধ্যস্থলে সুদৃশ্য আলিপনামণ্ডিত বেদীর উপর পত্রপুষ্পসুসজ্জিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একখানি সুন্দর প্রতিকৃতি স্থাপন করা হইয়াছিল।

চতুর্দ্ধারে ও ১৬টী স্তম্ভে কলস স্থাপিত হয়। কাশীধাম হইতে আগত আটজন মহারাষ্ট্রীয় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও বঙ্গদেশীয় ৩ জন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ পূর্ব্বদিন প্রাতে বহির্মণ্ডপে স্বস্তিবাচন, সংকল্প ও বরণাদি-কার্য্য সমাপ্ত করিয়া যজ্ঞমণ্ডপে প্রবেশ করেন। পরে মণ্ডপের নৈঋতকোণে বাস্তুপুরুষ, ঈশান-কোণে নবগ্রহ, অগ্নিকোণে যোগিনী, বায়ুকোণে ক্ষেত্রপাল প্রভৃতি দেবদেবীগণের যথাবিহিত পূজা করিয়া বাস্তুযাগ, গ্রহযাগ, রুদ্রযাগ, দিক্‌পালযাগ সম্পন্ন করেন। সন্ধ্যাকালে নবনির্ম্মিত মন্দিরে গণেশ পূজান্তে শ্রীমূর্ত্তির শুভ অধিবাস ও মহাভিষেকের উপচার সকলের শুদ্ধিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই দিন প্রাতে প্রভুপাদ প্রাণগোপাল গোস্বামী নবমন্দিরে শ্রীমদ্ভাগবৎপাঠ করেন।

শুক্রবার প্রাতে ৬—২০ মিনিটের সময় শ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের পবিত্র অস্থি ও প্রতিকৃতিসহ একটি শোভাযাত্রা পুরাতন ঠাকুরঘর হইতে নবনির্ম্মিত মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। সমগ্র পথটিতে সালু বিছাইয়া উহার উপর ফুলের পাপড়ি ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। দুইদিকে কর্পূর দীপ ও ধূপ হস্তে ভক্তগণ দণ্ডায়মান ছিলেন। শোভাযাত্রার পুরোভাগে একজন গঙ্গাজল বিকীরণ করিতে করিতে অগ্রসর হন, সন্ন্যাসিগণ শঙ্খ বাজাইয়া যাইতে থাকেন, অতঃপর একটি গাভী ও পূর্ণকুম্ভ লইয়া যাওয়া হয়, কাশীধাম হইতে আগত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে এবং সাধুভক্তগণ "এসেছে নূতন মানুষ" গানটি গাহিতে গাহিতে গমন করেন, পরে পর্য্যায়ক্রমে চামর, আশাসোঁটা ও সিংহাসনোপরি শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি বহন করিয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করা হয়, শেষভাগে সুবৃহৎ ছত্রনিম্নে শ্রীশ্রীঠাকুরের পবিত্র অস্থি-পেটিকা লইয়া শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ মোটর গাড়ীতে আরোহণ করিয়া অগ্রসর হইতে থাকেন। বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে ৬—৩০ মিনিটের সময় শোভাযাত্রা নবমন্দিরে পৌঁছে। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া বেদীর উপরে শ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের পবিত্র অস্থি স্থাপন করেন।

অতঃপর বঙ্গদেশীয় ১৫ জন বিশিষ্ট শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ব্রাহ্মণ বহির্মণ্ডপে স্বস্তিবাচন, সংকল্প ও বরণ কার্য্য সমাপন করিয়া যজ্ঞমণ্ডপে প্রবেশ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূজান্তে পঞ্চদেবতা, বাস্তুপুরুষ, নবগ্রহ, যোগিনী, ক্ষেত্রপাল প্রভৃতি যজ্ঞবেদীস্থিত দেবদেবীগণের পূজা হয়। আচার্য্য কুণ্ড হইতে যজুর্ব্বেদক্রমে প্রতিকুণ্ডে চতুর্ব্বেদীয় অগ্নিস্থাপন করিয়া চারিবেদোক্ত মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক যথাবিহিত উপচারে যজ্ঞকার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণগণ হোতা ও সদস্যপদে বৃত হইয়াছিলেন এবং মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণ চতুর্দ্বারে দুইজন করিয়া ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব বেদোক্ত মন্ত্রসকল যথা—পুরুষসূক্ত, রুদ্রসূক্ত, শ্রীসূক্ত প্রভৃতি পাঠ করিয়াছিলেন।

নবমন্দিরে পঞ্চঘট ও শান্তিকুম্ভ স্থাপনপূর্ব্বক যথাবিহিত দেবদেবীগণের পূজা করিয়া শ্রীমূর্ত্তির মহাভিষেক কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। পরে জীবন্যাস করিয়া শ্রীমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠান্তে দুইবার ষোড়শোপচারে পূজা ও পঞ্চসহস্র সংখ্যক সমিধ যাগ হয়। আরতির পর নবমন্দির মন্ত্রপূত করিয়া উৎসর্গ করা হইয়াছিল। দিবাভাগে দশাবতার ও রাত্রে দশ-- মহাবিদ্যার ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া অগ্নি-স্থাপনপূর্ব্বক বিরজা হোম সম্পন্ন হয় এবং নয় জন সন্ন্যাস ও নয় জন ব্রহ্মচর্য্য ব্রত গ্রহণ করেন।

প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত উৎসব চলে। এই উপলক্ষে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দির, স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের মন্দির, স্বামীজির মন্দির প্রভৃতি সজ্জিত করা হইয়াছিল এবং সমগ্র দিনব্যাপী কালীকীর্ত্তন, হরিসংকীর্ত্তন ও ভজন সংগীতে মঠ প্রাঙ্গণ মুখরিত ছিল। এই দিন ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে প্রায় এক লক্ষ নরনারী বেলুড় মঠে সমাগত হইয়াছিলেন। প্রায় বার হাজার ভক্ত নরনারী শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদ গ্রহণ করেন। এই বিরাট জনতা নিয়ন্ত্রণের জন্য বহু স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করা হইয়াছিল। রাত্রে মন্দিরটি আলোক-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। সুদৃশ্য আতসবাজি পোড়ানের পর উৎসব শেষ হয়।

বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব—স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উৎসব গত ৮ই মাঘ, শনিবার, বেলুড় মঠে বিপুল সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। সারাদিনব্যাপী সুদীর্ঘ অনুষ্ঠানের দ্বারা এই মহাপুরুষের আবির্ভাবকে

যেন মূর্ত্ত করিয়া তোলা হইয়াছিল। উদাত্ত সুরেব বেদ গান, উপনিষদেব সুমধুর আবৃত্তি, পূজা, অর্চ্চনা ও কীর্ত্তনাদি দ্বাবা অতীতেব মহামানবকে অভ্যর্থনা করা হইয়াছে। দেশবিদেশ হইতে শত শত নরনারী উৎসবে যোগদান করিয়া মহাপুরুষেব স্মৃতিব দুয়ারে তাঁহাদের শ্রদ্ধা-অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছেন।

অপবাহ্ণে মঠ-প্রাঙ্গণে এই উপলক্ষে এক বিরাট সভা হয়। মিঃ বি সি চাটার্জ্জি সভাপতিব আসন গ্রহণ করেন। স্বামী অখিলানন্দ, স্বামী বিশ্বানন্দ, অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকাব 'বিশ্বসভ্যতায় বিবেকানন্দের দান' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। স্বামী বিবজানন্দ, স্বামী বিশুদ্ধানন্দ, শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ বসু, মেজব সি বর্দ্ধন, রাজা ক্ষিতীন্দ্রদেব রায়, ডাঃ ডি পি ঘোষ, কর্ণেল এ সি চাটার্জ্জি, মিসেস এ সি চাটার্জ্জি প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীভগবানকে আহ্বান করিয়া একটি উদ্বোধন সঙ্গীত গীত হইলে পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়।

স্বামী অখিলানন্দ বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, "আমরা আজ এক বিরাট পুরুষের, এক বিরাট ব্যক্তিত্বের জন্মতিথি উৎসব সম্পন্ন করিতে সমবেত হইয়াছি। জগতেব সমস্যা ও তাহার সমাধানের গুরুত্ব সম্বন্ধে যতই আমবা ভাবি বা চিন্তা করি, ততই আমবা এরূপ মহাপুরুষেব, এরূপ নেতাব মহত্ব ও তাঁহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করি।

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও পাশ্চাত্য আদর্শ বস্তুতন্ত্রবাদেব উপর প্রতিষ্ঠিত। আর্থিক উন্নতি তাঁহাদের একমাত্র কাম্য এবং ইহার জন্য ধর্ম্মকেও তাঁহাবা বিসর্জ্জন দিতে দ্বিধা বোধ করেন না। আধ্যাত্মিক জগতের উপব বস্তুতান্ত্রিক জগতেব প্রতিষ্ঠা বলিয়াই পাশ্চাত্য দেশে আজ এত অশান্তি এবং এজন্যই কোন সমস্যার সমাধানেই তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না। ডাঃ হোমস, কেরল প্রভৃতি বহু পাশ্চাত্য মনীষীও এ বিষয়ে একমত যে, এই বস্তুতন্ত্রবাদ পৃথিবীকে ধ্বংসের মুখে টানিয়া আনিতেছে। পাশ্চাত্য দেশবাসী ইহা কোনমতেই স্বীকার করিতে রাজী নন যে, ভারত তাঁহাদিগকে এমন কিছু দিয়াছে বা দিতেপারে, যাহা তাঁহাদিগকে বর্ত্তমান জটিল অবস্থা হইতে মুক্তি দিতে পাবে। যে পাশ্চাত্য দেশ আজ সভ্যতাব বড়াই করিতেছে, সে দেশে এখনও যথেষ্ট অজ্ঞতা, নিরক্ষরতা ও কুসংস্কাব রহিয়াছে। আমাদের দেশে এখনও যথেষ্ট ধর্ম্মভয় আছে, ন্যায় অন্যায়ের বিচারবুদ্ধিও আছে, প্রকৃত সভ্যতা বলিতে যাহা বুঝা যায়, তাহার যতটা ইঁহাদের মধ্যে পাই, ততটা সেই দেশের লোকদের মধ্যে অনেক সময় আমরা পাই না। ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবনে আমাদের অপেক্ষা তাঁহাদের অনেক বেশী গলদ, দুঃখ ও অশান্তি রহিয়াছে। স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া তাঁহাবা অশান্তি ও দুর্য্যোগ টানিয়া আনিয়াছেন খুবই বেশী।

স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বময় এই বাণীই ঘোষণা করিয়াছেন যে, প্রত্যেক মানব প্রত্যেক জীবই ভগবৎ শক্তির পূর্ণ ও ব্যাপকবিকাশ। আমাদের যুগ-প্রবর্ত্তক শঙ্করাচার্য্যও বিশ্বকে ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে, 'জীবই ব্রহ্ম এবং জীবাত্মা শক্তিময় ভগবান'। বেদান্তের এই সারমন্ত্রকেই তিনি দেশ বিদেশে প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার নির্দ্দেশ মতে অন্তর্নিহিত এই ভগবৎ শক্তিকে যদি আমরা বিশ্বাস করি এবং একে অপবকে অপমান করিবার দুর্ম্মতি যদি আমাদেব দূর হয়, তাহা হইলে জগতের সমস্ত সমস্যার সুন্দর সমাধান হইয়া যায়। ধনিক ও শ্রমিকের সংঘর্ষ, বিভিন্ন ধর্ম্মের সংঘাতও দূর হইয়া যাইত।

প্রত্যেক নেতা ও প্রত্যেক কর্ম্মীর একমাত্র কর্ত্তব্য—বিবেকানন্দের বাণী ও তাঁহার নির্দ্দেশিত মতবাদকে দেশবিদেশে প্রচার করা। কর্ম্মই ভগবান এবং কর্ম্মদ্বারাই ভগবৎসান্নিধ্য লাভ করা যায়। জনসেবার আদর্শদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া কর্ম্ম করাই প্রত্যেক মানবের ধর্ম্মের অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিয়া মনে করা উচিত, এবং তাহাতেই আত্মতুষ্টি ও আত্মতৃপ্তি লাভ হয়। সাম্য ও মৈত্রীর প্রতিষ্ঠা তখনই সম্ভব হইবে, যখন আমরা প্রত্যেক মানবকে ভগবানের অপরিহার্য্য অংশ বলিয়া ভাবিতে শিখিব এবং তখনই পরস্পরের প্রতি রেষারেষি ও সংঘর্ষের ভাবও চলিয়া যাইবে। ইহা না হইলে যতই আমরা কার্ল মার্কস বা অন্যান্য জগৎবিখ্যাত সাম্যবাদীদের মতবাদের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করি না কেন, আসল কাজ কিছুই হইবে না। সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রকৃত নিঃস্বার্থপরতা, পরস্পরের

প্রতি প্রকৃত দরদই একমাত্র প্রয়োজনীয় জিনিষ বলিয়া বিবেকানন্দ মনে করিতেন।"

স্বামী বিশ্বানন্দ সংক্ষেপে বলেন, "স্বামী বিবেকানন্দ এদেশে দেশপ্রেমের বন্যা আনিয়া দেন। তিনি ছিলেন, বিশ্ববিখ্যাত বক্তা। তাঁহার ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ। স্বকীয় কর্ম্ম ও বাণীদ্বারা তিনি দেশকে এক বিশেষ প্রেরণা দিয়াছেন। রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ একই জিনিষের দুইটি দিক। একজন আর একজনের অপরিহার্য্য অংশ, একজনকে বাদ দিলে আর একজন অসম্পূর্ণ। ইঁহারা দুজনই ছিলেন ভূমারই অংশ বিশেষ। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন যৌবন ও অদম্য কর্ম্মপ্রেরণার উৎস। জন্মভূমির প্রতি ছিল তাঁহার অপার অনুরাগ ও অচলা ভক্তি। বিশ্বজগতের সম্মুখে তিনি ভারতকে এত উচ্চ করিয়া তোলেন যে, সেই জন্য ভারতকে জানিতে ও বুঝিতে বিশ্ববাসীর আজ এত আগ্রহ। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ভারতের এই আধ্যাত্মিক শক্তি ও সম্পদকে বিশ্বের দ্বারে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য উপযুক্ত লোক খুঁজিতেছিলেন, এই বিবেকানন্দই তাঁহার চিরঈপ্সিত মানব। ইঁহারা দুইজন হিন্দুধর্ম্মের একটি রূপ দিয়াছেন।"

অতঃপর তিনি দেশবাসীকে, বিশেষ করিয়া যুবকবৃন্দকে এই বলিয়া উপদেশ দেন যে, তাহারা যেন বীরপূজা করা জীবনের কর্ত্তব্যকর্ম্ম বলিয়া মনে করে। প্রকৃত বীরের সন্ধান স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যেই মিলিবে। স্বামীজি ছিলেন সাধক। তিনি সাধনা দ্বারা ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের রূপ দেখিয়াছিলেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, এই ভারতই একদিন সমগ্র বিশ্বকে জয় করিবে। তাঁহার এই স্বপ্নকে সাফল্য মণ্ডিত করিবার দায়িত্ব দেশের যুবক সম্প্রদায়ের। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন অদ্বিতীয় সন্ন্যাসী। এই সন্ন্যাসীই মানবের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক প্রভৃতি সকল প্রকার উন্নতির পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন।

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার মহাশয় বলেন, "বিবেকানন্দ নবীন বাঙ্গলার, নবীন ভারতের জন্মদাতা। নবীন দুনিয়ার তিনি অগ্রদূত। এদেশের সকল বিষয়েই অগ্রদূতরূপে তিনি জন্মিয়াছিলেন। তিনি জাতিকে বুঝাইয়াছিলেন যে, পূর্ব্বপুরুষদের কীর্ত্তিতে গৌরব বোধ করিয়া কোন লাভ নাই। স্বকীয় কীর্ত্তিই মানুষের যথার্থ পরিচয়। মুখে সাম্য ও ঐক্যের বুলি আওড়াইলেই বিশ্ব হইতে ভেদবুদ্ধি দূর হয় না। ভ্রাতৃত্বের বড় বড় কথা না বলিয়া ছোটদের বড় করিয়া তুলিতে হইবে। তাহা হইলেই বেদান্তের উপযুক্ত চর্চ্চা হইবে, আধ্যাত্মিক স্বরাজ তখনই লাভ হইবে, যখন নিজের স্বার্থকে বলি দিয়া জনসাধারণের স্বার্থ ও উন্নতির প্রতি সকলের লক্ষ্য যাইবে। ইহাই স্বামী বিবেকানন্দের মূলমন্ত্র"। অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণের পর সভা ভঙ্গ হয়।

এলবার্ট হলে বিরাট সম্বর্দ্ধনা সভা--গত ১৭ই মাঘ, সোমবার, সন্ধ্যায় এলবার্ট হলে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় কলিকাতার নাগরিকগণের পক্ষ হইতে আমেরিকার বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক স্বামী অখিলানন্দ এবং নবনির্ম্মিত রামকৃষ্ণ-মন্দির নির্ম্মাণে অর্থ সাহায্যকারিণী মিসেস্ য্যানা উরষ্টার ও মিস্ হেলেন রুবেলকে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত করিয়া দুইখানি মানপত্র প্রদান করা হয়। এই উপলক্ষে এলবার্ট হলে এরূপ জনসমাগম হইয়াছিল যে, সভাস্থলে তিলধারণের স্থানও অবশিষ্ট ছিল না। কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র শ্রীযুক্ত সনৎকুমার রায় চৌধুরী এই সম্বর্দ্ধনা-সভার পৌরোহিত্য করেন।

নিম্নলিখিত বিশিষ্ট নাগরিকগণ এই সম্বর্দ্ধনা সভায় যোগদান করিয়া ইহার গুরুত্ব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন:—

সুসংএর মহারাজা, ময়মনসিংহের মহারাজা, মিঃ বি সি চাটার্জ্জি, ডাঃ ডি পি ঘোষ, স্বামী বিরজানন্দ, স্বামী মাধবানন্দ, অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, মিঃ বি সেনগুপ্ত, সিষ্টার সরস্বতী দেবী, মিঃ বি কে বসু, অধ্যাপক জয়গোপাল বানার্জ্জি, ডাঃ সাবিত্রী দেবী প্রভৃতি।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মিঃ বি সি চাটার্জ্জি অভ্যাগত ব্যক্তিবর্গকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিয়া বলেন, "আজিকার এই বিরাট জনসভা দর্শন করিয়া আমাদের মনে স্বতঃই এই ভাব উদয় হইতেছে যে, এতদিন পরে দেশ ভগবান পরমহংসদেবের বাণী প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছে; শুধু তাহাই নহে, ভারত ও আমেরিকার ধর্ম্মমত একসূত্রে গ্রথিত হইয়া এক অভিনব

ভাবরাজ্য সৃষ্টির যে চিন্তা ও পরিকল্পনা এতদিন আমাদের কল্পনায় রহিয়াছে, তাহা বাস্তবে পরিণত হইতে আর বেশী বিলম্ব নাই।"

মিঃ চাটার্জ্জির বক্তৃতার পর কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র শ্রীযুক্ত রায় চৌধুরী অভিনন্দন-পত্র দুইখানি মূল্যবান তিনটি আধারে স্থাপন করিয়া বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে উহা স্বামী অখিলানন্দ, মিসেস্ উরষ্টার ও মিস্ রুবেলের হস্তে সমর্পণ করেন।

স্বামী অখিলানন্দ অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে বলেন, "এই বিপুল জনসমুদ্রের দিকে চাহিয়া আজ আমাদের যদি কিছু বুঝিবার থাকে, তবে বুঝিব, ইহা ভগবান পরমহংসদেবেরই একমাত্র অনুকম্পা। আমাদের প্রতি আজ যে বিপুল ও বিরাট সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হইল, ইহা বাহ্যতঃ আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া প্রদর্শিত হইলেও ইহার মূলে রহিয়াছে ভগবান পরমহংসদেবের প্রতি তাঁহার গুণমুগ্ধ দেশবাসিগণের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি জ্ঞাপনের মূলসূত্র।"

নবনির্ম্মিত রামকৃষ্ণ-মন্দিরের কথা উল্লেখ করিয়া স্বামীজি বলেন, "গত ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ সর্ব্বপ্রথমে এইরূপ একটি মন্দির নির্ম্মাণের পরিকল্পনা করেন। তিনি তাঁহার সুদূরদর্শী কল্পনা-নয়নে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন যে, এই মন্দিরটিই হইবে প্রাচ্যের সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের এক প্রকৃষ্ট লীলাক্ষেত্র। কাজেই মন্দির নির্ম্মাণ সম্পর্কে সমস্ত কৃতিত্ব একমাত্র স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীরই প্রাপ্য। স্বামী বিবেকানন্দের এই পরিকল্পনাকে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বাস্তবে পরিণত করিতে অহোরাত্র কঠোর পরিশ্রম করিয়া যে অসাধ্য সাধন করেন, তাহা আমি ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। এই মন্দিরটি হইল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন-প্রতীক। এই মন্দিররূপ মহামিলন ক্ষেত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সহস্র সহস্র লোক দৈনিক সমবেত হইবেন এবং দুই বিভিন্নমুখী সংস্কৃতির যোগসাধন করিয়া এক অভিনব জগৎ সৃষ্টি করিয়া তুলিবেন"।

উপসংহারে বক্তা দেশের যুবক যুবতীগণকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, "আপনারা ভগবান পরমহংস-দেবের বিজয় পতাকা ঊর্দ্ধে ধরিয়া রাখিতে বদ্ধ-পরিকর হউন। আপনারা পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও সাহায্যের বাণী প্রচার করিয়া ভারতের পূর্ব্ব গৌরব হৃত ঐশ্বর্য্য পুনরায় ফিরাইয়া আনিতে প্রাণপণ চেষ্টা করুন। এইভাবেই আপনারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভেদবুদ্ধিকে চিরতরে নির্ব্বাসিত করিয়া এক অভিনব প্রেমের রাজ্য স্থাপন করিতে পারিবেন। এইভাবেই আপনারা ভগবান পরমহংসদেবের ঊর্দ্ধগামী অশরীরী আত্মার সম্যক তৃপ্তি সাধন করিয়া দেশকে ধন্য করিতে পারিবেন।"

অতঃপর ডাঃ সাবিত্রী দেবী, কুমারী নির্ম্মলা দেবী এবং অন্যান্য কয়েকজন এই সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহারা সকলেই মিসেস্ উরষ্টার ও মিস্ রুবেলের দানকার্য্যের প্রশংসা করিয়া তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সর্ব্বশেষে সভাপতি শ্রীযুক্ত সনৎকুমার রায় চৌধুরী বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, "আমরা কলিকাতার নাগরিকগণ আজ আমেরিকাবাসিনী এই মহীয়সী মহিলাদ্বয়কে অভিনন্দিত করিয়া গৌরবানুভব করিতেছি। তাঁহারা শুধুই যে সাত লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন, এমন নহে, অধিকন্তু তাঁহারা সুদূর আমেরিকা হইতে ভারতবর্ষে শুভাগমন করিয়া স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্ন কার্য্যে পরিণত করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন। ভারতীয় ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণের মনোমন্দিরে এই দানশীলা মহিলাদ্বয় চিরকাল বিরাজমানা থাকিবেন। এই নবনির্ম্মিত রামকৃষ্ণ-মন্দির আমেরিকা ও ভারতবর্ষের দূরত্বকে সান্নিধ্যে পরিণত করিতে সক্ষম হইবে। এই মন্দিরেই আমেরিকা ও ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ও ধর্ম্মভাবের চিরমিলন সাধন সম্ভবপর হইবে এবং এই মন্দিরই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাবধারার উপর বিশ্বভ্রাতৃত্বের এক অভিনব ছায়াপাত করিবে।"

অতঃপর অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে অধিক রাত্রে সভার কার্য্য শেষ হয়।

বেদান্ত সোসাইটি, স্যান্-ফ্রান্সিস্কো—গত জানুয়ারী মাসে অধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দ সেঞ্চুরী ক্লাব ও বেদান্ত সোসাইটিতে নিম্নোক্ত বক্তৃতা দান করিয়াছেন:—

(১) মনস্তত্ত্ব এবং সহজজ্ঞান-কলা, (২) অবতারবাদ, (৩) আমরা কি কর্ম্মের দাস? (৪) অনাসক্তি সাধনার কৌশল, (৫) মানুষ কি সর্ব্বজ্ঞ ও

সর্ব্বশক্তিমান হইতে পারে? (৬) বিশ্বশান্তি এবং আধ্যাত্মিক শান্তি, (৭) স্বামী বিবেকানন্দ ও আমেরিকার ধর্ম্ম, (৮) শারীরিক ও আত্মিক অধঃপতন।

এতদ্ব্যতীত প্রতি শুক্রবার বেদান্ত সোসাইটি হলে সমাগত ভক্তগণকে তিনি ধ্যান ধারণাদি ও বেদান্ত-তত্ত্ব সাধন সম্বন্ধে শিক্ষাদান করিয়াছেন। গত ২৬শে জানুয়ারী বেদান্ত সোসাইটি হলে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

বেদান্ত সোসাইটি, লস্ এঞ্জেলিস্—গত ডিসেম্বর মাসে অধ্যক্ষ স্বামী প্রভবানন্দ নিম্নলিখিত বক্তৃতাগুলি প্রদান করিয়াছেন:—

(১) যোগী হইবার উপায়, (২) জ্ঞানলাভ ও দুঃখনাশ, (৩) ভক্তিযোগ অথবা প্রেমের পথ, (৪) খ্রীষ্ট।

জানুয়ারী মাস হইতে লস্ এঞ্জেলিস্ ও স্যান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো বেদান্ত সোসাইটি একযোগে 'ভয়েস্ অব ইণ্ডিয়া' নামে একখানা মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিতেছেন।

রামকৃষ্ণ—বিবেকানন্দ—বেদান্ত সোসাইটি, লণ্ডন—গত ১১ই জানুয়ারী হইতে ৮ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত অধ্যক্ষ স্বামী অব্যক্তানন্দ নিম্নোক্ত বক্তৃতাগুলি প্রদান করিয়াছেন:—

(১) ব্রহ্মের স্বরূপ, (২) মত আরোপ করা, (৩) মায়া ও উহার বিচার প্রণালী, (৪) বৈদান্তিক সাধনার প্রণালী, (৫) মৃত্যু।

১৫ই ফেব্রুয়ারী হইতে ২৯শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত তিনি নিম্নলিখিত বক্তৃতা প্রদান করিবেন:—

(১) মৃত্যুর পর দেবযান ও পিতৃযান মার্গ, (২) পুনর্জ্জন্মবাদ, (৩) বেদান্তে অমরত্ব, (৪) মুক্তি, (৫) মুক্ত আত্মার শক্তি, (৬) জ্ঞান ও ধ্যান, (৭) জাগতিক মুক্তি।

শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিক স্মৃতি-মন্দির, ওয়েলওয়েতা, সিংহল—মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী শাশ্বতানন্দ ওয়েলওয়েতায় শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিক স্মৃতি-মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। বিভিন্ন ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিস্বরূপ স্থানীয় বহু বিশিষ্ট লোক এই উৎসবে যোগদান করেন। অপরাহ্নে একটি বিরাট সভার অধিবেশন হয়। ইহার সভাপতিরূপে স্বামী শাশ্বতানন্দ সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা করেন।

মন্দিরটি মেসার্স প্রেমজী দেবজী, এম্‌-কে কাপাটিয়া, এম জে পেটেল এবং প্রার্থনা গৃহটি ডঃ জি বিয়রাজা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে।

চিত্র-প্রদর্শনী—কলিকাতা, হগ ষ্ট্রীট, ১১, সমবায় মেনসনে গত ১৩ই জানুয়ারী হইতে সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত মহাশয়ের চিত্র প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে। পেইন্টিং, ড্রয়িং, এচিং, উড্‌কাট, লিথোগ্রাফ্ ও প্লেট এনগ্রেভিং মোট ১৯২ খানা চিত্র প্রদর্শনীতে স্থান পাইয়াছিল। মণীন্দ্র বাবুর চিত্রগুলিতে একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। সমুদয় চিত্রগুলিই বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব—আগামী ২২শে ফাল্গুন, ১৩৪৪, রবিবার, ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ত্র্যধিকশততম জন্মতিথি উপলক্ষে বেলুড় মঠে আনন্দোৎসব হইবে।

শ্রুতি ও যুক্তি

অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (পাটনা)

আচার্য্যগণ ভারতীয় দর্শনকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—আস্তিক ও নাস্তিক। তত্ত্বনির্দ্ধারণে শ্রুতি ও যুক্তির বলাবল বিচার অবলম্বনেই এইরূপ বিভাগ স্বীকৃত হইয়াছে। পাশ্চাত্যদর্শনে শব্দ প্রমাণান্তররূপে স্বীকৃত হইলেও ঐ দর্শন কার্য্যতঃ যুক্তিমূলক। একমাত্র যুক্তি অবলম্বনেই জগতের তত্ত্ব নির্দ্ধারিত হইতে পারে, ইহাই পাশ্চাত্যের সংস্কার। প্রাচ্য নাস্তিক দর্শনগুলিও এই ভাবেই অনুপ্রাণিত। আস্তিক দর্শনের মধ্যেও এক শ্রেণী শ্রুতিকেই বস্তুতঃ শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া ঘোষণা করে এবং যুক্তিকে উহার পোষক বা সহকারীরূপে গ্রহণ করে, যেমন মীমাংসাদ্বয়। আর এক শ্রেণী যুক্তিরই প্রাধান্য অবলম্বন করিয়া শ্রুতিকে সহকারীরূপে ব্যবহার করে, যেমন সাংখ্যাদি।

যুক্তিবাদীর বক্তব্য এই যে শ্রুতিপ্রামাণ্যের অভ্রান্ততায় নির্ব্বিচার বিশ্বাস স্থাপন এবং উহার একান্ত আনুগত্য মানবমনীষার প্রতি অনাস্থা ও অবমাননার পরিচায়ক। মানুষের ধীশক্তির অগম্য তত্ত্ব কাল্পনিকতা ছাড়া আর কিছুই নহে। মানুষ আপন বুদ্ধিবলে বুঝিবে না এমন তত্ত্ব যদি কিছু থাকেও তবে তাহা দ্বারা মানুষের কোনই প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে না। আধুনিক ভারতীয় মনীষিগণের কেহ কেহ এইরূপ ভাবের প্রতিধ্বনি করিতেছেন। ইঁহারা বলেন "যাহা শাস্ত্র তাহাই বিশ্বাস্য নহে, যাহা বিশ্বাস্য তাহাই শাস্ত্র।" "সত্যানুরাগের সাহায্যে শাস্ত্রের অমূলক অংশ পরিত্যাগ করিতে হইবে" ইত্যাদি। কিন্তু সিদ্ধপুরুষগণের কাহাকেও ঈদৃশভাব প্রকাশ করিতে শুনি নাই। বরং অসীম প্রতিভাসম্পন্ন ও শাস্ত্র-

সমুদ্রমন্থনকারী অনেক সিদ্ধমহাপুরুষ নিরপেক্ষ যুক্তির অসারতা এবং শ্রুতিপ্রামাণ্যের অভ্রান্ততা ও আনুগত্যই তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন। ইঁহাদের ধীশক্তির তীক্ষ্ণতা কিংবা অধ্যয়নের বিশালতা আধুনিক যুগের কাহারও অপেক্ষা ন্যূন ছিল বলিয়াও মনে হয় না। কেহ হয়ত বলিতে পারেন যে ইঁহারা তীক্ষ্ণধী হইলেও একই বিষয়ের আজীবন আলোচনা দ্বারা অলক্ষিতে একটা সংস্কার-গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু ঈদৃশ বিপদ সকল যুগের সকল মানুষেরই সম্ভব। বৈজ্ঞানিকই হউন আর দার্শনিকই হউন একেবারে সংস্কারমুক্ত বোধ হয় কেহই নন।

যাহা হউক, বর্ত্তমান যুগকে যুক্তির যুগ বলা যাইতে পারে। যুক্তিযুক্ত না হইলে কোন কিছুই গ্রাহ্য নহে, ইহাই এই যুগের মূলমন্ত্র। এই যুগে মানুষ আপন বুদ্ধির ক্ষমতা দেখিয়া আপনিই হত-বুদ্ধি (?) হইতেছে। যত বড় জটিল প্রশ্নই হউক না কেন বুদ্ধির নিকট তাহার সদুত্তর পাওয়া যাইবে, এ যুগের মানুষ ইহা বিশ্বাস করিতে শিখিয়াছে, অন্ততঃ তাহাদের আচরণে ও বাক্যে এইরূপই প্রতীয়মান হয়। এই অবস্থায় যাহারা পরমধীশক্তি-সম্পন্ন হইয়াও যুক্তির অকিঞ্চিৎকরতা ও শ্রুতির ঐকান্তিকতা বাক্যে ও আচরণে প্রচার করিয়াছেন, তাহাদের বক্তব্য একবার স্মরণ করিলে বর্ত্তমান যুগ প্রকৃত পন্থা অবলম্বন করিয়া চলিয়াছে কি না তাহা বুঝিবার সুযোগ হইবে মনে করিয়া এই প্রবন্ধে দুই চারিটী কথা বলিব।

মানুষ নাকি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।" মানুষের হাতেই যখন তুলিকা তখন দুর্দ্দম সিংহকেও নর-পদানত-রূপে অঙ্কিত করিবার তাহার নিরঙ্কুশ অধিকার অবশ্যই আছে। আর মানুষ বুদ্ধির বলে করিতেছেও একরূপ অসাধ্য সাধন। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে তাহার বুদ্ধির দৌরাত্ম্য, অসাধারণ প্রতিপত্তি। কুশাগ্রবুদ্ধির লীলাচাতুর্য্যে জগৎরহস্য ছিন্ন ভিন্ন করিয়া যুগে যুগে কত কত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মতবাদ প্রচার করিয়া মানুষ গর্ব্ব অনুভব করিয়াছে ও করিতেছে। কিন্তু এত বুদ্ধি, এত চাতুর্য্য সত্ত্বেও তাহার টাইটানিক্ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়, তাহার অভ্রংলেহী প্রাসাদ মুহূর্ত্তে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। এক যুগের দার্শনিক মতবাদ পরবর্ত্তী যুগে বালকের মনোরাজ্যরূপে গণ্য হয়। সহসা একদিন প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প উপস্থিত হইলে মানুষ আপনাকে নিতান্তই অসহায় ভাবিয়া হতাশ হইয়া পড়ে। ভাবরাজ্যে চিন্তা করিতে করিতে কিছুদূর অগ্রসর হইলে সমগ্র চিন্তার ধারা বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, সমস্ত বিচারশক্তি প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে, দার্শনিক তখন অজ্ঞেয়বাদের নৈরাশ্যে অভিভূত হইয়া পড়েন।*

মানববুদ্ধিকে যতটা প্রসারী বলিয়া মনে করি প্রকৃতপক্ষে তাহা ততটা নয়। তাহার একটা সীমা আছে। বুদ্ধির বোধশক্তি দৃশ্য জগতের অভ্যন্তরেই সীমাবদ্ধ। কল্পনার সাহায্যে মানুষ দৃশ্যের অন্তরালের একটা চিত্র অঙ্কিত করিতে পারে বটে, কিন্তু তাহার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের ক্ষমতা বুদ্ধির নাই। দৃশ্য হইতে অদৃশ্যে গতি অনুমান প্রমাণের কার্য্য হইলেও সেই অদৃশ্যের ভাসমান-রূপটীই দৃশ্যেরই অনুরূপ, সুতরাং সেই ভাসমান রূপটীই যে তাহার স্ব-রূপ তাহার নির্ণয় করিবার আর কোন পন্থাই মানুষের নাই। জগতের দৃশ্যত্বই যদি তাহার তত্ত্ব হইত তবে বুদ্ধির বলেই উহা গ্রাহ্য হওয়া সম্ভব হইত এবং সকল প্রশ্নেরও অবসান হইত। কিন্তু জগৎটীকে যেমন দেখিতেছি উহা তেমনই—এ কোন তত্ত্বই নয়। বস্তুর স্বরূপই উহার তত্ত্ব, দৃশ্যমান রূপ উহার একটা আবরণমাত্র। মানুষের বুদ্ধিই এই দৃশ্যমানরূপকে চরম বলিয়া স্বীকার করিতে না পারিয়া স্বরূপের

* যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।

অনুসন্ধান করে। ইহাই দার্শনিকতা, তত্ত্বজিজ্ঞাসা। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপে অতৃপ্তিই অতীন্দ্রিয়রূপের অনুসন্ধানের প্রেরণা জাগায়। কিন্তু দুঃখ এই যে মানুষের বুদ্ধিতে অতীন্দ্রিয়ের সমাচারলাভের আকুল আগ্রহ জাগিয়া উঠিলেও সেই বুদ্ধির সাহায্যে প্রকৃত সমাচার লাভের কোনই সম্ভাবনা নাই; বুদ্ধি আপন সংস্কারের গণ্ডী ছাড়িয়া পদমাত্রও অগ্রসর হইতে পারে না, আপন রঙে না রাঙাইয়া কোন কিছুই গ্রহণ করিতে পারে না। ফলে গৃহীত বস্তুর স্বরূপ সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ থাকিয়াই যায়।* এই কারণেই "নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্", এই কারণেই স্বাধীন-চিন্তা-পরায়ণ এক দার্শনিকের তথাকথিত স্বরূপানুভূতি অপরের তাদৃশ অনুভূতি হইতে পৃথক্, অনেক অনেক সময় পরস্পর একান্তই বিরুদ্ধ। জগতের দৃশ্যমান রূপটী যেমন ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তনশীল, বিভিন্ন লোকের নিকট বিভিন্নভাবে প্রতিভাত, স্বরূপ সম্বন্ধেও যদি বিভিন্ন দার্শনিকের সিদ্ধান্ত তদ্রূপ পরিবর্ত্তনশীল ও বিভিন্ন বলিয়া প্রচারিত হয়, তবে তাদৃশ স্বরূপ দৃশ্যমানরূপেরই নামান্তর হইয়া পড়ে না কি? অখণ্ড, অব্যয়, অদ্বৈত রূপকেই বস্তুর স্বরূপ বলার সার্থকতা আছে, তদ্বিপরীত রূপই যদি তাহার স্বরূপ হইত তবে তত্ত্বানুসন্ধিৎসা উদ্বুদ্ধই হইত না। কিন্তু এটী মানুষের সহজাত স্বাভাবিক বৃত্তি। ইহাকে অস্বীকার করিলে, মানুষের ধর্ম্ম, দর্শন, বিজ্ঞান সমস্তই অস্বীকার করিতে হয়। ইহারই প্রেরণায় এই সকলের সৃষ্টি। মানুষ যে বস্তুর স্বরূপ খোঁজে তাহার কারণ সে এই স্বরূপকে এক, অখণ্ডনীয়, স্থির বলিয়া বোধ করে, নহিলে তাহার অনুসন্ধান প্রবৃত্তিই জাগিত না। বহুর অন্তরালে একের অনুসন্ধানই তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা। তত্ত্ব বস্তুতন্ত্র, পুরুষবুদ্ধিতন্ত্র নহে, সুতরাং তাহার প্রকারভেদ অসম্ভব। অতএব তত্ত্বসম্বন্ধে যদি বিভিন্ন মত প্রচারিত হয় তবে তাহা তত্ত্ব বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্যই নয়,* এবং তাহাতে মানুষের অনুসন্ধিৎসার নিবৃত্তিও হয় না। সেই জন্যই বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও আজ পর্য্যন্তও জগৎরহস্যের সন্তোষজনক মীমাংসা হইল না।

মানুষের বুদ্ধিশক্তির এই দৈন্য, এই অব্যবস্থিতত্ব বুঝিতে পারিয়াই বৈদিক ঋষি গাহিলেন—"তদ্বৈ বিদিতাদবিদিতাদধি।" "নৈষা মতিস্তর্কেণাপনেয়া"। পাশ্চাত্যের মনীষী প্রচার করিলেন অজ্ঞেয়বাদ। শ্রেষ্ঠ দার্শনিক হতাশার নিশ্বাস মোচন করিয়া বলিলেন—'The thing in itself is unknown and unknowable'. বস্তুতঃ যুক্তির সাহায্যে মানুষ অতি সামান্যই জানিতে পারে। কয়টা 'কেন'র উত্তর মানুষ দিতে পারে?† ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যুক্তির প্রয়োজনীয়তাও খুব সামান্য। ফলতঃ প্রায় সর্ব্বত্রই 'মানিয়া নেওয়ার' উপর আমাদের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হয়। বায়ু না হইলে বাঁচিতে পারি না, কিন্তু কেন পারি না। এ প্রশ্নের উত্তরের উপর বাঁচা মরা নির্ভর করে না। এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়াও মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও বিশ্লেষণ করিয়া একটা মৌলিকপদার্থ আবিষ্কার করিতে পারেন, ঐ পদার্থটীর দ্বারা এমন এমন কাজ হইতে পারে—ইত্যাদি বহু কথাই বলিতে পারেন। কিন্তু ঐ পদার্থটী স্বয়ং যে কি তাহা মানববুদ্ধির অগোচর। একবিন্দু জল হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নামক দুইটী মৌলিক পদার্থের সংমিশ্রণে উৎপন্ন হয়, ইহার অধিক বলিবার ক্ষমতা মানুষের নাই।

* নিরূপয়িতুমারব্ধে নিখিলৈরপি পণ্ডিতৈঃ।
অজ্ঞানং পুরতস্তেষাং ভাতি কক্ষাসু কাসুচিৎ॥ ৬।১৪৩

* ন তু বস্তু এবং নৈবম্ অস্তি নাস্তি ইতি বা বিকল্প্যতে। বিকল্পনাস্তু পুরুষবুদ্ধ্যপেক্ষাঃ। ন বস্তু যাথাত্ম্যজ্ঞানং পুরুষবুদ্ধ্যপেক্ষম্, কিং তর্হি? বস্তুতন্ত্রমেব তৎ। ন হি স্থাণাবেকস্মিন্ স্থাণুর্বা পুরুষো বা অন্যো বেতি তত্ত্বজ্ঞানং ভবতি। শঙ্কর ভাষ্য, ১-১-২।

† ন জানামি কিমপ্যেতদিত্যন্তে শরণং তব। পঞ্চদশী।

কিন্তু এ শুধু শব্দের প্রতিশব্দই দেওয়া মাত্র, শব্দের অর্থ, অর্থাৎ জলবিন্দু স্বরূপতঃ কি তাহা বুঝাইবার ক্ষমতা মানুষের নাই। যে কোন বস্তু সম্বন্ধে "আরও জানিবার" আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি বুদ্ধি কখনও করিতে পারে না। "ততঃ কিম্ ততঃ কিম"—ইহাই বুদ্ধির স্বতঃস্ফূর্ত চিরন্তন প্রশ্ন। বস্তুতঃ এই অনুসন্ধিৎসার নিবৃত্তি হইলে বুদ্ধির বুদ্ধিত্বই লোপ পায়, অথচ প্রশ্নের সমাধান না হইলেও বুদ্ধির তৃপ্তি নাই।

বুদ্ধির বোধশক্তি যেমন নিতান্তই সীমাবদ্ধ, উহার বৈচিত্র্যও তেমনি অনন্ত, অব্যবস্থিত, প্রতি ব্যক্তিতে বিভিন্ন। দুইজন মনুষ্য স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়া কদাপি একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে না। আবার দেখা যায় একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি অতি যত্নে বিচারবলে একটী সিদ্ধান্ত স্থাপন করিলেন, অপর এক বুদ্ধিমান ব্যক্তি অনায়াসে তাহা খণ্ডন করিলেন, আবার তাঁহার অপেক্ষা বুদ্ধিমান তৃতীয় ব্যক্তি সেই খণ্ডনেরও খণ্ডন করিয়া এক অভিনব মত প্রচার করিলেন।*

মানব বুদ্ধির এই দৈন্য ও অব্যবস্থিতত্ব অনুধাবন করিয়া শ্রুতিবাদী তত্ত্বনির্দ্ধারণে প্রধানভাবে শ্রুতির উপরই নির্ভর করেন। ইঁহাদের বক্তব্য এই যে ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ে কি প্রত্যক্ষ, কি অনুমান কোন লৌকিক প্রমাণেরই স্বাধীন প্রসার নাই। আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করি অনুমানবলে সেইরূপ একটা কিছু কিংবা সেইরূপ দুটা পাঁচটা জুড়িয়া একটা কিছু কল্পনা করিতে পারি। আর প্রত্যক্ষ অনুমানাদি লৌকিক প্রমাণোদ্ভূত জ্ঞান ব্যাবহারিক জগতেই যথার্থ। প্রত্যক্ষাদি লৌকিক প্রমাণের স্বতঃপ্রামাণ্যও লৌকিক। সুতরাং এক প্রমাণলব্ধ জ্ঞানের সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে প্রমাণান্তরের আবশ্যকতা না থাকিলেও অতীন্দ্রিয়বিষয়ক অনুমানাদির সত্যাসত্য নির্দ্ধারণে লৌকিক অনুমানাদি কখনই পর্য্যাপ্ত হইতে পারে না। অপর, বস্তুর স্বরূপ চিরকাল একই রূপ, সুতরাং মানুষের স্বাধীন বিচারলব্ধ জ্ঞান বিভিন্ন লোকের বিভিন্নরূপ বলিয়া তাহা নিঃসংশয়ে বস্তুর স্বরূপ প্রকাশে সমর্থও হয় না। অতএব যে স্থলে বুদ্ধি পরাহত, শ্রুতিই সেইস্থলে একমাত্র আলোকবর্ত্তি।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে শ্রুতির অভ্রান্ততার প্রমাণ কি? 'শ্রুতি কোন পুরুষবিশেষ দ্বারা রচিত নয়' কিংবা 'শ্রুতি ঈশ্বরের বাণী, অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমান' ইত্যাদি কথা বিশ্বাসের ব্যাপার—আধুনিক যুগে অপ্রয়োজ্য। শ্রুতিবাদীরা বলেন, শ্রুতির বিশেষত্বই এই যে অজ্ঞাত বস্তু সম্বন্ধে কিছু বিজ্ঞাপন করা, কিংবা জ্ঞাতবস্তু সম্বন্ধে কিছু নূতন তথ্য প্রকাশ করা, অর্থাৎ যাহা অন্য কোন প্রকারে জানিবার উপায় নাই তাহা বিজ্ঞাপন করে বলিয়াই শ্রুতির শ্রুতিত্ব, প্রামাণ্য ও বিশেষত্ব। তাদৃশ শ্রুতির অভ্রান্ততায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলে সমস্ত গোল মিটিয়া যায়। কিন্তু বিশ্বাস করিতে বলিলেই আর বিশ্বাস করা যায় না। সুতরাং অবস্থাটা দাঁড়ায় এই যে বুদ্ধিদ্বারা তত্ত্বের স্বরূপ উপলব্ধি করিবার অসম্ভবতা এবং শ্রুত্যুক্ত স্বরূপেও বিশ্বাস স্থাপনের অপ্রবৃত্তি। এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া তত্ত্বার্থী যে তিমিরে সেই তিমিরেই ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হয়। এমতাবস্থায় শ্রুতিবাদিরা বলেন—হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। বেশ ত শ্রুতির অভ্রান্ততায় বিশ্বাস যদি না হয়, তবে অন্ততঃ শ্রুতি সিদ্ধান্তকে আপাততঃ মানিয়া লইয়া তন্নির্দ্দিষ্ট ক্রমে অগ্রসর হইয়া দেখিতে আপত্তি কি? শ্রুতি বলেন, দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য মন্তব্য নিদিধ্যাসিতব্য। উদ্দেশ্য প্রত্যক্ষ দর্শন, সাক্ষাৎকার। ইহারই উপায় স্বরূপ শ্রুতি একটী ক্রমের নির্দ্দেশ করিলেন, শ্রোতব্য মন্তব্য

* যত্নেনানুমিতোঽপ্যর্থঃ কুশলৈরনুমাতৃভিঃ।
অভিযুক্ততরৈরন্যৈরন্যথৈবোপপাদ্যতে।

নিদিধ্যাসিতব্য। বুদ্ধি যখন পরাহত তখন শ্রুতির বক্তব্যটা একবার শুনিয়া লইতে হইবে। যুক্তি-সর্ব্বস্ব তত্ত্বার্থী যুক্তিরপ্রয়োগে শ্রুতিসিদ্ধান্তকেও যাচাই করিয়া দেখিতে না পারিলে সোয়াস্তিবোধ করে না। সুতরাং তাহার পক্ষে যুক্তির শরণাগতি অনিবার্য্য। যুক্তি প্রয়োগে শ্রুতিসিদ্ধান্তের সম্ভাব্যতা নির্ণীত হইলেও জিজ্ঞাসার পূর্ণ নিবৃত্তি হয় না, কারণ বিপরীত সংস্কার অতীব দৃঢ়মূল এবং পারি-পার্শ্বিক অবস্থাও সন্দিগ্ধ করিবার পক্ষে যথেষ্ট অনুকূল। সুতরাং পুনঃ পুনঃ অনুশীলন দ্বারা যুক্তিসহ শ্রুতির তথ্যকে আত্মজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। তখন বাহ্য অন্তের কোন বাধাই সাধককে বিচলিত করিতে পারে না। তখনই হয় প্রকৃত সাক্ষাৎকার। প্রশ্ন হইতে পারে যে তখনকার অনুভূতিই যে যথার্থ তত্ত্বোপলব্ধি তাহার প্রমাণ কি? অবশ্য সাক্ষাৎকারের পূর্ব্বে এরূপ প্রশ্ন সঙ্গত ও স্বাভাবিক হইলেও প্রকৃত সাক্ষাৎকারের পরে ঈদৃশ প্রশ্নই মনে উদিত হয় না। অপরে উত্থাপন করিলেও সাধক তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দেন। তাহার তুষ্টির বিঘ্ন তখন কিছুতেই উৎপন্ন হয় না। লৌকিক ব্যাপারেও এইরূপই হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষদর্শীর উক্তি হয় এইরূপ—আমি নিজে স্বয়ং দেখিয়া আসিলাম, আর তুমি অন্যরূপ বলিলে মানিব কেন? সাক্ষাৎকার স্বশক্তিতে শক্তিমান, জিজ্ঞাসার নিবৃত্তিতে কৃতার্থ।

এস্থলে শঙ্কা হইতে পারে যে শ্রুতিসিদ্ধান্ত আদৌ যুক্তিবলে প্রমাণিত হইতে পারে কি না? যদি বল পারে (সাংখ্য প্রভৃতির অভিপ্রায় তাদৃশই মনে হয়), তবে শ্রুতির শ্রুতিত্বই লোপ পায়; কারণ, যুক্তিলব্ধ সিদ্ধান্ত আর শ্রুতির সিদ্ধান্ত উভয়ই যদি অভিন্ন হয় তবে শ্রুতিকে একটী বিশিষ্ট ও পৃথক্ প্রমাণরূপে স্বীকার করিবার কোন সার্থকতাই থাকে না, যুক্তিকেই চরম প্রমাণরূপে স্বীকার করা যায়। কিন্তু যুক্তি চরম সিদ্ধান্ত লাভের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে বলিয়াই শ্রুতির আদর। এতদুত্তরে শ্রুতিসর্ব্বস্ব আচার্য্যগণের বক্তব্য আলো-চনা করিয়া দেখা যাক। ইঁহাদের মধ্যেও দুই রকমের মত দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন, শ্রুতি শ্রুতি বলিয়াই প্রমাণ, শ্রুতিসিদ্ধান্তের যুক্তিযুক্ততা বিচার করিবার কোন প্রয়োজন নাই। শ্রুতি বিরুদ্ধ কথা বলিলেও তাহাই গ্রাহ্য। (ইঁহাদের মতে মননের বিশেষ সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয় না)। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, শ্রুতি যখন বলেন যে ব্রহ্ম নির্ব্বিকারও বটেন, আবার পরিবর্ত্তিতও হন, তখন তাহা অসম্ভব বোধ হইলেও উহাকেই চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। পক্ষান্তরে শঙ্কর প্রমুখ বৈদান্তিক বলেন, যে শ্রুতির সিদ্ধান্তই যে চরম সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু মানুষ যতদিন মানুষ ততদিন সে আত্মশক্তিতে অশেষ শ্রদ্ধাশীল। তাহার স্বাভাবিক যুক্তিপ্রিয়তা তাহাকে নির্ব্বিচারে বিষয় গ্রহণে পদে পদে বাধা দেয়। এই স্বাভাবিক বৃত্তির চরিতার্থতা ব্যতীত সে কখনও তৃপ্ত হইতে পারে না। ফলে একভাবে দেখিতে গেলে শ্রুতির প্রতি তাহার যতই শ্রদ্ধা থাকুক না কেন তাহার নিকট যুক্তিই চরম শরণ। সুতরাং তাহার পক্ষে মনন বা বিচার অপরিহার্য্য। শ্রুতিই মননের আবশ্যকতা ঘোষণা করেন। অতএব বিচার বলে যদি শ্রুতির আপাত বিরুদ্ধ উক্তির একটা সামঞ্জস্য করা যায় তবে তাহাতে আপত্তি কি? ব্রহ্মসূত্রাদি দার্শনিক গ্রন্থ এই উদ্দেশ্যেই রচিত। তত্ত্বোপলব্ধি বিষয়ে যুক্তির সহকারিতা অত্যাবশ্যক বলিয়াই দর্শনশাস্ত্রের প্রবৃত্তি। তবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে মানুষের বিচারশক্তি সর্ব্বগ্রাহী নয় এবং এই বিচার শ্রুতির সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যেই প্রয়োগ করিতে হইবে, স্বাধীনভাবে কোন মতবাদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নহে। এমন কি স্বাধীনভাবে বিচার করিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া পশ্চাৎ শ্রুতির বচনে তাহার সমর্থন

করাও ইঁহারা অনুমোদন করেন না। ইঁহাদের মতে প্রথমে শ্রুতি, পরে যুক্তি। সুতরাং স্বাধীন বিচার প্রয়োগে শ্রুতির অংশবিশেষ ত্যাজ্যরূপে প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস করাও ইঁহাদের মতে ধৃষ্টতা মাত্র। শ্রুতি বলিয়াছে বলিয়াই গ্রাহ্য, ইহা যদি কুসংস্কার হয় তবে আপাততঃ অবিশ্বাস্য বলিয়াই ত্যাজ্য ঈদৃশ বুদ্ধিও সুসংস্কার নয়। আমার বুদ্ধির অগম্য বলিয়াই অসত্য—ঈদৃশ উক্তি ধৃষ্টতা মাত্র।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে শ্রুতিবাদী শ্রুতিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিলেও যুক্তিকে একেবারে পরিত্যাগ করেন না। ইঁহারা নির্ব্বিচারে শ্রুতিকে মানিয়া লইতে বলেন না। কারণ সেরূপ মানিয়া লইলে আপাততঃ কাজ চলিয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হয় না। আর প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ব্যতীত কেবল মানিয়া লওয়ার সার্থকতাও কিছু নাই। শ্রুতিবাদীদের এইমাত্র বক্তব্য যে মানুষের বুদ্ধিশক্তি পরিমিত সুতরাং শ্রুতির প্রতিকূল কিংবা নিরপেক্ষ স্বাধীন যুক্তি কোন কালেই ইষ্টসিদ্ধির সহায় নয়, আর শ্রুতির অনুকূল যুক্তি সর্ব্বদাই উপাদেয়। বর্ত্তমান যুগের মানুষ আপন বুদ্ধির উপর যতটা আস্থা স্থাপন করিয়া চলিয়াছে তাহা ততটার যোগ্য কিনা ভাবিবা দেখিবার বিষয়। এবং সেইজন্যই বর্ত্তমান প্রবন্ধে শ্রুতিবাদীর বক্তব্যের কিঞ্চিৎ আভাস দিলাম।

অদ্বৈত ও সন্ন্যাস

সম্পাদক

অদ্বৈত জ্ঞানের বিকাশ না হইলে সন্ন্যাস হয় না এবং সন্ন্যাস না হইলে অদ্বৈত-তত্ত্বের স্ফুরণ হয় না। অদ্বৈত ধর্ম্মজ্ঞানের সর্ব্বোচ্চ উপলব্ধি, সন্ন্যাস এই উপলব্ধির পরিণাম। অদ্বৈত সন্ন্যাসে এবং সন্ন্যাস অদ্বৈতে পর্য্যবসিত।

"তাহাকে (জগৎকে) সৃষ্টি করিয়া তাহার ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া আছেন," "যাঁহা হইতে এই ভূতগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং যাঁহাদ্বারা জীবিত আছে," "সকল ভূতের মধ্যে গূঢ়ভাবে অবস্থিত একই দেব সর্ব্বব্যাপী ও সকল ভূতের অন্তরাত্মা," "নিশ্চয়ই এই সমস্ত (নামরূপের জগৎ) ব্রহ্ম," "তাঁহার আলোকে সকল আলোকিত," "এই সকল (বিশ্ব) ব্রহ্মরূপ আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত," "সৃষ্টি নামক ব্রহ্মরূপে সচ্চিদানন্দ বিদ্যমান," "সচ্চিদানন্দ অদ্বয় ব্রহ্ম," "অদ্বৈত পরমার্থ—দ্বৈত তাহার ভেদ বা কার্য্যমাত্র" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে মুখ্যতঃ একমাত্র অদ্বৈত ব্রহ্মের নিত্যত্ব এবং গৌণভাবে নামরূপ দ্বৈত জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

আবরণ ও বিক্ষেপ নামক শক্তিদ্বয়স্বরূপ মায়া অদ্বয় ব্রহ্মে অবস্থিত থাকিয়া তাঁহার অখণ্ডত্বকে আচ্ছাদন করিয়া জীব ও জগৎ সৃজন করিয়াছে। আপন অজ্ঞানাবৃত রজ্জুতে সর্পের আবির্ভাবের ন্যায় আবরণশক্তিদ্বারা আবৃত আত্মায় ভোক্তৃত্ব কর্ত্তৃত্ব প্রভৃতি সম্ভব হইয়াছে। রজ্জুবিষয়ক অজ্ঞান যেমন নিজ শক্তিদ্বারা আবৃত রজ্জুতে সর্প উৎপাদন করে, তদ্রূপ অজ্ঞান আপনার দ্বারা আবৃত আত্মাতে বিক্ষেপ শক্তিদ্বারা প্রপঞ্চ উৎপাদন করিয়াছে। যেমন উর্ণনাভ তন্তুরূপকার্য্যের প্রতি স্বয়ংপ্রধানরূপে

নিমিত্তকারণ এবং নিজের শরীরপ্রধানরূপে উপাদানকারণ, তেমন এই শক্তিদ্বয়বিশিষ্ট অজ্ঞানোপহিত যে চৈতন্য তাহা চৈতন্যপ্রধানরূপে নিমিত্ত কারণ এবং নিজ মায়ারূপ উপাধিপ্রধানরূপে উপাদান কারণ। ব্রহ্মরূপে তিনি কারণ, জীবজগৎরূপে তিনি কার্য্য। সর্পের মুখে বিষ থাকিলেও যেমন সর্প উহার দ্বারা আক্রান্ত হয় না, ব্রহ্মে মায়া থাকিলেও তেমন ব্রহ্ম উহা দ্বারা অভিভূত হন না। যিনি বস্তুতঃ অবিদ্যাদ্বারা অবচ্ছিন্ন না হইয়াও ব্যষ্টি অজ্ঞানোপহিত চৈতন্যরূপে অল্পজ্ঞ জীব এবং সমষ্টি অজ্ঞানোপহিত চৈতন্যরূপে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর, তিনিই সমস্ত প্রপঞ্চের অধিষ্ঠান। সমষ্টি হইতে ব্যষ্টি পারমার্থিক দৃষ্টিতে ভিন্ন নহে, এজন্য "জীবো ব্রহ্মৈব না পরঃ"—'জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু নহে।'

অনির্ব্বচনীয়া মায়ার এই কার্য্যদ্বয় জীবের ব্রহ্মদশায় থাকে না, কেবলমাত্র ব্যবহারকালেই ইহারা দৃষ্ট হয়। এই কারণে এতদুভয় ব্যবহারিক। অনাদিকাল হইতে আরম্ভ করিয়া বিদেহ-কৈবল্য প্রাপ্তির (ভাবী ও বর্ত্তমান উভয়প্রকার দেহনিবৃত্তির) পূর্ব্বপর্য্যন্ত এই জীবজগৎ ব্যবহারকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে বলিয়া ইহাকে ব্যবহারিক বলে। কৈবল্য-দশায় এই ব্যবহারিক জীব, জগৎ ও ইহাদের প্রতীতির আত্যন্তিক নাশ হয়। ব্রহ্মবিদের উপদেশে স্বভাবসিদ্ধ ব্রহ্মাত্মজ্ঞানলাভ হইলে প্রাতিভাসিক (স্বপ্নদৃষ্ট) জীব ও জগতের ন্যায় ব্যবহারিক (জাগ্রত কালীন) জীব ও জগৎ মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হয়। এইজন্য নিত্যানিত্যবিবেকসম্পন্ন সন্ন্যাসীর দৃষ্টিতে "মায়ামাত্রমিদং দ্বৈতমদ্বৈতং পরমার্থতঃ" (মাঃ উঃ গৌড়পাদীয় কারিকা, ১।১৭)—'দ্বৈত মায়ামাত্র, পরমার্থতঃ অদ্বৈতই সত্য।' পুনশ্চ—

> "স্বপ্নমায়ে যথা দৃষ্টে গন্ধর্ব্বনগরং যথা।
> তথা বিশ্বমিদং দৃষ্টং বেদান্তেষু বিচক্ষণৈঃ॥"
>
> • (মাঃ উঃ গৌড়পাদীয়কারিকা, ২।৩১)।

—'যেমন স্বপ্নকালে ও মায়াবলে দৃষ্ট গন্ধর্ব্বনগর অলীক ও বিনশ্বর, সেইরূপ বেদান্তবিচক্ষণ ব্যক্তিগণ এই (নামরূপের) জগৎকে মায়াময় ও অনিত্য বলিয়া জানেন।' "ব্রহ্ম এব নিত্যং বস্তু, ততঃ অন্যৎ অখিলম্ অনিত্যম্" (বেদান্তসার, ১৬)—'ব্রহ্মই নিত্য বস্তু, তদ্ভিন্ন সকল বস্তুই অনিত্য।' জ্ঞানীর দৃষ্টিতে লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহারসকল মায়াময়—"বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং" (ছাঃ উঃ, ৬।১।৪)। মুমুক্ষু ব্যক্তি তত্ত্বতঃ এই জ্ঞানে অধিষ্ঠিত হইলে

> "যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি
> নামরূপে বিহায়।
> তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং
> পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥"
>
> (মুঃ উঃ, ৩।২।৮)।

—'যেমন প্রবহমান নদীসমূহ (নিজ নিজ) নাম ও রূপ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে মিশিয়া যায়, সেইরূপ বিদ্বান পুরুষও নামরূপ বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর দিব্যপুরুষকে প্রাপ্ত হন, এবং "ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ" (শ্বেঃ উঃ, ১।১০)—'বিশ্বমায়ার নিবৃত্তি হয়।' এইরূপে অদ্বয় ব্রহ্মকে জানিয়া "ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" (মুঃ উঃ, ৩।২।৯)—ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া বলেন—

> "জ্ঞানমহং জ্ঞেয়মহং জ্ঞাতাহং জ্ঞানসাধনগণোঽহম্।
> জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়বিনাকৃতমস্তিত্বমাত্রমেবাহম্॥ ১২৬।
> বহুভিঃ কিমেভিরুক্তৈরহমেবেদং চরাচরং বিশ্বম্।
> শীকরফেনতরঙ্গাঃ সিন্ধোরপরাণি ন খলু বস্তূনি॥
> ১৪৫। (স্বাত্মনিরূপণম্)।

—'আমি জ্ঞান, আমি জ্ঞেয়, আমি জ্ঞাতা এবং আমি (প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি, শাব্দ প্রভৃতি যাবতীয়) জ্ঞানলাভের সাধনগণ অর্থাৎ করণ বা উপায়সমূহ। আমিই জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান হইতে অতিরিক্ত কেবলমাত্র অস্তিত্বস্বরূপ অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ সত্তামাত্র বা সৎস্বরূপ। বহু কথায় কাজ কি?

আমিই এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ। জলকণা, ফেন ও তরঙ্গরাশি সমুদ্র হইতে পৃথক বস্তু নহে, অর্থাৎ সমুদ্রে জলকণা, ফেন ও তরঙ্গ দেখিলে মনে হয় যেন উহারা স্বতন্ত্র এক একটী বস্তু, কিন্তু উহারা যেমন সমুদ্রস্বরূপই, সেইরূপ জগতের সকল পদার্থই আমার স্বরূপ—তাহারা আমা হইতে অতিরিক্ত নহে, আমাকে বাদ দিলে সকলই আকাশকুসুমকল্প হইয়া পড়ে।'

এইরূপ আবরণ ও বিক্ষেপরহিত মায়াবর্জ্জিত সর্ব্বনামরূপের অধিষ্ঠান "যৎপূর্ণানন্দৈকবোধস্তদ্ব্রহ্মৈবাহমস্মীতি"—'যিনি পূর্ণ, আনন্দ, এক এবং বোধস্বরূপ, সেই ব্রহ্মই আমি,' এই অনুভূতির নাম তত্ত্বজ্ঞান। সর্ব্ববাসনা বিনির্ম্মুক্ত না হইলে এই তত্ত্বজ্ঞান হইতে পারে না। শাস্ত্র বলেন, বাসনাক্ষয় ও তত্ত্বজ্ঞান এই দুইটী পরস্পরের কারণ।

"যাবন্ন বাসনানাশস্তাবত্তত্ত্বাগমঃ কুতঃ।
যাবন্ন তত্ত্বসংপ্রাপ্তির্ন তাবদ্ বাসনাক্ষয়ঃ॥"
(উপশম প্রঃ, ১৩।৯২)।

—'যে পর্য্যন্ত না বাসনাক্ষয় হয়, সে পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞান হইতে পারে না এবং যে পর্য্যন্ত না তত্ত্ববোধ জন্মে সে পর্য্যন্ত বাসনাক্ষয় হয় না।' বাসনাক্ষয় ভিন্ন তত্ত্বজ্ঞানের অন্য কোন পথ নাই। শাস্ত্রে বলেন, "প্রবৃত্তিরেব সংসারো নিবৃত্তির্ম্মুক্তিরিষ্যতে" (সর্ব্ববেদান্ত-সিদ্ধান্তসারসংগ্রহঃ, ৫০১) —'প্রবৃত্তিই সংসার এবং নিবৃত্তিই মুক্তি।' ভোগাদি মলিন বাসনা থাকা পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞানলাভের পক্ষে অপরিহার্য্য নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ইহামুত্রফলভোগবিরাগ, শমাদি ষট্ সম্পত্তি এবং মুমুক্ষুত্বরূপ অধিকার অর্জ্জন কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। শুদ্ধ বাসনার ফলস্বরূপ মানুষের তত্ত্বজ্ঞান লাভের এই অধিকার জন্মিয়া থাকে। স্বপ্নপ্রপঞ্চ যেমন মায়া দ্বারা আমাতে প্রকটিত হয়, সেইরূপ এই জাগ্রতপ্রপঞ্চও তদপেক্ষা অধিক বলবতী মায়া দ্বারা আমাতে প্রকটিত হইতেছে, বস্তুতঃ 'আমি মায়াবর্জ্জিত নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত ব্রহ্মস্বরূপ' এই তত্ত্বজ্ঞানে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত না হইলে বাসনাক্ষয় হইতে পারে না। বাসনারূপ দ্বৈতভাব থাকিতে অদ্বৈত ব্রহ্মাকারকারিত হইয়া 'আমি ব্রহ্ম' উপলব্ধিও সম্ভবপর নহে। কারণ, যেখানে দ্বৈত সেখানে অদ্বৈত তত্ত্বজ্ঞানের স্থান নাই। সকল বৃত্তি এক অদ্বৈত বৃত্তিতে পর্য্যবসিত হইয়া "আমি ব্রহ্ম" রূপ তত্ত্বজ্ঞানের আবির্ভাব হয়। এই হেতু বাসনাদি সকল বৃত্তির বিলয় তত্ত্বজ্ঞানের কারণ। "বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্তং নির্ব্বিষয়ং স্মৃতম্" (ব্রহ্মবিন্দুপনিষদ্, ১।২) —'বিষয়াসক্তিই বন্ধন—নির্ব্বিষয়তাই মুক্তি।' পক্ষান্তরে আকাশ-কুসুম লাভ করিতে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির যেমন প্রয়াস দেখা যায় না, তত্ত্বজ্ঞান হইলে তেমন মিথ্যাভূত ভোগাদি বাসনা সম্বন্ধে আর বৃত্তির উদয় হয় না, কারণ ব্রহ্মবস্তু লাভের পর বাসনার বিষয়ীভূত বস্তুর আর প্রয়োজন থাকে না। তত্ত্বজ্ঞানলাভ করিলে বাসনা ইন্ধনহীন অগ্নির ন্যায় আপনা আপনি নির্ব্বাপিত হইয়া যায়।

সন্ন্যাস শব্দের অর্থ এই তত্ত্বজ্ঞান লাভার্থ বাসনাশূন্য হইয়া সর্ব্ববিধ কর্ম্মত্যাগ। সন্ন্যাসের সংজ্ঞা সম্বন্ধে গীতামুখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন —"কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ" (১৮।২)—'তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ কাম্য (বাসনামূলক) কর্ম্মের ত্যাগকে সন্ন্যাস বলিয়া জানেন।' অন্যত্র—

"সাধনত্বেন দৃষ্টানাং সর্ব্বেষামপি কর্ম্মণাম্।
বিধিনা যঃ পরিত্যাগঃ স সন্ন্যাসঃ সতাং মতিঃ॥"
(সর্ব্ববেদান্ত সিদ্ধান্তসারসংগ্রহঃ, ১৫২)।

—'(স্বর্গাদির) সাধন বলিয়া যে সকল কর্ম্ম শাস্ত্রবিহিত, সেই সকল নিত্য, নৈমিত্তিক এবং কাম্য কর্ম্মের শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে যে পরিত্যাগ তাহাই সন্ন্যাস—এই প্রকার সাধুগণের অভিমত।'

ব্রহ্মের কোন কর্ম্ম সাধ্যত্ব নাই অর্থাৎ ব্রহ্ম

কোন ক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন হন না। কারণ, যাহা কর্ম্মসাধ্য তাহাই অনিত্য। কর্ম্ম দ্বারা অর্জ্জিত বর্ত্তমান দেহাদি ভোগ এবং পুণ্য কর্ম্মদ্বারা অর্জ্জিত পারলৌকিক ভোগ উভয়ই বিনাশী। যাহার উৎপত্তি আছে, তাহার বিনাশও অবশ্যম্ভাবী। এইজন্য হিন্দুশাস্ত্রসমূহ সমস্বরে তত্ত্বজ্ঞানলাভেচ্ছু মোক্ষার্থীর পক্ষে কর্ম্মত্যাগের বিধান দিয়াছেন। উপনিষদ্ বলেন, "ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ" (কৈঃ উঃ, ১।২) —'ত্যাগ ভিন্ন কর্ম্ম, প্রজা বা ধনদ্বারা অমৃতত্ব লাভ করা যায় না।' ত্যাগ শব্দের অর্থ এখানে বাসনা ত্যাগ বা সন্ন্যাস। সুতরাং অদ্বৈত তত্ত্বজ্ঞানরূপ অমৃতত্ব লাভার্থীর পক্ষে বাসনাত্যাগ বা সন্ন্যাস অপরিহার্য্য। সাধক কবীর দাস বলিয়াছেন — "কাম বলবান, তঁহ প্রেম কঁহ পাইয়ে, প্রেম জহ হোয় তঁহ কাম নাহী"—'কাম যেখানে বলবান্ সেখানে প্রেম কোথায়? প্রেম যেখানে আছে সেখানে কাম নাই।' সুতরাং "অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ" শাস্ত্র ও মুক্তি বিরোধী কবিকল্পনা মাত্র। সন্ন্যাস গ্রহণ বা বাসনা ত্যাগ ভিন্ন মুক্তির স্বাদ লাভ করা অসম্ভব। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে" (গীতা, ১৮।১১)—'যিনি কর্ম্মফলত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই যথার্থ ত্যাগী বা সন্ন্যাসী।' মন কর্ম্মত্যাগের যোগ্যতা অর্জ্জন না করা পর্য্যন্ত বলপূর্ব্বক কর্ম্মত্যাগ কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। এ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া শ্রদ্ধেয় স্বামী সারদানন্দ মহারাজ লিখিয়াছেন, "দেখনা—পূজা করিতে বসিয়া আপনাকে জগদম্বার সহিত অভেদজ্ঞান করিতে বলিবামাত্র মন তাহাই করিতে লাগিল; জগদম্বার পাদপদ্মে বিল্বজবা দিতে যাইলেও ঠাকুরের হাত তখন কে যেন ঘুরাইয়া নিজ মস্তকের দিকেই টানিয়া লইয়া চলিল। আবার দেখ— সন্ন্যাস-দীক্ষা গ্রহণ করিবামাত্র মন সর্ব্বভূতে এক অদ্বৈত ব্রহ্ম দর্শন করিতে থাকিল। অভ্যাসবশতঃ ঠাকুর ত্রৈকালে পিতৃতর্পণ করিতে যাইলেও হাত আড়ষ্ট হইয়া গেল, অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া হাতে জল তুলিতেই পারিলেন না! অগত্যা বুঝিলেন, সন্ন্যাস গ্রহণে তাঁহার কর্ম্ম উঠিয়া গিয়াছে" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব—উত্তরার্দ্ধ, ১৮৮ পৃঃ)। "জ্ঞানং সন্ন্যাস লক্ষণম্"—'জ্ঞানই সন্ন্যাসের লক্ষণ।' "জ্ঞানদণ্ডোধৃতো যেন একদণ্ডী স উচ্যতে" (পরমহংসোপনিষৎ)—'জ্ঞানদণ্ড যিনি ধারণ করিয়াছেন তিনিই একদণ্ডী বা সন্ন্যাসী।' উভয় স্থলে জ্ঞান শব্দের অর্থ অদ্বৈত তত্ত্বজ্ঞান।

"যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং" (বৃঃ উঃ, ২।৪।৩)—'যাহা দ্বারা আমার অমৃত হওয়া সম্ভবে না তাহা লইয়া আমি কি করিব?' এইরূপ বিবিদিষাবশতঃ সর্ব্ববাসনা ত্যাগের নাম সন্ন্যাস। বাসনাত্যাগরূপ রঙ্গে মনকে না রঙ্গাইয়া কেবল কাপড় রঙ্গাইলে সন্ন্যাস হয় না। মহাত্মা কবীর বলিয়াছেন—

"মন ন রঙ্গায়ে,
রঙ্গায়ে যোগী কাপড়া।
আসন মারি মন্দির মেঁ বৈঠে
ব্রহ্ম ছাড়ি পূজন লগে পথরা॥

* * *

মথবা মূড়ায় যোগী,
কাপড়া রঙ্গৌলৈ।
গীতা বাঁচকে,
হোই গৈলৈ লবরা॥
কহহিঁ কবীর,
শুনো ভাই সাধো
জম দরজরা
বান্ধল জৈবে পকড়॥"

—'ভগবৎ প্রেমের রঙ্গে মন না রঙ্গাইয়া যোগী তাঁহার কাপড় রঙ্গাইয়াছেন। দিব্য মন্দিরের

মধ্যে আসন করিয়া বসিয়া ব্রহ্মকে ত্যাগ করিয়া পাষাণ পূজা করিতেছেন। * * * মাথা মুড়াইয়া কাপড় রঙ্গাইয়া গীতা পড়িয়া যোগী মিথ্যা বাচাল হইয়া গিয়াছেন। কবীর বলেন, তোমাকে বদ্ধ হইয়া মৃত্যুর দ্বারে যাইতে হইবে।' উপনিষদ্ বলেন, "কাষ্ঠদণ্ডো ধৃতো যেন সর্ব্বাশী জ্ঞানবর্জিতঃ। ভিক্ষামাত্রেণ যো জীবেৎ স পাপী যতিবৃত্তিহা" (পরমহংসোপনিষৎ)—'যিনি জ্ঞান-বর্জ্জিত কাষ্ঠদণ্ডধারী এবং ভিক্ষাজীবী তিনি যতিবৃত্তি হননকারী।' তত্ত্বজ্ঞান ও বাসনাত্যাগ ভিন্ন সন্ন্যাসগ্রহণ যথার্থই নিন্দনীয়। শ্রেয়কামী ব্যক্তিগণ সর্ব্বপ্রকার এষণা অর্থাৎ পুত্রকামনা, বিত্তকামনা ও লোককামনা (বৃঃ উঃ, ৩।৫।১) প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাচর্য্যা বা সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া থাকেন। সন্ন্যাসী বিরজা হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া "প্রাণাপানব্যানোদান-সমানা মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা" (নারায়ণোপনিষৎ, ৬৫) ইত্যাদি মন্ত্রে পঞ্চবায়ু, পঞ্চেন্দ্রিয় প্রভৃতি শুদ্ধ করিয়া "স্বাহা" মন্ত্রে স্বর্গলোক, পিতৃলোক, ধর্ম্মাধর্ম্ম, পুণ্যাপাপ, কামনা-বাসনা, ক্ষুৎপিপাসা প্রভৃতি বিসর্জ্জন দিয়া প্রেমমন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যান, এবং মধুমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক বলেন, "ব্রহ্মমেতু মাম্। মধুমেতু মাম্। ব্রহ্মমেব মধুমেতু মাম্।" অদ্বৈত জ্ঞানে অধিষ্ঠিত হইয়া সন্ন্যাসী "অন্তর্ব্বহিশ্চ তৎসর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ" (নারায়ণোপনিষদ্)—'অন্তরে এবং বাহিরে সর্ব্বত্র নারায়ণের অবস্থিতি সন্দর্শন করেন।' সন্ন্যাসীর নিকট "একং রূপং সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ" (বৃহজ্জাবালোপনিষদ্, ২।১)—'সকল নামরূপ ভস্মে পরিণত, সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মস্বরূপ এক ব্রহ্মমাত্র বর্ত্তমান।' এইজন্য তিনি সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি লেপন করেন। 'দুই'কে 'এক'-এ পরিণত করাতে যেমন প্রেমের চরম স্বার্থকতা, জগতের বহুত্বকে 'এক'-এর অভিব্যক্তিরূপে সন্দর্শন করাই তেমন সন্ন্যাসের আদর্শ। সুতরাং সন্ন্যাস বা তত্ত্বজ্ঞানে প্রেমের লক্ষণ পূর্ণ প্রকট। আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমগ্র জীবজগৎ সন্ন্যাসীর নিকট আপনার সঙ্গে অভেদ-প্রেম-সম্বন্ধে সম্বন্ধান্বিত; কারণ, তাঁহার মানসাক্ষে "একে একে দুই না হইয়া এক।" "যাহা যাহা নেত্র পড়ে তাহা তাহা কৃষ্ণ স্ফুরে," "স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্তি, সর্ব্বত্র হয় তাঁর ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি।" সন্ন্যাসী সকল মত পথ ও নামরূপের বহির্দ্দেশে অবস্থিত। তাঁহার ধর্ম্ম দেশকাল পাত্রদ্বারা সীমাবদ্ধ নহে, তাঁহার ধর্ম্ম বিশ্বজনীন। তিনি অব্যক্তলিঙ্গ (আশ্রমবিশেষের চিহ্নাদিশূন্য) এবং অব্যক্তাচার (যাঁহার আচারের স্থিরতা নাই)। "ন ধর্ম্মো ন চার্থো ন কামো ন মোক্ষ"—'তাঁহার ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ কিছুই নাই।' সকল প্রকার সঙ্ঘবদ্ধ ধর্ম্ম বা সমাজবদ্ধ ধর্ম্মের তিনি পারে। পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্ম তাঁহার ধর্ম্মের বহিরাবরণ মাত্র। তিনি ত্রিগুণের অতীত পথে বিচরণ করেন, সুতরাং তাঁহার পক্ষে কোন বিধি-নিষেধ নাই, লৌকিক ব্যবহার সমূহও নাই। জনসাধারণ যে বিষয়ে একবারে প্রসুপ্তের ন্যায় জ্ঞানহীন, সন্ন্যাসী তাহাতেই সর্ব্বদা জাগ্রত এবং সাধারণ লোক যে বিষয়ে (দৃশ্য-প্রপঞ্চে) জাগরিত, সন্ন্যাসী সেই বিষয়ে একেবারে সুষুপ্তের ন্যায় জ্ঞানহীন। তিনি "বেদান্তবাক্যেষু সদা রমন্তঃ"—'সর্ব্বদা বেদান্ত-বাক্যে রমণ করেন', এবং অহর্নিশ ব্রহ্মভাবে বিভোর থাকেন। তিনি সকল অবস্থার সাক্ষিস্বরূপ স্বপ্রকাশ ব্রহ্মকে "আমিই সেই" বলিয়া অবগত হইয়াছেন। নিজের স্বরূপভূত আত্মার দর্শনলাভহেতু তাঁহার বর্ণাশ্রমোচিত আচার আপনি বিগলিত হইয়াছে। তিনি সকল বর্ণ ও সকল আশ্রম অতিক্রম করিয়া আপনি আপনাতে অবস্থিত। এইরূপে যিনি "সর্ব্বান্ কামান্ পরিত্যজ্য অদ্বৈতে পরমে স্থিতিঃ' (পরমহংসোপনিষৎ)—'সকল কামনা পরিত্যাগ করিয়া অদ্বৈতে স্থিতিলাভ করিয়াছেন, তিনিই সন্ন্যাসী।' অদ্বৈতে স্থিতির অর্থ তত্ত্বজ্ঞানে স্থিতি। সকল কামনা পরিত্যাগ না করিলে অদ্বৈতে স্থিত হওয়া যায় না। সন্ন্যাস শব্দের অর্থ সর্ব্ব কামনা বা বাসনা পরিত্যাগ। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তত্ত্বজ্ঞান ও বাসনা ত্যাগ পরস্পর পরস্পরের সাপেক্ষ। অতএব সিদ্ধান্ত—যাহা অদ্বৈত তত্ত্বজ্ঞান তাহাই সন্ন্যাস বা বাসনাত্যাগ এবং যাহা সন্ন্যাস বা বাসনাত্যাগ তাহাই অদ্বৈততত্ত্বজ্ঞান।

উড়িয়া ভক্তদের মুখে শ্রীচৈতন্য-কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অধ্যাপক শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার, এম্-এ, পি-আর্-এস্, পি-এইচ্-ডি, ভাগবতরত্ন

৩। ঈশ্বর দাসের চৈতন্য ভাগবত—কটকে ঈশ্বর দাসের চৈতন্য-ভাগবতের দুইখানি পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে। আমি কটক কলেজের অধ্যাপক রায় সাহেব আর্ত্তবল্লভ মহান্তি মহাশয়ের অনুগ্রহে "প্রাচী সমিতির" পুঁথিশালায় রক্ষিত পুঁথিখানি দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি। ঈশ্বর দাসের পুঁথিতে (৬৫ অধ্যায়ে) দুইটী গুরু প্রণালী দেওয়া আছে। কিন্তু উহাদের মধ্যে কোনটী ঈশ্বর দাসের নিজের গুরু প্রণালী কিনা জানা যায় না। উহার একটীতে আছে—

শ্রীচৈতন্য—বক্রেশ্বর—গোপাল গুরু—ধ্যানদাস—রথীদাস—শ্যামকিশোর—অনন্ত। শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ভক্ত গোপাল গুরু হইতে পঞ্চম অধস্তন শিষ্য হইতেছেন অনন্ত।

দ্বিতীয়টীতে আছে—

মত্ত বলরাম—জগন্নাথ দাস—বিপ্র বনমালী—কেলি কৃষ্ণদাস—পুরুষোত্তম দাস-কৃষ্ণ বল্লভ—কাহ্নু দাস। শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ভক্ত জগন্নাথ দাস হইতে ষষ্ঠ অধস্তন শিষ্য কাহ্নু দাস। প্রত্যেক গুরুর সময় ২৫ বৎসর করিয়া ধরিলে ও ঈশ্বর দাসকে কাহ্নু দাসের শিষ্য ধরিলে তাঁহার চৈতন্য-ভাগবত শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পর ১৫০।১৭৫ বৎসর পরে অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে বা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে লিখিত হয় মনে করা যাইতে পারে।

চৈতন্য ভাগবতের শেষে ঈশ্বর দাস নিজের নিম্নলিখিত পরিচয় দিয়াছেন—

মাটী বংশে হেলি জাত দয়ালু প্রভু জগন্নাথ
সুকৃপা মতে যহুঁ কলে এ যে শাস্ত্র লেখনি বোইলে
শ্রীগুরুরূপেণ ভাবগ্রাহী কহন্তি ত্রৈলোক্য গোঁসাই
তেহুটী ভরসা মোরে সুজনে দোষ মোর না ধর
তুম্ভ চরণ রেণু মতে দয়া করিব হৃদ গতে
মাগই দাস ঈশ্বর উদ্ধরি ধর নিরাকার
মোছার মূঢ় দুর্ম্মতি মো ভক্তি রথ গিরিপতি ॥

"মাটী বংশে জাত" মানে পণ্ডিত বংশে বা গণক কুলে জাত।

ঈশ্বর দাস বলেন যে গ্রন্থ রচনার পর তিনি যখন পুরীতে যান, তখন তথায় শ্রীচৈতন্যের জগন্নাথের শ্রীবিগ্রহে লীন হওয়ার কথা আলোচিত হইতেছিল।

শ্রীজগন্নাথ অঙ্গেলীন দেখন্তি সর্ব্ব বিদ্বজ্জন
যে শাস্ত্র মুক্ত মন্তপেন শুনন্তি সন্ন্যাসী ব্রাহ্মন
যে মন্ত সমযরে মুহিঁ শ্রীপুরুষোত্তম গলই
বাসুদেব তীর্থ সন্ন্যাসী আপে সরস্বতী প্রকাশি
তাঙ্ক ছামুরে পুন গ্রন্থ প্রকাশ কলে বৈষ্ণবন্ত

*　　*　　*

তীর্থ যে কহন্তি মধুর বোলন্তি শুন হে ঈশ্বর
পূর্ব্বে যে শাস্ত্র শুনুন নাহিঁ য়েবে য়ে শাস্ত্র শুনিলইঁ
ভক্তি যোগর যেহুঁ কথা চৈতন্য মঙ্গল বারতা
শ্রীজগন্নাথ অঙ্গে লীন কাহুঁ লেখিল য়ে বচন ॥

ঈশ্বর দাস শ্রীচৈতন্যকে সর্ব্বত্র বুদ্ধ অবতাররূপে বন্দনা করিয়াছেন। আবার জগন্নাথই যে শ্রীচৈতন্য-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সে কথাও বলিয়াছেন। যথা—

ভক্ত বৎসল জগন্নাথ অব্যয় অনাদি অচ্যুত
মর্ত্ত্যে মনুষ্য দেহ ধরি অনাদি নাথ অবতরি
নদীয়া নগ্রে অবতার পশুজনমরু কলে পার ॥
(১ম অধ্যায়)।

ঈশ্বর দাস শ্রীচৈতন্ত ও তাঁহার পরিকরগণ সম্বন্ধে কতকগুলি ভ্রান্ত সংবাদ দিয়াছেন। তাঁহার সময়ে শ্রীচৈতন্তের জীবনী সম্বন্ধে যে কিরূপ অদ্ভুত অদ্ভুত মত উড়িষ্যার এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রচলিত ছিল, তাহার দৃষ্টান্ত এই গ্রন্থখানি হইতে পাওয়া যায়। নিম্নে ঈশ্বর দাস বর্ণিত যে সংবাদগুলির কথা লিখিতেছি তাহার সহিত শ্রীচৈতন্তের অন্তরঙ্গ ভক্ত মুরারি গুপ্ত ও কর্ণপূরের এবং নিত্যানন্দের প্রিয় শিষ্য বৃন্দাবন দাসের বর্ণনার একেবারেই মিল নাই।

১। ঈশ্বর দাসের মতে জগন্নাথ মিশ্রের মধ্যম ভ্রাতার নাম নীলকণ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম আদিকন্দ। তাঁহার ভগিনীর নাম চন্দ্রকান্তি (দ্বিতীয় অধ্যায়)। চৈতন্ত চরিতামৃত মতে জগন্নাথ মিশ্রের ছয় ভাইয়ের নাম কসারি, পরমানন্দ, পদ্মনাভ, সর্ব্বেশ্বর, জনার্দ্দন ও ত্রৈলোক্যনাথ (১।১৩।৫৪—৫৬)। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যে তাঁহার ভগিনীর নাম পাওয়া যায় না। জয়ানন্দ চন্দ্রকলা ও চন্দ্রমুখী নামে দুই জন নারীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

২। মুরারি গুপ্ত বলেন শচীর পিতার নাম নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী; ঈশ্বর দাসের মতে গৌতম বিপ্র (দ্বিতীয় অঃ)।

৩। মুরারি বলেন যে, শচীদেবীর আট কন্যা মৃত হওয়ার পর বিশ্বরূপ জন্ম গ্রহণ করেন, তৎপরে বিশ্বম্ভর জন্মেন। ঈশ্বর দাসের মতে শচীর পাঁচ পুত্র মৃত হওয়ার পর শ্রীচৈতন্ত অবতীর্ণ হন।
(২য় অধ্যায়)।

৪। ঈশ্বর দাস বলেন যে, পুরন্দর মিশ্রের ভগিনী চন্দ্রকান্তির সহিত হাড়ু মিশ্রের বিবাহ হয়। এই বিবাহের ফলে নিত্যানন্দ জন্মগ্রহণ করেন (১৭ অঃ); অর্থাৎ চৈতন্য ও নিত্যানন্দ মামাতো পিসতুত ভাই। কিন্তু হাড়াই ওঝা ছিলেন রাঢ়ী ব্রাহ্মণ, আর জগন্নাথ মিশ্র পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ। এই দুই শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের মধ্যে আদানপ্রদান চলিত না।

৫। ঈশ্বর দাসের মতে নিত্যানন্দের শ্বশুরের নাম অনন্ত চক্রবর্ত্তী ও শাশুড়ীর নাম জম্বুবতী (৫৫ অঃ)। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে পাওয়া যায় যে, বসুধা ও জাহ্নবী সূর্য্যদাস সারখেলের কন্যা।

তত্ত্ব নির্ণয় বিষয়ে ঈশ্বর দাসের মতের সহিত স্বরূপ দামোদর তথা কর্ণপূরের মতের পার্থক্য সুস্পষ্ট। অদ্বৈত শিবের অবতার বলিয়া গৌড়ীয়-সাহিত্যে নিরূপিত হইয়াছেন। ঈশ্বর দাস তাঁহাকে রাধার অবতার বলিয়াছেন। যথা—গোলকে কৃষ্ণ রাধিকাকে বলিতেছেন—

এমন্তে কহিন গোঁসাই নিত্যকে বলে ভাবগ্রাহী
রাধিকা দেখি হস হস অধর চুম্বে পীতবাস
বোলে শুন প্রিয়বতী জন্ম হেবো আম্ভে ক্ষিতি
তুম্ভ হইবে অবতার অদ্বৈতরূপে মনুষ্যর
আম্বুরা নগ্রে গোপাপথির মো জন্ম শুনিলে আথির ॥
(২য় অঃ)।

শ্যামানন্দ অম্বিকা কালনার হৃদয়—চৈতন্তের শিষ্য বলিয়া উড়িয়া বৈষ্ণবদের নিকট অম্বিকা নামটী সুপরিচিত হইয়াছিল। তাই অদ্বৈতকেও অম্বিকার অধিবাসী বলা হইয়াছে।

৬। ঈশ্বর দাসের মতে শ্রীচৈতন্ত পুরীতে পৌঁছিয়া নিম্নলিখিত ভক্তদের সঙ্গে জগন্নাথ-মন্দিরে গিয়াছিলেন।

চৈতন্ত নিত্যানন্দ ঘেনি আদিত্য হরিদাস ঘেনি
উদ দত্ত যে শ্রীনিবাস অভিরাম শঙ্কর ঘোষ
সুন্দরানন্দ রামেশ্বর পুরুষোত্তম বিশ্বেশ্বর
গৌরাঙ্গ দাস যে পণ্ডিত মুরারি দাস যে অচ্যুত

বক্রেশ্বর যে বৃন্দাবন বাসু দাস বংশীবদন
গদি দাস রাঘো পণ্ডিত সার্ব্বভৌম যে সঙ্গত
বলরাম দাস গোপাল রামানন্দ যে সঙ্গমেল
রূপসনাতন যে দুই সঙ্গেতে জগাই মাধাই
গহনে দীন কৃষ্ণ দাস নাগর পুরুষোত্তম পাশ
সঙ্গতে সীতা ঠাকুরাণী জঙ্গলি নন্দিনী এ বেণী
আদিত্য পত্নীর গহন তিনশ স্ত্রীবৃন্দগণ
উদ্দণ্ড নানক সেবক এ আদি গহনর লোক
সঙ্গতে বলরাম দাস যশোবন্ত অচ্যুত দাস
অনন্তদাস সঙ্গতর চারি শাথাঙ্ক ধরি কর
এমন্তে চৈতন্য গোঁসাই ক্ষেত্র ডাহান বর্ত্ত হই
ঐ লে প্রদক্ষিণ করে সিংহ মুরলী নাদস্কুরে ॥
(৪৭ অধ্যায়)।

উল্লিখিত ভক্তগণের মধ্যে আদিত্য – অদ্বৈত; উদদত্ত—উদ্ধারণ দত্ত; বাসুদাস—বাসু ঘোষ; গদিদাস—গদাধর দাস; রামানন্দ—রামানন্দ বসু।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীরূপের ও শ্রীজীবের সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন; সুতরাং রূপ-সনাতন সম্বন্ধে তাঁহার কথা ঈশ্বর দাসের বর্ণনা অপেক্ষা অধিক প্রামাণিক। কবিরাজ গোস্বামীর মতে রূপ-সনাতনের সহিত শ্রীচৈতন্যের প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটে শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসের পঞ্চম বর্ষে। ঈশ্বর দাস কর্ত্তৃক উল্লিখিত রামেশ্বর, দীন কৃষ্ণদাস ও নানকের সেবক উদ্দণ্ডের নাম গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে পাওয়া যায় না। নানকের একজন সেবক শ্রীচৈতন্যের অনুগত হইয়াছিলেন এ সংবাদ একেবারে নূতন।

এইরূপ আরও কয়েকটী নূতন সংবাদ ঈশ্বর দাস দিয়াছেন।

১। ঈশ্বর দাসের মতে নানক শ্রীচৈতন্যের কৃপা পাইয়াছিলেন। যথা—

শ্রীনিবাস যে বিশ্বম্ভর কীর্ত্তন মধ্যে বিহার
নানক সারঙ্গ এ দুই রূপ সনাতন দুই ভাই
জগাই মাধাই একত্র কীর্ত্তন করন্তি এ নৃত্য ॥
(৬১ অধ্যায়)।

অন্যত্র—

নাগর পুরুষোত্তম দাস জঙ্গলী নন্দিনী তা পাশ
নানক সহিতে গহন গোপাল গুরুসঙ্গ তেন
সঙ্কেত মত্ত বলরাম বিহার নীলগিরি ধাম ॥
(৬৪ অধ্যায়)।

নানকের জীবনকাল ১৪৬৯ হইতে ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। সুতরাং তিনি শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক। নানকের সহিত শ্রীচৈতন্যের দেখা সাক্ষাত হওয়া খুবই সম্ভব। কিন্তু সে সম্বন্ধে শিখদের ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মধ্যে কোন প্রবাদ প্রচলিত নাই। এক্ষেত্রে ঈশ্বর দাসের বর্ণনা কতদূর সত্য বলা কঠিন।

২। শ্রীচৈতন্যের সাতখানি জীবনীতে ও বৈষ্ণব বন্দনাতে কেশব ভারতীর গুরুর নাম পাওয়া যায় না। ঈশ্বর দাসের মতে—

নারদ শিষ্য মাধবানন্দ সন্ন্যাসী পথে উচে চন্দ্র
তা শিষ্য বাসব ভারতী হরিশরণ দীক্ষা খেয়তি ॥
পুরুষোত্তম তাঙ্ক শিষ্য ভারতী নামর বিশ্বাস
শ্রীমন্ত আচার্য্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পণে বিচক্ষণ
সন্ন্যাস দীক্ষা সে বেনন্তি কেশব নাম সে বহন্তি
নাম তা কেশব ভারতী নন্দন বনে তাঙ্কস্থিতি
নবদ্বীপরে শ্রীচৈতন্য আপে প্রত্যক্ষ ভগবান ॥
(৬৫ অঃ)।

অসমীয়া ভাষায় লিখিত কৃষ্ণ ভারতীর সন্ত নির্ণয় গ্রন্থে কেশব ভারতীর গুরুপ্রণালী নিম্নলিখিত-রূপ প্রদত্ত হইয়াছে—

শঙ্করাচার্য্য সদানন্দাচার্য্য শ্রীশুক্রাচার্য্য, পরমাত্মাচার্য্য, চতুর্ভুজ ভারতী, (অতঃপর সকলের ভারতী উপাধি), লক্ষ্মণ, কমললোচন, বিশু, রসিক, উদ্ধান, শিবানন্দ, বিশ্ব, ভারতানন্দ,চকোরানন্দ, কাঞ্চনানন্দ, বালারাম, সুত্রানন্দ, লোকানন্দ, সবানন্দ, কেশবানন্দ, শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ।

দুইটী গুরুপ্রণালীর মধ্যে মিল নাই। আমার মনে হয়, উভয় প্রণালীই কাল্পনিক।

৩। বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন যে, শ্রীচৈতন্ত যখন পুরীতে প্রথমবার গমন করেন, তখন প্রতাপ-রুদ্র উৎকলে ছিলেন না। যথা—

যুদ্ধরসে গিয়াছেন বিজয়া নগরে।
অতএব প্রভু না দেখিলেন সেইবারে॥
(চৈঃ ভাঃ ৩,৩।৪১২ পৃঃ)।

কিন্তু ঈশ্বর দাসের বর্ণনা পাঠ করিয়া মনে হয় যে, সেই সময় প্রতাপ-রুদ্র কটকে ছিলেন ও শ্রীচৈতন্তকে দর্শন করিতে আসেন। যথা—

এমন্তে সময়ে রাজন প্রতাপ রুদ্র দেবরাণ
কটকে বিজে করিথিলে চৈতন্ত বিজয় শুনিলে
সৈন্ত সাজিলে নৃপরাণ প্রবেশে নীলাদ্রি ভুবন
* * *
প্রবেশ আসি সিংহদ্বার দর্শন চৈতন্ত ঠাকুর
সন্ন্যাস বেশ বনমালী দেখি চরণে রঙ থালি
চৈতন্ত আপে ভগবান রাজাকু কোড সম্ভাষণ
নম্রতা হই নৃপসাঁই চৈতন্ত ছামুরে জানই।
(৪৭ অঃ)।

ঈশ্বর দাসের মতে প্রতাপ রুদ্র জগন্নাথ দেবের আজ্ঞা পাইয়া সস্ত্রীক শ্রীচৈতন্তের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।

শুনিল চৈতন্ত গোঁসাই নৃপতি কর্ণে দীক্ষা কহি
কর্ণেন মহামন্ত্রদেলে সমস্ত হরষ হইলে॥
(৪৯ অধ্যায়)।

ঈশ্বর দাসের বইয়ের ঐতিহাসিক মূল্য খুব বেশী বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু উড়িয়া ভক্তের লেখা শ্রীচৈতন্তের জীবনীর বড়ই অভাব। সেই হিসাবে এখানি প্রকাশ করা কর্ত্তব্য।

৪। **দিবাকর দাসের "জগন্নাথ চরিতামৃত"**—দিবাকর দাসের "জগন্নাথ চরিতামৃতের" প্রথম সাত অধ্যায়ে শ্রীচৈতন্যের সম্বন্ধে কিছু বিবরণ আছে। শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন মহাশয় বলেন যে,দিবাকর জগন্নাথ দাসের শিষ্য (প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪১)। কিন্তু উক্ত গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে দিবাকর নিম্নলিখিত ভাবে নিজের গুরুপ্রণালী বর্ণনা করিয়াছেন—

শ্রীচৈতন্য, গৌরীদাস, হৃদয়ানন্দ, বলরাম, জগন্নাথ, বনমালী, কেলিকৃষ্ণ, নবীনকিশোর, দিবাকর। ঈশ্বর দাস প্রদত্ত গুরুপ্রণালীতে জগন্নাথ দাস, বিপ্রবনমালী ও কেলীকৃষ্ণ দাসের নাম আছে। দিবাকর কেলিকৃষ্ণের শিষ্যের শিষ্য, আর ঈশ্বর দাসের গুরু (?)। কাহ্নু দাস কেলিকৃষ্ণের শিষ্য পুরুষোত্তমদাসের শিষ্যের শিষ্য, এ হিসাবে দিবাকর ঈশ্বর দাস অপেক্ষা দুই পুরুষ পূর্ব্বের লোক। দিবাকর শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক জগন্নাথদাস হইতে চার পুরুষ দূরে। সুতরাং তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

দিবাকর বলেন, শ্রীচৈতন্য জগন্নাথ দাসের সেবায় তুষ্ট হইয়া তাঁহার মাথায় নিজের উত্তরীয় বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। যথা—

আপন শ্রীঅঙ্গ পাছড়ি কসাবসন অঙ্গ কাড়ি
দাসঙ্ক শিরে বান্ধি দিলে (তৃতীয় অধ্যায়)।

"জগন্নাথ চরিতামৃতের" চতুর্থ অধ্যায়ে দেখা যায় যে, শ্রীচৈতন্য সর্ব্বাভৌমকে জগন্নাথ প্রসাদের মাহাত্ম্য বলিতেছেন ও মন্ত্র উপদেশ দিতেছেন। সপ্তম অধ্যায়ে আছে যে, শ্রীচৈতন্য দিনে চারিবার করিয়া জগন্নাথ দর্শন করিতেন ও দ্বাদশবার দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেন।

জগন্নাথ দাসের সম্প্রদায়কে "অতিবড়ী" সম্প্রদায় কহে। "অতিবড়ী" শব্দটী তাঁহার ভক্তেরা অত্যন্ত মহৎ অর্থে ব্যবহার করেন। কিন্তু পুরীর উড়িয়া মঠের মহান্ত আমাকে বলেন যে জগন্নাথ দাস স্ত্রীবেশ গ্রহণ করিয়া প্রতাপ রুদ্রের অসূর্য্যম্পশ্যা রাণীদিগকে দীক্ষা দেন, এই কপট বেশ গ্রহণ করার জন্য শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে ত্যাগ করেন। ঝাঁঝাঁপিঠা মঠের মহান্ত বলেন যে, প্রতাপ-রুদ্রের অন্তঃপুরে জগন্নাথ দাস স্ত্রীবেশ গ্রহণ করিয়া ভাগবত পাঠ করিতেন। রাজার লোকেরা তাঁহাকে সন্দেহ করিয়া পরীক্ষা

করিতে আসিলে তিনি স্ত্রীরূপ প্রকট করেন। বৈষ্ণবগণের নারীভাবে ভজন গুহ্য কথা। জগন্নাথ দাস সেই নারীভাবের রহস্য প্রকাশ করিয়া দেওয়ায় শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে "অতিবড়" আখ্যা দিয়া ত্যাগ করেন।

যাহা হউক, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যে যে সব ভক্ত ব্রজের ভজনপ্রণালী গ্রহণ করেন নাই সেই সব উড়িয়া ভক্তদের কথা লিখিত হয় নাই। এইরূপ সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির ফলে শ্রীচৈতন্যের প্রেম—ধর্ম্মপ্রচারের বিবরণ অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে।

৫। **গৌর কৃষ্ণোদয় কাব্য**—৪২৭ চৈতন্যাব্দে শ্রীযুক্ত বিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্ত সরস্বতী মহোদয় "শ্রীগৌরকৃষ্ণোদয়" নামে একখানি সংস্কৃত কাব্য প্রকাশ করেন। তিনি উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় জানাইয়াছেন যে গৌরশ্যাম মহান্তি মহাশয় নয়াগড় রাজ্য হইতে ঐ গ্রন্থের পুঁথি সংগ্রহ করিয়া আনেন। আমি পুরীর উড়িয়া মঠে উহার আর একখানি পুঁথি পাই। উভয় পুঁথিতে প্রদত্ত পুষ্পিকা হইতে জানা যায় যে গ্রন্থখানি ১৬৮০ শকে আশ্বিন মাসে কৃষ্ণাতৃতীয়া তিথিতে রচিত হয়। লেখকের নাম গোবিন্দদেব। সম্ভবতঃ তিনি উৎকল দেশীয় ও বক্রেশ্বর পণ্ডিতের পরিবার ভুক্ত।

"গৌরকৃষ্ণোদয়" কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত অবলম্বন করিয়া লিখিত। চরিতামৃতে যে ঘটনা যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, গোবিন্দদেবও দুই এক স্থান ছাড়া সর্ব্বত্র সেই ঘটনা সেই ভাবে লিখিয়াছেন। তবে চরিতামৃতের বিচারাংশ তিনি বাদ দিয়াছেন। গ্রন্থের শেষে তিনি ইঙ্গিতে চরিতামৃতের নিকট ঋণ স্বীকার করিয়াছেন। যথা—

শ্রীগৌরচন্দ্র চরিতামৃতসারসিন্ধোঃ
সংদুহ্য কিঞ্চিদিহ মে হৃদি বিন্দুমাত্রম্।
যদ্ বর্ণিতং লঘুতয়া সহসা হসন্তঃ
সন্তোহি সন্তু শরণং স্থিতরেণ তত্র॥ (১৮।৬৩)

বিশ্বম্ভর জন্মগ্রহণ করিয়া তিনদিন পর্য্যন্ত মাতৃস্তন্য পান করেন নাই; পরে অদ্বৈত আচার্য্য আসিয়া শচীদেবীকে দীক্ষা দিলে তিনি স্তন পান করিলেন এরূপ কোন কথা চরিতামৃতে নাই। কিন্তু গোবিন্দদেব এই ঘটনাটী বর্ণনা করিয়াছেন (২।২৪-৩২)।

তিনি অষ্টম সর্গে লিখিয়াছেন যে গোপীনাথ আচার্য্য সার্ব্বভৌমের নিকট বলিতেছেন যে শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তার প্রমাণ বায়ু পুরাণে আছে (৮।২৩)। বাঁকীপুর পাটনা হইতে ৪ মাইল দূরবর্ত্তী গাইঘাট নামক স্থানে শ্রীচৈতন্যের এক প্রাচীন মন্দির আছে। এ মন্দিরে রক্ষিত বহু সংখ্যক পুঁথির মধ্যে একখানির নাম "বায়ু পুরাণোক্তম্ শ্রীচৈতন্যাবতারনিরূপণম্ সটীকম্।" ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বেই কোন কোন বৈষ্ণব শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তা বিষয়ক শ্লোক রচনা করিয়া পুরাণের মধ্যে ঢুকাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্য পুরীতে বিশ বৎসর কাল থাকিয়া অসংখ্য ব্যক্তিকে কৃপা করিয়াছিলেন। অথচ গোবিন্দদেব উড়িয়া হইয়াও শ্রীচৈতন্যের উড়িয়া ভক্তদের সম্বন্ধে চরিতামৃতে প্রদত্ত বিবরণ ছাড়া অন্য কিছুই বলিলেন না, ইহা বিস্ময়জনক ব্যাপার।

উড়িয়া ভক্তের লেখা শ্রীচৈতন্যের জীবনী বিষয়ে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির নাম ও সন্ধান পাইয়াছি; কিন্তু এগুলি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। (১) কানাই খুঁটিয়ার "মহাপ্রকাশ"। কানাই খুঁটিয়া শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন; তাঁহার লেখা বই ঐতিহাসিকের নিকট অত্যন্ত মূল্যবান্। কিন্তু গ্রন্থখানি কোন আমেরিকান্ ভ্রমণকারী কিনিয়া লইয়া গিয়াছেন শুনিলাম। সুরঙ্গীর রাজার গ্রন্থাগারে উড়িয়া ভাষায় লেখা (২) চৈতন্যচন্দ্রোদয়, (৩) চৈতন্য-চন্দ্রোদয় কৌমুদী, (৪) চৈতন্য-ভাগবত,

(৫) চৈতন্য সম্প্রদায়, (৬) চৈতন্য পূজামন্ত্র, (৭) ভক্তি চন্দ্রোদয়, (৮) স্বপ্নদাস কৃত বৈষ্ণবসাবোদ্ধার, (৯) গোবিন্দ ভট্ট কৃত চৈতন্যবলী, (১০) চৈতন্য মহাপ্রভুঙ্কু ঝুলনছন্দ, (১১) সবঙ্গী শ্রীরাধাকান্ত মহাপ্রভুঙ্কু মহিমাসাগব নামক গ্রন্থগুলিব পুঁথি আছে। (১২) সদানন্দ "মোহন কল্পলতা" নামক পুঁথিব শেষে লিখিযাছেন যে তিনি "ব্রহ্মাণ্ড মঙ্গল" নামক গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যেব বাল্যলীলা বর্ণনা করিয়াছেন। শুনিয়াছি শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন মহাশয় "ব্রহ্মাণ্ড মঙ্গলেব" পুঁথি সংগ্রহ কবিয়াছেন। অনুসন্ধান কবিলে শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধীয় আবও অনেক পুঁথি উড়িষ্যায় পাওয়া যাইতে পাবে। একজনেব চেষ্টায় ও অর্থব্যয়ে এই কার্য্য সম্পন্ন হওয়া কঠিন।

স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দের পত্র

ওঁ শ্রীগুরুঃ শবণং

Aug 21, 1937
On the "Mountaineer"
bound for St Paul.

পবমপ্রীতিভাজনেষু

ভাই দ্বি—, সেদিন সিট্‌ল্ ষ্টেসনে (Seatle Station) তুইমাস একত্র বসবাস, চলাফেবা ও উঠাবসা কবাব পব তোমাকে বিদায় দিয়ে মনটা একটু খালি খালি বোধ হচ্ছিল। বাড়ী এসে আব বিশেষ গল্প গুজব না কবেই শুযে পড়ি, পবদিন সকালে অধ্যাপক হব্‌উজেব (Prof Horwitz) সঙ্গে প্রাতবাশ (breakfast) কবে ও একটু হেঁ'ট বেড়িয়ে এসেই ষ্টীমাবে চলে যাই। অধ্যাপক মহাশযও ষ্টেশনে এসেছিলেন—চমৎকাব লোক এই বুড়োটী!

ষ্টীমারে একটী ষ্টেট্ কক্ষ (State room) নিয়ে খুব ঘুমায়ে ও বিশ্রাম ক'বে আবামে এসেছিলাম। বেলা ২টায় জাহাজ ভিক্টোবিয়া (Victoria) নামক ব্রিটিশ কলম্বিয়াব (British Columbia) ক্যাপিট্যাল আইল্যাণ্ডে (Capital Island) এক ঘণ্টাব জন্য থামে। উপরে উঠে বেড়ায়ে সহরটী দেখেছিলাম, চমৎকাব সহব। আব বাস্তায় বহু দ্বীপ ও তটদেশেব (coast line) দৃশ্য অতি মনোবম। অপবাহ্ণ ৫॥টায় সময় ভ্যাঙ্কোবব (Vancouver) পৌছি। বন্দবটী অতি সুন্দব। প্রকাণ্ড সহব। কোপাব(Cooper)দেব আত্মীযেব সঙ্গে সেখানে দেখা হয় নাই। সন্ধ্যায় সেখান থেকে ট্রেনে চাপি। পবদিন যখন সকাল হ'ল তখনই দেখি গাড়ী পার্ব্বত্যভূমিব ভেতব দিয়ে চলেছে, ক্রমশঃ পর্ব্বতগুলি উচ্চ হতে উচ্চতব হতে লাগল, তাতে যে কত নদী প্রস্রবণ, গাছপালা বনজঙ্গল, তা আব কি বলবো। এম্-এস্-এ তুই একটী ববফ ঢাকা পর্ব্বত দেখে আমাদেব কত আনন্দ হতো। এখানে একেবাবে ববফ ঢাকা পর্ব্বতেব গাড়ী ব'য়েছে—তাবই মাঝেব উপত্যকা (valley) দিয়ে গাড়ী পাহাড়েব গাযে গায়ে, নদীব কিনাবে কিনাবে, চল্‌তে লাগ্‌লো। উঃ কত সুড়ঙ্গই (Tunnel) এ লাইনে ব'য়েছে। এক কথায় ক্যানাডাব পাহাড়েব (Canadian Rock) দৃশ্য অভাবনীয়। বেলা ২টাব সময় বরফের পাহাড়ের কোলে মায়াপুবীব ন্যায় অবস্থিত ফিল্ড (Field) নামক ষ্টেসনে গাড়ী থেকে নেমে বাসে চড়ি।

বাসটী ঐ অঞ্চলের বহু দ্রষ্টব্য দেখায়ে সন্ধ্যায় আমাদের নিয়ে গেল লেয়ার লৌজ (Lare Louise)এ। ভাই, সেদিন ছিল চতুর্দ্দশী, সে রাত্রিটী লেয়ার লৌজে (Lare Louise) যে কি শোভনীয় ছিল তা বর্ণনাতীত। এমন একটী স্থানে এক রাত্রি বাস জীবনে আর কখনো করেছি বলে মনে হচ্ছে না। আজ গাড়ীতে বসে মনে হচ্ছে লেয়ার লৌজের (Lare Louise) এক রাত্রি একটা সুখ স্বপ্ন মাত্র। ছবি খুব তুলেছি, যদি কখনো তোমাকে নিজে দেখাতে পারি তবে খুব আনন্দ হবে। তুমি নিশ্চয়ই পীত-প্রস্তর বাগান (Yellow Stone Park) খুব উপভোগ করেছ—তা অতি চমৎকার। কিন্তু ভাই, তুমি হিমালয়ের দৌহিত্র, তোমাকে কিন্তু একবার এই ক্যানাডার পাহাড় (Canadian Rockies)—বিশেষতঃ লেয়ার লৌজ (Lare Louise) দেখতেই হবে। উহা ছয় হাজার ফিট উচ্চে (altitude) অবস্থিত। জল কখনো নীল, কখনো সবুজ, তার ভেতরে যখন ওপারের তুষার ঢাকা ভিক্টোরিয়া গ্লেসিয়ারের (Victoria Glacier) ছায়া পড়ে তখন যেন ধ্যানমগ্ন শিবের অচলমূর্ত্তি স্তিমিত হ্রদের নিরুদ্ধ চিত্তে স্পষ্ট প্রতিভাত হ'তে থাকে। ভাই, এটা ঠিক কবিত্বের স্থান। আবার কি জান? হ্রদের ওপারে র'য়েছেন সমাধিমগ্ন মহেশ্বর আর এ পাশে অগণন পুষ্পমালা শোভিত অপ্সরা-কিন্নরী মুখরিত নন্দন কানন ও বৈজয়ন্তীপুরী। এমন একটী হোটেলও পূর্ব্বে দেখি নি।

পরের দিন সকালে আবার সূর্য্যালোকে হ্রদের সৌন্দর্য্য উপভোগ ক'রে বেলা ৯টায় বাসে (গাড়ী এবার ষ্টেশনে থেমেছে—সুতরাং এবার লেখা স্পষ্ট হবে, পূর্ব্বের লেখা পড়তে তোমার কষ্ট হবে) বফ (Bauff) রওনা হই। পার্ব্বত্য প্রস্রবণ, ১২ শত ফুট জলপ্রপাত, বনভূমি, গিরিসঙ্কট (gorge) সব দেখে বেলা ১২টায় বফ স্প্রিং হোটেলে (Bauff Spring Hotel) পৌছি। এখানে বহু গন্ধক ঝরণা (sulphur springs) র'য়েছে, তাতে স্নান করা হচ্ছে এ অঞ্চলের বড়-লোকদেরও বিলাসিতা (luxury)। তোমার প্রিয় ষ্টার জিঞ্জার রোজার্স (Star Ginger Rogers) সম্প্রতি এখানে রয়েছে, আমি অবশ্যই তাকে দেখে চর্ম্ম চক্ষু সার্থক করার সৌভাগ্য লাভ করি নাই। এই হোটেলও একটী ইন্দ্রপুরী, এখানে প্রিন্স অব ওয়েলস্ (Prince of Wales), শ্যামের রাজা (King of Siam) প্রভৃতি বাস করেছেন। চতুর্দ্দিকে বহু নদী ও প্রপাত, পাহাড়গুলি সব কঠিন প্রস্তরময় (rocky), বরফ আর দেখতে পাওয়া যায় না। তবে প্রাকৃতিক শোভা অতি মনোরম। আর কি ফুলটাই এরা ফুটায়েছে হোটেল কুটীর চারপাশে! এখানে এ অঞ্চলের বহু জানোয়ার, যথা—মার্কিন মহিষ (bison), বন্য ছাগ, হরিণ (elk), ভল্লুক (bear) প্রভৃতি দেখতে পাওয়া যায়। পশুবাটিকা (Zoo)তেও স্বচ্ছন্দে বিচরণকারী বহু জানোয়ার দেখবার সুযোগ হ'য়েছিল। একটী হরিণ ও একটী ছাড়া ভল্লুকের ছবি তুলেছি, তা ছাড়া বন্য হরিণ ও ভল্লুক যা দেখেছি, তা ক্যামেরা (camera)র পাল্লা (range) থেকে দূরে বলে আর ছবি তুলি নি। সারাদিন বফ (Bauff)এ কাটায়ে ও দৃশ্য দেখে শুক্রবার রাত্রে আবার ট্রেনে চেপেছি। আজ শনিবার, গাড়ী চলেছে সমতল দেশের (flat country) ভেতর দিয়ে, ২।১ ঘণ্টার মধ্যে ইউ-এস্-এ র সীমানায় প্রবেশ করব। কাল সকালে সেণ্টপল (St. Paul) পৌছে এই পত্র ডাকে দিব। এইতো হ'ল আমার ক্যানাডা (Canada) ভ্রমণের সংক্ষেপ বিবরণ।

তোমার নিশ্চয়ই কোনও স্থানে কোনও অসুবিধা হয় নি, এবং বলা বাহুল্য যে, পীত প্রস্তর বাগান (Yellow Stone Park) দেখে খুব

আনন্দ লাভ করেছি। এখন স্বস্থানে পৌছে বিশ্রামাদি করবার সুযোগ পাচ্ছি। চিকাগো পৌছে তোমার সকল সংবাদ জানতে বিশেষ উৎসুক থাকব। ৭ই সেপ্টেম্বর আমার চিকাগো পৌছাব কথা।

এ ক'দিনের ক্রমাগত উত্তেজনা (excitement) ও দৃশ্যদর্শনে শরীর আবার ক্লান্ত বোধ করছি। খাওয়া দাওয়ার অনিয়মে অর্শের রক্তপাত ক্রমাগতই চলেছে। বুকের সেই চাপ আর বোধ করি নাই। এবারে পল্লীতে গিয়ে নিতান্ত শুয়ে শুয়ে দুই সপ্তাহ কাটায়ে দেখব শরীর সারে কিনা, কিছু উপকার বোধ করলে দুই সপ্তাহের বেশী ওখানেই থাকব, অন্যথা চিকাগো পৌছে আবার বিশ্রামের ব্যবস্থা করব। তুমি সে জন্য ভাবনা করো না ভাই। শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের ইহপরকালের নিয়ন্তা। তিনিই আমাদের সব কিছুর ব্যবস্থা করবেন।

এখন দেখছি সেণ্টপল (St. Paul) পৌছাব পূর্ব্বেই এই পত্র ডাকে দেওয়া যাবে। হয়তো ক্যানাডার প্রান্তে পোর্টাল (Portal) নামক সহরে ডাকে দিব। তুমি আমার আন্তরিক প্রীতি নমস্কারাদি গ্রহণ করো। দু'মাস তোমার সঙ্গে বাস করায় আমার খুব উপকার হ'য়েছে, আর অন্যান্য সব গুরুভাইদের সঙ্গও খুব উপভোগ করা গেল। ওখানকার সকল ভক্তদের আমার আন্তরিক প্রীতি সম্ভাষণাদি জানাচ্ছি। তাঁদের আদর আপ্যায়নে আমি বিশেষ মুগ্ধ হয়েছি। ইতি—

তোমার
জ্ঞানেশ্বরানন্দ

ভ্রান্তি

অধ্যাপক শ্রীশম্ভুনাথ রায়, এম্-এ

বিগত ১৯৩৫ সনে নিখিল ভারত দর্শন সভার ভারতীয় দর্শন শাখায় সাংখ্য মতানুসারে 'ভ্রম" সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি এবং 'উদ্বোধন' শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী সংখ্যায় "মিথ্যাজ্ঞান" সম্বন্ধে বিভিন্ন হিন্দু দর্শনের মত বিশ্লেষণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। আজ ভ্রান্তি বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত আলোচনা এবং ভ্রান্ত প্রত্যক্ষের কারণ মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে বিচার করিব।

ইউরোপীয় দার্শনিকগণ ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্বন্ধে দুই বিভিন্ন মত প্রচার করিয়াছেন। বস্তুতন্ত্রবাদী (Realist) বলেন, ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ একটা সহজজ্ঞান, সে সম্বন্ধে শুধু এই কথা বলা যাইতে পারে, যে ভ্রম ঘটে এবং যে ঘটনা আমরা ভ্রান্ত বলি, তাহা অন্যান্য ঘটনার মতই একটী ব্যাপার। বিজ্ঞানবাদী (Idealist) বলেন, ভ্রম মনের কার্য্য, বস্তুতে অবস্তুর ভান মানসিক ক্রিয়ার ফল। বিষয় ও বিষয়ীর সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে জ্ঞানের উদয় হয়, কিন্তু বিষয়ীর মনোবৃত্তির বিভিন্ন কার্য্যের ফলে বিষয় বিভিন্ন আকারবিশিষ্ট হয় এবং সেই জন্যই ভ্রম হয়। রজ্জুতে সর্পভ্রম মনের ক্রিয়া, বস্তু বা বিষয়ের রূপান্তর প্রাপ্তি মানসিক ক্রিয়ার ফলে ঘটিয়া থাকে। বস্তুতন্ত্রবাদী বলেন, বিষয়ের কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে না, রজ্জু রজ্জুই থাকে, তবে সর্প যে

প্রত্যক্ষ হয়, তাহার কারণ অনেক প্রকার হইতে পারে, কিন্তু প্রত্যক্ষ সর্প যে একটা ঘটনা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই এবং তাহা মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না।

এই দুই মতই প্রণিধানযোগ্য। ভ্রান্তি হয় কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে স্বীকার করিতে হয় যে, মন বিষয়ের যথার্থ রূপ নিরূপণে অসমর্থ হয় এবং সেই জন্যই ভ্রম হয়। রজ্জুতে রজ্জুজ্ঞান সত্য এবং রজ্জুতে সর্পজ্ঞান মিথ্যা। রজ্জুতে যখন রজ্জুজ্ঞান হয়, তখন মানসিক বিকার ঘটে না, কিন্তু রজ্জুতে যখন সর্পবুদ্ধি হইতেছে, তখন মানসিক ক্রিয়ার ফলে বিষয়ের বিকার ঘটিতেছে এবং সেই জন্য ভ্রম হইতেছে। 'ভ্রম' বা 'ভ্রান্তি' শব্দ ভ্রম্ ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 'ভ্রম' ধাতুর অর্থ ভ্রমণ অর্থাৎ মন যখন এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুতে ভ্রমণ করে তখন ভ্রম হয়। অথবা মানসিক ক্রিয়া হেতু বিষয়ের যে পরিবর্ত্তন, তাহাই ভ্রম। বিজ্ঞানবাদীর এই মত নিতান্ত হেয় নয়।

আবার বস্তুতন্ত্রবাদীর মতেরও সার্থকতা আছে। ভ্রম যে একটা ঘটনা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রজ্জুতে সর্পজ্ঞান মিথ্যা এই কথা বলিলে ভ্রম সম্বন্ধে কিছুই বলা হইল না। রজ্জুতে রজ্জুজ্ঞান সত্য, ইহার অর্থ এই যে, যাহা আছে তাহাই আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি এবং তাহার যথার্থ বোধ হইতেছে। রজ্জুতে সর্পজ্ঞান সময়ে যে সর্প প্রত্যক্ষের বিষয় নহে তাহার জ্ঞান হইতেছে এবং সেই জন্য এই জ্ঞান মিথ্যা। কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে, রজ্জুতে রজ্জুজ্ঞান সময়ে রজ্জু আছে ইহার প্রমাণ কি? 'রজ্জু আছে' ইহা যদি তর্কের বা যুক্তির দ্বারা সিদ্ধ করিতে হয়, তাহা হইলে বুদ্ধিকে হার মানিতে হইবে। কারণ কোনও যুক্তির দ্বারাই রজ্জুর অস্তিত্ব প্রমাণিত হইতে পারে না। কিন্তু যদি এই কথা বলা হয় যে, 'রজ্জু আছে' ইহা অনুভূতির সাহায্যে প্রমাণিত হইতেছে, তাহা হইলে রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি সময়ে 'সর্প আছে' ইহাও অনুভূতির সাহায্যে প্রমাণিত হয়। কাজেই প্রত্যক্ষকে ভ্রান্ত বা অভ্রান্ত বলা চলে না। কারণ প্রত্যক্ষ একপ্রকার জ্ঞানের উপায়, প্রত্যক্ষজ্ঞান কিরূপে হয়, তাহা বিচারের বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু ঐ জ্ঞান ভ্রান্ত বা অভ্রান্ত বলা চলে না। কারণ যাহাকে আমরা ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ বলি এবং যাহা অভ্রান্ত প্রত্যক্ষ এই দুই এর মধ্যে বাস্তবিক কোনও পার্থক্য নাই। ভ্রম (Illusion) একটী ঘটনা এবং সেই হিসাবে উহা সত্য বা মিথ্যাবাচ্য নহে।

বিশিষ্ট মনোবিদগণ বলিয়াছেন, প্রত্যক্ষ ভ্রান্ত হয়। যে বস্তু নাই, তাহার প্রত্যক্ষ ভ্রান্তি বা ভ্রম (Illusion) হয় না। অতএব যথার্থ প্রত্যক্ষ এবং ভ্রমের মধ্যে পার্থক্য আছে। ভ্রম নানা কারণে হইতে পারে। ইন্দ্রিয়ের দোষ জন্য ভ্রম, অতি দূরত্ব বা অতি সন্নিধান হেতু ভ্রম, মানসিক বিকার হেতু ভ্রম, অবদমন হেতু ভ্রম, নির্দ্ধারিত ধারণার জন্য ভ্রম, বস্তুর সম্পূর্ণ এবং সম্যক্ বিশ্লেষণ অভাবে ভ্রম—এইরূপ নানাকারণে ভ্রম হইতে পারে। ফলে যে বস্তু যাহা নয়, তাহা সেইরূপ প্রত্যক্ষ হয়, অর্থাৎ বস্তুর রূপান্তর প্রত্যক্ষ হয়। অবশ্য একথা অনেকেই স্বীকার করেন যে, কতকগুলি ভ্রম বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির হইয়া থাকে, সকলের হয় না, যে লোক শোকে মুহ্যমান বা যাহার চিত্ত কোনও প্রকট উদ্বেগের দ্বারা আন্দোলিত হইয়াছে বা বিকারচিত্ত ব্যক্তির ভ্রম সকলের হয় না। আবার কতকগুলি ভ্রম কোনও এক ব্যক্তির হইলেও অন্যের হয় না। আমি রজ্জুতে সর্প দেখিতেছি বা চক্ষুর পীতত্বশতঃ বস্তু পীতবর্ণ দেখিতেছি, কিন্তু অন্য লোক সেই সকল বস্তুর রূপ যথার্থ জ্ঞান করিতেছে। কিন্তু এমন অনেক ভ্রম আছে যাহা সকলেরই হয় এবং সকল সময়েই হইতে পারে। যেমন জলমগ্ন কাঠিকে বাঁকা দেখা, বা সুদূরস্থিত বালুকা-রাশিকে জল বলিয়া ভ্রম করা। দুইটী সরলরেখা একই মাপের হইলেও একটী অন্যটীর অপেক্ষা বড় মনে হয়,

যখন একটীর দুই প্রান্তে দুইটী ছোট রেখা বাহিরের দিকে টানা হয় এবং অন্যটীর দুই প্রান্তে দুইটী ছোট রেখা ভিতরের দিকে টানা হয়। চলন্ত রেলগাড়ীতে বসিয়া বাহিরের নিশ্চল দ্রব্যকে গতিশীল দেখা—এইরূপ ভ্রমও সকলের হয়। কেহ কেহ বলেন, এইগুলি ভ্রম নয়, কারণ যে প্রত্যক্ষ কোনও বাহ্য কারণ বশতঃ হয় (physical), মনের ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে না, তাহা ভ্রম নয়, যেমন জলমগ্ন কাঠির বক্র রূপ। কিন্তু বাহ্য কারণ বশতঃই হউক আর শরীরের কোনও দোষ বশতঃই হউক অথবা মানসিক ক্রিয়ার ফলেই হউক, বস্তুর রূপান্তর প্রত্যক্ষ হয় এবং সেই জন্য এই সকল জ্ঞান ভ্রমাত্মক বলিতে হইবে।

কিন্তু এই প্রশ্ন করা যাইতে পারে—আমার প্রত্যক্ষ যে ভ্রমাত্মক, ইহার প্রমাণ কি? আমি সরল কাঠির জলমগ্ন অংশটুকু বক্র দেখিতেছি। কেমন করিয়া জানিব উহা বক্র নয়? উত্তরে ইহা বলিতে হয় যে, হাত দিয়া স্পর্শ করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিব কাঠি বক্র নয়। অথবা দুইটী সরল রেখার মধ্যে একটী অন্যটীর চেয়ে বড় দেখাইলেও মাপ করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিব দুইটীই সমান। অতএব এক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুকে অন্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করিলে অথবা যে অবস্থায় বস্তুর জ্ঞান হইতেছিল, সেই অবস্থা পরিবর্ত্তন করিয়া অন্য অবস্থায় সেই বস্তু প্রত্যক্ষ করিলে আমাদের ভ্রম দূর হইবে, অর্থাৎ আমরা বুঝিতে পারিব, আমাদের প্রত্যক্ষ ভ্রান্ত ছিল।

অতএব বুঝা যাইতেছে যে, বস্তুর সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ অভাব হেতু ভ্রম হয়। অসম্পূর্ণ ভেদজ্ঞান বা বিশ্লেষণের অভাব, ইন্দ্রিয়ের দোষ বা শক্তিহীনতা হেতু ভ্রম হইতে পারে, মানসিক ক্রিয়ার ফলেও হইতে পারে, কিম্বা কোনও বাহ্য কারণ (physical cause) বশতঃ হইতে পারে। প্রত্যেক প্রত্যক্ষ বিষয় (object of perception) অবধারণ কালে বাহ্যবস্তু ও অবস্থা, ইন্দ্রিয়ের সহিত বস্তুর সংযোগ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া, এবং মানসিক বৃত্তির বিভিন্ন প্রকাশ হেতু বিষয়ের সম্পূর্ণ জ্ঞান না হওয়াই সম্ভব এবং হয়ও না। অতএব প্রত্যেক প্রত্যক্ষ জ্ঞান অসম্পূর্ণ এবং ভ্রান্ত বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না।

এক টুকরা সাদা কাপড় যদি কাগজ বলিয়া ভ্রম হয়, তাহা হইলে তাহার কারণ শুধু দৃষ্টিশক্তির অভাব বা ভেদজ্ঞানের অভাব বলা চলে না। মানসিক বৃত্তিও উহার কারণ হইতে পারে। আমি যদি একটী প্রয়োজনীয় কাগজের টুকরা হারাইয়া ফেলিয়া থাকি ও তাহা অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিবার জন্য ব্যগ্র হই, তাহা হইলে কাপড়ের টুকরাকে অনায়াসে কাগজ ভ্রম করিব। পূর্ব্ববর্ত্তী ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া আমরা অনেক সময়ে ভ্রমে পতিত হই। মানসিক বিকার হেতু নানাপ্রকার অলীক দৃশ্য আমরা দেখি।

যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান যথার্থ বা সত্য বলিয়া পরিগণিত হয় এবং যাহা ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ নামে অভিহিত এই দুইরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞান একই উপায়ে হইয়া থাকে। কাজেই একটী সত্য ও অপরটী ভ্রান্ত বলার কোন সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য অভ্রান্ত প্রত্যক্ষ বস্তুর সহিত ব্যবহারকালে আমাদের কোনও রূপ অসুবিধা হয় না বা আমাদের আশা বা ধারণার কোনও ব্যতিক্রম ঘটে না। একথা সত্য এবং সেই জন্যই ব্যবহারিক সত্য বা ব্যবহারিক সার্থকতা অভ্রান্ত প্রত্যক্ষের লক্ষণ হিসাবে ধরা যাইতে পারে। তবে যাহা ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ, তাহার যতক্ষণ ব্যবহারিক সার্থকতা আছে ততক্ষণ তাহাই অভ্রান্ত বলিলে অন্যায় হয় না।

এক টুকরা কাপড় কাগজ বলিয়া ভ্রম হইলে কাগজের জ্ঞান ভ্রান্ত বলায় শুধু ইহাই ইঙ্গিত করা হইতেছে যে, ব্যবহারকালে ঐ জ্ঞানের বাধ হইবে এবং আমাদের আশা ক্ষুণ্ণ হইবে। যাহা অভ্রান্ত প্রত্যক্ষ, তাহার বাধ নাই বলা হয়, কিন্তু বাধিত না

হওয়া বা আশা ক্ষুণ্ণ না হওয়া একটা এমন কিছু বিশিষ্ট লক্ষণ নয়, যাহা নির্ব্বিবাদে গ্রাহ্য করা যাইতে পারে, কারণ বাধ না হওয়া বা বিকল্প না ঘটা কতকগুলি মানসিক বা বাস্তব অবস্থার উপর নির্ভর করে। রজ্জুতে রজ্জুবুদ্ধি যথার্থ প্রত্যক্ষ, তাহার বাধ নাই; একথার অর্থ এমন নয় যে কখনই বাধ সম্ভব নয়। কারণ আমার প্রত্যক্ষীভূত রজ্জু যেরূপে প্রকাশ পাইতেছে, অন্যের কাছে ঠিক সেইরূপে প্রকাশ পায় না এবং আমার আপাত অবস্থানুযায়ী রজ্জুবুদ্ধি পরবর্ত্তী অবস্থায় একই রূপ থাকে না। কাজেই যাহা ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ তাহার কারণ যথেষ্ট ভেদজ্ঞানের অভাব, এবং যাহা অভ্রান্ত প্রত্যক্ষ, তাহাতে ভেদজ্ঞান ও বিশ্লেষণ বুদ্ধির অনেকটা সম্পূর্ণতা থাকে। যাহা নাই, তাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান ভ্রান্ত, একথা বলা ভুল। যাহা নাই, তাহার প্রত্যক্ষ সম্ভব নয়।

অতএব এই সীদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, সকল প্রত্যক্ষজ্ঞানই ভ্রান্ত বলা যাইতে পারে। ভ্রান্ত এবং অভ্রান্ত প্রত্যক্ষজ্ঞান একই উপায়ে হয় এবং বিষয়ের সম্যক্ জ্ঞান প্রত্যক্ষের দ্বারা অর্জ্জন করিতে হইলে বিষয় এবং বিষয়ীর মধ্যে এমন সাম্য স্থাপিত হওয়া দরকার, যাহাতে বাধের কোনও সম্ভাবনা থাকিবে না। শুধু এই অবস্থায়েই বিষয়ের সম্যক্ জ্ঞান সম্ভব।

খোকা মহারাজের কথা

জনৈক ভক্ত

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম শিষ্য শ্রদ্ধেয় খোকা মহারাজকে আমি প্রথম দেখি ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ঢাকা জেলায় বালিয়াটী গ্রামে। কয়েক বৎসর হইল এই গ্রামে একটি রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম স্থাপিত হইয়াছে। আশ্রমের উদ্যোক্তাগণ রামকৃষ্ণ মঠ হইতে সাধু-মহারাজদের নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইতেন। এ পর্য্যন্ত তাঁহারা যথেষ্ট চেষ্টা ও যত্ন সত্ত্বেও শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গ শিষ্যদের মধ্যে কাঁহাকেও আনিতে সক্ষম হন নাই। এই জন্য যখন শুনিলাম যে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের এক শিষ্য আসিতেছেন, তখন আমাদের উৎসাহ ও উদ্বেগের অন্ত ছিল না। খোকা মহারাজের সম্বন্ধে বহু কথা তাঁহার আসিবার পূর্ব্বেই লোকমুখে প্রচারিত হইল। শুনিলাম, 'শ্রীশ্রীমা নাকি পা ছড়াইয়া বসিয়া মুড়ি খাইতেন, আর যে দুই একটি মুড়ি ডালা হইতে পড়িত, তাহাই ইনি কুড়াইয়া কুড়াইয়া মুখে দিতেন।' এইরূপ অনেক বিষয় যাহা শুনিলাম, তাহাতে 'তিনি নামেও যেমন খোকা, কাজেও তেমনই খোকা, ইহাই মনে বদ্ধমূল হইল। আমরা এই খ্যাতনামা বৃদ্ধ খোকা মহারাজকে দেখিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া রহিলাম।

তখন আমি স্থানীয় স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে পড়ি—প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত হইতেছি। আশ্রমে যথাশক্তি সেবাকার্য্যাদি করিতাম। একদিন বিকালবেলা যথানিয়মে আশ্রমে যাইয়া দেখি, খুব সমারোহ, সেবকগণ ছুটাছুটি করিতেছেন, দর্শনার্থী লোকের বিশেষ ভিড়, ঘরে ঢুকিতে পারিলাম না। উঁকি মারিয়া দেখিলাম, একঘর লোক বসিয়া

আছেন, একধারে একটি তক্তাপোষের উপর বেশ ভাল বিছানা পাতা, তাহার উপর একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন, দুইজন সেবক দুই দিক হইতে দুইটি বড় বড় পাখা ধীরে ধীরে চালাইতেছেন। বেশ হাস্যোজ্জ্বল মুখ, বৃদ্ধদের মতন মোটেই গম্ভীর নন, চেহারার মধ্যে সারল্য ও খোলাখুলি ভাব। গায়ে একটি ওভারকোট, তদুপরি একখানা চাদর। শুনিয়াছিলাম, অল্প বয়সে মুখমণ্ডল গোলাকার ছিল, কিন্তু দেখিলাম, তাহা নহে, চেহারায় দৃঢ় ও প্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক ভাবের মধ্যেও মনোমুগ্ধকর কমনীয়তা বর্তমান। চক্ষু দুইটি ছোট ও শ্রমকাতর, কিন্তু হাসিলেই ইহা অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

নিকটে বসিয়া কথাবার্ত্তার সুযোগ হইল না, এজন্য একটু মনক্ষুণ্ণ হইয়া ফিরিয়া আসিলাম। পরদিন সকালবেলা কিছু পয়সা লইয়া চলিয়াছিলাম বাজারের দিকে—মিষ্টি কিনিবার জন্য। ভাইবোনও সঙ্গে ছিল। আশ্রমের ধার দিয়া যাইতেছিলাম। ইচ্ছা ছিল, আশ্রমে উঠিয়া সন্ন্যাসীকে দেখিয়া ও প্রণাম করিয়া যাইব। আশ্রমে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সেই পূর্ব্বের ঘরে একাকী বসিয়া আছেন। আমরা উঁকি মারিয়া দেখিতেই তিনি ডাকিলেন, "আয় আয়, তোরা এদিকে আয়।" আমি সাহস করিয়া তাঁহাকে যাইয়া প্রণাম করিলাম। নিজে প্রণাম করিয়া ছোট ছোট ভাই বোনদের ডাকিয়া আনিয়া প্রণাম করাইলাম। তাহারা প্রণাম করিয়া ঘরের বাহিরে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তিনি আমাকে দুইএক কথা কি যে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা এখন আমার মনে পড়িতেছে না। সম্ভবতঃ পরিচয় ও কি পড়ি, তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়া থাকিবেন। হঠাৎ তিনি তক্তাপোষের উপর হইতে নামিয়া আসিয়া সস্নেহে আমার কাঁধে হাত দিয়া কানের নিকট মুখ রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দীক্ষা নিবি?" আমি তখন একেবারে ছোট নই। ধর্ম্মপুস্তক কিছু কিছু পড়িয়াছি। বয়স ১৫ হইতে ১৬র ভিতর। সুতরাং এই প্রশ্নের অর্থ বুঝিতে পারিলেও, ইহা অপ্রত্যাশিত বলিয়া একটু চমৎকৃত হইয়াছিলাম। আমি সামনের দিকে মাথা ঝাঁকাইয়া উত্তর করিলাম, —"আচ্ছা"। আমাদের উভয়েরই খালি গা এবং উভয়েই দাঁড়াইয়া। তিনি আমার নিকট ঘেঁসিয়া আসিয়া কানে মৃদুস্বরে একটি মন্ত্র বলিলেন ও আমার বুঝিবার জন্য দুই তিনবার উচ্চারণ করিলেন। যখন দেখিলেন বুঝিতে পারিয়াছি, তখন বলিলেন, "আজ পূর্ণিমা, বেশ ভাল তিথি—ভালই হল।" এই বলিয়া জলপাত্র হইতে গঙ্গাজল লইয়া নিজে একটু পান করিলেন, আমার মুখেও কিছু ঢালিয়া দিলেন এবং পরে বলিলেন, "দীক্ষা নিলি, দক্ষিণা দিবিনে।" আমি একটু অপ্রস্তুত হইলাম। পরক্ষণেই স্মরণ হইল, আমার নিকট একটা সিকি আছে, তাহাই দিতে চাহিলাম। তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, "থাক্ থাক্, তোর দিতে হবে না, তুই রেখে দে।" আমি পুনরায় তাঁহাকে প্রণাম করিলাম, তিনি মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন ও বলিলেন, "আবার আসিস্।" ২।৩টার সময় আবার আশ্রমে গেলাম। তিনি শুইয়া ছিলেন, আমার শব্দ শুনিয়া তিনি চোখ মেলিয়া আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "আয়"। আমি যাইয়া প্রণাম করিলাম ও তিনি মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং আমাকে বলিলেন, "একটু টিপে দে দেখিনি।" আমি মেজের উপর হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পা টিপিবার মনে করিতেছি, এমন সময় তিনি আমাকে টানিয়া একেবারে উপরে বসাইয়া দিলেন। আমি মৃদু আপত্তি করিলাম এবং বলিলাম, "আমার পায়ে ধূলা আছে।" কিন্তু তিনি শুনিলেন না। আমি পদ-সেবা করিতে লাগিলাম, তিনি বলিতে লাগিলেন, "দ্যাখ্, আর কারু থেকে মন্ত্র নিবিনে।

আমি যা দিয়েছি সেই তোর মন্ত্র, আর গুরু করবিনি, আমিই তোর গুরু। যে মন্ত্র দিয়েছি, তাই সকালে সন্ধ্যায় একটু একটু জপ করবি। আর দ্যাখ্, এই মন্ত্র কারুর কাছে বল্‌বিনি, বল্‌লে কিন্তু ফল হবে না।" এমন সময়ে অন্য লোক ঘরের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহার কথা বন্ধ হইল।

পরদিন সকালবেলা ৮।৯ টার সময়ে আশ্রমে উপস্থিত হইয়াই দেখি, তিনি পায়খানায় চলিয়াছেন। পায়খানাটি আশ্রম হইতে প্রায় ৫০।৬০ গজ দূরে ছিল। আমাকে দেখিয়াই তিনি সঙ্গে যাইতে বলিলেন। আমি গাড়ু লইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলাম। তিনি বলিলেন, "দ্যাখ্, যা দিয়েছি, ওতেই তোর সব হবে।" আমি বলিলাম, "এতে আমার ঈশ্বর লাভ হবে তো?' তিনি জোরের সহিত বলিলেন, "নিশ্চয়ই হ'বে।" পরে বলিতে লাগিলেন, "জপ করিস তো? বেশ বেশ, সকালে উঠে একটু জপ করে তারপর পড়্‌তে বস্‌বি। আর দ্যাখ্, মেয়েমানষের মুখের দিকে কক্‌খনো তাকাবিনে।" পায়খানা হইতে ফিরিয়া ঘরে আসিয়া তক্তাপোষে তিনিও বসিলেন এবং আমাকেও বসাইলেন। আমি পদসেবা করিতে লাগিলাম আর তিনি বলিতে লাগিলেন, "এখন তো তুই আমার 'পোলা' হলি, আমাকে খাওয়াতে হবে কিন্তু। এখন ভাল করে পরীক্ষা দে—স্কলারশিপ পেয়ে পাশ কর। পরে চাকুরী ক'রে আমাকে খাওয়াতে হবে।" আমিও হাসিতে হাসিতে তাঁহার কথায় সায় দিতে লাগিলাম। এইরূপ মিষ্টি মিষ্টি কত কথা হইতে লাগিল।

এই স্থানে তিনি স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে বহু লোককে দীক্ষা দিয়াছিলেন। একদিন আশ্রম-প্রাঙ্গণে সহস্র সহস্র লোকের সমক্ষে "শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ ও সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়" সম্বন্ধে মিনিট দশেক বক্তৃতাও দিয়াছিলেন। প্রায় প্রতিদিনই সন্ধ্যারতির পরে তাঁহার ঘরে স্থানীয় ভদ্রলোকগণ সমবেত হইয়া তাঁহাকে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা, তাঁহার সাধন-কালের কথা ও সংসারে থাকিয়া ঈশ্বর লাভের উপায় সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। তাঁহার নিজ জীবন সম্বন্ধে প্রশ্ন প্রায়ই এড়াইয়া যাইতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা উঠিলেই উৎসাহিত হইতেন। ঈশ্বর লাভের উপায় সম্বন্ধে প্রায়ই বলিয়াছেন, "ভগবানের কৃপা ছাড়া আর কোন উপায় নেই, সুতরাং তাঁর নাম করা. তাঁর কাছে আন্তরিক প্রার্থনা এই সব করতে হবে।"

এখানে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা না বলিয়া তৃপ্তি পাইতেছি না। আমাকে যে তিনি অহেতুক কৃপা করিয়াছিলেন, তাহা আমি গোপন রাখিতে পারি নাই। বন্ধুরূপী শ্রদ্ধেয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ঐ কথা গর্ব্বসহকারে বলিয়াছিলাম। ইনি আমাকে ও আমার নিম্ন শ্রেণীর একটি বালককে খুব ভালবাসিতেন। এই বালকটি অত্যন্ত নম্র, সেবাপরায়ণ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। এই সমস্ত গুণের জন্য সে তখনকার ছাত্রগণের আদর্শস্থানীয় ছিল। শিক্ষক মহাশয় আমাদের দুইজনের আধ্যাত্মিক কল্যাণের দিকে সর্ব্বদাই লক্ষ্য রাখিতেন, তাই আমার সৌভাগ্যের কথা জানিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "Well boy, I do envy you" তাঁহার ইচ্ছা ছিল সেই বালকটিও ঐরূপে দীক্ষিত হয়। যাহা হউক, খুব সম্ভব তাঁহার এই ইচ্ছা বালকটির মধ্যে সংক্রমিত হয়। কিন্তু তখন সময় ছিল না। তাই যেদিন খোকা মহারাজ আমাদের গ্রাম হইতে চলিয়া যান, সেদিন বালকটি তাঁহার পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে বহুদূর পর্য্যন্ত দৌড়া-ইয়া গিয়াছিল। শুষ্কমুখ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এই বালকটিকে ঐরূপে পাল্কীর সঙ্গে দৌড়াইতে দেখিয়া খোকা মহারাজের দয়া হইল। তিনি পাল্কী থামাইয়া বালকটিকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেই সে

তাঁহার পায়ের উপর পড়িয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মহাপুরুষ সমস্তই বুঝিলেন। তাহাকে সস্নেহে উঠাইয়া তাহার আধ্যাত্মিক জীবনের যাহা প্রয়োজন সমস্ত উপদেশ দিয়া বিদায় দিলেন। কয়েক বৎসর হয় শিক্ষক মহাশয় অকস্মাৎ দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইনি আজীবন ব্রহ্মচারী ও সংযত চিত্ত ছিলেন। ইঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্র এখনও চোখের উপর ভাসিতেছে।

স্বপ্নের মত খোকা মহারাজ আমার জীবনে আসিয়াছিলেন, আবার স্বপ্নের মতই চলিয়া গেলেন। তিনি চলিয়া গেলে আমি প্রায় সমস্ত ভুলিয়া গেলাম। পূর্ব্বে যেরূপ ছিলাম সেইরূপই রহিয়া গেলাম। জপ করিতাম না বলিয়াই মনে হয়। তাই প্রবেশিকা পরীক্ষার পর অখণ্ড অবসরের মধ্যে যখন ঢাকায় ঘুরিতে ফিরিতে ছিলাম, তখন একদিন চমক লাগিল তাঁহাকে হঠাৎ ঢাকায় দেখিয়া। সেদিন কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে ঢাকায় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ দেখিতে গিয়াছিলাম। তিনি একান্তে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সতু, জপ করিস্ তো।" আমি কি বলিব? নীরবে "হুঁ" বলিলাম। সঙ্গীয় বন্ধুগণ পাছে জানিয়া ফেলে এই ভয়ে সেদিন তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিলাম। পরের দিন পুনরায় একাকী মঠে যাইয়া তাঁহার বিছানার উপর বসিয়া পদসেবা করিতে লাগিলাম। তিনি বলিলেন, "তুই-ত এবার ম্যাট্রিক্ দিলি। বৃত্তি পেলে বেশ ভাল হয় না? চাকুরী করে আমাকে খাওয়াবি ত? লোকে আমায় খোকা বলে, তুই কি তাই বলিস? না তুই বুড়ো খোকা বলিস্?" পরক্ষণেই অনুচ্চ স্বরে বলিলেন, "ছাখ্, আমিই তোর গুরু। এতেই তোর সব হবে।"

পূজনীয় খোকা মহারাজকে তৃতীয়বার দর্শন করি বেলুড় মঠে। তখন কলিকাতায় হোষ্টেলে থাকিয়া আই-এ পড়ি। সন ইংরাজী ১৯২৫। নূতন কলিকাতায় আসিয়াছি, কলেজ তখনও খোলে নাই; দ্রষ্টব্য নানা জিনিষ দেখিয়া বেড়াইতেছি। এইরূপে মিউজিয়ম, চিড়িয়াখানা, কালীঘাট, গড়ের মাঠ, মনুমেণ্ট ও ইডেন গার্ডেন দেখা হইল। সহপাঠিদের প্রস্তাব হইল বেলুড় মঠ ও দক্ষিণেশ্বর দেখিতে হইবে। সদলবলে ষ্টীমারে বেলুড় মঠে আসিয়া বেলা দুইটার সময়ে উপস্থিত হইলাম। গেষ্ট হাউস, ডাক্তারখানা, স্বামীজির মন্দির, মার মন্দির, মহারাজের মন্দির ইত্যাদি দর্শন করিতে করিতে আমাদের সময় কাটিতে লাগিল। শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করিয়া আমরা সামান্য প্রসাদ পাইলাম। তখন আমাদের মধ্যে কেহ প্রস্তাব করিল, 'চল মঠের প্রেসিডেণ্ট মহাপুরুষজীকে দেখে আসি।' আমরা জনৈক স্বামীজিকে আমাদের অভিপ্রায় বলিলাম। তিনি আমাদের মহাপুরুষজীর ঘরে পৌঁছাইয়া দিলেন। আমরা সকলেই একে একে প্রণাম করিয়া মেজেতে বসিলাম। শুনিয়াছিলাম ইনি অত্যন্ত গম্ভীর। দেখিয়া সেরূপ মনে হইল না। তথাপি তাঁহার মুখের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে, যাহাতে সহজে ও ইতস্ততঃ না করিয়া তাঁহার কাছে যাওয়া ও খোলাখুলি আলাপ করা চলে না। আমরা নিঃশব্দে বসিয়া রহিলাম। মনে করিয়া ছিলাম, ইনি হয়তো আমাদের কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, কিন্তু ৫।৭ মিনিটের মধ্যেও কিছুই বলিলেন না। কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া আমরা উস্ খুস্ করিতে লাগিলাম। তখন তিনি বলিলেন, "ব্যস্, এইবার তোমরা যাও, আর ঘর গরম করে লাভ কি।" আমরা লজ্জিত হইয়া পুনরায় প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম। এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, এমন সময়ে একজন স্বামীজি আসিয়া আমাদিগকে বলিলেন, "সতু কে?" আমি বলিলাম, "আমার নাম।" "তবে চল, তোমাকে

খোকা মহারাজ ডেকেছেন।" আমরা সকলেই খোকা মহারাজকে দর্শন করিতে চলিলাম। আমি একটু আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম এই ভাবিয়া—তিনি জানিলেন কি করিয়া যে আমি এখানে আসিয়াছি। আমি অবশ্য খোঁজ লইয়া জানিয়াছিলাম যে, তিনি বেলুড় মঠেই আছেন কিন্তু কোন্ ঘরে থাকেন তাহা জানিতাম না, কাজেই তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে পারি নাই। ঘরে গিয়া দেখিলাম, আমাদের সু বাবু তাঁহার পদসেবা করিতেছেন। তখন বুঝিলাম, সু বাবু বলিয়া দিয়াছেন যে আমি এখানে আসিয়াছি। আমরা সকলেই একে একে প্রণাম করিয়া মেঝেতে বসিলাম। তিনি আমাকে বাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তাঁহার মাথার নিকট বসিয়া হাওয়া করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পর অন্যান্য ছেলেরা উঠিয়া তাঁহাকে পুনরায় প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। তিনি আমাকে আর একদিন সকালে আসিতে বলিলেন। আমিও বিদায়গ্রহণ করিলাম।

খুব সম্ভব তার পরের দিনই আমি আবার একাকী বেলুড় মঠে গেলাম। বেলা ৭টা হইবে। সোজাসুজি পূজনীয় খোকা মহারাজের ঘরে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। প্রণাম করিয়া তাঁহার পদসেবা করিতে লাগিলাম। নানা * কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। একটা কথা মনে আছে। তিনি বলিয়াছিলেন, "এখন ত আমার 'পোলা' হলি (আমি পূর্ব্ববঙ্গীয় বলিয়া তিনি আমার সহিত পূর্ব্ববঙ্গীয় কথ্যভাষাতেই প্রায় কথাবার্ত্তা বলিতেন), আর চিন্তা কি? আমিও চলিলাম, আর তুইও চল্লি। তবে আমি কিছুদিন আগে আর তুই কিছুদিন পরে।" ইতোমধ্যে ঘোলের ঘণ্টা পড়িল। তিনি বলিলেন, "চল, ঘোল খেয়ে আসি।" এই বলিয়া আমাকে লইয়া রান্নাঘরের বারান্দায় আসিলেন। তিনি একটু ঘোল খাইয়া অধিকাংশই আমাকে দিলেন। আমিও সন্তুষ্টচিত্তে প্রসাদ পাইতে লাগিলাম। তাহারপর মুড়ির টিন হইতে মুড়ি লইয়া উপরে তাঁহার ঘরে যাইয়া আমাকে মুড়ি প্রসাদ দিলেন। দ্বিপ্রহরে আমরা এক স্থানেই প্রসাদ পাইতে বসিয়াছিলাম। তিনি ভাল জিনিষ হইলেই আমার পাতে উঠাইয়া দিতে লাগিলেন। জনৈক স্বামীজি আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে পরিচয় দিয়া বলিলেন, "ছেলেটি বড় ভাল।" ইহা শুনিয়া আমার বুক ফুলিয়া উঠিল। বৈকালে ফিরিয়া আসিবার সময়ে তিনি আমাকে বুকে জড়াইয়া গভীর আলিঙ্গন করিলেন।

ইহার পর বি এ পড়া পর্য্যন্ত অনেক বারই মঠে গিয়াছি কিন্তু প্রায় কিছুই মনে নাই, কেবল একটা গভীর অনুভূতি আছে যে, খোকা মহারাজ আমাকে খুব ভালবাসিতেন। গেলেই বলিতেন, "ঠাকুরকে প্রণাম করেছিস্? যা, মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করে আয়।" আমি মঠে যাইয়া প্রায়ই তাঁহার ঘরে থাকিতাম, আর কোথাও যাইতাম না। সেজন্য অন্যান্য সাধু মহারাজগণ আমাকে মধুর উপহাস করিতেন। কখনও কখনও মঠে যাইয়া তাঁহাকে দেখিতাম না, তখন অনেকে বলিতেন, "আজ এসেছিস্ যে?" একদিন দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর সোজাসুজি তাঁহার ঘরে না গিয়া ভিজিটার্স রুমে বসিয়া গল্পসল্প করিতেছিলাম। তিনি জনৈক সাধুকে আমার খোঁজ করিতে পাঠাইয়াছিলেন। আমি তাঁহার ঘরে গেলে অনুযোগ করিয়া বলিয়াছিলেন, "এই ত্যাথ্, তুই কোথায় ছিলি, আর আমি ঘুমাতে পারছি না।" আমি লজ্জিত হইয়া পদসেবায় নিযুক্ত হইলাম। আরও দুইএকদিন ঐরূপ ঘটনা হওয়ায় তিনি যে মৃদু অনুযোগ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে বুঝিয়াছিলাম যে, আমি মঠে গিয়া কুড়েমি করিয়া অথবা গল্প করিয়া সময় কাটাই ইহা তাঁহার অভিপ্রায় নহে। একদিন তিনি স্পষ্টাক্ষরে

বলিয়াছিলেন, "মঠে এসে আর কোথাও যাস্ নি, সোজাসুজি এ ঘরে চলে আসবি।"

আমার যে সমস্ত কথাবার্ত্তা স্মরণ আছে তাহার অনেক কথা আমি বাদ দিয়া যাইতেছি। সমস্ত কথা বলিবারও নয়। যাহা বলিতেছি, তাহা দ্বারা যদি দেখাইতে পারি যে, তিনি কেমন নিঃস্বার্থ ভাবে আমাদের আধ্যাত্মিক কল্যাণকামনা করিতেন, তাহা হইলেই ইহা সার্থক হইবে। পাঠকগণ দয়া করিয়া এই লেখা হইতে লেখককে বাদ দিয়া কেবল মাত্র এই মহাপুরুষের কার্য্যকলাপের এই দিক্‌টিই লক্ষ্য করিলে আমার উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।

সাহিত্যে করুণ-রস

অধ্যাপক শ্রীনগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, এম্-এ

ভারতের আদিকাব্যের প্রেরণা এসেছিল বিরহিণী ক্রৌঞ্চবধূর করুণ বিলাপের মধ্য দিয়া—এই বিলাপই চঞ্চল ক'রে তুলেছিল ঋষি হৃদয় কল্পনার কল্পলোকে আর প্রকাশ করে'ছিল আপনাকে জগতের অজেয় কাব্যসম্পদে। তাই রামায়ণের আদিতে উৎসারিত হয়েছে যে করুণার ধারা, তাহা শুষ্ক হয়ে' যায় নাই দীর্ঘকালের ঘাত প্রতিঘাতে; সে আপন সত্তাকে বিকসিত করে' তুলেছে সহজ আনন্দ ও ভাবের গভীরতায়, সার্থক হয়েছে আপন রূপের আভায় সমাপ্তির সীমারেখায়। সে আজও অন্তস্তলকে করে' তোলে চঞ্চল; কিন্তু রামায়ণের পরে এই 'মানস-কুমারের' সাক্ষাৎ মেলা বড়ই দুষ্কর—এ যেন পলাতকা বন্দীর নিরুদ্দেশ যাত্রা। এমন কি নিয়মের শিকলে বেঁধে কাব্যের যজ্ঞভূমিতে 'করুণের' প্রবেশ-পত্রিকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে পরবর্ত্তী যুগে—এমন 'করুণ' দৃশ্যের অভিনয় সত্যিই দুঃসহ। যাকে আশ্রয় করে' জন্ম নিল এমন কাব্যসম্পদ, তার অকালে স্বর্গারোহণের মূলে কি কোনও সত্যই নিহিত নেই?

রামায়ণের মত 'করুণ-কাব্য' জাতীয় জীবনে নীতির পরিমাপে উন্নতির রসদ যুগিয়েছে অনেকই সত্য, কিন্তু ভারতের আকাশে, বাতাসে তথা তার জল ধারায় মিশ্রিত আছে এমন একটী উপাদান, ভারতবাসীর জীবনে বিক্ষিপ্ত আছে এমন একটী কোমলতা ও ভাব প্রবণতা, যাতে করে' পাঠক ও দর্শকের মনে "করুণ-কাব্য" রেখে যায় একটী দুঃসহ দুঃখানুভূতির গভীরতা। এমন কি এই অনুভূতির প্রভাবে তার গৃহ-জীবনেও দেখা দিতে পারে দুঃখের জঞ্জাল, কারণ আমাদের মনে বিয়োগ-ব্যথাটী অনভ্যাসের ফলে দীর্ঘকালের সুখ-শান্তির আরামে দেখা দেয় একটী অভিশাপের মত। তাই পাঠক যাতে পায় না তৃপ্তির আভাস, যাতে তার মনে জাগে না শান্তির পুলক—সে কাব্য-রচনা সার্থক হয় না কোনও কালে কোনও দেশে (আপরিতোষাৎ বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্)। এই ধারণার মূলেই নিহিত আছে ভারতের বিয়োগান্ত কাব্য বা নাটকের অভাব। পাঠকের মনেও সন্দেহ জেগেছিল যে, "করুণ-কাব্য"—যার মূল-সূত্র মানুষের

দুঃখ বর্ণনা, তাতে আবার রসের বিকাশ ঘটে কেমন করিয়া—আর যদি রস বা আনন্দেরই অনুভূতি না জাগে কোনও রূপে, কি উদ্দেশ্য সেই কাব্য বা নাট্য রচনায়? শুধু কি কথার মালা বা ভাবের খেলাতেই এর শেষ প্রয়োজন? যদি বা তাহাই সত্য হয়, তবে রসের গণ্ডীতে 'করুণের' স্থান কেবল অনধিকার প্রবেশমাত্র। সাহিত্যে দুঃখকর কাহিনী কেন আনন্দ দেয় এবং কেন তাকে সৌন্দর্যের কোঠায় গণ্য করি—এ সমস্যা বড়ই বিস্ময়ের বিষয়।

জগতে জীবনের প্রত্যেক ব্যাপারের মধ্যে তার বস্তু-সত্তার ঊর্দ্ধে বিরাজ করে একটী ভাবসত্তা। এই ভাবসত্তা যদি রূপায়িত হয়ে ওঠে রসিক শিল্পীর প্রকাশ ভঙ্গীতে, তবেই তার পরিণতি ঘটে রস রূপে; বহির্জগৎ ও বহির্জীবনের বস্তুসত্তা বিচিত্র হ'য়ে ওঠে, রঙীন হ'য়ে ওঠে অন্তরের ভাবসত্তার যোগে; অন্তরের ভাবরসে রসায়িত হয় নিবিড়ভাবে বাইরের বস্তুসম্ভার। তাই রসানুভূতির আনন্দে মানুষের নিজের শোক-হর্ষ বা সুখ-দুঃখকে যদি সে দেখতে পায় বিশ্ব-প্রাণের মর্মতলে রেখায়িত, তবেই সে তার নিজের কর্ম ও চেষ্টাকে মনে করে সার্থক। এই যে সসীম আত্মশক্তির সহিত ঐক্যের যোগসঞ্চারে বিশ্ব শক্তির অবাধ আনন্দ মিলন, ক্ষুদ্র খণ্ডিত জলবিন্দুকে অতলসিন্ধুর অখণ্ড জলরাশিতে বিলীন করে' দেওয়া—একেই বলি সাহিত্য। এই সাহিত্যের মধ্যে সুরে, শব্দে, পটে, দৃশ্যে, গন্ধে ও গানে সবাই অতীতের কোলে মিলিয়ে যাওয়া অনুভূতিগুলিকেও রাখতে চায় আপন করে'; মমত্ববোধে ভুলে' যায় সে অনুভূতির স্বরূপ; ভুলে যায় এই অনুভূতি তাকে বাস্তবের ক্ষেত্রে সুখের বা দুঃখের পথে কতটা এগিয়ে দিয়েছিল। তাই কল্পলোকে কাব্য, চিত্র, নৃত্য গীতের পরিসরে যখনই সে ফিরে পায় তার হারানো সম্পদ্, তখনই তার অন্তর্লোক পুলকিত হ'য়ে ওঠে আনন্দের উচ্ছ্বাসে; যে সুপ্ত অনুভূতির চিহ্ন শুধুমাত্র ছিল তার অন্তরের গুপ্তধন, আজ সে দেখা দিল নূতনের বেশে; অবচেতনের চেতনায় ভরে' গেল চিত্ত আর উৎফুল্ল হোল মনের পাঁপড়ি-গুলি। তাই সুখের চিত্রই হোক আর দুঃখের চিত্রই হোক তাকে সমানভাবে করে' তোলে মহান্, পুলকিত ও বিভাবিত; সে তখন চিত্ত প্রাসাদে আপন ঐশ্বর্যে বিরাজ করে বিজয়-গৌরবের সিংহাসনে। এই অনুভূতি, এই চিত্তের স্বতো-বিকাশ যে তার বড়ই আপন—এইক্ষণে সে চরম দুঃখের আঘাতে নিজের ব্যক্তির বিলয়ে সন্ধান পায় একটী বিপুল জীবনের, তাতেই তার পরম আনন্দ। সে জানে সুখে হোক, দুঃখে হোক, জীবনের বিপুলতাই সন্ধানের বস্তু, অল্পে তার সুখ নাই।

সৃষ্টির আদিম কাল থেকে আজ অবধি মানুষ অতিক্রম করে আসছে প্রতিদিন একটী কণ্টকময় দুর্গম যাত্রা-পথ; দুঃখ তার জীবনে একটী করুণ কঠোর সত্য। তাই অপরের দুঃখের সহিত আমার দুঃখের একটা যোগ রয়েছে—অপরের জীবনে এই দুঃখের অরূপ-পদ্ম যখন ধীরে ধীরে ব্যাপ্ত করে' দেয় আপন রূপের আভা, যখন আমার জীবনের পুঞ্জিত দুঃখকে মিলিয়ে দিতে পারি বিশ্বের সকল দুঃখের সঙ্গে, তখন আমার চিত্তও যেন আনমনায় হ'য়ে ওঠে চঞ্চল, আমার দুঃখের বিরাম ঘটে কিছুটা। এই যে বিরাম বা সান্ত্বনা, এতে বুদ্ধি-বৃত্তির যোগের চেয়ে হৃদয়বৃত্তির যোগই রয়েছে বেশী। শ্রেয়োবুদ্ধির চেয়ে প্রেয়োবাসনাই প্রবল। সেই 'বাসনায়', সেই হৃদয়তলে কোথায় যেন মানব-জীবনে অবরুদ্ধ হ'য়ে আছে অনন্ত দুঃখের অশ্রু-উৎস। তাই দুঃখ সঙ্গীত এমন করে' জাগিয়ে তোলে মানুষের গভীর চেতনাকে—ফুটিয়ে তোলে তার চিত্ত-মুকুল। এই চেতনার উদ্বোধন তথা গলিত চিত্ত বা অন্তর্লোকের ব্যাপ্তরূপই রসোপলব্ধির চরম সোপান। মধুর আনন্দ, যাকে বলি রসের নামান্তর, সে যে চিত্তেরই একটী ভাবান্তর,

চিত্তেরই গলিত অবস্থা। তাই গেয়েছেন বৈষ্ণব কবি—

"নামে পাষাণ গলিত হোল, সখি!
মন-পাষাণ ক্যান্ গলে না।
ভাবের সাগরে সখি! ডুব দিলাম না॥"

এই যে অন্তস্তলকে ব্যথিত করে তোলা, অসাড় মনে একটা সাড়া জাগিয়ে দেওয়া, এর গুরুত্ব অনুভব করি ততবেশী, যতবেশী অগ্রসর হই আমরা করুণ-রসাত্মক কাব্যের পরিসমাপ্তির দিকে। এই করুণ রস আপনাকে ব্যাপ্ত করে' দেয় নিবিড়ভাবে আমাদের চিত্ত-ক্ষেত্রে; আর অশ্রু-ধারায় পুষ্ট হ'য়ে ওঠে তুষ্টির লতিকা। এ ধারা অপর রস-গণ্ডীতে ততটা উৎসারিত হয় না, যতটা হয় এই করুণ রসে। তাই দুঃখের কাব্য ও নাটক আমরা যতটা সুখে পাঠ করি, হাল্কা হাসির মধ্যে তেমনতর আনন্দ পাই না, যে হাসির অন্তরে অনুভব করি না একটী অন্তঃসলিলা অশ্রুর প্রবাহ, সে হাসির মূল্য খুবই সামান্য—কারণ সে হাসি অন্তরের তলদেশ স্পর্শ করে না, তাতে আমাদের চিত্তের বিকাশ ঘটে না, মাধুর্যের উদ্রেক হয় না।

মানুষের চিত্ত যেন এক অখণ্ড স্থির জলরাশি। এর মাঝে লুকিয়ে আছে নানা-ধরণের জীব-জন্তু এক একটী ভাব ধারণ করে'—এদের মাঝে কোনটাতে যদি ঘটিয়ে তোলে একটু চঞ্চলতা, তবেই জলরাশি উপলব্ধি করতে পারে তার আপন সত্তা। তেমনি চিত্ত-সাগরে দুঃখের আলোড়ন জাগিয়ে তোলে চঞ্চলতা, চির-সুখের আত্ম-বিস্মৃতির সমতটে জাগ্রত হয়, মূর্ত হয় দুঃখের গৌরব। দুঃখ-বোধ, বেদনা বোধ, কি-যেন নাই-বোধ আমাদের আত্মোপলব্ধির অভাব-বোধকে অসীম করে' আত্ম বোধের পরোক্ষানুভূতি দিয়ে থাকে। এই আত্মোপলব্ধিতেই আনন্দ আর আত্ম-বোধের অভাবই দুঃখ। দুঃখের মধ্যেও আনন্দের নীরব অভিসার অসম্ভব নয়; কারণ 'করুণ-কাব্য' আমাদের প্রাণে জাগিয়ে তোলে একটী অস্তিত্বের ভাব। নাস্তিত্বেই দুঃখ—এই অস্তিত্ব বুঝিয়ে দেয় 'আমি আছি'। কাব্য নাটকে দুঃখের অভিনয়ে নাটকের রচনা-কৌশলে আমাদের অন্তরে রেখাপাত করে নিত্যকালের দুঃখের স্পর্শ। সে যেন আমাদের অন্তরকোণে মণি দীপ জ্বালিয়ে দিয়ে বলে 'তুমি আছ, তুমি আছ, তুমি বিচ্ছিন্ন নও—মহাকালের যোগসূত্রে তুমি সার্থক, তুমি প্রাণবান্, তুমি জীবন্ত।'

এই যে রচনা-কৌশল, একেই পুরনো সমালোচকরা বলেছেন "অলৌকিক বিভাবনা।" এটা অলৌকিক, কারণ সাধারণ সুখ দুঃখ মানুষের মনকে সুখ দুঃখেই রাঙিয়ে তোলে, কাঁদিয়ে দেয়; কিন্তু কাব্যে এবং নাট্যে এই কারণই রচনার বলে পাঠক ও দর্শকের মনে এমন একটী আবেষ্টনী সৃষ্টি করে' তোলে, যাতে করে' আমাদের চিত্তলোকে আমরা দুঃখের মাঝেও সুখের সুষমা ও সৌন্দর্য ভোগ করে' থাকি। এই সত্যকেই রসবিদ্ Aristotle বলেছেন কাব্য এবং নাটকের unity বা সামঞ্জস্য। এম্নি করে' করুণ চিত্র বা দুঃখের মুহূর্তও ইংগিত করে সেই কল্পপুরীর। এমন কি যে সব ঘটনা বাস্তব জীবনে সত্যিই দুঃখের ইতিহাস, তারাই ভাবরাজ্যে বহন করে' নিয়ে আসে অপূর্ব সৌন্দর্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার। দুঃখ-রাত্রির ঘন অন্ধকার যে দিনের আলোর মত দীপ্ত হয়ে ওঠে, তাহা নয়, কিন্তু সেই অন্ধকারে এমন একটী বস্তুর সংযোগ ঘটে, যাতে দুঃখের তীব্রতাই নিজেকে পরিবর্তিত করে' দেয়, রূপায়িত করে' তোলে মাধুর্যের কোমলতায়। 'করুণ কাব্য' আমাদের দুঃখ দেয় সত্য, কিন্তু নবাগত দুঃখের অভ্যর্থনায় ডুবিয়ে দেয় আপনার রূপ পূর্বসঞ্চিত দুঃখরাশি, মিলিয়ে যায় সকল ব্যথা, অন্তরেতে বরণ করে' তুলে নেই আমাদের 'দুঃখ-রাতের রাজাকে' সাদর সম্ভাষণে।

এম্নি ভাবে 'করুণ কাব্য' যদি আনন্দেরই সন্ধান

দেয় আমাদের অন্তর্লোকে, তবে করুণ দৃশ্য বা চিত্র দর্শনে আমাদের কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে আসে কেন, আমাদের চোখের পাতা অমন করে অশ্রু-সিক্ত হ'য়ে ওঠে কেন? অশ্রু বিসর্জন সত্যিই দুঃখের পরিচয়-লিপি বহন করে' বেড়ায়, কিন্তু দুঃখেরও একটা আপন অভিব্যক্তি আছে যেখানে সে আপন মনে হাসি কান্না দুয়ের মধ্য দিয়েই আত্ম প্রকাশ করে' থাকে। বৈষ্ণব কবিরা এই সারসত্য জান্তে পেরেই বলেছিলেন—"দুঃখের ব্যথায় যদিই বা জ্বলে আগুন, সেই আগুনই আলোক দেয় সকলকে আর দূর করে তমোরাশি।" এই আগুনের বাণী-রূপই নাম ধরেছে সাহিত্য ও গান। তাই ভক্ত-কবি জ্ঞানদাস বলেন, "অন্তরের ব্যথা যখন বাজে সুরে, তখনই তো গান হয় পরিপূর্ণ" (মলাল জবহী সুরসে বাজৈ তবহী পূরা গানা)।

তাই দেখি 'করুণ-কাব্যে' মানুষ আত্মোপলব্ধির অবকাশে আপন অনুভূতিকে এমন আপন করে' নিবিড় করে' ভাব্তে পারে বলেই তার আনন্দ সম্ভবে। সে ক্ষণিকের তরে নাস্তিত্বের গণ্ডী ছাড়িয়ে অস্তিত্বের মাঝে আপনাকে বিশ্ব-লোকে মিলিয়ে দিতে পারে, তাই তার এত সুখ, এত আনন্দ।

বিরাটের অবিষ্কার—বিজ্ঞানে ও ধর্ম্মে

ব্রহ্মচারী বীরেশ্বর চৈতন্য

সৃষ্টি যে কত বিরাট্, তাহা নির্ণীত হইবার সূত্রপাত বোধ হয় তখনই হইল, যখন মানুষ নীচে হইতে উপরে তাকাইয়া আকাশে সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণে মন দিল। সভ্যতার তখনও মাত্র প্রথম ঊষাকাল। মানুষের বিকাশোন্মুখ জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তি দশদিকের সকল কুয়াসার আবরণকে ভেদ করিবার জন্য অধীর হইয়াছে বটে—কিন্তু বিস্ময়, ভয় ও জড়তার আমেজ তাহাকে রীতিমত অগ্রসর হইতে দিতেছে না। স্বাধীন, স্বতন্ত্রভাবে যদি কিছু সে আবিষ্কার করিতেছে, শত শত অসংবদ্ধ কোমল কল্পনা আসিয়া উহাকে তিমিরাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। সত্যের যথাযথ রুদ্ররূপকে সহ্য করিবার মত সাহস ও দৃঢ়তা মানুষের মন তখনও লাভ করে নাই।

নানা রূপক ও কিম্ভুত কিমাকার উপকথার জঞ্জাল সরাইয়া মানুষের এই আদিম জ্যোতির্বিদ্যার নিছক বৈজ্ঞানিক সত্যটুকুর মূল্য নিরূপণ করা তাই অনেক সময় সম্ভবপর হইয়া উঠে না। কিন্তু তবুও উহা অবহেলাস্পদ নয়। ঋগ্বেদে, পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক সমূহে[১] প্রাচীন মিশরের প্যাপাইরাস্ পুঁথিতে প্রাচীন ব্যাবিলন-আসিরিয়া চেল্ডিয়ার শিলা ও মৃত্তিকাফলকে[২] আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ তাঁহাদের আকাশ-পর্য্যবেক্ষণের যে সব পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন উহাদের অনেকগুলিই এখনও এই বিংশশতাব্দীর বিজ্ঞানের রুদ্র প্রখর তেজ অনায়াসে সহ্য করিয়া বাঁচিয়া আছে।

১ Cultural Heritage of India, Vol III, p 341-346, 380-384

২ A Short History of Science--Sedgwick, Chap. I.

তখন মানুষের স্বাভাবিক বীক্ষণশক্তিকে সংবর্দ্ধিত করিবে এমন কোনও যন্ত্র ছিল না, গ্রহ-নক্ষত্রের চলাচলের হিসাব নির্ণয়ে সহায়তা করিবে এমন উন্নত গণিতশাস্ত্রও আবিষ্কৃত হয় নাই। তাহার উপর নিঃস্বার্থভাবে জ্ঞানের অনুশীলনরূপ আদর্শটীও বোধ করি খুব অপরিপুষ্ট অবস্থায় ছিল। কাজেই উপরের জ্যোতিষ্কজগতের সহিত জীবনের অতি প্রয়োজনীয় কতকগুলি ব্যবহার, যথা—ঋতুর পরিবর্ত্তনে, মরু ও সাগরবক্ষে ভ্রমণ, দেবতার উপাসনার কালাকাল নির্ণয়, ভবিষ্যৎ ঘটনা নির্দ্দেশ অর্থাৎ জ্যোতিষ—এই সকলের যতটুকু ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, ততটুকু অন্বেষণ করিয়াই মানুষ আকাশ হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া আনিল। একটা অজ্ঞাত রহস্যের আবরণ পরিয়া বাহিরের বিরাট্ তাহার বিস্ময়ের বস্তু হইয়াই রহিল।

অবশ্য, ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, মাঝে মাঝে বিদ্রোহী প্রতিভা গতানুগতিক চিন্তাধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অজানার কবল হইতে সৃষ্টিকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। যেমন আমরা দেখিতে পাই প্রাচীন গ্রীসের দার্শনিকগণের শিক্ষার মধ্যে। কিন্তু ইঁহাদিগের অনুশীলন ধারার একটী বৃহৎ ত্রুটি ছিল এই যে, বস্তুতান্ত্রিক সত্য আবিষ্কার ইঁহারা শুধু কল্পনা দ্বারাই করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাই দর্শনশাস্ত্রে এই সকল বড় বড় মনীষীদিগের দান যে অমেয় একথা কেহ অস্বীকার না করিলেও, বিশ্বপ্রকৃতির বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহারা যে সকল তথ্য জানিবার ভান করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারা যে সত্যের সমস্যা অনেকক্ষেত্রে জটিলতর করিয়া তুলিয়াছিলেন তাহা নিশ্চিতই। আয়োনিয়ান্ দার্শনিকগণের অন্যতম আনক্সিমেনডরের (খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী) মতে সূর্য্য, চন্দ্র এবং নক্ষত্রসমূহ আকাশে কতকগুলি ফুটার মধ্য দিয়া জলমান্ অগ্নিশিখা মাত্র। চন্দ্র ছিদ্রটী দিনের পর দিন ধীরে ধীরে বুঁজিয়া যায়—পরে আবার ঐরূপ খুলিতে থাকে—ইহাই তাহার কলা রহস্য। আনাক্সিমেনিস, জেনোফেনিস্ ও হেরাক্লিটাস্ প্রভৃতি বিখ্যাত পণ্ডিতও জ্যোতিষ্কের স্বরূপ, আকৃতি ও দূরত্ব সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছিলেন। ঐ সকলে মৌলিকতাও ছিল যথেষ্ট, কিন্তু সেই মৌলিকতা বস্তুতান্ত্রিক সত্য হইতে অনেক দূরে। সকল পণ্ডিতের সম্বন্ধে অবশ্য একথা বলা চলে না। পিথাগোরাস্ খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীতে নক্ষত্রজগতের যে ছবি আঁকিয়াছিলেন এই বিংশশতাব্দীর মানমন্দিরে উন্নত যন্ত্রপাতির সাহায্যে যে চিত্র অনুভব করা যায়, তাহা উহারই সুমার্জ্জিত সংস্করণ মাত্র। আনাক্সাগোরাস্ সূর্য্য, চন্দ্র ও পৃথিবীর সম্বন্ধে যে সকল ধারণা দিয়াছিলেন, আমরা আজ যাহা জানি, তাহা তাহার অনেকটা কাছাকাছি বলিলে কেহ আপত্তি করিবে না। আলেকজান্দ্রিয়ার এরাটোস্থেনিস্ পৃথিবীর পরিধির যে হিসাব গণনা করিয়াছিলেন আধুনিকতম সংখ্যা হইতে উহাতে ভুল ছিল শতকরা ১ ভাগেরও কম। সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসা করিতে হয় সামো (Samos)র এরিষ্টারকাসকে (খৃঃ পূঃ ৩ ০ ২৩০)। তাঁহার সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী প্রভৃতির আকার এবং দূরত্ব নির্ণয়ের চেষ্টাকে অবৈজ্ঞানিক বলা চলে না। এই মহাপ্রতিভাবান্ গ্রীক মনীষীই প্রথম বলিতে সাহস করিয়াছিলেন যে, উর্দ্ধে পৃথিবী চন্দ্র প্রভৃতি দ্বারা পরিবেষ্টিত সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া যেমন একটী মণ্ডল, তেমনি অনন্ত তারাকে লইয়া অনন্ত নক্ষত্রমণ্ডল। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সীমাহীন—অনন্ত। কিন্তু তখনকার গ্রীক মন এই সত্যগ্রহণে প্রস্তুত ছিল না। পরবর্ত্তী গ্রীক চিন্তাধারার অন্যতম নায়ক এরিষ্টটল্ ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন। ফলে বিরাট্ তাঁহার স্বস্বরূপ চকিতে একবার দেখাইয়াই আবার মিথ্যা কল্পনার অন্ধকারে ডুব দিলেন—একেবারে প্রায় দু হাজার বৎসরের জন্য, যতদিন না পোলাণ্ডের

সন্ন্যাসী জ্যোতির্ব্বিদ্ কোপরনিকস্ ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি তাঁহাকে সেই অন্ধকার হইতে টানিয়া তুলিলেন।[১] জ্যোতির্বিদ্যার এই বিশাল তামস-যুগে মানুষ, এরিষ্টটল এবং পরে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর টোলেমিকে গুরু করিয়া চলিয়াছিল। টোলেমির সময় বিশ্বপাবন খৃষ্টধর্ম্ম দিকে দিকে আপন মহিমা বিস্তার করিতে সুরু করিয়াছে। ইহকালের পরকালের মানুষের সকল সমস্যা ভগবান্ চিরদিনের জন্য বাইবেলে মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। মানুষকে তিনি নিজের প্রতিবিম্বরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। 'সবার উপরে মানুষ সত্য'—সেই মানুষের আবাসস্থল পৃথিবীও তাই সকল স্থানের উপরে—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র। সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহনক্ষত্র যেখানে যত কিছু আছে, সকলি সৃষ্টির এই সর্ব্বোত্তম বিকাশ অচঞ্চল বসুন্ধরাকে বেড়িয়া ঘুরিতেছে। ধর্ম্মের উপদেশের সহিত অনুরঞ্জিত সংক্ষেপে ইহাই টোলেমির শিক্ষা। ভগবান্ এবং ভগবানের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি ধর্ম্মযাজকগণের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে কে? তাই মানুষ নির্ব্বিচারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এবম্বিধ রূপেরই ধ্যান করিয়া চলিল। কোপরনিকস্ও ভগবদ্ভক্ত পাদ্রী ছিলেন। কিন্তু তিনি হয়ত বিশ্বাস করিতেন, ভগবান্ সত্যস্বরূপ, সত্যের কোনপ্রকার অনুসন্ধানই তাঁহার বিপ্রিয় হইতে পারে না। তাই এই সন্ন্যাসী, ভগবানের সৃষ্টির প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে নিজের গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও মেধা-প্রসূত এক যুগবিপ্লবকারী মত প্রচার করিলেন। দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে পিথাগোরাস্ যাহা-সংক্ষেপে এবং তাহার কয়েক শতাব্দী পরে সামো নগরীর এরিষ্টারকাস্ বিশদ্ভাবে যাহা বলিয়া গিয়াছিলেন, বলবত্তর অকাট্য যুক্তি ও দৃঢ়তর সুস্পষ্ট প্রমাণসমূহের সহায়তায় ব্যক্ত হইয়া তাহা কোপারনিকীয় মতবাদরূপে জগৎসংসার সম্বন্ধে মানুষের এতদিনকার জমাট কুসংস্কার অনেকখানিই দূর করিয়া দিল। এই কুসংস্কার অবশ্য সম্পূর্ণভাবে কাটিতে আরও প্রায় এক শতাব্দী লাগিয়াছিল—যতদিন না সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে গ্যালিলিও চশমার কাচের পরিবর্দ্ধন, পরিবর্ত্তন ও পরিসজ্জা করিয়া দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

যুক্তি অপেক্ষা চোখের দেখা অনেক বেশী কার্য্য করে। চোখে দেখিলে আর কোন সংশয় থাকে না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পৃথিবী-কেন্দ্রিক কি না, গ্রহ উপগ্রহগুলির সূর্য্যের সহিত সম্বন্ধ কি, অগণিত নক্ষত্ররাশির রাজ্যে পৃথিবীর স্থান কতটুকু, এই সকল সমস্যার উত্তরে কোপরনিকস্ যে সকল যুক্তিসহ উত্তর দিয়াছিলেন, গ্যালিলিও তাঁহার যন্ত্রের সাহায্যে সেগুলির হাতে-কলমে মীমাংসা করিলেন। এই দুই মহামনীষী বিরাটের যে রূপ আবিষ্কার আরম্ভ করিয়া গিয়াছেন, এখন পর্য্যন্তও তাহা একটুও ঢাকা পড়ে নাই—উত্তরোত্তর ব্যক্ত হইতে ব্যক্ততর হইতে চলিয়াছে।

সপ্তদশ শতাব্দী হইতে বিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই তিন শত বৎসরে বিজ্ঞান বিরাটের যে সকল ধারণায় উপনীত হইয়াছে, তাহা বাস্তবিকই রোমাঞ্চকর। গ্যালিলিও সুখে মরিতে পারেন নাই—কেননা ধর্ম্ম-যাজকগণ তাঁহাকে জীবনব্যাপী এই দ্বন্দ্বে আহ্বান করিয়াছেন যে, পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরে, আকাশের দূর সীমায় পরিদৃষ্ট ছায়াপথ অগণিত নক্ষত্রপুঞ্জের সমষ্টি—এ সকল কথা যখন শাস্ত্রে নাই, তখন যে যন্ত্র ঐ সকল শয়তানের ভেল্কী দেখায়, তাহা কেন ভাঙ্গিয়া ফেলা হইবে না, যে চোখ উহা দেখিতে চাহে, তাহা কেন উপড়াইয়া ফেলা হইবে না। দশবৎসর পূর্ব্বে তাঁহার সমসাময়িক

১ বেদের পরবর্ত্তীকালে বহু বৎসর ধরিয়া স্বাধীনভাবে ভারতেও বৈজ্ঞানিক রীতিতে জ্যোতির্বিদ্যায় নানা গবেষণা হইয়াছিল। The Cultural Heritage of India, Vol. III. p 377

বৈজ্ঞানিক গিয়োর্ডানো ব্রুণোকে ত বাইবেল বিরোধী কোপরনিকসীয় মতবাদ সমর্থন করিতে গিয়া মৃত্যু-দণ্ডেই দণ্ডিত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু বিজ্ঞান খুব অল্পকালের মধ্যেই গ্যালিলিওর মৃত্যুশয্যার এই অতৃপ্তির যথোপযুক্ত প্রতিশোধ লইতে সমর্থ হইয়াছিল। তাহার দ্রুত-সংবর্দ্ধমান শক্তির নিকট বিকৃত ধর্ম্মের উন্মত্ত গোঁড়ামীর আধিপত্য চিরদিনের মত ধূলিসাৎ হইয়াছে।

১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দেও ধর্ম্মবিশ্বাসীকে বিশ্বাস করিতে হইত যে জগৎ খ্রীষ্টের জন্মের ৪০০৪ বৎসর পূর্ব্বে সৃষ্ট হইয়াছে[১] এবং ভগবান এই সৃজন কার্য্যে ঠিক্ সাতদিন সময় লইয়াছিলেন। আজ আর এ বিশ্বাসের কোন স্থান নাই। আজ বৈজ্ঞানিক বলেন, আকাশের অপর জ্যোতিষ্কের হিসাব আলাদা —এই পৃথিবীরই বয়স দুইশত কোটি বৎসর। তাহার মধ্যে পৃথিবীতে প্রাণের স্পন্দন আরম্ভ হয় ৩০ কোটি বৎসর পূর্ব্বে—প্রথম মানুষ আবির্ভূত হইয়াছে অন্ততঃ তিনলক্ষ বৎসর আগে। জগতের একজন সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন নিশ্চয়ই, কিন্তু তাঁহার সৃজনক্ষমতার পরিচয় ধর্ম্মগ্রন্থে যাহা আছে তাহা খুবই অল্প, আর তাঁহার সৃষ্টি করিবার ধারাও নানা উপকথার মধ্যে আমরা শিশুকাল হইতে যেরূপ শুনিয়া আসিয়াছি, মোটেই সেইরূপ নয়। আমাদের এই পৃথিবী এবং স্বর্গ সৃষ্টি করিয়াই পরমেশ্বর ক্ষান্ত হন নাই। ২৪২০২ মাইল পরিধির মৃত্তিকাপিণ্ড পৃথিবী কোটী কোটী বৎসর পূর্ব্বে ৯১ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত নিজের অপেক্ষা ১০ লক্ষ গুণ বড় ঘূর্ণায়মান একটী জ্বলন্ত বাষ্পপিণ্ড—সূর্য্যের সহিত এক হইয়া মিশিয়াছিল। বুধ, শুক্র, মঙ্গল, শনি, জুপিটর, ইউরেনস্ নেপ্‌চুন্, প্লুটো—পৃথিবীর অন্যান্য সহোদর সহোদরাগণেরও এইরূপ সূর্য্য হইতে একদিন কোন ভিন্ন সত্তা ছিল না। তাহার পর সেই কোটি কোটি বৎসর অতীতে সূর্য্যের সহিত সূর্য্যেরই সমতুল্য অপর এক জ্বলন্ত বাষ্পপিণ্ডের হয়ত একদিন সাক্ষাৎ ও সংঘর্ষ হয় এবং ফলে আহত সূর্য্যের শরীর হইতে কতকগুলি বাষ্পপিণ্ড আকাশে ছিট্‌কাইয়া পড়ে। সূর্য্য যেমন ঘুরিতেছিল বিচ্ছিন্ন এই পিণ্ডগুলিও তেমনি সূর্য্যের চারিপাশে ঘুরিতে থাকিল এবং লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে ঠাণ্ডা হইয়া প্রথমে তরল ও পরে কঠিন অবস্থা লাভ করিয়া বর্ত্তমান উপরোক্ত ঐ সকল গ্রহের আকার প্রাপ্ত হইল। এই আমাদের সৌরজগৎ। আকাশে যে সকল ছোট বড় তারা দেখিয়া থাকি উহাদের প্রত্যেকটীই এক একটী সূর্য্যের মত। গ্রহ উপগ্রহ লইয়া হয় ত উহারা নিজ নিজ বিচিত্র জগৎ-শাসন করিতেছে। নীল তারাগুলি সাধারণতঃ সূর্য্য অপেক্ষা সহস্র গুণ বড়, লাল তারাগুলি লক্ষ গুণ। আকাশের বৃহত্তম তারা আনটেয়ার্স (Antares) ৬ কোটি সূর্য্যকে গিলিয়া ফেলিতে পারে।[১]

এইরূপ অতিকায় জ্বলন্ত বাষ্পপিণ্ড সংখ্যায় কত? একদিন ভগবান্ বেদব্যাস সঞ্জয়ের মুখে বিশ্বরূপধারী শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গজ্যোতিঃর বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন, আকাশে যদি যুগপৎ সহস্র সূর্য্যের উদয় হয় তাহা হইলে উহাদের কিরণ সেই মহাপুরুষের শরীরের আভার সদৃশ হইতে পারে। আজকার জ্যোতির্ব্বিদ বলেন, না—না—সহস্র সূর্য্য কি বলিতেছ, অনন্ত অসীম আকাশ জুড়িয়া ভগবানের যে বিরাট দেহ—তাহা যে কত সূর্য্যের আলোয় দীপ্তি পাইতেছে তাহা নির্ণয় করা একরূপ দুঃসাধ্য। যদি বলি পৃথিবীর সকল মহাসাগরের তীরে যত বালুকণা আছে তাহাদের সংখ্যা যত তত, তাহা হইলেও বোধ হয় পর্য্যাপ্ত হয় না।[২] আকাশের দূর সীমান্তে যে অস্পষ্ট অর্দ্ধ বৃত্তাকার

১ Outline of History—H. G. Wales, P. 17.

১ Through Space & Time—Jeans, P 183.

২ The Mysterious Universe, Jeans, P 1

আলোকবর্ত্ম দেখি—চলিত কথার ছায়াপথ—উহার স্বরূপ গেলিলিও নিজেই তাঁহার প্রথম দূরবীক্ষণ দিয়া আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন। উহারা বহুদূরের নক্ষত্রপুঞ্জ মাত্র—এতদূরে যে, সকলগুলির আলোক পৃথক চেনা যাইতেছে না—আবছায়ায় সব মিশিয়া গিয়াছে। আজ এই ছায়াপথ লইয়া আরও অনেক বিস্তৃত গবেষণা হইয়াছে। আজ আমরা শুনিতে পাই বিশ হাজার কোটি তারা লইয়া যে একটী নক্ষত্র ব্রহ্মাণ্ড আছে ছায়াপথ তাহার শেষ সীমা—প্রাচীর। কিন্তু এই নক্ষত্র-ব্রহ্মাণ্ড (Galactic System) পৃথিবীর মানুষ আমরা যাহাকে দেখিতে বুঝিতে পারিতেছি তাহা ঐরূপই অগণিত ব্রহ্মাণ্ডের একটী মাত্র। আমাদের ছায়াপথের বেড়ার বাহিরে কতদূর কতদূর ব্যাপিয়া এই সকল ব্রহ্মাণ্ড পরিস্থিত তাহা কে বলিবে ?

গেলিলিওর নির্ম্মিত প্রথম যন্ত্রটী এই তিনশত বৎসর নানাভাবে সংস্কৃত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া আজ মাউণ্ট উইল্‌সন বীক্ষণাগারের ১০০" ছিদ্রযুক্ত সুবৃহৎ দূরবীক্ষণ যন্ত্রের জন্ম দিয়াছে। খালি চোখের দৃষ্টি এই যন্ত্র আড়াই লক্ষ গুণ বাড়াইয়া দিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর জ্যোতির্ব্বিদ্ তাঁহার এই প্রজ্ঞানেত্র দিয়া তারকা ছাড়া দূর আকাশে আর এক রহস্যময় বস্তুর সন্ধান পাইয়াছেন। উহার নাম নেবুলা (Nebulæ), যাহাকে আধুনিক বাংলায় আমরা নীহারিকা বলিতে সুরু করিয়াছি। ইহাই বুঝি বিরাটের শীর্ষ—দেহের মুখ্যতম অঙ্গ। নেবুলা শব্দের অর্থ কুয়াসা বা মেঘ। কিসের মেঘ? তারকা যখন সৃষ্ট হয় নাই—উহার উপাদান ভৌতিক পরমাণুসমূহ যখন একত্রে পুঞ্জীভূত হইয়া আকর্ষণ-বিকর্ষণ-সংবর্ত্তন-সংঘর্ষে সৃষ্টির মাত্র প্রথম অঙ্ক অভিনয় করিতেছে, সেই অবস্থায় ঐ বিক্ষুব্ধ পরমাণুপুঞ্জ দ্বারাই এই মেঘের সৃষ্টি। কোটি কোটি বৎসর ধরিয়া এই বিক্ষোভ চলিতে থাকিবে—তাহার পর একদিন ঐ বিরাট্ মেঘখণ্ড অদৃশ্য হইবে—নিজের দেহের আহুতি দ্বারা কোটি কোটি নক্ষত্রের আবির্ভাব ঘটাইয়া।

কোটি নক্ষত্রের পুঞ্জীভূত দেহোপাদান একটী নেবুলায়, —এইরূপ বিশ লক্ষ নেবুলার সন্ধান বীক্ষণাগারে বসিয়াই পাওয়া গিয়াছে, আর মানুষের গড়া দূরবীক্ষণের দৃষ্টির সীমা ছাড়াইয়া এইরূপ যে আরও লক্ষ লক্ষ নেবুলা আছে, তাহা বেশ ভরসা করিয়াই বলা যায়।[১] আকাশের কোন্ প্রান্তে বসিয়া ভগবান্ এই সৃষ্টির খেলা খেলিতেছেন? আমাদের নিকটতম নক্ষত্র প্রোক্সিমা সেনচারি (Proxima Centauri)র দূরত্ব ৪১/২ আলোকবর্ষ। (এক আলোকবর্ষ ৬ লক্ষ কোটি মাইল।) ছায়াপথ দিয়া ঘেরা আমাদের এই নক্ষত্রমণ্ডলের (Galactic System) ব্যাস আড়াই লক্ষ আলোকবর্ষ—আর যে দুই লক্ষ নেবুলাকে আমাদের যন্ত্র দিয়া ধরা যায়, তাহাদের দূরত্ব দশ কোটি হইতে চৌদ্দ কোটি আলোকবর্ষের ভিতরে। সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল বেগে ছুটে, এমন একটী আলোক কিরণ যখন পৃথিবীকে লক্ষ্য করিয়া ঐরূপ একটী নেবুলা হইতে প্রথম যাত্রা করিয়াছিল, তখন পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্ট হয় নাই, জলে নিম্নশ্রেণীর সরীসৃপ ও মাটীতে কোন কোন পাখী মাত্র দেখা দিয়াছে। ঐ কিরণটী পৃথিবীতে পৌছাইতে পৌছাইতে সমুদ্র শুকাইয়া পাহাড় উঠিল, স্থল ভাসাইয়া সমুদ্র বিস্তৃত হইল, কত প্রাণী বিলুপ্ত হইল, আবার কত নূতন নূতন প্রাণী দেখা দিল। সকল প্রাণীকে পায়ে দলিয়া ভগবানের প্রতিবিম্ব মানুষ রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিল, লক্ষ বৎসর ধরিয়া তাহার বুদ্ধি পরিপক্ব হইল, সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া সে সভ্য হইল, ভাবিতে শিখিল, উদ্ভাবন করিতে শিখিল, যে কিরণ রেখা এই কোটি বৎসর ধরিয়া অবিশ্রান্ত গতিতে ছুটিয়া তাহাকে

১ The Universe Around Us—Jeans, P. 81.

দেখিতে আসিতেছে, তাহার উপযুক্ত অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রজ্ঞানেত্র—সুবৃহৎ টেলিস্‌কোপ নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইল। বিরাটের পরিধের বস্ত্রের টানা-পোড়েন দেশ ও কালরূপী দুটী সূত্রই অদ্ভুত!

সর্ব্বাপেক্ষা রোমাঞ্চকর বিষয় এই যে, অনন্ত দেশ, অনন্ত কাল, অনন্ত সৃষ্টির এই হিসাব আমরা কল্পনা করিয়া পাই নাই। কঠোর বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা এই হিসাবের জন্য জামিন্ আছে। দূর-বীক্ষণ যন্ত্রের পর, উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ফ্রঁহপারে (Framhoper)র আবিষ্কৃত বর্ণরেখা-বীক্ষণ (spectroscope) যন্ত্র জ্যোতিষ্কের তথ্য নিরূপণে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছে। তাহার পর জ্যোতির্বিদ্ ছাড়া, পদার্থবিদ্, রাসায়নিক, ভূতত্ত্ববিদ্ ইঁহারাও নিজ নিজ সাজসরঞ্জাম, যন্ত্র-পাতি ও অভিজ্ঞতা লইয়া আকাশের রহস্য আবিষ্কারে ব্যাপৃত হইয়াছেন। বিরাটের বিজ্ঞান আজ বিজ্ঞানের সকল বিভাগেরই সাধারণ আলোচ্য বিষয়। তাই মানুষ আজ বিরাটকে ভাসা ভাসা জানিয়াই ক্ষান্ত নয়—তন্ন তন্ন করিয়া সে উহার সকল খবর জানিতে উৎসুক। অনন্ত দেশের, অনন্ত কালের মাপ তাহার চিন্তার কাছে এখন সহজ হইয়া গিয়াছে। এখন সে চায় নক্ষত্র—নেবুলার গতিবেগ, তাপমাত্রা কত, আভ্যন্তরীণ চাপ্ কত, তাহা জানিতে—কি উপাদানে উহারা গঠিত, তাহা বুঝিতে—উহাদের উজ্জ্বলতা কত, উহারা যে আলোক বিকীরণ করিতেছে, তাহারই বা প্রকৃতি কি, এ সকল পরীক্ষা করিতে। বিরাটের রহস্যেরও অন্ত নাই, মানুষেরও উহা উদ্ঘাটন করিবার উৎসাহের অন্ত নাই।

* * * *

বর্ত্তমান বিজ্ঞান বিশেষতঃ জ্যোতির্বিজ্ঞান সৃষ্টিকে এতই বিরাট্ বলিয়া ভাবিতে শিখাইতেছে। গ্রহ উপগ্রহ, জ্বলন্ত বাষ্পপিণ্ড সূর্য্য হইতে আসিল—সেই সূর্য্য এবং সেইরূপই কোটি কোটি সূর্য্য বিক্ষুব্ধ পরমাণুপুঞ্জ দ্বারা রচিত 'কুয়াসা' নেবুলা হইতে জন্মলাভ করিল। অনন্ত আকাশে অনন্ত নেবুলা হইতে এখনও এই প্রক্রিয়া চলিতেছে—যুগ-যুগান্তর ধরিয়া চলিবে। সৃষ্টির বিরাম নাই—ছয় দিনের পরে একদিন সৃষ্টিকর্ত্তা বিশ্রাম লাভ করেন, বর্ত্তমান বিজ্ঞান এ উপকথায় বিশ্বাসী নয়। নেবুলা কোথা হইতে আসিল? ঐ পরমাণুপুঞ্জ কি স্বয়ম্ভূ অথবা তাহারও আবির্ভাবের পূর্ব্বাবস্থা বৈজ্ঞানিকভাবে অনুসরণ করা চলে? কেহ কেহ বলেন, পরমাণুপুঞ্জের পূর্ব্বাবস্থা সমস্ত আকাশ জুড়িয়া এক আদিম সজ্জাহীন, সম্বন্ধহীন, বিত্রস্থ বাষ্পীয় বস্তু[১] (Chastic primordial gas)। তাহার পর এই সর্ব্বতোব্যাপ্ত বাষ্প বিচ্ছিন্ন হইয়া কোটি কোটি কুয়াসাখণ্ডের জন্ম দিল; ইহারাই নেবুলা। ঐ আদিম বাষ্পীয় বস্তুরও পূর্ব্বাবস্থা কেহ কেহ বলিতে চান—নিস্পন্দ, নিরবয়ব আকাশ। এই আকাশ অবশ্যই অচেতন। কিন্তু আকাশে প্রথম স্পন্দন আরম্ভ হইল কিরূপে? স্পন্দিত আকাশকণা হইতে বিদ্যুতিন্, কেন্দ্রিন্ পরমাণু, নেবুলা, তারকা, এই সৃজন প্রবাহ কি আপনা আপনিই চলিল? সকল সৃষ্টির পশ্চাতে কোন চেতন বস্তু ঈশ্বর বা পরমাত্মা রহিয়াছেন কি? এই প্রশ্ন স্বতঃই আসিয়া হাজির হয়। বৈজ্ঞানিক ইহা লইয়া মাথা ঘামাইতে রাজী নন্—তাঁহার আলোচ্য বস্তুর এলাকার মধ্যে ইহা পড়ে না। দার্শনিক ও ধর্ম্মতত্ত্বালোচকগণ এই সকল বিষয়ের উত্তর দিবার চেষ্টা করেন। নানা ধর্ম্মশাস্ত্রে যে ঈশ্বরের পরিচয় পাওয়া যায় এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যাতাগণ তাঁহার গুণ ও কার্য্যাবলীর যেরূপ নির্দ্দেশ করেন, বর্ত্তমান বিজ্ঞানের শিক্ষায় শিক্ষিত মানব সহজে সেই ঈশ্বরে এবং তাঁহার ঐরূপ গুণ-

১ Through Space & Time—Jeans P. 211.

কার্য্যে বিশ্বাস করিতে চাহেন না। ধর্ম্মযাজক বহুদিন ধরিয়া নরকের ভয় দেখাইয়া, স্বর্গ, দেবতা, দেবদূত প্রভৃতির দোহাই উপস্থিত করিয়া মানুষের স্বাধীন চিন্তা, যুক্তি ও সমীক্ষা শক্তিকে চাপিয়া রাখিয়াছিল—যাহা শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে, তাহাই জানিবার চরমসীমা—এই বিশ্বাস মানুষের রক্ত-মজ্জায় ঢুকাইয়া দিয়াছিল। আজ মানুষ ধর্ম্ম-যাজকের এই শাসন হইতে মুক্ত হইয়াছে—আর তারপর দীর্ঘকাল ধরিয়া জ্ঞানের বাধাহীন অনন্ত আনন্দরাজ্যের সন্ধান পাইতে দেয় নাই বলিয়া ধর্ম্মের উপর সে এক তাণ্ডব বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে। সব জুয়াচুরি, ভণ্ডামি, ছেলে ভুলান গল্প। কোটি কোটি বৎসর ধরিয়া অনন্ত অনন্ত গগন জুড়িয়া যে সৃষ্টির খেলা চলিতেছে, ভগবান নিঃশ্বাসে তাহা প্রকট করিয়া গোলকধামে বসিয়া লক্ষ্য করিতেছেন!—ছয় দিনে শেষ করিয়া সপ্তম দিনে বিশ্রাম করিয়াছেন!! আজ মানুষ হাতে-কলমে পরীক্ষা করিয়া স্বাধীন, মুক্ত বুদ্ধির দ্বারা যে বিরাটকে চিনিতে বুঝিতে পারিয়াছে, তাহাই তাহার ভগবান্—কল্পনার অন্য কোন ভগবানের প্রয়োজন নাই।

ধর্ম্মের কিছু বলিবার আছে কি?

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

বর্তমান সমস্যা ও স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীদ্বিজেন্দ্রকুমার প্রামাণিক

ভারতের বর্তমান সমস্যা লইয়া দেশের ছোট বড় প্রায় সকলেই বিশেষভাবে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। অন্ন-বস্ত্র সমস্যাই এখন দেশের একমাত্র সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ অর্ধ শতাব্দী পূর্বেই ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রতীকারের যে উপায় নির্দারণ করিয়া গিয়াছেন, সে সম্বন্ধেই এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন ধর্মপ্রচারক। ধর্মপ্রচার উদ্দেশ্যেই তিনি পাশ্চাত্য দেশে গমন করিয়াছিলেন এবং এই কার্যেই তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু দারিদ্র্য-দুঃখপীড়িত দেশবাসীর অন্ন বস্ত্র সংস্থানের চিন্তাও তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার সকল চেষ্টা ও সকল কার্যের মধ্যেই যে এই চিন্তা প্রবল ছিল সে ধারণা অনেকেরই নাই; সেজন্যই অন্ন বস্ত্র সংস্থানে অসমর্থ অনেক শিক্ষিত যুবক স্বামীজির প্রতিষ্ঠিত মঠ মিশনকে একটি গতানুগতিক ধর্ম-প্রতিষ্ঠান মাত্র মনে করিয়া থাকেন। স্বামীজির চিন্তাধারার সহিত যাঁহাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, তাঁহারা সকলেই একথা জানেন এবং স্বামীজির অনেক লেখা ও বক্তৃতার মধ্য হইতে ইহা দেখান যাইতে পারে যে, তিনি ভারতের দরিদ্র জনসাধারণকে ধর্মকর্মের জন্য তেমন উৎসাহিত না করিয়া রজোগুণ সহায়ে দুনিয়াকে ভোগ করিবার জন্যই অধিকতর উৎসাহিত করিয়াছেন। অবশ্য তাই বলিয়া তিনি ধর্মকে পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দেন নাই।

ধর্মই আমাদের পুরুষানুগত জাতীয় সম্পদ। যিনি যাহাই বলুন না কেন, ধর্মকে ত্যাগ করিবার

উপায় আমাদের নাই। পক্ষান্তরে ঐহিক উন্নতি উপেক্ষা করিলেও আমাদের চলিবে না। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বর্গের কোনটাই বাদ দিবার নয়। ইহাদের যে কোনটী লাভ করিতে হইলে চাই নিরলস চেষ্টা, কর্মপ্রবণতা, প্রবল উৎসাহ উদ্যম। আমাদের মধ্যে এই সব গুণের বিশেষ অভাব হইয়া পড়িয়াছে বলিয়াই আমাদের চতুর্বর্গের কোন বর্গই লাভ হইতেছে না। অনেকে ধর্মের দোহাই দিয়া সত্ত্বগুণের ভান করিয়া ধার্মিক সাজিতেছেন, আবার অনেকে অন্ন-বস্ত্র সংস্থানে অসমর্থ হইয়া ধর্মকে গালি দিতেছেন। এইরূপে একের দোষ অপরের ঘাড়ে চাপাইয়া নিজের মনকে ও অপরকে সান্ত্বনা দেওয়ার অজুহাত খুঁজিতেছেন। আমাদের এই ভাবের ঘরে চুরি, এই ভণ্ডামিকে স্বামীজি কিরূপ তীব্রভাবে কষাঘাত করিয়াছেন, তাহা যাঁহারা তাঁহার পত্রাবলী পড়িয়াছেন তাঁহারাই জ্ঞাত আছেন।

স্বামীজি তাঁহার স্বদেশবাসীকে সত্ত্বগুণের ভান ছাড়িয়া সর্বাগ্রে রজোগুণী তথা ভোগপরায়ণ হইতেই বলিয়াছেন। ধর্ম কর্ম সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—"ধর্ম কর্ম করতে গেলে, আগে কূর্ম অবতারের পূজা চাই, পেট হচ্ছেন সেই কূর্ম। * * * * ধর্ম কথা শুনাতে হলে আগে এদেশের লোকের পেটের চিন্তা দূর করতে হবে।"

স্বামীজি পরিব্রাজকরূপে হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত সমস্ত ভারতবর্ষ পদব্রজে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং দেশের বিপুল জনসংঘের দুঃখ-দারিদ্র্য দুর্দশা স্বচক্ষে পরিদর্শন করিয়া নিতান্ত ব্যথিত ও বিক্ষুব্ধ চিত্তে তাহাদের সমস্যা সমাধানের উপায় চিন্তা করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সহায়ে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতিসাধন করিয়া দেশের দুঃখ-দুর্দশা দূর করিবার জন্য যুবকদিগকে দলে দলে পাশ্চাত্য দেশে গমন করিয়া পাশ্চাত্য জাতির নিকট হইতে এই সকল বিষয় শিক্ষা লাভ করিবার জন্য তিনি বিশেষভাবে উৎসাহিত করিয়াছেন। কিন্তু তাহা ভিক্ষুকের মত নহে, বিনিময়ে পাশ্চাত্য জাতিকে আমাদের আধ্যাত্মিক জ্ঞান শিক্ষা দিতে তিনি সর্বপ্রযত্নে উৎসাহ দান করিয়াছেন।

ভারতের জনসাধারণের উন্নতিসাধনই ছিল তাঁহার অন্যতম জীবনের ব্রত। শিক্ষা বিস্তার ভিন্ন দেশের বিপুল জনসংঘের উন্নতি সম্ভবপর নয় বুঝিয়া তিনি গ্রামে গ্রামে শিক্ষা প্রচারকল্পে দেশের সর্বত্র প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে বলিয়াছেন। জাতীয় ভাষাকে শিক্ষার বাহন ও জাতীয় ভাবে শিক্ষা প্রচলন করিবার জন্য ইদানীং যে চেষ্টা ও আন্দোলন চলিয়াছে, স্বামীজি অর্ধ শতাব্দী পূর্বেই তাহার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি জাতীয় ভাবে শিক্ষা দানের পক্ষপাতী ছিলেন। রাজা রামমোহন রায় ইংরাজী ভাষার মধ্য দিয়া এদেশে শিক্ষা প্রচলনের ব্যবস্থা করিয়া দেশটাকে পঞ্চাশ বৎসর পিছাইয়া দিয়া গিয়াছেন, একথাও তিনি স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন। তিনি তাঁহার কর্মীদিগকে গ্রামে গ্রামে যাইয়া শিক্ষা প্রচার করিবার জন্য উৎসাহিত করিয়াছেন। কৃষক জেলে মালা প্রভৃতিকে শিক্ষাদান করিয়া তিনি নূতন ভারত গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন—"* * * নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে, মালা, মুচি, মেথরের ঝুপড়ীর মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে।"

অবনত জাতির উন্নতি সাধন ব্যতীত দেশের উন্নতি যে অসম্ভব, তাহা তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ের রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতি তিনি ততটা আস্থাবান ছিলেন না; কারণ সে সময়ের রাজনৈতিক আন্দোলন-

কারীদের সহিত দেশের অশিক্ষিত চাষা, জেলে, মালী, হাড়ী, ডোম প্রভৃতি অজ্ঞ জনসাধারণের কোনই সম্পর্ক ছিল না। উহা মুষ্টিমেয় কয়েক জন শিক্ষিত ব্যক্তির মন্তব্য পাশের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। স্বামীজির দেশোদ্ধার-ব্রত রাজনীতির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। এজন্য তাঁহার বা তাঁহার প্রবর্তিত মিশনের প্রতি আমাদের অনেক রাজনৈতিক নেতা এবং তাঁহাদের অনুগামী তথা সমাজতন্ত্রবাদী বা সাম্যবাদীদের আস্থা ও সহানুভূতির অনেকটা অভাব পরিলক্ষিত হয়। প্রাণের ভিতর যখন জাগরণের সাড়া আসে, যখন দেশপ্রেমে মানুষের হৃদয় ঠিক ঠিক উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে, তখন রাজনীতি, ধর্মনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতির শ্রেষ্ঠত্ব বিচার লইয়া মাথা ঘামাইবার তাহার অবসর থাকে না। সে যে নীতির মধ্য দিয়া দেশ সেবার সুযোগ সুবিধা পায়, সেই নীতি অবলম্বন করিয়াই কাজে লাগিয়া যায়। এক নীতির উপাসক অন্য নীতির উপাসকের কর্মপ্রণালীর সমালোচনা না করিয়া বরং সহানুভূতির চক্ষেই দেখিয়া থাকে। কেননা, উদ্দেশ্য যেখানে অভিন্ন, সেখানে নীতির বিরোধ থাকিতে পারে না, বরং পরস্পর সহায়ক হয়। ধর্মনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি পরস্পর অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধবিশিষ্ট। একের উন্নতিতে অপরের উন্নতি, এবং একের অবনতিতে অপরেরও অবনতি ঘটিয়া থাকে। তবে স্বামীজি কেন ধর্মকেই তাঁহার দেশোদ্ধার ব্রত উদযাপনের মূল ভিত্তি করিয়া লইলেন, তাহা তিনি তাঁহার বক্তৃতার অনেক স্থানে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। বলিয়াছেন—প্রত্যেক জাতিরই একটা প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য থাকে, যে জাতি সেই বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করিয়া চলিতে পারে না, সে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধভাবের মধ্যে পড়িয়া স্রোতের তৃণের মত ভাসিয়া যায়। ভারতের জাতীয় বৈশিষ্ট্য হইতেছে ধর্ম। ইহাকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়া যা কিছু চেষ্টা তাহা পণ্ডশ্রম মাত্র। বরং গঙ্গাকে হিমালয়ের ক্রোড়ে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া সম্ভব, তথাপি ধর্মকে বাদ দিয়া এ জাতির উত্থান সম্ভব নয়। ইহাই তাঁহার সুচিন্তিত অভিমত। দেশের অর্থনৈতিক দুর্গতি দেখিয়া তিনি ধর্মকর্ম আপাতত কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখিতে পরামর্শ দিতে যাইয়া বলিয়াছিলেন, "আগামী পঞ্চাশৎ বর্ষ ধরিয়া সেই পরম জননী মাতৃভূমি যেন তোমাদের আরাধ্য দেবী হন, অন্যান্য অকেজো দেবতাগণকে এই কয়েক বর্ষ ভুলিলে কোন ক্ষতি নাই।" দেশের জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিয়া তাহাদের ভাল খাওয়া পরার ব্যবস্থা করা স্বামীজির আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। আমাদের বর্তমান প্রয়োজন পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সহায়ে আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা উন্নত করিতে চেষ্টা করা। কিন্তু ইউরোপীয়দিগের দ্বারে দাঁড়াইয়া কেবলমাত্র ক্রন্দন ও ভিক্ষা প্রার্থনা করিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। তাহারা যেমন আমাদিগকে উন্নত কৃষি, শিল্প ইত্যাদি শিক্ষা দিবে, বিনিময়ে আমাদেরও তাহাদিগকে কিছু দিতে হইবে। ভারতবর্ষের বর্তমানে দিবার মত এক আধ্যাত্মিক জ্ঞান ব্যতীত আর কি আছে? তিনি দেশবাসী যুবকদিগকে দলে দলে পাশ্চাত্যদেশে গমন করিয়া বেদান্তের অত্যুদার ধর্মের প্রচার করত আদান প্রদান সম্পর্ক স্থাপন করিবার জন্য উৎসাহিত করিয়াছেন। প্রত্যেক ভারতবাসীরই স্বজাতি ও স্বদেশের তথা জগতের কল্যাণ কামনায় এই চেষ্টায় সাহায্য করা কর্তব্য।

ভারতের অগণিত দীন দরিদ্রের অভাবের তাড়নার কথা চিন্তা করিয়া স্বামীজি বলিয়াছেন —"আমরা লক্ষ লক্ষ সন্ন্যাসী ইহাদের অন্নে জীবন ধারণ করিয়া ইহাদের জন্য করিতেছি কি? ইহাদিগকে দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা দিতেছি।" ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন—"খালি পেটে ধর্ম হয় না, মোটা ভাত মোটা কাপড়ের বন্দোবস্ত আগে চাই।" ক্ষুধিত ব্যক্তিকে ধর্ম উপদেশ প্রদান

করিতে অগ্রসর হওয়া মূঢ়তা। ধর্ম তাহাদের যথেষ্ট আছে, এক্ষণে প্রয়োজন শিক্ষা বিস্তার। চাই অশন বসনের সংস্থান। কিন্তু অর্থ কোথা হইতে আসিবে? এই চিন্তাভার মস্তিষ্কে লইয়া স্বামীজি হৃদয়ের রক্ত মোক্ষণ করিতে করিতে সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ধনী, রাজা, মহারাজা, প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে গিয়াছিলেন, দরিদ্রের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু কেবল মৌখিক সহানুভূতি লাভ করিয়াছিলেন মাত্র। তিনি পাশ্চাত্যদেশে গমন করিয়া নিজ প্রতিভাবলে রাজার অধিক সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াও দীন দরিদ্র স্বদেশবাসীর কথা ভুলিয়া যাইতে পারেন নাই। পাশ্চাত্য দেশবাসীর ধন ঐশ্বর্য ও সুখসম্পদের মধ্যে থাকিয়াও দুঃখ দারিদ্র্যসমাচ্ছন্ন তাঁহার স্বদেশবাসীর অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া তিনি গভীর দুঃখ ও বেদনায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন, অশ্রুজলে কতদিন উপাধান সিক্ত করিয়াছিলেন, এই চিন্তায় কত যে বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়াছিলেন, কে তাহার খবর রাখে? তাঁহার হৃদয় ছিল কুসুমের চেয়ে কোমল, সমুদ্রের চেয়েও গভীর ও বিস্তৃত এবং আকাশের চেয়েও মহান্ ও উদার। ভারতের দীন দরিদ্র পতিত ও অজ্ঞ জনসাধারণ ছিল তাঁহার প্রাণের প্রাণস্বরূপ। ইহাদের উন্নতির জন্য তিনি অসংখ্যবার নরকে যাইতেও প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে আজিও আমরা তাঁহাকে ভালরূপে চিনিতে বুঝিতে পারিলাম না। তিনি ঠিকই বলিয়াছিলেন—যদি আর একটা বিবেকানন্দ থাকিত তবে তাঁহাকে ঠিক ঠিক বুঝিতে পারিত। যদি আমরা দেশের জন্য কিছু করিতে চাই, তাহা হইলে তাঁহার এই প্রাণের সহিত—তাঁহার এই ভাবধারার সহিত আমাদিগকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইতে হইবে। এজন্য দেশের মধ্যে তাঁহার ও তাঁহার গুরুদেবের বাণী অর্থাৎ "রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের" অবাধ প্রচার হওয়া নিতান্ত দরকার, বিশেষ করিয়া শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে। দেশের তরুণ সমাজের মধ্যে এই সাহিত্যের প্রচার বর্তমানে তেমন ভাবে হইতেছে না বলিয়া দেশের বিশিষ্ট জননায়ক শ্রীযুত সুভাষ চন্দ্র বসু মহাশয় অতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"চরিত্র গঠনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সাহিত্যের আমি কল্পনা করিতে পারি না।" আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ যদি এদিকে একটু মনোযোগী হইতেন, তবে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সহজেই সমস্ত দেশে প্রচারিত হইতে পারিত এবং জাতির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ও আশাপ্রদ হইত।

প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা স্বতই মনে আসিতেছে, যাঁহার পাদমূলে বসিয়া স্বামী বিবেকানন্দ জীবনের এই মহাব্রত কার্যে পরিণত করিবার শিক্ষা পাইয়াছিলেন, তাঁহার মহাপ্রাণতার অনেক দৃষ্টান্ত আমরা পাইয়াছি। তিনিও ভারতের দীন দরিদ্র ও আর্ত জনগণের জন্য কিরূপ ব্যথিত ও সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন, তাহা মথুর বাবুর সহিত তাঁহার তীর্থভ্রমণের বৃত্তান্ত হইতেই জানিতে পারা যায়। দেওঘরের নিকট গিয়া তিনি যখন জানিতে পারিলেন যে, তথায় অন্নবস্ত্রের অভাবে বহু দরিদ্র ব্যক্তি বিশেষ কষ্ট পাইতেছে, তখন তাহাদের একটা ব্যবস্থা করিয়া দেওয়ার জন্য মথুর বাবুকে এমনভাবে ধরিয়া বসিলেন যে, তাহা না করিয়া দিয়া মথুর বাবু কিছুতেই তাঁহাকে সেস্থান হইতে তীর্থভ্রমণে লইয়া যাইতে পারিলেন না।

এই যে মহাপ্রাণতা, দীন দরিদ্রের প্রতি এই যে সহানুভূতি, প্রেম, প্রীতি ভালবাসা ইহা ধর্মকে বাদ দিয়া হয় নাই, বরং ধর্মকে গ্রহণ করিয়া ও জীবনে ঠিক ঠিক ভাবে উহাকে পরিণত করিতে

যাইয়াই হইয়াছে। সুতরাং ধর্মকে অযথা দোষারোপ করিয়া বা জীবনের ক্ষেত্র হইতে বাদ দিয়া চলার মধ্যে কোন সার্থকতা নাই। ধর্মকে গ্রহণ করিয়া ঠিক ঠিক ভাবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে পারিলে উহা দ্বারা আমাদের সর্বার্থ সিদ্ধ হইবে। পরকালের কথা ছাড়িয়া দিলেও ইহকালেরও অনেক সুখ সুবিধা আমরা লাভ করিতে পারিব। ধর্মকে আমাদের গ্রহণ করিতেই হইবে এবং সমগ্র জগৎকে এই ধর্ম দান করিতে হইবে। কিন্তু খালি পেটে ধর্ম করা চলে না, সেজন্য আমাদিগকে প্রথমত বল সঞ্চয় করিতে হইবে। তাই সর্বাগ্রে চাই অশন বসন, চাই সবল সুস্থদেহ, পুষ্ট ও উর্বরমস্তিষ্ক। "Iron nerves with a well-intelligent brain and the whole world is at your feet" তবেই আমরা সমস্ত জগৎ জয় করিতে পারিব।

পাশ্চাত্য ভূখণ্ড এখন ভোগের শেষ সীমায় উঠিয়াছে। ভোগে সে এখন আর তৃপ্তি না পাইয়া ভয়ানক অশান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করিতেছে। তাই সেখানকার অনেক চিন্তাশীল মনীষী স্বামী বিবেকানন্দ প্রচারিত বেদান্ত ধর্মকে ধীরে ধীরে গ্রহণ করিতেছেন এবং সকল প্রকার ব্যয় বহন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ হইতে বেদান্ত ধর্মের প্রচারক লইয়া যাইয়া তাঁহাদের দেশেও প্রচারকেন্দ্র স্থাপন করিতেছেন। ইহা দ্বারা প্রাচ্যধর্ম কর্তৃক পাশ্চাত্য জড়বাদ বিজয়ের সূচনাই পরিলক্ষিত হইতেছে। ভারতের এই বিজয় অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক মুক্তি আনয়ন বিশেষ প্রয়োজন। ভাল খাওয়া, পরা ও ভালভাবে থাকা মেলার ব্যবস্থা করিয়া শরীর, মন ও মস্তিষ্ক সবল সুস্থ ও পুষ্ট করিতে না পারিলে উন্নত বিষয়ে মনোনিবেশ করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব।

ধর্মকে আপাতত বাদ দিবার কথায় কেহ যেন বিপরীত না বুঝিয়া বসেন। কেননা, যুগ যুগ ধরিয়া পুরুষানুক্রমে ধর্মের উচ্চ তত্ত্বগুলি সূক্ষ্ম সংস্কাররূপে আমাদের মস্তিষ্কে শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়া প্রতি রক্তবিন্দুতে মিশিয়া আছে; উপযুক্ত খাদ্য অভাবে, দারিদ্র্য ও অভাবের চিন্তায় উহা শুষ্ক ও মৃতপ্রায় হইয়া আছে। দেহ সবল সুস্থ এবং মস্তিষ্ক পুষ্ট ও উর্বর হইলেই উহা দ্রুত সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে। কাজেই সর্বাগ্রে চাই এই দারিদ্র্য ও অভাবের চিন্তা হইতে মুক্তি। বর্তমান সমস্যার ইহাই স্বামী বিবেকানন্দের বাণী। সমস্ত পাশ্চাত্য ভূখণ্ড আমাদের নিকট হইতে বেদান্তের বাণী শুনিবার জন্য ক্রমশই অধিকতর আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিতেছে। সুতরাং আমাদিগকে এজন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। স্বামীজির বাণী আমাদের এই যাত্রাপথে সহায় হউক, এই প্রার্থনা।
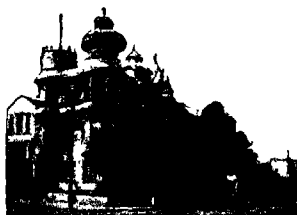
অভিমান

শ্রীরণজিৎকুমার মুখোপাধ্যায়

তুমি যবে চাহিলে না ফিরে—
ভক্তের হৃদয়রক্তে কলঙ্কিল পূজার বেদীরে।
বৃথা হ'ল যত ফুল তোলা,
বৃথা হ'ল যত মালা গাঁথা।
ব্যর্থ বেদনার অশ্রুজলে
সিক্ত হ'ল নয়নের পাতা।
প্রতীক্ষার কাল বয়ে যায়,
পুষ্প-অর্ঘ্য নীরবে শুকায়,
ক্ষণ শুধু ত্বরিত চরণে
চলে যায় অতীতের তীরে।
ভক্তের আকুল অশ্রুনীরে
দেবতা ত চাহিল না ফিরে।

ধরণী যে কুসুমের ডালি
সাজাইল বনে বনান্তরে,
সে আজি নীরবে ঝরি ঝরি
ভরি উঠে নিখিল অন্তরে।
বায়ের হঠাৎ আকুলতা
অরণ্যের মর্ম্মর ব্যথা
দিগন্তের কোল ঘিরে ঘিরে
কেঁদে ফিরে আকাশে প্রান্তরে।
ব্যর্থ হ'ল কুসুমের ডালি
আমার এ নিখিল অন্তরে।

হৃদয়ের গভীর আঁধারে
ফুটিল না আলোর কমল,
জীবনে করুণ মেঘে মেঘে
দেখা দিল ব্যথার বাদল।
চিত্ত ফেরে একা সে গহনে
দুঃখ ঘোর নিবিড় কাননে,
অশ্রুজল অন্তরে গোপনে
কাঁটা হ'য়ে জাগিল কেবল।
হৃদয়ের আঁধার পাথারে
ফুটিল না আলোর কমল।

সে কথা মরিয়া গেছে আজি
জাগিল যা তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে,
অশ্রুবারি দুখের নিদাঘে
বাষ্প হ'য়ে ফিরিছে আকাশে।
ফাল্গুনের মাধুরী চঞ্চল
ছড়াইল ছিন্ন পুষ্পদল,—
শুষ্কপত্রে মরিয়া সে ব্যথা
মর্ম্মরিয়া উঠিছে বাতাসে।
অশ্রুবারি দুঃখের নিদাঘে
বাষ্প হ'য়ে ফিরিছে আকাশে।

জীবনের স্তরে স্তরে শুধু
মেঘ হ'য়ে জাগে অভিমান,
বেদনা বজ্রের শিখা মেলি
গুরু গুরু জেগে ওঠে প্রাণ।
জগতে এত যে অবহেলা
অশ্রু লয়ে কি নিঠুর খেলা
আজিকে বিপুল ঝঞ্ঝাতলে
দেবতা কি হ'বে অবসান?
বেদনার বজ্রশিখা মেলি
গুরু গুরু জেগে ওঠে প্রাণ।

চিত্রকূট

(পূর্বানুবৃত্তি)

চিত্রকূট হতে গোদাবরী নদী পার হয়ে তিন মাইল দূরে একটি উঁচু পাহাড়ের প্রায় শীর্ষদেশে হনুমানধারা। কতকটা শুষ্ক ঝরনা ও কতকটা জঙ্গলাকীর্ণ স্থান দিয়ে রাস্তা। মাঝে মাঝে কয়েকটি ভগ্নপ্রায় এবং পরিত্যক্ত মন্দির দেখলাম। একটি মন্দিরের মাথায় ইষ্টকনির্মিত সেকেলে ধরণের বিরাটকায় দশানন মূর্তি পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। পাহাড়টি পাদদেশ হতে 'হনুমানধারা' পর্যন্ত বাঁধানো সিঁড়ি। এখানে থেকে মহাবীর রাম-সীতাকে পাহারা দিতেন বলে জনশ্রুতি। খোলামেলা গুহার মতো কয়েকটি কোঠা। একটি মুখ বাঁধানো ঝরনা হতে অবিরত জল বেরুচ্ছে। নিকটে মহাবীরের একটি অপূর্বদর্শন মূর্তি। ঝরনার জল একটি বড় চৌবাচ্চায় পড়ছে, যাত্রীরা এতে স্নান করেন। এখান হতে সামান্য কিছু উপরে উঠলেই বিস্তীর্ণ অধিত্যকা। এখানে সীতা-রসুই আছে। এই রকম একটি অযোধ্যাধামেও দেখেছি। সীতাদেবী এখানে রান্না করতেন বলে প্রবাদ। অদূরে কোটিতীর্থ ও দেবাঙ্গনা প্রভৃতি দর্শনীয়।

চিত্রকূট হতে দুমাইল দূরে মন্দাকিনী তীরে শিরীষা বন, উদাসী সন্ন্যাসীদের আখড়া, প্রমোদ বন, জানকীকুণ্ড প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। এলোমেলো ভাবে অবস্থিত শিলাখণ্ডের চারদিক দিয়ে স্বচ্ছসলিলা মন্দাকিনী কোথাও ধীর স্থিরভাবে অবস্থান করছেন এবং কোথাও সবেগে প্রবাহিতা হচ্ছেন। একদিকে তটদেশে অনেক দূর প্রসারিত বৃক্ষ সমন্বিত সমতল ভূমি ও খাড়া উঁচু পাড়ের গায় অসংখ্য গুহা এবং অপর তীরে শ্যামলবৃক্ষরাজি শোভিত পাহাড়শ্রেণী। স্থানটির মুগ্ধকর প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং গাম্ভীর্যপূর্ণ নির্জনতা যথার্থই উপভোগ্য। একটি স্থানে মন্দাকিনী প্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত করে একটি ময়দার কল চালান হচ্ছে। প্রমোদবনে রেওয়া ষ্টেটের লক্ষ্মী নারায়ণজীর বিরাট মন্দির। এর চারদিকে উঁচু প্রাচীর এবং প্রাচীর গাত্র সংলগ্ন এক হাজার কোঠা পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। শুনলাম, সাধুদের তপস্যার জন্য এই কোঠাগুলি নির্মাণ করা হয়েছিল। কিন্তু যাঁর খেয়ালে হয়েছিল, তাঁর দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই এ সব অন্য আকার ধারণ করেছে। এই-ই জগতের নিয়ম। জানকীকুণ্ডে একটি ছোট মন্দির আছে। মন্দির হতে মন্দাকিনী তীর পর্যন্ত বাঁধানো ঘাট। মন্দাকিনী-প্রবাহে অগণন মাছ সানন্দে স্বাধীনভাবে বিচরণ করছে। ঘাটে একটি বিস্তীর্ণ উপলখণ্ডের উপর জানকীর পদচিহ্ন রয়েছে। নিকটে দুটি আখড়ায় অপূর্ব-দর্শন দুটি গুহা দেখলাম।

জানকীকুণ্ড হতে ৩ মাইল দূরে গভীর বনাকীর্ণ রাস্তা দিয়ে ফটিক শিলায় যেতে হয়। রাস্তায় কয়েকটি ছোট বড় মন্দির আছে। মন্দাকিনী তটে জঙ্গলের মধ্যে ফটিকশিলা। এখানে জনৈক বৈষ্ণব সাধুর একটিমাত্র পর্ণকুটির আছে। এখানকার গভীর অচঞ্চল মন্দাকিনী বক্ষে কুমীর ও মৎস্যের একচ্ছত্র রাজত্ব। একটি ক্ষুদ্র বাঁধানো ঘাটের পাশে দুটি প্রকাণ্ড উপলখণ্ড পড়ে রয়েছে, এর উপর রাম-সীতা বসে বিশ্রাম করতেন বলে পাণ্ডাদের অভিমত। যাত্রীরা এখানে স্নান করেন। শুনলাম, এখানকার জল ম্যালেরিয়ার বীজাণুপূর্ণ। আমি জল স্পর্শ করলাম। আমার সঙ্গী সুশীল বাবু এতে স্নান করে অসুস্থ বোধ করেছিলেন। পরে তিনি চেৎলা এক্স

কিছুদিন ম্যালেরিয়ায় ভুগেছেন। তাঁর বিশ্বাস, এই জলে স্নান করার জন্যই তাঁর ম্যালেরিয়া হয়েছিল।

চিত্রকূটের হাঁপানির অষুধ ভারত বিখ্যাত। অনেক ঘটা করে পুষ্কর বিছারিয়া নামক জনৈক পাণ্ডা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ সমাগত বহু রোগীকে প্রতিবৎসর লক্ষ্মী-পূর্ণিমা রাত্রে অষুধ দিয়ে থাকেন। ফণী বাবু বললেন, এ অষুধে শতকরা ৯০ জন আরোগ্য হয়। অষুধের জন্য চতুর্দশী দিন চিত্রকূট লোকে লোকারণ্য হলো। ফণী বাবুর বাসায়ও অনেক রোগী এসে আশ্রয় নিলেন। আমরা সন্ধ্যার সময় একজন পাণ্ডাকে সঙ্গে নিয়ে অষুধ দেওয়ার দৃশ্য দেখতে গেলাম। দেখলাম, পাহাড়ের ধারে একটি বিস্তীর্ণ চাষী জমির এখানে সেখানে ধনবান নির্ধন প্রায় হাজার রোগী বসে রয়েছেন। সন্ধ্যার সময় নূতন মৃৎপাত্রে দুধ দিয়ে সামান্য কিছু চাল ঘুঁটের আগুনে সিদ্ধ করে কলার পাতায় ছড়িয়ে সারারাত বসে থেকে চন্দ্র কিরণ পক্ক করতে হয়। এই চরুতে কোন কিছুর ছায়া না পড়ে, সেদিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। শুনলাম, রাত ১২টার সময় অষুধদাতা এসে ওতে স্বাদগন্ধহীন গুঁড়ার মত একটি অষুধ দিয়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে রোগীরা ইচ্ছামত দক্ষিণা দিয়ে থাকেন। সারারাত জেগে রাত ৪টার সময় অষুধ মিশানো চরু খেয়ে রোগীকে কামতা পাহাড় প্রদক্ষিণ করতে হয়। রোগীদের আবশ্যকীয় জিনিষ পত্র সব এখানেই পাওয়া যায়। চিত্রকূটে এদিন দুধের দাম প্রতিসের ১৷৷০ টাকা হতে ২৲ পর্যন্ত হয়ে থাকে। সারারাত খোলা মাঠে বসে থাকার জন্য নাকি রোগীদের রোগবৃদ্ধি হয় না। আমরা কতকটা সময় ঘুরেফিরে সব দেখে এ রাত্রির জন্য কামতা পাহাড়ের অপর প্রান্তে ভরত মন্দিরে যেয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলাম। ফণী বাবুর নিকট শুনলাম, পুষ্কর বিছারিয়ার অনুকরণে হীরালাল বিছারিয়া নামক এক ব্যক্তিও অষুধ দেন, কিন্তু তাঁর অষুধ নাকি খাঁটি নয়।

চিত্রকূট হতে ১২ ক্রোশ দূরে রাজাপুর নামক স্থানে সাধক তুলসীদাসের জন্মস্থান দর্শনীয়। বর্ষার পর তখনও রাস্তা মেরামত হয় নাই, কাজেই ওখানে গেলাম না। শুনলাম, রাজাপুরে তুলসীদাসের একটি ছোট মন্দির এবং তাঁর হাতের লেখা রামায়ণ আছে। চিত্রকূটের কয়েকটি স্থানও তুলসীদাসের তপস্যাক্ষেত্র বলে পাণ্ডারা নির্দেশ করেন।

আলমবাজারের শ্রীযুক্ত মণিলাল লালা নামক জনৈক ভদ্রলোক হাঁপানি রোগের অষুধের জন্য চিত্রকূটে এসে ফণীবাবুর বাড়ী ছিলেন। ইনি আর্-এম্-এস্-এর সি-ডিভিসনে কাজ করেন। এই ভদ্রলোকের সঙ্গে একদিন প্রাতে ঘোড়ায় চড়ে চিত্রকূটের ১০ মাইল দূরে গুপ্ত গোদাবরী দেখতে গেলাম। ঘোড়ার মালিকও সঙ্গে চললো। ভাড়া দিতে হলো বার আনা। ঘোড়ায় চড়ে অনভ্যাসের জন্য প্রথমত যেন কেমন অস্বস্তি বোধ হতে লাগলো, পরে ক্রমেই সে ভাব কেটে গেল। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পাহাড় শ্রেণীর উপত্যকাস্থিত বিস্তীর্ণ মাঠ, স্থানে স্থানে চাষী জমি ও ৩।৪টি পল্লীর ভেতর দিয়ে রাস্তা। পল্লী কয়টির দুরবস্থা অবর্ণনীয়। দেখলাম, অচিন্তনীয় দারিদ্র্য ও দারুণ তামসিকতাপূর্ণ অজ্ঞতার সংমিশ্রণে এই সব পল্লীবাসী নরনারীকুলের জন্য এক অভিনব পশুজীবন সৃষ্ট হয়েছে! আঁস্তাকুড় তুল্য আবর্জনা রাশির অন্তরালে ভগ্নপ্রায় পর্ণকুটিরগুলি পল্লীবাসীদের নিদারুণ দৈন্য দুর্দশার মর্মন্তুদ বার্তা ঘোষণা করছে! ভগ্নস্বাস্থ্য কঙ্কালসার পল্লীবাসীদের সম্পত্তির মধ্যে কয়েকটি মৃৎপাত্র এবং অস্বাভাবিক নোংরা শতচ্ছিন্ন কন্থাবৃত দুএকটি দড়ির খাটিয়া। খাদ্য এদের বাজরার রুটি আর নুন, তা-ও দুবেলা বা প্রতিদিন জোটে না! রত্নপ্রসূ ভারত—বিপুল এর ঐশ্বর্য, তবু তার অগণন অধিবাসী অর্ধাহার ও অনাহারে এমন জঘন্য জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে কেন? সম্মুখ দিয়ে

উৎকট ভোগের স্রোতস্বিনী বয়ে যাচ্ছে, আর তারই তটপ্রান্তে দাঁড়ায়ে এই পশুপ্রায় জীবগুলো পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠে মৃতপ্রায়।

এই সব কথা ভাবতে ভাবতে বেলা ১২টার সময় গুপ্ত গোদাবরী এসে উপস্থিত হলাম। গম্ভীর অরণ্য সমাবৃত উচ্চ পর্বতগাত্রস্থিত একটি সুদৃশ্য গুহার ভেতর জল জমে কতকদূর পর্যন্ত বাঁধানো সিঁড়ির উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। গুহার মুখে পঞ্চবক্ত্র মহাদেব, মহাবীর, গণেশ, রাম, সীতা প্রভৃতি বিগ্রহ। এখানে কোন বসতি নেই, দু একজন সাধু ধুনি জ্বেলে বাস করেন। দুটি অপূর্বদর্শন গুহা এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য বিষয়। একটি গুহা উপরে এবং একটি নীচে। একজন পাণ্ডার সঙ্গে প্রথমে উপরের গুহা দেখতে চললাম। একজন মশাল এবং পাণ্ডাজী হারিকেন লণ্ঠন সঙ্গে নিলেন। একটি নিতান্ত সরু পথ দিয়ে গুহায় প্রবেশ করে ক্রমেই ঢালু স্থান দিয়ে নীচের দিকে যেতে লাগলাম। গুহাভ্যন্তর উঁচু নীচু এবং এমন অন্ধকারময় যে, মশালের আলোও তা দূর করতে অতি সামান্যই সক্ষম হলো। গুহাটিতে প্রায় হাজার লোকের স্থান হতে পারে। ভেতরে কেমন একটা দুর্গন্ধ পেলাম, কিন্তু অসহ্য মনে হলো না। পাণ্ডাজীর নির্দেশে গুহার ভেতরে সীতাকুণ্ডে স্নান করলাম, জল ঈষদুষ্ণ। পরে বিভিন্ন স্থানে বাণ-লিঙ্গ, সীতাচরণ, মহাবীর প্রভৃতি দর্শন করে গুহার বাইরে আসলাম। নীচের গুহাটি দেখতে ঈষদুষ্ণ জলের ভেতর দিয়ে যেতে হলো। পূর্বের মত একজন মশাল এবং পাণ্ডাজী হারিকেন লণ্ঠন সঙ্গে পথ দেখায়ে চললেন, আমরা অতি সন্তর্পণে তাঁদের পেছনে পেছনে চললাম। কোন স্থানে এক হাঁটু, কোন স্থানে এক বুক এবং কোন স্থানে এক গলা পরিমাণ জল। প্রথমত গুহার সম্মুখ দিকে ৪।৫ হাত প্রশস্ত স্থান, শেষে ২।৩ হাত প্রশস্ত সূচীভেদ্য অন্ধকারময় সুড়ঙ্গের মত প্রস্তর-প্রাচীরের ভেতর দিয়ে এঁকে-বেঁকে প্রায় এক ফার্লং গেলাম। রাস্তাটির মোড় ঘুরতেই পাণ্ডাজীর আদেশমত হনুমান কুণ্ডে ডুব দিয়ে চলতে লাগলাম। রাস্তার শেষপ্রান্তে একটি প্রস্তর খণ্ডের দুপাশে রাম ও লক্ষ্মণকুণ্ডে বেশ আরাম করে স্নান করা গেল। এখানে প্রায় ৫০ হাত ঊর্ধ্বে চারদিক আটকানো প্রকাণ্ড কাল জালার মতো এক টুকরা পাথর অবিরত নড়ছে, এর নাম খট্‌খটা। এত বড় পাথরের টুক্‌রা কি করে নড়ছে, সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। সমগ্র সুড়ঙ্গের রাস্তায় লালচে রঙের পাথর, কোন কোন স্থানের পাথর একেবারে স্ফটিকের মতো। জল পরিষ্কার, স্বচ্ছ ও অসাধারণ হজমশক্তিসম্পন্ন। জলে সামান্য স্রোত এবং ছোট ছোট মাছ আছে। মাঝে মাঝে ডুব দিতে দিতে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে পাণ্ডাজীর পেছনে পেছনে বেরিয়ে আসলাম। মনে হলো যেন এক স্বপ্নপুরীতে গিয়েছিলাম। রামায়ণে এরই নাম সংকর্ষণ পাহাড়। এই পাহাড়ে জটায়ু তপস্যা করেছিলেন বলে প্রসিদ্ধি আছে।

জলযোগের পর বিশ্রাম করে পুনঃ অশ্বারোহণে যাত্রা করলাম। সন্ধ্যার পূর্বে এক বিস্তীর্ণ মাঠে এসে উপস্থিত হলাম। চারদিকে অর্ধপক্ক শস্যক্ষেত্র, প্রত্যেকটি ক্ষেতের মাঝখানে উঁচু মাচানের মধ্যে দু একজন লোক বসে এক অদ্ভুত স্বরে ঘন ঘন চীৎকার করছে। এই রকম শত শত মাচান হতে মুহুর্মুহুঃ এক অপরূপ ধ্বনি উত্থিত হয়ে সমগ্র মাঠটি মুখরিত হচ্ছে। শুনলাম, ক্ষেতে বীজ গজানো হতে ফসল কেটে না নেওয়া পর্যন্ত দিনে—বিশেষ করে রাতে এ ভাবে পাহারা না দিলে বানর, শূকর, হরিণ, টিয়া, পঙ্গপাল অতি অল্প সময়ের মধ্যেই শস্য নষ্ট করে ফেলতে পারে। এর উপর আবার জমিদার, পাটোয়ার, পঞ্চায়েৎপতি, দারোগা, পুলিশ, চৌকিদার প্রভৃতির লোভ হতে রক্ষা পেতে কৃষকগণকে নাকি অনেক হেঙ্গাম ভোগ করতে হয়! শস্য উৎপাদনের এই রকম দুর্ভোগ দেখে আশ্চর্য

হলাম। সংবাদপত্রে দেখি, যুক্তপ্রদেশে ব্যাপক ভাবে কিষাণ-আন্দোলন চলছে। কিন্তু এই হত-ভাগ্য কিষাণগণকে এই সব অত্যাচারের হাত হতে রক্ষা করতে পারেন, একপ কোন মহাপ্রাণ ব্যক্তি কি ওদেশে নেই? যা হ'ক, আমরা রাত ৮৷৷০টার সময় চিত্রকূটে পৌঁছলাম।

আমার সঙ্গী সুশীলবাবু এলাহাবাদে চলে গেলেন। আমি মণিবাবুর সঙ্গে আর একদিন প্রাতে চিত্রকূট হতে আট মাইল দূরে অনুসূয়া দেখতে রওনা হলাম। দুজনেই অশ্বারোহণে চললাম, ভাড়া লাগলো ৷৷৵০ আনা। এবার ঘোড়ায় চড়তে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ হলো না। পূর্ববর্ণিত জানকীকুণ্ড ও ফটিকশিলা পার হয়ে দিগন্তপ্রসারী নিস্পন্দ অরণ্যানীর ভেতর দিয়ে চললাম। মনে হলো, অত্যন্ত কুণ্ঠাসহকারে গভীর বনানী যেন মানুষকে একটু রাস্তা ছেড়ে দিয়েছে। একটি ক্ষুদ্র গ্রামের পর একটি জঙ্গলাকীর্ণ নাতিউচ্চ পাহাড়ের চড়াই ও উৎরাই অতিক্রম করতে হলো। প্রায় মাইলখানেক রাস্তা শিলাখণ্ডের উপর দিয়ে হেঁটে গেলাম। কতদূর যেয়ে এক বিরাটকায় ঝরনা পার হলাম—নাম ঝুড়িনদী। এর তীরে মহাবীরের একটি ভগ্নমন্দির আছে। ক্রমেই গভীর হতে গভীরতর অরণ্যের মধ্য দিয়ে বেলা ১৷৷০টার সময় একটি গগনস্পর্শী খাড়া পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত অনুসূয়া এসে উপস্থিত হলাম। সম্মুখ দিয়ে মন্দাকিনী সবেগে কুলকুল-নাদে প্রবাহিতা। নদীবক্ষে স্থানে স্থানে ছোট বড় উপলখণ্ডগুলি এক একটি দ্বীপ সৃষ্টি করেছে; অপর তীরে বনাকীর্ণ পর্বত মস্তক উত্তোলন করে প্রশান্ত মূর্তিতে দাঁড়ায়ে স্থানটির প্রাকৃতিক দৃশ্যকে মনোমুগ্ধকর করে রেখেছে। পর্বত-গাত্রে সিদ্ধ বাবার আশ্রম, একটি বড় ধর্মশালা, রাম লক্ষ্মণ, নৃসিংহ ও মহাদেবের মন্দির আছে। এখানে চারটি গুহা আছে, কিন্তু পরিত্যক্ত। শুনলাম, গুহা-গুলি সম্প্রতি বাঘের আড্ডায় পরিণত। জনমানব-হীন বলে এ গুলির ভেতর না দেখে অতি নিকটেই অনুসূয়া দেবীর ক্ষুদ্র মন্দিরে গেলাম। এখানে একজন পূজারী এবং মন্দাকিনীর বক্ষস্থিত উপল-খণ্ডের উপর উপবিষ্ট কয়েকজন যাত্রী দেখলাম। মন্দির অঙ্গনে উপবেশন করে বিশ্রামছলে অনেকক্ষণ স্থানটির অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করলাম। গৌহাটির নিকটবর্তী বশিষ্ঠ গুহা হতেও স্থানটি মনোরম। বিশ্রামান্তে স্বচ্ছসলিলা মন্দাকিনীগর্ভে স্নান করে দুর্বাসা, দত্তাত্রেয়, অনুসূয়া দেবী ও রামচন্দ্রের পদচিহ্ন দর্শন ও স্পর্শ করলাম। অত্রীমুনি, দুর্বাসা প্রভৃতি এখানেই তপস্যা করে-ছিলেন। অত্রীমুনির পত্নীর নাম অনুসূয়া। এমন মনোরম নির্জন তপস্যাক্ষেত্র খুব কমই দেখা যায়। পাণ্ডাজী প্রাতে এখানে এসে বিগ্রহের সেবা করেন এবং সন্ধ্যার পূর্বে চলে যান। শুনলাম, কচিৎ কখনও দুএকজন সাধু ভিন্ন রাতে এখানে কেউ থাকেন না, কারণ, এখানে সব রকম হিংস্র জন্তুর ভয় যথেষ্ট। মন্দিরটি বান্দা জেলার অন্তর্গত কামতা-রজৌলা ষ্টেটের অধীন। এই জনমানব-সম্পর্কশূন্য দুর্গম স্থানে অবস্থিত ক্ষুদ্রাকৃতি অনুসূয়া দেবীর মন্দিরের জন্য পাণ্ডাজী প্রতি বৎসর দেড়শ টাকা ষ্টেটকে সেলামী দেন। এখানকার দ্রষ্টব্য সব দেখে বেলা ৩টার সময় রওনা হয়ে রাত ৮টার সময় চিত্রকূটে এলাম। পরদিন বেলা ৩টার সময় শ্রীরামচন্দ্রের লীলাভূমি চিত্রকূট হতে বাসে কার্ভি ষ্টেসনে এসে তীর্থরাজ প্রয়াগের ট্রেনে উঠলাম এবং মনের আনন্দে গাইলাম—

"জপতঃ সর্ববেদাংশ্চ সর্বমন্ত্রাংশ্চ পার্বতি।
তস্মাৎ কোটিগুণং পুণ্যং রামনাম্নৈব লভ্যতে॥
প্রাণপ্রয়াণ সময়ে রামনাম সকৃৎ স্মরেৎ।
স ভিত্ত্বা মণ্ডলং ভানোঃ পরংধামাভিগচ্ছতি॥"

'হে পার্বতি, সমস্ত বেদমন্ত্র জপ করলে যে ফল লাভ হয়, তা হতে কোটিগুণ পুণ্য হয় রাম নামে। প্রাণপ্রয়াণ সময়ে যে একবার রাম নাম করে, সে সূর্যমণ্ডল ভেদ করে পরমধামে গমন করে।'

আমাদের গোল কোথায় ?

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, এম্-এ

কিছুদিন হইল "হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডে" জে-বি-প্রিষ্ট্‌লী নামক একজন চিন্তাশীল মনীষী কর্ত্তৃক লিখিত একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম—"What is Wrong with us" অর্থাৎ আমাদের গোল কোথায় ? প্রবন্ধটি সত্য ও সুষ্ঠু চিন্তার জন্য এত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে ভাবিয়াছিলাম সমস্ত প্রবন্ধটি অনুবাদ করিয়া 'উদ্বোধনে'র পাঠকদিগকে উপহার দিব ; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কাগজটি হারাইয়া যাওয়ায় সে কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলাম না। তবে স্মৃতি হইতে তাহার ভাবটি এখনো বিলুপ্ত হয় নাই—সুতরাং তাহার সারাংশটি স্মৃতি হইতে উদ্ধার করিয়া দিতেছি। আশা করি, ইহাতে অনেকে ভাবিবার কথা পাইবেন এবং প্রাচীন যে একেবারে অশ্রদ্ধার যোগ্য নহে পরন্তু শ্রদ্ধার যোগ্য তাহারও আশ্বাস পাইবেন। প্রিষ্ট্‌লী যাহা লিখিয়াছেন তাহার ভাব এইরূপ :—

আমি চিরকালই সাংসারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলাম। ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিক সম্বন্ধে আমার গোঁড়ামী তো দূরের কথা, কোন বিশেষ মতামতই ছিল না, একেবারে উদাসীন ছিলাম বলিলেই হয়। আমি আমেরিকা যাইয়া দেখিলাম যে সেখানকার লোক সমৃদ্ধির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে। আমি যাহা যাহা ভাল মনে করিতাম বা চাহিতাম, আমার মনের ভাব ছিল যে প্রত্যেক ব্যক্তিরই তাহা পাওয়া উচিত। ভোগ্য বিষয়ে শুধু সমান অধিকার নহে—সকলেরই প্রাপ্তব্য বা ভোগ্য উপকরণগুলি প্রাপ্ত হইয়া সংসারে আনন্দিত হওয়া উচিত। শুধু আমিই ভোগ করিব আর সকলে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিবে এরূপ মনোভাব আমার আদৌ ছিল না। পরন্তু আমি ভাবিতাম যে আমি তো এ সব ভোগ করিবই, জগতের প্রত্যেক ব্যক্তিও এই সকল ভোগ করিয়া সুখী হউক। আমেরিকা যাইয়া দেখিলাম যে যাহা আমি কল্পনা করিতাম, কোন ক্ষেত্রে তাহা বাস্তবে পরিণত হইয়াছে অর্থাৎ তত্রত্য প্রত্যেক অধিবাসীরই মোটরকার, ভাল বাড়ী, রেডিও, বৈদ্যুতিক আলো, পাখা আরও কত কি সবই আছে। সকলেই প্রাণভরিয়া ভোগের সর্ব্ববিধ উপাদান পাইয়াছে।

কিন্তু এইখানেই একটা মস্ত 'কিন্তু' দেখিলাম। জীবনের ঈপ্সিত যাবতীয় ভোগোপকরণ প্রাপ্তি সত্ত্বেও দেখিলাম যে কোন জায়গায় যেন একটা বিষম গোল আছে—সকলে যেন সুখী নহে, অনেকের নিকট যেন জীবনটা নীরস একঘেঁয়ে হইয়া গিয়াছে। অনেককে মনে হইল যেন একেবারে দুঃখগ্রস্ত। ভাবিলাম, ইহার কারণ কি ? খুঁজিয়া দেখিলাম, কারণ এই যে যুবকদিগের কোনো আদর্শ নাই—লাইব্রেরীতে যে সব দুই আনা দামের বই পাওয়া যায়, যাহাতে লেখা থাকে বিবর্ত্তনবাদের ছুটকোর মত অন্তঃসারবিহীন অগভীর চিন্তার ফল—এই জীবনটাই সব আর আমরা শুধু একটা বংশপরম্পরাগত বিবর্ত্তন, অবশ্যম্ভাবী পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের একটা বাঁধাধরা অভিব্যক্তি মাত্র—আর কিছুই নহে, সেই সব মূল্যহীন অসার পুস্তকপ্রচারিত তুচ্ছ মতবাদে ইহাদিগের মস্তিষ্ক পরিপূর্ণ, তাই তাহাদের জীবন এত ভূমা ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থাকিয়াও এত অকিঞ্চিৎকর, এত তুচ্ছ, এত নগণ্য। আমি ছিলাম যাকে বলে Rationalist অর্থাৎ যুক্তিবাদী—কোনো বিশেষ ধর্ম্মেরই ধার ধারিতাম না।

কিন্তু এই সকল সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্যবেষ্টিত ব্যক্তিদিগের এইরূপ মানসিক ও চারিত্রিক দুরবস্থা দেখিয়া আমি অজ্ঞাতসারে আস্তে আস্তে যেন ভাবুক ও প্রজ্ঞাবাদীদিগের দলে কোন চেষ্টা না করিয়াই ভিড়িয়া পড়িতেছি।

অতঃপর লেখক ইহ-সর্ব্বস্ব বিবর্ত্তন বাদের কতিপয় সিদ্ধান্তের হাস্যাস্পদত্ব ও অসারত্ব অতি রমণীয়ভাবে অল্প কথায় প্রতিপাদন করিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন—

আমরা কি করিয়াছি? কতগুলি এরোপ্লেন, মোটরকার ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু আমার মনে হয় যে প্রাচীনেরা ইহা অপেক্ষা অনেক বড় বড় জিনিস আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

'উদ্বোধনের' গ্রাহকগণ সকলেই বোধ হয় ভক্ত ও ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসু। সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে হয়তো অনেকে বলিবেন যে প্রিষ্টলী সাহেবের যাহা মত আমাদেরও তো সেইই মত সুতরাং সে মতটাকে লেখক এত ভণিতা করিয়া 'ফালাও' করিতেছেন কেন? কথাটা খুবই সত্য। যদি আমরা "স্বে মহিম্নি" প্রতিষ্ঠিত ঋষিদিগের মত "স্ব-মহিমায়" অথবা "স্বে মহিম্নি" প্রতিষ্ঠিত থাকিতাম, প্রাচীনের প্রতি অশ্রদ্ধাসম্পন্ন না হইতাম, তাহা হইলে এই সাদা কথা কয়টি একটি আধুনিক সাহেবের মুখ হইতে বাহির হইয়াছে বলিয়া তাহাকে এতটা মহার্ঘ্য জ্ঞান করিতাম না। কিন্তু আজকাল যাঁহারাই সংবাদপত্র পড়েন ও সমাজের চলমানপ্রবাহ একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেন, তাঁহারাই দেখিয়া থাকিবেন, সমাজ আজ কোন্‌দিকে চলিয়াছে। রাজা রামমোহন রায় ও রবীন্দ্রনাথ হইতে যত নামজাদা দার্শনিক, ঔপন্যাসিক, সংবাদপত্রের লেখক, প্রচারক আছেন তাঁহাদের মধ্যে শতকরা নিরনব্বই জন ব্যক্তিই আজ পশ্চিমের দিকে মুখব্যাদান করিয়া আছেন। তাঁহাদিগের নিকট হইতে জীবনপ্রণালী পরিচালনার পদ্ধতি শিখিবার জন্য 'উপুসী ছার-পোকার' মত আজ ভারতবাসী পশ্চিম হইতে যে কোনো ভোগবাদ আসিতেছে তাহাই গলাধঃকরণ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া পড়িয়াছে। সংবাদ-পত্র সকলও তাহার খোরাক অহরহ যোগান দিতেছে এবং যে কাগজ যত বেশী তথাকথিত অগ্রগতির প্রচণ্ড প্রচারক হইতেছে ও প্রাচীনকে অবমানিত করিতেছে, এক শ্রেণীর লোকের নিকট সেই কাগজেরই তত বেশী আদর হইতেছে। এ ক্ষেত্রে যদি আমার মত একজন নগণ্য ব্যক্তি—যে প্রাচীনের টলমলায়মান খুঁটি ধরিয়া ঝুলিতেছে, সে কোনো কথা বলে, তাহার কথা গ্রাহ্য হইবে কেন? বিশেষতঃ যে ঐশ্বর্য্য ভোগ করে নাই অথবা তেমন করিবার সুযোগ লাভ করে নাই, সে যদি পশ্চিম হইতে আমদানী বর্ত্তমানের উচ্ছলিত ও উচ্ছ্বসিত ভোগ-প্রণালী রোধের কথা বলে আর প্রাচীনের নিয়ন্ত্রিত ভোগের সমর্থন করে, তবে এই প্রবল উচ্ছ্বাসের সময়—যখন অন্নপূর্ণারূপে পূজিতা মহিয়সী মহিলাগণও এই উত্তাল তরঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছেন—তাহার কথা কে শুনিবে? যদি বলি যে এই ভারতে "স্ত্রিয়ঃ সমস্তা সকলা জগৎসু" বাণী ধ্বনিত হইয়াছিল, সমস্ত নারীতে জগতের মাতা প্রতিবিম্বিত সুতরাং নায়িকা ভাবের পরিবর্ত্তে সকল নারীতে অন্নপূর্ণা বা পার্ব্বতী ভাবের আরোপ করা উচিত, ইহাই প্রাচীনের শিক্ষা, তখনই কি বর্ত্তমান যুবক যুবতীর পরমগুরু শ্রীশ্রীফ্রয়েড প্রমুখ Sex Psychologist-দিগের চরণ-বজ্রঃবুভুক্ষু মদন ও বসন্ত-সেনাদল ইডিপাস্ কম্‌প্লেক্‌স, লিবিডো (Oedipus Complex, Libido), রিপ্রেসন্, সাপ্রেসন্ ও এক্সপ্রেসন্ প্রভৃতি বারম্বার আম্রেড়িত বুলিগুলি আওড়াইতে আওড়াইতে শুধু বাক্যবাণ দ্বারাই প্রাচীনপন্থীকে জাহান্নমে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিবেন না।

আরো অনেক বিশেষ বিশেষ কারণ আছে যে জন্য এখন পাশ্চাত্যদিগের মত উদ্ধার করিয়া আমাদিগের আচার্য্যদিগের মতের পরিপোষণ করিতে হয়। ভবিষ্যতে অন্যান্য মনীষীদিগের মতামত সম্বলিত প্রবন্ধে দেখাইবার চেষ্টা করিব যে, কি ভাবে স্বকীয় দুর্ব্বার কুৎসিত বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া, সত্যকে কোণঠাসা করিয়া শুধু কাগজ-বাজী ও গলাবাজী করিয়া কতকগুলি ব্যক্তি আমাদের বালক বালিকা ও যুবক যুবতীকে মোহগ্রস্ত করিয়া দুর্ব্বল হইতে দুর্ব্বলতর করিয়া তুলিতেছেন।

পঞ্চদশী

অনুবাদক পণ্ডিত শ্রীদুর্গাচবণ চট্টোপাধ্যায়

শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনের লক্ষণ

দ্রব্যেব শেষোক্ত লক্ষণটি নৈয়ায়িকদিগেব অনুমোদিত। যাহা কর্ম্ম নহে, অথচ জাতিমাত্রে আশ্রয় তাহাব নাম গুণ। যাহা নিত্য ও এক হইয়া (সমবায় সম্বন্ধে) অনেক ধর্ম্মীতে অনুগত বা অনুস্যূত ধর্ম্ম, তাহা সামান্য বা জাতিব লক্ষণ। সংযোগ ও বিয়োগেব অসমবায়িকাবণেব সজাতীয় কর্ম্মেব নাম ক্রিয়া। এই সকলগুলিই বজ্জুতে সর্পেব ন্যায় আত্মবস্তুতে কল্পিত ইহাই তাৎপর্য্য। (এই লক্ষণগুলিব সবিশেষ বিববণ ও পবীক্ষা, বাবান্তবে দেওয়া যাইবে)। ৫২

এতদূব গ্রন্থবচনা কবিয়া, কি বলা হইল? এইরূপ জানিবাব ইচ্ছা হইতে পাবে বলিয়া ইহাব ফলিতার্থ বলিতেছেন ঃ—

ইত্থং বাক্যৈস্তদর্থানুসন্ধানং শ্রবণংভবেৎ।
যুক্ত্যা সম্ভাবিতত্বানুসন্ধানং মননন্তু তৎ॥ ৫৩

অন্বয়—ইত্থম্ বাক্যৈঃ তদর্থানুসন্ধানম্ শ্রবণম্ ভবেৎ। যুক্ত্যা সম্ভাবিতত্বানুসন্ধানম্ তৎ তু মননম্।

অনুবাদ—এইরূপে মহাবাক্য চতুষ্টয়ের সাহায্যে জীবব্রহ্মের অভেদরূপ, সেই সকল বাক্যেব যে তাৎপর্য্য, তাহার অনুসন্ধানকেই শ্রবণ বলে। আব যুক্তি দ্বাবা জীবব্রহ্মেব সেই অভেদরূপ তাৎপর্য্যার্থের যে সম্ভাবিতত্ব, তাহাব অনুসন্ধানের —আপন হৃদয়ে সমর্থনেব নাম মনন।

টীকা—"ইত্থম্"—৪৪সংখ্যক শ্লোক হইতে আবম্ভ কবিয়া ৫২ সংখ্যক শ্লোক পর্য্যন্ত অংশে যে প্রকার বা প্রণালী কথিত হইয়াছে, সেই প্রকারে "বাক্যৈঃ"—"তত্ত্বমসি"প্রভৃতি মহাবাক্য চতুষ্টয় দ্বাবা "তদর্থানুসন্ধানং'—সেই সকল বাক্যেব, জীবব্রহ্মেব একতা বা অভেদরূপ যে অর্থ, তাহাব অনুসন্ধানই শ্রবণ। [এস্থলে গুরুমুখ হইতে উপদিষ্ট মহাবাক্যেব সহিত শ্রোত্রসংযোগ বা জ্ঞানেব হেতুভূত যে শ্রবণ তাহাই অভিপ্রেত। তাহা অঙ্গী, তাহাব অঙ্গরূপ অপব প্রকার শ্রবণ অর্থাৎ শ্রুতিষড্ লিঙ্গেব সাহায্যে অদ্বৈতব্রহ্মই শ্রুতিবাক্যসমূহের তাৎপর্য্য, এইরূপ নিশ্চয় যাহাব ফল, সেই বেদান্তবাক্যবিচাবরূপ দ্বিতীয়প্রকাব শ্রবণ এস্থলে অভিপ্রেত নহে। কেননা ইহাব দ্বাবা প্রমাণগত সংশয় নিবৃত্ত হয় মাত্র, জ্ঞান হয় না। ইহা তৃপ্তি দীপেব ১০১ সংখ্যক শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। "যুক্ত্যা"—৩ সংখ্যক শ্লোক হইতে আবম্ভ কবিয়া ৪৩ সংখ্যক শ্লোক পর্য্যন্ত বর্ণিত প্রকার যুক্তির সাহায্যে "সম্ভাবিতত্বানুসন্ধানম্"—যে অর্থ শ্রুত হইয়াছে, তাহা সম্ভবপব এইরূপ যে জ্ঞান "তৎ তু মননম্"—তাহাকেই 'মনন' বলে। (তাহা তৃপ্তিদীপে ১০২ সংখ্যক শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে)। ৫৩

এইরূপে শ্রবণ ও মননের লক্ষণ কবিলেন। এক্ষণে নিদিধ্যাসন বর্ণনা কবিতেছেন ঃ—

তাভ্যাং নির্ব্বিচিকিৎসেঽর্থে
চেতসঃ স্থাপিতস্য যৎ।
একতানত্বমেতদ্ধি নিদিধ্যাসনমুচ্যতে ॥৫৪

অন্বয়—তাভ্যাম্ নির্ব্বিচিকিৎসে অর্থে স্থাপিতস্য চেতসঃ যৎ একতানত্বম্ এতৎ নিদিধ্যাসনম্ উচ্যতে হি।

অনুবাদ—সেই শ্রবণমননদ্বারা জীবব্রহ্মের অভেদরূপ অর্থ নিঃসন্দেহরূপে অবধারিত হইলে, তাহাতে চিত্ত স্থির করিলে, চিত্তে একাকার বৃত্তি-প্রবাহ চলিতে থাকে, তাহাকেই নিদিধ্যাসন বলে।

টীকা—"তাভ্যাম" সেই শ্রবণমনন দ্বারা "নির্ব্বিচিকিৎসে অর্থে" তাহা নির্ব্বিচিকিৎস—নিবৃত্ত হইয়াছে বিচিকিৎসা বা সংশয় যাহা হইতে, সেই-রূপ অর্থে অর্থাৎ জীবব্রহ্মের একতারূপ মহাবাক্যার্থ-রূপ বিষয়ে "স্থাপিতস্য চেতসঃ"—ধারণাবিশিষ্ট চিত্তের, কেননা পতঞ্জলি কহিয়াছেন, "দেশসংবন্ধ (বন্ধ ?) শ্চিত্তস্য ধারণা" (যোগসূত্র ৩।১), ইন্দ্রিয় সকল প্রত্যাহৃত হইলে হৃৎপদ্মাদি আধ্যাত্মিক দেশে অথবা বাহ্যদেশে চিত্তের বন্ধনের নাম ধারণা। আধ্যাত্মিক দেশে ভাবনাদ্বারা চিত্ত বদ্ধ হয়। বাহ্যদেশে তদাকার বৃত্তির দ্বারা চিত্ত বদ্ধ হয়। এই ধারণা দ্বারাই ধ্যান অর্থাৎ প্রত্যয়ের বা চিত্তবৃত্তির, একতানতা বা একাকারতা সম্ভব হয় বলিয়া 'ধারণাবিশিষ্ট চিত্তের' এইরূপ অর্থ করিতে হইল। (৬ষ্ঠ অধ্যায় চিত্রদীপ ২৮০ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। "যৎ একতানত্বম্"—(ব্রহ্ম ও আত্মার) একতারূপ যে একত্ব, তাহার আকারে আকারিত চিত্তবৃত্তির প্রবাহরূপতা, "এতৎ নিদিধ্যাসনম্ উচ্যতে হি" ইহাকেই নিদিধ্যাসন বলে, ইহা যোগশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। নিদিধ্যাসন বিজাতীয় প্রত্যয়ের অর্থাৎ অনাত্মাকার বৃত্তিসমূহের তিরস্করণ বা নিরাস ও স্বজাতীয় প্রত্যয়ের অর্থাৎ আত্মাকার বৃত্তিসমূহের প্রবণতা বা প্রবাহস্থাপন। (তৃপ্তিদীপ ১০৫-১২৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য) "হি"—শব্দদ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, এই নিদিধ্যাসনে যোগশাস্ত্রে (ধ্যান নামে) প্রসিদ্ধ, কেননা যোগসূত্রে (৩।২৯) ইহার লক্ষণ করা হইয়াছে "প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্", ধারণায় জ্ঞানবৃত্তির একতানতা বা অবিচ্ছিন্ন ধারা হইলে তাহাকে ধ্যান বলে। সেই নিদিধ্যাসনের পরিপাক দশারূপ সমাধির বর্ণন করিতেছেন :—

ধ্যাতৃধ্যানে পরিত্যজ্য ক্রমাদ্ধ্যেয়ৈকগোচরম্।
নির্ব্বাতদীপবচ্চিত্তং সমাধিরভিধীয়তে ॥ ৫৫

অন্বয়—ধ্যাতৃধ্যানে ক্রমাৎ পরিত্যজ্য ধ্যেয়ৈক গোচরম্ নিবাতদীপবৎ চিত্তম্ সমাধিঃ অভিধীয়তে।

অনুবাদ—(সেই নিদিধ্যাসনে অভ্যাস-পটুতা দ্বারা) ধ্যাতা ও ধ্যানকে ক্রমে পরিত্যাগ করিয়া চিত্তবৃত্তি যখন কেবল ধ্যেয়রূপতা ধারণ করে, তখন নিবাতদেশে অবস্থিত (নিষ্কম্প) প্রদীপের ন্যায় চিত্তের সেই অবস্থাকে সমাধি বলে।

টীকা—নিদিধ্যাসনের প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ অপরিপক্কাবস্থায় (১) ধ্যাতা,—ধ্যানের কর্তা অর্থাৎ চিদাভাসযুক্ত অন্তঃকরণ, (২) ধ্যান—ধ্যেয়াকার চিত্তের বৃত্তিপ্রবাহ ও (৩) ধ্যেয—ধ্যানের বিষয় ব্রহ্ম, এই ত্রিপুটী প্রতীত হয়। তন্মধ্যে, চিত্ত যখন অভ্যাসের পটুতাবশতঃ, "ধ্যাতৃধ্যানে ক্রমাৎ পরিত্যজ্য"—ধ্যাতা ও ধ্যানকে ক্রমে পরিত্যাগ করিয়া "ধ্যেয়ৈকগোচরম্"—(ভবেৎ) ধ্যেয় যে ব্রহ্ম, তাহাই একমাত্র গোচর বা বিষয় যাহার, এইরূপ হইবে, তখন, "সমাধিঃ অভিধীয়তে"—সেই চিত্তকে 'সমাধি' এইরূপ বলা হয়। (ইহাই সমাধির আকার বা স্বরূপ। সমাধির লক্ষণ, চিত্রদীপের ২৮০ সংখ্যক শ্লোকের টীকায় দ্রষ্টব্য।) চিত্তের সেই সমাধিরূপতার দৃষ্টান্ত দিতেছেন :—"নিবাতদীপবৎ" —('নিবাত' শব্দে একান্ত বায়ুশূন্য স্থান নহে, কেননা সেইরূপ স্থলে প্রদীপ জ্বলিতেই পারে না) নিবাত স্থানে অর্থাৎ যেস্থলে বায়ু নিশ্চল হইয়াছে, সেইরূপ স্থানে বিদ্যমান দীপ যেমন নিশ্চল হয়, সেইরূপ নিশ্চল অর্থাৎ ধ্যেয়াকারে আকারিত যে চিত্ত, তাহাকেই সমাধি বলে, ইহাই অভিপ্রায়। (শ্রুতিতে আছে বায়ু হইতেই অগ্নির উৎপত্তি, অর্থাৎ বায়ুই অগ্নির উপাদান কারণ বলিয়া, অগ্নির উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় বায়ুর অধীন। এই হেতু বায়ুর সর্ব্বথা অভাব ঘটিলে, প্রদীপের স্থিতি অসম্ভব

হইয়া পড়ে। সেই কারণ 'নিবাত' শব্দে, বায়ুর স্ফুরণরূপে অভাব ও অস্ফুরণ বা সূক্ষ্মরূপে বায়ুর স্থিতি সূচিত হইয়াছে। সেইরূপ সমাধির অবস্থায় অন্তঃকরণের একান্ত অভাব হইলে শরীরের স্থিতিই অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই কারণে মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কাররূপ স্ফুরণশূন্য বা বৃত্তিরহিত হইয়া অন্তঃকরণ সূক্ষ্মরূপে অর্থাৎ মূল অন্তঃকরণরূপে অবস্থিত হইলে তাহাই 'সমাধি'। ৫৫

(শঙ্কা) ভাল, সমাধিতে যখন বৃত্তি প্রতীত হয় না, তখন বৃত্তিসমূহ ধ্যেয়মাত্রকেই বিষয় করিল, এইরূপ নিশ্চয় করা ত' দুর্ঘট। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন যে সমাধিকালে বৃত্তিসমূহ থাকে, তাহা অনুমান প্রমাণ দ্বারা জানিতে পারা যায় বলিয়া উক্তরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না।

বৃত্তয়স্তু তদানীমজ্ঞাতা অপ্যাত্মগোচরাঃ।
স্মরণাদনুমীয়ন্তে ব্যুত্থিতস্য সমুত্থিতাৎ ॥৫৬

অন্বয়—আত্মগোচরাঃ বৃত্তয়ঃ তু তদানীং অজ্ঞাতাঃ অপি, ব্যুত্থিতস্য সমুত্থিতাৎ স্মরণাৎ অনুমীয়ন্তে।

অনুবাদ—আত্মবিষয়িণী বৃত্তিসমূহ সমাধিকালে অজ্ঞাত থাকিলেও সমাধিভঙ্গে যখন স্মৃতি জাগিয়া উঠে, তখন সেই স্মরণ হইতে সেই সকল বৃত্তির অনুমান হয়।

টীকা—"আত্মগোচরাঃ বৃত্তয়ঃ"—আত্মা গোচর অর্থাৎ বিষয় যাহাদের, এইরূপ বৃত্তি সকল, "তু তদানীম্ অজ্ঞাতাঃ অপি"—সেই সমাধিকালে অপ্রতীত থাকিলেও, "ব্যুত্থিতস্য সমুত্থিতাৎ স্মরণাৎ"—সমাধি হইতে উত্থিত পুরুষের যে স্মৃতি সম্যক প্রকারে উৎপন্ন হয়—যে আমি এতক্ষণ সমাধি অনুভব করিতেছিলাম, এইরূপ স্মৃতি হইতে অনুমীয়ন্তে—অনুমিত হইয়া থাকে, কেননা যাহা যাহা স্মৃত হয়, তাহা পূর্ব্বে অনুভূত হইয়াছে এই ব্যাপ্তি বা অবিনাভাব সম্বন্ধ লোকসিদ্ধ অর্থাৎ সর্ব্বজনবিদিত, ইহাই অর্থ। ৫৬

(শঙ্কা) ভাল, যে প্রযত্নে বৃত্তি উৎপাদিত হইয়া থাকে সেই প্রযত্ন ত' সেই সমাধিকালে থাকে না; তাহা হইলে কি প্রকারে বৃত্তির অনুবৃত্তি থাকিতে পারে? অর্থাৎ ব্রহ্মাকার প্রবাহরূপে একবৃত্তির পরে অপর বৃত্তির বিদ্যমানতা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন যে তাৎকালিক প্রযত্ন না থাকিলেও পুণ্যরূপ অদৃষ্ট প্রভৃতি সহকারীর সহিত মিলিত হইলে, আরম্ভকালীন প্রযত্ন হইতেই বৃত্তির অনুবৃত্তি চলিতে থাকে।

বৃত্তীনামনুবৃত্তিস্তু প্রযত্নাৎ প্রথমাদপি।
অদৃষ্টাসকৃদভ্যাসসংস্কারসচিবাদ্ভবেৎ ॥

অন্বয়—বৃত্তীনাম্ অনুবৃত্তিঃ তু প্রথমাৎ অপি প্রযত্নাৎ অদৃষ্টাসকৃদভ্যাসসংস্কারসচিবাৎ ভবেৎ।

অনুবাদ—(সমাধিকালে ব্রহ্মাকারা অন্তঃকরণবৃত্তির উৎপাদক প্রযত্ন না থাকিলেও পুণ্যরূপ) অদৃষ্ট ও নিরন্তর অভ্যাসজনিত সংস্কার সহকারী হইলে পূর্ব্বকৃত প্রযত্ন হইতেই ব্রহ্মাকারা বৃত্তির অনুবৃত্তি চলিতে থাকে (যেমন কুম্ভকার দণ্ডদ্বারা চক্রকে ঘুরাইয়া দণ্ডটি উঠাইয়া লইলেও চক্র পূর্ব্বকালীন চেষ্টাদিবশতঃ আপনিই ঘুরিতে থাকে, বৃত্তির অনুবৃত্তিও সেইরূপ)।

টীকা—"প্রথমাৎ অপি প্রযত্নাৎ"—সমাধির পূর্ব্বকালীন কৃতি বা উৎসাহ বিশেষ হইতে ও "অদৃষ্টাসকৃদভ্যাসসংস্কারসচিবাৎ"— অদৃষ্ট অর্থাৎ অশুক্ল অকৃষ্ণ কর্ম্ম নামক যে পুণ্যবিশেষ তাহা, কেননা পতঞ্জলি সূত্র করিয়াছেন—"কর্ম্মাশুক্লাকৃষ্ণং যোগিনাং ত্রিবিধমিতরেষাম্।" (৪।৭) যোগিগণের কর্ম্ম অশুক্ল অকৃষ্ণ, অন্য সকলের কর্ম্ম ত্রিবিধ অর্থাৎ হয় কৃষ্ণ, না হয় শুক্ল, না হয় শুক্লকৃষ্ণ। [হিংসাদি তামসিক কর্ম্ম, যাহার ফল দুঃখ, তাহাই কৃষ্ণকর্ম্ম।

যাগাদি রাজসিক কর্ম্ম, যাহার ফল অল্পদুঃখ-মিশ্রিত সুখ, তাহাই শুক্লকৃষ্ণ। স্বাধ্যায়াদি সাত্ত্বিক কর্ম্ম, যাহার ফল অমিশ্রিত সুখ, তাহাই শুক্ল কর্ম্ম। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি প্রভৃতি কর্ম্ম যাহা ত্রিগুণজনিত নহে এবং যাহার ফল সুখদুঃখবর্জ্জিত তাহাই অশুক্ল—অকৃষ্ণ।] "অসকৃদভ্যাসসংস্কার"—পুনঃ পুনঃ সমাধির অভ্যাস দ্বারা উৎপাদিত ভাবনা নামক সংস্কার অর্থাৎ যে সংস্কার অনুভব হইতে উৎপন্ন এবং স্মৃতির হেতু, সেই সংস্কার। অদৃষ্ট ও ভাবনা নামক সংস্কার এই দুইটি 'সচিব' অর্থাৎ সহকারি কারণরূপে বর্ত্তমান যাহার, সেইরূপ, "প্রথমাৎ অপি প্রযত্নাৎ"—সমাধির পূর্ব্বকালীন কৃতি বা উৎসাহবিশেষ হইতে, "বৃত্তীনাম্ অনুবৃত্তিঃ ভবেৎ"—ধ্যেযমাত্রবিষয়ক অর্থাৎ কেবল ব্রহ্মাকার বৃত্তিসমূহের প্রবাহরূপে অনুগমন ঘটিয়া থাকে। ৫৭

শ্রীগৌরীমাতার মহাপ্রয়াণ

গত ১৬ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার, রাত্রি ৮টা ১৫ মিনিটের সময় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্যা তপস্বিনী গৌরীমাতাজী নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া শ্রীগুরুপদে লীন হইয়াছেন। পরদিন প্রাতে ৯ ঘটিকার সময় তাঁহার দেহ ২৬নং মহারাণী হেমন্তকুমারী ষ্ট্রীটস্থ শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম হইতে কাশীপুর শ্মশান ঘাটে নীত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাসমাধি স্থানের নিকট সৎকার করা হয়। তাঁহার বয়ঃক্রম অনুমান ৯০ বৎসর হইয়াছিল।

মাতাজীর পিতার নাম পার্ব্বতীচরণ চট্টোপাধ্যায় এবং মাতার নাম গিরিবালা দেবী। কালীঘাট অঞ্চলে তাঁহার পিতৃভবন ছিল। ৯।১০ বৎসর বয়সে মাতাজী প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন লাভ করেন। অতঃপর পরমভক্ত বলরাম বসু মহাশয়ের সঙ্গে মাতাজী দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া তাঁহাকে দর্শন করেন। ইহার পর হইতে মাঝে মাঝে তিনি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর সহিত দক্ষিণেশ্বরে (নহবতে) বাস করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য রন্ধনাদি কার্য্যে সাহায্য করিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের অবতার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় তিনি ঈশ্বরীয় অনুভূতি লাভে সমর্থা হইয়াছিলেন। ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও কর্ম্মশক্তি বলে মাতাজী কলিকাতায় শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া জীবনের শেষ পর্য্যন্ত স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীগৌরী মাতা

সমালোচনা

আর্ট এণ্ড্ আর্কিয়লজি এ্যাব্রড্ (ইংবাজী)—শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ প্রণীত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১২৫ + ১৯টী প্লেট।

প্রাচ্য ভূখণ্ডেব উপব ভাবতীয় শিল্পকলাব বিস্তৃত ও সুগভীব প্রভাবের প্রতি যাঁবা অধুনা আমাদেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবেছেন, তাঁদেব মধ্যে শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ একজন অগ্রণী। বিশাল ভাবত-সমিতিব মূলে বয়েছে তাঁবই উৎসাহ ও প্রেবণা। গত ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে গোটাকয়েক বিদেশী শিক্ষাসংসদ্ ও সমিতিব আহ্বানে তিনি আমেবিকা ও যুবোপেব নানা স্থান পবিদর্শন কবেন ও ভাবতেব শিল্পকলা সম্বন্ধে কতকগুলি বক্তৃতা দান কবেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েব 'ঘোষ ট্র্যাভেলিং ফেলো' রূপে তিনি এই ভ্রমণেব সুযোগ লাভ কবেছিলেন, তাই প্রত্যাবর্তনেব পব বিভিন্ন দেশে শিল্প ও পুবাতত্ত্ব আলোচনা ও অনুসন্ধানেব জন্য যে সব বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও যাদুঘব বয়েছে, তাদেব সম্বন্ধে একটী বিববণ বিশ্ববিদ্যালযকে দান কবেন। ভাবতীয ছাত্রগণের মধ্যে যাঁবা বিদেশে বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানে গিয়ে শিল্প বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হ'তে চান, তাঁদেবই প্রয়োজন ও উপকারেব জন্য বিশ্ববিদ্যালয ঐ বিববন বর্তমানে পুস্তকাকাবে প্রকাশিত করেছেন।

পুস্তকেব পাঁচটী অধ্যায়ে ফ্রান্স, ইতালী, তুর্কী, গ্রীস, সিবিয়া, ইবাক, ইবাণ, আমেবিকাব যুক্তরাজ্য ও লাতিন আমেবিকায় নানাবিধ শিল্প-কলাব আলোচনা, শিক্ষাদান ও অনুসন্ধানেব কিরূপ ব্যবস্থা ও সুযোগ রয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত পরিচয দেওয়া হয়েছে। লেখকেব এই সংক্ষিপ্ত ও ক্ষুদ্র বিববণই প্রাচীন ও আধুনিক দেশসমূহে অতীতেব শিল্পকলাব উদ্ধাব ও আবিষ্কাব এবং বর্তমান শিল্পকে জাতীয় জীবনেব অনুভূতিব সংগে যুক্ত ক'রে সঞ্জীবিত ক'বে তোলবাব জন্য কি বিপুল ও ব্যাপক প্রচেষ্টা চলেছে, তা আমাদেব কাছে বেশ পবিস্ফুট কবেছে। কিন্তু আক্ষেপেব বিষয়, এখনো ভাবতে ঐ বিষয়ে একটা জাতিগত জাগ্রত চেতনাব ঢেউ এসে পৌছয় নি। বিপুল শিল্প সম্পদ্ থাকা সত্বেও ভাবত পুবাতত্ত্ব আলোচনায় কত পেছনে পড়ে বয়েছে, তা কিছুকাল পূর্বে প্রকাশিত মার্কহাম ও হাবগ্রিভস্ এব লিখিত ইণ্ডিয়ান মিউ-জিয়ামস্ সম্বন্ধে বিববণ পাঠেই বোঝা যায়। ভাবতেব শিল্পাদর্শ যে অদূব ভবিষ্যতেই পাশ্চাত্য শিল্প-কলাব ও শিল্প-জীবনেব মধ্যে একটী নূতন প্রেবণা ও যৌবন এনে দেবে এবং একটী নূতন রেনেসাঁস্ (Renaissance) এব প্রবর্তন কববে —অনেক পাশ্চাত্য শিল্প-মনীষী এ সম্বন্ধে স্পষ্ট উক্তি কবেছেন ও কবছেন। কিন্তু আমাদেব অনেকেই এখনো জাতীয় শিল্পস্বাতন্ত্র্যেব সুষমা ও শক্তি সম্বন্ধে অজ্ঞ।

পুস্তকখানা যাঁদেব জন্য প্রধানত প্রকাশিত, তাঁদেব উদ্দেশ্য ও প্রযোজন সিদ্ধিব সহায়তা কববে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পাবে। তবুও মনে হয়, বিববণ আবও বিস্তৃত ও বিশদ্ হলেই যথোপযুক্ত হ'ত। কাবণ, অনেক ক্ষেত্রেই পবিচয়গুলি সূচীপত্রেব মতই সংক্ষিপ্ত। পুস্তকেব শেষে ১৯টী প্লেটে বিভিন্ন স্থানেব শিল্পেব মোটামুটি পবিচয় হিসেবে ৩০ খানি চিত্র দেওয়া হয়েছে।

ব্রহ্মচাবী শিবচৈতন্য

পল্লীসখা—মৌঃ তছকীন উদ্দিন নুরী, কাব্যপ্রভাকর। প্রাপ্তিস্থান—(১) দি ফ্যাম্পিয়ল, দিনবাজার, (২) জনমত অফিস, জলপাইগুড়ি।

এই ছোট কবিতা পুস্তিকাটি সরল গ্রাম্য-ভাষায় লেখা। ইহাতে কবি খুব দরদী ভাষায় বর্তমান সাম্প্রদায়িকতার প্রতি হিন্দু ও মুসলমান কৃষকভাইদের প্রকৃত মনোভাব কি তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। বইখানিতে—পল্লীসখা হিন্দু ও মুসলমানের স্বার্থ যে একই ভাবে জড়িত ও তাহারা যে একই মাটির সন্তান, তাহা সরল ও আবেগময়ী ভাষায় বুঝান হইয়াছে। বইটি কথোপকথনের ভঙ্গীতে লেখা। কবি যতদূর সম্ভব ভাষাকে সরল ও অনাড়ম্বর করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তবুও ভাষার প্রকাশভঙ্গী স্থানে স্থানে আরও পরিষ্কার ও ছাপা নির্ভুল হওয়া উচিত। বর্তমানে সাম্প্রদায়িকতার বহ্নি যে ভাবে ধীরে ধীরে জাতীয় জীবনে প্রবেশ করিয়া সমাজ, রাষ্ট্র, এমন কি সাহিত্যকে পর্যন্ত আক্রমণ করিতে সুরু করিয়াছে, তাহাতে এই শ্রেণীর পুস্তকের বহুল প্রচার একান্ত কাম্য। আমরা কবিকে এই জাতীয় জীবনধ্বংসকারী সাম্প্রদায়িকতা-কণ্টক দূর করিতে সচেষ্ট হওয়ার জন্য অভিনন্দিত করিতেছি।

শ্রীহারাধন বসু, বি-এল্

পরমহংস পূর্ণানন্দ স্বামীর পত্রাবলী, ১ম খণ্ড—প্রকাশক 'আনন্দ ধাম', ২সি ধনদা ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৯৯ পৃষ্ঠা, মূল্য এক টাকা।

চট্টগ্রাম জগৎপুর আশ্রম এবং কামাখ্যা কাশীপুর আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা পরমহংস স্বামী পূর্ণানন্দ সময় সময় তাঁহার শিষ্যগণকে যে সকল পত্রাদি লিখিয়াছিলেন, তাহার কতকগুলি সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়দ্বয় পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়াছেন।

পুস্তকে সর্বশুদ্ধ ৭৩ খানা পত্র স্থান পাইয়াছে। পত্রগুলি পাঠ করিয়া আমরা সুখী হইয়াছি।

স্বামী প্রেমঘনানন্দ

সংবাদ

স্বামী অখিলানন্দ—আমেরিকা যাইবার প্রাক্কালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভিডেন্স সহরস্থ রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেণ্ট স্বামী অখিলানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ইউনাইটেড্ প্রেসের প্রতিনিধি আমেরিকার হিন্দু মিশনারীদিগের এবং ভারতে খৃষ্টান মিশনারীদিগের কার্য্যের তুলনামূলক অভিমত জানিতে চাহিলে স্বামীজি বলেন—

"বেদান্ত তত্ত্ব অর্থাৎ অদ্বৈতবাদ ও দৈনন্দিন জীবনে তাহার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে শিক্ষালাভের জন্য আমেরিকার কয়েকজন বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তি রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামীজিদিগকে (আমাদিগকে) আহ্বান করিয়াছিলেন। ধ্যানপদ্ধতি এবং অন্যান্য আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে তাঁহারা আমাদের নিকট শিক্ষা পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আমেরিকাবাসীরাই আমাদের যাবতীয় ব্যয় বহন করেন। আমরা ভারতবর্ষ হইতে কোনও আর্থিক সাহায্য লই না। ভারতীয় সংস্কৃতির এবং ভারতবাসীর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ

ভারতবাসীর অবস্থার উন্নতিকল্পে এবং তাহাদের দুঃখ-দৈন্য লাঘবের উদ্দেশ্যে ভারতের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহে এবং রামকৃষ্ণ মিশনের বিবিধ জনহিতকর অনুষ্ঠানে আমেরিকার অধিবাসীরা সাহায্য করিয়া থাকেন।

"ভারতের খৃষ্টান মিশনারীদের মত আমরা আমেরিকায় ধ্বংসমূলক সমালোচনার নীতি অনুসরণ করি না; কিংবা আমেরিকায় প্রচলিত ধর্ম্মমত-গুলিকে নিন্দা বা ঘৃণা করি না। আমরা বরং ঐসকল ধর্ম্মমতের সমীচীনতা বিশ্লেষণই করিয়া থাকি। আমরা আমেরিকান্‌দিগকে ধর্ম্মের সার্ব্বজনীনত্ব শিক্ষা দেই। সকল ধর্ম্মই সমান এবং সকল ধর্ম্মমতেরই লক্ষ্য এক,—এই নীতি শিক্ষা দিয়া আমরা সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব-কলহ নিরসনের প্রয়াস পাই।

"গত শতাব্দীর শেষভাগে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় উপস্থিত হইলে স্বার্থানুসন্ধিৎসুগণ প্রবল বাধা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অনুদার ও অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধ সমালোচনায় আমেরিকার গোঁড়া অন্ধবিশ্বাসীরা বিশেষ উত্তেজিত হইয়া উঠে। স্বামীজি যে একজন নিতান্ত নগণ্য ব্যক্তি, তাঁহারা তাহাই প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পান। কিন্তু অবশেষে এই বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যেও এক বিশেষ অনুকূল অবস্থার সূচনা হয়। আমেরিকার সাধারণ অধিবাসীরা যুক্তিতর্কে বিশ্বাস করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। তাঁহারা ভারতীয় সংস্কৃতির ও হিন্দুধর্ম্মের বাস্তব স্বরূপ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতালাভের জন্য কৌতূহল প্রকাশ করিতে থাকেন এবং ইহারই পরিণামে স্বামী বিবেকানন্দ বিদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হন।

"এখন নেতৃস্থানীয় খৃষ্টানদিগের অনেকেই আমাদের কার্য্যকলাপে সহানুভূতি প্রকাশ করেন এবং আমাদের যাবতীয় ব্যাপারে সাহায্য করিয়া থাকেন। প্রাচ্যের ধর্ম্মমতগুলির সম্বন্ধে বৈদেশিক-গণের মনে প্রথম হইতে যে ধারণা বদ্ধমূল ছিল, হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ হকিংএর নেতৃত্বে প্রাচ্যের খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার সম্পর্কে "লেমেন্‌স্‌ কমিশনের" রিপোর্ট সে ভ্রমধারণা দূর করিয়াছে। উক্ত রিপোর্টে জগতে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী জনগণকে জড়বাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।"

আমেরিকায় রামকৃষ্ণ মিশনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইয়া স্বামী অখিলানন্দজী বলেন—

"আমরা মনে করি, আমেরিকায় মিশনের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষায় আমেরিকার অধিবাসিগণ দৈনন্দিন জীবনে ধর্ম্ম বিষয়ক আদর্শের সার্থকতার বিষয় সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। আমেরিকানগণ গোঁড়া বাস্তববাদী, তাঁহারা তত্ত্ববিদ্যার মৌলিক তত্ত্বসমূহে আস্থাবান নহেন। তবে যে সত্য প্রত্যক্ষভাবে ও সুস্পষ্টরূপে বাস্তব জগতের ব্যাপারের সহিত সম্পৃক্ত, আমেরিকানগণ ঐরূপ ধর্ম্মনৈতিক আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হন। আমেরিকার প্রধান প্রধান সহর পরিভ্রমণ করিয়া আমি এই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি যে, চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ আমাদের নিকট ধর্ম্মশিক্ষা পাইবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র। বড় বড় সহরে আমাদের মিশনের নূতন নূতন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহারা বিশেষ আগ্রহশীল। বস্তুতঃ আমরা অচিরে একটী নূতন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী হইয়াছি।"

ভারতের জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে আমেরিকার জনসাধারণের মনোভাবের বিষয় জানিতে চাহিলে, স্বামীজি বলেন—

"ভারতের প্রগতিপন্থী কর্ম্মপ্রচেষ্টা সম্পর্কে আমেরিকানগণ বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করেন। লব্ধপ্রতিষ্ঠ জননায়কগণের দৃঢ় বিশ্বাস, ভারতীয় সমস্যার সন্তোষজনক মীমাংসার উপরই আধুনিক জগতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। তাঁহাদের মতে

জাগতিক উন্নতির ক্ষেত্রে ভারত যখন কার্য্যকরী অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে, তখনই জাগতিক বহু জটিল সমস্যার সমাধান হইতে পারিবে।

"আমেরিকানগণ বিশেষভাবেই জানেন যে, ভারতবর্ষ দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা ও অন্যান্য দুর্গতিতে প্রপীড়িত। তাঁহারা আমাদিগকে সাহায্য করিয়া আনন্দানুভব করেন। প্রকৃতপক্ষে আমেরিকার অনেক ধনী ব্যক্তি ভারতের জনসাধারণের উপকার সাধন করিতেছেন। তাঁহাদের বিশ্বাস, একমাত্র ভারতবাসীই জগতে শান্তি ও প্রীতি আনয়ন করিতে পারে, আর একমাত্র ভারতবাসীই জগতে ঐক্য-স্থাপনে ও সমন্বয়সাধনে সমর্থ।

"আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দের প্রচারকার্য্যের উদ্দেশ্যই ছিল—প্রতীচ্যের জড়বাদের সহিত প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতার সমন্বয় সাধন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, আমেরিকার ও ভারতের পারস্পরিক সংস্রবে ভবিষ্যতে স্বামীজির সংকল্প সফল হইবে। এই উপলক্ষে আমার প্রস্তাব এই যে, আমাদের ভারতীয় প্রতিনিধিগণ যেন সাবধানতার সহিত ভারতের আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি বিশ্লেষণ করেন। তাঁহারা যেন কখনও দৈবশক্তির এবং মনস্তাত্ত্বিক প্রমেয় প্রপঞ্চের প্রশ্রয় না দেন। ঐ সকল তথাকথিত শক্তি সাময়িকভাবে আমেরিকার অতি বিশ্বাসী ও সহজ বিশ্বাসী অনেকের মনে বিশ্বাস জন্মাইতে পারে সত্য কিন্তু তাহাতে প্রকৃত চিন্তাশীল ব্যক্তির নিকট আমাদিগকে হেয় হইতে হইবে। বস্তুতঃ ঐ প্রকারের শক্তিতে আমরা নিজেরাই বিশ্বাস করি না। ভারতের সংস্কৃতি ও কৃষ্টি সম্পর্কে কেহ ভ্রম ধারণা জন্মায়, তাহাও আমরা ইচ্ছা করি না।"

বেদান্ত সোসাইটি, ডেন্‌ভার, কোলোর‍্যাডু, আমেরিকা—১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ১৯শে মে স্বামী বিবিদিষানন্দ ওয়াসিংটন হইতে ডেন্‌ভার উপস্থিত হইয়া বেদান্ত ও ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে কয়েকটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। এই বক্তৃতাগুলি শ্রোতৃবৃন্দের এত চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল যে, তাঁহাদের অনুরোধে জুন মাস পর্য্যন্ত তথায় তিনি বেদান্ত সম্বন্ধে নিয়মিত ক্লাস করেন।

আগষ্ট মাসে প্রভিডেন্স বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী অখিলানন্দ ডেন্‌ভারে আসিয়া কয়েকটী মনোজ্ঞ বক্তৃতা প্রদান করেন। সেপ্টেম্বর মাসে ডেন্‌ভার সহরে অনেকগুলি জনসভায় স্বামী বিবিদিষানন্দ বক্তৃতা দেন এবং প্রতি মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার স্থানীয় ওয়াই-ডব্লিউ-সি-এ হলে এবং প্রতি রবিবার কস্‌মোপলিটান্ হোটেলে গীতা, পতঞ্জলির যোগসূত্র, কর্ম্মযোগ, রাজযোগ ও কঠোপনিষদ্ সম্বন্ধে ক্লাস করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উৎসব ডেন্‌ভার সহরে মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। ইহাতে স্বামী বিবিদিষানন্দ "স্বামী বিবেকানন্দ", "বিচিত্র ভারতবর্ষ", "শ্রীরামকৃষ্ণ—ভগবানের মানুষ" "আমার চক্ষে ভারতবর্ষ দেখ" শীর্ষক হৃদয়-গ্রাহী বক্তৃতা প্রদানে সকলকে মুগ্ধ করেন। প্রত্যেকটী সভাতেই স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন।

আমেরিকায় এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে "আন্তর্জ্জাতিক কবিতা সপ্তাহ" অনুষ্ঠিত হয়। ডেন্‌ভার সহর আমেরিকার অন্যতম সাংস্কৃতিক কেন্দ্র বলিয়া এই অনুষ্ঠান এখানে সমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া স্বামী বিবিদিষানন্দ এই উপলক্ষে "ভারতবর্ষের কবিতা" সম্বন্ধে একটী চমৎকার বক্তৃতা দান করেন। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ও ২৭শে মে এখানকার বিশিষ্ট শ্রোতৃবৃন্দের সমক্ষে স্বামীজি "আধ্যাত্মিক বিকাশ ও জ্ঞানের স্তরসমূহ" এবং "কর্ম্ম ও জন্মান্তরবাদ" শীর্ষক বক্তৃতা করেন।

২০শে জুন চিকাগো বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ

স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দ ডেন্‌ভারে আসিয়া "বিজ্ঞান ও ভারতীয় সঙ্গীতের সৌন্দর্য্য" সম্বন্ধে একটী পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতাদান করেন। বক্তৃতার পর স্বামীজিকে অভিনন্দিত করা হয়।

বেদান্ত সোসাইটি, স্যানফ্রান্‌সিস্‌কো—গত ফেব্রুয়ারী মাসে অধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দ সেঞ্চুরী ক্লাব ও বেদান্ত সোসাইটি হলে ধর্ম্ম, দর্শন, মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে আটটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত প্রতি শুক্রবার বেদান্ত সোসাইটি হলে সমাগত ভক্তগণকে তিনি ধ্যান ধারণা এবং বেদান্ততত্ত্ব সাধন সম্বন্ধে শিক্ষাদান করিতেছেন।

বেকার বান্ধব সমিতি, কলিকাতা—আমরা হাটখোলা, ১৭ হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীটস্থ বেকার বান্ধব সমিতির ১৩৪৩ সনের সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি। বেকার সমস্যার প্রতিকার, কৃষি শিল্প এবং বাণিজ্যের উন্নতি ও বিস্তার সাধন, শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রভৃতি জনহিতকর কর্ম্মের আদর্শ গ্রহণ করিয়া এই সমিতি গত ১৩৩৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে সমিতি হইতে ৩৩টী বেকার যুবককে সাময়িকভাবে আহার বাসস্থান ও আর্থিক সাহায্য করা হইয়াছে। ছাত্রাবাসে ৮টী ছাত্রকে স্থান দেওয়া হইয়াছে। সমিতির গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যা মোট ২৬৮ এবং ঐ বৎসরের পাঠক সংখ্যা ৫০৯। বন্দিপুরে সমিতির একটী শাখা আছে। ইহাতে কৃষি ও বয়ন কার্য্য পরিচালিত হইতেছে।

১৩৪৩ সালে সমিতির মোট আয় ৭৫৬।৶১৫ এবং মোট ব্যয় ৬৫৩৷৴১০। আমরা সমিতির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

ম্যালেরিয়া-নিবারণ সমিতি, সুনামগঞ্জ—১৯৩৬ সালের বিশ্বব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে শ্রীহট্টের সুনামগঞ্জ মহকুমায় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের দরিদ্র-নারায়ণ সেবার অনুপ্রেরণায় এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সহর ও পল্লীগুলিতে বিশেষতঃ পার্ব্বত্য অঞ্চলে প্রতি বৎসর বহু সংখ্যক লোক ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সমিতির উদ্যোক্তৃগণ ম্যালেরিয়া-পীড়িত গ্রামগুলিতে ১২টী শাখা স্থাপন করিয়া ঔষধপত্রাদির দ্বারা হিন্দু মুসলমান বাঙ্গালী গারো মণিপুরী হাজং কোচ আসামী প্রভৃতির মধ্যে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সেবাকার্য্য করিতেছেন।

১৯৩৭ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত সমিতি ৬৯৪৯ জন রোগীকে মোট ১৫৩৪ পাউণ্ড কুইনিন মিক্‌সার এবং ১৪৩৫ কুইনিন ও সিঙ্কোনা ট্যাব্‌লেট্‌ প্রদান করিয়াছেন। আমরা সমিতির উন্নতি কামনা করি।

রামকৃষ্ণ মিশন, বরিশাল—বরিশালস্থ রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে রায়পুর জেনারেল হাসপাতালের (নোয়াখালি) প্রতিষ্ঠাতা ও প্রসিদ্ধ সার্জ্জন ডাঃ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র চন্দ্র নাথ, এম্‌-বি মহাশয় ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে এক সপ্তাহ স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম-প্রাঙ্গণে অস্থায়ী ডিস্পেন্সারী ও হাসপাতাল স্থাপন করেন। ডাক্তার বাবু এই সাতদিন প্রত্যহ ৯।১০ ঘণ্টা অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিয়া বিনা পারিশ্রমিকে ৭২টী চোখের ছানি অপারেশন্‌ এবং ৮০টী রোগী চিকিৎসা করিয়াছেন। ছানি কাটান রোগীগুলি প্রায় সমস্তই আরোগ্যলাভ করিবে। পূর্ব্ববঙ্গের এই বিখ্যাত সার্জ্জন রোগীদের অপারেশনের পর অস্থায়ী হাসপাতালে স্বীয় তত্ত্বাবধানে রাখিয়া ৫।৬ জন সহকারীসহ পরিচর্য্যা করিয়াছেন। আগামী বৎসর ডাক্তার বাবু আবার বরিশালে আগমন করিয়া এইভাবে বিনা পারিশ্রমিকে ছানি কাটিবেন ও চক্ষু চিকিৎসা করিবেন।

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, দিল্লী—দিল্লী রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ১৯৩৬ ও ১৯৩৭ সনের সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইলঃ—

ধর্ম্ম প্রচার—নূতন ও পুরাতন সহরে এবং আশ্রমে আলোচ্য দুই বৎসরে যথাক্রমে ২৬৫ ও ৩৭০টী ধর্মসভার অনুষ্ঠান হইয়াছে। ইহাতে ধর্মশাস্ত্র পাঠ এবং ভজনাদি হইয়াছে। স্বামী শর্ব্বানন্দ প্রমুখ বক্তাগণ দিল্লী, করাচি এবং অন্যান্য স্থানে এই দুই বৎসরে যথাক্রমে ৩৮ ও ৫১টী ধর্ম্ম দর্শন ও সংস্কৃতি বিষয়ক বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

পুস্তকালয় ও পাঠাগার—১৯৩৭ সনের শেষভাগে পুস্তকালয়ের পুস্তক সংখ্যা ছিল ৯১৯। এই দুই বৎসর যথাক্রমে ৭২২ এবং ৯২০ খানা পুস্তক পাঠকগণকে দেওয়া হইয়াছে। সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য মোট ২৫ খানা সাময়িক পত্র পাঠাগারে প্রত্যহ রক্ষিত হইয়াছিল।

দাতব্য চিকিৎসালয়—ইহাতে সাধারণ ও যক্ষ্মা নামে দুইটি বিভাগ আছে। আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে সাধারণ চিকিৎসালয়ে রোগী সংখ্যা যথাক্রমে ১৭৬৩০ এবং ২৪৬৩২। যক্ষ্মা চিকিৎসালয়ে আলট্রা ভায়লেট্ রে এক্স্পোজার প্রভৃতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চিকিৎসা করা হইতেছে। এই দুই বৎসরে যক্ষ্মাচিকিৎসালয়ের রোগী সংখ্যা যথাক্রমে ৬৯৩৪ ও ১১৩৬১। যক্ষ্মাচিকিৎসালয়ের জন্য একটী নিজস্ব বাড়ী আবশ্যক। ইহার অনুমানিক ব্যয় ২৫০০০৲ টাকা।

শতবার্ষিক উৎসব—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শতবার্ষিক উৎসব বিশেষ সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে পূজা, ধর্ম্মসম্মেলন, রচনা প্রতিযোগিতা, মহিলা সভা, দরিদ্রনারায়ণ সেবা এবং সমগ্র প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে সভা বক্তৃতা প্রভৃতির অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল।

রামকৃষ্ণ আশ্রম, ফরিদপুর— ফরিদপুর রামকৃষ্ণ আশ্রমের গত ১৯৩৪ হইতে ১৯৩৬ সনের সংক্ষিপ্ত কার্য্য-বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে:—

প্রতি রবিবার আশ্রমে সর্ব্বসাধারণের জন্য শাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন আশ্রমবাসিগণের জন্য প্রত্যহ ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করা হয়। গত দুই বৎসরে সহরের বাহিরে বারটী ধর্ম্ম-বক্তৃতা প্রদান করা হইয়াছে।

আশ্রম কর্ত্তৃক মহাকালী পাঠশালা নামক একটী বালিকা বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে। উহার ছাত্রী সংখ্যা ৫৪। সহরের হরিজন পাড়ায় বালকদের জন্য একটী ফ্রি পাঠশালা পরিচালিত হইতেছে। ইহার ছাত্র সংখ্যা ২৪। মহাকালী পাঠশালাতে ছাত্রীদের স্থান হইতেছে না। ছাত্রীদের জন্য অতিরিক্ত গৃহ এবং হরিজন পাঠশালার জন্য একটী নিজস্ব গৃহ বর্ত্তমানে বিশেষ আবশ্যক।

আশ্রম হইতে অনেক দরিদ্র পরিবারকে অর্থ ও চাউল প্রভৃতির দ্বারা সাময়িক সাহায্য প্রদান করা হইয়াছে। চিকিৎসালয়ে এই তিন বৎসরে যথাক্রমে ৪৮৮৩, ৬৯২২ এবং ৭৮৬৯ জন রোগীকে চিকিৎসা করা হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে নানা স্থানে সভা, বক্তৃতা, দরিদ্রনারায়ণ সেবা প্রভৃতির আয়োজন করা হইয়াছিল।

গত ১৯৩৩ সনের উদ্বৃত্ত ৩২২২৶৬ পাই সহ এই তিন বৎসরের মোট আয় ৯৩৬৩৸৹ আনা এবং মোট ব্যয় ৫৬৬০৷৴৯ পাই।

জাপানে বৌদ্ধধর্ম্ম

সম্পাদক

বর্ত্তমানে জাপানীগণ পৃথিবীব অন্ততম শ্রেষ্ঠজাতি বলিয়া সম্মানিত। শিক্ষা শিল্প বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে জাপান আজ প্রতীচ্যেব উন্নত দেশসমূহেব সম্পূর্ণ সমকক্ষ। পাশ্চাত্য জাতিব সর্ব্ববিধ সম্পদে সমৃদ্ধ হইয়াও জাপানীরা আপনাদেব বৈশিষ্ট্য হাবায় নাই। জাপ-প্রতিভা জ্ঞানবিজ্ঞানোন্নত পাশ্চাত্য শিক্ষাকে জাপানীদেব জাতীয় জীবনের চিবন্তন বিশেষত্বেব সঙ্গে সুন্দবভাবে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া লইযাছে। জাপানের সভ্যতা সংস্কৃতি সমাজ সাহিত্য ইতিহাস প্রভৃতির সঙ্গে আজও বৌদ্ধধর্ম্ম অচ্ছেদ্য সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ। এজন্য জাপ-জীবন ও তাহার চিন্তাধাবার সঙ্গে পরিচিত হইতে হইলে জাপানের বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করা আবশ্যক। আমরা এই প্রবন্ধে জাপানে প্রচলিত বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

৫৩৮ খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধধর্ম্ম কোবিয়া হইতে জাপানে প্রবেশ কবে এবং তথাকাব প্রাচীন শিন্তোধর্ম্মকে অনেকটা রূপান্তরিত করিয়া আপনার বঙে অনু-রঞ্জিত কবিতে সমর্থ হয়। জাপানে প্রচলিত মহাযান মতেব সঙ্গে বেদান্ত মতের আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য দেখা যায়। বেদান্তের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া জাপানের মহাযান প্রচাব কবে যে, মনুষ্য হইতে ইতর প্রাণী —এমন কি বৃক্ষলতা হইতে পথের ধূলিকণা পর্য্যন্ত সকলই বুদ্ধ-প্রকৃতি-সম্পন্ন। পরিদৃশ্যমান ও অদৃশ্য সকল ভূতের মধ্যেই বুদ্ধত্ব লুক্কায়িত রহিয়াছে এবং কালক্রমে ইহার পূর্ণ অভিব্যক্তি অবশ্যম্ভাবী। মহাযান-বর্ণিত বোধিসত্ত্বের আদর্শে বোধিচিত্ত হওয়াই মানুষের অন্তর্নিহিত বুদ্ধত্ব পরিব্যক্ত করার একমাত্র পথ। জাপানের মহাযান-প্রচারকগণের মতে এই বুদ্ধ-প্রকৃতির জ্ঞানই পরাজ্ঞান। বোধি-চিত্তের পরিপক্কতা হইতে এই পরাজ্ঞানের আবির্ভাব

হয়। পরাজ্ঞান লাভের জন্য বোধিচিত্ত হওয়া আবশ্যক। মহাযান মতের সার্ব্বজনীন প্রামাণিক গ্রন্থ "প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্র" মানুষকে 'পারমিতা'র (দান শীল প্রজ্ঞা ইত্যাদি) সাহায্যে বোধিচিত্ত হইতে উপদেশ দান করে। বুদ্ধের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা, বুদ্ধের মূর্ত্তি ও গুণাবলী ধ্যান, জাগতিক বিষয়ের নশ্বরত্ব ও জরা ব্যাধি মৃত্যু প্রভৃতি দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় চিন্তা বোধিচিত্ত জাগরণের উপায় বলিয়া জাপানের মহাযানীগণ প্রচার করেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহারা বোধিচিত্ত লাভের জন্য আরও দুইটি উপায় নির্দ্দেশ করেন। প্রথম—জীবের দুঃখ দর্শনে মনে করুণার উদয়, দ্বিতীয়—সকল দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির উপায় স্বরূপ নির্ব্বাণমোক্ষ লাভের ঐকান্তিক ইচ্ছা। হীনযানপন্থিগণ কেবল ব্যক্তিগত মোক্ষলাভ করিতে সচেষ্ট, পক্ষান্তরে জগতের সকল জীবের মোক্ষ মহাযানীগণের কাম্য। জাপানে শেষোক্ত সম্প্রদায়ের প্রাধান্য। জাপানের মহাযান-মতে সকল প্রাণীই নির্ব্বাণমোক্ষ লাভের অধিকারী। কেবল মানুষেরই নির্ব্বাণমোক্ষ লাভ হইতে পারে মনে করা মানুষের পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। সাধারণ মানুষ হইতে মহত্তর অনেক প্রাণী আছে এবং মানুষের মতই জীবন উপভোগ করে এরূপ অনেক বৃক্ষও দেখিতে পাওয়া যায়, এই সকল প্রাণী ও বৃক্ষেরও মুক্তিলাভের অধিকার আছে। এই সম্প্রদায়ের মতে মুক্তিকে কেবল মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা মানুষের অনুচিত পক্ষপাতিতার পরিচায়ক; কারণ, 'তুমি নিজে যাহা চাও, অপর প্রাণীকে তাহা দাও' ইহাই শ্রেষ্ঠ নীতি। জাপানের মহাযান সম্প্রদায়ের প্রামাণিক শাস্ত্র "সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক" বলে যে, ইতর প্রাণী ও বৃক্ষলতাদির মধ্যেও অদৃশ্য-ভাবে বুদ্ধপ্রকৃতি বর্ত্তমান, সুতরাং ইহারাও কালবশে অবশ্য নির্ব্বাণ লাভ করিবে। এই বিশ্বাসমূলে সকল ভূতের বোধিচিত্ত জাগরণের চেষ্টা জাপানের মহাযানপন্থীদের ধর্ম্মের অঙ্গ। মানুষের বোধিচিত্ত লাভের অন্যতম প্রধান উপায়রূপে মৈত্রী করুণা মুদিতা উপেক্ষা ও এতদনুকূল সংখ্যাতীত 'বিনয়' বা 'শীল' (নীতি) জাপানের মহাযান সম্প্রদায়ে অনুষ্ঠিত।

বোধিচিত্তের জাপানী নাম "বোদৈসিন"। জাপানে মহাযানমতের অন্তর্গত অনেক সম্প্রদায় আছে এবং ইহাদের প্রত্যেকটি "বোদৈসিন"—লাভের ভিন্ন ভিন্ন উপায় নির্দ্দেশ করে। জাপানের সিংগণ সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক কোবোদৈশী মানুষের সত্যের প্রতি নিষ্ঠা আনয়নকে বোধিচিত্ত লাভের পথ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই সম্প্রদায়ের শাস্ত্রগ্রন্থ "মহাবৈরোচনসূত্র" সত্য লাভের উপর বিশেষ জোর দিয়াছে। জেন্ সম্প্রদায়ের মতে ব্যক্তিগত চেষ্টাই বোধিচিত্ত লাভের পথ। "পবিত্র ভূমি মতবাদ" (Pure Land School) নামে পরিচিত সম্প্রদায়ের অন্তর্গত জুডু ও সিন্ মতে "নমো অমিদ (অমিতাভ ?) বুৎসু" মন্ত্র জপ করাই বোধিচিত্ত লাভের উপায় বলিয়া প্রচারিত। বিখ্যাত অমিদ (অমিতাভ) সম্প্রদায়ের সাধন-প্রণালীও এইরূপ। নিচ্ছিরেন্ সম্প্রদায় "নমো মহোরেঞ্জ কায়ো"—মন্ত্র জপের সঙ্গে শাক্যমুনির ধ্যানকে বোধিচিত্ত লাভের পথ বলিয়া মনে করে। এইরূপে জাপানের আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী ধর্ম্মসম্প্রদায়সমূহ বোধিচিত্ত লাভের দিক দিয়া এক আশ্চর্য্য সামঞ্জস্যে সমন্বিত। হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত অনেক সম্প্রদায়ের সঙ্গে এই সম্প্রদায়গুলির সাধন-প্রণালীর কোন পার্থক্য নাই।

এক অদ্বিতীয় পরমসত্তা (One Absolute Reality) জাপানের মহাযান মতে ধর্ম্মকায় বলিয়া বর্ণিত। ধর্ম্মকায়ের অপর নাম—শাশ্বত বা নিত্য বুদ্ধ (Eternal Buddha)। এই ধর্ম্মকায় বা নিত্যবুদ্ধের সঙ্গে বেদান্তোক্ত ব্রহ্মের কোন প্রভেদ নাই। বৈদান্তিকগণের মত জাপানের মহাযানীগণ

সকল প্রাণীকেই এই ধর্ম্মকায়ের বাহ্যিক অভিব্যক্তি বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং তন্মতে সকল জীবের প্রতি সম্মান দেখাইয়া থাকেন। খৃষ্টধর্ম্মের ন্যায় বৌদ্ধধর্ম্ম মানুষকে পাপী মনে করে না। খৃষ্টীয় মতে খৃষ্ট স্বর্গস্থ পিতার একমাত্র পুত্র এবং ইস্‌লাম ধর্ম্মমতে মহম্মদ ভগবানের একমাত্র প্রতিনিধি বলিয়া বর্ণিত কিন্তু জাপানের মহাযান মতে কেবল মানুষ নয়, জীবমাত্রই ধর্ম্মকায়ের সন্তান বা প্রতিনিধি। জগৎকারণ ব্রহ্মের সঙ্গে সম্পূর্ণ এক ও অভেদ হইয়া যাওয়া বেদান্তের লক্ষ্য, ঠিক তেমন ধর্ম্মকায়ের সঙ্গে সম্পূর্ণ এক ও অভেদ হইয়া যাওয়াই জাপানের মহাযানপন্থীদের মতে নির্ব্বাণমোক্ষ। এই আদর্শের অনুসরণে মহাযানীগণ ঠিক বৈদান্তিকদের মত জীবজগতের একত্ব ও অভেদত্ব প্রচার করেন।

বৌদ্ধগণ কার্য্য-কারণ সম্বন্ধকে সৃষ্টির মূল বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। দীপাধার তৈল বর্ত্তিকা ও অগ্নি এই কারণ চতুষ্টয় ভিন্ন যেমন প্রদীপ জ্বলে না, তেমন রূপ বেদনাদি পঞ্চস্কন্ধ জীবত্বের কারণ। বীজ হইতে বৃক্ষের জন্মের ন্যায় কর্ম্ম বা বাসনা হইতে জীবের জন্ম হয় বলিয়া বৌদ্ধগণ প্রচার করেন। জাপানী বৌদ্ধেরা হিন্দুদের মতই জন্মান্তরবাদ স্বীকার করেন এবং বিশ্বাস করেন যে, মানুষ দেহত্যাগ করিয়া একেবারে অস্তিত্বহীন বা শূন্যে পরিণত হয় না। মৃতব্যক্তিগণ জাপানীদের গৃহে, মন্দিরে এবং আত্মীয় স্বজনের হৃদয়ে বিরাজ করে। জাপানের অধিকাংশ লোক তাঁহাদের পারিবারিক "বুৎসুদন"-এ (family shrine) মৃতব্যক্তির স্মৃতি-ফলক (memorial tablet) স্থাপন করিয়া ইহার নিকট প্রত্যহ খাদ্য ফুল ধূপ দীপ দান এবং স্তোত্রাদি পাঠ করে। ইহা ছাড়া প্রতি মাসে—বিশেষ করিয়া বাৎসরিক মৃত্যুতিথিতে সাধ্যমত সমারোহের সহিত মৃত-ব্যক্তির সদ্‌গতি কামনা করা হয়। এইরূপে পূর্ব্বপুরুষগণের পূজা (ancestors' worship) আজকালও জাপানীদের মধ্যে প্রচলিত। ইহাকে হিন্দুর মাসিক ও বাৎসরিক শ্রাদ্ধের একটি জাপানী সংস্করণ বলা যাইতে পারে। জাপানের বৌদ্ধগণ প্রচার করেন যে, যে পর্য্যন্ত মানুষ নির্ব্বাণমোক্ষ লাভ না করে, সে পর্য্যন্ত তাহার অস্তিত্ব থাকে। "আর্য্য-অষ্টাঙ্গ মার্গের" অনুসরণে মানুষের বাসনারূপ দীপ নির্ব্বাপিত হইলেই তাহার জীবত্ব নাশ হইয়া নির্ব্বাণ-মোক্ষ লাভের অধিকার জন্মে। হিন্দুশাস্ত্রেও বলেন —'যে পর্য্যন্ত না বাসনা ক্ষয় হয়, সে পর্য্যন্ত তত্ত্ব-জ্ঞান বা মুক্তিলাভ হইতে পারে না এবং যে পর্য্যন্ত না তত্ত্বজ্ঞান জন্মে, সে পর্য্যন্ত বাসনা ক্ষয় হয় না।'* সুতরাং এ দিক দিয়াও হিন্দুধর্ম্মের সঙ্গে জাপানের মহাযানমতের চমৎকার সাদৃশ্য আছে।

জাপানের মহাযানপন্থিগণের মতে প্রজ্ঞা ও করুণা নির্ব্বাণমোক্ষ লাভের উপায় বলিয়া প্রচারিত। তাঁহাদের নিকট এই দুইটি অঙ্গাঙ্গী ভাবে সম্বন্ধান্বিত, একটি হইতে অপরটিকে পৃথক্ করা যায় না। প্রজ্ঞা হইতে করুণার উদয় হয়। প্রজ্ঞা জীবের দুঃখের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং করুণা সেই দুঃখ দূর করিবার জন্য মানুষের হৃদয়কে এক স্বর্গীয় আবেগে পূর্ণ করিয়া তোলে। জাপানের বোধিসত্ত্বগণের মধ্যে কাউয়ান্নন মিরোকু জিজু ফুজেন প্রভৃতি করুণার মূর্ত্তবিগ্রহরূপে পূজিত। জাপানীদের বদ্ধমূল ধারণা যে, জগতের সকল জীব নির্ব্বাণ লাভ না করা পর্য্যন্ত করুণার অবতারস্বরূপ এই বোধিসত্ত্বগণ আপনাদের নির্ব্বাণকে পর্য্যন্ত তুচ্ছ করিয়া লোক-চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া নির্ব্বাণকামী ব্যক্তিদিগকে সর্ব্বদা সাহায্য করিতেছেন। জাপানী বৌদ্ধমাত্রই বোধিসত্ত্বের

* যাবন্ন বাসনানাশস্তাবত্তত্ত্বাগমঃ কুতঃ।
যাবন্ন তত্ত্বসংপ্রাপ্তির্ন তাবদ্ বাসনাক্ষয়ঃ॥
—উপশম প্রঃ, ১৩।৯২।

কৃপালাভে বিশ্বাসী। এজন্য বোধিসত্ত্বগণ প্রকৃতই প্রত্যেক জাপানী বৌদ্ধের হৃদয়দেবতা।

জাতকের বহু গল্পের ভিতর দিয়া মহাযান মতের গৌরব স্বরূপ এই করুণার মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে। বিখ্যাত গৃহস্থ বোধিসত্ত্ব বিমলকীর্তি বিশ্বের সহিত একত্ব অনুভব করিয়া এই করুণা-বশে আপনাকে রোগগ্রস্ত-ঘোষণা করিয়া বলিলেন যে, জগতের সকল রোগী আরোগ্য লাভ না করা পর্য্যন্ত তিনি রোগমুক্ত হইবেন না। জীবের প্রতি করুণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া রাজপুত্র সুটুকোতৈশী মহাত্মা কোবোদৈশী পুরোহিত রিয়োকান্ প্রভৃতি বৌদ্ধ-সাধক পরার্থ-কর্ম্মে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সাধক রিয়োকান্ কেবল মানুষ নয়, পীড়িত পশ্বাদিরও সেবা শুশ্রূষা করিতেন। বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীর সর্ব্বত্র মানুষে মানুষে কাটাকাটি ও মারামারি চলিতেছে, এই সময় বৌদ্ধধর্ম্মের করুণার এই মহান্ আদর্শ প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণে অধুনা জাপানীগণ প্রয়োজনের তাড়নায় অন্যতম সাম্রাজ্যবাদী জাতিরূপে পরিণত হইলেও জাপানের মহাযান-প্রচারিত করুণার অনুশীলনে জাপ-সমাজ আজও সমৃদ্ধ। দরিদ্রকে অন্নদান, রোগীকে ঔষধ দান, নিরক্ষরকে শিক্ষাদান, নিরাশ্রয়কে আশ্রয়দান জাপ-জাতির সমাজ জীবনের অঙ্গ। জাপানের সর্ব্বত্র যে অনাথালয়, দাতব্য ঔষধালয়, বিবিধ প্রকার অবৈতনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়, উহাদের মূল উৎসও এইখানে। এই কারণেই জাপানের অসংখ্য মঠ-মন্দির মোহান্ত-পুরোহিতদের ভোগবিলাসের ক্ষেত্র না হইয়া জন-সেবার এক একটি কেন্দ্ররূপে পরিণত। জাপানের মহাযান-উপদিষ্ট করুণা সমাজের প্রতি স্তরে প্রবিষ্ট হইয়া স্বজাতি বাৎসল্য ও স্বদেশ-প্রেমে জাপজাতিকে মহিমান্বিত করিয়াছে।

নানা প্রকার ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ হইতে জাপানে বৌদ্ধধর্ম্মের পুনর্জ্জাগরণ আরম্ভ হইয়াছে। ইদানীং জাপানের জাতীয়তার সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমেই অধিকতর নৈকট্য সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতেছে। তথাকার দেশভক্ত ব্যক্তিগণ বুঝিয়াছেন যে, জাপানের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য অব্যাহত রাখিয়া জাপানীগণকে এক উন্নত জাতিরূপে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে তাহাদের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক। ইতিহাসের শিক্ষামূলে জাপনেতৃবৃন্দের ধারণা হইয়াছে যে, সর্ব্বগ্রাসী পাশ্চাত্য সভ্যতার করাল কবল হইতে জাপ-জাতিকে রক্ষা করিতে হইলে বৌদ্ধধর্ম্মের মাহাত্ম্য-মণ্ডিত সংস্কৃতির আশ্রয় গ্রহণ তাহাদের পক্ষে অপরিহার্য্য। এইজন্য জাপানের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ দেশব্যাপী "নিপ্পন (জাপান) শক্তি আন্দোলন" (Nippon Spirit Movement) উপস্থিত করিয়াছেন। নিপ্পন বা জাপানের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সঞ্জীবিত রাখাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য জাপানের ধর্ম্ম-নায়কগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া "বৌদ্ধ সম্প্রদায় সম্মিলন" (Alliance of Buddhist Sects) স্থাপন করিয়া দেশের সর্ব্বত্র ব্যাপকভাবে প্রচারকার্য্য পরিচালন করিতেছেন। যে সকল জাপানী খৃষ্টান ধর্ম্মগ্রহণ করিয়া পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে "জাপানী-করণ" (Japanization of Christianity) নামক এক অভিনব আন্দোলন চলিতেছে। ধর্ম্ম সংস্কৃতি বেশভূষা ভাষা সামাজিকতা প্রভৃতি বিষয়ে বিজাতীয় ভাব ত্যাগ করিয়া জাপানের সকলকে প্রকৃত জাপানীরূপে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা চলিতেছে। পুস্তক সংবাদপত্র বক্তৃতা সংগীত কথকতা রেডিও প্রভৃতির সাহায্যে জাপানের সর্ব্বত্র "জাপানী-করণ" মাহাত্ম্য প্রচারিত হইতেছে। পৃথিবীর সকল বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীকে সংঘবদ্ধ করিবার জন্য জাপানে 'বৌদ্ধ যুব-সংঘ' (Young Men's Buddhist Association) এবং তৎকর্ত্তৃক "বিশ্ব-প্রশান্ত-

সমিতি" (Pan-Pacific Society) স্থাপিত হইয়াছে। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে ১৮ই হইতে ২৫শে জুন পর্য্যন্ত টোকিজীর (টোকিও) বিখ্যাত 'হনগঞ্জি' মন্দির-প্রাঙ্গণে এই সমিতির দ্বিতীয় অধিবেশন হইয়াছে। বুদ্ধের ২৫০০ শত জন্মবর্ষে এই সভার উদ্বোধন হওয়ায় ইহা বৌদ্ধজগতের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। ক্যানাডা অষ্ট্রেলিয়া চীন শ্যাম সিংহল ব্রহ্ম ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশ হইতে সহস্রাধিক প্রতিনিধি এবং জাপানের খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ন্যায় বর্ত্তমানে জাপানেও নূতন নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইতেছে এবং নবীন ও প্রাচীন সকল সম্প্রদায়ই বৌদ্ধধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি সাধন, প্রচার ও বিবিধ প্রকার জনহিতকর কার্য্যের উপর জোর দিয়াছে। ইদানীং জলপ্লাবন ভূমিকম্প ও যুদ্ধ বিগ্রহাদি উপলক্ষে আবশ্যকমত এই সকল সম্প্রদায় ব্যাপকভাবে সেবাকার্য্য পরিচালন করিয়া থাকে।

অসমীয়াগ্রন্থে শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার পরিকরগণের কথা

অধ্যাপক শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার, এম্-এ, পি-আর্-এস্, পি-এইচ্-ডি, ভাগবতরত্ন

আসামের মহাপুরুষ শঙ্করদেব শ্রীচৈতন্যের প্রায় সমসাময়িক। শঙ্করদেবের ধর্ম্মমতের সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। উভয় সম্প্রদায়েই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ও নবধা ভক্তির সাধন দেখা যায়। শঙ্করদেব ও শ্রীচৈতন্য উভয়েই কীর্ত্তনের দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার করেন। উভয়েই শ্রীকৃষ্ণকে একমাত্র উপাস্যরূপে স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণকে মধুর রসে উপাসনা করিয়াছেন, আর শঙ্করদেব দাস্য-ভক্তির মহিমা প্রচার করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ ইত্যাদি ষোড়শ নাম ও শঙ্করদেব চারি নাম গ্রহণের উপদেশ দিয়াছেন।

১। শঙ্করদেবের সহিত অদ্বৈত প্রভুর সম্বন্ধ :—অসমীয়া শঙ্করদেবের নাম স্পষ্টভাবে কোন গৌড়ীয় বৈষ্ণব গ্রন্থে উল্লিখিত হয় নাই।

ভক্তি রত্নাকরে এক শঙ্করের কথা আছে। যথা—

অদ্বৈতচার্য্যের শাখা শঙ্কর নামেতে।
জ্ঞানপক্ষে তাঁর নিষ্ঠা হৈল ভাল মতে॥
অদ্বৈত শঙ্কর প্রতি কহে বারে বারে।
মনোরথ সিদ্ধি মুই কৈলু এ প্রকারে॥
ছাড় ছাড় ওরে রে পাগল নষ্ট হৈলা।
তেহোঁ না ছাড়ে তারে অদ্বৈত ত্যাগ কৈলা॥
মহাবহির্ম্মুখ বীজ করিল রোপণ।
ক্রমে বৃদ্ধি হইব জানিল বিজ্ঞগণ॥

(দ্বাদশ তরঙ্গ, পৃঃ ৮৪৫)।

এখানে শঙ্করকে জ্ঞাননিষ্ঠ বলা হইয়াছে। অসমীয়া শঙ্করদেবও জ্ঞানমিশ্রাভক্তি প্রচার করিয়াছেন। তিনি কীর্ত্তন ঘোষার প্রথমেই লিখিয়াছেন—

প্রথমে প্রণমো ব্রহ্মরূপী সনাতন।
সর্ব্ব অবতারের কারণ নারায়ণ॥

শঙ্কর যে জ্ঞাননিষ্ঠ ধীর গম্ভীর ভক্ত ছিলেন তাহা লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া মহাশয়ও তাঁহার "শঙ্করদেব" গ্রন্থে স্বীকার করিয়াছেন (অষ্টাদশ অধ্যায়)।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অদ্বৈত শাখা নির্ণয়ে শঙ্করদেবের নাম নাই। তাহার দ্বারা বিশেষ কিছু প্রমাণিত হয় না। কেন না, শঙ্কর যদি অদ্বৈত কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার নাম কৃষ্ণদাস কবিরাজ উল্লেখ করিবেন না।

কাল বিচার করিলে দেখা যাইবে যে অদ্বৈত ও শঙ্কর উভয়ে সমসাময়িক এবং দুইজনই আসামের লোক। শঙ্করদেবের তিরোভাবের তারিখ দৈত্যারি ঠাকুরের মতে ১৪৯০ শক। রামচরণ ঠাকুর বলেন—

ভাদ্র মাহত শুক্লা দ্বিতীয়া তিথি ভৈলা।
সেহি দিনা গুরুনর নাটক এড়িলা॥
(শঙ্কর চরিত্র, ৭ম খণ্ড, ৩৮৩৪ পয়ার)

তাহা হইলে ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে শঙ্করদেবের তিরোধান হইয়াছিল জানা গেল। গেট্ সাহেব প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া আসামের ইতিহাসে লিখিয়াছেন—"He is said to have been born in 1449 and to have died in 1569 The latter date is probably correct, so the former must be about thirty or forty years too early"

"আসাম বান্ধব" পত্রিকাতে (১৩১৮ বৈশাখ) কাব্যবিনোদ ও "শঙ্করদেব" গ্রন্থে বেজবরুয়া কেন যে ১৪১৯ শক ভাদ্রমাসকে ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দ না বলিয়া ১৫৬৯ খৃষ্টাব্দ ধরিয়াছেন তাহা বুঝা গেল না।

শঙ্করের আবির্ভাবের তারিখ লইয়া তিনটী বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনাথ বেজবেরুয়া মহাশয় বরদোবায় প্রাপ্ত গন্থে লেখা 'গুরুচরিত্রে' ১৩৭১ শক, ১৪৪৯ খৃষ্টাব্দ শঙ্করের জন্ম তারিখ বলিয়া উল্লেখ পাইয়াছেন[১]। "আসাম বান্ধব" পত্রিকার পূর্বোক্ত সংখ্যায় রামচরণ ঠাকুরের "শঙ্কর চরিত" হইতে শঙ্করের জীবনকাল সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বাক্য ধৃত হইয়াছে—"তের বরষ মন্দ আয়ু ভৈলা ছয় কুরি"। ইহার অর্থ করা হইয়াছে এই ১২০—১৩=১০৭ বৎসর। অর্থাৎ ১৫৬৮ (মৃত্যুর তারিখ) —১০৭ (জীবনকাল)=১৪৬১ খৃষ্টাব্দে জন্ম। উদ্ধৃত বাক্যটী কিন্তু হলিরাম মহন্ত কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থে নিম্নলিখিতরূপে পাওয়া যায়—

ডের বছরর মন্দ আরুছই কুরি।
তেবে চলি গৈলা গুরু নরদেহা এরি॥
(রামচরণ ঠাকুরকৃত শঙ্কর চরিত, ৩৮৩৫ পয়ার)।

—যদি "ত" স্থানে "ড" পাঠই ঠিক হয়, তাহা হইলে শঙ্করের জন্ম ১৪৪৯ খৃষ্টাব্দেই হয়।

অনিরুদ্ধ 'শঙ্কর চরিত' পুথিতে লিখিয়াছেন যে শঙ্কর "বান বায়ু নয়ন চন্দ্রমা শক চারি" অর্থাৎ ১৩৮৫ শকে, ১৪৬৩ খৃষ্টাব্দে জন্মিয়াছিলেন ও ১০৫ বৎসর জীবিত ছিলেন। বেজবরুয়া মহাশয় বলেন যে, যেহেতু অনিরুদ্ধের বই ১৬৭৪ শক, ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে রচিত সেই হেতু ইহার প্রামাণিকতা রামচরণের গ্রন্থ অপেক্ষা কম। আমার মনে হয় যে "গুরু চরিত্র" পুথির অনেক কথাই যখন প্রামাণিক নহে এবং রামচরণের গ্রন্থে যখন স্পষ্টত জন্ম শকের উল্লেখ নাই ও তাহার পাঠ লইয়া মত ভেদ আছে, তখন অনিরুদ্ধের দেওয়া ১৩৮৫ শক বা ১৪৬৩ খৃষ্টাব্দ শঙ্করের জন্ম সময় ধরাই অধিকতর সঙ্গত। ১০৫ বৎসর জীবন যতটা যুক্তিযুক্ত ১১৯ বৎসর জীবন ততটা নহে। বিশেষতঃ পরে দেখা যাইবে যে আসামে প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে শঙ্করদেব যখন দ্বিতীয়বার তীর্থ ভ্রমণ উপলক্ষ্যে পুরীতে ছিলেন তখন চৈতন্যের তিরোভাব হয় (১৫৩৩ খৃষ্টাব্দ)। শঙ্করের জন্ম যদি ১৪৪৯ খৃষ্টাব্দে হয়, তাহা হইলে ঐ সময়ে তাঁহার বয়স ৮৪ বৎসর হয়। ঐ বয়সে যে তিনি তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন তাহা বিশ্বাস করা কঠিন। অনিরুদ্ধের কথা

১। বেজবরুয়া গুরুচরিত্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "এই পুথিখন শঙ্করদেবর আদিস্থান বরদোবা সত্রত অতি যত্নেরে রক্ষিত, তাত লিখা আন কোনো কোনো বিষয়ত সন্দেহ করিলেও জন্ম তারিখটোত ন করাই উচিত, কারণ বরদোবাই তেওঁর জন্মস্থান" (পৃঃ ১৮৪ শঙ্করদেব। কিন্তু তিনি নিজেই ঐ পুথিতে উল্লিখিত অন্যান্য সময়-নির্ণয় মানিয়া লন নাই (ঐ পৃঃ ২১৬—১৭)।

মানিয়া লইলে তখন তাঁহার বয়স হয় ৭০ বৎসর।

অদ্বৈত শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় ছিলেন। বিশ্বম্ভরের বয়স যখন তেইশ বৎসর তখন তিনি অদ্বৈতকে জ্ঞানবাদ প্রচারের জন্য দণ্ড দিতে শান্তিপুরে গমন করেন। বৃন্দাবন দাসের মতে সেই সময়ে অদ্বৈত পত্নী সীতা বলিয়াছিলেন—

বুঢ়া বিপ্র, বুঢ়া বিপ্র, রাখ রাখ প্রাণ।
কাহার শিক্ষায় এত কর অপমান ॥

(চৈঃ ভাঃ ২।১৭।২৯৭ পৃঃ)।

শঙ্কর যদি ১৪৬৩ খৃষ্টাব্দে জন্মেন ও শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা ২৩ বৎসরের বড় হন, তাহা হইলে উক্ত ঘটনার সময় শঙ্করের বয়স ৪৮ বৎসর হয়। তখন অদ্বৈতের বয়স ৪৮ অপেক্ষা বেশী ছিল, তাহা না হইলে সীতাদেবী অদ্বৈতকে বুঢ়া বিপ্র বলিতেন না। ইহা হইতে অনুমান হয় যে অদ্বৈত শঙ্কর অপেক্ষা বয়সে বড়। বেজবরুয়া মহাশয় অনেক যুক্তি তর্কের অবতারণা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে শঙ্কর ৩২ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে তীর্থভ্রমণে বাহির হন নাই।

শঙ্কর প্রথমবারে দ্বাদশ বৎসর তীর্থভ্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ। তাহা হইলে শঙ্করের জন্ম ১৪৬৩ খৃঃ + ৩২ বৎসর বয়সে তীর্থ ভ্রমণ আরম্ভ + ১২ বৎসর ভ্রমণ = ১৫০৭ খৃষ্টাব্দে বা তাহার কাছাকাছি সময়ে অদ্বৈতের সহিত শঙ্করের সাক্ষাৎকার হইতে পারে। শ্রীচৈতন্যের ভাবাবেশ আরম্ভ ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে।

উমেশচন্দ্র দে মহাশয় লিখিয়াছেন যে, কন্যার বিবাহ ও পত্নীর মৃত্যুর পর শঙ্কর ৪৪ বৎসর বয়সে তীর্থভ্রমণে বাহির হন এবং বার বৎসর ভ্রমণান্তে অদ্বৈতের নিকট উপস্থিত হন। তিনি অদ্বৈতের নিকট ভাগবত পাঠ করেন। দে মহাশয়ের মতে ১৪৩০ শকে বা ১৫০৮।৯ খৃষ্টাব্দে শঙ্করের সহিত অদ্বৈতের মিলন হয়।

এই সব যুক্তি বলে আমি আপাতত সিদ্ধান্ত করিতে চাই যে, অদ্বৈতের নিকট শঙ্করের জ্ঞান-নিষ্ঠা ভক্তির উপদেশ পাওয়ার কাহিনী ভিত্তিহীন না হওয়াই সম্ভব। অদ্বৈত শ্রীচৈতন্যের ভক্ত হওয়ার পর শঙ্করকে মাধুর্য্য রসে আনয়নের চেষ্টা করেন; কিন্তু তাহাতে সফল হন নাই। সেইজন্য অদ্বৈত শাখায় শঙ্করের নাম পাওয়া যায় না। বেজবরুয়া মহাশয় যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে শঙ্করের উপর শ্রীচৈতন্যের কোন প্রভাব পড়ে নাই, তাহার সহিত আমার সিদ্ধান্তের কোন বিরোধ নাই।

২। শ্রীচৈতন্যের কথা আছে এমন অসমীয়া গ্রন্থের কালনির্ণয়ঃ—

যেমন বাংলা ভাষায় শ্রীচৈতন্যকে লইয়া, তেমনি অসমীয়া ভাষায় শঙ্করদেবকে লইয়া অনেক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। শঙ্করের শিষ্যদের মধ্যে মাধব ও দামোদর প্রধান ছিলেন। কায়স্থ মাধবদেবের অনুগত দল মহাপুরুষীয়া ও ব্রাহ্মণ দামোদরের শিষ্যেরা বামুনীয়া বা দামোদরীয়া সম্প্রদায় নামে পরিচিত। মহাপুরুষীয়াগণ শ্রীচৈতন্যকে মানেন না। শঙ্কর ও মাধব রচিত ধর্ম্মগ্রন্থে, কীর্ত্তনে ও ঘোষায় শ্রীচৈতন্যের নাম গন্ধও নাই। কিন্তু দামোদরীয়াগণ চৈতন্যকে অবতার বলিয়া স্বীকার করেন। [রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা—১৩১৮ সাল, প্রথম সংখ্যা, পৃঃ ৪]।

রামচরণ, দৈত্যারি ঠাকুর ও ভূষণ দ্বিজকবি মহাপুরুষীয়া সম্প্রদায়ের অনুগত লেখক। রামচরণ ঠাকুর মাধব দেবের ভাগিনেয় (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩২৭।৩, পৃঃ ৭৮)। উমেশচন্দ্র দে বলেন, শঙ্করের শিষ্য গদাপাণি বা রামদাস। রামদাসের পুত্র রামচরণ ও রামচরণের পুত্র দৈত্যারি ঠাকুর। হলিরাম মহান্ত রামচরণের "শঙ্কর চরিতের" ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে রামচরণ ঠাকুর "মাধব দেব পুরুষর ভাগিন আরু রামদাস আতৈর পুত্র। এওঁ শ্রীশ্রীশঙ্করদেবতকৈ প্রায় ৪০ বছর

মানে সরু। এনে স্থলত প্রায় সমসাময়িক বুলিলেও অত্যুক্তি করা ন হব।" দৈত্যারি ঠাকুব উক্ত বামচবণেব পুত্র। তিনি মাধবেব শিষ্য গোবিন্দ আতৈ ও পিতা বামচবণের নিকট হইতে উপাদান সংগ্রহ কবিয়া শঙ্কব চবিত লিখিয়াছেন।

ভূষণ দ্বিজকবি একখানি শঙ্কব চবিত লিখিয়াছেন। তিনি নিজের পবিচয়ে বলিয়াছেন যে শঙ্কবেব শিষ্য চক্রপানি[১]

হেন চক্রপাণি মহামানী আছিলন্ত।
তাহান তনয় পাচে বৈকুণ্ঠ ভৈলন্ত॥
অদ্যাপিও লোকে যাক প্রশংসা কবয়।
ভকতি ধর্ম্মত নিষ্ঠ বুদ্ধি অতিশয়॥
তান পুত্র মূরুখ ভূষণ শিশুমতি।
শঙ্কব চরিত্র পদে সম্প্রতি বদতি॥

(পৃঃ ১৮৩, দুর্গাধব ববকটকী সম্পাদিত)।

দামোদবিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে দামোদবেব শিষ্য বাম বায় বা বামকান্ত দ্বিজ "গুরুলীলা" গ্রন্থ শঙ্কব চৈতন্যেব মিলনের কথা লিখিযাছেন। গুরুলীলার অন্ত্যখণ্ডেব একখানি পুথি ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে নকল কবা হইয়াছিল। উহাব চতুর্থ পত্রে একখানি চিত্র আছে। তাহাতে দেখা যায় যে "চৈতন্য, শঙ্কর, দামোদব, মাধব, গোপাল, বলদেব, পরমানন্দ, বনমালী, এবং মিশ্রের ছবি লিখিতানুক্রমে আছে। ....চৈতন্যদেব বামদিকে মুখ করিয়া বসিয়া আছেন; শঙ্কব প্রভৃতি অপরেব দৃষ্টি তাঁহাব দিকে নিবদ্ধ" (বঙ্গপুর সাহিত্য পবিষৎ পত্রিকা ১৩১৮।১)।

কৃষ্ণ ভারতী নামে দামোদবেব এক শিষ্য সন্ত নির্ণয় নামক এক গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন।

ভট্টদেব নামে এক ব্যক্তি 'সৎ সম্প্রদায়' কথা লিখিয়াছেন। তিনি কৃষ্ণ ভাবতীর সংগ্রহ দেখিয়া গ্রন্থ লিখিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। আসামের পুবাতত্ত্ববিদ্ হেমচন্দ্র গোস্বামী বলেন যে, দামোদর শিষ্য ভট্টদেব ১৫৬০ হইতে ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দেব মধ্যে জীবিত ছিলেন। তবে এই ভট্টদেবই "সৎ-সম্প্রদায় কথাব" লেখক কি না সন্দেহ। কৃষ্ণ ভারতীব "সন্তনির্ণয" আমি কেন প্রামাণিক মনে করি না তাহা পবে বলিব।

কৃষ্ণ আচার্য্য "সন্ত বংশাবলী" গ্রন্থে নৃসিংহকৃত্য নামে একখানি গ্রন্থ হইতে চৈতন্য সম্বন্ধে কিছু উদ্ধৃত কবিয়াছেন। নৃসিংহ কোন সময়ের লোক তাহা নির্ণয় কবিতে পারি নাই। "দীপিকাচান্দ" নামে একখানি নাতি প্রামাণিক গ্রন্থেও শ্রীচৈতন্যেব কথা আছে। হেমচন্দ্র গোস্বামীর মতে ঐ গ্রন্থ ১৭৭১ শকে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে নকল কবা হয়। মহা-মহোপাধ্যায় পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ বলেন যে, ঐ গ্রন্থ আধুনিক (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৯।১)।

ক্রমশঃ

১। উমেশচন্দ্র দে লিখিয়াছেন যে, তিনি দ্বিজভূষণকৃত শঙ্কর চরিত গ্রন্থ ৯০ পৃষ্ঠায় পুথির আকারে মুদ্রিত দেখিয়াছেন। উহার পুথি তিনশত বৎসরের অধিক প্রাচীন এবং উহা দরঙ্গ জেলাব হৃদেশ্বরের মৌজাদার মহীধর ভূঞার নিকট আছে। দে মহাশয় বলেন যে, ভূষণের গ্রন্থ রচনাকালে শঙ্করের পৌত্র চতুর্ভুজ বিষ্ণুপুর সত্রে বিদ্যমান ছিলেন (রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৯।৪)।

বৈশাখী-কুসুম

শ্রীমতী অপর্ণা দেবী

অনলের জ্বালা সহিয়া সহিয়া,
প্রখর তপনে দহিয়া দহিয়া,
মরণের পানে চাহিয়া চাহিয়া,
জীবনের গীতি গাহিয়া গাহিয়া,
ঝরিয়া যাইতে চাই,
প্রাণের কামনা তাই।

ফুরাইল যবে মধু-উৎসব
থেমে গেল তার বীণা-বাঁশী রব,
কোকিল, পাপিয়া হইল নীরব,
ভাঙ্গাইল ঘুম বিষাণের রব,
প্রলয়ে নাচিতে চাই,
প্রাণের কামনা তাই।

কম্পিত করি' বিশ্ব-মানবে
রুদ্রের রথ ঘর্ঘর রবে
ছুটিয়া চলিবে প্রলয়োৎসবে,
চক্রের তলে মহাগৌরবে
বক্ষ পাতিতে চাই,
প্রাণের কামনা তাই।

তন্ত্রী বাঁধিব রুদ্র-বীণার,
বিষাণে তুলিব ভীম-ঝঙ্কার,
রচিব মালিকা শত উল্কার,
ভীমা-ভৈরবী-রণ-কালিকার
চরণ পূজিতে চাই,
প্রাণের কামনা তাই।

গরল মন্থি' অমৃত আনিব,
অনন্ত প্রাণ মর্ত্ত্যে দানিব,
মৃত্যু-বীণায় অমৃত রণিব,
বিশ্ব-বক্ষে যে সুর ধ্বনিব
উপমা তাহার নাই।
প্রাণের কামনা তাই।

অনলের জ্বালা সহিয়া সহিয়া,
প্রখর তপনে দহিয়া দহিয়া,
মরণের পানে চাহিয়া চাহিয়া,
জীবনের গীতি গাহিয়া গাহিয়া,
ঝরিয়া যাইতে চাই,
প্রাণের কামনা তাই।

মোঘল রাজদরবারে হিন্দী

অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী, এম্‌-এ, পি-আর্‌-এস্‌

মুসলমান ভারতবর্ষের রাজ্য শাসনোপযোগী বহুলোক লইয়া আসিতে পারে নাই। কারণ রাষ্ট্রশাসন চিন্তা তাহাদের মস্তিষ্কে উদিত হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ লোকবলও বেশী ছিল না। ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক অমুসলমানকে রাষ্ট্রশাসনে নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইল। মহম্মদ বিন্‌ কাসিম প্রথম ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিলেন। ব্রাহ্মণগণ দেশীয় ভাষায় তাঁহাদের রাষ্ট্র-পত্রাবলী রচনা করিতেন। গজনীরাজ মামুদ লাহোরে শাসন ব্যবস্থা করিলেন। সেখানে হিন্দু শাসনকর্ত্তা ছিলেন। মামুদের সময় একটা কৃষ্টি-ধারা ভারত ও বহির্ভারতীয় রাজ্য সমূহ বহিয়া চলিয়াছিল। সাহবুদ্দিন ঘোরী তাঁহার পাশ্চাৎগামী দাসরাজগণ, খিলজী ও তোগলক বংশ তাঁহাদের রাজ্যসংক্রান্ত কাগজ দলিল ইত্যাদি দেশীয় ভাষায় লিখিতেন। এইরূপ সিদ্ধান্তের কারণ এই যে সুলতান সেকেন্দর লোদীর ফারমান অনুসারে জানা যায় যে তিনি তাঁহার কর্ম্মচারীদিগকে পারসী ভাষা শিক্ষা করিতে আদেশ করেন। সুতরাং সহজেই অনুমিত হয়, সেকেন্দর শাহের পূর্ব্বে কর্ম্মচারীরা পারসী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন না। অবশ্য ভারতের মুসলমান নৃপতিগণের মধ্যে সেকেন্দর লোদীই প্রথম রাজস্ব-আয়ব্যয়-হিসাব রাখার ব্যবস্থা করেন। এই রাজস্ব বিভাগ চিরকাল হিন্দুদের হস্তেই ছিল। পরে সম্রাট আকবরের সময় টোডরমলের বিধান অনুসারে আয়ব্যয়ের হিসাব পারসী ও হিন্দী উভয় ভাষায় লিখিত হইত। ইহাতে বুঝা যায় যে প্রাক্‌ আকবরীয় যুগে রাষ্ট্রের ভাষা হিন্দী ছিল। রাজা টোডরমলের সময় হইতে পারসী রাষ্ট্রের ভাষা রূপে গৃহীত হইল। এই কারণে আমরা টোডরমলকে হিন্দীভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রচারক বলিয়া অনুমান করিতে পারি। টোডরমলের পর এক শতাব্দীর মধ্যে হিন্দী সরকারী দপ্তর হইতে বিদায় গ্রহণ করিল।

কিন্তু মোঘল যুগে হিন্দী সাধারণের ব্যবহার্য্য ভাষা ছিল। যদিও উন্নততর শ্রেণীর মধ্যে পারসী ভাষা ব্যবহৃত হইত। জ্ঞানী ও পণ্ডিতগণ আরবী ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। মোঘল রাজগণ হিন্দুস্থানী ভাষায় সাধারণ কথোপকথন করিতেন।

সম্রাট আকবরের সময় হিন্দী সরকারী দপ্তর হইতে বিতাড়িত হইলেও এই যুগেই হিন্দীর সম্যক্‌ উন্নতি আরম্ভ হয়। আকবরের রাজদরবারে হিন্দী ভাষাকে যথেষ্ট সম্মান দেওয়া হইত। তাঁহার দরবারী কবিদিগের মধ্যে অনেকেই হিন্দীভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। রাজা টোডরমল নীতি-বিষয়ক বহু অনুষ্টুপ পদ রচনা করিয়াছেন। বীরবলের হিন্দীরসকবিতা আজিও বহু রসিকের চিত্তে অবসর বিনোদন করে। গুণগ্রাহী আকবর তাঁহাকে "কবিরায়" উপাধি দ্বারা সম্মানিত করিয়াছিলেন। রাজা মনোহর দাস, মানসিং বহু হিন্দীকবিতা রচনা করিয়াছেন। সম্রাট-বন্ধু ফৈজী হিন্দীভাষায় বহু কবিতা লিখিয়াছেন। তানসেনের রচিত হিন্দী সংগীতের বেশ চারিশত বৎসরের ব্যবধানেও ভারতীয়গণকে আনন্দ পরিবেশন করে। তানসেন হিন্দী "সংগীত সার" ও রাগমালা" প্রণয়ন করেন। সুরদাসের পিতা রামদাসের (১) রচিত অনেক হিন্দী গান ও দোঁহা আছে। প্রবাদ আছে তুলসী দাসের

(১) এই রামদাস সুরদাসের পিতা কিনা সে বিষয়ে মতভেদ আছে।

উপর সম্রাট আকবরের পরোক্ষ প্রভাব ছিল। (২) আকবর তুলসীদাসের সঙ্গে আলাপ করিয়া তৃপ্ত হইয়াছিলেন। দাদূ ও সুরদাস দুই জনের সঙ্গে আকবরের অন্তরঙ্গ হৃদ্যতা ছিল। দাদূর (৩) সঙ্গে আকবরের ৪০ দিন ব্যাপী ধর্ম্মালোচনা চলিয়াছিল। আকবর কবি কর্ণ ও নরহরি সহায়কে "মহাপাত্র" উপাধি দিয়াছিলেন। বিখ্যাত গঙ্গ কবির নাম আকবরের যুগে সুপরিচিত ছিল। আকবরের পালিতপুত্র তথা বৈরামখানের পুত্র আবদুর রহিম খানখানানের দান হিন্দী ভাব-সাহিত্যে অপরূপ। রহিমের ভক্তিরসমিশ্রিত কবিতাবলি হিন্দী-সাহিত্যে অমর স্থান লাভ করিয়াছে।

মোঘল যুগের হিন্দীর উন্নতি আলোচনা করিলে মনে হয় সমসাময়িক যুগের সমৃদ্ধি যেন হিন্দী সাহিত্যকেও সমৃদ্ধ করিয়াছিল। হিন্দী যেন তাহার শৈশবের সরল নিরাভরণতার সীমা অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে স্বয়ম্বরে নববধূরূপে। ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত তাহার বেশ, কারুশিল্পখচিত তাহার অঞ্চল, ছন্দোময়ী তাহার গতি। হিন্দী কবিতাতে শ্রীমণ্ডণের বিশেষ রীতি এই যুগেই প্রচলিত হয়। শ্রীমণ্ডণের জন্য হিন্দী-সাহিত্য কেশবদাসের নিকট বিশেষ ভাবে ঋণী। যদিও কৃপারাম এই মণ্ডণ-ধারার প্রথম প্রবর্ত্তন করেন, কেশবদাসই তাঁহার রচনাবলীতে রূপরেখা নির্দ্দেশ করেন। কেশবদাসের প্রথম জীবনের রচনা শ্রেষ্ঠ রচনা "বিজ্ঞানগীতা" তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ওরছারাজা মধুকর শাহকে উৎসর্গ করেন। কেশবদাসের শ্রেষ্ঠতম রচনা "কবিপ্রিয়া"। ইহাতে তিনি কাব্যের গুণাগুণ, অলঙ্কার ও সৌন্দর্য্য বিচার করিয়াছেন। ইহার স্থান হিন্দী-সাহিত্যে প্রায় সংস্কৃত "সাহিত্য-দর্পণের" মত। এই পুস্তক খানি তিনি সমসাময়িক নর্ত্তকী, কবি ও রসিকা প্রবীণা রায় পাতুরীকে উৎসর্গ করেন। কেশবদাসের রচিত "রামচন্দ্রিকা," "রসিকপ্রিয়া" ও "রাম অলঙ্কার মঞ্জরী" হিন্দী সাহিত্যকে সঙ্কলন, কাব্যবিচার ও রসবিজ্ঞানে বহুধা সমৃদ্ধ করিয়াছে।

কেশব দাসের ভ্রাতা বলভদ্র মিশ্রের রচনা হিন্দী-সাহিত্যে বহু উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে। তিনি ভাগবৎ পুরাণের একখানি টীকা প্রণয়ন করেন, তাঁহার প্রণীত "নখশিখ" গ্রন্থে তিনি আদর্শ নায়ক-নায়িকার সৌন্দর্য্য বিচার করিয়াছেন। নায়ক-নায়িকার নখাগ্র হইতে আরম্ভ করিয়া শিখাগ্র অর্থাৎ কেশাগ্র পর্য্যন্ত দেহের প্রতি অংশের রূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। পররর্ত্তী যুগের বহু লেখক ও কবি বলভদ্র মিশ্রের রচনা হইতে নারী-সৌন্দর্য্যের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন। সম্রাট আকবরের সময় বালকৃষ্ণ ত্রিপাঠী ও কাশীনাথ নামীয় দুইজন কবি হিন্দী-সাহিত্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

সম্রাট আকবরের যুগে টোডরমলের ফারমান অনুযায়ী হিন্দী দরবারী আসন বিচ্যুত হইলেও আকবরের অনুগ্রহে হিন্দী বহু উন্নতি লাভ করিয়াছিল। অবশ্য সমস্ত হিন্দী কবিই যে আকবর কর্ত্তৃক পৃষ্ঠপোষিত হইতেন তাহা নহে। তবে ইহা যথার্থ যে হিন্দী কবিদের মধ্যে অনেকেই আকবরের সাহায্য লাভ করিয়াছেন। কেহ বা তাঁহার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে পরিচিত ছিলেন, কেহ বা দূর হইতে আকবরের হিন্দী-প্রীতির আখ্যান দ্বারা উৎসাহিত হইয়াছেন, আবার অনেকেই সম্রাটের পারিষদবর্গের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছেন। আকবর স্বয়ং হিন্দী কবিতা রচনা করিয়াছেন।

জাকো জস্ হ্যায় জগৎমে, জগৎ সরাহে জাহি
তাকো জীবন সফল হ্যায়, কহৎ আকব্বরসহি।

যাহার যশঃ আছে অখিল ব্যাপিয়া, যাহার যশ জগৎ গাহিতেছে, তাহারই জীবন সফল। আকবর এই উক্তি করিতেছেন।

(২) তুলসী ও সুরদাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের কাহিনী আধুনিক তত্ত্বান্বেষীদের মতে যথার্থ নহে।

(৩) দাদূ আকবর পরিচয় বিষয়ে বিশ্বভারতীর ক্ষিতি মোহন সেন বহু নতুন কথা বলিয়াছেন।

সবৈঁ তুমি গোপাল কী, যামে অটক কহা
জাকে মনমে অটক হ্যায়, সোই অটক রহা।

আকবরের প্রথম জীবনের কবিতার মধ্যে একটা তরল আবিল ভাব আছে। কিন্তু পরবর্ত্তী জীবনে মন্ত্র পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আকবরের কবিতাগুলি একটা নতুন আদর্শ স্পর্শে সুন্দরতর হইয়া উঠিয়াছে।

জাহাঙ্গীর তাঁহার শিক্ষাগুরু আবদুর রহিম খান-খানানের শিক্ষা দ্বারা তদানীন্তন উদার ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল জ্ঞানের জাতি নাই; তাই জাহাঙ্গীর জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে জ্ঞানানুশীলন করিয়াছেন। হিন্দী-সাহিত্যে জাহাঙ্গীরের অতিশয় প্রীতি ছিল। তাঁহার রচিত আত্মচরিতে দুইজন হিন্দী কবির উল্লেখ আছে—মাড়োয়ার রাজা সুরজসিং এবং গুজরাট নিবাসী বৃথরায় ভাট। অবশ্য আকবরের সময়কার বহু হিন্দী কবি জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীরের দরবারে হিন্দী কবিদিগকে "কবিরায়," "মহাপাত্র" প্রভৃতি উপাধি প্রদান করা হইত। জাহাঙ্গীরের স্বরচিত কয়েকটী হিন্দী কবিতা পাওয়া যায়,

সৌঙন মধ্ খেলত লাল ভম্বর
মানফুলী ফুলজারী বন্ বন্ বনিতা আই হ্যায়,
পিয়া মন ভাই
একন্ সো নিন সেন একন সো মীটে বেন একন
কো পাছে তে অঙ্ক ভরত অচানক ছবি ছাই।

শ্রীকৃষ্ণ গোপিকাগণ মধ্যে ভ্রমররূপে লীলা করিতেছেন। মনে হয় গোপীগণ যেন প্রস্ফুটিত পুষ্পোদ্যানরূপে বনে সমাগতা, কানু এইরূপ ভালবাসেন, কাহাকে তিনি নয়ন দ্বারা ইঙ্গিত করিতেছেন। কাহাকে বা মিষ্ট বচনে তুষিতেছেন; অন্যকে পশ্চাৎ হইতে আলিঙ্গন করিতেছেন। কানুর এইরূপ বড় ভাল লাগে। জাহাঙ্গীরের কবিতার ভিতর একটা চঞ্চল রসগ্রাহী ভাবের আভাস পাওয়া যায়।

এই সময় হইতে মোগল পরিবারে হিন্দী ভাষার বহুল প্রচার হয়। ইহার অন্যতম কারণ রাজপুত বিবাহ,—রাজমাতা, রাজকন্যা, রাজপুত্র, রাজপুত্র-বধূ সকলেই ন্যূনাধিক পরিমাণে হিন্দীভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। জাহাঙ্গীর-পুত্র খসরু ও শহর ইয়ার উভয়েই হিন্দী কবি ছিলেন এবং হিন্দী কবিদের উৎসাহ দিতেন। শহর ইয়ারের রচিত কবিতার সন্ধান পাওয়া যায়।

শহর ইয়ার :—চান্দ্ সে চকোর টলে,
মেঘ সে মৌ টলে।
চোরী সে চোর টলে, দিল সে দিলদার জো॥
রোগী সে রোগ টলে, ভোগী সে ভোগ টলে।
জোগী সে জোগ টলে, কামী হুঁতে নার জো॥
লেকিন 'শহরইয়ার' মানো রহ এতবার।
টলে নহি হোনহার, হোবে হোনহার জো॥

শহরইয়ার এই কবিতার ভিতর দিয়া আপনার ভবিষ্যৎ জীবন-নাটকের শ্লেষ (irony) সন্ধান পাওয়া যায়।

সম্রাট শাহ্‌জাহানের হিন্দুবিদ্বেষ থাকিলেও হিন্দী বিদ্বেষ ছিল না। তাঁহার দরবারে বহু হিন্দী কবি ও গায়ক বৃত্তি লাভ করিত। 'মহাপাত্র', 'কবিরায়' প্রভৃতি উপাধি প্রচলিত ছিল। বিওলী হরনাথ 'মহাপাত্র' এবং সুন্দর 'কবিরায়' উপাধি দ্বারা সম্মানিত হইয়াছিলেন। রাজপুত্র দারাশুকো একজন উদার গুণগ্রাহী পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় বহু কবি নিজের শক্তি প্রচার করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। রাজকুমারী রোশেনারার জীবনী আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তিনি হিন্দী-সাহিত্যে বিশেষ প্রীতিময়ী ছিলেন। দারাশুকো এবং রোশেনারা কাশী নিবাসী কবি সরস্বতীকে বহুভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন।

ক্রমশঃ

বিরাটের আবিষ্কার—বিজ্ঞানে ও ধর্ম্মে

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ব্রহ্মচারী বীরেশ্বর চৈতন্য

সৃষ্টির পশ্চাতে স্রষ্টাকে স্বীকার করিতে বর্ত্তমান বিজ্ঞান একেবারে গররাজি নয়—কিন্তু তাহার দাবী এই যে, সে তাহার নিঃসন্দিগ্ধ জ্ঞানালোকে যে বিরাট্‌কে আবিষ্কার করিয়াছে উহার নির্ম্মাতা যেন উহা হইতে ক্ষুদ্রতর কিছু না হন। তাহার আশঙ্কা এই যে, ধর্ম্মপুস্তকে বা পুরোহিত, সাধু সন্তের মুখে বালককাল হইতে সে যে স্রষ্টার কথা শুনিয়া আসিয়াছে, তিনি আজিকার এই অনন্ত দেশ-কাল সংহতির মধ্যে অনন্ত নেবুলা হইতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তিলীলা দেখিয়া নিশ্চয়ই বিস্ময়-বিমূঢ় হইয়া পড়িবেন—নিজে সৃষ্টি বা পালন করা ত দূরের কথা। অথচ স্রষ্টাও একজন চাই। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের যাঁহারা ছিলেন অগ্রদূত—গেলিলিও, বেকন্, ডেকার্ট, নিউটন্ ইঁহারা সকলেই জগতের কর্ত্তা ভগবান্‌কে স্বীকার করিয়া গিয়াছিলেন। হয়ত ইহা তখন স্বাভাবিকই ছিল, কেননা বিজ্ঞান তখনও জলে, স্থলে, অনলে, অনিলে সর্ব্বত্র তাহার সর্ব্বজয়ী ক্ষমতা আবিষ্কার করে নাই। আবার ধর্ম্মযাজকের শক্তিও তখন অপ্রতিহত না হইলেও একান্ত দুর্ব্বল নয়। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে আবহাওয়া কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যরূপ ধারণ করিল। "মসিয়েঁ ল্যাপ্‌লস্, শুনতে পাই—জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের সংহতি বিষয়ে আপনি একখানা প্রকাণ্ড বই লিখেছেন অথচ তাতে নাকি সৃষ্টিকর্ত্তার নাম একবার ও উল্লেখ করেন্ নি?" সম্রাট্ নেপোলিয়নের এই প্রশ্নে তখনকার প্রথিতযশাঃ ফরাসী বৈজ্ঞানিক উত্তর করিয়াছিলেন, হাঁ সম্রাট্, কেননা আমার গবেষণায় ঐরূপ কোন প্রতিজ্ঞার প্রয়োজন হয় নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ল্যাপ্‌লস্ (Leplace) বিজ্ঞানকে এই যে স্বাধীনতা দিয়া গেলেন, দুইশত বৎসর ধরিয়া সে উহার চরম প্রয়োগ ত করিলই, বরং উল্‌টিয়া, স্রষ্টার কথা যাহারা বলিতে আসিল তাহাদিগকে দশকথা শুনাইয়া দিল, অপমানিত করিল, প্রহার করিতেও ক্ষুণ্ণ হইল না। বিগত দুই শতাব্দীতে স্রষ্টার প্রতিজ্ঞা হইতে বিযুক্ত হইয়া সৃষ্টির গবেষণার সে কি অপ্রতিহত প্রসার—আবার বিজ্ঞানে ও ধর্ম্মে পরস্পর সে কী তুমুল কোলাহল! আজ বিংশ শতাব্দীতে, আসরে আবার নূতন পালা সুরু হইয়াছে। আজ বিজ্ঞান সৃষ্টির সহিত স্রষ্টার তত্ত্ব অপ্রাসঙ্গিক মনে করিতেছেনা—বরং কোন কোন স্থলে অপরিহার্য্য বলিয়া গণ্য করিতেছে। স্রষ্টার এই চাহিদা আবার গেলিলিও-বেকন্-নিউটনীয় ধরণের চাহিদা নয়। পিতৃপিতামহের কাছ হইতে পাওয়া স্বাভাবিক সরল ধর্ম্মবিশ্বাস হইতে, অথবা রাজার বা পাত্রীর শাসনের ভয় হইতে এই অনুসন্ধিৎসা আসে নাই। বিজ্ঞান তাহার প্রচলিত পন্থা সমীক্ষা সিদ্ধান্ত ধরিয়া চলিতে চলিতেই এখানে আসিয়া পঁহুছিয়াছে। স্রষ্টা চাই, শুধু সৃষ্টি নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে না—বিজ্ঞানের নানা বিভাগ কম বেশী উত্তেজনার সহিত এই একই কথা শুনাইতে চাহিতেছে। রসায়নে পরমাণু গঠন আবিষ্কার করিতে গিয়া, পদার্থ বিদ্যায় আলোক কণার স্বরূপ

নির্দেশ করিতে গিয়া প্রাণিতত্ত্বে (Biology) জীবনের স্পন্দনকে বিশদভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতে গিয়া আবার ক্রমবিকাশের সমীক্ষিত ঘটনাবলীর রহস্য সাজাইতে গিয়া বৈজ্ঞানিক একই ভাবে বিষম হেঁয়ালীর মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন, কোন চেতন শক্তি, ঈশ্বর বা ঐরূপ একটা কিছু না মানিলে গোলমালের সমাধান হয় না। এই সকল বিজ্ঞানের অনেক অধিনায়ক, তাই এই চেতনশক্তির নানা চিত্র আঁকিয়াছেন, নানা নামকরণও করিয়াছেন। সার অলিভার লজ্, ম্যাক্স প্লাঙ্ক্, ভাইকাউন্ট হলডেন, লরেন্স্ হেণ্ডারসন্ ও লয়েড্ মর্গ্যানের আধুনিক পুস্তকগুলি পড়িলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য-সত্যের সহিত অতীন্দ্রিয় সত্যের যে শীঘ্রই একটা আপোষ হইতে চলিয়াছে এইরূপ আশা হয়। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ ভাবে স্রষ্টার সমস্যা যে বিজ্ঞানের প্রসঙ্গে ব্যাপকভাবে আজ আলোচিত হইতেছে, তাহা বর্ত্তমান জ্যোতির্বিদ্যা এবং ইহার দুইজন অন্যতম গবেষক সার আর্থার এডিংটন্ এবং সার জেমস্ জিন্স্ তাঁহাদের পুস্তকে সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান সম্বন্ধে এত উদার এবং সুন্দর কথা বলিয়াছেন যে ধর্ম্মের তরফ হইতে তাঁহাদিগকে প্রায় অধর্ম্মের অভ্যুত্থান-নাশক মেসায়া (Messiah) করিয়া তোলা হইয়াছে। দেশে বিদেশে আজকাল যত ধর্ম্মপুস্তক বা প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে প্রায় সকল গুলিরই মধ্যে ইহা দেখাইবার চেষ্টা চলে যে, বিজ্ঞান ধর্ম্মের নিকট পরাভূত,—প্রমাণ—বৈজ্ঞানিক এডিংটন ও জিন্স্ এর লেখা। রাসেল্ (Bertrand Russel) তাঁহার একখানি বইতে* সম্প্রতি ধর্ম্মের এই মনোভাবকে খুব ব্যঙ্গ করিয়াছেন। তিনি বলতে চান্ যে এডিংটন্ ও জিন্স্ স্রষ্টা সম্বন্ধে যে সকল কথা লিখিয়াছেন তাহা তাঁহাদের বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিত্বের অগোচরে, তাঁহাদের দার্শনিক মেজাজ হইতেই বাহির হইয়াছে, উহাদের বৈজ্ঞানিক মূল্য খুব কম এবং খুব সম্ভব জনমত খুসী করিতেই তাঁহারা ঐরূপ দুটী একটী আবোল তাবোল্ বকিয়াছেন। রাসেল্ হয়ত জড়বাদ সমর্থন করিয়া বাহাদুরী লইতে গিয়া এই উক্তিতে যথেষ্ট গোঁড়ামী প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু যাঁহারা এই দুই বৈজ্ঞানিকের দোহাই দিয়া বিজ্ঞানকে ধর্ম্মের নিকট দাসখত লিখাইয়া লইতে চান্ তাঁহাদেরও এই বিজয়োল্লাস যেন খুব সমীচীন ও কালোপযোগী বলিয়া মনে হয় না। প্রকৃত সত্য বোধ হয় এই দুই দলের পরস্পর বিরোধী নির্দ্দেশ দুটীর মাঝামাঝি। বর্ত্তমান বিজ্ঞান বিশেষতঃ জ্যোতির্বিজ্ঞান সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে এমন একটী পারম্পর্য্য, অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্র আবিষ্কার করিয়াছে যে, উহার সহিত একজন চেতন স্রষ্টার সম্বন্ধ কল্পনা করিলে সেই পারম্পর্য্যের একটা সুসঙ্গত অর্থ হয়। জিন্স্ এডিংটন্ এই-টুকু মাত্রই বলিয়াছেন। বহুশ্রুত বৈজ্ঞানিকের মুখে, বৈজ্ঞানিক গবেষণারই প্রত্যঙ্গ হিসাবে এই উক্তির দাম কম নয়—কিন্তু ইহাও সত্য যে, বিজ্ঞানের এই স্রষ্টার চাহিদাতেই ধর্ম্ম, সন্দেহ ও নাস্তিক্যবাদ হইতে চিরদিনের মত বিমুক্ত হয় নাই—ধর্ম্মের মহিমা সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে এখনও অনেক বাকী। বরং ধর্ম্মের সম্মুখে জটিল ও কঠিন সমস্যা এই যে, বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের যাবতীয় আবিষ্কারের কোনটীকেই বাদ না দিয়া, অবহেলা না করিয়া বৈজ্ঞানিক যুগের উপযোগী ধর্ম্মের নূতন রূপ ব্যাখ্যান আবিষ্কার করা। বৈজ্ঞানিকের বিরাট্ প্রকৃতি আজ স্বয়ংবরা হইয়াছেন কিন্তু পণ বড় কঠিন—তাঁহার পতি যিনি হইবেন অসামান্য যশঃ, বীর্য্য, মেধা তাঁহাতে থাকা চাই। তিনি বরঞ্চ অনূঢ়া হইয়া সারাজীবন কাটাইবেন কিন্তু যাহাকে তাহাকে বরমাল্য প্রদান করিবেন না—কিছুতেই না।

* * * *

* The Scientific Outlook. Chap V.

অচেতন বিরাটের স্বামী এই চেতন বিরাট্‌কে চাহিয়াই মাত্র বৈজ্ঞানিক আজ ক্ষান্ত হন নাই—কেহ কেহ ধর্ম্মের মুখাপেক্ষী না হইয়া স্বতন্ত্র ভাবে তাঁহার এক একটী ছবিও আঁকিবার চেষ্টা করিয়াছেন। জিন্‌স্‌এর ভগবান্‌ একজন মহামেধাবী গণিতজ্ঞ,* কেননা নীহারিকার ও পূর্ব্বেকার সেই আদিম কুজ্ঝটিকা (primordial gas) হইতে প্রকৃতির স্থূলতম সৃষ্টি পর্য্যন্ত সকল বস্তুই গণিতের সূক্ষ্ম হিসাব মানিয়া দাঁড়াইয়া আছে। প্রচীন গ্রীসের পিথাগোরাস্‌ ও প্লেটো আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে অনেকটা এইরূপ কথাই বলিয়াছিলেন—আকৃতি ও পরিমাপ (form and measure) জগতের সর্ব্বত্র ওতপ্রোত।

কিন্তু এই দুই প্রাচীন দার্শনিকের কথা হইতে আজ বৈজ্ঞানিক সার জেম্‌স্‌ জিন্‌সের উক্তির শক্তি অনেক বেশী। আজ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ করিতে পারেন যে, শুধু এই পৃথিবীতে নয়—কোটি কোটি মাইল দূরের নক্ষত্রে, নেবুলায়—প্রকৃতির ঘটনা একই গাণিতিক হিসাব ধরিয়া নিষ্পন্ন হইতেছে। অনন্ত আকাশে—অনন্ত প্রকার আলোক-তরঙ্গ উত্থিত ও বিকীরিত হইতেছে, কিন্তু উহা যাহা দ্বারা গঠিত সেই আলোকাণু (quantum)র পরিমাপ সর্বত্র এক—দূরতম নেবুলায় যাহা, আমাদের এই পৃথিবীতেও তাহা। বিদ্যুতিন্‌ (electron)-এর সহিত যেটুকু তড়িৎ সংশ্লিষ্ট থাকে এই অনন্ত অসীম ব্রহ্মাণ্ডের কোথাও তাহার সেই মাপের কমবেশী হইবার উপায় নাই। আলোকের বেগের ক্ষেত্রেও ওই একই কথা। আমাদের এই পৃথিবীর গণিতবিদ্‌ যেমন খাতার উপর খাতা আঁক কসিয়া ভরিয়া ফেলেন, তেমনি দেশকালের অতীতে কোন্‌ এক রহস্যময় লোকে ভগবান এই বিরাট্‌ সৃষ্টিরূপ অঙ্ক লিখিয়া যাইতেছেন। কোথায়? জিন্‌স্‌ বলেন বিরাট্‌ মনে।* আলোকাণু, বিদ্যুতিন্‌ প্রভৃতি হইতে গ্রহ, নক্ষত্র, নেবুলা পর্য্যন্ত সৃষ্টির যাহা কিছু সবই সেই মহামহিম গণিত-বিশারদের গাণিতিক চিন্তা মাত্র।

পয়কারে (Poincare), আইন্‌ষ্টিন্‌, সোমার-ফিল্ড্‌ সৃষ্টি এবং স্রষ্টাতে গাণিতিক প্রতিভা ছাড়া শিল্প ও সৌন্দর্য্যের প্রতিভাও দেখিয়া থাকেন। খাঁটি বৈজ্ঞানিকগণ ব্যতীত বৈজ্ঞানিক-সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া, অনেক দার্শনিকও আজকাল বিরাটের স্রষ্টার নানা ধারণা দিয়াছেন ও দিতেছেন। জেম্‌স্‌ওয়ার্ড, বার্গ্‌স ও হোয়াইট্‌-হেড্‌ এই তিনটী নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন সভ্যদেশের বিভিন্ন মনীষিগণ কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত এই নানা ভগবানের মধ্যে কোন্‌টী আসল ভগবান্‌? এই প্রশ্নের মীমাংসা করা সহজ নহে, বিশেষতঃ প্রশ্নটী আরও জটিল হইয়া উঠে, যখন জিজ্ঞাসা করি, এই সকল বিজ্ঞান-সম্মত ভগবানের কোন্‌টী বিশ পঁচিশ জন পণ্ডিতের বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষুধা ও কৌতূহল নিবৃত্তি করা ছাড়া শত সহস্র সাধারণ মানুষের হৃদয়ের আবেগ, সুখ দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে সমর্থ হইবেন?

* * * * *

এই অবসরে একবার পিছে তাকাইয়া দেখিলে মন্দ হয় না। হয়ত ক্ষেপা তাহার উদ্দাম লৌল্যের আবেগে পরশপাথর দেখিয়াও দেখে নাই—হাতে পাইয়াও অনাদরে রাস্তায় কোথায় ফেলিয়া আসিয়াছে। বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া ধর্ম্ম মানুষকে যে ভগবানের কথা শুনাইয়া আসিয়াছে তাঁহার কি আজিকার এই বিদ্বৎসভায় একেবারেই প্রবেশান-ধিকার? সৃষ্টি যে এত বিরাট্‌, উহার প্রক্রিয়া যে এত রহস্যময় তাহা হয় ত সেকালের মুনি ঋষিরা বুঝিতে পারেন নাই—কিন্তু উহার কর্ত্তাকে হয়ত তাঁহারা ঠিক্‌ই চিনিয়াছিলেন। অনন্ত দেশ ও

* The Mysterious Universe. P. 122

* The Mysterious Universe P. 129.

অনন্ত কালের সূতায় সৃষ্টির যে অনন্ত বস্ত্র বয়ন, আমরা আজ যন্ত্রের নির্ভুল নির্দ্দেশে মানিয়া লইতেছি, উহার রচয়িতা অবশ্যই মহাশক্তির অনন্ত বিরাট্, কিন্তু হয়ত তিনি দেশ ও কাল দুটারই বাহিরে। কোন কোন বৈজ্ঞানিকের অন্তর্দৃষ্টি আজ এ সত্য উপলব্ধি করিতেছে। দেশ ও কালের বিরাটত্ব অপেক্ষা মহীয়ান্ জ্ঞানের বিরাটত্ব, ইচ্ছা, বল, প্রেম, আনন্দের বিরাটত্ব। প্যাস্কাল্ (Pascal) নক্ষত্র-জগতের অনন্ত শূন্য দেশের কথা ভাবিয়া একদিন শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন আর ভগবানই বা এই অনন্ত শূন্যদেশের সহিত কি করিয়া সম্বন্ধ হইয়া জগৎ পরিপালন করিবেন বুঝিতে না পারিয়া নিজের ধর্ম্মবিশ্বাসের শিথিলতায় ব্যথিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ভগবানের বিভূতি যদি দেশ ও কালকে অপেক্ষা না করে, যদি তাঁহার বিরাট্ ইচ্ছা, বল ও প্রেমের গরিমার একটী সামান্য ইঙ্গিতে দেশ ও কালের যত কিছু অভিব্যক্তি, সব অনায়াসে নিষ্পন্ন হয়, তাহা হইলে অনন্ত আকাশের এই অনন্ত সৃষ্টি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিবার ত কিছুই নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতারা বোধ হয় এই ভাবেই, তাঁহাদের ভগবান্‌কে সৃষ্টির মালিক বলিয়াছিলেন এবং অভিনব অনন্ত রহস্য লইয়া যদিও আজ সৃষ্টি তাহার মহাবিরাট্‌রূপে আমাদের চোখ্ ঝলসাইয়া দিতেছে তবুও ইহার মালিক তিনিই—সেই প্রাচীন পুরুষই—যাঁহাকে ঋষিরা শুধু মস্তিষ্কের কল্পনা দিয়া আবিষ্কার করেন নাই—নানা ভাবে আধ্যাত্মিক যোগবলে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। আজ মেটারলিঙ্ক (Maeterlinck) তাঁহার ঈশ্বর-ধারণায় অতিদেশ (hyper space) এর কথা শুনাইয়া নূতন কিছুই বলেন নাই। 'প্রাচীন কুসংস্কার' বলিয়া যাহাকে অনাদর করিয়া আসিয়াছ, খুঁজিয়া দেখ, তাহারই ভিতর ঐ ধারণা আরও কত স্পষ্টভাবে, উজ্জ্বলভাবে, গভীর প্রাণপ্রদ ভাবে নিহিত রহিয়াছে। স্রষ্টার কথা বলিতে গিয়া শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন—কালে জগতের উপাদানীভূত সমুদায় পরমাণুকেও হয়ত গণিয়া শেষকরা চলে কিন্তু কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃজনকারী পরমেশ্বরের বিভূতির সংখ্যা নির্দ্দেশ সম্ভবপর নয়।* স্রষ্টা সৃষ্টি অপেক্ষা অনন্ত গুণে বিরাট্ যদিও সেই বিরাটত্ব দৈশিক বা কালিক বিরাটত্ব নয়—সে বিরাটত্ব সত্যে, জ্ঞানে, প্রেমে—আপন অনন্য মহিমায়।† সমগ্র সৃষ্টিটাই ত তাঁহার মহিমার এক আংশিক প্রকাশ মাত্র—তাঁহার তিন পাদ সৃষ্টির অতীতে‡ অচঞ্চল, অক্ষয়, অব্যয়রূপে অবস্থান করিতেছে। উপনিষদে যাহা আত্মা, ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে আর বৃহদারণ্যকে যাজ্ঞবল্ক্যের মুখে আমরা উহার যে ধারণা শুনিতে পাইয়াছি, মনে হয় স্রষ্টার নির্ব্বাচনে উহারই দাবী সর্ব্বপ্রথম। জগতের বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রে সৃষ্টিকর্ত্তাকে যত ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে, প্রাচীনকালের মনীষিগণ আনাক্সোগোরাস্, প্লেটো, এরিষ্টটল প্রভৃতি এবং পরবর্ত্তী কালের স্পিনোজা, কাণ্ট, হেগেল, শোপেনহাওয়ার প্রভৃতি দার্শনিক চিন্তার মধ্য দিয়া আদিকারণকে যত প্রকারে নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকযুগে জিন্‌স্, এডিংটন্, হব্‌হাউস্ মর্গান, বার্গস্, মেটারলিঙ্ক, হোয়াইট্‌হেড্ প্রভৃতি সৃষ্টি এবং স্রষ্টার যত রকম বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যান উপস্থিত করিয়াছেন, উপনিষদের ব্রহ্মবাদ উহাদের সকলগুলি'কেই সমর্থন করে—সকলগুলির সামঞ্জস্য বিধান করিয়া আরও কিছু অধিক নির্দ্দেশ করে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "Religion of Man" বক্তৃতা গুলিতে উপনিষদের দেবতার এই সমন্বয়মূর্ত্তি অতি সুন্দর ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। ঠিক একই ভাবে অর্থাৎ ধর্ম্মশাস্ত্রের নির্দ্দিষ্ট ঈশ্বর-ধারণাকে অব্যাহত রাখিয়া অথচ বৈজ্ঞানিক

* শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৬।৩৯
† ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৭।২৪।১
‡ পুরুষসূক্ত, ৩

আবিষ্কারের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া স্রষ্টার আলোচনা সম্প্রতি আর একজন দার্শনিক অতি চমৎকার ভাবে করিয়াছেন।* ধর্ম্মশাস্ত্রের ঈশ্বর-ধারণা গুলিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে যাচাইয়া লইবার দিন আসিয়াছে। অনেক রূপক, উপকথার জঞ্জালের সহিত খাঁটি তত্ত্ব হয় ত মিশিয়া আছে কিন্তু বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের কর্ত্তব্য সেই জঞ্জাল সরাইয়া প্রকৃত বস্তুকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে গ্রহণ করা। হয়ত তাহাতে বিজ্ঞানের আত্মমহিমার কথঞ্চিৎ লাঘব হইবে কিন্তু মানব সাধারণ অবিশ্বাস, নাস্তিকতা, জড়বাদের মোহ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া শান্তি লাভ করিবে। কেননা, ইহা অসন্দিগ্ধ সত্য যে, ঈশ্বর সম্বন্ধে স্থির কার্য্যকরী ধারণা শুধু বুদ্ধি খাটাইয়া দাঁড় করান চলেনা—উহা কোন উচ্চতর বিজ্ঞান—অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সমীক্ষা হইতেই জানা যায়। অতএব উহার জন্য উপনিষদ্—গীতা—বাইবেল—আবেস্তা প্রভৃতি অধ্যাত্মশাস্ত্রের উপর নির্ভর করাই ভাল। কেবল লক্ষ্য রাখিলেই হইল যে উহাদের সঠিক তাৎপর্য্য কি।

* John Elof Boodin—"God, a Cosmic Philosophy of Religion"

বুদ্ধ-পূর্ণিমা

শ্রীশিবদাস সুর

বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি তিনটি মহান্ স্মৃতি
জাগাইয়া বুকে
নিরাশায় দিল আশা, ধ্বনিয়া তুলিল ভাষা
কোটী মূক মুখে,
জনম, বুদ্ধত্ব লাভ, নিরবাণে তিরোভাব
এই শুভ দিনে
দ্বি সহস্র পঞ্চশত অধিক বরষ গত
ঘটেছিল তিনে।
ত্রিতাপে তাপিত জনে উদ্ধারিতে শুভক্ষণে
হ'লে অবতার,
রাতুল চরণ চুমি লুম্বিনী কানন ভূমি
হল তীর্থ সার,
দীর্ঘ দিবস যামি হয়ে নির্ব্বাণ কামী
উরু বেলা বনে
আচরিলে তপশ্চর্য্যা, ত্যজি রাজ্য প্রিয় ভার্য্যা
একক নন্দনে,

এই সে পবিত্র তিথি যাহে জন্ম মৃত্যু ভীতি
মুক্ত হল চিত্ত,
মারে করি পরাভব বহুকল্প সুদুর্লভ
লভিলা বোধিত্ব।
'অহিংসা পরম ধর্ম্ম পরহিতার্থই কর্ম্ম
আদি, সুমহান্
সদ্ধর্ম্ম প্রচারিলে, পথহারা জনে দিলে
পথের সন্ধান,
জীবনের শেষক্ষণে আগত জিজ্ঞাসু জনে
অভীঃ মন্ত্র দানি
পরহিতে তিলে তিলে নির্ব্বাণে আহুতি দিলে
জীর্ণ তনুখানি।
পবিত্র পূর্ণিমা তিথি বহিয়া ত্রিপুণ্য স্মৃতি
হল শুচিতম
বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সংঘলাগি আজি গো শরণ মাগি
নমঃ নমঃ নমঃ।

যুগে যুগে

শ্রীঅনিলবরণ রায

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত-সখা অর্জ্জুনকে তাঁহার যোগশিক্ষা দিবার সময় বলিলেন,

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।

স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥৪।২

—"এইরূপ পরম্পরাক্রমে রাজর্ষিগণ এই যোগ বিদিত হইয়াছিলেন। হে পরন্তপ। ইহলোক সেই যোগ দীর্ঘকালের বশে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।" যোগ সম্বন্ধে এখানে কেবল ক্ষত্রিয় পরম্পরাই উক্ত হইয়াছে, ব্রাহ্মণদের কোনই উল্লেখ নাই। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে সে-কালে বেদ বেদান্তের চর্চ্চা, যোগ বা অধ্যাত্ম সাধনা কেবল ব্রাহ্মণদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তাহাদের সহিত ক্ষত্রিয়েরাও অন্ততঃ সমানভাবে প্রতিযোগিতা করিত। বর্ণবিভাগ বলিতে আজকাল লোক যেমন কড়াকড়ি প্রভেদ বুঝে বস্তুতঃ সেকালে সেরূপ কিছুই ছিল না। জীবনের মূল প্রয়োজনীয় সকল কর্ম্মে সকল শ্রেণীরই অধিকার ছিল। কুরুক্ষেত্রে ব্রাহ্মণেরা অপূর্ব্ব বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন, ক্ষত্রিয় শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন গভীরতম জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিয়াছেন। অর্থহীন কড়াকড়ি জাতিভেদের দ্বারা বর্ত্তমানে সমাজের যে ঘোর অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, প্রাচীনকালে এইরূপ স্বাধীনতা থাকায় সামাজিক, অর্থনৈতিক, আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বর্ণবিভাগের দ্বারা সেরূপ অনিষ্ট হইত না। গীতা বলিয়াছে, পুণ্যশীল ব্রাহ্মণ ও ভক্ত রাজর্ষিগণ উচ্চ অধ্যাত্ম সাধনার যোগ্যতর অধিকারী হইলেও স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র, অন্ত্যজ যে-কেহ ঐকান্তিকভাবে ভগবানকে ভজনা করিবে সেই পরম গতিলাভ করিবে (গীতা ৯।৩৩)। প্রাণহীন সমাজের কঠোর শাসনে লোকে গীতার এই উদার শিক্ষা ভুলিয়াছে।

মানুষকে তাহার লক্ষ্যে, পুরুষার্থে লইয়া যাইবার জন্য এক শাশ্বত সনাতন ধর্ম্ম আছে। কিন্তু ইহার অর্থ নহে যে, কোন বিশেষ যুগের বা দেশের কোন বিশেষ শাস্ত্রে তাহা সম্পূর্ণভাবে নিবদ্ধ আছে। বেদ, উপনিষদ্, গীতা, বাইবেল, কোরাণ—কোন শাস্ত্র সম্বন্ধেই এ কথা বলা চলে না। কৃষ্ণ, বুদ্ধ, মহম্মদ, মূশা, ঈশা, শ্রীচৈতন্য, কাঁহারও সম্বন্ধেই ইহা বলা যায় না যে, তিনি যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহাতেই সত্য নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে, আর কিছুই সন্ধান করিবার, জানিবার, ব্যক্ত করিবার নাই। তাহা ছাড়া কালক্রমে মানুষের মতি গতির, মানসিক শক্তি ও প্রকৃতির অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া যায়, এককালের লোক যে শাস্ত্র বুঝিত, যে শিক্ষা ও আদর্শকে অনুসরণ করিয়া কল্যাণমার্গে অগ্রসর হইত, অন্যকালের লোক তাহা আর সেইভাবে বুঝিতে বা গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় না। এককালে যাহা জীবনযাত্রায় পথ-নির্দ্দেশের সাফল্যময় নীতি ছিল, অন্যকালে তাহাই প্রাণহীন লোকাচারে পরিণত হয়, লোকে আর তাহার মর্ম্মার্থ না বুঝিয়া গতানুগতিকভাবে অনুসরণ করে। তাহার উপর প্রকৃত বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা না থাকায় তাহার দ্বারা ইহকাল পরকাল কিছুই হয় না, ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ। এই জন্যই যুগে যুগে নূতন সত্যদ্রষ্টার প্রয়োজন হয়, তিনি নিজের সাধনার দ্বারা সনাতন সত্যকে নূতনভাবে আবিষ্কৃত করিয়া দেশ ও কালের উপযোগিতা অনুসারে প্রচার করেন। তাঁহার মধ্যে সত্যকে

জীবন্তভাবে পরিস্ফুট দেখিয়া লোকে শ্রদ্ধার সহিত তাহা গ্রহণ করে, তাহাদের জীবনযাত্রা সুব্যবস্থিত হয়। বৈদিক ধর্ম্ম লোকাচারে পরিণত হইল, তখন এক বুদ্ধ আবির্ভূত হইলেন তাঁহার অষ্টাঙ্গ মার্গের নূতন বিধান এবং নির্ব্বাণের আদর্শ লইয়া, আর এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, তিনি ইহাকে তাঁহার ব্যক্তিগত সৃষ্টি বলিয়া প্রচার করিলেন না, বলিলেন যে, ইহা আর্য্যজীবনের সত্য নীতি, জ্ঞানোদ্ভাসিত মনীষা ও প্রবুদ্ধ আত্মার দ্বারা, বুদ্ধের দ্বারা ইহা বার বার পুনরাবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু কার্য্যতঃ ইহার অর্থ হইতেছে এই যে, একটি আদর্শ, একটি শাশ্বত ধর্ম্ম আছে যাহাকে ধর্ম্ম, দর্শন, নীতিশাস্ত্র এবং মানুষের মধ্যে আর যে-সব শক্তি সত্য ও পূর্ণতার জন্য প্রয়াস করে, সকলেই আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যজীবনের বিদ্যা ও প্রয়োগনীতির নবতম বিবৃতিতে, নূতন শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ করিতে নিরন্তর চেষ্টা করিতেছে। মূসা-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম, নীতি, সামাজিক সদাচারের বিধান সঙ্কীর্ণ ও অপূর্ণ বলিয়া নিন্দিত হইল, তাহা ছাড়া উহা লোকাচার মাত্র হইয়া দাঁড়াইল, তখন খ্রীষ্টের ধর্ম্ম উহার স্থান গ্রহণ করিতে আসিল, একই সঙ্গে উহাকে উচ্ছেদ ও সার্থক করিতে চাহিল, তাহার অসম্পূর্ণ বাহ্যরূপকে উচ্ছেদ করিতে চাহিল, এবং জীবনের যে দিব্য বিধান উহার লক্ষ্য ছিল সেইটিকে আত্মার গভীরতর ও প্রশস্ততর জ্যোতি ও শক্তিতে সার্থক করিতে চাহিল। আর মানুষের অনুসন্ধান ঐখানেই থামিয়া যায় নাই পরন্তু এই সকল বিধানকেও পরিহার করিয়াছে, যে-সত্যকে সে এককালে বর্জ্জন করিয়াছিল তাহাতেই পুনরায় ফিরিয়া গিয়াছে অথবা কোন নূতন সত্য ও শক্তির দিকে অগ্রসর হইয়াছে, কিন্তু সকল সময়ে সে একটি জিনিষই সন্ধান করিয়াছে,—তাহার সর্ব্বাঙ্গসিদ্ধির নীতি, তাহার যথাযথ জীবন যাপনের বিধান, তাহার উচ্চতম ও মূলগত আত্মা ও প্রকৃতি।

গীতা শম দম জ্ঞান ইত্যাদির জন্য ব্রাহ্মণকে উচ্চ স্থান দিলেও, ক্ষত্রিয়বীরকেই যোগের উৎকৃষ্ট পাত্র বলিয়া বিবেচনা করিয়াছে, এবং যোগের পরম্পরা বর্ণনায় ব্রাহ্মণদের কোন উল্লেখ করে নাই। আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার বিখ্যাত ভাষ্যে গীতার এই ত্রুটি সংশোধন করিয়া দিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন যে, ক্ষত্রিয়গণকে যোগজ্ঞান দেওয়া হইয়াছে এই জন্য যে যোগবলে বলবান হইয়া তাঁহারা ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় পরম্পরের দ্বারা পরিরক্ষিত হইলে সকল সংসার রক্ষা করিতে সমর্থ হন। কিন্তু শঙ্করের যুগে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরা নিজেদের প্রাধান্য চিরস্থায়ী করিয়া রাখিবার যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সমাজের অন্যান্য স্তরের লোককেও নিজেদের স্তরে তুলিয়া লইতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন, তাহাতে সংসার রক্ষা পায় নাই, সমস্ত ভারতের অধঃপতনের সহিত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরও শোচনীয় অধঃপতন হইয়াছে। বস্তুতঃ গীতা সমাজে এইরূপ অলঙ্ঘ্য প্রাচীর সৃষ্টি করিবার কথা বলে নাই, গীতা সাম্যেরই আদর্শ প্রচার করিয়াছিল। গীতা তৎকালীন সামাজিক বর্ণবিভাগের উল্লেখ করিলেও বাহ্যিক ভেদের উপর জোর দেয় নাই বা নির্ভর করে নাই, পরন্তু আভ্যন্তরীণ প্রকৃতি বা স্বভাবের উপরেই জোর দিয়াছে। যাঁহারা কর্ম্মবীর, ভিতরে বাহিরে শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে যাঁহারা সর্ব্বদা প্রস্তুত ও উৎসাহশীল, তাঁহারা যে কুলেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন, তাঁহারাই প্রকৃত ক্ষত্রিয়, এবং গীতোক্ত যোগসাধনার উপযুক্ত পাত্র। অর্জ্জুনকে "পরন্তপ" বলিয়া সম্বোধন করায় ইহাই সূচিত হইয়াছে। "পর" বলিতে শত্রুপক্ষকেই বুঝায়, যে ব্যক্তি স্বীয় শৌর্য্য, তেজ ও প্রতাপের দ্বারা সূর্য্যের ন্যায় শত্রুগণকে তাপিত করেন, তিনিই

পরন্তপ। এই শব্দের দ্বারা ক্ষত্রিয়কেই বুঝায়। কালের বশে লোকে যখন প্রকৃত ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম হইতে চ্যুত হইয়া পড়ে, অধ্যাত্ম জীবন, অধ্যাত্ম সাধনা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা লইয়া কর্ম্মে বিরত হয়, যুদ্ধে বিরত হয় এবং এইভাবে প্রকৃতির নিকৃষ্ট গুণ তামসিকতাকে প্রশ্রয় দেয় তখনই উপযুক্ত আধার না পাইয়া সংসার হইতে যোগ সাধনা, যোগশক্তি অদৃশ্য হইয়া যায়। বহুদিন ধরিয়া আপামর জনসাধারণের মধ্যে মায়াবাদ, সংসারত্যাগ, কর্ম্মত্যাগের শিক্ষা তীব্রভাবে প্রচারিত হওয়ায় এবং অসংখ্য প্রাণহীন গতানুগতিক বিধিনিষেধের বন্ধনে সমাজজীবন পিষ্ট হওয়ায় ঘোর তমোগ্রস্ত হইয়া ভারতীয় জাতি যখন নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইতেছিল সেই সঙ্কট মুহূর্ত্তে আবির্ভূত হইলেন সত্য ও আধ্যাত্মিকতার জীবন্ত বিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণ। ভারতের ধর্ম্ম, ভারতের আদর্শ জগতের কল্যাণের জন্যই রক্ষা পাইল। শ্রীরামকৃষ্ণ চরণাশ্রিত স্বামী বিবেকানন্দ বুঝিয়াছিলেন যে, সাত্ত্বিকতা ও আধ্যাত্মিকতার নামে ভারত যে গভীর তামসিকতার মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে—ইহা দূর করিতে না পারিলে ভারতের রক্ষা নাই। তাই তিনি বলিলেন, "এখন রজোগুণের দরকার। দেশে যে সব লোককে এখন সত্ত্বগুণী বলে মনে কচ্ছিস—তাদের ভিতর পনর আনা লোকই ঘোর তমোভাবাপন্ন। এক আনা লোক সত্ত্বগুণী মিলে ত ঢের। এখন চাই প্রবল রজোগুণের তাণ্ডব উদ্দীপনা,—দেশ যে ঘোর তমসাচ্ছন্ন, দেখতে পাচ্ছিস্ না? এখন দেশের লোককে উদ্যমী করে তুলতে হবে, জাগাতে হবে, কার্য্যতৎপর করতে হবে। নতুবা ক্রমে দেশশুদ্ধ লোক জড় হয়ে যাবে,—গাছ-পাথরের মত জড় হয়ে যাবে।"

দেশশুদ্ধ লোক যে গাছ পাথরের মত জড় হয়ে যায় নাই, জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে যে আজ নূতন প্রাণের স্পন্দন দেখা যাইতেছে, ইহার মূলে রহিয়াছে দক্ষিণেশ্বরের সাধনা।

ভগবান্ বুদ্ধ ও তাঁহার ধর্ম্মমত

শ্রীরমণীকুমার দত্ত গুপ্ত, বি-এল্

শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি ভারতীয় ধর্ম্ম ও দর্শনের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় দিন। এই শুভ দিবসেই খৃষ্টপূর্ব্ব ৬২৩ অব্দে যখন বেদের কর্ম্মকাণ্ডান্তর্গত যাগযজ্ঞ, ক্রিয়াকাণ্ড, আচার অনুষ্ঠানাদি কালক্রমে অত্যন্ত প্রাণহীন, নীরস ও আড়ম্বরবহুল হইয়া পড়িয়াছিল এবং যজ্ঞে নিষ্ঠুর প্রাণিহত্যা ও জাতিবৈষম্যের বাড়াবাড়ি অতিমাত্রায় আত্মপ্রকাশ করিল, তখন লোকোত্তর মহাপুরুষ সর্ব্বলোকানুকম্পা, সাম্য, মৈত্রী, অহিংসা, শান্তি ও নির্ব্বাণের বক্তা, কর্ম্মযোগিশ্রেষ্ঠ ভগবান্ বুদ্ধ আমাদের এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি তিন প্রকারে ধর্ম্মেতিহাসে জয়যুক্তা হইয়া রহিয়াছে। এই শুভ তিথিতে ভগবান্ বুদ্ধ কপিলবাস্তু নগরের লুম্বিনী উদ্যানে জন্ম পরিগ্রহ করেন, আবার এই তিথিতেই পঞ্চত্রিংশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে মগধ রাজ্যের উরুবেল নামক স্থানে বোধিদ্রুমমূলে সম্যক্ সম্বোধিলাভ করেন, আবার এই শুভ তিথিতেই

অশীতিবৎসর বয়ঃক্রমকালে কুশীনগরের উপবর্ত্তনে শালবনে পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন। এই শুভ তিথির স্মরণে ভগবান্ তথাগতের জন্ম, সম্বোধিলাভ, পরিনির্ব্বাণ ও ধর্ম্মমত সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতে প্রয়াস পাইব। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধগ্রন্থ 'ললিত বিস্তর সূত্র" অবলম্বনে আমি প্রধানতঃ এই সকল প্রসঙ্গ আলোচনা করিব।

কপিলবাস্তু মহানগরের রাজা সুপ্রসিদ্ধ শুদ্ধোদন শাক্যাধিপতি সুপ্রবুদ্ধের কন্যা মায়াদেবীকে বিবাহ করেন। বৈশাখমাসের পূর্ণিমা তিথিতে মায়াদেবীর গর্ভসঞ্চার হয়। তৎকালে একদিন মায়াদেবী স্বপ্ন দেখিলেন, হিমরজত নিকাশ, চন্দ্রসূর্য্যাতিরেক এবং সুচরণ ও সুবর্ণ এক মহাত্মা তাঁহার উদরে প্রবেশ করিয়াছেন। তখন শুদ্ধোদন নিমিত্তজ্ঞ ও স্বপ্নাধ্যায় পাঠক ব্রাহ্মণগণের নিকট উক্ত স্বপ্নের ফলাফল জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণগণ উত্তর করিলেন, মায়াদেবীর গর্ভে এক পুত্র জন্মিবে। তিনি যদি গৃহে থাকেন, তাহা হইলে রাজচক্রবর্ত্তী হইবেন, আর যদি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সর্ব্বলোকানুকম্পী বুদ্ধ হইবেন। তদনন্তর দশমাস অতীত হইলে মায়াদেবী কপিলবাস্তু নগরের সান্নিধ্যে লুম্বিনী নামক পরম রমণীয় উদ্যান মধ্যে একটি পুত্র প্রসব করেন। পুত্র জাতমাত্রই শুদ্ধোদনের সর্ব্বার্থ সংসিদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া তিনি পুত্রের নাম সর্ব্বার্থসিদ্ধ বা সিদ্ধার্থ রাখিলেন। সিদ্ধার্থের জন্মগ্রহণের সাতদিন পরে মায়াদেবীর মৃত্যু হয়। বোধিসত্ত্বের জন্মগ্রহণের সাত দিন পরেই মায়াদেবীর মৃত্যু ঘটিল কেন? মায়াদেবীর যে আয়ুঃ পরিমাণ ছিল, তাহা বোধিসত্ত্বের জন্মের সাতদিন পরেই নিঃশেষিত হইয়াছিল, এই হেতু তিনি ঐ সময়ে দেহত্যাগ করিলেন। আর বিবৃদ্ধ শরীর ও পরিপূর্ণেন্দ্রিয় সন্তানের বহির্নিক্রমণে মাতার হৃদয় বিদীর্ণ হয়, এই হেতুও মায়াদেবীর মৃত্যু ঘটিয়াছিল। কুমারের প্রতিপালনের ভার উহার মাতৃস্বসা মহাপ্রজাবতী গৌতমীর হস্তে অর্পিত হয়। লালন পালনের জন্য আটজন অঙ্কধাত্রী, আটজন ক্ষীরধাত্রী, আটজন মলধাত্রী এবং আটজন ক্রীড়াধাত্রী নিযুক্ত হইয়াছিল।

এই সময়ে অসিত বা কাল দেবল নামে এক মহর্ষি স্বীয় ভাগিনেয় নরদত্তের সহিত কপিলবাস্তু নগরে আগমন করিয়া সিদ্ধার্থের দ্বাত্রিংশৎ প্রকার মহাপুরুষ লক্ষণ ও অশীতি প্রকার অনুব্যঞ্জন দেখিয়া শুদ্ধোদনকে বলিলেন যে, যদি ঐ বালক সংসারাশ্রমে অবস্থান করে, তবে রাজচক্রবর্ত্তী হইবে, আর যদি গৃহত্যাগী হয়, তাহা হইলে সম্যক্ সম্বোধি লাভ করিবে।

বালক সিদ্ধার্থ গুরুগৃহে গমনের পূর্ব্বেই ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠী প্রভৃতি চতুঃষষ্টি প্রকার লিপি অবগত হন এবং বিশ্বামিত্র নামক উপাধ্যায়ের নিকট নানাদেশীয় লিপি শিক্ষা করেন। তিনি যখন বর্ণমালা শিক্ষা করেন, তখনই অকার উচ্চারিত হইবামাত্র "অনিত্যাঃ সর্ব্বসংস্কারাঃ" এই বাক্য তাঁহার কর্ণমধ্যে প্রবেশ করে। অন্যান্য বর্ণশিক্ষা-কালেও তাঁহার মনে এইরূপ বৈরাগ্য জন্মিয়াছিল। সিদ্ধার্থ যাহাতে গৃহত্যাগ না করেন, তজ্জন্য তাঁহার পিতা তাঁহাকে যৌবনকালে দণ্ডপাণি শাক্যের পরমাসুন্দরী ও গুণবতী কন্যা গোপার সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করেন। বিবাহের সময় সিদ্ধার্থ বেদ, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, শিক্ষা, কল্প, সাংখ্য, যোগ, বৈশেষিক, নিগম, পুরাণ, ইতিহাস, অর্থবিদ্যা, হেতুবিদ্যা, বার্হস্পত্য ইত্যাদি শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। পিতা শুদ্ধোদনের পুত্রকে সংসারে আসক্ত রাখিবার সর্ব্বপ্রকার সতর্ক আয়োজন সত্ত্বেও কুমার সিদ্ধার্থ রথে উদ্যানভূমি বিচরণকালে জীর্ণ, বৃদ্ধ, ও মৃত ব্যক্তিসকল এবং পরিশেষে বিষয়বিরাগী কাষায় বস্ত্র পরিহিত, শান্তশীল, স্থিরচক্ষু, প্রশান্তচিত্ত সন্ন্যাসীকে দর্শন করিয়া

সংসারের অনিত্যতা সম্যক্ উপলব্ধি করিলেন এবং নিজের ও জগতের মুক্তির পথ আবিষ্কারের জন্য এক অর্দ্ধরাত্রে পুষ্যানক্ষত্রযোগে গৃহ হইতে অভিনিষ্ক্রমণ করিলেন। জীর্ণ, বৃদ্ধ ও মৃত ব্যক্তি-ত্রয়কে দর্শন করিয়া সিদ্ধার্থ বলিয়াছিলেন,

ধিগ্ যৌবনেন জরয়া সমভিদ্রুতেন
আরোগ্যেন ধিগ্ বিবিধ ব্যাধি পরাহতেন।
ধিগ্ জীবিতেন পুরুষো ন চিরস্থিতেন
ধিগ্ পণ্ডিতস্য পুরুষস্য রতিপ্রসঙ্গৈঃ॥
যদি জর ন ভবেয়া নৈব ব্যাধির্ন মৃত্যু
তথাপি চ মহদ্দুঃখং পঞ্চস্কন্ধং ধরন্তো।
কিং পুনঃ জরব্যাধি মৃত্যুনিত্যানুবদ্ধাঃ
সাধু প্রতিনিবর্ত্য চিন্তয়িষ্যে প্রমোচম্॥

অর্থাৎ যৌবনে ধিক্, কারণ জরা ইহার পশ্চাতে ধাবমান। আরোগ্যে ধিক্, যেহেতু বিবিধ ব্যাধি অবশ্যম্ভাবী। জীবনে ধিক্, কারণ লোক চিরস্থায়ী নহে। বিজ্ঞ পুরুষকে ধিক্, যে তিনি অলীক আমোদ প্রমোদে মত্ত থাকেন। যদি জরা ব্যাধি ও মৃত্যু না থাকিত, তাহা হইলেও লোকের পঞ্চ স্কন্ধ ধারণ করিয়া মহাদুঃখ ভোগ করিতে হইত। জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর নিত্য সহচর হইয়া আমাদের যে দুঃখভোগ করিতে হইবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি? অতএব আমি দুঃখ মোচনের উপায় চিন্তা করিব।

গৃহ হইতে অভিনিষ্ক্রমণের সময় সিদ্ধার্থের চিত্ত চারিপ্রকার প্রণিধানে নিমগ্ন হইয়াছিল। সংসার মহাচারকবন্ধন প্রক্ষিপ্ত লোকসমূহের বন্ধনমোচনের নিমিত্ত তাঁহার প্রথম প্রণিধান জন্মিল। সংসার মহাবিদ্যান্ধকার গহন প্রক্ষিপ্ত লোকসমূহের প্রজ্ঞাচক্ষুঃ উৎপাদন করিবার জন্য তাঁহার দ্বিতীয় প্রণিধান জন্মিল। তিনি তৃতীয় প্রণিধানে অহংকার মমকারাভিনিবিষ্ট লোকসমূহকে আর্য্যমার্গোপদেশ প্রদান করিবার উপায় চিন্তা করিলেন। চতুর্থ প্রণিধানে তাঁহার মনে উদিত হইল যে, জীব সকল ধর্ম্মাধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া ইহলোক হইতে পরলোকে ধাবমান হয় এবং পুনরায় পরলোক হইতে ইহলোকে প্রত্যাবর্ত্তন করে। এই অলাতচক্রসমারূঢ় সংসারী লোকসমূহের পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন ক্লেশ নিবারণ করিবার জন্য তিনি প্রজ্ঞাতৃপ্তিকর ধর্ম্ম প্রকাশিত করিবার মানস করিলেন।

সিদ্ধার্থ বৈশালীর উপাধ্যায় আড়ারকালাম, রাজগৃহের রুদ্রক, ব্রহ্মর্ষি রৈবত প্রভৃতির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া কিছুকাল তাঁহাদিগের উপদিষ্ট মতে ধর্ম্মশিক্ষা করেন। কিন্তু কোথায়ও তাঁহার বিশেষ তৃপ্তি হইল না। অনন্তর গয়ার নিকটবর্ত্তী নৈরঞ্জনা তীরস্থ উরুবিল্ব গ্রামে বোধিদ্রুমমূলে ষড়বর্ষব্যাপিনী তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। যোগাসনে আসীন হইয়া বলিয়াছিলেন,—

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে॥

এই আসনে আমার শরীর শুষ্কতা লাভ করুক এবং আমার ত্বক্, অস্থি ও মাংস এই স্থানে বিলীন হউক, কিন্তু দুর্লভ বুদ্ধত্ব লাভ না করিয়া আমার দেহ এই আসন হইতে বিচলিত হইবে না। বোধিসত্ত্ব তৃষ্ণা, রাগ, দ্বেষ ও মোহকে সম্পূর্ণরূপে জয় করিয়া পরমশান্তি ও চিত্তের সুপ্রসন্নতা লাভ করিলেন। তিনি নিরুপদ্রব চিত্তে ধ্যানসুখ ভোগ করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমতঃ সবিতর্ক, দ্বিতীয়তঃ অবিতর্ক, তৃতীয়তঃ নিষ্প্রীতিক এবং চতুর্থতঃ অদুঃখাসুখধ্যানে বিহার করিতে লাগিলেন। চিত্তের সৎ ও অসৎ বৃত্তিসমূহের মধ্যে সদ্বৃত্তি-সমূহই মঙ্গলদায়ক এইরূপ বিচার করিয়া তিনি সবিতর্কধ্যানে পরম আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। চিত্তের সৎ ও অসৎবৃত্তিসমূহের পরস্পর বিরোধ উপশান্ত হওয়ায় তিনি অবিতর্ক সমাধি লাভ

করিলেন। যখন প্রীতি ও অপ্রীতি এতদুভয়ের প্রতি তাঁহার উপেক্ষা জন্মিল তখন তিনি নিষ্প্রীতিক ধ্যান লাভ করিলেন। সুখ ও দুঃখ সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হওয়ায় তাঁহার চিত্ত ক্রমে সুনির্ম্মল হইল। তখন তিনি অদুঃখাসুখ ধ্যান লাভ করিলেন। তদনন্তর রাত্রির প্রথম যামে বোধিসত্ত্বের দিব্যচক্ষুঃ উৎপন্ন হইল। তিনি তত্ত্বজ্ঞানের সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন। রাত্রির মধ্যম যামে তাঁহার পূর্ব্বতন বিষয়সমূহ মনে পড়িল। রাত্রির শেষ যামে তিনি জগতের দুঃখের কারণ ভাবিতে লাগিলেন। তদনন্তর তিনি বাহ্য ও আভ্যন্তর জগতের ক্রিয়াপ্রবাহের মধ্যে কিরূপ অবিচ্ছিন্ন কার্য্যকারণভাব বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইলেন। কার্য্যকারণভাবের অখণ্ড্য নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া এই অনাদি সংসারের বাহ্য বস্তুসমূহের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ হইতেছে। আধ্যাত্মিক জগতেও কুশল ও অকুশল চিত্তবৃত্তিসমূহ অবিদ্যার বশবর্ত্তী হইয়া উৎপত্তি ও নিরোধ লাভ করিতেছে। এইরূপে অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মসমূহের বশে সমগ্র সংসার ঘটীযন্ত্রের ন্যায় অবিরত আবর্ত্তন করিতেছে। গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হইয়া দুঃখের কিরূপে উৎপত্তি ও নিরোধ হয়, এই তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া সিদ্ধার্থ বুদ্ধ বা জ্ঞানী নাম ধারণ করেন। এই দুঃখতত্ত্বের নামই বৌদ্ধদর্শনে প্রতীত্যসমুৎপাদ। বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াই গৌতম বলিয়াছিলেন, "আমি এই দেহরূপ গৃহের নির্ম্মাণকারিণী তৃষ্ণার অন্বেষণ করিতে করিতে অনেকবার পৃথিবীতে পরিভ্রমণ ও নানা জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি। হায়! পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করা কি দুঃখময়। হে গৃহ নির্ম্মাত্রি, আজ আমি তোমাকে দেখিতে পাইয়াছি। তুমি পুনরায় আর গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারিবে না। গৃহের স্তম্ভ ও উহার পার্শ্ব- দণ্ডনিচয় আমি সম্পূর্ণরূপে ভগ্ন করিয়াছি। আমার সংস্কারবিহীন চিত্ত তৃষ্ণার ক্ষয় সাধন করিয়াছে" (ধর্ম্মপদ, জরা বগ্‌গ ৮০৯)।

এক্ষণে বৌদ্ধধর্ম্মের মূলতত্ত্বটি বিস্তৃতরূপে আলোচনা করা যাক্। নির্ব্বাণ শিখরে উপনীত হইবার সোপানস্বরূপ বুদ্ধ চতুরার্য্য সত্য ও আষ্টাঙ্গিক মার্গের উপদেশ করিয়াছেন। দুঃখের স্বরূপ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের ধ্বংস, ও দুঃখ ধ্বংসের উপায়—এই চারি প্রকার সত্যকে চতুরার্য্য সত্য বলে। (১) প্রথম আর্য্যসত্য দুঃখের স্বরূপ নির্ণয়। বুদ্ধ বলেন, "হে ভিক্ষুগণ, দুঃখ সম্বন্ধে আর্য্যসত্য শ্রবণ কর। জন্ম দুঃখময়, জরা দুঃখময়, রোগ দুঃখময়, মৃত্যুও দুঃখময়। অপ্রিয় মিলনে দুঃখ, প্রিয় বিচ্ছেদেও দুঃখ, কোন ইচ্ছার অপূরণ, সেও দুঃখময়।" কাজেই জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু ইত্যাদি সমস্তই দুঃখশব্দ-বাচ্য। (২) দ্বিতীয় আর্য্যসত্যে দুঃখের উৎপত্তি হয় কিরূপে উহা উপদিষ্ট হইয়াছে। বুদ্ধ বলেন, দ্বাদশটি তত্ত্ব কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া পরিণামে দুঃখের উৎপত্তি হয়। বৌদ্ধশাস্ত্রে এই ব্যাপারের নাম প্রতীত্যসমুৎপাদ। দ্বাদশটি তত্ত্বের নাম—অবিদ্যা হইতে সংস্কার, সংস্কার হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে নামরূপ, নামরূপ হইতে ষড়ায়তন, ষড়ায়তন হইতে স্পর্শ, স্পর্শ হইতে বেদনা, বেদনা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে উপাদান, উপাদান হইতে ভব, ভব হইতে জাতি ও জাতি হইতে জরামরণ, শোক, পরিদেব, দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য, উপায়াস ইত্যাদির উৎপত্তি হয়। অবিদ্যা শব্দের অর্থ অজ্ঞান। এই অজ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব সংসারের সৃষ্টি করিয়াছি। ঘট, পট, মনুষ্য, বৃক্ষ, লতা, ইত্যাদি যে কোন বিষয়ের জ্ঞান হউক না কেন, উহা প্রকৃত প্রস্তাবে অজ্ঞান মাত্র। এই অজ্ঞান অনাদি এবং উহা কিরূপে প্রথমে উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার কোন উপায় নাই। এই অজ্ঞানসমূহ আমাদের

অভ্যন্তরে যে চিহ্ন রাখিয়া যায়, তাহাকে সংস্কার বলে। আমরা অতীতকালে যে সকল পদার্থ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, উহারা যদিও এক্ষণে আমাদের ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত নহে, তথাপি ঐ সকল পদার্থের আকৃতি ও প্রকৃতি আমাদের অভ্যন্তরে সংস্কাররূপে বিদ্যমান আছে। এই সংস্কারসমূহ হইতে বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। কাহারও মতে বিজ্ঞান ষড়্‌বিধ এবং কেহ বলেন উহা পঞ্চবিধ—দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, স্বাদ ও স্পর্শ এই পাঁচ প্রকার বিজ্ঞান সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন মনোবিজ্ঞান বা আন্তর বিজ্ঞান নামক ষষ্ঠ বিজ্ঞানও কোন কোন গ্রন্থে স্বীকৃত হইয়াছে। যদি সংস্কারসমূহ আমাদের অভ্যন্তরে বিদ্যমান না থাকিত, তাহা হইলে দর্শন শ্রবণাদি জ্ঞান উৎপন্ন হইত না। এই জ্ঞানসমূহ আবার রূপ রসাদি পঞ্চ বিষয় এবং চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ ও অন্তঃকরণ—এই ষড়ইন্দ্রিয়ের সহ দৃঢ়রূপে সংবদ্ধ। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের যে সম্বন্ধ উৎপন্ন হয়, উহাকে স্পর্শ বলে। ঐ স্পর্শই সুখ, দুঃখ ও অদুঃখাসুখ এই ত্রিবিধ বেদনার হেতু। বেদনা হইতে তৃষ্ণা জন্মে এবং তৃষ্ণা হইতে উপাদান বা কর্ম্মের উৎপত্তি (আসক্তি) হয়। শারীরিক, বাচিক, এবং মানসিক এই ত্রিবিধ কর্ম্ম হইতে ধর্ম্মাধর্ম্মের উৎপত্তি হয় এবং ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলোপভোগের নিমিত্তই জীবগণ জন্মলাভ করিয়া থাকে। জাতি শব্দের অর্থ জন্ম। জন্ম লাভ করিলেই জরা, মরণ, শোক, পরিদেব, দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য ইত্যাদি ভোগ করিতে হয়। বুদ্ধ এইরূপে দেখিতে পাইলেন, অবিদ্যা বা অজ্ঞানই আমাদের দুঃখের কারণ এবং অবিদ্যার ধ্বংসেই দুঃখের আত্যন্তিক ধ্বংস। (৩) কারণ হইতে কার্য্য উৎপন্ন হয় এবং কারণের নাশে কার্য্যের নাশ অবশ্যম্ভাবী। এই দুঃখজনক জীবনের মূল অবিদ্যা ও তৃষ্ণা। তৃষ্ণাকে দূর কর—দুঃখের সমাপ্তি হইবে। এই দুঃখ নিরোধ তৃতীয় আর্য্যসত্য। বুদ্ধ বলেন, "হে ভিক্ষুগণ! চতুর মৃগ যেমন ফাঁদ হইতে পলায়ন করিয়া ব্যাধের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে এবং দূরে পর্ব্বতগাত্রে ও বনপ্রদেশে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে, তেমনই যে ব্যক্তি শব্দাদি বিষয়ের অসারতা আলোচনা করিয়া তৃষ্ণার ফাঁদে পা না দেন, তিনিই ধন্য ও কৃতকৃতার্থ জানিবে। তিনি 'মার' ব্যাধের কবল হইতে মুক্ত হইয়া দিব্যজ্ঞানে আরূঢ় হন, পরম স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন।"

(৪) চতুর্থ আর্য্যসত্যটিতে আমরা দুঃখনিরোধের উপায় পাইয়া থাকি। সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প, সম্যক্ বাক্, সম্যক্ কর্ম্মান্ত, সম্যগাজীব, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি—দুঃখপরিহারের এই আটটি উপায়কে আর্য্যাষ্টাঙ্গিক মার্গ বলে। (ক) জগৎকে চঞ্চল, দুঃখাত্মক, অনাত্মরূপে ধারণা করিবার চেষ্টা করিলে আসক্তি দূর হওয়া স্বাভাবিক, অতএব ভবরোগ দূর করিবার প্রথম ঔষধ—এই সম্যক্ দৃষ্টি, যাহা মানুষকে তাহার লক্ষ্যের দিকে সর্ব্বদা মন রাখিতে নিযুক্ত করে। (খ) গতানুগতিক জীবনটাকে ত্যাগ করিবার ইচ্ছা, ইন্দ্রিয় ভোগ ত্যাগ করিবার সঙ্কল্পকে সম্যক্ সঙ্কল্প বলে। (গ) মিথ্যা, পরনিন্দা, কর্কশবাক্য ও অসার আলাপ পরিত্যাগের নাম সম্যক্ বাক্। (ঘ) প্রাণী হিংসা পরিত্যাগ, অচৌর্য্য ও অব্যভিচারকে সম্যক্ কর্ম্মান্ত বা আচরণ বলে। (ঙ) সৎপথে থাকিয়া জীবিকা অর্জ্জনের চেষ্টার নাম সম্যগাজীব। (চ) যে সকল অসৎগুণ চরিত্রে এখনও দেখা দেয় নাই, সেইগুলি যাহাতে ভবিষ্যতে আক্রমণ না করিতে পারে, যেগুলি ভাগ্যদোষে পূর্ব্বে অসতর্কতা নিবন্ধন আসিয়া পড়িয়াছে, সেগুলি যাহাতে চলিয়া যায়—যে সকল সৎগুণ আয়ত্ত করা হয় নাই তাহাদের অর্জ্জন এবং যে সকল সৎগুণ চরিত্রে আসিয়াছে, সেগুলির পরিরক্ষণ—এই চারিটি বিষয়ে দৃঢ় চেষ্টা করার নাম সম্যক্ ব্যায়াম। (ছ) সম্যক্ স্মৃতির অর্থ সম্যক্-ধ্যান-।

বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির অষ্টম সপ্তাহে বুদ্ধদেব বারাণসী যাত্রা করিয়া মৃগদাব নামক ঋষিপত্তনে (বর্ত্তমান সারনাথে) অবস্থিত তাঁহার পূর্ব্বতন পাঁচ সঙ্গী কৌণ্ডিন্য, ভদ্রজিৎ, বপ্প, মহানাম ও অশ্বজিৎএর নিকট প্রথম এই চতুরার্য্যসত্য ও আর্য্যাষ্টাঙ্গিক মার্গ ব্যাখ্যা করিলেন। এই পঞ্চ শিষ্য বৌদ্ধশাস্ত্রে "ভদ্রবর্গীয় পঞ্চক" নামে অভিহিত। তথাগত পঞ্চশিষ্যকে বলিলেন, "প্রব্রজিতগণ প্রায়শঃ দুইটি পদ্ধতি অবলম্বন করেন। কেহ কেহ হীন, গ্রাম্য ও সাধারণলোকের ন্যায় সর্ব্বদা কামসুখে রত থাকেন। তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান বা ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিরোধের প্রয়াস করেন না। অপর শ্রেণীর প্রব্রজিতগণ সতত নিজকে নিপীড়িত করেন। যাহাতে নিজের কষ্ট হয় এরূপ কার্য্যেই তাঁহারা সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকেন। এই উভয় পদ্ধতিই হেয় ও আর্য্যজন-বিগর্হিত"। এই উভয় অন্ত ত্যাগ করিয়া তথাগত মধ্যম পথ অবলম্বন পূর্ব্বক ধর্ম্মের উপদেশ দেন। পূর্ব্ব-ব্যাখ্যাত আর্য্যাষ্টাঙ্গিক মার্গকেই মধ্যম পথ বলে।

বৌদ্ধ সাধনা দুঃখনিবৃত্তির সাধনা। সমস্ত বাসনা ও তৃষ্ণার নিরসন হইলে, দুঃখের নিবৃত্তি হইলে, পরিণামে নির্ব্বাণের বিমল আনন্দসম্ভোগ। বুদ্ধ যে ধর্ম্মের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তত্ত্বের দিক দিয়া উহার মধ্যে তিনি কোন মৌলিকত্বই দাবী করিতে পারেন না। সূত্রপিটকে তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন, "আমি একটি প্রাচীন পথ আবিষ্কার করিয়াছি। পুরাকালের মহাজ্ঞানিগণ এই পথেই যাতায়াত করিতেন। এই পথে বিহার করিয়া আমি জন্মমৃত্যুর রহস্য বুঝিয়াছি। আমি যাহা বুঝিয়াছি, তাহাই ভিক্ষুদের এবং শ্রাবকদের নিকট প্রচার করিয়াছি।" কাজেই তত্ত্বের দিক দিয়া দেখিতে গেলে বুদ্ধদেব কপিল, পতঞ্জলি প্রভৃতি পূর্ব্বগ দার্শনিকগণের পন্থাই অনুসরণ করিয়াছেন। তথাপি তিনি যাহা বলিয়াছেন এবং যে ভাবে বলিয়াছেন তাহা অপূর্ব্ব। পণ্ডিত মোক্ষমূলর ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তনসূত্রের ভূমিকায় বলিয়াছেন—"Never in the history of the world had a scheme of salvation been put-forth so simple in its nature, so free from any superhuman agency" অর্থাৎ পৃথিবীর ইতিহাসে আর কেহ মুক্তির বাণী এমন সরলভাবে, এমন অতিপ্রাকৃত ব্যক্তিত্ব বর্জ্জন করিয়া বিবৃত করেন নাই। অনেকে তাঁহাকে বেদবিরোধী ও নাস্তিক বলিয়া থাকেন। তিনি দর্শন ও ঈশ্বর সম্বন্ধীয় নানাবিধ মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে চাহিতেন না, ঐ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞেয়বাদী ছিলেন। অনেকে অনেক সময় তাঁহাকে ঈশ্বর আছেন কিনা জিজ্ঞাসা করিতেন, তিনি উত্তর দিতেন, "ও সব বিষয়ে আমি কিছু জানি না। ঈশ্বর আছেন, ইহা কি আমি বলিয়াছি? ঈশ্বর নাই, ইহা কি আমি বলিয়াছি?" একবার তাঁহার নিকট পাঁচজন ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহাকে তাঁহাদের তর্কের মীমাংসা করিয়া দিতে বলিলেন। একজন বলিলেন, "ভগবন্, আমার শাস্ত্রে ঈশ্বরের স্বরূপ ও তাঁহাকে লাভ করিবার উপায় সম্বন্ধে এই কথা আছে"। অপর ব্যক্তি বলিলেন, "না, না, ওকথা ভুল। কারণ আমার শাস্ত্রে ঈশ্বরের স্বরূপ ও তৎপ্রাপ্তির সাধন অন্য প্রকার বলিয়াছে"। এইরূপে অপরেও ঈশ্বরের স্বরূপ ও তৎপ্রাপ্তির উপায় সম্বন্ধে নিজ নিজ অভিমত ও শাস্ত্রের দোহাই দিয়া বিভিন্ন অভিপ্রায়সমূহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ভগবান্ বুদ্ধ প্রত্যেকের কথা বেশ মনোযোগের সহিত শুনিয়া প্রত্যেককে এক এক করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, আপনাদের কাহারও শাস্ত্রে কি একথা বলে যে, ঈশ্বর ক্রোধী, হিংসাপরায়ণ বা অপবিত্র?" ব্রাহ্মণেরা সকলেই একবাক্যে বলিলেন, "না ভগবন্! সকল শাস্ত্রই বলে, ঈশ্বর শুদ্ধ ও

শিব-স্বরূপ"। ভগবান্ বুদ্ধ তখন বলিলেন, "বন্ধুগণ, তবে আপনারা কেন প্রথমে শুদ্ধ ও সাধুস্বভাব হইবার চেষ্টা করেন না, যাহাতে আপনারা ঈশ্বর কি বস্তু জানিতে পারেন ?"

হিন্দুগণ বুদ্ধদেবকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। জয়দেব দশাবতার স্তোত্রে বুদ্ধাবতার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয়হৃদয়দর্শিত পশুঘাতম্
কেশব ধৃত বুদ্ধশরীর
জয় জগদীশ হরে ॥

"হে কেশব, তুমি বুদ্ধশরীর ধারণপূর্ব্বক দয়াদ্রচিত্তে পশুহিংসার অপকারিতা প্রদর্শন করিয়া যজ্ঞবিষয়ক মন্ত্রসমূহের নিন্দা করিয়াছ। হে জগদীশ হরি, তোমার জয় হউক।" ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ বুদ্ধদেব সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "বুদ্ধ নাস্তিক কেন ? নাস্তিক নয়, মুখে বল্‌তে পারেন নাই। বুদ্ধ কি জান ? বোধস্বরূপকে চিন্তা ক'রে ক'রে,—তাই হওয়া,—বোধস্বরূপ হওয়া। বুদ্ধ ভগবানেরই খেলা,—নূতন একটী লীলা। নাস্তিক কেন হ'তে যাবে। *যেখানে স্বরূপকে বোধ হয়, সেখানে অস্তি নাস্তির মধ্যের অবস্থা।*" আচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "বুদ্ধদেব তপস্যার পর কি পেলেন, তা' মুখে বল্‌তে পারেন নাই। তাই ব'লে সকলে বলে, নাস্তিক। যা'রা সংসারী, ইন্দ্রিয়ের বিষয় নিয়ে থাকে, তা'রা বলেছে, সব 'অস্তি'; আবার মায়াবাদীরা বলছে,—'নাস্তি'; বুদ্ধের অবস্থা এই 'অস্তি' 'নাস্তি'র পরে।" (শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, ৩য় ভাগ, ২৮৭ পৃষ্ঠা)।

অনেকের পক্ষে একজন ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতে পারিলে সাধনপথ খুব সহজ হইয়া থাকে। কিন্তু বুদ্ধের জীবনী আলোচনায় স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, যদি কোন ব্যক্তি আদৌ ঈশ্বরে বিশ্বাসী না হয়, তাহার যদি কোনরূপ দার্শনিক মতে বিশ্বাস না থাকে, যদি সে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত না হয়, অথবা কোন মন্দিরাদিতে গমন না করে। এমন কি প্রকাশ্যে নাস্তিক বা জড়বাদীও হয়, তথাপি সে সেই চরমাবস্থা লাভে *সমর্থ হয়। হইতে পারে বুদ্ধ ঈশ্বরে বিশ্বাস* করিতেন না—তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। কিন্তু অপরে ভক্তি, যোগ বা জ্ঞানের দ্বারা যে পূর্ণ অবস্থা লাভ করে বুদ্ধও তাহা নিষ্কামকর্ম্মসাধন করিয়া লাভ করিয়াছিলেন। কর্ম্ম নিষ্কামভাবে করিতে পারিলেই তাহার বলে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। গীতোক্ত সাম্যবাণীর জীবন্ত উদাহরণ-স্বরূপে উহার এক বিন্দুও যাহাতে কার্য্যে পরিণত *হয়, তজ্জন্য সেই গীতোপদেষ্টা স্বয়ং* ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধরূপে আবার মর্ত্ত্যধামে আবির্ভূত হইলেন। বুদ্ধদেব নিজকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া কখনও ঘোষণা করিয়া যান নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, "কেহই তোমাকে মুক্ত হইবার সাহায্য করিতে পারে না—আপনার সাহায্য আপনি কর—নিজ চেষ্টা দ্বারা নিজ মুক্তি সাধনের চেষ্টা কর।" নিজের সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন, "বুদ্ধ শব্দের অর্থ আকাশের *ন্যায় অনন্তজ্ঞানসম্পন্ন। আমি গৌতম, সেই অবস্থা* লাভ করিয়াছি—তোমরাও যদি উহার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা কর, তোমরাও উহা লাভ করিতে পারিবে।"

বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণ লাভের প্রসঙ্গ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ কীর্ত্তন করিয়া প্রবন্ধটির উপসংহার করিব। ভগবান্ বুদ্ধের কাশ্যপ, আনন্দ, সারিপুত্র, মৌদ্গল্যায়ন, অনিরুদ্ধ, সুভূতি, পূর্ণ, কাত্যায়ন, উপালি ও রাহুল এই দশজন প্রধান শিষ্য ছিলেন। ইঁহারাই তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধে তাঁহাকে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব শিষ্যগণ সমভি-ব্যাহারে বহুস্থানে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া অনন্তর পাবা নামক স্থানে গমন করিয়া চুন্দ নামক কর্ম্মকারের আম্রবনে বিহার করেন। চুন্দ বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া অভিবাদনপূর্ব্বক নিবেদন করিল,

"হে ভগবন্! ভিক্ষুসঙ্ঘসহ আপনি কল্য আমার গৃহে ভোজন করিবেন।" বুদ্ধ তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিয়া চুন্দের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। চুন্দ গৃহে গমন করিয়া বিবিধ প্রকার খাদ্য ও প্রভূত শূকর মাংস প্রস্তুত করিল। পরদিন বুদ্ধ চুন্দের আলয়ে গমন করিয়া তাহাকে বলিলেন, "হে চুন্দ! তুমি এই শূকরমাংস আমাকে পরিবেশন কর, কিন্তু ভিক্ষুসঙ্ঘকে উহা প্রদান করিও না, মনুষ্যলোক, দেবলোক ও ব্রহ্মলোকে বুদ্ধ ভিন্ন এমন কেহ নাই, যিনি এই শূকর মাংস ভক্ষণ করিয়া জীর্ণ করিতে পারেন। হে চুন্দ! আমাকে পরিবেশন করিবার পর যে শূকর মাংস অবশিষ্ট থাকিবে, উহা গর্ত্তমধ্যে নিক্ষেপ কর।" তাঁহার বাক্যানুসারে চুন্দ অবশিষ্ট মাংস গর্ত্তে নিক্ষেপ করিল। চুন্দের গৃহে ভোজনের অব্যবহিত পরেই তথাগতের রক্তামাশয় জন্মে। তিনি সেই অবস্থায়ই কুশী নগরাভিমুখে গমন করেন। পথে ককুৎথা নদীতে স্নান ও উহার জল পান করিয়া চুন্দের আম্রবনে আবাস গ্রহণ করেন। চুন্দ একখানি বস্ত্র চতুরাবৃত্ত করিয়া বুদ্ধের শয্যা প্রস্তুত করে। তথাগত ঐ শয্যায় শয়ন করিয়া কিয়ৎকাল বিশ্রাম করেন। অনন্তর তিনি তাঁহার প্রধান সেবক আনন্দকে একান্তে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "আনন্দ! চুন্দের মনে যদি কোন প্রকার পরিতাপ উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি উহার বিনোদন করিও। তুমি তাহাকে বলিও, সে বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘকে ভোজন করাইয়া যে সৎকর্ম্ম সঞ্চয় করিয়াছে, তদ্দ্বারা তাহার স্বর্গলাভ হইবে। চুন্দের পক্ষে ইহা পরমলাভ যে, তথাগত তাহার গৃহে শেষ আহার গ্রহণ করিলেন। যে খাদ্য খাইয়া বুদ্ধ সম্বোধি লাভ করিয়াছিলেন ও যে খাদ্য খাইয়া তিনি পরিনির্ব্বাণ লাভ করিলেন, উভয় খাদ্যই মহাফলদায়ক।" অনন্তর তথাগত হিরণ্যবতী নদী পার হইয়া কুশীনগরের উপবর্ত্তনে শালবনে উপস্থিত হন। সেখানে উত্তরশীর্ষ হইয়া একটি মঞ্চের উপর শয়ন করেন। অনন্তর প্রিয়তম শিষ্য আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে আনন্দ, আমার পরিনির্ব্বাণের পর আমার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মই তোমাদিগের পরিচালক হইবে। অতঃপর বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুগণ নব্য ভিক্ষুগণকে নাম বা গোত্র উচ্চারণপূর্ব্বক আহ্বান করিবেন, অথবা 'হে বন্ধো' এই ভাবে সম্বোধন করিবেন। নবীন ভিক্ষুগণ প্রাচীন ভিক্ষুগণকে 'মাননীয় বা পূজনীয়' বলিয়া অভ্যর্থনা করিবেন।" অনন্তর বুদ্ধ ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে ভিক্ষুগণ! সংযোগোৎপন্ন পদার্থমাত্রেরই ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী, আপনারা সাবধান হইয়া স্ব স্ব কার্য্য করিবেন তথাগতের এই শেষ বাক্য।" অনন্তর বুদ্ধদেব প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ ধ্যানে ক্রমে বিহার করিতে লাগিলেন। তদনন্তর আকাশানন্ত্যায়তন, বিজ্ঞানানন্ত্যায়তন, আকিঞ্চন্যায়তন, নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন ও সংজ্ঞাবেদয়িতনিরোধ এই সকল যোগে বিহার করিলেন। আকাশ অসীম, জ্ঞান অনন্ত, জগৎ অকিঞ্চন, সংজ্ঞা ও অসংজ্ঞা উভয়ই অলীক; এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় উভয়ের লয় হওয়ায় বুদ্ধ পরিনির্ব্বাণ লাভ করিলেন। তদনন্তর তাঁহার দেহ অগ্নিসাৎ করা হইল। দেহ ভস্মীভূত হইলে পর ভিক্ষুগণ উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "দেবরাজ, নাগরাজ ও নররাজ এবং শ্রেষ্ঠ মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক পূজিত বুদ্ধকে কৃতাঞ্জলিপুটে বন্দনা কর। শত শত কল্পেও বুদ্ধের জন্ম দুর্লভ।"

অদ্ভুতানন্দ-জীবন-কথা

স্বামী সিদ্ধানন্দ

সরল ও শান্তপ্রকৃতি বালক লাটুকে শ্রীরামকৃষ্ণ অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তাঁহার ভক্তদেব সকলেই ছিলেন শিক্ষিত, কিন্তু লাটু ছিলেন একেবাবে নিরক্ষর। লাটুকে লেখাপড়া শিখাইবাব জন্য একদিন তিনি একখানা বর্ণপবিচয় আনাইযাছিলেন এবং স্বয়ং তাঁহাকে পড়াইতে বসিয়াছিলেন। লাটুর ভাগ্য দেখিয়া উপস্থিত ভক্তেবা সকলেই অবাক্ হইলেন। কিন্তু লাটুব লেখাপড়া বেশীদূব অগ্রসব হইল না। তাঁহাব মোটা জিহ্বা কিছুতেই 'ক' অক্ষব উচ্চাবণ কবিতে পারিল না, যতবারই তিনি 'ক' বলিতে চেষ্টা করিলেন, ততবাবই 'কা' হইয়া যাইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া শ্রীবামকৃষ্ণ সহাস্যে বলিয়াছিলেন, "যা, তোব আব লেখা পড়া হবে না। তুই ক'কে যদি কা বলবি, তবে কা'কে কি বলবি বে?"

লাটুকে বর্ণবোধ কবাইবাব প্রয়াস তখন হইতে তিনি একেবারে পবিত্যাগ করিলেন এবং আধ্যাত্মিক মার্গে উন্নীত করিবাব জন্য তাঁহাকে সাধন-প্রণালীব মধ্য দিয়া পবিচালিত করিতে বিশেষ যত্নবান হইলেন।

দুর্লভ মানসিক সম্পদেব অধিকাব লইয়া লাটু সংসারে আসিয়াছিলেন। তাঁহাব প্রতি শ্রীবামকৃষ্ণের অহেতুক ভালবাসা ও করুণা এই অল্প বয়সেই তিনি সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম কবিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। জপধ্যান কবিতে আদিষ্ট হইলেও তিনি তাই শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা ও উপদেশামৃত পানে বিভোর হইয়া থাকিতে ভালবাসিতেন। কাশীপুব বাগানে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তিম অসুখের সময় তাঁহাব যুবক ভক্তগণ প্রাণপণে সেবা করিতেছিলেন। কি করিয়া তাঁহাদের দ্বাবা মলমূত্র পবিষ্কাব কবাইবেন, এই ভাবিয়া ঠাকুব সত্যই চিন্তিত হইয়াছিলেন। একদিন তিনি লাটুকে বলিলেন, "লাটু, তুই আমার মলমূত্র পবিষ্কাব কববি?"

লাটু সানন্দে উত্তব করিলেন, "আমি তো আপনাব মেস্তব আছি। হুকুম হলেই পরিষ্কাব কবব।"

স্নেহেব সন্তান ছাড়া অপব কাহাকেও মলমূত্র পবিষ্কাব কবিবাব আদেশ কবা যায় না। এই সময় লাটু আহাব নিদ্রা পবিত্যাগ কবিয়া সমস্ত মনপ্রাণ ঢালিয়া গুরুদেবেব সেবা কবিতেন। সেবাই তাঁহাব ধ্যান জ্ঞান ছিল।

লাটু কীর্ত্তন বড ভালবাসিতেন। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুবেব ঘবে প্রাযই কীর্ত্তন হইত। লাটু ও অন্যান্য ভক্তেবা তাহাতে যোগদান কবিয়া মহানন্দে নৃত্যগীত কবিতেন। কীর্ত্তনে ভক্তদেব অনুবাগ দেখিযা শ্রীবামকৃষ্ণ একদিন জগন্মাতাব নিকট প্রার্থনা কবিয়াছিলেন, "মা, এদের একটু ভাব টাব হোক।"

কিছুদিন পবেই লাটু ও অপব কাহাবও কাহারও 'ভাব' হইতে লাগিল। খোকা মহারাজ (স্বামী সুবোধানন্দ) তখন দক্ষিণেশ্বরে সবেমাত্র যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছেন, সেই সময় একদিন সন্ধ্যার পর ঠাকুবেব ঘবে কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। ভাবাবেশে শ্রীরামকৃষ্ণ নৃত্য করিতে লাগিলেন, সেই নৃত্যে ভক্তেরাও আনন্দে যোগদান কবিলেন। দেখিতে দেখিতে আনন্দময়ীর ছেলেদেব মধ্যে কেহ কেহ হাসিতে, কেহ কাঁদিতে, কেহ উদ্দাম নৃত্য কবিতে

লাগিলেন, কেহ কেহ বা ভাবাবেশে অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন।

এইভাবে কিছুকাল অতিবাহিত হইবার পর শ্রীরামকৃষ্ণ কাহারও বক্ষঃস্থল কাহারও করতল স্পর্শ করিতে লাগিলেন। তাহাতে ভক্তদের সকলেরই ভাবের উপশম হইতে লাগিল। খোকা মহারাজ তখন ভাবের কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ভক্তদের সকলের কাণ্ড দেখিয়া তিনি অবাক্ হইয়া গেলেন।

ভক্তেরা একে একে চলিয়া যাইবার পরও খোকা মহারাজ যাইতেছেন না দেখিয়া ঠাকুর তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, "তুমি এখনও রইলে যে ?"

উত্তরে খোকা মহারাজ বলিলেন, "আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করবার জন্য রয়েছি। এই যে আপনার সামনে আজ ভক্তদের ভাব হতে দেখা গেল, এদের মধ্যে সকলেরই কি ঠিক ঠিক ভাব হয়েছিল ?"

খোকা মহারাজের মুখে এই প্রশ্ন শুনিয়া ঠাকুর সমাধিমগ্ন হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পর অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায় মধুর হাস্যপূর্ণ মুখে বলিতে লাগিলেন, "একমাত্র লেটোরই আজ ঠিক ঠিক ভাব হয়েছিল, আর সবার অল্প সল্প।"

ঠাকুর যখন কাশীপুর বাগানে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় লাটু কখন কখন ভাবের ঘোরে নাচিয়া বেড়াইতেন, আবার যখন ধ্যানে বসিতেন, মাঝে মাঝে ভাব-সমাধিতে মগ্ন হইয়া যাইতেন। দক্ষিণেশ্বরে অথবা ভক্তদের বাড়ীতে কীর্ত্তনাদির সময় ঠাকুরের যখন ভাব সমাধি হইত, তখন সেই অবস্থায় খুব শুদ্ধসত্ত্ব অন্তরঙ্গ ছাড়া অপর কেহ তাঁহাকে স্পর্শ করিলে তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না, চীৎকার করিয়া উঠিতেন। কিন্তু ঐরূপ অবস্থায় লাটুর স্পর্শ তিনি সহ্য করিতে পারিতেন। ইহাতেই বুঝা যায়, লাটুর আধার কত উচ্চ ও পবিত্র ছিল।

লাটু মহারাজ নির্জ্জন স্থান বড় ভালবাসিতেন। নির্জ্জন স্থান পাইলে তিনি আহার নিদ্রা ভুলিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এরূপ অবস্থায়ও তিনি নিয়মিত-ভাবে ঠাকুরের সেবা যথারীতি সম্পন্ন করিতেন। কাশীপুর বাগানে ঠাকুর তাঁহার ত্যাগী যুবক শিষ্যগণকে পবিত্র গেরুয়া বস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। গৈরিক প্রাপ্ত পরম সৌভাগ্যবান্ যুবকগণের মধ্যে লাটু মহারাজ অন্যতম।

গুরুদেবের প্রতি লাটু মহারাজের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল অসাধারণ। কোনরূপ তর্ক বিচার না করিয়া গুরুদেবের সর্ব্বপ্রকার আদেশ পালন করিবার জন্য তিনি অনুক্ষণ প্রস্তুত থাকিতেন। লাটু মহারাজ বলিতেন, "একদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর আমায় মা-কালীর মন্দিরে গিয়ে ধ্যান করতে বললেন। তাঁর আদেশে মন্দিরে গিয়ে ধ্যানে বসবার আগেই আমার মনে এরূপ ভাবনা হতে লাগল, মা-কালী যদি আমায় কৃপা করে বর দিতে চান, আমি মূর্খ, কি চাইতে কি তখন চেয়ে বসব। আমার কিসে কল্যাণ হবে, তা তো আমি জানি নে। যিনি সতত আমার মঙ্গল চিন্তা করছেন, সেই মঙ্গলময় ঠাকুর আমার হয়ে যা বলে দেবেন, তাঁর মুখ থেকে যা বেরুবে, তাই হবে। তা ছাড়া আমার নিজের কোন কামনা নেই। ঠাকুরের যা ইচ্ছা তাই পূর্ণ হোক।

"এরূপে মনের ভাব মার চরণে জানিয়ে আমি গভীর ধ্যানে ডুবে গেলাম। কামনাই মনের চাঞ্চল্যের কারণ। আমার মনে কোন কামনা ছিল না বলেই আমি গভীর ধ্যানে ডুবে যেতে পেরেছিলাম।"

গুরুদেবের প্রতি তাঁহার কিরূপ নির্ভরতা ছিল এই ঘটনা হইতেই তাহা পরিষ্কার বুঝা যায়। ঠাকুরের অহেতুক ভালবাসার কথায় একদিন তিনি বলিয়াছিলেন, "দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে

থাকিবার সময় দুপুর বেলা মাঝে মাঝে শিবমন্দিরে বসে আমি ধ্যান করতাম। একদিন অনেকক্ষণ ধ্যানের পর যখন বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল, তখন আমার বোধ হল যেন কোথা হতে আমার মাথার উপর দিয়ে বাতাস বইছে। চারদিক বন্ধ, বাইরে থেকে হাওয়া আসবার পথ নেই। তখন পেছনে চেয়ে দেখি ঠাকুর আমার মাথায় পাখা দিয়ে বাতাস করছেন। ঠাকুরের কাণ্ড দেখে আমি একেবারে শিউরে উঠলাম, বললাম, 'আপনি এ কি করছেন? কোথায় আমি আপনার সেবা করব, তা না হয়ে আপনিই আমাকে বাতাস করছেন।'

"ঠাকুর স্নেহমাখা স্বরে বললেন, 'এ দারুণ গরমে দরজা বন্ধ করে ধ্যান করছিস, তোর কষ্ট হচ্ছে, তাই আমি একটু বাতাস করছিলাম।' তাঁর এই অহৈতুকী কৃপা দেখে আমি একেবারে অবাক হয়ে গেলাম। আমার মাথা তার চরণে আপনি লুটিয়ে পড়ল।"

পুত্রাধিক স্নেহে লাটু মহারাজের উপর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা-পবন সদাই বহিয়া যাইত। লাটুও তাহার জীবন-তরীখানিতে আত্মসমর্পণের পাল তুলিয়া দিয়া ধীরে ধীরে সেই আনন্দসাগরের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন।

একদিন কথায় কথায় লাটু মহারাজ বলিয়াছিলেন, "দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর একবার রাখালকে (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) ও আমাকে বললেন, ভিক্ষান্ন অতি শুদ্ধ, তোমরা আজ ভিক্ষা করে কিছু নিয়ে এস।

"আদেশ পেয়ে আমরা দুজনে ভিক্ষা করতে বের হলাম। রাখালের হৃষ্টপুষ্ট দেহ দেখে কোন লোক তাকে ভিক্ষা দিলে না, বরং উলটে তাকে দুকথা শুনিয়ে দিলে। রাখাল দক্ষিণেশ্বরে ফিরে গেল। আমি অনেক জায়গা ঘুরে প্রচুর ভিক্ষা যোগাড় করলাম। সকলের শেষে যে বাড়ীতে গিয়ে ভিক্ষা চেয়েছি, আমার অল্প বয়স দেখে বাড়ীর গিন্নীর মনে কি হল, তিনি আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, কেন আমি ভিক্ষা করছি। আমি তখন সব বললাম। আমার কথা শুনে গিন্নীর মনে কি ভাব হল, তিনি সূর্যের দিকে তাকিয়ে যোড়হাতে প্রার্থনা করলেন, হে ব্রহ্মণ্যদেব, এ বালক অল্প বয়সে গুরুর আদেশে যে উদ্দেশ্য নিয়ে ভিক্ষায় বেরিয়েছে, তুমি তার সেই অভীষ্ট পূর্ণ করো।

"সন্তুষ্ট মনে গিন্নী আমাকে ভিক্ষা দিয়ে বিদায় দিলেন। আমার ভিক্ষার ঝুলিটি পূর্ণ দেখে ঠাকুর খুসী হয়ে বললেন, হাঁরে, তোকে কেউ কিছু বলে নি তো? রাখাল তো শুধু হাতেই ফিরেছে।

"আমি মেয়েটির সব কথা ঠাকুরকে বললাম। শুনে ঠাকুর বললেন, সে ঠিকই বলেছে, আমি তার প্রার্থনা জানতে পেরেছি, কারণ সূর্যের সঙ্গে আমার যোগ আছে।

"সেই ভিক্ষান্ন তৈরী হলে ঠাকুর আহ্লাদ করে তা গ্রহণ করলেন, আমরাও সকলে প্রসাদ পেলুম। ঠাকুরের অহংভাব আদপেই ছিল না। তিনি তো বললেন না যে আমিই সূর্য।"

একদিন ভক্তবীর গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় গাড়ী করিয়া দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট গিয়াছেন। গিরিশ বাবু সেইদিন অতিরিক্ত মদ্যপান করিয়া সম্পূর্ণরূপে অপ্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া ঠাকুর লাটু মহারাজকে বলিলেন, "ওরে লেটো, মাতাল হয়ে এসেছে। দেখ্, গাড়ীতে কিছু ফেলে এল কি না। গাড়ীতে যদি কিছু থাকে, নিয়ে আয়।"

লাটু মহারাজ গাড়ীর নিকটে গিয়া দেখিলেন, গাড়ীর মধ্যে মদের বোতল রহিয়াছে। মদের বোতল স্পর্শ করিতে তাঁহার ঘৃণা বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু গাড়ীতে কিছু থাকিলে লইয়া যাইবার জন্য ঠাকুর আদেশ করিয়াছেন। মহাসমস্যায় পড়িয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন, কি করা

যায়। অন্তরের সংস্কার তাঁহাকে আবদ্ধ করিতে পারিল না, গুরুভক্তি জয়লাভ করিল। কালবিলম্ব না করিয়া তিনি গাড়ী হইতে মদের বোতলটি গ্রহণ করিলেন এবং সঙ্কুচিতভাবে ঠাকুরের ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুরের ঘরে তখন অনেক ভক্ত বসিয়াছিলেন। পরম নিষ্ঠাবান্ লাটুর হাতে মদের বোতল দেখিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিলেন। ইহাতে লাটু মহারাজও একটু লজ্জিত হইলেন।

এই ব্যাপার লইয়া গিরিশবাবু উত্তরকালে মাঝে মাঝে আমোদ করিতেন। তিনি লাটু মহারাজকে ঠাট্টা করিয়া বলিতেন, "জানিস, একদিন আমার মদের বোতল বয়ে এনেছিলি।"

লাটু মহারাজ এই রহস্য বুঝিতে পারিতেন। হাসিতে হাসিতে তিনি উত্তর করিতেন, "তোমারই ভাগ্য বলবান্, তাই তোমার মান বাড়াতে ঠাকুর আমাকে দিয়ে তোমার মদের বোতল বইয়েছিলেন।"

সদ্গুরুর কৃপাতেই জীবনে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় এবং ভগবদ্ আনন্দ লাভ হইয়া থাকে, এই মহান্ সত্য লাটু মহারাজের জীবনে সার্থক হইয়াছিল। সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য তাই তিনি তত্ত্বপিপাসু ভক্তগণকে সর্ব্বদাই উৎসাহ দিতেন। তাঁহার অন্তরে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা বা গোঁড়ামির লেশমাত্র ছিল না। সকল ধর্ম্মমতের মধ্যেই সত্যবস্তু আছে, ইহা তিনি সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সকল ধর্ম্মকেই তিনি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন, কাহাকেও অমর্য্যাদা করিতেন না। তিনি একদিকে যেমন হিন্দুদের পাল পার্ব্বণ মানিয়া চলিতেন, অপরদিকে তেমনি মুসলমানদের পর্ব্বোপলক্ষে পূজা পাঠাইতেন এবং বড়দিনের সময় খ্রীষ্টের জন্মোৎসব করিয়া ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করিতেন।

কোন ব্যক্তি কোনদিন সামান্য কিছু উপকার করিলে লাটু মহারাজ তাহা কৃতজ্ঞহৃদয়ে চিরদিন স্মরণ রাখিতেন। রামচন্দ্র দত্ত মহাশয় পিতৃমাতৃহীন নিরাশ্রয় লাটুকে তাঁহার বাড়ীতে আশ্রয় দিয়াছিলেন এবং সেখান হইতেই তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট গমন করিতে সমর্থ হন। এইজন্য লাটু মহারাজ সারাজীবন রামবাবুর গুণগান করিতেন। রামবাবুর বাড়ীতে থাকিবার সময় তিনি সর্ব্বপ্রথম ভক্ত নিত্যগোপালের (জ্ঞানানন্দ অবধূত) সঙ্গ ও সেবা করিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলেন। এই কথার উল্লেখ করিয়া তিনি বলিতেন, "যাঁর নিকট থেকে একটুও জ্ঞানের *আলো পাওয়া যায়, তিনিই যথার্থ সুহৃদ, তাঁর* দয়া কখনও ভোলা যায় না।"

লাটু মহারাজের অলৌকিক জীবনে তাঁহার অদ্ভুতানন্দ নাম সার্থক হইয়াছিল।

স্বামীজির দেশাত্মবোধ

শ্রীকলিঙ্গনাথ ঘোষ, এম-এ

ভারতে দরিদ্রনারায়ণ-সেবার অগ্নিমন্ত্রদাতা বিশ্ববিজয়ী বীরসন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের বিশাল হৃদয়বত্তার কথা ভাব্‌লে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে অসীম শ্রদ্ধায় স্বতঃই নতশির হ'তে হয়। তাঁর দেশাত্মবোধ এত তীব্র ও গভীর ছিল যে, যে ধর্ম্ম বা যে ঈশ্বর বিধবার অশ্রুমোচন করতে পারে না অথবা বুভুক্ষুর মুখে এক টুকরা রুটি দিতে পারে না, সে ধর্ম্মে বা সে ঈশ্বরে তিনি বিশ্বাস করতেন না। মার্কিনমুল্লুকে ধর্ম্মপ্রচারক স্বামী বিবেকানন্দকে একবার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, "স্বামীজি আপনার ধর্ম্ম কি ?" উত্তরে তিনি যে অদ্ভুত জবাব দিয়েছিলেন তা' ভাব্‌লে বিস্ময়ে অবাক্ হতে হয়। তিনি যা বলেছিলেন, তার সার মর্ম্ম এই, বিবেকানন্দের কোনো ধর্ম্ম নাই, যতদিন পর্য্যন্ত ভারতের একটি কুকুর, একটি বিড়াল পর্য্যন্ত অনাহারে থাক্‌বে ততদিন বিবেকানন্দের কোনো ধর্ম্ম নাই। এই প্রসঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী বিপিন-চন্দ্রের জীবনের একটা ঘটনা মনে হল। তাঁর আত্মচরিতে পড়েছি, ধর্ম্ম সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জনের উদ্দেশ্যে তিনি বিলাত ও মার্কিন দেশে গিয়েছিলেন। আমেরিকায় অবস্থান কালে বিপিনচন্দ্রকে মার্কিন দেশের জনৈক ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করেছিলেন, একথা কি সত্য যে ভারতবর্ষের জগৎকে ধর্ম্মবিষয়ে শিক্ষা দিবার অনেককিছু আছে কিন্তু যখন আপনারা রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করে দুনিয়ার সাম্‌নে সোজা হ'য়ে দাঁড়াতে পারবেন তখনই আমরা আপনাদের মুখে ধর্ম্মকথা শুন্‌ব। আপনারা আগে স্বাধীনতা অর্জ্জন করুন, আপনারা স্বাধীনতা না পেলে, আপনাদের কথা আমরা কিছুতেই শুনব না। শোনা যায়, একথা নাকি স্বদেশপ্রেমিক বিপিন চন্দ্রের হৃদয়ের অন্তঃস্তল স্পর্শ করেছিল। মার্কিন ভদ্রলোকের এই উপদেশের ইঙ্গিত স্বামী বিবেকানন্দও হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। স্বাধীন দেশে, স্বাধীন জাতির মধ্যে ধর্ম্মকথা আলোচনা করতে গিয়ে, তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেছিলেন যে, গোলামের জাতির কোনো ধর্ম্ম নাই—থাকতে পারে না। একথা তাঁর মর্ম্ম স্পর্শ করেছিল, প্রতিপদে তিনি অনুভব করতেন, পরাধীন পরপদানত হিন্দু জাতির তিনি প্রতিনিধি, দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ ভারতমাতার সন্তান বলে আত্মপরিচয় দিতে তিনি অশেষ গ্লানি ও অপরিসীম লজ্জা অনুভব করতেন। শুধু কি তাই, মার্কিনমুল্লুকের অপার বিলাস ঐশ্বর্য্যের মধ্যে রাজারহালে অবস্থান করেও স্বামীজি পরাধীন নিরক্ষর দরিদ্র ভারতের কথা দুঃস্থ নিঃস্ব অসহায় ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠ কোটি কোটি মূঢ় মূক ভারত-বাসীর কথা তিনি এক মুহূর্ত্তের তরেও বিস্মৃত হ'ন নাই। বরং আমেরিকায় অবস্থান কালে স্বদেশের মর্ম্মন্তুদ দারিদ্র্য ও দাসত্বের ব্যথা স্বামীজি এমন গভীর ভাবে অনুভব করতেন যে, রাত্রে দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যায় শুয়ে শান্তিতে নিদ্রাসুখ উপভোগ করতে পারেন নাই। লক্ষ লক্ষ দরিদ্র স্বদেশবাসীর দারুণ দুরবস্থার কথা স্মরণ করে' তিনি মর্ম্মান্তিক বেদনায় অস্থির হ'য়ে উঠতেন, সুকোমল পরিপাটি শয্যা ত্যাগ করে' কঠিন ভূমিতলে শয়ন করতেন; কখনও বা হৃদয়-বেদনায় ও মানসিক যন্ত্রণায় বিনিদ্র রজনী যাপন করতেন।

বিবেকানন্দ সাহিত্য—বিশেষতঃ স্বামীজির "পত্রাবলী", "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য", "ভাববার কথা", "ভারতে বিবেকানন্দ" প্রভৃতি যাঁরা একটু অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করেছেন, তাঁরা সকলেই কর্ম্মযোগী বীরসন্ন্যাসীর অমোঘ শক্তিমন্ত্রে ধর্ম্মভাবে ও স্বদেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। স্বামীজির লেখার প্রতি ছত্রে তাঁর অপরিসীম প্রাণস্পর্শী দেশাত্মবোধ অতি সুস্পষ্ট। খাঁটি জলন্ত স্বদেশপ্রেম পরিস্ফুট তাঁর প্রত্যেক চিঠিপত্রে ও বক্তৃতায়। একটু মনোযোগ দিয়ে পড়লেই উপলব্ধি হ'বে স্বামীজি স্বীয় জন্মভূমিকে কিরূপ প্রাণদিয়ে ভালবাসতেন, যেন স্বদেশের স্বাধীনতা-যজ্ঞে দধীচির মত বিরাট আত্মাহুতিই ছিল তাঁর সমস্ত কর্ম্ম-প্রচেষ্টার মূলে। ভারতের প্রতি ধূলিকণাটি পর্য্যন্ত তাঁকে কি অপূর্ব্ব ভাবে আকর্ষণ করত। কি আপনভোলা অপরিমেয় ছিল তাঁর দেশপ্রাণতা—দেশাত্মবোধ। তিনি মনে প্রাণে খাঁটি স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন। কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হ'য়ে তিনি সদর্পে ডেকে বলে গেছেন—তিনি ভারতবাসী, ভারতবাসী তাঁর ভাই, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী তাঁর ভাই। ভারতবাসী শুধু তাঁর ভাই ছিল না, ভারতবাসী ছিল তাঁর প্রাণ। ভারতের কল্যাণ ছিল তাঁর কল্যাণ, ভারতের মৃত্তিকা ছিল তাঁর স্বর্গ, তাঁর যৌবনের উপবন, তাঁর বার্দ্ধক্যের বারাণসী। অনেক ধর্ম্ম-প্রচারকের জীবন চরিত পড়েছি কত সাধু-সন্ন্যাসীর বাণী শুনেছি, কিন্তু এমন জলন্ত স্বদেশপ্রেমদ্যোতক ধর্ম্মবাণী কোথাও শুনি নাই।

আচার্য্য বিবেকানন্দের প্রাণ ছিল অতীব মহান্। তাই দেশের পরাধীনতার গ্লানি লাঞ্ছনা গঞ্জনা-দারিদ্র্য-দুঃখ-দুর্দ্দশা তাঁর বিশাল হৃদয়ে গভীর মর্ম্মপীড়া উৎপাদন করত। বিবেকানন্দ ছিলেন স্বাধীনতার একজন শ্রেষ্ঠ উপাসক। পরাধীনের মুক্তি তিনি চাইতেন মনে প্রাণে—একথা বললে সত্যের বিন্দুমাত্র অপলাপ করা হবে না।

আমরা সামান্য একটা সূঁচ গড়তে পারি না। অথচ ইংরেজের নিন্দা করি, এই বলে' স্বামীজি আমাদের তীব্র ভর্ৎসনা করেছেন। তিনি সর্ব্বদা চাইতেন, প্রতিপদে আমাদের পরমুখাপেক্ষিতা দূর করতে—পরাধীনতার নাগপাশ হ'তে মুক্ত করতে। রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করতে হ'লে 'আবেদন নিবেদনের থালা' হাতে করে কিছুই হবে না, স্বাবলম্বনের দ্বারাই আমাদের স্বরাজ লাভ করতে হ'বে—এই ছিল স্বামীজির মূলমন্ত্র। কথায় ও কাজে তিনি এই অভয় মন্ত্র প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন। স্বদেশের স্বাধীনতাই ছিল স্বামীজির মন্ত্র।

কিসে আমরা যথার্থই একজাতি একদেহ একমন একপ্রাণ হ'তে পারব, হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ জৈন খৃষ্টিয়ান সকলে পরধর্ম্মমতসহিষ্ণু হ'য়ে কিভাবে একযোগে এককাট্টা হয়ে দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করে দাসত্ব-দুঃখ ঘুচায়ে দেশমাতৃকার মলিন মুখ উজ্জ্বল করতে পারব—এই ছিল স্বামীজির লক্ষ্য। তাঁর আপ্রাণ চেষ্টা ছিল—কি করে ভারতে দরিদ্রের উপর অত্যাচার বন্ধ করা যায়। কি করে কোটি কোটি অস্পৃশ্য মুচি মেথর হাড়ি ডোম মুদ্দফরাস বুভুক্ষু নরনারীকে মনুষ্যত্বের অধিকারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা যায়। তাই স্বামীজির ভারতব্যাপী দরিদ্র-নারায়ণ সেবার বিরাট আয়োজন। তাই তিনি সর্ব্বদাই বলতেন—দরিদ্র অজ্ঞ পদদলিত আর্ত্ত দুর্ব্বল এরাই তোমার উপাস্য হউক। স্বামীজি ছিলেন সর্ব্বত্যাগী উমানাথ শঙ্করের মূর্ত্ত-অবতার। তিনি দুঃস্থ দরিদ্র কাঙ্গাল অনাথদের জন্য অশ্রুবিসর্জ্জন করতেন, আর বন্ধু বান্ধবদের সমক্ষে বলতেন, এদের এত কষ্ট যে, ঈশ্বরকে চিন্তা করবার পর্য্যন্ত অবসর নেই।

স্বামীজি চেয়েছিলেন উপেক্ষিত জাতি হতে নূতন ভারত সৃষ্টি করতে। আবার নূতন ভারত বেরুক, কৃষকের কুটির—দরিদ্রের পর্ণকুটির থেকে—ভুনিওয়ালার উননের পাশ থেকে, আবার নূতন

ভারত বেরুক, ঝোপঝাড় জঙ্গল থেকে। আর আমরা—তথাকথিত উচ্চ জাতের লোকেরা ত হাজার বছরের মমি—আমরা অচিরে শূন্যে লোপ পেয়ে যাব। গণদেবতার জাগরণ হ'লে আবার কৃষক-শ্রমিক-মজুরের সমবেত শক্তিতে নূতন ভারত গড়ে উঠবে—এই ত ছিল তাঁর জীবনের কাম্য। স্বামীজির স্বপ্ন সফল হবেই হবে, আজ না হউক, দশবছর পরে হবে। দেশের হাওয়া ত ঐ দিকেই বইছে। আজ যুগসন্ধিক্ষণে এই শুভলক্ষণ ত শুধু স্বামীজির জয়ই ঘোষণা করছে দিকে দিকে। তাঁর ভবিষ্যৎবাণী যেন এতদিনে সফলতার পথে অগ্রসর হচ্ছে।

স্বামীজির নিকট ত হিন্দু-মুসলমান ভেদ ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন ভারতবর্ষে কি হিন্দু কি মুসলমান প্রত্যেক মানুষ অপর মানুষকে ভাইএর মত দেখুক। তিনি ভারতবাসীকে সেইস্থানে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন– যেখানে বেদও নাই, বাইবেলও নাই, কোরানও নাই—আছে শুধু মনুষ্যত্বের অধিকার। স্বামীজি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেছিলেন যে, আমাদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু এবং মুসলমান ধর্ম্মরূপ—এই দুই মহান্ মতবাদের সমন্বয়ই একমাত্র ভরসা। তিনি দুঃখবাদী ছিলেন না, তিনি ছিলেন মঙ্গলবাদী, তিনি বুকভরা আশা পোষণ করতেন। তিনি দিব্যচক্ষে দেখেছিলেন—বৈদান্তিক মস্তিষ্ক এবং ইসলামীয় দেহ লয়ে ভবিষ্যৎ ভারত গৌরবমণ্ডিত হয়ে উঠবে। স্বামীজির নিজের কথায়—"I see in my mind's eye, the future perfect India, rising out of this chaos and strife, glorious and invincible, with Vedantic brain and Islamic body"

স্বামীজির হিন্দু মুসলমানের মিলনের স্বপ্ন—দিব্য দৃষ্টিবলে তিনি হিন্দু-মুসলমান সমস্যার যে সমাধান কল্পনা করেছিলেন, জানি না কতকালে তা কার্য্যে পরিণত হবে—কবে দেশে এই সৌভাগ্যের উদয় হবে। ইসলামীয় দেহ এবং বৈদান্তিক মস্তিষ্ক এই দ্বিবিধ ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে ঐ মহান্ আদর্শের বিকাশ সাধন করে' ভারতবাসী কল্যাণের পথে অগ্রসর হবে।

আমাদের জাতের "পোড়া হিংসেটা" গেল না দেখে স্বামীজি নিরন্তর ব্যথিত হ'য়েছেন। আমাদের খালি পরচর্চ্চা পরনিন্দা আর পরশ্রীকাতরতা, হাম-বড়াভাব, আর কেহ বড় হবে না। কৌলিন্যের দম্ভ, আভিজাত্যের অহঙ্কার, পৌরোহিত্যের অত্যাচার তথাকথিত নীচ পতিত জাতির উপর উচ্চজাতির অমানবিক ব্যবহারের বিরুদ্ধে তিনি কত কথাই না বলেছেন। ধর্ম্মের নামে দুর্ব্বিসহ যথেচ্ছাচার স্বচক্ষে দেখে যে-ধর্ম্ম গরীবের দুঃখ দূর করে না, মানুষকে দেবতা করে না, শুধু বিধিনিষেধের ভারে মানুষকে দাবিয়েই রাখে, এরূপ অসার ধর্ম্মে স্বামীজি কখনও আস্থা স্থাপন করতে পারেন নাই। তিনি ত স্পষ্টই বলে গেছেন,, যে-দেশে কোটি কোটি মানুষ সম্বৎসর মহুয়ার ফুল খেয়ে কাল কাটায়, আর দশবিশ লাখ সাধু-মহাত্মা আর কয়েক ক্রোড় ব্রাহ্মণ গরীবদের রক্ত চুষে খায়, আর তাদের উন্নতির কোনও চেষ্টা করে না, সে কি দেশ, না নরক! সে ধর্ম্ম, না পৈশাচনৃত্য।

আমাদের অধোগতি, দেশের দারুণ দুরবস্থা, বিশেষতঃ ভারতবাসীর দারিদ্র্য আর অজ্ঞতা দেখে স্বামীজির মর্ম্মবেদনার সীমা ছিল না। কুমারিকায় ভারতবর্ষের শেষ পাথরটুকরার উপর বসে স্বামীজি ভেবেছিলেন, এই যে আমরা এতজন সন্ন্যাসী আছি, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, লোককে Metaphysics শিক্ষা দিচ্ছি, এসব পাগলামি। খালি পেটে ধর্ম্ম হয় না। ঐ যে গরীবগুলো পশুর মত জীবন যাপন করছে, তার কারণ মূর্খতা। আমরা আজ চার যুগ ধরে ওদের রক্ত চুষে খেয়েছি, আর দু'পা দিয়ে দলেছি।

স্বামীজি বলেছেন, ভাবতে যে আজ এত

অবিচার অনাচার অত্যাচার, আমাদের যে এত দুঃখদুর্দ্দশা, এত দৈন্য-লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, চক্ষের উপরে শত অপমান আর দেশব্যাপী অনাটন অনশন দুর্ভিক্ষ মহামারীর তাণ্ডব নৃত্য, তার প্রথম ও প্রধান কারণ আমরা আমাদের জাতীয় সত্তা, নিজেদের individuality হারিয়ে ফেলেছি। এর প্রতিকার করতে হ'লে চাই সমাজ-বিপ্লব, কণ্ঠে কণ্ঠে বিদ্রোহ ঘোষণা, আর ঐ তথাকথিত নীচ অধঃপতিত পদদলিত জাতি, যারা যুগ যুগ ধরে মনুষ্যত্বের অধিকারে বঞ্চিত আছে, তাদের স্বাধিকার প্রমত্ত করে তুলতে হ'বে, দিতে হবে সকলকে সমাজে রাষ্ট্রে মনুষ্যত্বলাভের সমান সুযোগ। স্বামীজি চক্ষের উপর নিত্য দেখেছেন, আমরা আমাদের অজ্ঞ ভাইদের, মূর্খ দরিদ্র অস্পৃশ্য পতিত দেশবাসীকে শুধু দু'পায়ে দলেছি, শত শত বৎসর অত্যাচার-নিষ্পেষণ করে তাদের পশুত্বের স্তরে নামিয়ে দিয়েছি। আমাদের মত কূপ-মণ্ডূক দুনিয়ায় আর নাই, আমরা যেন অতীত হীন, ভবিষ্যৎ হীন, আমাদের ভরসা কি? আমরা একটু স্বার্থত্যাগ করে এককাট্টা হয়ে কোন কাজ করতে পারি না, Jealousy আমাদের National Sin। আমরা পারি কেবল ভূরি ভূরি বাক্য রচনা করতে। আমাদের স্বার্থান্ধ মতিগতি স্বার্থসর্ব্বস্ব বুদ্ধি, তাই আমাদের সমাজে রাষ্ট্রে ভেদ, মিলনের মূলসূত্র আমাদের নজরে পড়ে না—তাই আমাদের কোন সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। দেশাত্মবোধের মূর্ত্ত অবতার স্বামী বিবেকানন্দ উদাত্তস্বরে আহ্বান করেছিলেন, দেশ-প্রেমের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত আত্মত্যাগী জগদ্ধিতায় উৎসৃষ্ট প্রাণ যুবকবৃন্দকে এর প্রতিকার করতে। স্বামীজি নিজেও সমস্ত জীবন ধরে ঐ পতিত নীচ জাতিদের জাগাবার, টেনে তুলবার, গরীব মূর্খ পদদলিতদের চোখ খুলবার, তাদের মূঢ় মৌন মূক মুখে ভাষা দিবার চেষ্টা করেছেন। ব্যথিত আর্ত্তপীড়িতের সেবা, অসহায় রোগীর ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা গরীবদের খাওয়ান, উপবাসক্লিষ্ট বুভুক্ষু নরনারীর ক্ষুধার জ্বালা নিবারণকল্পে আসমুদ্র হিমাচল "দরিদ্র-নারায়ণ" সেবার মাহাত্ম্য তিনি বজ্রনির্ঘোষে প্রচার করে গিয়েছেন।

মুখবন্ধে আমি অভিযোগ উপস্থিত করেছি, নব্য বঙ্গের তরুণ তরুণীরা স্বামী বিবেকানন্দকে শুধু ধর্ম্ম-প্রচারক বলেই জানেন। আমাদের যুবক যুবতীরা বিবেকানন্দ গ্রন্থাবলী আজ আর তেমন অভিনিবেশ সহকারে গভীর ভাবে পাঠ করেন না, তাই আজ দেশের তরুণ সম্প্রদায়কে বিশেষ করে ছাত্র-সমাজকে স্বামীজির দেশাত্মবোধ সম্বন্ধে যৎসামান্য বলতে অগ্রসর হ'য়েছি। স্বামী বিবেকানন্দের বহুমুখী প্রতিভা ও নানা কার্য্য সম্বন্ধে বিস্তারিত জানবার প্রবৃত্তি বা ঔৎসুক্য যদি একটি প্রাণের ভিতরও জাগে, তবে এই শ্রম সার্থক মনে করব।

স্বামী বিবেকানন্দ শুধু ধর্ম্মপ্রচারক ছিলেন না, তিনি ছিলেন দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের অবিসম্বাদী নেতা। বিবেকানন্দ-সাহিত্য পাঠ করলে দেখতে পাবেন, স্বামীজি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেছিলেন গোলামের জাতির, কাপুরুষদের কোনো ধর্ম্ম নাই, থাকতেও পারে না। ভগবান্ কাপুরুষদের প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন না। তাই মুক্তির ধর্ম্মই স্বামীজির জীবনের কাম্য ছিল। তিনি চেয়ে ছিলেন, সমাজে রাষ্ট্রে সর্ব্বত্র স্বাধীনতার ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করতে। যতদিন আমরা এই স্বাধীনতা লাভে বঞ্চিত থাকব, ততদিন ভারতের ধর্ম্মের প্রকৃত উন্নতি হবে না। পুণ্যভূমি ভারতের জগৎকে ধর্ম্মবিষয়ে শিক্ষা দিবার অনেক কিছু আছে, কিন্তু এই গোলামের জাতির ধর্ম্ম স্বাধীন জাতি ব্যাপকভাবে গ্রহণ করবে না। স্বাধীন জাতি পরাধীন জাতির ধর্ম্মমত একটু অবজ্ঞার চক্ষেই দেখে থাকে। একথা স্বামীজির মর্ম্মস্থল স্পর্শ করেছিল, তাই সুপ্রসিদ্ধ চিকাগো বক্তৃতার পর স্বদেশে প্রত্যাগমন করে' স্বামী বিবেকানন্দ ঘোষণা করেছিলেন—

আগামী পঞ্চাশ বৎসরকাল আর কোনো দেবতাকে আমরা মনের কোণে স্থান দিব না। একমাত্র দেবতা এখন জাগ্রত। সেই জাগ্রত ভগবান্ হচ্ছেন আমাদের স্বজাতি। সর্ব্বত্র তাঁর হস্ত, সর্ব্বত্র তাঁর চরণ, সর্ব্বত্র তাঁর শ্রবণ, সকল কিছুকে ব্যাপ্ত করে বিদ্যমান শুধু তিনি। আর সব দেবতা এখন নিদ্রিত। বিরাট্‌রূপে যে ভগবান্‌কে আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছি আমাদের চতুর্দ্দিকে, তাঁকে পূজা না করে আর যে দেবতাদের আমরা অনুসরণ করব, তাঁদের কোন মূল্য নেই। এই যে জীবগুলি আমাদের চারদিকে বর্ত্তমান, এরাই আমাদের ভগবান্ এবং সকলের আগে যে ভগবান্‌কে আমরা পূজা করব—তিনি হচ্ছেন আমাদের দেশবাসী।

ধর্ম্মগুরু স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশ-প্রেম ছিল জ্বলন্ত, দেশাত্মবোধ ছিল সদাজাগ্রত। বর্ত্তমান ভারতের নবজাগরণের অগ্রদূত স্বামী বিবেকানন্দের অপরিমেয় দেশাত্মবোধের অপূর্ব্ব অনুপ্রেরণায় আজ মরণোন্মুখ জাতি নূতন প্রাণ লাভ করুক। স্বামীজি আমাদিগকে মৃতের পূজা হতে জীবন্তের পূজাতে আহ্বান করেছেন, গতানুশোচনা হতে বর্ত্তমান প্রযত্নে আহ্বান করেছেন, লুপ্ত পন্থার পুনরুদ্ধারে বৃথা শক্তিক্ষয় হতে সদ্যোনির্ম্মিত বিশাল ও সন্নিকট পথে আহ্বান করেছেন। আমাদের মুক্তি এই পথে।

এস, মানুষ হও, নিজেদের সঙ্কীর্ণ গর্ত্ত থেকে বেরিয়ে এসে বাইরে গিয়ে দেখ, সব জাতি কেমন উন্নতির পথে চলেছে। তোমরা কি মানুষকে ভালবাস? তোমরা কি দেশকে ভালবাস? তা হ'লে এস, আমরা ভাল হবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করি, পেছনে চেয়ো না,—সাম্‌নে এগিয়ে যাও। পশ্চাতে ফিরিও না, কেবল সাম্‌নে এগিয়ে যাও—ভগবানের মহিমা ঘোষিত হউক, আমরা সিদ্ধিলাভ করবই করব। তুচ্ছ জীবন, তুচ্ছ মরণ, অগ্রসর হও—পশ্চাতে চাহিও না, কে পড়ল দেখ্‌তে যেয়ো না, এগিয়ে যাও—সম্মুখে, সম্মুখে, এই ছিল স্বামীজির শেষ কথা।

লীলাময়

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

তুমি সুন্দর, কত সুন্দর—
কে আঁকিবে তব ছবি?
রচি' জয় গান, করিবে প্রণাম
কে আছে জগতে কবি?
নিতি চঞ্চল উচ্ছল স্রোতে,
জীবনের ধারা আসে কোথা হ'তে
কার জ্যোতি লয়ে মহাকাশ পথে
ভেসে আসে কোটি রবি,
মৌন-দেবতা সে সকল কথা
তুমি তো জানহে সবই?

পদে পদে ভুল, আর্ত্ত আকুল
জাগিছে মানব মনে,
হেরিয়া সৃষ্টি, বিভল দৃষ্টি
জীবন সংহরণে,
অসীম ছলনা ভুবন ব্যাপিয়া
মহাতমসায় রেখেছ ঢাকিয়া
তাই ভীরু হিয়া উঠিছে কাঁপিয়া
প্রকৃতি বিবর্ত্তনে,
নব নব প্রাণ করে অভিযান
নিত্য জীবন-রণে।

তুমি হে ভীষণ কত যে ভীষণ,
এ ধারণা কা'র আছে ?
অজ্ঞাত ভয়ে শঙ্কিত হয়ে
বাম আঁখি সদা নাচে ;
তব উন্মাদ নৃত্যের তালে
হুতাশন নদ বহে জটাজালে,
দহন-যাতনা দেয় দেশকালে
বিশ্ব করুণা যাচে,
উদয় অস্ত ভয়ে তটস্থ,
ভুল ত্রুটি হয় পাছে।

কত সংগ্রাম চলে অবিরাম
মানুষে মানুষে নিতি,
চলে ভেদাভেদ হর্ষ ও খেদ,
নির্ভয় আর ভীতি,
ধনীর প্রাসাদে হেরিয়া বিত্ত,
পথে পথে কাঁদে ভিখারী চিত্ত,
গড়িতে ভৃত্য চলেছে নিত্য
প্রভুদের কূটনীতি,
তব দুই জায়া করে কত মায়া
মর্ত্ত্যে অদিতি-দিতি।

তুমি বীভৎস কত বীভৎস
ভাবিতে পারে না কেহ,
গলিত কুষ্ঠে সবল সুস্থে
কুৎসিত কর দেহ,
পচা পোকা পড়া গন্ধ মড়ার,
যন্ত্রণাময় দুর্ব্বহ ভার,
ব্যাধি দিয়ে কর কঙ্কাল সার
কি ভীষণ অমুলেহ ?
আর্ত্ত ধরার উঠে হাহাকার,
নাই নাই তব স্নেহ ?

তুমি দুর্জ্জয় কত দুর্জ্জয়
তোমার দোসর নাহি,
অসীম বিশ্ব বড় যে নিঃস্ব
ভয়ে করে ত্রাহি ত্রাহি,
সৃজন সিন্ধু তব পদতলে—
আছাড়িয়া পড়ে গর্জ্জন রোলে,
বাধা করেছ কী বিপুল বলে—
নীরব নয়নে চাহি।
ব্রহ্মা ইন্দ্র দেবতাবৃন্দ
চলে তব পথ বাহি।

তবু তারি মাঝে যে রাগিণী বাজে
মানব চিত্ত তলে
কত ঝঙ্কার তুলি অনিবার
বাজিছে সুকৌশলে,
বাসনারে তুমি করেছ বৃহৎ
দেখাতেছ পথ দেখাও বিপথ
সারথীর বেশে জীবনের রথ
চালাতেছ ধরাতলে
তুমি প্রেমময় কত প্রেমময়
তাই ভাবি আঁখি জলে।

রসবিচার—মধুররস

শ্রীকানাইলাল পাল, এম্-এ, বি-এল্

শ্রুতি হইতেও জীবতত্ত্বের শক্তিত্ব স্থাপন হয়। বেদান্তের—১।১।৬ "গৌণশ্চেন্নাত্মশব্দাৎ" সূত্রের ব্যাখ্যায় শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, "অনেন জীবেনাত্মনানু প্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবানীতি", এই জীবরূপে আপন স্বরূপে অনুপ্রবেশপূর্ব্বক নাম ও রূপ ব্যক্ত করিব। পুনশ্চ —"জীবোহি নাম চেতনঃ শরীরাধ্যক্ষঃ প্রাণানাং ধারয়িতা তৎপ্রসিদ্ধেনির্ব্বচনাচ্চ", জীব—চেতন নামক পদার্থ শরীরের অধ্যক্ষ পঞ্চ প্রাণের ধারয়িতা, জীব শব্দ ঐ অর্থে প্রসিদ্ধ। এই কথার সহিত শ্রীগীতার ৭ম অধ্যায়ের "যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ", জীব নামক পরাশক্তির সুন্দর ঐক্য রহিয়াছে। শ্রুতি হইতে আরও পাই "এতস্যৈবানন্দস্য অন্যানি ভূতানি মাত্রামুপ জীবন্তি"—সমস্ত প্রাণী সেই আনন্দস্বরূপ পরম পদার্থের এক কণা লাভে জীবিত আছে। "কো হ্যেবান্যাৎ কো প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশঃ আনন্দো ন স্যাৎ" (শ্রুতি), কেই বা প্রাণধারণ করিত যদি এই অনন্ত স্বরূপে আনন্দ না থাকিত। সুতরাং বুঝা গেল প্রাণী মাত্রই তাঁর সেই আনন্দের কণা লাভে জীবিত। সেই রসময় পরমপুরুষের ("রসো বৈ সঃ") আনন্দ শক্তিই জীবসমূহকে রক্ষা করিতেছে, সুতরাং জীবকে বাঁচিতে হইলে সেই রসময়ের হ্লাদিনী শক্তির একত্রে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। জীবশক্তি শ্রীভগবানের পরাশক্তি—সেই শক্তিই ব্যষ্টি জীবরূপে প্রকট হইয়াছে। যে শক্তি জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, সেটা ক্ষুদ্র জীবের শক্তি নহে, কারণ জগৎ সৃষ্টি স্থিতি অর্থাৎ ধারণের শক্তি জীবের নাই, সে কথা "জগদ্ব্যাপার বর্জ্জম্" বেদান্ত সূত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। জীব যে পরাশক্তির অংশ তাহা "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতন" গীতার ১৫।৮ শ্লোকে স্পষ্টভাবেই উক্ত হইয়াছে। পরমতত্ত্ব অখণ্ড, সুতরাং আমার অংশ বলিতে ভগবানের শক্তিকেই বুঝিতে হইবে, বিশেষতঃ যখন গীতায় জীবকে শক্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া ১।১।৬ বেদান্তসূত্র হইতেও তাহাই প্রতিপন্ন হয়, এই জীব শক্তি বলেই নামরূপে সেই অনন্ত ব্রহ্ম প্রকাশ পাইয়াছেন—অর্থাৎ সেই অনন্ত শান্ত হইয়াছেন। অখণ্ড বস্তুর একদেশ গ্রহণকেও অংশ বলা যাইতে পারে। এই হিসাবে যে শক্তিবলে সেই পরম অখণ্ড তত্ত্ব আপনার একদেশকে ব্যক্ত করেন, তাহাই তার জীবশক্তি, এবং নামরূপধারী ব্যষ্টি জীব সেই শক্তির এক একটী প্রকাশ মাত্র। এই শক্তির মূলে কিন্তু হ্লাদিনী শক্তি। কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন, সেই হ্লাদিনী শক্তির এক এক কণা লাভে ভূতসকল জীবিত আছে। এই শক্তির আবার স্থূলবিকাশ—অপরা শক্তি বা জড়রূপে অভিব্যক্ত গীতায় ৭ম অধ্যায়ে ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম মন বুদ্ধি অহঙ্কার অষ্টধা প্রকৃতি। সেই শক্তিমান্ যেমন শক্তি ছাড়া থাকেন না, শক্তিও তেমনি সদা সর্ব্বদা শক্তিমান্কে আশ্রয় করিয়া আছেন। শক্তি শক্তিমানের ভেদ, পুরুষ প্রকৃতির প্রভেদ বা পার্থক্য থাকিলেও একটীর সহিত অপরের আশ্রয় আশ্রিত নিত্যসম্বন্ধ। এই শক্তির বিকাশের তারতম্য লইয়া লীলার তারতম্য। অথবা সেই লীলা অনুভূতির তারতম্য লইয়া শক্তির

বিকাশের তারতম্য। সেই আনন্দময় আনন্দলীলা করিতেছেন—নিজ আনন্দ আস্বাদন করিতেছেন। যিনি সেই পরাশক্তির হ্লাদিনী শক্তির পরিচয় পাইয়াছেন, তিনি প্রেমনেত্রে দেখিতেছেন—সর্ব্বত্রই সেই হ্লাদিনী শক্তির বিকাশ—সবই প্রেমের খেলা। যিনি জ্ঞানচক্ষু পাইযাছেন, তিনি দেখিতেছেন সবই চিদ্বিলাস। যার জড় চক্ষু, তিনি সবই জড়ীয় দেখিতেছেন। ক্ষুদ্রতাই যত দুঃখ উপস্থিত করে। "নাল্পে সুখম্" "ভূমৈব সুখম্" (শ্রুতি)। সুতরাং দুঃখ দূর করিতে হইলে সেই ভূমাপুরুষকে তাঁর হ্লাদিনী নাম্নী পরাশক্তির সহিত তাঁকে পাইতে হইবে। মানুষ ত সুখই চায়, আনন্দকেই চায়, সুতরাং হ্লাদিনী স্বরূপিণী শ্রীরাধাঠাকুরাণীর আশ্রয় ব্যতীত সুখ বা আনন্দ পাইবে কোথায়? স্ত্রী পুত্র ধন জনে মানুষ সুখ অন্বেষণ করে, কিন্তু প্রতি স্থানেই কি একটা অতৃপ্তি বা নৈরাশ্য লইয়া ফিরিয়া আসে না? তাহারা ত সুখ দিতে পারে না, শুধু তাহাই নয়, যদি কাহারও ভাগ্যে তাদের দ্বার ক্ষণিক সুখ উপস্থিত হয় তাহারা ত একে একে চলিয়া যায়। যাহা নশ্বর ক্ষণস্থায়ী তাহাতে জীবের আনন্দ কিরূপে মিলিবে? শ্রুতিও তাই বলিয়াছেন, সেই রসস্বরূপকে লাভ করিয়া জীব সুখী বা আনন্দিত হয়। তবে সেই অনন্ত রস-স্বরূপের হ্লাদিনী শক্তির মূর্ত্তি শ্রীরাধারাণীতে যে আনন্দপূর্ণ মাত্রায় বর্ত্তমান, তারই ছায়া প্রাকৃত জগতে দেখা যায়—জগৎটাও যে পরমতত্ত্বের ছায়া-স্বরূপ। ছায়া দেখিয়া কেহ ধরিতে গেলে ছায়াকে ধরিতে পারে না। সেই ছায়ার আশ্রয়ের যখন সংবাদ বা সন্ধান জীব পায়, তখনই সে আনন্দলাভ করিবার যোগ্য হয়। স্ত্রী পুত্রকে আমার স্ত্রী পুত্র ভাবিলে প্রকৃত আনন্দ মিলিবে না। প্রতি জীবে—সুতরাং প্রতি স্ত্রী পুত্রেও সেই পরমতত্ত্ব বিরাজমান, তাঁর সত্তায় তাদের সত্তা, তাঁর জ্ঞানে তাদের জ্ঞান, তাঁর আনন্দে তাদের আনন্দ—এইটী বুঝিলে সেখানে আনন্দ মিলিবে। তিনিই বহুরূপে বিরাজমান, শুধু তাই নয়, তিনি মধুর সম্বন্ধ লইয়া বিরাজমান এইটী না বুঝিলে মধুররসের আস্বাদন অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

অনেকেই জানেন, মধুর রসের সাধনে সাধককে যুগল মিলন অর্থাৎ রসময় শ্রীগোবিন্দের সহিত রসবতী হ্লাদিনী মূর্ত্তি শ্রীরাধাঠাকুরাণীর মিলন ব্যাপারে সতত উদ্যোগী থাকিতে হয়, এবং যুগলসেবায় আপনাকে নিযোজিত করিতে হয়। এই যুগলমিলন ও যুগলসেবারও দুইটী দিক আছে, একটা অন্তশ্চিন্তিত নিজ স্বরূপ দেহ অর্থাৎ চিন্ময় নিজ স্বরূপ ভাবনায় যুগলের মিলন-সাধন ও সেবা এবং অন্যটী বহির্জ্জগতে প্রতি জীবের সহিত তার হ্লাদিনী শক্তির সংযোগ অর্থাৎ প্রতি জীবকেই সুখী করা—প্রীতি প্রেম প্রণয়াদি দিয়া সেবা করিয়া। জীব যখন সেই পরমতত্ত্বের অংশ সদৃশ, তখন জীবেও চিৎকণা আনন্দকণা আছে; এবং তার স্বরূপের সহিত হ্লাদিনী বা আনন্দদায়িনী শক্তি-কণার সংযোগ—সেই অখণ্ড অনন্ত রসস্বরূপের সহিত অপরিসীম হ্লাদিনী শক্তির সংযোগের একটী আংশিক ব্যাপার বলিলেও চলে। এই বিশ্বজগৎটা যখন তাঁর আংশিক প্রকাশ মাত্র—"একাংশেন স্থিতং জগৎ" (গীতা), তখন প্রতি জীবে প্রেম প্রীতি প্রণয় দ্বারা তাঁর আনন্দবিধানও সেই যুগলমিলনের আংশিক সাধন হইবে না কেন? কিন্তু বিশ্বজগৎ তাঁর একপাদ-বিভূতি, সুতরাং বিশ্বপ্রেমেও তাঁকে পূর্ণমাত্রায় প্রেম করা হইবে না। অপরকে আনন্দ দিলে যে সুখ পাওয়া যায়, নিজে শুধু ক্ষুদ্র আনন্দ ভোগ করিয়া কেহ সে সুখ পায় না। শাস্ত্রে বলে, সুখ কোথায়? না সুখের অনুসন্ধানে "সুখং দুঃখ-সুখাত্যয়ঃ" (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৯।৪১), তাই দেখি গোপিকাগণের নিজ সুখেচ্ছা বিন্দুমাত্র নাই, তাঁরা যুগলের সুখসম্পাদনে যে সুখ লাভ করেন,

তাহা নিজ সুখের ভোগ হইতে কোটীগুণ অধিক। দুঃখ কার?—অভাব যার—"দুঃখং কামসুখাপেক্ষা" (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৯।৪১)। যিনি আনন্দস্বরূপিণী হ্লাদিনীকে আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁর আবার অভাব কোথায়? তাঁর কাম্যই বা আর কি থাকিতে পারে? শুধু তাই নয়, যদি আবার তিনি জানিতে পারেন, তিনি স্বরূপতঃ সেই হ্লাদিনী স্বরূপিনীর স্বজাতীয়া—যদি তিনি নিজের ক্ষুদ্রতা ভুলিয়া যায়, তবে আর তাঁর দুঃখের সম্ভাবনা কোথায়? শাস্ত্র তাই উপদেশ করেন—তুমি চিন্ময়ী, তোমার কান্ত সেই রসময় পুরুষ, তুমি সেই হ্লাদিনী মূর্ত্তির আশ্রিত। এই রসে অসমোদ্ধ সৌন্দর্য্য লীলা ও বৈদগ্ধ্যের আধার শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্ব এবং শ্রীরাধা ও প্রেয়সীবর্গ আশ্রয় আলম্বন।

নবজলধর ময়ূরপুচ্ছ মুরলীধ্বনি প্রভৃতি এই রসকে উদ্দীপ্ত করে। স্তম্ভ স্বেদ রোমাঞ্চ স্বরভেদ বৈবর্ণ অশ্রু প্রলয় বেপথু এই রসে অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব। আলস্য ও উগ্রতা ভিন্ন নির্ব্বেদ বিষাদ দৈন্য গ্লানি শ্রম মদ গর্ব্ব শঙ্কা ত্রাস আবেগ উন্মাদ অপস্মার ব্যাধি মোহ মৃতি জড়তা ব্রীড়া অবহিত্থা স্মৃতি বিতর্ক চিন্তা মতি ধৃতি হর্ষ ঔৎসুক্য অমর্ষ চাপল্য অসূয়া নিদ্রা সুপ্তি ও বোধ ব্যাভিচারী ভাবগুলি এই রসে সঞ্চরণ করে।

ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণা ও পরমাবিষ্টতা এই রাগের লক্ষণ। শুধু অনুরাগময় ভাব লইয়া রাগমার্গে ভজন বিহিত হয়। শ্রীভগবানের মাধুর্য্য শ্রবণ করিয়া বা কিঞ্চিৎ অনুভব করিয়া লোভের প্রেরণায় বিধি বা যুক্তিকে অপেক্ষা না করিয়া রাগমার্গে ভাগ্যবান্ জীব প্রবৃত্ত হয়—সদ্গুরু বা সাধুকৃপার ফলে এবং আপনাকে শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণীর কোন সখীর অনুগতা ভাবনা করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষবিধানে যত্নশীল হন।

শ্রীভগবান্ প্রসন্ন হন কিসে জিজ্ঞাসা করিলে সাধারণ উত্তর মিলিবে—

"তিতিক্ষয়া করুণয়া মৈত্র্যা চাখিল জন্তুষু সমত্বেন চ সর্ব্বাত্মা ভগবান সম্প্রসীদতি। (শ্রীমদ্ভাগবত)। তিতিক্ষা করুণা মিত্রতা ও অখিল জীবে সমজ্ঞান দ্বারা শ্রীভগবান্ সন্তুষ্ট হন এবং এই ভাবটী লাভ করিবার জন্য বাহ্যসাধন—শ্রীভগবানের নাম গুণ লীলা শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নববিধভাবযাজন এবং আন্তর সাধন নিজেকে শ্রীভগবানের শক্তি জ্ঞানে নিজ চিন্ময় স্বরূপ স্মরণ করিয়া সেবার জন্য সতত ব্যস্ত হওয়া।

পূর্ব্বোক্ত সাত্ত্বিক ভাব যখন উদ্দীপ্ত হইয়া প্রকাশ পায়, তখন তার রূঢ় আখ্যা হয়; এবং রূঢ় ভাব কোন এক অনির্ব্বচনীয় উৎকর্ষ অবস্থা লাভ করিলে অধিরূঢ় আখ্যা ধারণ করে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, নায়িকা ত্রিবিধা, সাধারণী সমঞ্জসা ও সমর্থা। সাধারণী নায়িকার রূঢ় বা অধিরূঢ় ভাব নাই। সমঞ্জসা নায়িকার— যেমন শ্রীকৃষ্ণের মহিষীগণ—রূঢ়ভাব পর্য্যন্ত লাভ হয়। শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণী ও ব্রজসুন্দরীগণ—যাঁহারা সমর্থা নায়িকা—তাঁহাদেরই অধিরূঢ় ভাব সম্ভব। সাধারণী নায়িকা প্রেম পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারে। সমঞ্জসা অনুরাগময়ী। সমর্থা নায়িকা ভাবময়ী এবং তাঁহাদের শিরোমণি শ্রীরাধাঠাকুরাণী মহাভাবময়ী। সেই 'মহাভাবস্বরূপিণীর গুণ কি, আলোচনা করা যাউক—

মধুরেয়ং নববয়াশ্চলাপাঙ্গোজ্জলস্মিতা।
চারুসৌভাগ্যরেখাঢ্যা গন্ধোন্মাদিত-মাধবা॥
সঙ্গীত-প্রবরাভিজ্ঞা রম্যবাঙ্ নর্ম্মপণ্ডিতা।
বিনীতা করুণাপূর্ণা বিদগ্ধা পাটবান্বিতা॥
লজ্জাশীলা সুমর্য্যাদা ধৈর্য্যগাম্ভীর্য্যশালিনী।
সুবিলাসা মহাভাব পরমোৎকর্ষতর্ষিণী॥
গোকুলপ্রেমবসতির্জ্জগৎশ্রেণীলসদ্যশাঃ।
গুর্ব্বর্পিত-গুরুস্নেহা সখীপ্রণয়িতা বশা॥
কৃষ্ণপ্রিয়াবলী মুখ্যা সন্ততাশ্রব-কেশবা।
বহুনা কিং গুণাস্তস্যা সংখ্যাতীতা হরেরিব॥

(১) মধুরা (২) নববয়া (৩) চঞ্চল অপাঙ্গযুক্তা (৪) উজ্জ্বল হাস্যযুক্তা (৫) চারু সৌভাগ্য রেখাযুক্তা (৬) অঙ্গগন্ধে মাধবকে উন্মাদকারিণী (৭) সঙ্গীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা (৮) রম্যবাক্—যাহার বাক্য অতি রমণীয় (৯) নর্ম্মে বা পরিহাসে পণ্ডিতা (১০) বিনীতা (১১) করুণাপূর্ণা (১২) বিদগ্ধা (১৩) চাতুর্য্যশালিনী (১৪) লজ্জাশীলা (১৫) সুমর্য্যাদা অর্থাৎ মর্য্যাদা-রক্ষাকারিণী (১৬) ধৈর্য্যশালিনী (১৭) গাম্ভীর্য্য-শালিনী (১৮) বিলাস মণ্ডিতা (১৯) মহাভাবের পরমোৎকর্ষ অবস্থাপ্রাপ্তা (২০) গোকুলবাসীর সকলের প্রেমের পাত্রী (২১) জগৎ তাঁর যশে ব্যাপ্ত (২২) গুরুজনের অতিশয় স্নেহের পাত্রী (২৩) সখীর প্রণয়াধীনা (২৪) কৃষ্ণ-প্রেয়সীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা (২৫) শ্রীকৃষ্ণ যাঁর আজ্ঞাধীন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শ্রীমতীর স্বরূপ ও দেহ প্রেমবিভাবিত —সখীগণও আনন্দ চিন্ময়রস প্রতিভাবিতাভি সেই চিন্ময় রসের দ্বারা প্রতিভাবিত। এ জগতে যেমন জড় শক্তি দেহাদি নানা আকারে প্রকাশিত হ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধাঠাকুরাণী ও গোপী আকারে প্রকটিত। পরকে আনন্দ দেওয়া পরের সুখে নিজে সুখী হওয়া প্রীতির লক্ষণ এবং সেই সঙ্গে পরের দুঃখে নিজে দুঃখী হইতে হয়। ইহাই সাধারণ প্রীতির লক্ষণ। ইহার মধ্যে কারুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। সাধারণ প্রীতির যদি ইহাই নিয়ম হয়, তবে শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণী যে অপার করুণাময়ী হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাই শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—

কারুণ্যামৃত ধারায় স্নান প্রথম।

তাঁর দেহখানি করুণারূপ অমৃতের প্রবাহে সতত আর্দ্র। তাঁর বেশভূষার একটু পরিচয় লওয়া যাউক।

"নিজ লজ্জা শ্যাম পট্টসাটী পরিধান"

লজ্জাই স্ত্রীলোকের ভূষণ—সেই ভূষণে শ্রীমতী সর্ব্বদা ভূষিতা। আবার সে সাটী কোন বর্ণের? শ্যাম বর্ণের। শ্যাম যার অন্তরে বাহিরে, তিনি আর কোন শাটী পরিধান করিবেন? আধুনিক বৈজ্ঞানিক বলেন, অনন্তের বর্ণ ই শ্যাম—দৃষ্টান্ত আকাশ সমুদ্র। জানিনা তাঁর পরিধেয় বসনের সহিত অন্তরের কোন অংশে সাদৃশ্য। ভক্তিশাস্ত্রে বলে ব্রহ্ম শ্রীভগবানের অঙ্গকান্তি—শ্রীভগবান মণিস্থানীয় —আর সেই মণির অনন্তচ্ছটাস্বরূপ ব্রহ্ম গীতার ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহহম্—ঘনীভূত ব্রহ্মাহহম্ (স্বামিপাদ) তত্ত্বটী প্রণিধানযোগ্য। ফল কথা— হ্লাদিনী শক্তিকে জড়াইয়া আছে অনন্ত ভাবের আবরণে—সে শক্তি ত শান্ত নয়। এ তো গেল একদিকের কথা। সেই শ্যাম সাটীকে আবার আচ্ছাদন করিয়া আছে দ্বিতীয় বসনে, কৃষ্ণ অনুরাগময় রক্তবর্ণের বসনে। যে অনুরাগে শ্রীকৃষ্ণ ক্ষণে ক্ষণে নব নবায়মান বোধ হন, সেই অনুরাগ সদা সর্ব্বদা শ্রীমতীকে ব্যাপিয়া রহিয়াছে। আবার সেই হৃদয়ভরা অনুরাগকে গোপন করিবার জন্য প্রণয় ও মানরূপ কঞ্চুলিকায় বক্ষ আচ্ছাদন করিয়া আছেন। মানের প্রকার অনেকেই জানেন—যাঁর জন্য অধীর, তিনি চরণপ্রান্তে পড়িয়া কত সাধিলেও উপেক্ষাসদৃশ ভাব। মনে হয় বুঝি ভালবাসা নাই। ভালবাসাকে গোপন এমনি করিয়া করিতে হয়। আর তিনি চিবুকে ও হৃদয়ে মৃগমদ ধারণ করেন। কিসের মৃগমদ? কৃষ্ণের মধুর রস রূপ মৃগমদ। রসস্বরূপ শ্রীভগবানকে তিনি সতত মধুর রস পরিবেশন করিতেছেন—সতত আনন্দ সুধা পান করাইতে-ছেন। আর তাঁর অধর হইয়াছে রাগ রূপ তাম্বূলে উজ্জ্বল। যে রাগে প্রিয়তমের জন্য সব দুঃখ সুখ বোধ হয়, সেই রাগ সর্ব্বদাই তাঁর অধরকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। অর্থাৎ প্রিয়তমের জন্য সব দুঃখ সুখ বোধ করিয়া প্রফুল্লমুখে তিনি বিরাজমানা। আর তাঁর নেত্রে আছে প্রেমকজ্জল। প্রেমের

গতি কুটিল তাই নেত্রপ্রান্তে কত কুটিল কটাক্ষ বিস্তার করিতেছেন—সবই প্রিয়তমের সুখের জন্য।

পূর্ব্বে শ্রীমতীর অসংখ্য গুণের মধ্যে ২৫টী প্রধান গুণ উল্লিখিত হইয়াছে। সেইগুলি একটু আলোচনা করা যাউক—প্রথম (১) মধুরা। অর্থাৎ তিনি মাধুর্য্যশালিনী ; শুধু তাই নয়, তিনি মাধুর্য্যের খনি। আবার তিনি (২) নববয়া—তিনিই নিতুই নবীনা, তাঁর বয়সের কোন অপচয় বা বৃদ্ধি নাই, এই কারণে তাঁর একটী নাম কিশোরী। চিন্ময় পদার্থেরই পরিণতি নাই—হ্লাদিনীর মূর্ত্তি চির কিশোরী হইবে তার আর সন্দেহ কোথায়? নিত্যই প্রিয়তমকে আনন্দ দেওয়া তাঁর কাজ এবং সেই আনন্দ প্রদানের প্রধান করণ প্রণয়কটাক্ষ—(৩) চপলাপাঙ্গা ও উজ্জ্বল হাস্য—(৪) উজ্জ্বল-স্মিতা। আবার তিনি চারু অর্থাৎ সুন্দর রেখা দ্বারা আঢ্য বা ভূষিত। চারু সৌভাগ্য রেখাঢ্যা (৫) নিজ অঙ্গগন্ধে তিনি মাধবকে মুগ্ধ করেন (গন্ধোন্মাদিত মাধবা) শ্রীভগবান আর কিছুতে লুব্ধ হন না। বিদ্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত, সেই বিদ্যায় তিনি সুপণ্ডিতা (সঙ্গীত প্রবরাভিজ্ঞা) আর তাঁর বচনে অমিয় ঝরে (রম্যবাক্) আর তিনি হাস্যপরিহাসে সুনিপুণ (নর্ম্ম পণ্ডিতা)। আর তিনি বিনীতা। ফলবন্ত বৃক্ষ আর গুণবন্ত জন সকল সময়েই নত। তিনি যে সকল গুণের খনি, তাই বিশেষভাবে নতা। তাঁর করুণার সীমা নাই—পরদুঃখ তিনি সহিতে পারেন না (করুণা পূর্ণা)। আবার তিনি যাবতীয় সেবাকার্য্যে সুপণ্ডিতা (পাটবান্বিতা)—কিরূপ সেবায় শ্রীভগবান সুখী হন তিনিই ভালরূপ জানেন। সেই সঙ্গে তিনি চাতুর্য্যশালিনী (সুচতুরা)। এবং স্ত্রীলোকের যে প্রধান গুণ—(লজ্জা) সেইটী দ্বারা মণ্ডিতা (লজ্জাশীলা)। তিনি কাহারও মর্য্যাদা কখনও লঙ্ঘন করেন না (সুমর্য্যাদা) আবার সকল প্রকার কষ্ট তিনি ধৈর্য্যসহকারে সহ্য করিতে অদ্বিতীয়া (ধৈর্য্যশীলা) কাহারও প্রতি দ্বেষ বা ক্রোধ করেন না। অতি দুঃখের সময়ও নিজ গাম্ভীর্য্য নষ্ট করেন না (গাম্ভীর্য্যশালিনী)। এবং বিলাস বিষয়ে সুপণ্ডিতা—যাহাতে প্রিয়তম সুখ পান (সুবিলাসা)। তিনি সতত মহাভাবের পরমোৎকর্ষ দশায় অবস্থিত (মহাভাব পরোৎকর্ষ তর্ষিনী) গোকুলের সকলের তিনি প্রেমের পাত্রী (গোকুল প্রেম বসতি) এবং তাঁর যশ জগৎময় ব্যাপ্ত (জগৎশ্রেণীলসদ্‌যশা)। তিনি গুরুজনের অতিশয় স্নেহের বিষয় (গুর্ব্বর্জিত গুরু স্নেহা), নিজ সখীর প্রণয়ের অধীন (সখী প্রণয়িতা বশা) এবং সকল সময় নিজ প্রিয়তমকে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন (সন্ততাশ্রব কেশবা)। পূর্ব্বে বলিয়াছি তিতিক্ষা করুণা মিত্রতা ও অখিল জীবে সমভাবে শ্রীভগবান সন্তুষ্ট হন। ইহাও সাধারণ নিয়ম। শ্রীমতীতে এই সকল গুণ অপরিসীমভাবে বর্ত্তমান, তাহারই দৃষ্টান্ত স্বরূপে কয়েকটী উদাহরণ প্রদান করিব। শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থ হইতে দৃষ্টান্ত লওয়া হইয়াছে।

(করুণাপূর্ণা)

কোন একদিন একটী বৎসের মুখে তৃণাগ্রভাগ বিদ্ধ হইতে দেখিয়া শ্রীমতী কাতর হইয়া অশ্রু সিঞ্চন করিতে করিতে কুঙ্কুমপঙ্ক দ্বারা বৎসের সেই ক্ষত স্থান লেপন করিয়া দিলেন।

(মর্য্যাদাশালিনী)

কোন এক শ্রাবণ পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণ প্রেরিত কোন এক দূতী শ্রীরাধাকে নিবেদন করেন—অদ্য শ্রাবণ পূর্ণিমা, ইহাতে সকল কামনা সিদ্ধ হয়, গোবিন্দ তোমাকেই কামনা করিতেছেন। তথাপি শ্রীমতী নিজ সখী চিত্রাকেই অভিসারার্থ প্রেরণ করিলেন।

(ধৈর্য্যশালিনী)

বিপক্ষ সখী পদ্মার বাক্যে অভিমন্যু তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে থাকেন, কুটীলা শিক্ষিত বানর দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ প্রদত্ত হার হরণ করান, বিপক্ষ সখী শৈব্যা ছাগী দ্বারা কৃষ্ণপ্রিয় মল্লীবৃক্ষের পল্লব নষ্ট করান। শ্রীমতী সচক্ষে দেখিয়া ধৈর্য্যধারণ করিয়া থাকেন।

ইহা দ্বারাই তাঁর তিতিক্ষা কারুণ্য ও মিত্রতা ও অখিল জীবে সমভাব সম্যগরূপে প্রকাশ পাইতেছে।

পঞ্চদশী

অনুবাদক পণ্ডিত শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়

(শঙ্কা) ভাল, এই সমাধি পূর্ব্বাচার্য্যদিগের কর্ত্তৃক নিরূপিত হইয়াছে বলিয়া ত দেখা যায না। —এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন, অখিলগুরু পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক এই সমাধি নিরূপিত হইয়াছে বলিয়া ঐরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না।

যথা দীপ নিবাতস্থ ইত্যাদিভিরনেকধা।
ভগবানিমমেবার্থমর্জ্জুনায় ন্যরূপয়ৎ ॥৫৮

অন্বয় "যথা নিবাতস্থঃ দীপঃ" (গীতা ৬।১৯) ইত্যাদিভিঃ ভগবান্ অনেকধা ইমম্ এব অর্থম্ অর্জ্জুনায় ন্যরূপয়ৎ।

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতার ষষ্ঠাধ্যায়ের উনবিংশ শ্লোকে "যথা দীপো নিবাতস্থঃ ইত্যাদি বচনসমূহদ্বারা অনেক প্রকারে অর্জ্জুনকে এই কথাই বুঝাইয়াছেন।

টীকা—"যথা দীপঃ নিবাতস্থঃ ইত্যাদিভিঃ"—যেমন নিবাত স্থানে অবস্থিত দীপ কম্পিত হয় না, আত্মসমাধিরূপ যোগের অনুষ্ঠানে রত সংযতচিত্ত যোগীর অচঞ্চল চিত্তের উহাই উপমা, ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা "অনেকধা"—অনেক প্রকারে, "ভগবান্—জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ ধর্ম্ম-যশ-লক্ষ্মী বৈরাগ্যসম্পন্ন ভগবান্, "ইম্ এব অর্থম্"—"অর্জ্জুনায়"—শিষ্যরূপ অর্জ্জুনকে, এই সমাধিরূপ বিষয়টি, "ন্যরূপয়ৎ"—বুঝাইবার জন্য নিরূপণ করিয়াছেন। ৫৮

এই সমাধির অবান্তর ফল, অর্থাৎ মুখ্য ফলের সাধনস্বরূপ গৌণ ফল, বলিতেছেন :—

অনাদাবিহ সংসারে সঞ্চিতাঃ কর্ম্মকোটয়ঃ।
অনেন বিলয়ং যান্তি শুদ্ধো ধর্ম্মোবিবর্দ্ধতে॥৫৯

অন্বয়—অনাদৌ ইহ সংসারে সঞ্চিতাঃ কর্ম্মকোটয়ঃ অনেন বিলয়ম্ যান্তি; শুদ্ধঃ ধর্ম্মঃ বিবর্দ্ধতে।

অনুবাদ—অনাদি এই সংসারে সঞ্চিত কোটি কোটি কর্ম্ম এই নির্ব্বিকল্প সমাধিপ্রভাবে বিলীন হইয়া যায় ও তত্ত্বসাক্ষাৎকারের হেতুভূত পবিত্র ধর্ম্ম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

টীকা—"অনাদৌ ইহ সংসারে"—অনাদিকালের (জন্মমরণ প্রবাহরূপ) এই সংসারে "সঞ্চিতাঃ কর্ম্ম-কোটয়ঃ,"—পুণ্য-অপুণ্যরূপ অপরিমিত সঞ্চিত কর্ম্মের, "কোটয়ঃ"—কোটি কোটি, ইহা উপলক্ষণ মাত্র অর্থাৎ অপরিমিত কর্ম্ম, "অনেন বিলয়ম্ যান্তি"—এই (নির্ব্বিকল্প) সমাধির দ্বারা বিনাশপ্রাপ্ত হয়। [অর্থাৎ নিদিধ্যাসনের পরিপাকদশারূপ সমাধির ফল যে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার, তাহার দ্বারাই বিনাশপ্রাপ্ত হয়, কেন না সেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার দ্বারা অজ্ঞানকৃত আবরণ নিবৃত্ত হয় এবং সেই আবরণরূপ আশ্রয়ের নিবৃত্তি হইলে, তদাশ্রিত অনন্ত সঞ্চিত কর্ম্মেরও নিবৃত্তি হয়, সুতরাং জ্ঞান দ্বারাই কর্ম্ম বা কর্ম্মফল বিনাশ-প্রাপ্ত হয়, যেহেতু শ্রুতি বলিতেছেন "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে" (মুণ্ডক উ, ২।৯) সেই পরাবরের দর্শনলাভ হইলে পর, এই পুরুষের কর্ম্মক্ষয় হয় অর্থাৎ ব্রহ্মলোকাদি পুনরাবৃত্তিবিশিষ্ট 'পর' বা শ্রেষ্ঠ পদ 'অবর' বা নিকৃষ্ট, যাহা হইতে, সেই প্রত্যগভিন্ন পরব্রহ্মরূপ 'পরাবরের' দর্শনলাভ বা অপরোক্ষ জ্ঞান হইলে পর, সেই জ্ঞানীর অনন্তজন্মসম্পাদিত সঞ্চিত কর্ম্ম, সেই তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা বিনষ্ট হয়, যেহেতু,

জ্ঞানীর প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগদ্বারাই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, এবং 'আমি অকর্ত্তা, অভোক্তা, অসঙ্গ' এইরূপ নিশ্চয়ের বলে, ক্রিয়মাণ কর্ম্ম পদ্মপত্রস্থিত জলবিন্দুর ন্যায় জ্ঞানীর স্বরূপকে স্পর্শ করিতে পারে না।] আর স্মৃতিও বলিতেছেন—"জ্ঞানাগ্নি সর্ব্বকর্ম্মানি ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন" (গীতা ৪।৩৭) হে অর্জ্জুন জ্ঞান রূপ অগ্নি সকল কর্ম্মকে ভস্মের ন্যায় করিয়া ফেলে। "শুদ্ধঃ ধর্ম্মঃ"—পুণ্যবিশেষ—যাহা স্থূলসূক্ষ্মকার্য্যের সহিত অবিদ্যার নিবৃত্তি করিয়া এবং (চিত্ত হইতে মল ও বিক্ষেপদোষরূপ প্রতিবন্ধক বিদূরিত করিয়া) সাক্ষাৎকারের সাধনস্বরূপ হয়, তাহা, 'বিবর্দ্ধতে' বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, ইহা স্পষ্ট। ৫৯

সমাধিদ্বারা ধর্ম্ম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি? এতদুত্তরে বলিতেছেন :—

ধর্ম্মমেঘমিমং প্রাহুঃ সমাধিং যোগবিত্তমাঃ।
বর্ষত্যেষ যতো ধর্ম্মামৃতধারাঃ সহস্রশঃ ॥৬০

অন্বয়—যোগবিত্তমাঃ ইমাম্ সমাধিম্ ধর্ম্মমেঘম্ প্রাহুঃ, যতঃ এষঃ ধর্ম্মামৃতধারাঃ সহস্রশঃ বর্ষতি।

অনুবাদ—শ্রেষ্ঠ যোগবিদ্‌গণ এই সমাধিকে "ধর্ম্মমেঘ" নাম দিয়াছেন, কেন না এই সমাধি সহস্র-প্রকারে ধর্ম্মরূপ অমৃতধারা বর্ষণ করিয়া থাকে।

টীকা—"যোগবিত্তমাঃ"—যাঁহারা প্রভূত পরিমাণে যোগবিষয়ক জ্ঞানলাভ করিয়াছেন অর্থাৎ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারবান্ পুরুষ, "ইমম্ সমাধিম্"—এই নির্ব্বিকল্প সমাধিকে, "ধর্ম্মমেঘং প্রাহুঃ"—'ধর্ম্মমেঘ' বলিয়া থাকেন, ইহা স্পষ্ট। [যথা—"প্রসংখ্যানেঽপ্যকুসীদস্য সর্ব্বথা বিবেকখ্যাতের্ধর্ম্মমেঘসমাধিঃ" পাতঞ্জল যোগসূত্র, কৈবল্যপাদ ২৯ সূত্র—যখন বিবেকখ্যাতি-বিশিষ্ট অর্থাৎ বুদ্ধি ও চৈতন্যের পৃথক্ত্ব বিষয়ক প্রজ্ঞা-বিশিষ্ট, ব্রাহ্মণ অর্থাৎ আপনার ব্রহ্মরূপতা উপলব্ধি করিতে ইচ্ছুক মুমুক্ষু, প্রসংখ্যানেও—বিবেকখ্যাতি-জনিত সর্ব্বজ্ঞতাসিদ্ধিলাভেও, অকুসীদ—স্পৃহাশূন্য, হন, তখন তাঁহার যে সর্ব্বথা বিবেকখ্যাতি হয় অর্থাৎ সংস্কারবীজের ক্ষয় হওয়াতে, আর প্রত্যয়ান্তর উৎপন্ন হয় না, সেইরূপ বিবেকখ্যাতি হইতেই ধর্ম্মমেঘসমাধি হয়, অর্থাৎ মেঘ যেমন জলবর্ষণ করে, সেই সমাধি সেইরূপ পরমধর্ম্মকে বর্ষণ করে—বিনা প্রযত্নে প্রদান করে অর্থাৎ সর্ব্ববিঘ্ন-নিবৃত্তিপূর্ব্বক প্রত্যগ্‌ব্রহ্মৈক্যসাক্ষাৎকার প্রদান করে। সেই সমাধির ধর্ম্মমেঘরূপ নামকরণের কারণ উপপাদন করিতেছেন—যুক্তিদ্বারা সমর্থন করিতেছেন :—"যতঃ"—যেহেতু, "এষঃ"—এই সমাধি, "ধর্ম্মামৃতধারাঃ সহস্রশঃ বর্ষতি"—পুণ্যবিশেষরূপ ধর্ম্মকে সহস্র সহস্র অমৃতধারারূপে বর্ষণ করিয়া থাকে *। [জ্ঞানী মুমুক্ষু বলিয়া, তাঁহার উত্তম লোকপ্রাপ্তি প্রভৃতি অন্য ফললাভ হয় না বটে, কিন্তু তাঁহার প্রত্যগ্‌ব্রহ্মৈক্য সাক্ষাৎকারের অন্তরায় সমূহ তিরোহিত হয়। তবে তাঁহার দর্শন ও সেবাদির দ্বারা লোকের পাপনিবৃত্তি হয় এবং বাসনানুরূপ সিদ্ধিলাভ হয়] যেহেতু শ্রুতি বলিতেছেন :—"ক্ষণমেকং ক্রতুশতস্যাপি চতুঃসপ্তত্যা যৎ ফলং তদবাপ্নোতি" (অথর্ব্বশিখো-পনিষৎ, ৩য় কণ্ডিকা)। "ধ্যেয়ঃ সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্নঃ সর্ব্বেশ্বরঃ শম্ভুরাকাশমধ্যে ধ্রুবং স্তব্ধ্বাধিকং ক্ষণমেকং ক্রতুশতস্যাপি চতুঃসপ্তত্যা যৎ ফলং তদাপ্নোতি। কৃৎস্নমোক্ষারগতিশ্চ"। ইহার ব্যাখ্যা—

"সর্ব্বকারণত্বেন যো ধ্যেয়ঃ সোঽহং সর্ব্বজ্ঞত্ব-সর্ব্বেশ্বরত্ব-সর্ব্বকারণত্ব-সর্ব্বান্তর্যামিত্বাদি **সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্নঃ সর্ব্বেশ্বরঃ** স্বাংশজ সর্ব্বপ্রাণি-স্বামিত্বাৎ **শম্ভুঃ** সর্ব্বসুখকৃত্ত্বাৎ এবং বিশেষণ-বিশিষ্টঃ পরমাত্মা সদা যো বিজ্ঞয়তে তমেতং **ধ্রুবং** আত্মানং যঃ কোঽপি বা পুরুষঃ স্বহৃদয়াকাশ-মধ্যে **অধিকং** ক্ষণম্ একং ক্ষণার্দ্ধং বা ধ্যানপূর্ব্বকং স্তব্ধ্বা স্তম্ভয়িত্বা ধ্যায়ীত তস্য তদ্ভাবাপত্তিরেব

* ধর্ম্ম সকলকে অর্থাৎ জ্ঞেয় পদার্থ সকলকে মেহন করে বা যুগপৎ জ্ঞানারূঢ় করে বলিয়া ইহার নাম ধর্ম্মমেঘ—এইরূপ অর্থ, সিদ্ধিলিপ্সুগণের অনুমোদিত।

পরমকলং আন্তরালিক ফলং তু চতুসংসপ্তত্যধিক-শতক্রত্বনুষ্ঠানতো যৎফলং তদবাপ্নোতি কৃৎস্নমোক্ষাব-গতিশ্চানেন বিদিতা ভবেৎ। [পৃ ১৯ শৈবোপনিষদঃ উপনিষদ্ব্রহ্মযোগিবিবচিতব্যাখ্যাযুতাঃ Ed. by Mahendra Shastri] (যে কেহ পরমাত্মাকে স্বহৃদয়মধ্যে নিশ্চল করিয়া দীর্ঘকাল বা ক্ষণার্দ্ধমাত্র ধ্যান করেন তিনি পরমাত্মভাবপ্রাপ্ত হন এবং তদভাবে ১৭৪টি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে যে ফললাভ হয় সেই ফললাভ করেন।) এই নিমিত্ত এই সমাধিকে 'ধর্ম্মমেঘ' বলিয়াছেন।—এইরূপে শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধের সহিত অন্বয় হইবে।

এক্ষণে সমাধির মুখ্য প্রয়োজন বা ফল বলিতেছেন :—

অমুনা বাসনাজালে নিঃশেষং প্রবিলাপিতে।
সমূলোন্মূলিতে পুণ্যপাপাখ্যে কর্ম্মসঞ্চয়ে ॥৬১

(৪) উত্তর প্রবন্ধের ফলিতার্থ।

(১) বাক্য হইতে অপরোক্ষ জ্ঞানের উৎপত্তি।

বাক্যমপ্রতিবদ্ধং সৎ প্রাক্পরোক্ষাবভাসিতে
করামলকবদ্বোধমপরোক্ষং প্রসূয়তে ॥ ৬২

অন্বয়—অমুনা বাসনাজালে নিঃশেষং প্রবিলাপিতে পুণ্যপাপাখ্যে কর্ম্মসঞ্চয়ে সমূলোন্মূলিতে, বাক্যম্ অপ্রতিবদ্ধম্ সৎ প্রাক্পরোক্ষাবভাসিতে (তত্ত্বে) করামলকবৎ অপরোক্ষম্ বোধম্ প্রসূয়তে।

অনুবাদ—এই সমাধিদ্বারা জ্ঞানবিরোধী সংস্কারসমূহ সম্পূর্ণরূপে বিনাশিত হইলে এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মসমূহ সমূলে উন্মূলিত হইলে "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্য প্রতিবন্ধক রহিত হইয়া যে আত্মতত্ত্ব প্রথমে পরোক্ষভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই আত্মতত্ত্ববিষয়ে করস্থিত আমলক ফলবিষয়ক জ্ঞানের ন্যায় অথবা করস্থিত নির্ম্মল জলবিষয়ক জ্ঞানের ন্যায় অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপাদন করিয়া থাকে।

টীকা—"অমুনা"—এই সমাধির দ্বারা, "বাসনা-জালে—'আমি', 'আমার', 'আমি কর্ত্তা' ইত্যাদি—প্রকার অভিমানের হেতুভূত, জ্ঞানবিরুদ্ধ সংস্কার-সমূহ, "নিঃশেষম্"—যাহাতে তাহার অবশেষ না থাকে, এইরূপে, সম্পূর্ণরূপে, "প্রবিলাপিতে" বিনাশিত হইলে, এবং "পুণ্যপাপাখ্যে কর্ম্মসঞ্চয়ে"—পুণ্যপাপনামক কর্ম্মসমূহ, "সমূলোন্মূলিতে" (বৃক্ষলতাদি) মূলের সহিত যে প্রকারে উন্মূলিত হয়, সেইপ্রকারে উন্মূলিত হইলে, উদ্ধৃত হইলে, অর্থাৎ বিনাশিত হইলে ; কি ফললাভ হয়, তাহাই বলিতেছেন ;—"বাক্যম্ অপ্রতিবদ্ধম্ সৎ"—"তত্ত্ব-মসি" প্রভৃতি মহাবাক্যসমূহ কর্ম্ম ও বাসনারূপ প্রতিবন্ধক শূন্য হইয়া, "প্রাক্পরোক্ষাবভাসিতে" (তত্ত্বে)—প্রথমে পরোক্ষভাবে প্রকাশিত যে প্রত্যগ্‌রূপ ব্রহ্মতত্ত্ব, সেই তত্ত্ববিষয়ে "করামলকবৎ" করস্থিত আমলক ফল বিষয়ে যেরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান হয়, সেইরূপ, অথবা করস্থিত নির্ম্মল জল বিষয়ে যেরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান * হয়, সেইরূপ, "অপরোক্ষম্ বোধম্" অপরোক্ষভাবে তত্ত্ব প্রকাশনে সমর্থ যে জ্ঞান সেই জ্ঞানকে, "প্রসূয়তে"—উৎপাদন করিয়া থাকে। ৬১-৬২

(২) এক্ষণে পরোক্ষজ্ঞানের ফল বলিতেছেন :—

পরোক্ষং ব্রহ্মবিজ্ঞানং শাব্দং দেশিকপূর্ব্বকম্।
বুদ্ধিপূর্ব্বকৃতং পাপং কৃৎস্নং দহতি বহ্নিবৎ ॥৬৩॥

অন্বয়—দেশিকপূর্ব্বকম্ শাব্দম্ পরোক্ষম্ ব্রহ্ম-বিজ্ঞানম্ বুদ্ধিপূর্ব্বকৃতম্ কৃৎস্নং পাপম্ বহ্নিবৎ দহতি।

অনুবাদ—গুরুমুখলব্ধ 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহা-বাক্যজনিত পরোক্ষ ব্রহ্মবিজ্ঞান, জ্ঞানপূর্ব্বকৃত সমস্ত পাপকে অগ্নির ন্যায় দগ্ধ করিয়া থাকে।

* করস্থিত আমলক ফলের বহির্দ্দেশ জানা যায় বটে কিন্তু অন্তর্দ্দেশ জানা যায় না, সেইহেতু কর+অমলক=করস্থিত অমল বা স্বচ্ছ জল (ক=জল), এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে উক্ত দোষের পরিহার হয়।

টীকা—"দেশিকপূর্ব্বকম্"—(ব্রহ্মনিষ্ঠ) গুরুর মুখ হইতে প্রাপ্ত "শাব্দম্"—তত্ত্বমসি প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে উৎপন্ন এইরূপ, "পরোক্ষম্ ব্রহ্মবিজ্ঞানম্" ব্রহ্মবিষয়ক পরোক্ষ জ্ঞান, "বুদ্ধিপূর্ব্বকৃতম্ পাপম্"—জ্ঞানপূর্ব্বকৃত পাপকে (অর্থাৎ কোনও কর্ম্মকে পাপকর্ম্ম বলিয়া জানিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিলে যে পাপ হয় সেই পাপকে অথবা জন্মের পর, জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে, কৃত সকলপাপকে) "বহ্নিবৎ দহতি"—অগ্নির ন্যায় দগ্ধ করিতে থাকে। ৬৩

(৩) অপরোক্ষ জ্ঞানের ফল বলিতেছেন :—

অপরোক্ষাত্মবিজ্ঞানং শাব্দং দেশিকপূর্ব্বকম্।
সংসারকারণাজ্ঞানতমসশ্চণ্ডভাস্করঃ ॥ ৬৪ ॥

অন্বয়—শাব্দম্ দেশিকপূর্ব্বকম্ অপরোক্ষাত্ম-বিজ্ঞানম্ সংসারকারণাজ্ঞানতমসঃ চণ্ডভাস্করঃ (ভবতি)।

অনুবাদ— গুরূপদেশলব্ধ মহাবাক্যজনিত অপরোক্ষ আত্মসাক্ষাৎকার, সংসারের (মূলীভূত) কারণ অজ্ঞানান্ধকারের পক্ষে প্রচণ্ডমার্ত্তণ্ডসদৃশ (নিবর্ত্তক)।

টীকা—"শাব্দম্ দেশিকপূর্ব্বকম্"—পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে, (গুরুমুখে উপদিষ্ট মহাবাক্য হইতে উৎপন্ন), "অপরোক্ষাত্মবিজ্ঞানম্"—নিত্য সাক্ষাৎপ্রত্যক্ষ যে আত্মা, তদ্বিষয়ক সংশয়বিপর্য্যয় রহিত যে জ্ঞান, তাহা, 'সংসারকারণাজ্ঞানতমসঃ চণ্ডভাস্করঃ"—সংসারের কারণ যে অজ্ঞান, তাহাই তমঃ অর্থাৎ অন্ধকার, তাহার সম্বন্ধে "চণ্ডভাস্করঃ" মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্য, সেই চণ্ডভাস্কর যেরূপ বাহ্য অন্ধকারের নিবর্ত্তক, সেইরূপ সেই জ্ঞান, অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের নিবর্ত্তক, ইহাই ভাবার্থ। ৬৪

(৪) এই তত্ত্ববিবেক গ্রন্থের অভ্যাস বা আলোচনার ফল বলিতেছেন :—

ইত্থং তত্ত্ববিবেকং বিধায় বিধিবন্মনঃ সমাধায়
বিগলিতসংসৃতি বন্ধঃ প্রাপ্নোতি পরং পদং
নরো ন চিরাৎ ॥ ৬৫ ॥

অন্বয়ঃ—নরঃ ইত্থম্ তত্ত্ববিবেকম্ বিধায় বিধিবৎ মনঃ সমাধায় বিগলিতসংসৃতিবন্ধঃ (সন্) পরম্ পদম্ ন চিরাৎ প্রাপ্নোতি।

অনুবাদ—লোকে এইরূপে আত্মাকে পঞ্চকোষ হইতে পৃথক্ বুঝিয়া, সেই আত্মতত্ত্বে, বিধিপূর্ব্বক মনের একাগ্রতা—সম্পাদন করিলে, সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া অবিলম্বে পরমপদলাভ করে।

টীকা—লোকে "ইত্থম্"—উক্ত প্রকারে (অর্থাৎ সমস্ত প্রথমপ্রকরণে বর্ণিত যে অধ্যারোপ —অপবাদির প্রকার, সেই প্রকারে), "তত্ত্ববিবেকং বিধায়"—ব্রহ্ম ও আত্মার একতারূপ তত্ত্বের বিবেক,পঞ্চকোষ হইতে পৃথক্ করণ,তাহা করিয়া সেই আত্মতত্ত্বে, "বিধিবৎ" শাস্ত্রোক্তপ্রকারে (অর্থাৎ একতার বিচার ও লয়-চিন্তনাদি উপায়দ্বারা সর্ব্বপ্রপঞ্চের অভাব বিচার করিয়া 'আমিই হইতেছি ব্রহ্ম' এইপ্রকারে মনকে তদাকার করিয়া), "মনঃ সমাধায়"—মনকে স্থির করিয়া "বিগলিতসংসৃতিবন্ধঃ"—অপরোক্ষজ্ঞান-দ্বারা নিবৃত্ত হইয়াছে সংসাররূপ বন্ধ যাহার, এইরূপ হইয়া "পরম্ পদম্'—নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ যে মোক্ষপদ তাহাই, "নচিরাৎ"—অবিলম্বে, 'প্রাপ্নোতি' সত্যজ্ঞানানন্দরূপ ব্রহ্মই হইয়া যান, ইহাই তাৎপর্য্য।

এইরূপে প্রত্যক্তত্ত্ববিবেক ব্যাখ্যা সমাপ্ত হইল।

মাধুকরী

ধর্ম্ম ও দর্শন

ধর্ম্ম ও দর্শন পরস্পর-বিরোধী কি না, ইহার সম্বন্ধে বহু বাদানুবাদ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকারে হইয়া গিয়াছে। এই বিবাদের মূলে আছে মানুষের জ্ঞানের শক্তির সীমানা সম্বন্ধে প্রশ্ন। যদি যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত ব্যতীত জ্ঞেয় বস্তু আর কিছু না থাকে এবং সেই যুক্তি যদি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইন্দ্রিয় জ্ঞানের উপর নির্ভর করে, তাহা হইলে ধর্ম্মের ও দর্শনের বিবাদ অনিবার্য্য এবং বেদ বা অন্য আপ্ত-বাক্য সন্দেহজনক হইয়া উঠে। প্রত্যেক ধর্ম্মেই দুইটি বিষয় স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছে। প্রথমটি এই যে, ধর্ম্মের বস্তু অলৌকিক অর্থাৎ ধর্ম্ম এমন কতকগুলি বস্তুর আলোচনা করে, যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। আদিযুগে মানুষ বিশ্বাস করিতে পারিত যে, ভগবান সশরীরে আবির্ভূত হইয়া ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। কিন্তু সভ্য-সমাজে এ বিশ্বাস লোপ পাইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ভগবানের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের মত আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কোন শিক্ষিত ব্যক্তিই স্বীকার করিতে রাজী হইবেন না যে, কেহ কোনও কালে ভগবানের ইন্দ্রিয়সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছে। এইরূপ স্বর্গ বলিয়া একটি সুরম্য স্থান—যেখানে কল্পবৃক্ষ হইতে ইচ্ছামত খাদ্যদ্রব্যের সংস্থান হয়, অপ্সরার নৃত্যগীতে চক্ষুকর্ণ পরিতৃপ্ত হয়, যেখানে জরামৃত্যুর অধিকার নাই এবং নিরবচ্ছিন্ন ভগবৎসান্নিধ্য আত্মাকে আনন্দরসে ডুবাইয়া রাখে, এইরূপ লোভনীয় আবাস কোথাও আছে কি না, তৎসম্বন্ধে বর্ত্তমান যুগে ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে পূতিগন্ধময় ভয়াবহ, অন্ধকার আচ্ছন্ন পাপী জীবের পীড়াদায়ক নরকভূমি সম্বন্ধেও লোক সন্দেহ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। দেশ ও কাল এই মরজগতের বাহিরেও বিস্তৃত আছে কি না, এ প্রশ্নের সমাধান না হইলে স্বর্গনরক সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা সমর্থন বা নিরাকরণ করা সম্ভব নহে। উপনিষদ্‌কার বহু পূর্ব্বেই স্বর্গ-নরক হইতে আত্মার মুক্তিকে বিভিন্ন করিয়াছেন এবং যদিও সাময়িক পুরস্কার বা তিরস্কাররূপে স্বর্গ-নরকের কল্পনা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, তথাপি ইহাও জানাইতে ত্রুটি করেন নাই যে, আত্মার চরম অবস্থা কোন প্রাকৃতিক স্থান নহে। মুক্তি ও স্বর্গ এক বস্তু নহে বলিয়া দেবতারাও চিরস্থায়ী নহেন এবং পুণ্যকর্ম্ম করিয়া যে স্বর্গে যাওয়া যায়, তাহাও নশ্বর। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়া ধর্ম্ম যে ছবি গড়িয়া তোলে, দর্শন সকল সময়ে তাহার সমর্থন করে না।

দর্শনের সহিত ধর্ম্মের দ্বিতীয় অনৈক্য জ্ঞানের পরিসর লইয়া। সকল ধর্ম্মেই শ্রদ্ধাকে অধ্যাত্ম-জীবনের অঙ্গহিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, যেখানে জ্ঞানের গতি ক্ষুণ্ণ হয়, সেখানে শ্রদ্ধার দ্বার অবারিত। যাহা প্রত্যক্ষ বস্তু, তাহার প্রমাণ শ্রদ্ধার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু যাহা অপ্রত্যক্ষ ও অলৌকিক, তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে গেলে প্রথমেই মানিয়া লইতে হয় যে, সাধারণ লোকের জ্ঞান সীমাবিশিষ্ট বটে, কিন্তু এমন লোকও আছেন, যাঁহারা সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত এবং যাঁহাদের দৃষ্টি অপ্রত্যক্ষ বস্তুরও সন্ধান পায়। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে, সাধারণ

লোকদিগের মধ্যেও বুদ্ধির তারতম্য আছে। সুতরাং সাধারণ বুদ্ধির যাহা অগম্য, তাহা কয়েক-জন বিশিষ্ট ব্যক্তির জ্ঞানের সীমার মধ্যে আসিয়া পড়িবে, ইহাতে সন্দেহ করার কি আছে? ধর্ম্মের দাবী এই যে, লোকোত্তর বিষয় কোন কোন মনীষীর জ্ঞানের নিকট উদ্ভাসিত হইয়া থাকে এবং যাঁহাদের সে জ্ঞান নাই, তাঁহারা এই সকল বিষয় শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিলে তাহা অযৌক্তিক হয় না। পক্ষান্তরে দর্শনকার তর্ক করেন যে, সমজাতীয় জ্ঞান সম্বন্ধে তারতম্য স্বীকার করিলেও বিসমজাতীয় বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানের অনৈক্য স্বীকার করা হয় না। একজন অন্যজন অপেক্ষা অধিক জানিতে পারেন, কিন্তু তাহা বলিয়া যাহা একজনের অজ্ঞেয়, তাহা অন্যজনের জ্ঞেয় হইতে পারে না। ধর্ম্ম ও দর্শনের এই বিবাদের সামঞ্জস্য হইতে পারে, যদি আমরা নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করিতে পারি যে, অতীন্দ্রিয় বস্তুর উপলব্ধি একেবারে অসম্ভব নহে। জন্মগত সংস্কার বা স্বকীয় প্রচেষ্টার দ্বারা যদি আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন অতীন্দ্রিয় বস্তুর সন্ধান পায়, তাহা হইলে ধর্ম্ম ও দর্শনের বিবাদ বন্ধ হইবে। কিন্তু আমরা যদি মনে করি যে, ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ ও তৎপ্রতিষ্ঠিত অনুমান ব্যতীত জ্ঞানের অন্য দ্বার নাই, তাহা হইলে বেদান্তদর্শনের অপরোক্ষানুভূতি বা বৈষ্ণবদর্শনের ভক্তি প্রভৃতি তর্কাতীত জ্ঞানের কোন স্থান থাকে না। ভারতীয় দর্শন সাধারণতঃ অতীন্দ্রিয় জ্ঞানকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কি বৌদ্ধ, কি জৈন, কি হিন্দু সকল ধর্ম্মই অসামান্য পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, সে সকল মহাপুরুষ স্বীয় প্রতিভার দ্বারা জগতের নিগূঢ় তত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহাদের প্রচারিত মতবাদ জনসাধারণের শ্রদ্ধার বস্তু এবং সর্ব্বথা গ্রহণীয়। যে, যে বিষয়ের পারদর্শী, জনসাধারণ সেই বিষয়ে তাহার মতের অনুবর্ত্তন করে, সুতরাং মহর্ষিদিগের প্রদর্শিত পথও অনুবর্ত্তন করা সকলের কর্ত্তব্য। এই যুক্তির বিরুদ্ধে দার্শনিকের উত্তর এই যে, সত্যের স্বরূপ যদি এক হয়, তাহা হইলে বিরুদ্ধ ধর্ম্ম আসে কোথা হইতে? অথচ দেখা যায় যে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত, এবং তদ্বিষয়ক বস্তু তর্কাতীত বলিয়া কেহই অন্যের মত গ্রহণ করিতে চাহেন না। তবে কি আমরা মানিয়া লইব যে, প্রকৃতিহিসাবে মানুষের বুদ্ধিও বিভিন্ন হয়, এবং যে বিশ্বাস একের কাছে সহজ, তাহা অন্যের কাছে দুরধিগম্য? ভারতীয় দর্শনে প্রকৃতিবৈষম্য স্বীকৃত হইলেও, ইহা স্বীকার করা হয় নাই যে, ধর্ম্ম বিষয়ক আলোচনা বা তর্ক একেবারে নিষিদ্ধ। ভারতীয় দর্শনের সাধারণ বিশ্বাস এই যে, জ্ঞানের উৎকর্ষের সহিত ধর্ম্মেরও স্বরূপ পরিবর্ত্তিত হয় এবং এই জন্য অধিকারিভেদে অধ্যাত্মবিদ্যা পৃথক হইয়া থাকে। যেমন শ্রদ্ধা না থাকিলে জ্ঞান আহরণ করিতে বিলম্ব হয়, সেইরূপ আহৃত জ্ঞান শ্রদ্ধার প্রকারকে ভিন্ন করিয়া তোলে। ব্যক্তিগত বা সমাজগত জীবনে জ্ঞান প্রসার লাভ করিলে বহু পুরাতন সংস্কার ও শ্রদ্ধা লোপ পায়।

আধ্যাত্মিক জীবনের সহিত সংযোগসূত্র যাহাতে ছিন্ন না হয়, এই জন্য ভারতীয় দর্শন তর্কশাস্ত্রকে বিশেষ সুনজরে দেখেন নাই। মনুসংহিতায় বেদনিন্দক তার্কিককে সাধুসমাজ বহিষ্কৃত করিয়া দিবার ব্যবস্থা আছে। বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনকে আস্তিক্যবাদের বিরোধী বলা হয়, কারণ তাহারা বেদ ও বেদপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম ও সমাজের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছে। যে দিন বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতীত্য-সমুৎপাদকে অবলম্বন করিয়া জাগতিক ঘটনা বুঝিতে চেষ্টা করিলেন, তাহা ভারতীয় দর্শনের এক স্মরণীয় দিন। প্রত্যেক কার্য্যের কারণ আছে এবং মানবের বুদ্ধি কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ বুঝিলেই তৃপ্ত হয়, এই বাণী যেদিন প্রচারিত হইল, সেইদিন দুর্জ্ঞেয় ও অজ্ঞেয় কারণবস্তুর অনুসন্ধান অনাবশ্যক হইয়া

দাঁড়াইল। অপ্রাকৃত বা অলৌকিক জগতে কিরূপ ঘটনা ঘটে, তাহা অপেক্ষা এই পরিদৃশ্যমান জগতে প্রকৃতি ও সমাজ কিরূপে গড়িয়া উঠে, তাহার সন্ধান দর্শনের প্রধান অঙ্গ হইয়া উঠিল। বুদ্ধ অলৌকিক বিষয়ের তর্ক উঠিলে যে তূষ্ণীভাব অবলম্বন করিতেন, তাহার কারণ এই যে, তিনি অতীন্দ্রিয় বস্তুর আলোচনা নিরর্থক মনে করিতেন। তাঁহার শিক্ষার ফলে চিরপ্রচলিত অনেক ধর্ম্মবিশ্বাস ও সামাজিক প্রথা শিথিল হইয়া গেল এবং পারলৌকিক বস্তু অপেক্ষা ইহলৌকিক বিষয়ে সমাজ অবহিত হইয়া উঠিল। সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ ও সামাজিক পরিস্থিতির নৈতিকমূলের সন্ধান বৌদ্ধ-দর্শন যে নিপুণভাবে করিয়াছেন, তাহা আজও বিস্ময় উৎপাদন করে। ধর্ম্মকে স্বর্গ হইতে ভূতলে নামাইবার কৃতিত্ব বৌদ্ধধর্ম্ম ন্যায্যতঃ দাবী করিতে পারেন। পরবর্ত্তী যুগের বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম অনেক অলৌকিক বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন সত্য। কিন্তু তাঁহারা দর্শনকে ধর্ম্মের উপরে স্থান দিয়া যে নির্ভীকতা দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা অস্মদ্দেশের প্রাচীনযুগে অতি বিরল। অতীন্দ্রিয় প্রত্যাদেশ স্বীকার না করিলেও নৈতিক জীবন যে মুক্তির উপর প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব, ইহা বৌদ্ধধর্ম্ম জগতে প্রথম দেখাইয়াছেন। নীতি ও ধর্ম্মের পরস্পর সম্বন্ধ বহুশাস্ত্রে আলোচিত হইয়াছে, কিন্তু নীতিবাদকে ধর্ম্ম করিয়া তোলার যশঃ বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মেরই প্রাপ্য।

হিন্দুদর্শনেও যে কার্য্যকারণবাদের উপর দর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা হয় নাই, তাহা নহে। বৌদ্ধদর্শন যখন প্রতীত্যসমুৎপাদের ভিত্তির উপর দর্শনকে দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন, হিন্দু দর্শনেও তখন কর্ম্মবাদের উপর প্রাকৃতিক ও সামাজিক ঘটনা প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা চলিতে-ছিল। ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবনে যে পার্থক্য দৃষ্ট হয়, যদি ভগবানের ইচ্ছা তাহার একমাত্র কারণ হয়, তাহা হইলে ভগবানের উপর পক্ষপাতিত্ব-দোষ আসিয়া পড়ে। আমরা যদি নিজ নিজ কর্ম্ম-ফলে এই পার্থক্য অনুভব করি, তাহা হইলেই ভগবানের দায়িত্ব চলিয়া যায়। কিন্তু ইহাতে প্রাথমিক অনৈক্যের কোন সমাধান হয় না বলিয়া হিন্দু-দর্শনকে মানিয়া লইতে হইয়াছে, কর্ম্মপ্রবাহ অনাদি। ভগবান যে কোনও কালে কতকগুলি বিভিন্ন প্রকৃতির জীব সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা নহে, প্রত্যেক জীবাত্মা অজ, নিত্য ও শাশ্বত। যুগযুগান্তে জীব স্বকীয় কর্ম্মফলে বিভিন্ন দেহ ধারণ করিতেছে এবং পাপপুণ্যের অনুপাতে ঊর্দ্ধগতি ও অধোগতি লাভ করিতেছে। আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত প্রাণিজগৎ কর্ম্মের ফলে উন্নত ও অবনত হইতেছে। এই অনন্ত গমনাগমনের পথে প্রলয় সাময়িক বিশ্রাম দিতেছে সত্য, কিন্তু নূতন সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই আবার পূর্ব্ব-কর্ম্মার্জ্জিত জীবনগতি আরম্ভ হইতেছে। যতদিন না আত্মজ্ঞান লাভ হয়, ততদিন এ গতির আর বিরাম নাই। যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া মুক্তি লাভ করেন, তিনি আর ফিরিয়া আসেন না। বৌদ্ধদর্শনে যেরূপ উদ্বুদ্ধ আত্মা সম্বন্ধে বলা হয় যে, তাহা নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ হিন্দুদর্শনে আত্মজ্ঞ জীবকে বলা হয় যে, তিনি মুক্তিলাভ করিয়াছেন। কিন্তু বৌদ্ধ ও হিন্দুদর্শনে এবিষয়ে দুইটি পার্থক্য লক্ষিত হয়। বৌদ্ধধর্ম্ম এই কর্ম্মপ্রবাহে ভগবানের কোন স্থান রাখেন নাই এবং কর্ম্মভোগ করিতে গেলে যে আত্মা অভিন্ন থাকা আবশ্যক, ইহাও বিশ্বাস করেন নাই। হিন্দুদর্শন বৌদ্ধমতের বিপক্ষে এই যুক্তির অবতারণা করেন যে, যে আত্মা কর্ম্ম করে, সেই আত্মাই যদি ফলভোগী না হয়, তাহা হইলে একের পাপে অন্যের প্রায়শ্চিত্ত ঘটে, এবং কোনও সুকৃত অর্জ্জন না করিয়া এক জীব অন্য জীবের প্রাক্তনপুণ্যের ফলভাগী হয়। ইহাতে কৃতপ্রণাশ অর্থাৎ কাজ করিয়া তাহার ফলভোগ না করা এবং অকৃতাভ্যুপগম অর্থাৎ কাজ না

করিয়া তাহার ফলভোগ করা এই উভয় দোষই ঘটে। যে আত্মা কর্ম্ম করে, সেই আত্মাই ফলভোগ করে, ইহা মানিয়া লইলে আর এই দুইটি দোষ ঘটে না। কিন্তু তাহা মানিতে গেলে আত্মার অমরত্ব স্বীকার করিতে হয়। হিন্দুমতের বিপক্ষে যুক্তি করা যায় যে, যদি মানুষ কর্ম্মজনিত ফলভোগ করে, তাহা হইলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনাবশ্যক হয়। যদি জীব স্বকীয় প্রাক্তনকর্ম্মের ফল ইহজন্মে ভোগ করে, এবং ইহজন্মসঞ্চিত কর্ম্মের ফল পরজন্মে ভোগ করিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করিবার প্রয়োজনীয়তা কোথায়? সময়ে সময়ে সংসারক্লান্ত জীবকে বিশ্রাম দিবার জন্য প্রলয় সৃষ্টি করা এবং কর্ম্মোপযোগী দেহে দেহে জীবকে অনুপ্রবিষ্ট করা যদি ভগবানের একমাত্র ক্রিয়া হয়, জীব কেন এরূপ ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিবে এবং তাঁহাকে ভক্তি করিবে? আমরা যখন বিপদে পড়িয়া ভগবানের শরণাগত হই, তখন আমরা বিশ্বাস করি যে, তিনি আমাদিগকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ। কিন্তু যদি বিপদ পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মের ফলে ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে সে বিপদ হইতে মুক্ত করিবার ক্ষমতা ভগবানেরও নাই। অর্থাৎ, যদি কর্ম্মবাদ সত্য হয়, ভগবান আমাদিগকে সাহায্য করিতে অসমর্থ। আর যদি ভগবান ভক্তকে সত্য সত্যই বিপদ হইতে উদ্ধার করেন, তাহা হইলে কর্ম্মফলের যে ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে, তাহা মানিতেই হয়। যে ধর্ম্মে ঈশ্বরকে সর্ব্বশক্তিমান বলা হয়, সেখানে জীবের কর্ম্ম ভগবানের কর্ত্তৃত্বের অন্তরায় হইয়া উঠে না এবং তাঁহার নিগ্রহানুগ্রহের ক্ষমতা কোনরূপে সীমাবদ্ধ করা হয় না। কাজেই সে ধর্ম্মে প্রার্থনা, প্রপত্তি, শরণাগতি ইত্যাদির সার্থকতা আছে। কিন্তু যে ধর্ম্ম কর্ম্মের প্রাধান্য স্বীকার করে অথচ সেই সঙ্গে ভগবানের কর্ত্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে চায়, সে ধর্ম্মকে যুক্তি খুঁজিতে বিশেষ বিব্রত হইতে হয়।

আরও একটী দৃষ্টান্ত দেই। যদি জীব নিজ নিজ কর্ম্মের ফলভোগ করে, তাহার আত্মার উন্নতির জন্য অন্যের কি কিছু করা সম্ভব? ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, কর্ম্মবাদ অভ্রান্ত হইলে অন্যের দ্বারা আত্মার সদ্গতি কোনরূপেই সম্ভব নহে। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, যুক্তির বিরুদ্ধ হইলেও জনসাধারণের বিশ্বাস যে অন্যের আত্মার কল্যাণকে উদ্দেশ্য করিয়া যাহা কিছু পুণ্যকর্ম্ম করা যায়, তজ্জনিত সুকৃত মৃতাত্মার উপকারে আসে। শ্রাদ্ধশান্তি, স্নানদান ইত্যাদি কত কর্ম্মই না আমরা পূর্ব্বপুরুষের আত্মার কল্যাণকামনায় করিয়া থাকি। এই সকল ক্রিয়ার মূলে কি এই বিশ্বাস নিহিত নাই যে, সৎকর্ম্ম যাহার দ্বারাই কৃত হউক না কেন, যে আত্মার উদ্দেশ্যে তাহা সাধিত হয়, সেই আত্মাই তাহার ফলভোগ করে? যখন কোন যোগে গঙ্গাস্নান করিয়া আমরা ত্রিকোটীকুলোদ্ধার করি, তখন আমরা কি বিশ্বাস করি না যে, স্নানজনিত পুণ্য অন্য আত্মারও উপকারে আসিবে? কিন্তু যদি বাস্তবিকই এইরূপ স্নানে পূর্ব্বপুরুষেরা মুক্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাদের নিজের জীবনকে সুসংযত ও সুচালিত করার প্রয়োজন কি? নিয়মিত তর্পণ, শ্রাদ্ধ স্নান, দান প্রভৃতি পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে এইরূপ অধস্তনপুরুষ রাখিয়া গেলেই তো চলে? আমরা যে কেবল কর্ম্মবাদকে উপেক্ষা করিয়া পরের আত্মার উদ্ধারের চেষ্টা করি তাহা নহে, কিন্তু সেই চেষ্টার পুনরাবৃত্তি করিয়া নিজের বিশ্বাসেরও ক্ষীণতার পরিচয় দেই। যদি কোন বিশিষ্টযোগে গঙ্গাস্নান করিলে ত্রিকোটীকুলোদ্ধার হয়, লোকে তবে কেন আবার সেই যোগ আসিলে পুনরায় স্নান করিতে ধাবিত হয়? যে কুল একবার উদ্ধার হইয়া গিয়াছে, তাহা তো আর দ্বিতীয়বার স্নানের অপেক্ষা করে না? বস্তুতঃ ব্যাপার দাঁড়াইতেছে যে ইহাদের কোন্‌টিকে আমরা বিশ্বাস করিব, তাহা

আমরা নিজেরাই জানি না। হয় কর্ম্মবাদের আমূল পরিবর্ত্তন আবশ্যক, না হয় এই সকল ক্রিয়াকলাপের সার্থকতা সম্বন্ধে নূতন আলোচনা হওয়া উচিত।

কর্ম্মবাদ সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। আজ দেশে রাজনীতিক্ষেত্রে হিন্দুসমাজে যে বিষম গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার মূলেও আছে এই কর্ম্মবাদ। বেদে চারিবর্ণের উৎপত্তির যে কারণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহাকে উপজীব্য করিয়া যে সামাজিক দর্শন গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহারই ফল আমরা আজ ভোগ করিতেছি। যোগসূত্রকার যখন বলিলেন যে, মানুষের জাতি, আয়ুঃ ও ভোগ প্রাক্তনকর্ম্মের ফলমাত্র এবং যখন ব্যাখ্যাকারেরা বলিলেন যে, পূর্ব্বজন্মের দুষ্কৃতির ফলে জীব কুক্কুর বা চণ্ডাল হইয়া জন্মগ্রহণ করে, তখন তাঁহারা অত ভাবিয়া দেখেন নাই যে, ভবিষ্যতে হিন্দুসমাজ ইহার ফলে দ্বিধাবিভক্ত হইয়া যাইবে। তাঁহারা অবশ্য ইহা বলেন নাই যে উচ্চকুলে জন্ম কোন জীব বিশেষের একমাত্র অধিকার কিংবা উচ্চকুলের সহিত আত্মার সদ্‌গতির কোনও নিয়ত সম্বন্ধ আছে। সংসারচক্রের আবর্ত্তনে এবং কর্ম্মের ফলে জন্মান্তরে উচ্চ নীচ হয় এবং নীচ উচ্চ হয়। স্ব স্ব বর্ণ ও আশ্রম অনুযায়ী কর্ম্ম করিয়া সকলেই আত্মার সদ্‌গতি করিতে পারেন, কিন্তু পূর্ব্বজন্মের দুষ্কৃত যখন এজন্মে নীচবর্ণত্বের ছাপ লাগাইয়া দেয় এবং নানা সদ্‌গুণভূষিত হইয়াও সেই নিকৃষ্টবর্ণ জীব দুষ্কর্ম্মা ব্রাহ্মণাদি বর্ণের ঘৃণ্য হয়, তখনই সমাজে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। প্রত্যক্ষ চারিত্র্য তারতম্যকে উপেক্ষা করিয়া কল্পিত পূর্ব্বজন্মের সুকৃতদুষ্কৃতকে সামাজিক মর্য্যাদার ভিত্তি করিলে, তাহার বিরুদ্ধাচরণ অসম্ভব নহে। যেখানে দর্শন সমাজকে স্পর্শ করে না, সেখানে যাঁহার যাহা ইচ্ছা, তাহা তিনি কল্পনা করিতে পারেন। কিন্তু যে মতবাদের তরঙ্গ সমাজের অঙ্গে আঘাত করে, সেই মতবাদ সুদৃঢ় যুক্তির উপর দাঁড় করাইতে না পারিলে উহা অগ্রাহ্য হইয়া যাইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ধর্ম্মের ভিতর অনেক অলৌকিক বস্তুর অঙ্গীকার করিয়া লওয়া হয়। চাক্ষুষ প্রমাণদ্বারা এই সকল বস্তুর অস্তিত্ব স্থাপিত হয় না। ইহারা মতবাদের উপরই প্রতিষ্ঠিত এবং ধরিয়া লওয়া হয় যে, যাঁহারা এই মতবাদ প্রচার করেন, তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ না হইলেও আমাদিগের অপেক্ষা প্রভূত পরিমাণে অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন। তাঁহাদেরই মতের উপর নির্ভর করিয়া আমরা বর্ণভেদ সমর্থন করি এবং সামাজিক আচার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করি। যদি কোনদিন প্রশ্ন উঠে, তাঁহাদের দৃষ্টি অভ্রান্ত কি না, সেইদিনই সমাজের গঠন নড়িয়া উঠিবে। আর যদি আমরা মনে করি যে, বর্ণবিভাগ এবং কর্ম্মবাদের উপর তাহার ভিত্তি একটি দার্শনিক মতবাদ মাত্র, তাহা হইলে সমাজের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই মতবাদ যুক্তিবাণদ্বারা জর্জ্জরিত হইবে। সামাজিক জীবন যখন প্রাথমিক হইয়া উঠিবে, তখন দর্শন তাহার অনুগামী হইবে, ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তখন দর্শনের দোহাই দিয়া সমাজের স্তর নির্দ্দিষ্ট হইবে না এবং সমাজকে সজ্ঞবদ্ধ করিতে যে দর্শনের প্রয়োজন হইবে, তাহারই অবতারণা অনিবার্য্য হইবে। যে সকল বিশিষ্ট গুণ না থাকিলে বর্ণ ও বংশ একার্থক হইয়া উঠে, সেই সকল গুণ অবর্ত্তমানে কোনও ব্যক্তি বর্ণের দাবী করিতে পারিবেন কি না, তখন সেই প্রশ্নই বিবেচ্য হইবে। তুলনামূলক যুক্তির চক্ষে বর্ণবৈষম্য যে একটি ভৌগোলিক অর্থাৎ বিশিষ্টদেশনিবদ্ধ বিশ্বাসমাত্র, ইহা অস্বীকার করিলে চলিবে না; সুতরাং যাঁহারা বর্ণবিভাগ মানিয়া চলেন, তাঁহাদের প্রমাণ করিতে হইবে যে, এই বিশ্বাসের মূলে যথেষ্ট যুক্তি আছে।

পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে জগতের সকল দর্শনের

সাড়া আজ আমাদের দ্বারে ধ্বনিত হইতেছে। আজ যদি আমরা পরম্পরার দোহাই দিয়া বিশ্বের আহ্বান ও ইঙ্গিতকে উপেক্ষা করি এবং কূপমণ্ডূকের ন্যায় আমাদের ক্ষুদ্র চিন্তারাজ্যের মধ্যে নিবদ্ধ থাকি, তাহা হইলে যে স্বাধীন চিন্তার জন্য ভারত এককালে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল, সে চিন্তা ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবনে কি করিয়া আবার উদ্দীপিত হইবে? ভারতের সাধনা ও সভ্যতার ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আমরা জীবন্দরের আকুল প্রশ্নগুলির যথাযথ সমাধান করিতে যদি তৎপর না হই, তাহা হইলে নিশ্চেষ্টতা ও গতানুগতিকতার জালে আমরা ক্রমশঃ অধিকতর জড়িত হইয়া পড়িব। আজ আমাদের প্রয়োজন ভারতের চিরন্তন ভাবধারার সহিত পরিচিত হওয়া এবং পারিপার্শ্বিক ঘটনার সহিত সংযোগ রাখিয়া, ভারতীয় দর্শনকে দেশ ও কালের উপযোগী করিয়া তোলা। সনাতন হিন্দুধর্ম্ম চিরকালই এক দর্শনের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে নাই। ভগবানের প্রত্যাদেশ বলিয়া কোন মতকে গ্রহণ না করায় ভারতে ভাবুকেরা স্ব স্ব মতপ্রচারে কুণ্ঠা, কার্পণ্য বা কাপুরুষতা কখনও দেখান নাই। বিভিন্নমতের সমাদর ও সমালোচনা ভারতের অস্থিমজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। ভারত যেমন অবাধে আগন্তুক জাতিগুলিকে আপনার বিশাল সমাজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছে, সেইরূপ আভ্যন্তরীণ স্বতন্ত্রমতবাদ-গুলিকেও মর্য্যাদা দান করিয়াছে।

কিন্তু সমাজের শান্তির জন্য পরের মতবাদের আলোচনা হইতে নিরস্ত থাকা সমীচীন হইলেও ব্যক্তিগত জীবনে অমীমাংসিত মতবাহুল্য পোষণ করা মানসিক স্বাস্থ্যের পরিচায়ক নহে। মানুষ পর্য্যায়ক্রমে বিভিন্ন মতে বাস করিতে পারে না। যে আত্মায় মতের আভ্যন্তরিক কলহ চলে, সেখানে চিন্তা ও নীতির শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া যায়। যেমন সুবিন্যস্ত চিন্তা না থাকিলে তর্ক করা চলে না, যেমন বিভিন্ন আদর্শে অনুপ্রাণিত হইলে মনের ঐক্য ও শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া যায়, সেইরূপ যুগপৎ বিভিন্ন মতবাদ অনুবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিলে সমাজে ও স্বীয় জীবনে বিষম বিপ্লব উপস্থিত হয়। আমাদের সকলের পক্ষে সেই দিন আসিয়াছে, যখন ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে সমাজ, নীতি ও ধর্ম্ম কোন দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত করিলে তাহারা সহজে বিচলিত হয় না, তাহার সন্ধান করা। জনসমাজে এই দার্শনিক-তত্ত্ব যদি বহুল প্রচার করিতে হয়, তাহা হইলে বুদ্ধকে অনুকরণ করিয়া আমাদের আবার প্রাদেশিক ভাষার সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, দর্শন অলস মুহূর্ত্তের কল্পনার খেলা নহে—ইহা দৈনন্দিন জীবনের উৎস ও উপাদান।*

---

* কৃষ্ণনগর সাহিত্য-সম্মেলনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অভিভাষণ।

সমালোচনা

আত্মবোধ—শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য প্রণীত, অনুবাদক শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়। ১১৫ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। মূল্য ১৲ এক টাকা।

গ্রন্থখানির অনুবাদক যে অতি সুপণ্ডিত তাহা অনুবাদ পড়িলেই বুঝা যায়। প্রতি শ্লোকে যে সঙ্গতি দেখাইয়াছেন তাহা অতি সুন্দর ও সরল হইয়াছে। একাদশ শ্লোকে পঞ্চীকরণের ও ঊনত্রিংশত্তম শ্লোকে সামানাধিকরণ্যাদি সম্বন্ধত্রয়ের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা অনুবাদকের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। লিপিকর-প্রমাদ না থাকিলে পুস্তকখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত। গ্রন্থারম্ভে সন্নিবিষ্ট "গৃহস্থ-মহর্ষি-সংবাদ" বেশ রসপ্রদ, তবে ভাষা একটু কঠিন। অবতরণিকার প্রশ্নোত্তরগুলি মনোরম ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ। বিষয়সূচী ও দৃষ্টান্তসূচী বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। গ্রন্থখানি সাধারণের ও পণ্ডিতগণের পক্ষে বিশেষ উপকারী হইবে সন্দেহ নাই।

শ্রীসূক্তম্ ও শ্রীশ্রীলক্ষ্মীতত্ত্ব—শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, এম্-এ সঙ্কলিত। শ্রীভূবনেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ।৵০ আনা, ৫৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত।

"শ্রীসূক্তম্" ভাগে শ্রীসূক্তগুলি, এবং তাহার অন্বয় ও অনুবাদ আছে। অন্বয় ও অনুবাদে গ্রন্থকার বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছেন।

"শ্রীশ্রীলক্ষ্মীতত্ত্ব"—এই অংশে পুরাণাদি হইতে কতকগুলি বচন সংগৃহীত করিয়া সেগুলিকে লক্ষ্মীর বিষয়ে লাগাইয়া গ্রন্থকার বিশেষ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। গ্রন্থকারকে অধ্যবসায়ী ও পণ্ডিত বলিয়া আমরা মনে করি।

শ্রীসত্যকিঙ্কর ষটতীর্থ

সংবাদ

বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উৎসব—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উৎসব উপলক্ষে গত ২০শে ফাল্গুন, শুক্রবার, অপরাহ্ণ ৪।৩০ ঘটিকার সময় বেলুড় মঠে এক সভা হইয়াছিল। স্বামী মাধবানন্দ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

স্বামী মাধবানন্দ বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন, ১০২ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের এই বাঙ্গলা দেশে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার পর ৫২ বৎসর অতীত হইয়াছে, এই অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার নাম শুধু বাঙ্গলা দেশ অথবা ভারতবর্ষে নহে, সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। যেখানে ধর্ম্মের জন্য মানুষের মন ব্যাকুল হইয়াছে, যেখানে আসিয়াছে সন্দেহ, সেখানে তাঁহার মহতী বাণী দিয়াছে পথের সন্ধান, মানুষ পাইয়াছে আলোকস্তম্ভের সন্ধান। তাঁহার উপদেশ এবং আদর্শ কেবলমাত্র ভারতবাসীর নহে, সমগ্র বিশ্ববাসীর কল্যাণের পথ দেখাইয়াছে। নানাভাবে, নানাপথ দিয়া যে একই ভগবানকে পাওয়া যায়, নানা ধর্ম্মমত যে একই ভগবানকে লাভ করিবার বিভিন্ন উপায়, ঠাকুর জগদ্বাসীকে সেই শিক্ষাই দিয়াছেন।

স্বামী পবিত্রানন্দ বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ভগবানকে অতি দূরে বলিয়া কল্পনা করেন নাই, তিনি নিজ জীবনে দেখাইয়াছেন, ভগবানকে আপনার মত করিয়া পাওয়া সম্ভব।

শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন, আজ যে মহাপুরুষের স্মৃতির

উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি, বাঙ্গলাদেশে—ভারতবর্ষে এমন কি সমগ্র পৃথিবীতে তাঁহার ন্যায় মহাপুরুষ অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। মনুষ্য-সভ্যতার ইতিহাসে যে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির চিন্তা ও সাধনা আমাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, যাঁহাদের আদর্শ ও বাণী মনুষ্যজাতি অনুসরণ করিতেছে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাঁহাদের অন্যতম।

আমার পূর্ব্ববর্ত্তী এক বক্তা এইমাত্র বলিয়াছেন যে, আধুনিক যুগে সমগ্র বিশ্বে ভগবানের বিরুদ্ধে প্রচার করা হইতেছে। ভগবানের বিরুদ্ধে প্রচার প্রাচীন যুগেও হইয়া গিয়াছে। ভগবানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রচার করিয়াই বৌদ্ধধর্ম্ম ও জৈনধর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছিল। সুতরাং পাকাপাকি দুইটী চিন্তাধারা সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে মানব মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছে। একটী হইতেছে ভগবানের নাম লইয়া—তাঁহার আরাধনা লইয়া এবং দ্বিতীয়টী হইতেছে ভগবানকে অস্বীকার করিয়া, ভগবানের অস্তিত্বকে বিশ্বাস না করিয়া। এই দুই চিন্তাধারাই মানব-ইতিহাসের গোড়ার কথা।

যুগ যুগ ধরিয়া যে সকল সমস্যা মানবের যাত্রাপথে দেখা দিয়াছে, আজিও তাহাদের কোনটীর মীমাংসা হয় নাই। ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে মানুষের মনে যে রকম লোভ, ঈর্ষা, ভয় ও বিদ্বেষ ছিল, আজ পর্য্যন্তও তাহা আছে। এখনও মানব তাহা হইতে বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। অতীতকালের মানুষের জীবন-সমস্যার এইদিকগুলির কতটুকুই বা আজ আমরা সমাধান করিতে পারিয়াছি? যাঁহারা চিন্তাশীল, যাঁহারা মানব-জীবনের এই সকল সমস্যার কথা ভাবেন, তাঁহারা সময় সময় মনে করেন মনুষ্য জাতির ভবিষ্যৎ কি? এই যে মানুষ কত অসাধ্য সাধন করিতেছে কিন্তু তবুও কত দুর্ব্বল, কত অসহায় তাহারা। এই রকম অসহায় অবস্থা কোন না কোন সময়ে ব্যক্তির জীবনে, জাতির জীবনে আত্যন্তিক হইয়া দেখা দেয়। সেই সময় সেই অসহায় অবস্থা হইতে বাঁচিবার জন্য, উদ্ধারলাভের জন্য যাঁহারা পথের নির্দ্দেশ দিতে পারেন, তাঁহারাই মহাপুরুষ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। দিবাশেষে দুরন্ত বালক যেমন শ্রান্ত, ক্লান্ত হইয়া জননীর অঞ্চলতলে বিশ্রাম ও শান্তিলাভের জন্য আশ্রয় লয়, সেই রকম ব্যক্তি ও জাতি যখন নিতান্ত আর্ত্ত হইয়া পড়ে, দুঃস্থ হইয়া পড়ে, তখন তাহারা শান্তিলাভের আশায় মহাপুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করে। জাতির সেই রকম এক দারুণ দুর্দ্দিনে ও দুঃসময়ে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব হইয়াছিল এবং তাহারপর হইতে আমরা চিন্তাজগতে দাঁড়াইবার ভিত্তি খুঁজিয়া পাইয়াছি। আজ তাঁহার নাম সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত। ইহার কারণ কি? কারণ, তাঁহার জীবন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সাধনাদ্বারা লব্ধ তাঁহার উপদেশ, তাঁহার বাণী নানা বিচিত্র ভাবধারার মধ্য দিয়া আমাদের ব্যক্তির জীবনে, জাতির জীবনে প্রবেশ করিতেছে। শতবর্ষ পূর্ব্বে বাঙ্গলা দেশে ধর্ম্মদ্বন্দ্ব অতি কুৎসিত আকারে দেখা দিয়াছিল। সেই জঘন্য আবহাওয়া হইতে মুক্ত হইয়া আমরা উদার হইয়াছি, সহিষ্ণু হইয়াছি, পরধর্ম্মমতকে শ্রদ্ধা করিতে শিক্ষা করিয়াছি। এই মানসিক উদারতা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট হইতে আমরা পাইয়াছি। বাঙ্গলাদেশে বাঙ্গালীজীবন ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের সঙ্কীর্ণতার গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল—এই রকম জীবন যাপনে আমরা অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেরণায় স্বামী বিবেকানন্দ যে নূতন সেবাধর্ম্ম ও কর্ম্মজীবনের যে নূতন ধারা আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন, তাহাতে আমাদের ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবন

প্রসারিত হইল, তখন আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, গোষ্ঠীগত জীবন আমাদের আদর্শ নয়। তাই অনেকে ব্যক্তিগত সুখ, আয়াস, আরাম তুচ্ছ করিয়া, এমন কি ভগবান লাভের আশা ত্যাগ করিয়া বহুজন-কল্যাণের জন্য আত্ম নিয়োগ করিয়াছেন। এই যে নূতন যুগ, নূতন আদর্শ ও নূতন চিন্তাধারা লইয়া আমাদের সম্মুখে দেখা দিয়াছে—তাহার সবে মাত্র সূচনা হইয়াছে। আমরা ধন্য যে, আমরা এই যুগ পরিবর্ত্তনের মুখে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমরা আরও ধন্য যে, আমরা দিশাহারা হইয়া পড়ি নাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আদর্শ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমাদের প্রেরণা দিতেছে ও আমাদের জাতীয় জীবনে অগ্রগতির সঞ্চার করিতেছে। আমরা মানব-জীবনের উজ্জ্বল ভবিষ্যতে বিশ্বাসী। আমাদের যতটুকু দিবার, যতটুকু করিবার, তাহা সাধ্যানুযায়ী করিব এবং অন্তরে এই আশা পোষণ করিয়াই আমরা মরণের পথে যাত্রা করিব যে, আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ সুষ্ঠুভাবে, শক্তির সহিত, বীর্য্যের সহিত জাতীয় কল্যাণ সাধনে আত্ম-নিয়োগ করিবে।

স্বামী শ্রীবাসানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেন, বাঙ্গলা দেশের এক অখ্যাত স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া অতি সামান্য অবস্থায় জীবন-যাপন করিয়া তিনি এমন এক আদর্শ বিশ্বের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন, যাহার ফলে তিনি চিরকাল অমর হইয়া থাকিবেন।

স্বামী গম্ভীরানন্দ বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন সমগ্র পৃথিবীর মানব-মনের মধ্যে এক নূতন ভাবধারার সঞ্চার করিতে, নূতন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিতে।

বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব—শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ১০৩তম জন্মোৎসব উপলক্ষে গত ২২শে ফাল্গুন, রবিবার, বেলুড় মঠে সারাদিনব্যাপী উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে দুই লক্ষের উপর জনসমাগম হইয়াছিল এবং ত্রিশ হাজার ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছেন।

ভোর হইতেই দলে দলে নরনারী বিভিন্ন যান-বাহনের সাহায্যে বেলুড় মঠে সমবেত হইতে থাকেন। যাতায়াতের জন্য আহিরীটোলা হইতে মঠের ঘাট পর্য্যন্ত ষ্টীমারের ব্যবস্থা ছিল। ইহা ব্যতীত, বহু নৌকা এবং হাওড়া হইতে ২।৩ মিনিট অন্তর বাসের ব্যবস্থাও ছিল। বহুলোক মটর ও সাইকেল যোগেও মঠে আসিয়াছিলেন। নৌকাদি ডুবিয়া কোন দুর্ঘটনা হইতে পারে ভাবিয়া প্রায় ৩০জন স্বেচ্ছাসেবক ভোর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত গঙ্গায় নৌকা সহ তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলেন।

মঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নবনির্ম্মিত মন্দিরটী পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। মন্দিরের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মর্ম্মরমূর্ত্তি পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। মন্দিরের ভিতর ধূপ-ধুনা ও গন্ধপুষ্পের সুগন্ধে আমোদিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। মন্দিরের অভ্যন্তরে একদিকে পুরুষ ও অপরদিকে মহিলাদের যাতায়াত ও বসিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট করায় এত ভিড়ের মধ্যেও দর্শনের কোন বাধা হয় নাই।

মন্দিরের সম্মুখে অন্যান্য বৎসরের মত এবারও একটী বিরাট মণ্ডপ তৈয়ারী করা হইয়াছিল; তন্মধ্যে লতাপাতা দিয়া ভারতবর্ষের একটী বিরাট মানচিত্র প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্যস্থলে শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণের একটী সুবৃহৎ তৈলচিত্র পত্রপুষ্পদ্বারা অতি মনোরমভাবে সজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। সকাল হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজাদির অনুষ্ঠান হয়।

এতদ্ভিন্ন স্বামীজির মন্দির, স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের মন্দির, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর মন্দির পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের মণ্ডপের সম্মুখে ও অন্যান্য স্থানে চাঁদোয়ার নিম্নে আন্দুলের কালী-কীর্ত্তন, সিদ্ধেশ্বরী কালীকীর্ত্তন, ইটালীর হরি-কীর্ত্তন প্রভৃতি ১০।১২টী কীর্ত্তন দল ও কনসার্ট পার্টি সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সুন্দর কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই সকল স্থানে বহু নরনারী সমবেত হইয়া কীর্ত্তন শ্রবণ করেন।

ভলান্টিয়ার কোরের স্বেচ্ছাসেবকগণ প্রাথমিক চিকিৎসার কাজ করেন। ভিড়ের চাপে কয়েকজন স্ত্রীলোক, শিশু এবং বৃদ্ধ অল্প আহত হইয়াছিলেন। এইরূপ প্রায় ৪০টী নরনারী ও শিশুকে প্রাথমিক চিকিৎসা করান হয়।

কলিকাতা ও সহরতলীর বিভিন্ন স্থানের ৪০টী প্রতিষ্ঠানের প্রায় ১৩শত স্বেচ্ছাসেবক বেলুড়ে সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিয়া

সমাগত ভক্ত নরনারীবৃন্দের সেবা শুশ্রূষা ও সুখ-সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখেন। প্রায় ৩৫টী বালক বালিকা ও বৃদ্ধা তাহাদের সঙ্গী ছাড়া হইয়া পড়ে। তাহাদিগকে নিরাপদ স্থানে রাখিয়া তাহাদের সঙ্গীদের খুঁজিয়া বাহির করা হয়। যাত্রীদের যাহাতে অসুবিধা না হয় তজ্জন্য তাঁহাদের জুতা, ছাতা ও সাইকেল নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিবার ভার গ্রহণ ও পুনরায় ঐগুলি ফিরাইয়া দিবার বন্দোবস্ত হইয়াছিল। এই বিভাগে প্রায় ৩০জন স্বেচ্ছাসেবক কাজ করেন।

উৎসব উপলক্ষে এ বৎসরও স্বদেশী শিল্প-প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। মঠের নির্দ্দিষ্ট স্থানে বাঙ্গলা ও বাঙ্গলার বাহির হইতে আগত স্বদেশজাত কাপড়, জামা, খেলনা, পুতুল, নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রভৃতি বিভিন্ন শিল্পের প্রায় ১০০টী দোকান খোলা হয়। আগ্রার দয়ালবাগ কলোনী হইতে ঝরণা কলম, ছুরি প্রভৃতি নানাবিধ স্বদেশী শিল্পের ও বিবেকানন্দ শিল্পি-সঙ্ঘ, রামকৃষ্ণ মিশন শিল্প-বিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের ষ্টলগুলি উল্লেখযোগ্য। প্রদর্শনীতে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পুস্তক ও ছবি ইত্যাদিও ছিল। নানাপ্রকার খাদ্যাদির দোকান থাকায় সমাগত যাত্রীদের বিশেষ কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। সন্ধ্যায় নানা-প্রকার সুদৃশ্য আতসবাজী পোড়ান হইয়াছিল।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সাধু সন্ন্যাসী ও অসংখ্য ভক্ত নরনারীর আগমনে এবারকার উৎসব বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

বিবেকানন্দ আশ্রম, শ্যামলাতাল, আলমোড়া—গত ৪ঠা মার্চ্চ, শুক্রবার, আলমোড়া জেলাস্থ শ্যামলাতাল বিবেকানন্দ আশ্রমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। এই আশ্রমটী সুদূর হিমালয়ের ক্রোড়ে সমুদ্র হইতে ৫,৫০০ ফিট্ উচ্চে অবস্থিত এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে অনুপম। প্রাতঃকাল হইতে দূর দূর স্থান হইতে দলে দলে নরনারী আশ্রম প্রাঙ্গণে সমবেত হইতে থাকেন। এক সুবৃহৎ মণ্ডপে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, বুদ্ধদেব, আচার্য্য শঙ্কর ও অনেক দেবদেবীর প্রতিকৃতি হিমালয়জাত নানা রঙ্গের প্রচুর পত্র পুষ্পাদি দ্বারা সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। পূর্ব্বাহ্ণে নানাপ্রকার ভজনাদি ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও উপদেশ পাঠ করা হয়।

অপরাহ্ণে স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতায় এক বিরাট সভা আহূত হয়। স্বামী অমোহানন্দ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সঙ্গীতাদির পর সভাপতি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি দিবসের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। স্বামী অপূর্ব্বানন্দ ওজঃস্বিনী ভাষায় "শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও সেবাধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রসঙ্গে সংক্ষেপে ভারত ও ভারতেতর দেশে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কার্য্যাবলী আলোচনা করেন এবং তৎসম্পর্কে শ্যামলাতাল সেবাশ্রমের বিগত ২৪ বৎসরের সেবাকার্য্যের উল্লেখ করেন। উপস্থিত ভদ্রলোকদের মধ্যেও কয়েকজন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলৌকিক জীবন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। আশ্রমের সভাপতি ও প্রতিষ্ঠাতা স্বামী বিরজানন্দ মহারাজকে ধন্যবাদ দেওয়ার পর সভার কার্য্য শেষ হয়।

অতঃপর সমবেত আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করান হয়। ভোজন ও সঙ্গীতাদি রাত্রি পর্য্যন্ত চলিয়া ছিল।

শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ

মহাসমাধি—২৫শে এপ্রিল, ১৯৩৮

মহাসমাধি

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ গত ২৫শে এপ্রিল সোমবার অপরাহ্ণ ৩-২০ মিনিটের সময় এলাহাবাদ মুঠিগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে ৭০ বৎসর বয়সে মহা-সমাধি লাভ করিয়াছেন।

গত ৮ই মার্চ্চ তিনি বেলুড় মঠ হইতে এলাহা-বাদে যান। সেখানে যাওয়ার পরই তাঁহার শরীর ক্রমেই অধিকতর খারাপ হইতে থাকে। মঠের সন্ন্যাসিগণ ও তাঁহার অনুরাগী ভক্তমণ্ডলী তাঁহার চিকিৎসার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হন নাই। তিনি কোন প্রকার চিকিৎসা করাইতে সম্মত ছিলেন না। আপনার দেহের প্রতিও তাঁহার কিছুমাত্র দৃষ্টি ছিল না। সকল বিষয়েই তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্পূর্ণ শরণাগত হইয়া তাঁহার ইচ্ছার নিকট আপন ইচ্ছা উৎসর্গ করিয়াছিলেন। কয়েক মাস তিনি বেরীবেরী রোগে ভুগিয়া ছিলেন। শেষদিকে তাঁহার উদরীর লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং তাহাতেই তাঁহার হৃদ্‌যন্ত্র আক্রান্ত হইয়া দেহত্যাগ হয়। দেহত্যাগের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার সম্পূর্ণ জ্ঞান ছিল। তাঁহার দেহাবসানের সময় স্বামী শর্ব্বানন্দ, স্বামী অমৃতেশ্বরানন্দ, স্বামী ওঙ্কারানন্দ, স্বামী রঘুবরানন্দ প্রমুখ বেলুড় মঠের সন্ন্যাসিবৃন্দ ও বহু ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার নশ্বর দেহ শোভাযাত্রা সহকারে পুণ্যক্ষেত্র ত্রিবেণী-সঙ্গমে নীত হইয়া একটী প্রস্তর নির্ম্মিত সুদৃশ্য শবাধারে পুষ্পাদি দ্বারা সজ্জিত করিয়া সলিল-সমাধি দেওয়া হয়।

১৮৬৮ সালের ২৮শে অক্টোবর তিনি চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত বেলঘরিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। পাঠ্যাবস্থায় ১৮৮৩ সালে

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তদবধি তিনি তাঁহার বন্ধু শশী ও শরতের (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, স্বামী সারদানন্দ) সহিত প্রায়ই দক্ষিণেশ্বর যাইতেন।

তিনি পুণা হইতে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করিয়া যুক্তপ্রদেশে ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ারের পদ গ্রহণ করেন। সেই সময় তাঁহার অন্তরে তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হয় এবং তিনি চিরতরে সংসার পরিত্যাগ করিয়া ১৮৯৬ সালের শেষভাগে আলমবাজার মঠে যোগদান করেন।

পূজনীয় স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ মঠে যোগদানের প্রথম হইতে মঠের গৃহাদি নির্ম্মাণ-কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। স্বামীজি শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দির নির্ম্মাণ করিবার সঙ্কল্প করিয়া স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীকে বিস্তারিত নির্দ্দেশ দান করেন। তদানীন্তন বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার মিঃ গাইথারের সহিত পরামর্শ করিয়া স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মন্দিরের একটী নক্‌সা প্রস্তুত করিলে স্বামীজি উহা অনুমোদন করেন। এই নক্‌সার উপর ভিত্তি করিয়াই বেলুড় মঠের বর্ত্তমান বৃহৎ মন্দিরটী নির্ম্মিত হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তৃতীয় অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজের দেহত্যাগের পর ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাসে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ উক্ত পদে প্রতিষ্ঠিত হন। গত মকর সংক্রান্তি দিবসে তিনি বেলুড় মঠের নব-নির্ম্মিত মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকার্য্য সুসম্পন্ন করেন।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ এলাহাবাদের মুঠিগঞ্জ নামক স্থানে একটী বাটী ক্রয় করিয়া সেখানে মঠ ও সঙ্গে সঙ্গে সেবাশ্রম স্থাপন করেন। তিনি 'জল সরবরাহের কারখানা,' 'ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা' প্রভৃতি বাঙ্গালা পুস্তক প্রণয়ন এবং 'সূর্য্যসিদ্ধান্ত' বাঙ্গালাতে ও 'দেবী ভাগবত' ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কয়েকবৎসর যাবৎ তিনি বাল্মীকি রামায়ণের ইংরাজী অনুবাদ কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। ইহার কয়েক খণ্ড মুদ্রিত হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ লীলাসহচরগণের প্রায় সকলেই একে একে চলিয়া গিয়াছেন। এই অবস্থায় তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তদের শান্তি ও আধ্যাত্মিক প্রেরণা লাভের প্রধান আশ্রয়স্থল ছিলেন। তাঁহার শূন্য স্থান কখনও পূর্ণ হইবার নহে। এই মহাপুরুষের পবিত্র জীবন, জ্বলন্ত বৈরাগ্য, তিতিক্ষা এবং অসাধারণ আধ্যাত্মিকতা আমাদের জীবনকে অনুপ্রাণিত করুক, ইহাই প্রার্থনা।

শিখ-ধর্ম্মের প্রগতি

সম্পাদক

শিখ-ধর্ম্মের অভ্যুদয় ভারতের ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। ধর্ম্মপ্রাণতা, ত্যাগ ও বীরত্বের যে মহিমান্বিত আদর্শ শিখ-গুরুগণ স্থাপন করিয়াছেন, উহা চিরকাল জগতের শ্রদ্ধাদৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গুরুনানক-প্রবর্ত্তিত শিখ-ধর্ম্ম ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রদেশের অধিবাসিগণের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। শিখ-ধর্ম্মাবলম্বিগণের উপর যে অবর্ণনীয় অত্যাচার হইয়াছে, জগতের ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্য্যন্ত শিখগণকে তাঁহাদের ধর্ম্ম ও জীবন রক্ষার জন্য বিরুদ্ধশক্তির সঙ্গে অবিরত সংগ্রাম চালাইতে হইয়াছিল। শিখ-ধর্ম্মের উপর নির্য্যাতন শিখ-জাতিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া ত্যাগ ও বীরত্বের গরিমায় পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় করিয়া রাখিয়াছে। মহাত্মা ভাই মণিসিংহ, ভাই তারুসিংহ প্রমুখ ধর্ম্মবীরগণ শিখ ধর্ম্ম রক্ষার জন্য যে অকথ্য অত্যাচার সহ্য করিয়া তিলে তিলে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন, নররক্তে লিখিত সেই কাহিনী মানুষের পরধর্ম্ম-অসহিষ্ণুতারূপ বর্ব্বরতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। এক হস্তে লৌহনির্ম্মিত "সিমর্ণ" (জপমালা) এবং অপর হস্তে শাণিত কৃপাণ লইয়া অসহায় শিখগণ "সৎ শ্রী আকাল" (ঈশ্বর সত্য) ধ্বনিতে দিঙ্‌মণ্ডল প্রকম্পিত করিয়া অমিত শক্তিশালী অত্যাচারী জিঘাংসু সৈন্যদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া যে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত সেই আখ্যায়িকা অনন্তকাল শিখজাতির অসাধারণ ধর্ম্মবিশ্বাস ও বীরত্বের জয় ঘোষণা করিবে।

দশজন গুরুর প্রচারিত ধর্ম্মমতের সমবায়কে শিখধর্ম্ম বলে। গুরুনানক শিখ-সম্প্রদায়ের প্রথম গুরুরূপে সম্মানিত। সুদীর্ঘ আড়াইশত বৎসর নানাপ্রকার পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে দশম গুরু গুরুগোবিন্দ সিংহের প্রবর্ত্তিত "খালসা" মতবাদদ্বারা শিখধর্ম্ম শেষ আকার প্রাপ্ত হয়। ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে পঞ্চনদ প্রদেশের রাজধানী লাহোর নগরীর নিকট তালোয়ারী (নানক সাহেব) নামক স্থানে গুরুনানক জন্মগ্রহণ করেন। এই মহাপুরুষ ধর্ম্মের আচার অনুষ্ঠানের উপর জোর না দিয়া ভক্তিপথাবলম্বনে একেশ্বরের মাহাত্ম্যকীর্ত্তনমূলে শিখধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম মানুষের সঙ্গে মানুষের এবং স্ত্রীলোকের সঙ্গে পুরুষের কোন পার্থক্য স্বীকার করে না। জীবনের শেষভাগে গুরুগোবিন্দ কর্ত্তারপুর নামক স্থানে যাইয়া কৃষিকার্য্যে জীবিকার্জ্জন করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করেন। মহাত্মা অঙ্গদ শিখ-সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় গুরু। ইনি গুরু নানকের উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন এবং প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মপ্রচার উদ্দেশ্যে গুরু অঙ্গদ 'গুরুমুখী' বর্ণমালা প্রবর্ত্তন করেন। আদর্শ ধর্ম্মজীবন যাপন করার ফলে বৃদ্ধ বয়সে অমরদাস তৃতীয় গুরুর পদে অধিষ্ঠিত হন। ইনি ধনবান দরিদ্র এবং উচ্চ নীচ নির্ব্বিশেষে শিখদের মধ্যে "লঙ্গর" (সাধারণ পাকশালা) প্রবর্ত্তন করেন এবং শিখ সম্প্রদায় হইতে "পরদা প্রথা" উঠাইয়া দেন। চতুর্থ শিখগুরু রামদাস অমৃতসর নগরের ভিত্তি পত্তন করিয়া "শ্রীহরিমন্দির সাহেব" নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করেন। এই মহাত্মা পঞ্চনদের

বিভিন্ন স্থানে "সংগদ" স্থাপন করিয়া শিখগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন। পঞ্চম শিখগুরু অর্জ্জুনদেবের সময় শিখগণ একটী সঙ্ঘবদ্ধ সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। এই ধর্মাচার্য্য তাঁহার "মসন্দ" বা প্রতিনিধিগণকে ধর্ম্মপ্রচার উদ্দেশ্যে পাঞ্জাবের সর্ব্বত্র প্রেরণ করিয়া শিখদের মধ্যে ঐক্য সংস্থাপন এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। ইঁহার চেষ্টায় অমৃতসরের বিখ্যাত শিখমন্দির নির্ম্মাণ এবং সরোবর খনন কার্য্য শেষ হয়। এতদ্ব্যতীত ইনি তার্ণতরণ নামক স্থানে একটী সুদৃশ্য মন্দির এবং একটী বৃহৎ সরোবর প্রতিষ্ঠা করেন। গুরু অর্জ্জুনদেব শিখগুরুগণের উপদেশ ও হিন্দু-মুসলমান সাধুদের ভজন-সঙ্গীত সংগ্রহ করেন। এই ধর্ম্মগুরুর অক্লান্ত চেষ্টায় শিখ-সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ ধর্ম্মপুস্তক "গ্রন্থসাহেব" সংকলিত হয়। পঞ্চনদে শিখশক্তির অভ্যুত্থানে ভীত হইয়া বিদ্রোহী রাজপুত্র খুসরুকে আশ্রয় দেওয়ার অজুহাতে মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রেরিত সৈন্যদল অর্জ্জুনসিংহকে বন্দী করিয়া লাহোরে লইয়া যায়। এই মহাপুরুষকে এক কটাহ গরমজলে ফেলিয়া সিদ্ধ করিয়া একটী জলন্ত লৌহপাত্রের উপর বসাইয়া ইঁহার সর্ব্বাঙ্গে উত্তপ্ত বালুকা ঢালিয়া দেওয়া হয়। ইনি ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া সহাস্যবদনে এই অমানুষিক অত্যাচার অকুণ্ঠচিত্তে সহ্য করিয়া তিলে তিলে জীবনদান করেন। অর্জ্জুনসিংহের উপর মোগল রাজকর্ম্মচারিগণের এই হিংস্র পশুসুলভ নির্যাতন শিখগণকে একটী সঙ্ঘবদ্ধ সামরিক জাতিতে পরিণত করে। ষষ্ঠ শিখগুরু হরগোবিন্দ কেবল শিখ-সম্প্রদায়ের গুরু ছিলেন না পরন্তু ইনি একজন বিশিষ্ট সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। এই ধর্ম্মবীরের অধ্যক্ষতায় শিখগণ মোগল সৈন্যগণের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে কয়েকবার জয়লাভ করিয়াছিলেন। বাদসাহের আদেশে গুরু হরগোবিন্দ দুইবার বন্দী হইয়াছিলেন। ইহার ফলে মোগলের সঙ্গে শিখদের বিরোধ আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সপ্তম শিখগুরু হররায় দিল্লীর বাদসাহের আদেশ উপেক্ষা করিয়া শান্তভাবে ধর্ম্মজীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। অষ্টম শিখগুরু শ্রীহরকৃষ্ণ অল্প বয়সে দিল্লীতে যাইয়া পরলোকগমন করেন। নবম শিখগুরু তেগবাহাদুর দিল্লী গমন করিলে বাদসাহ ঔরংজেব তাঁহাকে বন্দী করিয়া বলপূর্ব্বক ইস্লামধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু এই ধর্ম্মবীর ধর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা মৃত্যুকে বরণ করেন। নিষ্ঠুর বাদসাহের আদেশে ইঁহার মস্তক কাটিয়া ফেলা হয়। গুরু তেগবাহাদুরের উপর বাদসাহ ঔরংজেবের এই পাশবিক অত্যাচার শিখজাতিকে মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অধিকতর সঙ্ঘবদ্ধ করে। ফলে পঞ্চদশ বৎসর বয়স্ক দশমগুরু শ্রীগুরুগোবিন্দসিংহের অধিনায়কত্বে শিখগণ একটী মহাপরাক্রমশালী "খাল্‌সা" সৈন্যদলে পরিণত হয়। ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসের পুণ্য 'বৈশাখী' দিনে গুরুগোবিন্দসিংহ একটী বৃহৎ "দেওয়ানের" (ধর্ম্মসভার) আয়োজন করিয়া শিখমাত্রকেই ইহাতে যোগদান করিতে আহ্বান করেন। সকলে সমবেত হইলে তিনি একটী উন্মুক্ত তরবারী হস্তে সভাস্থলে আগমন করিয়া ধর্ম্মের জন্য শিখগণকে বলি প্রদত্ত হইতে আহ্বান করেন। তাঁহার অনুরোধে সভা হইতে পাঁচজন শিখ আপনাদের জীবনদান করিতে অগ্রসর হন। অতঃপর একটী লৌহনির্ম্মিত পাত্রে তিনি ধর্ম্মাভিষেক বারি প্রস্তুত করিয়া চিনি মিশাইয়া উহা শাণিত ছোরাদ্বারা নাড়িয়া এই মন্ত্রপূত বারি ঐ পাঁচজন শিষ্যকে একই পাত্র হইতে পান করিতে দিলেন। পরে তিনি এই পঞ্চশিষ্যের দ্বারা ঐ প্রকার অভিষেক বারি প্রস্তুত করাইয়া নিজেও পান করিলেন। এইরূপে তিনি একাধারে গুরু এবং শিষ্য হইয়া উভয়ের বিভেদ নষ্ট

েবন। গুরুগোবিন্দসিংহ শিখগণের মন হইতে ত্রাভয দূর করিয়া তাঁহাদিগকে সাহসিকতা ধর্ম্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ করেন। শিখদের এই শেষ ধর্ম্মগুরু "পন্থ" (শিখ-সঙ্ঘ)কে একমাত্র বিচারক এবং পবিত্র "গ্রন্থ সাহেবকে" ধর্ম্মের পথ-প্রদর্শক বলিয়া প্রচার করিয়াছেন।

শিখগুরুগণ সকলেই সর্ব্বাবস্থায় শিখগণকে প্রত্যেক নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত ভগবানের নাম করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ঈশ্বরের অভিপ্রায়কে নিজের ইচ্ছায় পরিণত করা বা শরণাগতি এই ধর্ম্মমতের প্রধান সাধনা। শিখধর্ম্ম প্রচার করে যে, ভগবানের করুণা ভিন্ন জগতে কিছুই সম্ভবপর নহে। গুরুনানক বলিয়াছেন, "যেমন কোন স্ত্রীলোক কোন পুরুষের প্রেমে পড়িলে সে লোকনিন্দা ও ভয়াদি ত্যাগ করিয়া প্রিয়তমের প্রেমযজ্ঞে আপনাকে আহুতি প্রদান করে, সকল অপমান ও লজ্জা ত্যাগ করিয়া প্রিয়তমের প্রীতির জন্য সামান্য চাকরাণীর কাজ করিতেও দ্বিধাবোধ করে না, দিবানিশি প্রিয়তমের ভালবাসা অর্জ্জনের উপায় চিন্তা করে এবং প্রিয়তম অন্যায় ব্যবহার করিলেও সে যেমন হৃষ্টচিত্তে উহা সহ্য করে, মানুষকে তেমন সকল অবস্থায় ভগবানের প্রতি একান্ত অনুরক্ত থাকিয়া তাঁহার প্রেমে তাঁহার সহিত এক হইবার জন্য মৃত্যুকে পর্য্যন্ত বরণ করিতে হইবে।" মানবাত্মা যেসকল অবস্থা অতিক্রম করিয়া চরম শান্তি-রাজ্যে উপস্থিত হন, তৎসম্বন্ধে গুরুনানক তদীয় "জপজী" গ্রন্থে বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথম অবস্থার নাম "ধরমখণ্ড"। এই অবস্থায় কর্ত্তব্য কর্ম্মই মানুষের একমাত্র করণীয়। যেমন জল, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতির সাহায্যে পৃথিবী তাহার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া যাইতেছে, তেমন পৃথিবীতে যাহারা বাস করে, তাহাদেরও স্ব স্ব কর্ত্তব্য করিয়া যাওয়া উচিত; কারণ, স্বকীয় কর্ম্ম অনুসারে প্রত্যেকের বিচার হইবে। দ্বিতীয় অবস্থার নাম "জ্ঞানখণ্ড" বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্থাৎ যে জ্ঞান সহায়ে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া মহৎ ব্যক্তিগণ ভগবান্ লাভ করিয়াছেন। "কৈ রাম কৃষ্ণ রসুল, বিন্ ভগৎ কো ন কবুল", 'যাঁহারা রাম কৃষ্ণ এবং রসুল হইয়াছেন, তাঁহারাও "ভগতি" (ভক্তি) ভিন্ন হন নাই।' "জ্ঞানখণ্ড"কে অতিক্রম করিয়া জীবাত্মা "শরমখণ্ডে" উপনীত হন। এই অবস্থায় ধর্ম্ম কেবল কর্ম্ম বা জ্ঞানমাত্রে পর্য্যবসিত না থাকিয়া মানুষের স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত হয়। ইহাকে "সমাধিরাজ্য" বলে। সমাধি হইতে জীবাত্মা "করমখণ্ড" বা শক্তির রাজ্যে উপস্থিত হন। সাধনসহায়ে পর্য্যায়ক্রমে এক একটী করিয়া অবস্থা অতিক্রম করার ফলে যে সাধন-শক্তির অধিকার জন্মে, উহা শেষোক্ত অবস্থায় মানুষকে অসাধারণ আধ্যাত্মিকতার অধিকারী করে। এই অবস্থায় সাধক জন্ম মৃত্যুর উপর চিরতরে আধিপত্য লাভ করেন। ইহা হইতে মানবাত্মা "সৎখণ্ড" বা সত্যের রাজ্যে আগমন করেন। নির্গুণ ও নিরাকারের এই রাজ্যে পৌছিয়া মানুষ ভগবানের স্বরূপ-সত্তা লাভ করিয়া তাঁহার সহিত সম্পূর্ণ একীভূত হইয়া যায়। জন্ম-জন্মান্তরের অনেক অবস্থা অতিক্রম করিয়া মানুষ এই একত্বলাভ করিয়া থাকে। একমাত্র মনুষ্য জন্মেই এই অবস্থা লাভ করা সম্ভবপর। ভক্তি, অনুরাগ, নামস্মরণ ও মনন এই পূর্ণত্বলাভের উপায়। বৈদান্তিক ধর্ম্ম যেমন উপাসনা হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্বৈতজ্ঞানে পর্য্যবসিত, শিখধর্ম্মও তদ্রূপ। শৌর্য্য বীর্য্য ও বীরত্বের গৌরব স্মৃতি-মণ্ডিত এই উদার ধর্ম্মমত হিন্দুধর্ম্মেরই একটী শাখা বলিয়া গণ্য।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অসাধারণ বীরত্ববলে পরাক্রান্ত মোগল রাজশক্তিকে পর্য্যুদস্ত করিয়া গুরুগোবিন্দসিংহের সাধন-ভিত্তির উপর পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহ শিখ-সাম্রাজ্য স্থাপন

করেন। পশ্চিমে আফগানীস্থানের সীমান্ত হইতে পেশোয়ারের অন্তর্গত জামরুদ, উত্তরে জম্মু ও কাশ্মীর এবং পূর্ব্বে যমুনানদী পর্যন্ত সমগ্র পঞ্চনদ প্রদেশে শিখ সাম্রাজ্য বিস্তারলাভ করিয়াছিল। কালচক্রের আবর্ত্তে রণজিৎ সিংহের বংশধরগণের মধ্যে গৃহবিবাদ উপস্থিত হইলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে শিখগণকে পরাজিত করিয়া উদীয়মান ব্রিটিশশক্তি পাঞ্জাবে প্রভুত্ব স্থাপন করেন। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগ পর্য্যন্ত পঞ্চনদে শিখরাজত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। শিখ-ঐতিহাসিকগণ শিখজাতির এই স্বাধীনতার যুগ অপেক্ষা নির্যাতনের যুগকেই তাঁহাদের আভ্যন্তরীণ মহত্ত্ব বিকাশের সহায়ক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কারণ, স্বাধীনতার যুগে শিখ-সম্প্রদায় তৎকালীন পঞ্চনদে প্রচলিত কুসংস্কারাদি বহুল পরিমাণে গ্রহণ করিয়া আপনার স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই সময় শিখধর্ম্ম জাতিভেদদ্বারা আক্রান্ত হইয়া আপনার মহত্ত্ব-মণ্ডিত বৈশিষ্ট্য এবং সঙ্ঘশক্তি হারাইয়া এক অপরূপ মিশ্রিত মতবাদে পরিণত হয়। "গ্রন্থ সাহেবে"র পূজার সঙ্গে দেব-দেবীর মূর্ত্তি উপাসনা এই সময় প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এইরূপে শিখধর্ম্মোক্ত একেশ্বরবাদের সঙ্গে বহু দেবদেবীর অর্চ্চনা শিখ-সম্প্রদায়ে বিস্তারলাভ করে।

কালধর্ম্মের প্রভাবে শিখ-সম্প্রদায়ে যে সকল দোষ প্রবেশলাভ করিয়াছে, উহা হইতে শিখগণকে সম্পূর্ণ মুক্ত করিয়া এই বীরজাতিকে লুপ্ত গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে শিক্ষিত শিখনেতৃবৃন্দ সংস্কার আন্দোলন উপস্থিত করেন। এতদুদ্দেশ্যে লাহোর নগরী হইতে "সিংহ-সভা আন্দোলন" আরম্ভ হয় এবং পঞ্চনদের স্থানে স্থানে "শিখ-সংস্কার সভা" স্থাপিত হয়। ইহাদের মধ্যে অমৃতসরের "প্রধান খাল্‌সা দেওয়ান" ও "খাল্‌সা প্রাদেশিক সমিতি", লাহোরের "খাল্‌সা দেওয়ান" ও "শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটি", রাউলপিণ্ডির "গুরুসিংহ সভা", ভাসুরের "কেন্দ্রীয় শিখ দেওয়ান" প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান। শিখ-সম্প্রদায় পরিচালিত "খাল্‌সা" ও "খাল্‌সা সমাচার" নামক বিখ্যাত সংবাদপত্র এই সংস্কার কার্য্যে বিশেষ সাহায্য করিতেছে। কয়েক বৎসর হয় শিখদের মধ্যে ব্যাপকভাবে "আকালী আন্দোলন" আরম্ভ হইয়াছে এবং এই আন্দোলন শিখ-সম্প্রদায়কে সংস্কার কার্য্যে বিশেষ সাহায্য করিতেছে। শিখধর্ম্মের উপাসনালয়সমূহকে সংস্কৃত করিয়া উহাদিগকে শিখসম্প্রদায়ের সার্ব্বজনীন আয়ত্তাধীনে আনয়ন করাই এই আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য। বর্ত্তমানে দূরদর্শী শিখনেতৃবৃন্দ হিন্দু-সমাজের উপেক্ষিত অনুন্নত অস্পৃশ্য জাতিসমূহকে শিখধর্ম্মের উদার অঙ্কে স্থান দানের চেষ্টা করিয়া অনেকস্থলে সাফল্যলাভ করিতেছেন।
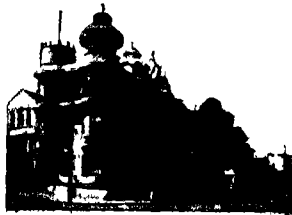
ঋষি বামদেব

(ঐতরেয় উপনিষৎ ২।১, বৃহদারণ্যক ১।৪।১০)

উদয়ন

আজি একি দীপ্ত জ্যোতিচ্ছটা চকিতে আমার
ভেদিল হৃদয়,
মহাশূন্যে—যুগ-যুগোচিত ঘন তমিস্রার
সহসা বিলয়।
কত অন্ধ ধরি, লৌহময় দৃঢ় কারাগৃহে
কাটিল জীবন,
সুর, নর, কীট, বিহঙ্গম কত জীবদেহে
জনম মরণ।
বার বার ব্যর্থ মরীচিকা, রুদ্ধ বেদনার
শূন্য দীর্ঘশ্বাস,
পুঞ্জীভূত অন্ধকার মাঝে, আলো জ্বালিবার—
নিষ্ফল প্রয়াস।
আজি বুঝি মোর বদ্ধ ঘরে, কাহার আহ্বানে
টুটিল অর্গল,
কক্ষ হতে বেগে বাহিরিনু, দেখিনু নয়নে
মুক্ত নভতল।

আজি স্নিগ্ধ জ্ঞানালোকে, গিয়াছে চলিয়া মোর
সব পরিসীমা,
আত্ম-আবিষ্কারে, ব্যাপিয়াছে দিগ্‌দিগন্তর
আপন মহিমা।
আমি ব্রহ্ম—বৃহত্তম, আজি জেনেছি আমারে
অনাদি অপার,
আমি মনু, প্রথম মানব, সূর্যে সুধাকরে
আমারি প্রসার।
দেশ ছাপি, কাল, সৃষ্টি ছাপি বাক্য মন পারে
আমার বিলাস
ইন্দ্র, যম, রুদ্র সঙ্কর্ষণ আজি দেখি মোরে
পাইছে সন্ত্রাস।
ওরে বিশ্ববাসী দেব, ঋষি, মানব তনয়
শোন্ শোন্ ওরে,
মুক্তি তোর আপন স্বরূপ অব্যয়—অভয়—
চিন্ আপনারে।

অসমীয়াগ্রন্থে শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার পরিকরগণের কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অধ্যাপক শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার, এম্-এ, পি-আর্-এস্, পি-এইচ্-ডি, ভাগবতরত্ন

শ্রীচৈতন্যের সহিত শঙ্করের মিলন—মহাপুরুষীয়া সম্প্রদায়ের তিনখানি প্রাচীন বইয়েতেই আছে যে শঙ্কর যখন দ্বিতীয়বার তীর্থ ভ্রমণে যান, তখন পুরীতে তাঁহার সহিত শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎকার হয়; কিন্তু পরস্পরের মধ্যে কথাবার্ত্তা হয় নাই। রামচরণ ঠাকুর লিখিয়াছেন—

কৃষ্ণর কীর্ত্তন করি ভকতর সঙ্গে।
তীর্থক্ষেত্র করিয়া ফুরন্ত মন রঙ্গে।
চৈতন্য গোসাঁই গ্রামে স্নান করিলন্ত।
সেই পথে আসিয়া তাহাঙ্ক দেখিলন্ত।
দুইকো দুই মুহূর্ত্তেক চাহি আছিলন্ত।
সম্ভাষণ নকরিবা চলিয়া গৈলন্ত॥ (৩১৩৯-৪০)

দৈত্যারি ঠাকুর লিখিয়াছেন—

প্রভাতে উঠিয়া নিত্যে গমন করন্ত।
কৃষ্ণ চৈতন্যর গৈয়া থানক পাইলন্ত॥
পথত চলন্তে শিক্ষা দিলন্তলোকক।
ন করিবা কেহো নমস্কার চৈতন্যক॥
বিটোজনে নমস্কার করে চৈতন্যক।
উলছায়া তেঁ হো প্রণামন্ত সিজনক॥
মনে নমস্কার তাঙ্ক করিবা এতেকে।
এহি বুলি শিখাইলন্ত লোক সমস্তকে॥
কৃষ্ণ চৈতন্য আছা মঠর ভিতর।
ব্রহ্মচারী কহিলন্ত আসিছা শঙ্কর॥
শঙ্করর নাম শুনি কৃষ্ণ চৈতন্যর।
মিলিল আনন্দ বাজ ভৈলন্ত মঠর॥
দুবার মুখতরহি আছিলন্ত চাই।
দুয়া নয়নর নীর ধীরে বহি যাই॥
শঙ্করো নয়নর নীর বহে ধারে।
পথ হন্তে নিরখিয়া আছন্ত সাদরে॥
কতোক্ষণে দুইকো দুই চাই প্রেম মনে।
পশিলা মঠত গৈরী শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যে॥
না মাতিলা দুইকো দুই নিদিলা উত্তর।
পরম হরিষ মনে চলিলা শঙ্কর॥

(বেজবরুয়া কৃত শঙ্করদেব গ্রন্থের ২৩০-২৩১ পৃঃ উদ্ধৃত)।

ভূষণ দ্বিজ কবি লিখিয়াছেন—

বৃন্দাবনো যাই সবে ক্ষেত্রে আসিলন্ত;
জগন্নাথ ক্ষেত্রে কতো দিন বঞ্চিলন্ত॥
চৈতন্য গোঁসাঞি তথা ভৈলা দরিশন।
দুইকো দুই চাহিলা নাহিক সম্ভাষণ॥
মুহূর্ত্তেক মান দুই চাহি আছিলন্ত।
নিবর্ত্তিয়া আসি বাসাঘরে আসিলন্ত॥

(শঙ্করদেব, পদ ৫৭৮-৭৯)।

দামোদরের শিষ্য দ্বিজরাম রায় "গুরুলীলায়" লিখিয়াছেন—

কণ্ঠ ভূষণর মুখে শুনিছে শঙ্কর।
কৃষ্ণ চৈতন্য হুয়া হৈছে অবতার।
ব্রহ্মানন্দ আচার্য্যেও কহিছে পূর্ব্বত।
ব্রহ্মহরিদাসে পাছে কৈলা শঙ্করত॥
সেই কথা শুমরি শঙ্কর মৌন ভৈলা।
রাম রাম গুরুনামে উচর চাপিলা॥
অবনত হুয়া দুই নমিলা সাক্ষাৎ।
পূর্ব্বাপর পুছিলন্ত কথা যত যত॥

শঙ্কব আগে না মাতিলা মহা জ্ঞানী।
কমণ্ডলু জল ঢালি বুঝাইলা আপনি॥
শঙ্কবেও বুঝিলন্ত সেই অনুমানে।
একযে শরণ ধর্ম্ম চৈতন্যর স্থানে॥

(বঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২১ সাল, পৃঃ ৬৩)।

বেজবরুয়া মহাশয় ববদোবাব 'গুরু চবিত্র' পুথি হইতে শঙ্করচৈতন্য মিলনের যে বিবরণ উদ্ধৃত কবিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, জগন্নাথের নাট মন্দিরে বসিয়া শ্রীচৈতন্য ও শঙ্কবদেব নটীর নাচ দেখিতেছিলেন। সেই সময় তাঁহাদের সামান্য কিছু কথাবার্ত্তা হয়। "এই প্রকারে ঈশ্বব পুরুষ দুইজনা সদালাপ করি কিছুদিন আছে, ক্ষেত্রস্থানর পরা বৃন্দাবনলৈ যাবর ইচ্ছা হোবাত কোনো এদিন ভকতসকল সহিতে চৈতন্য গোসাঁইব মন্দিবলৈ যাবলৈ সাজুহৈ মাধব দেবত কৈছে।" সেই দিন নিত্যানন্দ শঙ্কর-শিষ্য বলবামকে জিজ্ঞাসা কবিলেন—"কোন দেশর বৈবাগী কোন দেশে যায়। কোন মুখে ভিক্ষা মাগি কোন মুখে খায়?" বলবাম উত্তব দিলেন, "পূর্ব্বদেশর বৈরাগী পশ্চিমদেশে যায়। গুরুর মুখে ভিক্ষা মাগি নিজ মুখে খায়।" তাব পর নিত্যানন্দ বলিলেন—"কোন দেশর বৈরাগী কি বুলি কাটিছে বাও, সকলো জগৎ হবিময় দেখোঁ কতদিন আহিলা পাও?" বলরাম বলিলেন "পূব-দেশব বৈবাগী বাম বুলি কাটিছে বাও। হৃদয়মাঝে ঈশ্বর কৃষ্ণ আপুনি বিচারি চাও।' সেই দিন জগন্নাথ প্রসাদ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যেব সহিত শঙ্কবেব কিছু কথাবার্ত্তা হয়। তৎপরে "গৌরাঙ্গ প্রভুরে দেখি শঙ্কর দেবক ঈশ্বরশক্তি বুলি প্রশংসা করি অতি সমাদরে বিদায় দিছে" (পৃঃ ২২৯-৩০)।

দৈত্যারি ঠাকুরের বর্ণনা অপেক্ষা এই বিববণেব উপর বেজবরুয়া মহাশয় অধিকতর আস্থা স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু আমি ইহা কাল্পনিক মনে করি। প্রথমত শ্রীচৈতন্য জগন্নাথের নাটমন্দিরে বসিয়া দেবদাসীব নৃত্য দর্শন করিবেন ইহা সম্ভব মনে হয় না। দ্বিতীয়ত শঙ্কব শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের অল্পদিন পূর্ব্বে পুরীতে যান। সে সময়ে নিত্যানন্দ গৌড়দেশে থাকিয়া ধর্ম্মপ্রচার কবিতেছিলেন। সেই জন্য মনে হয় যে মাধবেব সম্প্রদায়-ভুক্ত রামচবণ ঠাকুব, দৈত্যারি ঠাকুর ও ভূষণ দ্বিজের বর্ণনাই অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য। শ্রীচৈতন্যের জীবনেব শেষ বার বৎসব কেবল ভাবের আবেশে কাটিয়াছে। সে সময় যদি শঙ্করের সহিত শ্রীচৈতন্যেব সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে তাহা হইলে কেবলমাত্র পরস্পবের প্রতি তাকাইয়া দেখাই অধিকতব সম্ভব।

কৃষ্ণভারতীব "সন্তনির্ণয়ে" শঙ্করচৈতন্য মিলনেব বর্ণনা কৌতূহলোদ্দীপক। সেই জন্য উহার খানিকটা উদ্ধৃত করিতেছি—"গঙ্গাস্নান করি জগন্নাথ দবশন কবি পাছে চৈতন্য গোসাঞিব মঠব দ্বারক লাগ পাইল। যায়া ব্রহ্মহরিদাসক লাগ পাইল। পাছে ব্রহ্ম পুছিল তোবা কথাত্র থাক, কিনা নাম। তাত রাম বাম কহিল "আমি পূর্ব্বদেশী ব্রাহ্মণ, এহ শঙ্কর গোমস্তা জগন্নাথ দেখিতে আসিছে। চৈতন্য গোসাঞি কো দেখিতে চায। পাছে ব্রহ্মহরিদাসে শ্রীচৈতন্য গোসাঞিত কহিল। চৈতন্যে বুলিল আমি জানি রাম রাম ব্রাহ্মণ শঙ্কব কায়স্থ দুইজন আহিচে। এখন আমাক দেখা পাইবার নয়। আমি শূদ্রের মুখ না দেখি। এহি কথা রাম রাম শঙ্কর গোমস্তাত কহিলেক। শঙ্করে সুনি বিস্তার মন দুখ করি ব্রহ্মহরিদাসক বুলিল আমি কেনমন্তে চৈতন্য প্রভুক দেখা পায়। তেবে ব্রহ্মহরিদাসে বোলে যদি তোমরাত কিছো বিত্ত থাকে, তবে তাক ভাঙ্গি কীর্ত্তন আরম্ভ করা। হরিধ্বনি শুনিলে কীর্ত্তন লম্পট চৈতন্য আপুনি মঠের বাহির হয়া নৃত্য করিবাক যাইবেক তাতে দেখা পাইবা। এহি কথা সুনি ধন কড়ি ভাঙ্গি কীর্ত্তন আরম্ভিল।

ভবদুইপবেত কীর্ত্তনধ্বনি শুনি চৈতন্য মঠহস্তে বাহিরায়া দুই দণ্ডমান নৃত্য করি দেখনে দেখ বেশে অলক্ষিতে পুনবায় জায়াছিল। চৈতন্য প্রভুক তো দেখন পাইল। পাছে হরিদাস বুলিল মহাপ্রভু তোমার কীর্ত্তনেত নৃত্য কবি পুনর্ব্বাব মঠের ভিতর আসিল। তুমি কেনে দেখা না পাইলা। তাত শঙ্করে বুলিল পূর্ব্বে কোন দিন নক্রি দেখি এতেকে চিনিবাক না পাবিলো। যদি আগে দেখি চিনো হেন্তে তেবে চিনিবাক পাবি। কহা প্রভুব কি বর্ণ, কি রূপ। এহি কথা সুনি হরিদাসে বোলে "আমি প্রভুব রূপ কহো। গৌবাঙ্গ তনু, আজানুলম্বিত ভুজ, মুণ্ডিত মুণ্ড, হস্তে জপমালা, দণ্ডনেত্রে সদা প্রেমধাবা বহে। গলায়ে নামমালা ভোলমুখে সদা কীর্ত্তনবোল। কটিত কপিন। সদা পুলকা বলিত তনু। এই লক্ষণে চৈতন্য মহাপ্রভু।

ভাল প্রভুক ন চিনিলা, আমি চিনায়া দিবো। রাত্রি চাবিদণ্ড থাকিতে আসিবা। জে সম জগন্নাথব জলশঙ্খব বাদ্য হয, সেই সময় প্রভু চৈতন্য সমুদ্র স্নানক জায় , সেই বেলা মঠেব দ্বাব মেলে। তোরা দুইজনে সেই বেলা দেখা পাইবা।" এহি কথা সুনি দুয়োজনে চারিদণ্ড থাকিতে মঠেব দ্বারেতে গৈল ব্রহ্মহবিদাস বুলিল মহাপ্রভুক দণ্ডবত ন করিবা। এহি কথা সুনি শঙ্কব একদিসে রহিল। বাম রাম গুরু মঠেব দ্বারত দণ্ডবত করিয়াছিল। সেই বেলা জগন্নাথের জলশঙ্খ বাদ্য হইল, তাকু সুনি চৈতন্য মহাপ্রভু মঠব বাহিব হয় সমুদ্র স্নানেক চলিল। অহি বাইতে বাম বাম গুরুর মস্তকত চরণ উঝটি লাগিল। ঈশ্বরেব চারি অক্ষবে নাম উচ্চাবণ কবিয়া সমুদ্র স্নানেক নড়িল। সেই চারি নামক রাম বাম মন্ত্র বুলিল। শঙ্করে প্রভুক দেখি মনে দণ্ডবত করি থোজতে দণ্ডবত করিলা। পাছে হরিদাসেক বুলিলা তোমার প্রসাদে মহাপ্রভুর দরশন হৈলো। আমি তোমাক কি দিম। আমিয়ো তোমাব। আব প্রভুত পুছিবা কলিত ভক্তি কাহাত রহিবেক। আমাক কি আজ্ঞা হৈবেক। আমাকে প্রসাদ দিবে কে। এহি কথা সকল কহিবা। হরিদাসে বুলিল এ সকল কথার মহাপ্রভু ত আজ্ঞা লয়া দিবো। তোবা স্নান করি আসিবা।

এহি সুনি বাম রাম শঙ্কর দুইজনে সমুদ্র স্নান পঞ্চতীর্থ স্নান করিবেক। চৈতন্য প্রভুয়ো স্নান কবি মঠেব ভিতব যাইতে ব্রহ্মহবিদাসে দণ্ডবতে পড়ি কথা কহে হে মহাপ্রভু দুইটি থিবয়ে পোছে-কলিত ভক্তি কাহাত বহিবেক, আমাব কি গতি হৈবেক আমাক কি আজ্ঞ হৈবেক, আমার প্রসাদ পাইবাক লাগে। এহি কথা সুনি প্রভু মনি কবঙ্গব জল ঢালিল, দ্বাবত ব্রহ্ম হবিদাসে বুলিল উচেত ভক্তি না বহে, হিনত ভক্তি রহিবেক। আব বামদেব শর্ম্মাক শঙ্কব দাসক দুইখানি দেবলার মালা দিব। দুইজনেক আব জগতপতি জে নাম নামমালিকা পুস্তক সাত শত শ্লোকেব কবাইবে তাক শঙ্কবদাসেক দিবা, সে দেশত প্রচারোক আর শঙ্কবদাসে ভাগবত সুনিবেক আব বামদেব শর্ম্মাকে সবণ ভজন হবিনামেব শ্লোক সবল দিবা, যেহি চাব নাম পাইলো সেহি ব্রহ্মপুত্রেক তিনি নাম দিবেক। ব্রাহ্মণেক চাবি নাম দিবেক। আর দামোদব ব্রাহ্মণ পুষ্পদন্ত পারিষদ আহিছে আগ্রোকে সব ভজনেব শ্লোক দিবা।

(বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষৎ পত্রিকা ১৩২৭।৩, পৃঃ ১৩১ – ৩৯)।

নিম্নলিখিত কাবণে এই বর্ণনা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। (১) উক্ত বর্ণনায় দেখা যায় যে, শ্রীচৈতন্য বলিতেছেন যে তিনি শূদ্রেব মুখ দেখেন না। তাঁহাব অনেক শূদ্র ভক্ত ছিল। তাঁহাদের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতেন। (২) শ্রীরূপ, প্রবোধানন্দ, রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভৃতি প্রত্যক্ষদর্শীবা শ্রীচৈতন্তের গলায় হরিনামের মালা

থাকার কথা বর্ণনা করেন নাই। যে সমস্ত গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যকে মালাতিলকধারী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, সেগুলি পরবর্ত্তী কালের। (৩) শঙ্করদেব যদি শ্রীচৈতন্যের উপদেশ গ্রহণ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিতেন, তাহা হইলে তাহাতে শ্রীরাধার নাম থাকিত। শঙ্করের দশমকীর্ত্তন প্রভৃতি কোন গ্রন্থে রাধার নাম নাই। (৪) শ্রীচৈতন্য ব্রাহ্মণের জন্য একপ্রকার হরিনাম ও শূদ্রের জন্য অন্য প্রকার হরিনাম উপদেশ দিবেন ইহা একেবারেই সম্ভব মনে হয় না।

কৃষ্ণভারতীর সন্তনির্ণয়কে কেহ কেহ খুব প্রামাণিক মনে করেন। তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলেন যে সন্তনির্ণয় খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত হইয়াছিল। কারণ ভটদেব ঐ গ্রন্থ দেখিয়া সৎ সম্প্রদায় কথা লিখিয়াছেন (১)। কিন্তু আমার মনে হয় ঐ গ্রন্থখানি বেশীদিনের প্রাচীন নহে। কারণ উহাতে ভবিষ্যপুরাণ, পদ্মপুরাণ, গরুড়পুরাণ, বৃহন্নারদীয় পুরাণ প্রভৃতি হইতে শ্লোক তুলিয়া প্রমাণ করা হইয়াছে যে শ্রীচৈতন্য ভগবান স্বয়ং। সনাতন, শ্রীজীব, গোপালভট্ট, কর্ণপূর ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ ঐ সমস্ত পুরাণ হইতে অনেক শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। যদি ঐ সমস্ত পুরাণে সত্যই শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তার কথা থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা শুধু শ্রীমদ্ভাগবতের ও মহাভারতের অস্পষ্ট প্রমাণ তুলিয়া শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তা স্থাপন করিতেন না। ঐ সমস্ত শ্লোক পরবর্ত্তী কালে জাল করা হইয়াছিল।

সন্তনির্ণয়ে আরও পাওয়া যায় যে শ্রীচৈতন্য জন্মগ্রহণ করিয়া তিনদিন পর্য্যন্ত মাতৃস্তন্য পান করেন নাই। পরে অদ্বৈত আচার্য্য আসিলে স্তনপান করেন। অদ্বৈত আচার্য্যই তাঁহার নাম চৈতন্য রাখেন। এইরূপ কথা অদ্বৈতের প্রক্ষিপ্ত জীবনীগুলিতে পাওয়া যায়। অদ্বৈতের এক পুত্র আসামে যাইয়া শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে (রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৯, পৃঃ ১৮০)। সম্ভবতঃ অদ্বৈতের বংশধরদের নিকট কিম্বদন্তি শুনিয়া কেহ কৃষ্ণভারতীর নাম দিয়া সন্তনির্ণয় লিখিয়াছেন। স্বরূপ দামোদরের করচা কথা কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন, কিন্তু ব জারে ঐ নামের একখানা সহজিয়া বই পাওয়া যায় সেইরূপ কৃষ্ণভারতীর নাম দিয়া কেহ হয়তো ঐ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের বহু পরে সন্তনির্ণয় রচিত হইয়াছিল বলিয়া আমার সন্দেহ হয়।

(১) ভট্টদেব বলেন—চৈতন্য সংগ্রহং দৃষ্ট্বা সংগ্রহং কৃষ্ণ ভারতেঃ নৃসিংহহরত্যমালোক্য কথয়ামি যথামিমাম্॥

বেদান্তে ঋষিপরম্পরা

মণ্ডলেশ্বর শ্রীমৎ স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি মহারাজ

বর্ত্তমানকালে চতুর্দ্দিকে স্বৈরাচারের তাণ্ডব নৃত্য, সর্ব্বত্র নরগণ দারিদ্র্য-পীড়নে ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে। যুদ্ধ, জলপ্লাবন, অগ্নিদাহ, ভূমিকম্পাদি কত প্রকারের আধি-ব্যাধি-আক্রমণে সংসার জর্জ্জরিত। সামাজিক রাজনৈতিক ধার্ম্মিক বিপ্লব মনুষ্য বুদ্ধি মহামোহে আচ্ছন্ন করতঃ জীবন বিভীষিকাময় করিয়াছে। এই সব মহাউপাধি ব্যাধি দূর করা আকাশের মহান্ অসুর রুদ্র ব্যতীত আর কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। তাই রুদ্র যিনি মন্যু বা যজ্ঞ-স্বরূপ তাঁরই স্মরণ লইয়া বলিতেছি, 'নমস্তে রুদ্র মন্যবে।' জগতে সবাই শান্তি চায়—নিরাবিল আনন্দ, অবিনাশী সুখ চায় কিন্তু পায় না, তাই ঋষিগণ শান্তিবাক্য সমন্বিত শান্ত রসাশ্রিত উপনিষদ্ সমূহের অবতারণ করিয়াছেন। তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যুপ বসন্ত্যরণ্যে শান্তা বিদ্বাংসো ভৈক্ষচর্য্যাং চরন্তঃ। এই আরণ্যকান্তর্গত উপনিষদাবলি যাহা প্রতীচ্য জগতের জ্ঞান উন্মেষক মহাত্মা সোপনহায়র প্রভৃতির প্রার্থনা পুস্তক হইয়াছিল তাহার রহস্য সজ্জনগণের মর্ম্মায়ত্ত করিবার জন্য এখানে যৎকিঞ্চিৎ প্রচেষ্টা করা যাইবে। 'সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং' হৃষিকেশের অনুধাবন নির্ম্মল চিত্তেই সম্ভব-পর। উপনিষদ্ শব্দটী বৈয়াকরণিকগণ দুই প্রকারে নিষ্পন্ন করিয়াছেন। ইহাতে উপ+নি+সদন এই তিনটী ভাগ আছে।

ষদ, বিশরণ গত্য-বসাদনেষু ইতি ধাতুপাঠ। উপ (উপগম্য গুরুম্), নি (নিশ্চয়েন) সীদতি (গচ্ছতি—প্রাপ্যতি ব্রহ্মতত্বং যেন বিদ্যয়া) তৎ উপনিষদ্। অথবা উপ (উপাশ্রিত্য যৎ বিদ্যাং) নি (নিঃশেষেণ) সীদতি (অবসাদয়তি বিনাশয়তি মায়া তৎকার্য্যঞ্চ) তৎ উপনিষদ্, ধনুর্গৃহিত্বোপ-নিষদং মহাস্ত্রং শরহ্যুপাসানিশিতং সন্ধয়ীত। মু।২।২। প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং যদাতমোস্তন্ন দিবানরাত্রি র্নসন্ন চাসচ্ছিব এব কেবলঃ।

রুদ্রই মঙ্গলাস্পদ শিবনামক দেবতা সুতরাং রুদ্র দৈবতক। উপনিষদ্ সংখ্যা মুক্তিক উপনিষদে ১০৮ দেখা যায়। বঙ্গদেশে ১১৭ খানি উপনিষদ্ ছাপা হইয়াছে।

ফরাসীদেশে প্যারিশ লাইব্রেরীর ক্যাটালগে ২৮০ খানি উপনিষদের সংখ্যা দেওয়া আছে জানা যায়। এই সকল উপনিষদ্ মধ্যে বৈদিক, আর্ষ, সাম্প্রদায়িক ও কৃত্রিম এই চার প্রকার বিভাগ কেহ কেহ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে কৃত্রিম যেমন আল্লোপনিষদাদি আকবর বা সাহাজান বাদসাহের সময়ে কৃত। সাম্প্রদায়িক যেমন বহ্বৃচ, কৃষ্ণ, রুদ্রাক্ষ জাবালাদি যাহা শাক্ত, বৈষ্ণব বা শৈব পন্থিগণের বিশেষত্ব খ্যাপনের জন্য কৃত। আর্ষ যেমন প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্যাদি—যাহাদের ঋষি প্রণীত হইলেও কোন্ সংহিতা বা ব্রাহ্মণান্তর্গত তাহা গ্রন্থলোপের জন্য জানা যায় না। বৈদিক যেমন ঈশ, কেন, বৃহদারণ্যকাদি—যাহাদের কোন সংহিতা বা ব্রাহ্মণান্তর্গত তাহা জানা গিয়াছে।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পর হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম এক মহান্ বিপ্লবের সৃষ্টি করে, সনাতন বৈদিকধর্ম্ম গ্লানিযুক্ত হয় তখন ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য সনাতন বৈদিকধর্ম্মের মহিমা স্থাপনার্থ জন্ম গ্রহণ করেন। যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত অভ্যুত্থানম-

ধর্মস্ত তদাত্মানং সৃজাম্যহম্। ইহা তাঁহার প্রতিজ্ঞা বাক্য। কিন্তু উক্ত কার্য্যের জন্য সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী অরুণোদয়বৎ তৎপূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্য কুমারিল ভট্টাদি কর্ত্তৃক বিপ্লব প্রতিরোধ কার্য্য আবদ্ধ হইয়াছিল। তাহাতে কর্ম্ম-মীমাংসার প্রচারাধিক্য দৃষ্টে বন্ধনের হেতু-ভূত কর্ম্মরাশি নিষ্কাম ভাবে আচরণে চিত্তশুদ্ধির হেতু হইলেও সর্ব্বপ্রকারে দুঃখপ্রশমন সক্ষম নহে জানিয়া এই দুঃখ দূরী-করণার্থ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য উত্তর মীমাংসার অর্থাৎ জ্ঞান ধর্ম্মের প্রচারার্থ বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য করেন। এবং উপনিষদ্ মধ্যে ঈশ কেন কঠ প্রশ্ন মুণ্ডক মাণ্ডুক্য তৈত্তিরীয় ঐতরেয় ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ দশকের এবং বেদান্তের প্রকরণ গ্রন্থ ও শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতার এক এক ভাষ্য করেন। এই সকল ভাষ্য ব্যতীত অন্যান্য ধর্ম্ম-গ্রন্থ সকলও ভগবান রচনা করিয়াছেন যাহা অধ্যয়ন ও অভ্যাস-দ্বারা সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন হইয়া লোকে শুদ্ধচিত্তে সর্ব্বাধার ব্রহ্মোপলব্ধির দ্বারা কৃতকৃত্য হইতে পারে। কেহ কেহ বলেন নৃসিংহতাপনি ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের শাঙ্কর ভাষ্য আছে। কিন্তু সুধীগণের তাহা সম্মত বলিয়া মনে হয় না। জার্ম্মানিতে বর্ত্তমানে বহুল উপনিষদের চর্চ্চা হইতেছে। তথাকার পণ্ডিত ডুনাশন্ প্রভৃতি উক্ত দশখানি উপনিষদ্ই প্রামাণ্য বলিতেছেন। বিশেষ মুক্তি-কোপনিষদে প্রথমতঃ মাণ্ডুক্য পাঠেরই প্রশংসা আছে, পশ্চাৎ উক্ত দশ খানি উপনিষদের উৎকর্ষতা-জ্ঞাপক বাক্য আছে। উক্ত দশখানি উপনিষদ্ মধ্যে প্রশ্ন, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য অথর্ব্ব বেদান্তর্গত। প্রশ্ন মহর্ষি পিপ্পলাদপ্রোক্ত। মুণ্ডক উপনিষদে বক্তা অঙ্গিরস শ্রোতা শৌনক। মাণ্ডুক্য উপনিষদ্ মণ্ডুক ঋষি-দৃষ্ট। ঐতরেয় উপনিষদ্ ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণান্তর্গত আরণ্যকের দ্বিতীয় খণ্ডের চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়। কঠ উপনিষদ্ তৈত্তিরীয় অর্থাৎ কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের পরিশিষ্ট মধ্যে সন্নিবেশিত। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ তৈত্তিরীয় আরণ্যকের সপ্তম, অষ্টম ও নবম অধ্যায়। কেন উপনিষদ্ জৈমিনীয় তলবকার ব্রাহ্মণাংশ মাত্র। ইহা উহার নবম অধ্যায়। ছান্দোগ্য উপনিষৎ ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের তৃতীয় হইতে একাদশ অধ্যায়। এই দুইটী সামবেদীয়। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ শতপথ ব্রাহ্মণের চতুর্দ্দশ কাণ্ডান্তর্গত শেষ ছয় অধ্যায়। ইহা শুক্ল যজুর্ব্বেদীয়। ঈশ উপনিষদ্ শুক্ল যজুর্ব্বেদের শেষ অধ্যায় অর্থাৎ চত্বারিংশৎ অধ্যায়। ঋগ্বেদ সংহিতা প্রাচীন বলিয়া গণ্য হয়। তাহা সম্পূর্ণ ইন্দ্রাগ্নি প্রভৃতি দেবগণের স্তুতিপর বলিয়া অনেকের ধারণা আছে। এবং অনেকে মনে করেন যে উহা আর্য্যজাতির বাল্যের স্মৃতি-লিপি মাত্র। জ্ঞানের উন্মেষ তেমন কিছু উহাতে নাই। পরন্তু এই মতটী প্রতীচ্যাগত, বস্তুতঃ ইহা সত্য নহে। অনেকে বিশ্বাস করেন অদ্বৈতবাদের প্রথম বিকাশ উপনিষদে আছে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যই অদ্বৈত বেদান্ত প্রণেতা। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের মতবাদ মায়াবাদ ও অনির্ব্বচনীয়-বাদ নামে অভিহিত হয়। উহার ভিত্তি কেবল উপনিষদে নিহিত নয়, ঋগ্বেদেই উক্ত মতবাদের সবিশেষ ঝঙ্কার আছে। এজন্য ঋগ্বেদের ১ম। ৮৯ সূক্ত। ১০ মন্ত্র, ১।৯১।৬-৮ মন্ত্র, ইহা গৌতমদৃষ্ট। অঙ্গিরাবংশীয় কুৎ ঋষি দৃষ্ট ১। ১১৫।১, মহর্ষি দীর্ঘতমা দৃষ্ট ১।১৬৪ সূক্ত; ভার্গব গৃৎসমদ দৃষ্ট ২।১।১-১১, মহর্ষি বামদেব দৃষ্ট ৪।২৬। ১, ৪।৪০।৫ ইত্যাদি মন্ত্র মহর্ষি ভরদ্বাজ দৃষ্ট ৬।৯। ১-৫, গর্গ্য দৃষ্ট ৬।৪৭।১৮, কণ্ববংশীয় মেধাতিথি দৃষ্ট ৮।৫১।২, আপ্তবংশীয় ভৌবন বিশ্বকর্ম্মা দৃষ্ট ১০।৮১।১ ৫, নারায়ণ দৃষ্ট ১০।৯০।১-৪, বাগাম্ভৃণী ঋষিকা দৃষ্ট ১০।১২৫ সূক্ত এবং সুপ্রসিদ্ধ নাসদাসীৎ ১ ।১২৯ সূক্ত যাহা পরমেষ্ঠী প্রজাপতি দৃষ্ট মন্ত্র সকল দ্রষ্টব্য। এই সকল মন্ত্র উপনিষদ্রূপে পৃথক্-ভাবে ব্যবহৃত না হইলেও মুক্তির দ্বারস্বরূপ অদ্বৈত

ব্রহ্মতত্ত্ব এই সকলে বর্ণিত আছে। এবং ইহাই বেদান্ত শাস্ত্রের মূল ভূমিকা। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের পরবর্ত্তী কালে উক্ত দশখানি উপনিষদ্, মহাভারতান্তর্গত শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা এবং বাদরায়ণ প্রণীত বেদান্ত সূত্র বা উত্তরমীমাংসা এই প্রস্থানত্রয়ের সবিশেষ আদর দেখা যায়। শৈব বৈষ্ণবাদি সকলেই আপন আপন মতানুসারে এই তিন প্রস্থানের ভাষ্যাদি করিয়া স্ব স্ব মত স্থাপন করিয়াছেন। এজন্ত উহাদিগকে প্রস্থানত্রয় আখ্যা দেওয়া হয়। দশখানি উপনিষৎ শ্রুতিপ্রস্থান। গীতা স্মৃতিপ্রস্থান এবং বেদান্তসূত্র তর্ক বা ন্যায় প্রস্থান।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে আচার্য্য রামানুজ, আচার্য্য বল্লভ, আচার্য্য নিম্বার্ক ও আচার্য্য মধ্ব এবং বঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ মধ্যে প্রচলিত অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদিগণ প্রধান। শৈব শ্রীকণ্ঠ, ভাস্করাচার্য্য, অভিনব গুপ্তাদি সমধিক প্রসিদ্ধ হইলেও বর্ত্তমানকালে বৈষ্ণবাচার্য্যগণের অনুমত জনসমষ্টির সংখ্যা গরিষ্ঠ পরিদৃষ্ট হয়। ইঁহাদের সকলেরই উক্ত প্রস্থানত্রয়মূলক ধর্ম্মমার্গ স্বীকার্য্য।

আচার্য্য রামানুজের মতকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বলে। আচার্য্য বল্লভের মত দ্বৈত বলিয়া কথিত হয়। আচার্য্য নিম্বার্কের মত দ্বৈতাদ্বৈতবাদ নামে প্রচলিত। আচার্য্য মধ্বের মতবাদ দ্বৈতবাদমাত্র। বস্তুতস্ত এই সকলই দ্বৈতবাদ।

উপরোক্ত উপনিষদের দ্রষ্টা ও অন্য যে সমস্ত মতবাদী ঋষিগণের উল্লেখ আছে তাঁহাদের বংশাবলি শতপথ ব্রাহ্মণের অন্তর্গত বৃহদারণ্যক উপনিষদে দ্বিতীয় চতুর্থ ও ষষ্ঠ অধ্যায়ের পশ্চাতে তিনটী তালিকা পাওয়া যায় এবং পাণিনিসূত্র মহাভারত ও পুরাণাদি হইতে গ্রহণ করিতে হয়। এই সকল তালিকায় যে সমস্ত নাম আছে তাহাতেও পরস্পর কথঞ্চিৎ অনৈক্য দৃষ্ট হয়। এক নামের বহু ব্যক্তি আছে বলিয়া কোন কোন মতাবলম্বী বলিয়া থাকেন, অপরে একই ব্যক্তিকে দীর্ঘায়ু করিয়া বহুত্বের অস্বীকার করেন, এই সকল উপনিষদে উক্ত ঋষিগণ মধ্যে বেদান্ত সূত্রোক্ত কাশকৃৎস্ন কার্ষ্ণাজিনি, উডুলোমী, আশ্মরথ্য, বাদরী, জৈমিনি প্রভৃতি কাহারও নাম পরিদৃষ্ট হয় না। বেদান্তসূত্র শতপথ ব্রাহ্মণের পরবর্ত্তী। বেদান্ত সূত্র প্রণেতা পারাশর্য্য বলিয়া কথিত হন। ঋক্‌বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা পরাশর ঋষির পুত্র মহাভারতের সমকালীন কল্পনা করা এবং মহাভারত ও ঋক্‌বেদ সমসাময়িক বলা একই কথা, ইহা কাহারও ইষ্ট নহে। শ্রীমদ্ভাগবৎ পুরাণ, মৎস্য পুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণ সমস্বরে ঘোষণা করিতেছে, যে দ্বাপরের প্রারম্ভেই বেদ চারিভাগে বিভক্ত করা হয় এবং ঋষিগণ ইহা সম্পাদন করেন। মহাভারত কলির প্রারম্ভের কথা, মধ্যে ২০০০ বর্ষ গত। কেবলমাত্র পরাশর-তনয় বিভাগ করেন এমন বুঝা যায় না। ব্যাসশিষ্য জৈমিনি, পৈল, সুমন্ত প্রভৃতি চতুর্ধা বিভক্ত বেদের প্রতিভাগ শাখান্তরিত করিয়া অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিয়াছেন। পারাশর্য্যকে এ বিষয়ে অনুকূল ও সহায়ক জন্যই বেদব্যাস বলিতে হয়।

বেদে যে শতবর্ষ পরমায়ু লেখে তাহাকে লক্ষবর্ষে পরিণত করা কষ্টকল্পনা বলিয়া অনেকে মনে করেন। বৃহদারণ্যকের ষষ্ঠ অধ্যায়ের তালিকায় চারিজন পরাশরী পুত্র দেখা যায়। ২য় অধ্যায়ে সেইস্থলে চারিজন পারাশর্য্য দেখা যায়। তালিকায় ব্রহ্মা হইতে গুরু শিষ্য বা পিতা পুত্রপরম্পরা দেখা যায়। তাহাতে এই পারাশর্য্যগণের স্থান অতিশয় নিম্নে প্রদত্ত হইয়াছে। ঋক্‌বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা পরাশরের স্থান এত নিম্নে হইতে পারে না, ঐ তালিকায় ঋক্‌বেদোক্ত অন্যান্য আঙ্গিরস ও কাশ্যপৌভরির পর হইতে এইরূপ আছে, পন্থা,বাভ্রব, বৎসনপাৎ, বিদর্ভি কৌণ্ডিণ্য, গালব, কুমার হারিত কৌশর্য্য কাপ্য, শাণ্ডিল্য, বাৎস্য, গৌতম, মাণ্টি, আত্রেয়, ভারদ্বাজ, আসুরী ঔপজন্ধনী, ত্রৈবনী,

আসুরায়ণ, যাস্ক, জাতুকর্ণ পারাশর্য্য, ঘৃতকৌশিক। অন্য তালিকায় ঋক্‌বেদীয় ঋষি কবষ বাজশ্রবস, কুশ্রী, উপবেশী, অরুণ, উদ্দালক-আরুণি, বাজসনেয়ী, যাজ্ঞবল্ক্য, আসুরী, আসুরায়ন, প্রাশ্নীপুত্র, সাঞ্জিবীপুত্র, প্রাচীন যোগীপুত্র, পাওয়া যায়। এই তালিকাদ্বয়ের প্রথম তালিকায় যে জাতুকর্ণ পারাশর্য্য আছে ইনি মহাভারত ও বেদান্ত সূত্র প্রণেতা হইতে পারেন। মহাভারতের পরিশিষ্ট স্বরূপে গণ্য খিলহরিবংশে ৪১ অধ্যায়ে জাতুকর্ণ শিষ্য পারাশর্য্য সত্যবতী-সুত বলিয়া উল্লেখ আছে। মহাভারত সত্যবতী-সুত রচিত বটে। মহাভারত সভাপর্ব্বে চতুর্থ অধ্যায়ে দেখা যায় কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ও পারাশর্য্য দুইজন পৃথক্ ব্যক্তি। মৎস্য পুরাণে দুইশত অধ্যায়ে শ্বেত, গৌর, শ্যাম, ধূম্র, নীল, কৃষ্ণ এই পরাশর থাকা দৃষ্ট হয়। ঐ ২০১ অধ্যায়ে বাদরায়ণ বশিষ্ঠ এর গোত্রীয় পাওয়া যায়।

হরিবংশের ২৭ অধ্যায়ে ও মহাভারতে অনুশাসন পর্ব্বে ৪র্থ অধ্যায়ে এক বৈশ্বামিত্র বাদরায়ণ দেখা যায়। এই জন্যেই সম্ভবতঃ বেদান্ত সূত্রে বাদরায়ণের মতবাদ উল্লিখিত আছে, তাহাতে বেদান্ত সূত্র প্রণেতা বাদরায়ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তি হইয়া পড়েন। জাতুকর্ণ ও পারাশর্য্য মৎস্য পুরাণেও বশিষ্ঠ গোত্রীয় পাওয়া যায়। এই সব কারণে বৃহদারণ্যকে উক্ত বংশাবলীর জাতুকর্ণ পারাশর্য্য বেদান্ত সূত্রকার গ্রহণ করিলে অনেকটা সামঞ্জস্য হয়। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী আসুরায়ণ যাস্ক নিরুক্তকার ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী আসুরী সাঙ্খ্যকার ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী আত্রেয় যিনি পূর্ব্বমীমাংসা মতাবলম্বী বলিয়া বেদান্ত সূত্রে ৩।৪।৪৪ উক্ত।

মহাভারতে অনুশাসন পর্ব্বে ৪র্থ অধ্যায়ে বিশ্বামিত্র বংশে আসুরায়ণী কপিল, শলঙ্ক প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়। মৎস্য পুরাণেও বিশ্বামিত্র বংশে শলঙ্ক, পাণিনি, অশ্মরথ্য নাম পাওয়া যায় এবং আত্রেয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে গৌতম নাম আছে, ইনি ন্যায়সূত্রকার হইতে পারেন। মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে বিশ্বামিত্র বংশের যে তালিকা আছে তাহাতে এক জন উলূক আছেন ইনি বৈশেষিককার হইতে পারেন। পতঞ্জলি যোগসূত্রকার। তিনি প্রাচীন যোগশিষ্য এ মত ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের ৬৭ অধ্যায়ে দেখিতে পাই। এই প্রাচীন যোগীর নাম এই তালিকায় দৃষ্ট হয়। পারাশর্য্য শিষ্য জৈমিনি পূর্ব্বমীমাংসাকার। জাতুকর্ণ পারাশর্য্য শিষ্য ঘৃতকৌশিক নাম পাওয়া যায়। তিনি মহাভারতে সভাপর্ব্বে ৪র্থ অধ্যায়ে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ও পারাশর্য্য সহিত মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সভায় উপস্থিত ছিলেন, বর্ণিত আছে। এই সমস্ত ঐক্য দৃষ্টে বৃহদারণ্যকের তালিকায় পুরুষ ও সময় নির্ণয় সম্ভবপর। ইহাদেরই অল্প পরবর্ত্তী ব্যাকরণ রচয়িতা পাণিনি ছিলেন বলা যায়। কারণ পাণিনীয় সূত্রে যাস্ক, পারাশর্য্য, পৈল, বৈশম্পায়ন, মণ্ডুক গালব নাম দৃষ্ট হয়।

যাস্কের নিরুক্তে গালব, কৌৎস্য ঔপমন্যব, গার্গ্য, শাকটায়ন, শাকপূণী, হারিদ্রুত, বার্ষায়ণ এই সকল নাম আছে। গালব নাম মহাভারতে, মৎস্য পুরাণে হরিবংশে বিশ্বামিত্র বংশীয় দেখা যায়। গালব শুক্ল যজুর্ব্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা। প্রাচীন শাল ঔপমন্যবের নাম ছান্দোগ্য উপনিষদের ৫ম অধ্যায়ে পাওয়া যায়। এইজন্য যাস্ক ইহাদের পরবর্ত্তী। গালবের নাম পূর্ব্বোক্ত বৃহদারণ্যকের তালিকায় উপরের দিকেই পরিদৃষ্ট হয়। পৌলুষি প্রাচীন যোগ্যের নামও ছান্দোগ্যের পঞ্চম অধ্যায়ে আছে। সুতরাং প্রাচীন যোগ্য পুত্র পতঞ্জলি যোগসূত্রকার ও পাণিনি ভাষ্যকার পতঞ্জলি যিনি সুঙ্গবংশীয় পুষ্পমিত্রের সমসাময়িক দুইজন পৃথক্ ব্যক্তি। অতএব পতঞ্জলির ব্যাসভাষ্য পারাশর্য্য কৃত হওয়া সম্ভবপর হইতেছে। পাণিনীয় সূত্রে পরীক্ষিৎ জন্মেজয়ের সর্প সত্রাদি যাহা পাণিনির বাসভূমির সন্নিহিত তক্ষশীলায় পরিসমাপ্ত হয় তাহার কোনই

নিদর্শন না থাকায় তিনি পরীক্ষিতের শেষ অবস্থা ও জন্মেজয়ের বাল্যাবস্থাকালে বর্তমান ছিলেন বলা যায়।

বৃহদারণ্যকের ২।৪ অধ্যায়ে ও ৬ অধ্যায়ে এবং শতপথ ব্রাহ্মণের দশম কাণ্ডের অধ্যায়ে যে ক্ষুদ্র তালিকা আছে তাহাতে সামান্য পরিবর্তিত নামাদি পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু পুরাণাদিসহ সামঞ্জস্য বিধানের সহায়ক হইয়াছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ের তালিকার আসুরীর পূর্ববর্ত্তী যাজ্ঞবল্ক্য আছে, তৎপূর্ববর্ত্তী উদ্দালক আরুণি ও তৎপূর্ববর্ত্তী অরুণ ও তৎপূর্ববর্ত্তী উপবেশী ও তৎপূর্ববর্ত্তী কুশ্রী আছে। শেষোক্ত ক্ষুদ্র তালিকায় কুশ্রী হইতে বাৎস্য শাণ্ডিল্য হইয়া সঞ্জীবী পুত্রে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। ২।৪ অধ্যায়ের তালিকায় গালব, কুমার হারিত, কৌশর্য্য কাপ্য, শাণ্ডিল্য, বাৎস্য হইয়া গৌতমাদি ঘৃতকৌশিক পর্য্যন্ত নাম আছে যাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এই উদ্দালক আরুণি গৌতম ও তৎশিষ্য বাজসনেয় যাজ্ঞবল্ক্যের বিষয় ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৩ ব্রা ৭ মন্ত্রেও পাওয়া যাইতেছে। ইহাতে ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকাদি এবং শুক্ল যজুর্ব্বেদ ও কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের সংযোগ দেখা পাওয়া যাইতেছে। কারণ ইঁহার শিষ্য ও পুত্র শ্বেতকেতু ইঁহার পৌত্র কঠোক্ত নচিকেতা, ইঁহার জামাতা কৌষিতকেয় কহোল দৌহিত্র অষ্টাবক্র। ইঁহার অপর শিষ্য কুসুরুবিন্দ কৃষ্ণযজু ও শুক্ল-যজু ও শতপথ ব্রাহ্মণে দ্রষ্টা। পূর্ব্বোক্ত ২।৪ অধ্যায়ের তালিকায় প্রাপ্ত আসুরী সাংখ্যকার হইলে (সাংখ্যকার বলিতে কপিলকেই লক্ষ্য করে)। এখন কোন্ কপিল সাংখ্যকার এই প্রশ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়, কারণ এক কপিল বিশ্বামিত্র বংশে পাই। মহাভারত অনু ৪ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

মহাভারতে উদ্যো ১০৮ অঃ সাংখ্যযোগ প্রবর্ত্তক অগ্নি অবতার কপিল উক্ত দেখা যায়। ঐ উদ্যোগপর্ব্বের ১০৮ অধ্যায়ে সূর্য্যপুত্র চক্রধনু সাগরবংশ ধ্বংসকারী এক কপিল পাওয়া যায়। ভাগবতে কর্দ্দম ঔরসে দেবহুতী গর্ভজাত এক কপিল স্বীয় মাতাকে সাংখ্যযোগ শুনাইয়াছেন, ঐ ভাগবতে ব্রহ্মার মানসপুত্র কপিল, আসুরী, পঞ্চশিখ প্রভৃতির উল্লেখ দেখা যায়। লিঙ্গ পুরাণে প্রিয়ব্রত পুত্র কপিল লিখে, হরিবংশে কশ্যপ তনয় কপিল ও বিতথ তনয় কপিল দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে তীর্থমধ্যে বঙ্গদেশে সাগর সঙ্গমে কপিলের স্থানে পৌষ সংক্রান্তিতে মেলা হয়। গুজরাটে শুষ্ক সরস্বতী তীরে কপিলাশ্রম পাওয়া যায়। বিকানীরে কপিলায়তন নামে ক্ষুদ্র হ্রদতীরে কার্ত্তিক মাসে মেলা হয়। এইরূপ কাত্যায়ন ও বহু পরিদৃষ্ট হয়। শ্রৌত সূত্রাদি প্রণেতা বিশ্বামিত্র বংশীয় কাত্যায়ন। স্মৃতিকার কাত্যায়ন গভিল পুত্র। সর্ব্বানুক্রমী ও প্রাতিশাখ্য প্রণেতা শৌনক শিষ্য কাত্যায়ন। বিশ্বামিত্র বংশীয় দেবরাত তনয় যাজ্ঞবল্ক্য ঔরসে কাত্যায়নী গর্ভে কাত্যায়ন বেদসূত্র প্রণেতা (স্কন্দে নাগর খণ্ড ১২৯।১৩০ শ্লোক)। সোমদত্ত পুত্র বর্ষ শিষ্য কাত্যায়ন (বররুচি) বার্তিককার (কথাসরিৎ সাগর) রামায়ণে আদিপর্ব্বে রাজা দশরথের মন্ত্রী কাত্যায়ন, মৎস্য ১১৫ অঃ আঙ্গিরস কাত্যায়ন প্রশ্ন উপনিষদে কবন্ধি কাত্যায়ন উল্লিখিত আছে। মৎস্য পুরাণে ১৯৯ অঃ কাশ্যপ বংশীয় এক কাত্যায়ন পাওয়া যায়। এইরূপ বহু যাজ্ঞবল্ক্য আছেন। মহাভারতে অনুশাসন পর্ব্বে ৪র্থ অধ্যায়ে বিশ্বামিত্র তনয় যাজ্ঞবল্ক্য। বিশ্বামিত্রের পালক পুত্র দেবরাজ তনয় যাজ্ঞবল্ক্য (হরিবংশ ২৭ অঃ) পদ্মপুরাণ পাতাল খণ্ডে রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞে এক যাজ্ঞবল্ক্যের উল্লেখ দেখা যায়। বিষ্ণুপুরাণে ৩।৪ অধ্যায় বৈশম্পায়ন শিষ্য বিষ্ণুরাত পুত্র এক যাজ্ঞবল্ক্য দেখা যায়, ঐ অধ্যায়ে বাস্কপি শিষ্য এক যাজ্ঞবল্ক্যের উল্লেখ আছে। মৎস্য পুরাণের ২০০ অধ্যায়ে বশিষ্ঠ বংশে একজন ও অত্রি বংশে

একজন যাজ্ঞবল্ক্য মিলিতেছে। অগ্নিপুরাণে ১৬ অঃ কল্কি-পুরোহিত এক যাজ্ঞবল্ক্য দেখা যায়। মৎস্যপুরাণে ৪৭ অধ্যায়ে যোগপ্রণেতা-এক যাজ্ঞবল্ক্য। কূর্ম্মপুরাণে ২৫ অধ্যায়ে পরীক্ষিত পৌত্র সতানীক এক যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট বেদাধ্যায়ন করেন। স্মৃতিকার এক যাজ্ঞবল্ক্য আছেন। পূর্ব্বোক্ত উদ্দালক শিষ্য বাজসনেয়ী যাজ্ঞবল্ক্য শুক্ল-যজুর্ব্বেদ ও শতপথ ব্রাহ্মণের আখ্যাতা। মহাভারতে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ অভিষেক কর্ত্তা ব্রহ্মজ্ঞ যাজ্ঞবল্ক্য (সভাপর্ব্ব ৪।৩২)। বৈশম্পায়ন যাজ্ঞবল্ক্য মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ৩১৯ অঃ। জনক যাজ্ঞবল্ক্য মহাভারত ৩১১ অঃ। বেদান্ত দর্শনোক্ত কাশ কৃৎস্ন অদ্বৈতবাদী, পাণিনীয় সূত্র ২।৪।৬১, ৪।১।১০৫ ও ৪।২।৮০তে উল্লিখিত। ইনি পূর্ব্ব-মীমাংসার সংকর্ষণ কাণ্ডের রচয়িতা। কার্ষ্ণাজিন কৃষ্ণপরাশর পুত্র বৈদান্তিক, মৎস্যপুরাণ ২০০ অঃ ও পাণিনীয় ২।৪।৬৯ সূত্রে উক্ত। বাদরী ঐ মৎস্য পুরাণ মতে শ্যাম পরাশর গোত্রীয় সগুণব্রহ্ম-বাদী। ঔড়ুলোমী ভেদাভেদবাদী। আশ্মরথ্য ১।২।২৯ ও ১।৪।২০তে উক্ত বিশ্বামিত্র গোত্রীয় বটেন। এক নামযুক্ত বহু ব্যক্তি থাকায় এবং আবির্ভাবকাল পৃথক্ হওয়ায় ঐতিহাসিক ভাবে দৃঢ় নির্ণয় দুরূহ ব্যাপার। শুক, বৈশম্পায়ন, সুমন্তু, পৈল প্রভৃতি ব্যাসপুত্র ও শিষ্য প্রশিষ্যগণ সমগ্র বেদ অধ্যয়ন না করিয়া কতকাংশ লইয়া এক এক শাখা করেন ও তাহারই অধ্যয়ন অধ্যাপনা করেন, তাঁহাদের নাম-তালিকা বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ ভাগবৎপুরাণে বিশদভাবে বর্ণিত আছে। জাতুকর্ণ পরাশর তনয় শুকদেব যিনি শ্রীমদ্ ভাগবতের বক্তা তাঁহার পুত্রগণ মধ্যে গৌড়পাদ শ্রেষ্ঠ অদ্বৈতবাদী। শুকপুত্র গৌড় এই কথা হরিবংশের ১৮, লিঙ্গপুরাণে ৬৩, কূর্ম্মপুরাণে ১৯।২৬, দেবীভাগবতে ১।১৯, সৌর পুরাণের ৩০, বায়ুপুরাণে ৭৩।১২, শিব ধর্ম্মোত্তরে ১২ এবং পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডে ৯ দ্রষ্টব্য। প্রচলিত গুরু-পরম্পরা স্মরণ বাক্যেও দেখা যায়। নারায়ণং পদ্মভবং বশিষ্ঠং শক্তিঞ্চ তৎপুত্র পরাশরঞ্চ। ব্যাসং শুকং গৌড়পাদং মহান্তং গোবিন্দ যোগীন্দ্র মথাস্যশিষ্যং। এখানে গৌড়পাদ পর্য্যন্ত পুত্র এবং গোবিন্দপাদশিষ্য। গৌড়পাদ কৃত সাংখ্যকারিকা ও মাণ্ডুক্য উপনিষদের কারিকা প্রসিদ্ধ। ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় আরণ্যকে ঋষি মণ্ডুক ও তৎপুত্র মাণ্ডুকের নাম আছে। মণ্ডুক হইতে উপনিষদের নাম মাণ্ডুক্য হইয়াছে। মাণ্ডুকের নামটি বিষ্ণুপুরাণ ৩।৪ ও ভাগবতের ১২শ স্কন্ধে দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি তথায় পৈলশিষ্য ইন্দ্রপ্রমতির শিষ্য। মাণ্ডুকের ও শাকপুনি নিরুক্তকার উভয়েই ইন্দ্র প্রমতি-শিষ্য। বশিষ্ঠ গোত্রে ইন্দ্রপ্রমতি নাম দেখা যায়। সুতরাং মাণ্ডুক্য উপনিষদের কারিকা গৌড়পাদ হওয়া অসম্ভব বলা চলে না।

মোঘল রাজদরবারে হিন্দী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী, এম্-এ, পি-আর্-এস্

সম্রাট শাহ্‌জাহানের রচিত অনেক কবিতা আছে, সেগুলি প্রায়ই রাধাকৃষ্ণ রসমিশ্রিত :—

মেরে তো আযে হো ভোরে,
সব নিশি আত হো বসে,
তুরত হী মানি বিত, সো কৈসে দুরত,
সো আস সব হবে।
চার জাম জানত জন ঘেরী হম সংগ,
ভাগবেকী গরজ হবে।
শাহজাঁহা পিয় পৈত্র গই তুমহারী চোরি ছো হরে॥

(কানু) তুমি সমস্ত নিশি অন্যত্র যাপন করিয়া ভোরে আমার সম্মুখে আসিয়াছ। তুমি যে এই মাত্র কেলি করিয়া আসিয়াছ তাহা গোপন করিতে পার না। তোমার এই আশা বৃথা, লোক জানে তুমি আমার সঙ্গে বাস কর। কিন্তু তুমি (নিজের ব্যবহারে) আমার জাগরণের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়াছ। প্রিয়তম, তোমার নীচতা ও চুরি তুমি ত্যাগ করিতে পার নাই।

সম্রাট ঔরংজেব বহুভাবে হিন্দুদের উপর অত্যাচার করিলেও হিন্দী ভাষার উপর অত্যাচার করার খেয়াল তাঁহার মস্তিষ্কে উদিত হয় নাই। একদা ঔরংজেবের পুত্র আজম্‌শাহ কিছু নতুন আম প্রেরণ করেন। ঔরংজেব আম্ররসাস্বাদনে তৃপ্ত হইয়া আমের নামকরণ করিলেন "সুধারস" ও "রসবিলাস"। এই হিন্দী নাম প্রবর্ত্তনের মধ্যে ঔরংজেবের হিন্দী-জ্ঞানের ও প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। ঔরংজেব স্বয়ং কবিতা-কার ছিলেন। তাহার দুই একটী এখনও পাওয়া যায় :—

পাক পরবর দিগর, করিম রহিম বন্দে নিবাজ
জিত্ দেখু তিত তুহি তু ভর রহী
তেরী কুদরত্ কী কোই ন পাবে বাজো নিয়াজ।

হে পবিত্র খোদা, তুমি দয়ালু ও কৃপাবান্, তুমি প্রণতপাল, যে দিকে আমি দেখি, তুমি সেই দিকেই ব্যাপ্ত, তোমার মহিমার রহস্য ও দর্শন কেহ পায় না।

জাহাঙ্গীর ও শাহ্‌জাহানের সমসাময়িক কবিদের মধ্যে সুন্দর, সেনাপতি রত্নাকর ত্রিপাঠী, বিহারীলাল চতুর্ব্বেদী বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। কবিরায় সুন্দর "সুন্দর শৃঙ্গার" নামক কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন। ব্রজভাষায় তিনি 'বত্রিশ সিংহাসন' অনুবাদ করেন। এই পুস্তকখানি মোঘল যুগে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। আকবরের সময় উহা পারসী ভাষায় অনূদিত হয়। পরে লালুজী লাল তাহা হিন্দী ভাষায় অনুবাদ করেন।

সেনাপতি কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ এবং কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। "কবিত্ব রত্নাকর" তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা। তাঁহার রচনায় বিশেষভাবে প্রকৃতি বর্ণনা আছে। কৃষ্ণপ্রেমের বিগলিত ধারায় প্রকৃতি ভিতর দিয়া নিরন্তর বহিয়া চলিয়াছে। ত্রিপাঠী পরিবারের দান এই যুগের হিন্দী-সাহিত্যে বিশেষ স্থানলাভ করিয়াছে। রত্নাকর ত্রিপাঠী ও তাঁহার চারি পুত্র চিন্তামণি, ভূষণ, মতিরাম ও নীলকণ্ঠ সকলেই সুপরিচিত কবি ছিলেন। চিন্তামণি শাহ্‌জাহানের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি বহু হিন্দুরাজার অনুগ্রহলাভে তৃপ্ত হইয়াছিলেন। সাহিত্য-বিচারে

তাহার স্থান খুবই উচ্চ। "ছন্দবিচার", 'কাব্যবিবেক', "কবিকুল কল্পতরু" এবং 'কাব্যপ্রকাশ' পুস্তকে চিন্তামণি তাঁহার কাব্যপ্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। তিনি কবিতায় "রামায়ণ" রচনা করিয়াছেন। মূল গ্রন্থ অধুনা দুষ্প্রাপ্য।

মতিরাম ত্রিপাঠী শাহজাহানের রাজসভা-কবি ছিলেন। তিনি বুন্দীরাজ রাহুসিং ও শম্ভুনাথ শোলাঙ্কী দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত হইয়াছেন। 'ললিত-ললাম' নামক গ্রন্থে তিনি ছন্দবিচার করিয়াছেন, "ছন্দসার পিঙ্গল" নামক গ্রন্থ তিনি শম্ভুনাথ শোলাঙ্কীকে উৎসর্গ করিয়াছেন। "রসরাজ" গ্রন্থে প্রেমিক প্রেমিকার রাগ অনুরাগ বর্ণন করিয়াছেন। হিন্দী আদি রসাত্মক কাব্য-সাহিত্যে ইহার স্থান আছে।

ভূষণ প্রণীত কাব্যের মধ্যে "শিবরাজভূষণ", "শিববাবনী", "ছত্রশাল দশক", প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। তাঁহার অনেক পদ লোকপ্রিয়। কথিত আছে মহারাষ্ট্রপতি শিবাজী ভূষণ রচিত একটী কবিতা বায়ান্নবার শুনিয়াও তৃপ্ত হন নাই। প্রীতিলাভান্তে শিবাজী ভূষণকে ৫২ হস্তী ৫২ গ্রাম ও ৫২ লক্ষ মুদ্রা পুরস্কার দিয়াছিলেন।

এই যুগের কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিহারীলাল চতুর্ব্বেদী। তাঁহার জন্ম গোয়ালীয়রে, শৈশব অতিবাহিত হইয়াছে বুন্দেলখণ্ডে, বিবাহিত জীবন মথুরাপুরীতে। মথুরানগরে তাঁহার কাব্য প্রতিভার স্ফুরণ হইয়াছে, সেই জন্যই বোধ হয় বিহারীলালের রচনা অধিকাংশ ব্রজভাষায় রচিত, রাজা জয়সিং তাঁহাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করিয়াছিলেন, প্রত্যেকটী দোঁহার জন্য বিহারীলালকে একটী আসরফি প্রদান করিতেন। ঔরংজেব পুত্র আজমশাহ তাঁহাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন। বিহারীলালের পাণ্ডিত্য অতুলনীয়, ছন্দোজ্ঞান অপরূপ, প্রতিভা অপূর্ব্ব, রসবোধ অনুপম; বিহারীলালের কাব্য রাধাকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেকটী পয়ারে তাঁহার এক একটী কবিতা পূর্ণতালাভ করিয়াছে। অথচ প্রত্যেকটী কবিতাতে এক একটী বিভিন্ন-ভাব মূর্ত্ত হইয়াছে। রসবোধের জন্য অন্য কোন কবিতার উপর নির্ভর করিতে হয় না। নায়ক বর্ণন, নায়িকা বিচার, ভাষার ঝঙ্কারে ও মূর্চ্ছনা ভাবের বিভিন্ন প্রকাশে বিহারের কাব্য হিন্দী-সাহিত্যকে বিশেষভাবে রূপায়িত করিয়াছে। বিহারী 'শতসই' সংস্কৃত 'সপ্তশতক' গ্রন্থের অনুকরণে রচিত হইলেও ইহার মধ্যে রসবৈশিষ্ট্য আছে। তুলসীদাসের 'শতসই' অপেক্ষা বিহারী 'শতসই' অধিকতর লোকপ্রিয়। বিহারী 'শতসই'এর একত্রিশ জন টীকাকার আছেন। হরপ্রসাদ তাহার সংস্কৃত অনুবাদ করিয়াছেন। আজমশাহ বিহারীলালের সংকলন করিয়াছেন, তাহা 'আজমশাহী ক্রম' নামে পরিচিত। প্রকৃতির সঙ্গে বিহারীলালের অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল। তাই প্রকৃতি বর্ণনায় তাঁহার মনের সূক্ষ্মতর দিকের সন্ধান পাওয়া যায়। মেঘের সঙ্গে বিহারীলালের নিবিড় পরিচয় ছিল। বিহারীলালের খণ্ডকাব্যের নায়ক ছিল মলয়। বিহারীলালের মলয় একদা যাত্রা আরম্ভ করিল পথশ্রান্ত পথিকের ছদ্মবেশে দক্ষিণমেরু হইতে প্রিয়তমার সন্ধানে—যেমন চলিয়াছিল সহস্র বৎসর পূর্ব্বে একদা "আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে" কালিদাসের নায়ক বিরহী যক্ষ মেঘের ছদ্মবেশে তাঁহার প্রিয়তমা সন্ধানে। বিহারীলালের নায়ক মলয় চলিয়াছে স্বয়ং শ্রান্ত পথিকের বেশে।

মোঘল সম্রাটগণের হিন্দী-প্রীতির রেশ আমরা রাজপুত রাজগণের মধ্যে ন্যূনাধিক পরিমাণে খুঁজিয়া পাই। ইহারা অনেকেই স্বয়ং কবি ছিলেন। অনেকেই হিন্দী কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। রাজপুত কুলনারীগণও হিন্দী আলোচনা করিতেন এবং কবিদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বহুজন বৈষ্ণব ভাবধারায় অনুপ্রাণিতা ছিলেন। কেহবা রামরসামৃত পানে তৃপ্তা ছিলেন, সেই জন্য

সমসাময়িক যুগ-সাহিত্যে নারী-রচনা প্রায়ই ব্রজভাষায় রচিত। মীরাবাই রচিত ভক্তি ও প্রেম রসাপ্লুত দোঁহাবলি সমস্ত হিন্দী-সাহিত্যকে অপূর্ব্ব রসশ্রীমণ্ডিত করিয়াছে।

রাজপুত জনগণের পৃষ্ঠপোষকতার প্রমাণ সমসাময়িক কবিগণের কাব্য উৎসর্গ-পত্রের ভিতর খুঁজিয়া পাওয়া যায়। মতিরাম ত্রিপাঠী তাঁহার রচিত 'ললিত ললাম' বুন্দীরাজ ররবাহুসিংকে উৎসর্গ করিয়াছেন। 'ছন্দসার পিঙ্গল' শোলাঙ্কীরাজ শম্ভুনাথকে উৎসর্গ করিয়াছেন। ভূষণ ত্রিপাঠীর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সিতারাপতি শিবরাজ, পান্নারাজ ছত্রশাল। কেশবদাস তাঁহার গ্রন্থ 'বিজ্ঞানগীতা' ওরচারাজা মধুকরশাহকে অর্পণ করিয়াছেন। 'রামচন্দ্রিকা' মধুকর পুত্র ইন্দ্রসিংকে দান করিলেন। প্রথম জীবনে তীকমাপুর নিবাসী কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ ছিলেন, পরে জয়পুরের আশ্রিত ছিলেন। শেষ জীবনে আকবরের সভাকবি পদ-লাভ করেন। তানসেনও বহু রাজপরিবারের অনুগ্রহ-লাভ করেন। দেবদত্ত রাজা ভোগীলালের প্রিয়-পাত্র ছিলেন। কুলপতি মিশ্র গৌড়রাজকর্তৃক অনুগৃহীত ছিলেন। কালিদাস ত্রিবেদী জম্বুরাজার সভাকবি পদ লাভ করেন। জম্বু হইতে গৌড় পর্য্যন্ত প্রত্যেক রাজসভায় যে হিন্দীর প্রচলন ছিল তাহা সমসাময়িক কবিদের উৎসর্গ পত্রের দ্বারা অনুমিত হয়। ইতিহাস লেখকরূপেও আমরা কয়েকজন সভাকবির পরিচয় পাই। মহারাজ জগৎসিং ও শাহ্‌জাহানের সংগ্রামের সুন্দর কাহিনী কবি গম্ভীর রায় হিন্দীতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। রাণা রাজ-সিংহের জীবনী অবলম্বন করিয়া "রাজপ্রকাশ" রচিত হইয়াছে। রাজসিংহের সভাকবি মান "রাজদেব বিলাস" গ্রন্থে ঔরংজেব ও রাজসিংহের কাহিনী গ্রথিত করিয়াছিলেন। কবি সদাশিব "রাজ রত্নাকর আখ্যায়" রাজসিংহের কাহিনী রচনা করিয়াছেন। রাজসিংহের পুত্র রাণা জয়সিংহের জীবনী 'জয়দেব বিলাস' গ্রন্থে নিবদ্ধ আছে। "জগৎসিংহকে" কেন্দ্র করিয়া একজন অনামী লেখক "জগৎ বিলাস" রচনা করিয়াছেন। রাজ-পুতদের মধ্যে মেবার, মাড়োবার, বুঁন্দি প্রভৃতি রাজাই হিন্দীর বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছে। রাজগণের মধ্যে অনেকেই হিন্দী ভাষায় স্বরচিত অর্ঘ্য দান করিয়াছেন। মাড়োয়াররাজ সুরজসিং, বুন্দীরাজ বুদ্ধসিং, পান্নারাজ ছত্রশাল, জয়পুর রাজ রাজা জয়সিং, টোডরমল, বীরবল, মনোহর দাস, মানসিং বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র

৺কাশীধাম
৬-৫-২১

শ্রীমান—,

গতকল্য তোমার একখানি দীর্ঘ পত্র পাইয়াছি। এ পত্রেও তোমার সেই পূর্ব্ব পত্রের সকল কাহিনী যেমন তেমনই রহিয়াছে। অথচ লিখিতেছ আমার পত্র পাইয়া—আমার উপদেশে তোমার যে কত উপকার হইয়াছে তাহা তুমি লিখিয়া জানাইতে পার না। কি যে উপকার হইল আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। পূর্ব্বেকার সকল অভিযোগ সকল কাঁদুনিই ত সমানভাবেই রহিয়াছে দেখিতেছি। ইহাতে কেমন করিয়া বুঝিব তোমার উপকার হইয়াছে। সকল কাজই অভ্যাস করিয়া শিখিতে হয়। তোমাদের কিন্তু দেখিতেছি ধর্ম্মকর্ম্ম অথবা চিত্ত সংযম, এ সকলের জন্য যে অভ্যাসের প্রয়োজন আছে, তাহা তোমরা একেবারেই স্বীকার কর না। তোমরা দুদিন চোখ্ বুজিয়া অথবা চারিদিন একটু জপ করিয়াই একেবারে মহাধ্যানী, মহাভক্ত হইয়া উঠিতে চাও। আর সকল বিষয়ে পরিশ্রম করিতে রাজী আছ ও তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে পার কিন্তু ধর্ম্মকর্ম্মের বেলায় একেবারে একটু দেরী সহ্য হবে না, মহা উতলা হইয়া পড়িবে। যা হোক্। জন্ম জন্ম অভ্যাস করিলে তবে একটু চরিত্র গঠন হয়। তোমরা কিন্তু সে কথা না বুঝিয়া তিন দিনেই সব মারিয়া নিতে চাও। কি আর বলিব। তুমি আমার পত্র নিশ্চয়ই মনোযোগ দিয়া পড় নাই। পড়িলে আবার পুরাতন প্রশ্ন ওরূপভাবেই করিতে না। মন স্থির করা কি এতই সোজা? কোন পরিশ্রম না করিয়াই তাহা করিতে চাও? আমার পূর্ব্বপত্রে বোধ হয় তোমাকে সকল কথাই লিখিয়াছি। আর আমার এখন কিছুই লিখিবার নাই। আমার শরীর একেবারে ভাল নহে। তোমার চিঠি পড়িয়া আমার বিশেষ কষ্ট হইয়াছিল। এসব কথা শুনিবার বা বলিবার আর আমার সামর্থ্য নাই দেখিতেছি। যদি আমার শরীরে বলাধান হয় তাহা হইলে এরূপ পত্রের উত্তর দিবার চেষ্টা করিব। যাহা বলি তাহা যদি নাই শুন, সেইরূপ করিবার চেষ্টা যদি নাই কর, তাহা হইলে বলা বৃথা ভিন্ন আর কি বলিব? সকলে ভাল আছে জানিয়া সুখী হইলাম। এখানে খুব গরম পড়িয়াছে। দিনরাত সমান গরম চলিতেছে। সকলেরই খুব কষ্ট হইতেছে। উভয় আশ্রমের সকলে একরূপ ভাল আছে। তোমরা শুভেচ্ছাদি জানিবে। ইতি।

তুরীয়ানন্দ

মধ্য-ইউরোপে বেদান্ত

স্বামী জ্যোতিশ্বরানন্দ

ধর্ম্মকে কোন দেশ বা জাতি বিশেষের নিজস্ব সম্পত্তি বলা চলে না। ধর্ম্মের অভিব্যক্তি কোন না কোন আকারে জগতের সর্ব্বত্রই দেখা যায়। ইউরোপের বর্ত্তমান আর্থিক ও রাজনৈতিক চাঞ্চল্যের মধ্যেও আধ্যাত্মিক সাধনাকে সুখসাধ্য করবার জন্য অনেকের ভেতর একটী নতুন ধর্ম্ম গড়ে তুলবার বাসনা জেগে উঠেছে।

প্রায় চার বছর আগে প্রতীচ্যের এরকম একদল ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষকে নিম্নোক্ত পত্র লিখেছিলেন :—

"খুবই সঙ্কোচের সঙ্গে আপনার নিকট একটী নিবেদন জানাচ্ছি। আপনার সঙ্ঘ থেকে আমাদের কাছে এমন একজন স্বামীজিকে পাঠাবেন যিনি আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনে গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত হবেন। বর্ত্তমানে আমাদের যে অবস্থা তাতে আমরা এরূপ একজনকে পেলে খুবই উপকৃত হব। আজ জীবন আমাদের খুব দুঃসহ মনে হচ্ছে, দিনের পর দিন ছুটে চলেছি কিন্তু প্রকৃত আদর্শের সন্ধান আমরা পাচ্ছি না, পরিপূর্ণ মানবজীবন আমাদের লক্ষ্যের বাইরে।

"আমরা জানি না আপনাদের কোন স্বামীজিকে পাওয়ার সৌভাগ্য আমাদের হবে কি না কিন্তু একথা আমরা বলতে পারি, যদি আমাদের সে সৌভাগ্য হয় তবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য ভাষা আমরা খুঁজে পাব না। বইয়ে জ্ঞান দিয়ে সত্যকে উপলব্ধি করা ত কখনও সম্ভব হয় না, দেখিয়ে দেবার মত লোক না থাকলে সত্যের পথ খুঁজে পাওয়া খুবই কষ্টকর ব্যাপার।

"আমাদের ধৃষ্টতা মাপ করবেন, স্বামীজি! একটী কথা আমাদের বলবার আছে—সেটী হচ্ছে আপনার সঙ্ঘকে এবং এর মূলে যিনি সেই শ্রীশ্রীঠাকুরকে আমরা আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা করি।

"বলা বাহুল্য, সাক্ষাৎভাবে ধর্ম্ম-উপদেশ পাওয়ার আর কোন পথ আমাদের সাম্‌নে নেই। অর্থাভাবে ভাবতে যাওয়া আমাদের হ'য়ে উঠবে না।"

পত্রে যে আন্তরিকতা ফুটে উঠেছে তা মিশনের কর্ত্তৃপক্ষ ভাল ক'রে উপলব্ধি করেন এবং আমাকে ১৯৩৩ সালের নভেম্বর মাসে তাঁদের প্রতিনিধিরূপে পাঠিয়েছেন। এ রকম ক'রে ইউরোপে বেদান্ত প্রচারের গোড়াপত্তন হয়।

চার বছরের বেশী আমি ইউরোপে আছি, এরমধ্যে জার্ম্মানী ও সুইজারল্যাণ্ডের বহু উদারমনা সত্য-সাধকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। পোল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও হল্যাণ্ডের বহু বেদান্তের ছাত্রের আহ্বান আমি পেয়েছি। আমি যে সব দেশে গেছি, সেখানে দেখেছি ধর্ম্মের গোঁড়ামি ও ভগবানে মানুষ-ভাবের অতিরিক্ত আরোপের উপর বিরক্ত লোকের সংখ্যা ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে। তাঁদের কেউ কেউ কোন ধর্ম্ম সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত, আর কেউ কেউ কোন ধর্ম্মভুক্ত নন। নতুন একটা আলোর জন্য এঁরা উদ্‌গ্রীব হ'য়ে উঠেছেন। এঁদের কাছে বেদান্তের বাণী পৌঁছেছে খুবই। বেদান্ত এঁদের বিচার ও ভক্তি উভয়কে আকৃষ্ট ক'রে আশা ও অনুপ্রেরণাকে জাগিয়ে তুলেছে, আর দেখিয়ে দিয়েছে আধ্যাত্মিক সাধনার

একটী নির্দ্দিষ্ট পথ। এদের মধ্যে বেশী আগ্রহশীল যাঁরা, বেদান্তের প্রতি তাঁদের আস্থা ক্রমেই দৃঢ় হচ্ছে। বেদান্তের অদ্ভুতশক্তি তাঁরা ধীরে ধীরে বুঝতে পারছেন। তাঁদের কর্ম্মজীবনেও বেদান্তের বাণী কিছু কিছু রূপায়িত হ'য়ে উঠ্‌ছে।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বিশিষ্ট শিক্ষিত ভক্তদের (স্ত্রী ও পুরুষ উভয় শ্রেণীরই) নিকট থেকে যে সকল চিঠি পাওয়া গেছে তার কিছু কিছু নিয়ে উদ্ধৃত করা গেল। এ থেকে উপরের বক্তব্যটী বোঝা বেশ সহজ হবে।

"বেদান্ত-শিক্ষার সুযোগ পেয়ে আমি কৃতার্থ হয়েছি।

"এরূপ মহান্ ভাবগুলির সংস্পর্শে আসা যে কত সৌভাগ্যের বিষয় তা আমি বুঝতে পেরেছি। আপনার নিকট সাধনার একটী নির্দ্দিষ্ট পথ পেয়ে কৃতজ্ঞ।

"শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের ধর্ম্ম-আন্দোলনের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে এসে আমি খুবই উপকৃত। এতে আমি বেদান্ত অনুসরণ কর্‌বার সহজ পন্থা পেয়েছি। এর আগে আমি এমন অস্থির ও হতাশ হয়ে পড়েছিলাম যে জীবনটাকে ঘৃণাই কর্‌তাম। এখন কিন্তু আমি জেনেছি যে ঈশ্বর এই শরীরে বাস করেন এবং তা ভেবে ক্রমশঃ শান্তির পথে এগিয়ে চলেছি।

"সময় বিশেষে আমি অনির্ব্বচনীয় শান্তি উপভোগ করি কিন্তু ভয় হয় এ অবস্থা আমার চিরদিন থাক্‌বে না। হয়ত আবার অশান্তির ঝড়ে আমার সমস্ত ভাব ও আদর্শ এদিক ওদিক হয়ে যাবে। কিন্তু মনে হয়, এমন কি কোন উপায় আছে যার বলে আমি সজ্ঞানে শাশ্বত 'আমির' সংস্পর্শে আস্‌তে পারব এবং সে 'আমির' সত্তা সম্বন্ধে মন কখনও সন্দেহ আসবে না? তখনই আমি সনাতন শান্তির অধিকারী হব এবং তখনই জীবনের সকল রকম দুঃখ কষ্ট ও মায়ামোহ আমার কাছে উপেক্ষার বিষয় হ'য়ে দাঁড়াবে।

"ধ্যানের সময় এবং পরে আমি একটী বেশ শান্তভাব অনুভব করি। কিন্তু আমার দুর্ব্বলতার কথা আমাকে এমনই চঞ্চল ক'রে ফেলে যে আমি কেঁদে ফেলি।

"আমি কিছু কিছু ধ্যান কর্‌বার চেষ্টা করি কিন্তু মনে হয়, আমার ধ্যান হয়ে উঠে না, তবুও আমি ছেড়ে দিই না। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যাতে তিনি আমাকে বল দেন—আমি যেন ক্রমশঃ এগিয়ে চলি ও দিনের কাজ দিন বেশ ভালভাবে কর্‌তে পারি। আপনার শিক্ষাগুলি আমার ভাবধারাকে বদ্‌লিয়ে দিয়েছে। ··· ··· আমি কি দিয়ে যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব তা খুঁজে পাচ্ছি না।····· ···আপনার শিক্ষা ছাড়া আর কোন কিছু আমাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পার্‌বে না। এ রকম সহজ ও সরল উপদেশ আমি আর কোথাও শুনিনি।"

প্রথম দু বছরের রিপোর্টের কিয়দংশ

(১৯৩৩—৩৫)

প্রথম দু-বছরের ওয়েজবাডেনে (জার্ম্মানী) ব্যক্তিগতভাবে ও এক একটী দল নিয়ে জার্ম্মাণীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও ওয়ালা সহরে আমার কাজ আরম্ভ হয়েছিল। সুইজারল্যাণ্ড ও পোল্যাণ্ডে বেড়াবার সময় আমি এই ভারতীয় ভাবাপন্ন মনীষীদের সংস্পর্শে এসেছি। আমার অন্যান্য কাজের মধ্যে সেণ্টমরিজ ও জেনেভায় নিয়মিত বক্তৃতা ও ক্লাস, জুরিকে কিছু প্রাথমিক কাজ, পণ্ডিতদের সঙ্গে কৃষ্টিগত বন্ধুতা স্থাপন করা ও বিভিন্ন পথের বহু একনিষ্ঠ সাধকের সংস্পর্শে আসা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৯৩৬ ও ৩৭

ওয়েজবাডেন সহরেই আমি প্রথমে নিমন্ত্রিত হয়ে আসি। ৩৬ সালের গরম ও শীতের সময়

ওয়েজবাডেনে (জার্ম্মানী) প্রায় তিনমাস থাকি। আমি নতুন লোক ও ভক্তদের মধ্যে ক্লাস করতে লাগলাম। সে সময় থেকে ১৯৩৬ সালের গরম পর্য্যন্ত আমি বিভিন্ন ক্লাসে Swami Brahmananda's Spiritual teachings, নারদীয় ভক্তিসূত্র, ভগবদ্গীতা, কথামৃত, শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব সংবাদ, উপনিষদের কিছু কিছু, রাজযোগ ও বিভিন্ন ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িয়েছি। এই সময় ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য বিশেষ ক্লাস এবং বহু জিজ্ঞাসুর সহিত দেখাশুনা করতে হয়েছে। একজন বিশিষ্ট ভক্তের ক্লাস নোট থেকে বাইরের বহু আগ্রহশীল লোকের উপকার হয়েছে। ভবিষ্যতে এই সকল নোট থেকে যে বই হবে তা থেকেও বহুলোকের উপকার হবে আশা করি।

১৯৩৬ সালের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত এখানেই আমার প্রধান-কেন্দ্র ছিল। এরপর জুরিকে কেন্দ্র ক'রে মধ্য-ইউরোপে বেদান্ত প্রচারের কাজ আরম্ভ হয়।

জেনেভা (সুইজারল্যাণ্ড)

১৯৩৬ সালের গোড়ার দিকে দ্বিতীয়বার এখানে আসি এবং একজন বন্ধুর অনুরোধে প্রায় চারমাস এখানে থাকি। বন্ধুটী বহু আগেই বেদান্তের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয় ১৯৩৫ সালের বসন্তের শেষ দিকে।

জেনেভা সহরের দুই জায়গায় সপ্তাহে চারবার ক'রে আমাদের সভা বস্‌ত। তা ছাড়া এখানকার আন্তর্জাতিক থিওজফিক্যাল সোসাইটীতে "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মিলন" (Synthesis of Eastern and Western Culture) সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা দিই। বক্তৃতায় বলেছিলাম, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়ের উচিত নিজেদের ভাল জিনিষকে সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষা করা। তারপর পরস্পরের মধ্যে যা ভাল ও শুভপ্রদ, তাকে আদর ক'রে গ্রহণ করা। এরকম ভাবে নিজ নিজ ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখলে প্রত্যেকেই বেড়ে উঠবে, এর বদলে যদি উভয় সভ্যতাকে এক ছাঁচে ঢালবার চেষ্টা করা হয়, তাহ'লে ফল হবে উভয় সভ্যতারই মৃত্যু।

জেনেভা থাকবার সময় আমাকে 'শতবার্ষিকী' উপলক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে হ'য়েছিল। তা ছাড়া জেনেভা ও ভারযোক্ষের "Institute Monnier"এ কয়েকটী বক্তৃতা এবং স্কুলের ছেলেদের মধ্যে ধর্ম্মের কয়েকটী ক্লাস করেছিলাম।

১৯৩৭ সালের গরম ও শীতের সময় জেনেভায় কিছুদিনের জন্য আমি গিয়েছিলাম। তখন দেখি, ওখানকার সভ্যগণ খুব অধ্যবসায়ের সঙ্গে পড়াশুনা ও ধ্যানভজন চালিয়ে যাচ্ছেন। দেখে খুবই আনন্দ হল যে জিন হারবার্ট ও তাঁর বন্ধুরা স্বামিজির গ্রন্থাবলী ও শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশগুলির অনুবাদ বেশ উৎসাহের সঙ্গে প্রকাশ কর্‌ছেন। সঙ্গে সঙ্গে রেডিওতে ভারতের ধর্ম্মগুরুদের সম্বন্ধে যে সব বক্তৃতা দিচ্ছেন তাতেও জনসাধারণের মধ্যে বেশ একটী আন্দোলন সুরু হয়েছে। ফ্রেঞ্চ ভাষায় Action of Pensee পত্রিকায়ও বহু প্রবন্ধ বের হ'য়েছিল।

লসানে (সুইজারল্যাণ্ড)

থিওজফিক্যাল সোসাইটীর আমন্ত্রণে ১৯৩৬ সালের মার্চ্চমাসে আমি লসানে যাই এবং 'বেদান্তের শিক্ষা', 'আত্মোপলব্ধি ও আধ্যাত্মিক উন্নতিবাদ' (Ideal of Spiritual Evolution & Self-realisation) সম্বন্ধে বক্তৃতা দিই। 'শতবার্ষিকী' উপলক্ষে Societe Vandoise d'Etudes Psychiques-এ শ্রীরামকৃষ্ণের আগমন ও ধর্ম্ম-আন্দোলন সম্বন্ধেও একটী বড় বক্তৃতা দিই, সভাপতি ডাঃ বারথোলেট শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও উপদেশ ফরাসী ভাষায় বিশদভাবে বর্ণনা করেন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে কেমনভাবে 'শতবার্ষিকী'র অনুষ্ঠান

হচ্ছে তারও উল্লেখ করেন। এখানকার একজন বিশিষ্ট ভক্তের বাড়ীতে কয়েকটী সভা বসেছিল, তাতে 'ধর্ম্মের আদর্শ ও সাধনা' এবং অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছিল। ১৯৩৭ সালের গরম ও শীতের সময় আমি আবার লসানে যাই। এদের সভা ছাড়া "Societe Vaudoise d'Etudes Psychiques"-এ ধ্যানের নিয়মাদি সম্বন্ধে তুবার বক্তৃতা দিই। আমার পুরনো ও নতুন সমস্ত বক্তৃতাগুলি ফরাসীতে অনূদিত হয়েছে এবং শ্রোতাদের মধ্যেও আগ্রহের সৃষ্টি করছে।

সেণ্টমরিজ (সুইজারল্যাণ্ড)

মরিজ আল্পসের উপর একটী ছোট সহর। শীত ও গরমের সময় এখানে বহুলোকের সমাগম হয়। ১৯৩৫ সালের জানুয়ারীতে একটী সংঘ তৈরী হয় এবং অদম্য উৎসাহের সঙ্গে তাঁরা নিয়মিত ক্লাস চালাতে থাকেন। ১৯৩৬ ও ১৯৩৭ সালের গরম ও হেমন্তের সময় আমি আবার এখানে এসেছিলাম। সপ্তাহে ২ বার বা তার বেশী প্রবন্ধ পাঠ করা হত। বেদান্তের বাণী ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনপ্রদ উপদেশ এ অঞ্চলের বহু আত্মজিজ্ঞাসুর নিকট জীবনের একটী অমৃতময় অধ্যায়ের সন্ধান দিয়েছে।

একখানি ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'বেদান্ত' ইংরাজী ও ফ্রেঞ্চ উভয় ভাষায় বের করা হচ্ছে এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পাঠান হচ্ছে। বেদান্তের কয়েকজন ছাত্রের স্বতঃপ্রণোদিত প্রাণ-ঢালা পরিশ্রমের উপর পত্রিকাখানি চল্‌ছে। সত্যের বিভিন্ন পূজারীর সঙ্গে তাঁদের ভাবধারার আদান প্রদান হচ্ছে। তাঁদের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা, 'বেদান্ত' (পত্রিকা) তার উদারমত নিয়ে বহুলোকের নিকট একটী নতুন আলো ছড়িয়ে দেয় এবং আদর পায়। বর্ত্তমানে Duplicator দিয়ে পত্রিকার সংখ্যা বাড়ান হয়। অর্থের সংস্থান হ'লে সত্বরই পত্রিকাখানি ছাপান হবে।

প্যারিস্

শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকীর সভায় বক্তৃতা দেবার জন্য আমি প্রথমে এখানে আসি ১৯৩৬ সালের মার্চ্চে। স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় দর্শনবিদ্যার অধ্যক্ষ ম্যাসন কারসেল মিউসিগিমেটে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা দেন। তাঁর আর একটী বক্তৃতা ছিল স্বামীজি সম্বন্ধে সরবোণের Institute of Indian Civilisationএ। দ্বিতীয় সভাটীতে আমি জেনেভা যেতে ওখানে গিয়ে পৌছি। শেষের দিকে গুরু ও শিষ্য—শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের সম্বন্ধ দেখাবার চেষ্টা করি। তুজনেই ছিলেন একই শক্তির তুটো দিক। রামকৃষ্ণ-জীবনে বেদান্তের প্রাচীন আদর্শগুলির উপলব্ধি হয়েছে অতি শান্ত ও নীরবভাবে, আর বিবেকানন্দ-জীবনে সেগুলি হয়েছে প্রচণ্ড গতিশীল, যেন ঠিক বজ্রের মত। স্বামীজির ভেতর দিয়ে তাঁর বাণী ছড়িয়ে পড়েছিল সারা ভারতে ও পাশ্চাত্যের বহু অংশে। সে বাণী বহু আত্মজিজ্ঞাসুর প্রাণে একটী নতুন জাগরণ ও উৎসাহের সঞ্চার ক'রে তাঁদের জীবনকে নীরব পূজা ও ধ্যানে নিযুক্ত করেছিল। শুধু তাই নয়, জীবসেবার মহান্ প্রয়াসও প্রকাশ পেয়েছিল তাঁদের বহু কর্ম্মে।

তু-সপ্তাহ প্রায় প্যারিসে ছিলাম এবং সে সময় "Society of Friends"এ এবং বৌদ্ধদের "Friends of Buddhism"এ কিছু কিছু বল্‌তে হয়েছিল। এ ছাড়া কতগুলি ছোটসভা ও ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনাও করা হ'য়েছিল। সব বক্তৃতাই বেদান্তের উদারমত যা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনে জীবন্ত হয়ে উঠেছে, তা প্রচারের চেষ্টা করেছি। এই তুটী আশ্চর্য্য জীবনে এই মহান্ আদর্শই ফুটে উঠেছে যে, ধর্ম্ম অনুভূতি ছাড়া কিছুই নয়।

ফ্রান্সে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী প্রথমে পৌছেছিল রোঁমারোঁলার অদ্ভুত বই তুটীর (শ্রীরামকৃষ্ণ ও

বিবেকানন্দের জীবনী) ভেতর দিয়ে। পরে যখন মিস্ ম্যাক্‌লাউডের (স্বামীজির আমেরিকান বন্ধু) প্রেরণায় জিন হারবার্ট ও তাঁর বন্ধুরা শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজির উপদেশগুলি ফরাসীতে অনুবাদ করলেন, তখন তা ফরাসীজানা লোকদের মধ্যে শীঘ্র ছড়িয়ে পড়ল। এই রকমে প্রাথমিক কাজের জন্য ক্ষেত্র তৈরী হ'তে লাগল এবং মনে হয়, অদূর ভবিষ্যতে ফরাসীজানা কোন স্বামীজির এখানে খুবই আবশ্যক হবে। মনসেবে হারবার্টের অনুরোধে মিশনের কর্তৃপক্ষ ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ অভাবের কথা বুঝ্‌তে পেরেছেন এবং সেজন্য মিস্ ম্যাক্‌লাউডের অর্থ-সাহায্যে (মিশনের) উপযুক্ত কর্ম্মী স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দজীকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে—যাতে তিনি ভবিষ্যৎ কাজের জন্য তৈরী হ'তে পারেন।

দ্বিতীয়বার আমার প্যারিসে যাওয়া হয় ১৯৩৭ সালের জুলাইতে। তখন সিদ্ধেশ্বরানন্দজী ও মহীশূরের সুব্রহ্মণ্য আয়ার প্যারিসে এসে পৌছেছেন। সুব্রহ্মণ্য আয়ার রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক। ফিলজফিক্যাল কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার জন্য তাঁর এখানে আসা। সিদ্ধেশ্বরানন্দজী ও আমি উভয়েই কংগ্রেসে যোগ দিই। সেখানে অধ্যক্ষ ফাউচার (Institute of Indian Civilisation) এবং অন্যান্য অনেক অধ্যাপক ও জ্ঞানী লোকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়।

তৃতীয়বার ১৯৩৭ নভেম্বর খুব কম দিনের জন্য ওখানে যাই। এবার দেখলাম, স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দজী ফরাসী ভাষা ও আদবকায়দা বেশ দখল ক'রে ফেলেছেন এবং ওখানকার বহু ধর্ম্ম-আন্দোলন ও ধর্ম্ম-পিপাসুর সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন।

যুরিক (সুইজারল্যাণ্ড)

১৯৩৫ সালের শেষের দিকে এখানে আমার আসার পর বহু ধর্ম্মপ্রাণ লোকের সঙ্গে আলাপ হয়। তা থেকে আমি বুঝতে পারি যে ভবিষ্যতে এখানে বেদান্তের কিছু কাজ হ'তে পারে। ১৯৩৬ সালের নভেম্বরে আবার এখানে আসি এবং ১৯৩৭ সালের জুন পর্যান্ত থাকি। এই কয়মাসে আমি বহু বিজ্ঞ অধ্যাপক, ছাত্র, যাজক ও ব্যবসায়ীর সংস্পর্শে আসি, Reformhaus Mdlle এর হার্ কডলফ্ মেডলার (শ্রীরামকৃষ্ণ-আন্দোলনের একজন বিশেষ পৃষ্ঠপোষক)এর সাহায্যে যুরিকে আমার কাজ আরম্ভ হয়। বক্তৃতার জন্য Lecture-Hallটী আমায় ছেড়ে দেওয়া হয়। সেখানে আমার বক্তৃতার বিষয় ছিল 'বেদান্তের আধ্যাত্মিক বাণী', 'আত্মোন্নতি ও যোগপন্থা', 'যোগমার্গে আত্ম-সাক্ষাৎকার' ও 'ভারতের বর্ত্তমান যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ'। তারপরে সপ্তাহে প্রায় দুবার ক'রে নিয়মিত ক্লাস হ'ত। ধর্ম্ম-সম্বন্ধে সকলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা, উপনিষদ, গীতা, রাজযোগ, শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাদি পাঠও আমার কাজের বিশেষ অঙ্গ ছিল। রামকৃষ্ণ-আন্দোলন সম্বন্ধে বিশদ-বক্তৃতাও বিশেষ বিশেষ সভায় করা হয়েছে। ফলে কয়েকটী প্রকৃত ধর্ম্মপিপাসু মহিলা ও ভদ্রলোক নিয়মিত শাস্ত্রাদি পড়াশুনা আরম্ভ ক'রেছেন। ভবিষ্যতে হয়ত তারা একটী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুল্‌বেন।

ধর্ম্ম-বিষয়ে বেশী আগ্রহ যাঁদের, তাঁদের সুবিধার জন্য একটী ছোট বেদান্ত-লাইব্রেরী খোলা হয়েছে। সেখানে ধর্ম্ম-বিষয়ক বই ও পত্রিকা উভয়ই থাকে। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট কয়েকজন নিয়মিত ছোট সভা চালিয়ে যাচ্ছেন। এই রকমে হোমের পুণ্য-শিখা ধীরে ধীরে জ্বলে উঠ্‌ছে যা কালে হয়ত আকাশস্পর্শী হবে।

পরের বার যুরিকে যাই ১৯৩৭এর নভেম্বর দু-সপ্তাহের জন্য। এবারও বন্ধু ও ভক্তদের সঙ্গে নিয়মিত আলাপ আলোচনা ও দেখা সাক্ষাৎ চল্‌তে থাকে। যুরিক হচ্ছে সুইজারল্যাণ্ডের সবচেয়ে বড় ব্যবসার জায়গা এবং এই জায়গাটীই

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের জার্ম্মাণী অনুবাদের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। রোঁমারোঁলার জার্ম্মাণী ভাষায় লেখা শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজির জীবনী জুরিকের কাছাকাছি একটী প্রকাশক কোম্পানী থেকে বেরিয়েছে। রোঁমারোঁলার বইএর প্রকাশক যারা, তাঁরাই মিসেস্ এমাডন পেলেটের অনূদিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ বের করেছেন। অনুবাদটী বেশ সুন্দর হয়েছে। এই মহিমময়ী মহিলা অলউইন ভন কেলারের সাহায্যে আমাদের সমস্ত বইএর অনুবাদের ভার নিয়েছেন প্রেম ও সেবার কর্ম্মরূপে।

১৯৩৭ সালের ডিসেম্বরে স্বামীজির কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ ও রাজযোগের অনুবাদ বের হয়। কর্ম্ম ও ভক্তিযোগ অন্য এক ভক্তের অনুবাদ করা। ভন পেলেট ছিলেন প্রকাশক, আর রাজযোগ হচ্ছে তাঁর নিজেরই অনুবাদ। বইগুলি বেশ যত্নের সঙ্গে যুরিকের একটী ভাল বইএর দোকান থেকে প্রকাশ করা হয়েছে। এই অনুবাদগুলি আর হারবার্টের ফরাসী অনুবাদগুলি প্রকাশের যা ব্যয় তা বহন করেছেন মিস্ ম্যাক্লাউড। আমরা আশা করি, এই অনুবাদগুলি বহুলোকের কাছে শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী বয়ে নিয়ে যাবে এবং অদূর ভবিষ্যতে এর ফল খুব মহান্ হয়ে দাঁড়াবে।

হেগ (হল্যাণ্ড)

বর্ত্তমানে আমি হেগ থেকে চিঠি লিখ্‌ছি। গত নভেম্বরের মাঝামাঝি আমি এখানে আসি। এখানেও বেদান্তের কাজ সবেমাত্র আরম্ভ হয়েছে। সানফ্রান্সিস্কো বেদান্ত-সোসাইটীর একজন বিশেষ বন্ধু মিসেস্ আগাথা লিফ্রিঙ্ক ছিলেন এখানকার প্রথম উদ্যোক্তা। যে আদর্শের মধ্যে তিনি নিজের জীবনে একটী নতুন আলোর সন্ধান পেয়েছেন তা যাতে অপর দশজনের জীবনেও সুলভ হয় এ জন্য তিনি তাঁর নিজের লাইব্রেরী সবার ব্যবহারের জন্য দিয়েছেন। এর ফলে বহু ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির সংস্পর্শে তিনি এসেছেন। এখানে এসে আমি এই সব লোকের সংস্পর্শে আসি প্রথমে। পরে সাধারণ ও বিশেষ বিশেষ ছোট সভায় আমি বক্তৃতা দিয়েছি—বেদান্তের সেই আদর্শ সম্বন্ধে, যে আদর্শ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-জীবনে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। যাঁরা বেদান্তের শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন তাঁদের এখন নিয়মিতভাবে পড়ান হচ্ছে। আশা করা যায়, ভবিষ্যতে একটী স্থায়ী সঙ্ঘ এখানে গড়ে উঠ্‌বে। আমাদের যা সামান্য কাজ আরম্ভ হয়েছে তা স্থায়ী হয়ে দাঁড়ালে পরে সাধারণের কাছে আরও বক্তৃতা দেওয়ার ইচ্ছা আছে। কেননা বিভিন্ন ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন লোকের সঙ্গে সংস্কৃতিগত মেলামেশার আয়োজন করা হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য। পরে আমষ্টারডম, রটারডম প্রভৃতি কাছাকাছি সহরেও আমাদের বেদান্তের কাজ বাড়ান যাবে।

অতীত ও ভবিষ্যৎ

গত চার বছরের মধ্যে ওয়েজবাডেনের বহুলোক বেদান্তের বিচারসম্মত বিশ্বজনীন বাণীর দিকে আকৃষ্ট হয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের প্রাণপ্রদ উপদেশগুলিও তাঁদের প্রাণে সাড়া পেয়েছে বেশ ভালভাবে। সুইজারল্যাণ্ডের সেন্ট-মরিজ, জেনেভা, লসান ও যুরিকে, ফ্রান্সের বিখ্যাত প্যারিসে, পোল্যাণ্ডের রাজধানী ওয়ারস তে এবং অন্যান্য বহুস্থানে এ আন্দোলন উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে। হেগে বেদান্তের কাজ সবেমাত্র আরম্ভ হয়েছে। এখানকার বিভিন্ন সহরে হয়ত আমাদের কাজ শীঘ্র আরম্ভ হবে।

এখানকার অনেকে আগে থেকেই বইয়ের মারফতে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণীর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। গত চার বছরের মধ্যে তাঁরা এবং অন্যান্য অনেকে বেদান্ত-আন্দোলনের সঙ্গে

পরিচিত হয়েছেন ঘনিষ্ঠভাবে। বিভিন্ন জায়গায় যে ছোট ছোট লাইব্রেরী খোলা হয়েছে, সেগুলি জনসাধারণের মধ্যে বেদান্ত প্রচারের বেশ সুবিধে করে দিচ্ছে। এই রকমে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-আন্দোলনের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছেন এমন লোকের সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে।

বহু বাধাবিঘ্নের ভেতর দিয়ে আমাদের কাজ আরম্ভ হয়েছিল এবং বহু বাধাবিঘ্নের ভেতরে থেকেও সে কাজ এখন চলেছে। আর্থিক অনিশ্চয়তা, সংস্কৃতি-গত পার্থক্য, মানসিক অস্থিরতা ও রাজনৈতিক চাঞ্চল্য আমাদের অগ্রগতিকে দিয়েছে অনেক পরিমাণে ব্যাহত করে। তবুও ভগবানের কৃপায় ও বন্ধুদের সাহায্যে কাজ স্থায়ীভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। যদিও এর গতি খুব দ্রুত নয়, ভক্ত ও বন্ধুদের সংখ্যা ক্রমশঃ আমাদের বেড়ে যাচ্ছে, বেদান্তের অমৃতময় উপদেশ আজ বহু হতাশ হৃদয়ে সান্ত্বনা ও নতুন আশার সঞ্চার করছে।

যতই বাধা আসুক না কেন বেদান্তের প্রচার আমাদের চালাতে হবে। প্রথমের কাজ হচ্ছে একটী স্থায়ী কেন্দ্র স্থাপন করা। একটী কেন্দ্র চালাবার জন্য যে লোকজন ও টাকাকড়ি দরকার তা আমাদের কাছে এখনও আসে নি। এমন কি বর্ত্তমান কাজের ব্যয় মাত্র তিন জন লোককে চালাতে হয়। মহীশূর মহারাজের দানও আমাদের বহু বাধা দূর করেছে। ভারতে ও ইউরোপে উভয় জায়গায়ই রামকৃষ্ণ আন্দোলনের তিনি পৃষ্ঠপোষক। এজন্য তাঁকে এবং আর যাঁরা বিভিন্ন উপায়ে এ আন্দোলনকে সফলতার দিকে নিয়ে যাচ্ছেন তাঁদিগকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমাদের বর্ত্তমান কাজ হচ্ছে, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী ও বেদান্তের আদর্শকে দিকে দিকে ছড়িয়ে দেওয়া, আর ভক্ত ও সহানুভূতি সম্পন্ন লোকের সংখ্যা বাড়ান। তারপরে স্থায়ী কেন্দ্র স্থাপন ক'রবার কথা আমরা ভাবব। ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে শুধু তাঁর উপর, যিনি সমস্ত সৎকর্ম্মের উৎসাহদাতা এবং সর্ব্বদা আমাদের চলার পথ নির্দ্দেশ করছেন।*

* গৌরীপুর রামকৃষ্ণ-মিশন বিদ্যার্থিভবনের শ্রীসিদ্ধেশ্বর সাহু কর্ত্তৃক ইংরাজী হইতে অনূদিত।

সত্যের সন্ধান ও সাধন

শ্রীগদাধর সিংহরায়, এম্-এ, বি-এল্

এক

আঁধার রাত, ঘর-বার, মাঠ-ঘাট সব যেন একখানা কাল মিশমিশে আবরণে ঢাকা। ক্ষুদ্র শিশুর কি সাধ্য, কোনটা কি তা নিরাকরণ করে। সে বুদ্ধিহারা হয়ে আশ্রয় নেয় আর এক অন্ধকারের—নিদ্রার।

ভোর হল। সূর্য উঠল। দিনের আলোয় যা যেখানে ছিল সব আত্ম-প্রকাশ করলে। পথ-ঘাট-মাঠ বাড়ি-বাগিচা-ঘাট পশু-পক্ষী কীট সব পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দেখা দিলে। শিশু তখন জিজ্ঞাসা করতে লাগল—এটা কি, ওটা কি, সেটা কি? সে ছুটল সত্যের সন্ধানে।

মানব-জাতির দৃষ্টিপথে সত্যের রূপ ঠিক এমনি ভাবেই একদিন ফুটে উঠেছিল। তা আজ প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর আগেকার কথা। সৃষ্টির আদিতে মানুষের চক্ষুর সম্মুখে ঢাকা ছিল ঠিক ঐ রকম একখানা কাল মিশমিশে তিমিরের আচ্ছাদনে এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড। মানুষও তখন যেন আশ্রয় নিয়েছিল সুষুপ্তির।

ক্রমে সে নিশার অবসান হল। অন্তরাকাশে জ্ঞান-সূর্য দেখা দিলে। তার আলোয় মানুষ দেখতে পেলে এক বিরাট বিশ্ব সম্মুখে পড়ে রয়েছে, শত শত সজীব ও নির্জীব পদার্থ বুকে নিয়ে—চলেছে যেন কার এক অলক্ষ্য ইঙ্গিতে কোন এক নির্দ্দিষ্ট পথে। তখন বিস্ময়ে মানব জিজ্ঞাসা করতে লাগল—এসব কি, এসব কেন, এসব কার? মানবের শৈশব-মন সেই দিন ছুটল সত্যের সন্ধানে।

সৃষ্টি গতিশীল। চেতন-অচেতন, স্থাবর-জঙ্গম কেউ চুপ করে অনন্তকাল একস্থানে একাবস্থায় বসে নেই। সকলেই চলেছে। যা চলছে তাই জগৎ। গত কাল যা ছিল আজ তা নেই, আবার আজ যা আছে কাল তা থাকবে না। কিন্তু সকলের সেরা রহস্য এই যে, এই নিরবচ্ছিন্ন পরিবর্ত্তন-ধারার মাঝেও এমন একটা বস্তু উঁকি মারছে যার কখনও পরিবর্ত্তন নেই—যে নিত্য স্থায়ী। যদি এই বস্তুটী না থাকত তবে আমি আমাকে চিনতে পারতাম না, কেউ কাউকে চিনতে পারত না, জগতের বাস্তবতা লোপ পেয়ে যেত। এ হেঁয়ালি সারা সৃষ্টির সকল পদার্থকেই ঘিরে রয়েছে। নিত্য ও অনিত্য এই দুই অবস্থা পাশাপাশি আছে বলেই সৃষ্টি গতিশীল। এ দুইয়ের মধ্যে যেটী নিত্য, সেটী সত্য, আর যেটী অনিত্য সেটী অসত্য।[১]

জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে এই হেঁয়ালি মানুষ দেখতে পেলে। তখন কোনটা সত্য আর কোনটা অসত্য সে বিচার করতে লাগল। এই হল তার সত্যের সন্ধান। জ্ঞানোন্মেষের সেই প্রথম প্রভাত থেকে মানুষ ছুটে চলেছে এই সত্যের সন্ধানে আকুল পিপাসা নিয়ে উদ্দাম নদী-স্রোতের মত। আবার নদী-স্রোতেরই মত এই অনুসন্ধিৎসার ধারা বিভক্ত হয়ে পড়েছে নানা শাখায়—দর্শনে, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে ও কলায়। সকলেই চায়, সত্য কি তাই উপলব্ধি করতে, প্রকাশ করতে, প্রচার করতে।

সত্য আবার দুই রকমের আমরা কল্পনা করে

১ যদ্রূপেন যন্নিশ্চিতং তদ্রূপং ন ব্যভিচরতি, তৎ সত্যম্। যদ্রূপেন যন্নিশ্চিতং তদ্রূপং ব্যভিচরদনৃতমুচ্যতে। শাঙ্করভাষ্য—তৈত্তিরীয়োপনিষদ্।

থাকি—যুগসত্য ও সনাতন সত্য। এক যুগে যেটা সত্য বলে জানি, পরযুগে হয় তো সেটা মিথ্যা হয়ে গেল এবং আর একটা নূতন সত্যের উদ্ভব হল। এইরূপে যুগে যুগে নানা সত্যের উদ্ভব হয়েছে ও লয় পেয়েছে। এগুলো যুগ-সত্য, চরম বা সনাতন সত্য নয়। যা সনাতন সত্য, তার কোন দিনেই কোন যুগেই পরিবর্তন ঘটে না। দর্শন আবিষ্কার করে সনাতন সত্য, আর বিজ্ঞান যুগ-সত্য। সাহিত্য ও কলা অধিকারীভেদে ফুটিয়ে তুলতে চায় এই দুই রকম সত্যেরই রূপ।

সনাতন সত্যের আবিষ্কার হয়েছিল সুদূর অতীতে মানব-সভ্যতার আদিযুগে এই আর্যাবর্তে। সেই যুগে এক শুভ মুহূর্তে মানুষ ধ্যানদৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিল যে একমাত্র আত্মাই সনাতন সত্য, যেহেতু এর না আছে জন্ম না আছে মৃত্যু।[২] এই আত্মা সূক্ষ্ম হতেও সূক্ষ্মতর, মহৎ হতেও মহত্তর, ইনি নিখিল জীবের হৃদয়-গুহায় নিহিত।[৩] পরবর্তী যুগে এই সনাতন সত্য ঘোষিত হয় যীশু প্রভৃতি ভিন্ন দেশের ভিন্ন ধর্মগুরুগণের মুখে। যীশু তাঁর ভক্তগণকে বলেছিলেন,—সত্যের অন্বেষণ কর (Seek ye the Truth)। সে সত্যের অর্থ ঐ সনাতন সত্য। গ্রীক দর্শনের জন্মদাতা সক্রেটিস তাঁর শিষ্যগণকে বলেছিলেন,—তুমি কে তা জান?

তার অর্থও ঐ অজ নিত্য শাশ্বত সনাতন আত্মাকে জানা।

দুই

মানবের অনুসন্ধিৎসা শুধু ঐ সনাতন সত্যের আবিষ্কার করেই ক্ষান্ত হয় নি। জীবনের লক্ষ্য এক, তাই জীবনের সাধনাও এক। দর্শন এক, ধর্ম আর এক এবং কর্ম আর এক, এমনভাবে মানবের জীবন-সাধনাকে তিনটা পৃথক্ পৃথক্ কোঠায় পুরে রাখা চলে না। দর্শন আবিষ্কার করলে সৃষ্টির চরম সত্য সেই এক চেতনময় আত্মরূপী পুরুষ, ধর্মের উদ্দেশ্য হল ঐ চেতনময় পুরুষের সাক্ষাৎকারে পশু-জীবনের পরিবর্তে দেব-জীবন লাভ করা, কর্মের উদ্দেশ্য হল ধর্মের অনুসরণ করা।

অধ্যাত্ম-বাদী ঋষি এই নিত্য মায়ামুগ্ধ চঞ্চল মনকে অন্তর্মুখী করে ঐ চেতনময় পুরুষের সাক্ষাৎকারের যে সকল কৌশল উদ্ভাবিত করেছিলেন, তার প্রধান হল সত্যের সাধন। বর্তমান প্রবন্ধে এই সত্যের সাধন সম্বন্ধে দু একটি কথা বলি। সত্য-সাধন অর্থে দুটো জিনিষ বুঝায়—সত্যভাষণ ও সৎ-সঙ্কল্প। মানবের দেবত্বলাভের উপায়স্বরূপ সত্যের ব্যবহারিক প্রয়োগ মোটামুটি এই দু প্রকারে করা যায়।

প্রথমত সত্য-ভাষণ। উপনিষদে আচার্য শিষ্যকে বেদাধ্যয়নের পর উপদেশ দিতেছেন,—সত্য অনুসরণ কর, ধর্ম আচরণ কর।[৪]

সত্য-কথনই ধর্মাচরণের প্রথম ধাপ। মহর্ষি পতঞ্জলি সংযম-সাধনার পাঁচ অঙ্গের একাঙ্গকে সত্যের সাধন বলে নির্দেশ করেছেন। যীশু, মহম্মদ প্রভৃতি অন্য দেশের ধর্মনায়কগণও সত্য-ভাষণকে দেবত্বলাভের উপায় বলেছেন। মহাভারতের শান্তিপর্বে ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে বলছেন, সত্য-নিষ্ঠার প্রয়োজন, কেননা জগৎ চরাচর সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

যদি সত্যকথার লোপ পেয়ে যায়, তা হলে মানব-সমাজে উচ্ছৃঙ্খল অরাজকতা এসে পড়ে। কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারে না—স্বামী

২ অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণঃ।

৩ অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়ানাত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।

৪ সত্যং বদ, ধর্মং চর। তৈত্তিরীয়োপনিষদ্—১১ অনুবাক্।

কে না, স্ত্রী স্বামীকে না, পিতা পুত্রকে না, পুত্র পিতাকে না, ভাই ভাইকে না, প্রতিবেশী প্রতিবেশীকে না। পাছে এই অরাজকতার আবির্ভাব হয়, সেই ভয়ে সমাজে সত্য-ভাষণের প্রতিষ্ঠার জন্য শাসক শাসন-নীতির অবলম্বন করেছেন। যদি মিথ্যার আশ্রয়ে একজনকে প্রতারণা করি, আমি তৎক্ষণাৎ আইনত দণ্ডের যোগ্য। এই শাসন-ব্যবস্থা মানব-সমাজের পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-ব্যবস্থাপক স্মৃতিকার-গণের আমল থেকে চলে আসছে। বেদ-সংহিতার যুগেও অসত্য-কথনের যথেষ্ট নিন্দাবাদ করা হয়েছে। যতদিন না মানুষ আত্ম-শক্তির উপর নির্ভর করে অসত্য-কথনের প্রলোভন ত্যাগ করতে পারে, ততদিন শাসকের শাসনে কিছু স্থায়ী ফল সে পেতে পারে না। আত্ম-শুদ্ধি ঘটে ভিতরের দিক দিয়ে, বাহিরের দিক দিয়ে নয়। চাই সেই শক্তির অর্জন।

দ্বিতীয়ত সৎ-সঙ্কল্প। যে শক্তি অর্জনের কথা আমরা উপরে বলেছি, সে হল মানুষের ইচ্ছাশক্তি। এ শক্তি আসে সেই অন্তর্নিহিত নিত্য সত্য ব্রহ্ম আত্মার কাছ থেকে। তাই সে এত দুর্বার। জগতে এই ইচ্ছাশক্তি ব্যক্তিগত ও জাতিগতভাবে অসাধ্য-সাধনও করেছে। মানুষের সৎ বা সত্য সঙ্কল্পই তার এই ইচ্ছাশক্তিকে বাড়িয়ে তোলে।

মিথ্যার সংসারে মিথ্যার সাহচর্যহেতু মানুষ জন্মের পর কতকগুলো মিথ্যা সংস্কারের দাস হয়ে পড়ে। সেগুলো যেন ভূতের মত তার মনের ঘাড়ে বসে থাকে এবং তাদের যেদিকে অভিরুচি সেদিকে তাকে পরিচালিত করে। সেগুলোকে তাড়াতে গেলে প্রয়োজন ইচ্ছাশক্তির—প্রয়োজন সৎ-সঙ্কল্পের।

এই সংস্কার আমার দেবত্বলাভের ও বিশ্ব-কল্যাণের পথে বাধাস্বরূপ, তাই আমি আজ থেকে তা দূর করবার চেষ্টা করব—এইরূপ মনে মনে শপথ গ্রহণ করা এবং কার্যক্ষেত্র উপস্থিত হলে তদনুযায়ী কাজ করার নাম হল ঐ সৎ-সঙ্কল্প বা সত্য সঙ্কল্প।

অনেকের ধারণা এ অসাধ্য। তা নয়। এ অসাধ্য এই যে বোধ, এটাও মানুষের মিথ্যা সংস্কারের কার্য—সে আপনাকে আপনি জানে না বলে। জগতে সকল ধর্মবীর ও কর্মবীরের জীবন আলোচনা করলে দেখা যায় যে, এই সৎ সঙ্কল্পই তাঁদের জীবনের গতি মহত্ত্বের দিকে পরিচালিত করেছিল।

তিন

ব্যক্তিগত ও জাতিগতভাবে সত্য-সন্ধানের ও সত্য-সাধনের প্রয়োজন বর্তমান যুগে অনেক বেশী। মানুষের আধুনিক ভ্রান্ত মন মেতে উঠেছে অসত্য-সন্ধানে ও অসত্য-সাধনে। বালক বৃদ্ধ-বনিতা আজ সেই সনাতন সত্য বিস্মৃত হয়ে ছুটে চলেছে ক্ষণস্থায়ী ইন্দ্রিয়-সম্ভোগ ও ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির পেছনে। অধ্যাত্ম-বিদ্যার বলে আত্মপ্রতিষ্ঠ হওয়ার প্রচেষ্টা দিন দিন ক্ষীণ হয়ে আসছে। ফলে মানব-সমাজে মিথ্যা-প্রবঞ্চনার প্রসার প্রতিপত্তি চরম সীমায় এসে পৌছেছে। শ্রীরামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনের জন্য এবং যুধিষ্ঠির নিজ সত্য পালনের জন্য রাজ্য সম্পদ্ ত্যাগ করে বনে গিয়েছিলেন। সত্য-সাধনের উদ্দেশ্যে এতখানি ত্যাগের আদর্শ আজ অর্থহীন। আজকালকার মানুষের কাছে সেটা কবির কল্পনা। মানুষের এই আধুনিক মনোবৃত্তির পরিণাম কি দাঁড়িয়েছে?

মানুষে মানুষে অবিশ্বাস, মানুষে মানুষে রক্তারক্তি এবং মানুষে মানুষে খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ বর্তমান যুগের পূর্বে বোধ হয় সারা জগতে ব্যাপক ভাবে এতখানি আর কখনও দেখা দেয় নি। অসত্য সন্ধান ও অসত্য সাধনের পরিণাম জাতিগতভাবে কি ভীষণ হয়ে দাঁড়ায়, তা আজ পাশ্চাত্যখণ্ডে

আমরা দেখতে পাচ্ছি। শান্তি-রাজ্য স্থাপনের জন্য কত চেষ্টাই না হল, কিন্তু দুঃখের বিষয় কোনটাই কার্যকরী হল না। জাতিসঙ্ঘ অকেজো হয়ে পড়েছে। তার এত যুক্তি এত চুক্তি সত্ত্বেও ইটালি চোখের সামনে সকল যুক্তি চুক্তি পদদলিত করে একটা দুর্বল ও নিরীহ জাতির উপর রক্তের ঢেউ খেলিয়ে দিলে। জাপান দেখাদেখি সেই অভিনয়ের পুনরভিনয় করছে। দ্বিখণ্ডিত স্পেন রক্ত-নদীশায়ী। দেশে দেশে রণ-চণ্ডিকার নৃত্য, অস্ত্র ঝনৎকার, শিশু-বৃদ্ধ-নারী রুগ্নের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড। যে দাবানল জ্বলেছে এর শেষ করে ও কোথায় কে জানে। এ সবের কারণ কি? ডিপ্লোম্যাসি। আমি মনে করি এক, আর মুখে বলি আর এক, এরই রাষ্ট্রনৈতিক পরিভাষা ডিপ্লোম্যাসি। বর্তমান রাষ্ট্রনীতির মূলমন্ত্র—জাতীয় অভ্যুত্থান নির্ভর করে এই ডিপ্লোম্যাসির উপর। ভীষ্মদেব রাজা যুধিষ্ঠিরকে শিক্ষা দিয়েছিলেন—সবই সত্যে প্রতিষ্ঠিত। বর্তমান রাষ্ট্রনীতি চায় সমস্তই অসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে। ফলে কোন জাতি কোন জাতিকে প্রীতি ও বিশ্বাসের চোখে দেখে না, তাই আজ এই জগৎ-জোড়া অশান্তি ও অরাজকতা। ডিপ্লোম্যাসি হল অসত্য সাধনের মার্জিত রূপ।

প্রকৃত শান্তি-রাজ্যের স্থাপন সম্ভব বাহিরের দিক দিয়ে নয়—অন্তরের দিক দিয়ে। মানুষে মানুষে জাতিতে জাতিতে যথার্থ মিল হবে তখনই, যখন মানুষ ব্যক্তিগত ও জাতিগতভাবে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করবে সেই সনাতন সত্য—একই আত্মা সকল জীবের অন্তর্গুহায় নিহিত এবং যখন মিথ্যা-প্রবঞ্চনার পরিবর্তে সত্যের সাধনাকেই মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা বলে মেনে নেবে। প্রাচীন ভারতের এই মহামূল্য বাণী।
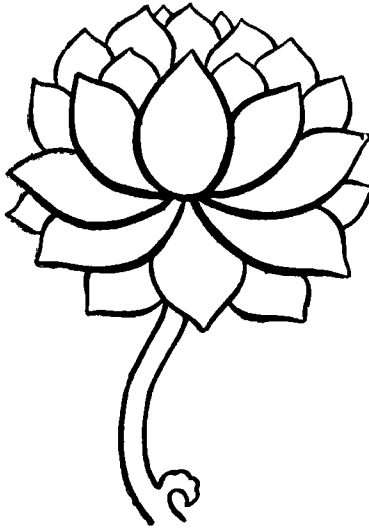
শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের পুণ্যস্মৃতি তর্পণে

স্বামী অপূর্ব্বানন্দ

পানেন তে দেব কথাসুধায়াঃ প্রবৃদ্ধভক্ত্যা বিশদাশয়া যে। বৈরাগ্যসারং প্রতিলভ্য বোধং যথাঞ্জসান্বীয়ুরকুণ্ঠধিষ্ণ্যম্‌ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ৩ ৫-৪৪ ।

"হে দেব, তোমার কথামৃত পান করে যাঁদের অন্তঃকরণ প্রবৃদ্ধভক্তির দ্বারা পরিষ্কৃত হয়, তাঁরা বৈরাগ্যরূপ পরমজ্ঞান লাভ করে বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হয়ে থাকেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্নেহচ্ছায়ায় সংসার বিরাগী যে ভিক্ষুসঙ্ঘের সূচনা হয়েছিল এবং কাশীপুর বাগানে তার জন্য যে বিরাট ভবিষ্যৎ অপেক্ষা কচ্ছিল, তার সন্ধান ঊনবিংশ শতাব্দীর মানব পেয়েছিল খুবই সামান্য। স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ কয়েকজন সন্ন্যাসী "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" বিরজা হোমানলে কেন যে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন তার নিগূঢ় অর্থ আজও আমরা পুরোপুরি বুঝতে পারিনি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন বলতেন—"বাউলের দল এল—নাচলে গাইলে আবার চলে গেল—কেউ তাদের চিনতে পারলে না।" বাউলের দল এসেছিলেন, তাঁদের নৃত্য গীতের মাধুর্য্য ও নবীনত্বে জগৎকে চমকিত করে চলে গেলেন, কেউ তাঁদের বুঝতে পারেনি—জানতে পারেনি। ১৮৯৯ সালে চলে গেলেন স্বামী যোগানন্দ। শ্রীশ্রীঠাকুরের যোগৈশ্বর্য্যের ভাবঘনমূর্তি শ্রীগুরু-পদে লীন হলেন। স্বামীজি অতি দুঃখে বলেছিলেন—"যোগেন চলে গেল—এবার কড়ি খসতে সুরু হল।" ১৯০২ সালে স্বামীজি নিজেই মহাপ্রস্থান করলেন। পরে পরে স্বামী নিরঞ্জনানন্দ, অদ্বৈতানন্দ, রামকৃষ্ণানন্দ, প্রেমানন্দ, অদ্ভুতানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, তুরীয়ানন্দ, সারদানন্দ, সুবোধানন্দ, শিবানন্দ, অখণ্ডানন্দ—সকলেই চলে গেলেন স্বধামে। শ্রীশ্রীঠাকুর ক্রমে ক্রমে তাঁর আধ্যাত্মিক বিভূতি সব নিজের ভেতরে আকর্ষণ করে নিলেন—এ গতি রোধ করে কার সাধ্য? এই যে এত সিদ্ধ মহাপুরুষের একত্র সমাবেশ, এর কি কোন অর্থ নেই? জগতের আদর্শবাদের ভাণ্ডারে এঁরা যে অক্ষয় রত্নরাজী আহরণ করে গেলেন তার সন্ধান কি মানুষ পাবে না?

গত ১২ই বৈশাখ, ২৫শে এপ্রিল সোমবার শ্রীমদ্ বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ নশ্বর দেহ ছেড়ে সমাধিযোগে শ্রীগুরুপাদপদ্মে মিলিত হয়েছেন। তাঁর অদর্শনে সমগ্র শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ ও অসংখ্য ভক্ত নরনারী আজ শোক-সাগরে নিমগ্ন। তাঁর আশ্রিত অগণন সন্তান আজ নিজেদের পিতৃহারা মনে করছেন এবং এই ভবসমুদ্র পার হওয়ার পথে নিজেদের একান্ত অসহায় ও দিশেহারা মনে করছেন। পূজ্যপাদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ আজ স্থূলদেহে নেই—আছে তাঁর পুণ্য-স্মৃতি। সেই সৌম্যদর্শন যোগিরাজ আজ আমাদের ধ্যানের বস্তু। এখন তিনি শ্রীগুরুসন্নিধানে সূক্ষ্মদেহে চিরকাল বিরাজিত থেকে আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। এ সংসার মরুর দুর্গম ও বন্ধুর পথে তাঁর পূত আশিস্‌ ও অভয়বাণী আমাদের একমাত্র পাথেয়। এই সময় শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহা-রাজের একটী কথাই বিশেষ করে মনে হচ্ছে। জনৈক ভক্ত কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে একদিন তিনি বলেছিলেন—"দেখ, আমরা তো আর এ জগতের মানুষ নই! আমরা হলুম ঠাকুরের লোক। ছিলুম ঠাকুরের ভিতর, এখন তাঁর যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের জন্য তিনি তাঁর ভেতর থেকে আমাদিগকে প্রকাশ

করেছেন—কিন্তু বাস্তবপক্ষে এখনও আমরা তাঁতেই লীন হয়ে আছি। আবার (নিজের শরীর দেখিয়ে) এ খোলটা নষ্ট হয়ে গেলে ঠাকুরেই গিয়ে মিশব। তিনিই চির সত্য—শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব তজ্জলান্। আমাদের সঙ্গে তোমাদের যে সম্বন্ধ তা ও ঠাকুরকে নিয়েই। তাঁর স্মরণ করলেই আমাদেরও স্মরণ করা হল, আমাদের আর—বাবা পৃথক্ অস্তিত্ব কিছুই নেই, বুঝলে ? ঠাকুরকে ধরবার চেষ্টা কর, তাঁকে ধরতে পারলেই আমাদের সকলকেই ধরা হল।" আজ এই সন্ধিক্ষণে মহাপুরুষজীর এই মহতী বাণী স্মরণ করবার সময় এসেছে—তাঁর সেই পুণ্যকথা হৃদয়ঙ্গম করবার সময় এসেছে। তাঁর পক্ষে যা সত্য, শ্রীমদ্ বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের সম্বন্ধেও তাই সত্য। মহাপুরুষজী যে আলোকের ছটা ছিলেন—স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজও সেই আলোক হতেই উদ্ভূত। তিনি আজ সেই দিব্যধামে জ্যোতির্ম্ময় দেহে শ্রীশ্রীপ্রভু সমীপে বিরাজ করছেন এবং সকল ভক্তদের হৃদয়স্থ হয়ে আরও নিকটে রয়েছেন, তাঁর মঙ্গল আশিস্ সকলের জীবন আরও মধুময় করে তুলবে। শুধু চাই আন্তরিকতা ও প্রাণের আবেগ।

শ্রীমদ্ বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ অনুমান ১৮৮৪ সালে প্রথম দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমীপে গমন করেন। বেলুড় মঠে একদিন কথা-প্রসঙ্গে তিনি তাঁর প্রথম দর্শনের কথা আংশিকভাবে বলেছিলেন—"তখন আমার বয়স ১৮।১৯ বছর হবে, আমি তখন কলকাতায় কলেজে পড়ি, সেই সময়ই একদিন ঠাকুরকে দর্শন করতে প্রথম দক্ষিণেশ্বরে যাই। বিকেল বেলায় গেছি—দেখি কি ঠাকুরের ঘরে অনেক লোক বসে আছে। আমি তাঁকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে ঘরের এককোণে গিয়ে বসি। তিনি তাঁর ছোট খাটটীতে বসে সকলের সঙ্গে আনন্দে কথাবার্ত্তা কইছিলেন। তাঁকে দেখে বিশেষ তেমন একটা কিছুই মনে হত না। দেখতে সাধারণ মানুষের মতই—তবে তাঁর মুখের হাসি ছিল অপূর্ব্ব। অমন হাসি কারও কখন দেখিনি। যখন হাসতেন, তখন তাঁর সারা মুখে এমন কি সর্ব্বাঙ্গে যেন একটা আনন্দের ঢেউ খেলে যেত। আর সেই হাসি সকলের মন প্রাণ থেকে শোক তাপ যেন চিরতরে মুছে ফেলে দিত। তাঁর কণ্ঠস্বরও ছিল অতি মধুর। এত মধুর যেন ইচ্ছা হত বসে কেবল তাঁর কথাই শুনি, কানে যেন মধুবর্ষণ করত। আর তাঁর চোখ দুটোও খুবই উজ্জ্বল ছিল, যখন তাকাতেন তখন মনে হত যেন ভেতরের সব দেখতে পাচ্ছেন। আমার তো তাই মনে হয়েছিল। সে দিন আর কে কে যে তাঁর ঘরে ছিলেন এবং কি সব যে কথা হচ্ছিল তার কিছুই আমার মনে নেই। তবে এখন মনে হচ্ছে যেন রাখাল মহারাজকে সেদিন ঠাকুরের কাছে দেখেছি। তাঁর ঘরে একটা অপূর্ব্ব শান্তি বিরাজমান এবং যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, সকলকেই দেখে মনে হচ্ছিল যে, তাঁরা ঠাকুরের কথাবার্ত্তায় খুবই আনন্দ পাচ্ছেন। আমি ঘরের এককোণে বসে সব দেখছি শুনছি, এদিকে আমার ভেতরে খুবই আনন্দ হচ্ছিল। অনেকক্ষণ বসে আছি, কথাবার্ত্তাও অনেক হচ্ছিল, আমার কিন্তু সেদিকে তেমন খেয়াল ছিল না, আমি একমনে তাঁকেই দেখছিলাম। তিনিও আমায় কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন নি, আমিও কোন কথা বলি নি। ক্রমে ক্রমে অনেকেই উঠে এদিক সেদিক চলে গেলেন—পরে দেখি যে ঘর একেবারে শূন্য, কেবল আমিই এককোণে বসে আছি আর ঠাকুর তাঁর ছোট খাটটীতে বসে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। আমিও যাব মনে করে প্রণাম করে উঠে দাঁড়িয়েছি—এমন সময় হঠাৎ ঠাকুর আমায় বল্লেন—"তুই কুস্তি লড়তে পারিস ? আমার সঙ্গে লড়তে পারবি ! দেখি লড়তো একহাত !" এই বলে ঠাকুর মেজের উপর সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

আমার শরীর খুবই বলিষ্ঠ ছিল – দেখতেও পালো-য়ানের মতন চেহারা। আমি ত তাঁর কথা শুনে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আর ভাবতে লাগলাম—ভালোরে ভাল, এ আবার কেমন সাধু দেখ্‌তে এলাম, সাধু কুস্তি লড়তে চায়। যাই হোক, আমি তাঁকে বল্লাম—"হাঁ কুস্তি লড়তে জানি।" এদিকে ঠাকুর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পালোয়ানদের মতন তাল ঠুক্‌তে সুরু করে দিয়েছেন আর মৃদু মৃদু হাসছেন এবং ক্রমে আমার দিকে এগিয়ে এসে আমার দুহাত ধরে জোরে ঠেলতে লাগলেন। তা তিনি আমার সঙ্গে পারবেন কেন? আমিও তাঁকে ঠেলতে ঠেলতে একেবারে দেয়ালের গায়ে চেপে ধরলুম। ঠাকুর তখনও হাসছেন এবং আমায় জোরে ধরে আছেন। আমি তাঁকে চেপে ধরে আছি, কিন্তু আমার মনে হতে লাগল, ঠাকুরের হাতের ভেতর দিয়ে কি যেন একটা শক্তি সির্ সির্ করে আমার ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। আমার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চ হতে লাগল, আর সব শরীর যেন অবশ হয়ে গেল, খানিক পরে ঠাকুর আমায় ছেড়ে দিয়ে খুব হাসতে লাগলেন আর বললেন—"কেমন হারিয়েছিস্ তো?" এই বলে ঠাকুর নিজের খাটটীতে গিয়ে বসলেন, আমি কি যে জবাব দেব কিছুই ভেবে পাচ্ছিলাম না। এদিকে ভেতরে একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দ হচ্ছিল আর কেবলই মনে হচ্ছিল, তিনি গায়ের জোরে আমার সঙ্গে পারলেন না বটে কিন্তু কি যেন একটা শক্তিতে আমায় একেবারে কাবু করে ফেলছেন। এই ভাবে খানিকক্ষণ কেটে গেল, পরে ঠাকুর উঠে এসে আস্তে আস্তে আমার পিঠ চাপড়ে বল্লেন—"আসিস্—মাঝে মাঝে এখানে আসিস্। একদিন এলে কি হয়?" ইত্যাদি। তার পর আমায় একটু প্রসাদ খেতে দিলেন। সেইদিনকার মতন বিদায় নিয়ে কলকাতায় ফিরে এলুম, কিন্তু তিনি যেন আমায় কেমন করে দিয়েছিলেন, আমার কেবলই মনে হচ্ছিল যে, তিনি আমার সব দেহের বল যেন হরণ করে নিয়েছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কি যেন একটা শক্তি আমার ভেতরে চালিয়ে দিয়েছিলেন।

"তারপর আরও কয়েকবার ঠাকুরের কাছে গিয়েছিলাম, রাত্রেও ২।১ দিন তাঁর কাছে ছিলাম, তাঁর কি যে এক অদ্ভুত মোহিনীশক্তি ছিল, তা বলে বোঝাবার নয়। যে একবার তাঁকে দেখেছে সেই যেন তাঁর প্রতি চিরকালের জন্য আকৃষ্ট হয়ে যেত। একদিন সন্ধ্যায় গিয়ে তাঁর কাছে দক্ষিণেশ্বরে রাত্রি যাপনের কথা বলি, তিনিও আনন্দে অনুমতি দিলেন। কিন্তু রাত্রে তাঁর ওখানে খাওয়া দাওয়ার তেমন ব্যবস্থা ছিল না। মা-কালীর মন্দিরে রাত্রে মায়ের যা ভোগ হত, সেই প্রসাদই কিছু তাঁর জন্য আসত। তাই থেকে তিনিও একটু খেতেন আর যাঁরা তাঁর কাছে রাত্রে থাক্‌তেন, তাঁদেরও সেই প্রসাদই একটু একটু খেয়ে রাত কাটাতে হত। ঠাকুরের খাওয়া ত খুবই সামান্য ছিল, যেন পাখীর আহার। তিনি ২।১ খানি লুচি বা সামান্য একটু মিষ্টি খেতেন, তাতেই তাঁর হয়ে যেত। আমি তো এদিকে প্রসাদের বরাদ্দ দেখে ভেতরে ভেতরে খুবই চট্‌ছি আর ভাবছি এ রাতটা উপুসেই কাটাতে হবে। আমি তখন youngman (যুবক), শরীরও বেশ বলিষ্ঠ আর হজমও হত খুব, আমার ও সামান্য প্রসাদে কেন হবে? ঠাকুর যেন আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে নহবত থেকে কিছু রুটি তরকারী আমার জন্য আনিয়ে দিলেন। তাতেও কিছুই হল না। তাই খেয়েই তাঁর ঘরের মেজেতে শুয়ে রইলাম। মাঝ রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যেতেই দেখি কি যে ঠাকুর উলঙ্গ অবস্থায় ঘরের মধ্যে পায়চারি কচ্ছেন, কখনও বা উন্মাদের মতন ছুটাছুটি কচ্ছেন। কখন বা বিড় বিড় করে কি বলতে বলতে সামনের বারান্দায় যাচ্ছেন,

আবার কখনও বা হাততালি দিয়ে দেব দেবীর নাম কচ্ছেন। ঠাকুরকে দিনের বেলায় দেখেছি একরকম, পাঁচজনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হাসি তামাসা করছেন আর রাত্রে ঐ রকম দেখে আমি তো ভয়ে একেবারে আড়ষ্ট। চুপ করে শুয়ে শুয়ে ঠাকুরের ঐ সব কাণ্ডকারখানা দেখছি। সেই রাত্রে আর ঘুম হল না। সারা রাত ঐ ভাবেই কেটে গেল। ঠাকুর তো কখন গান কচ্ছেন —কখন যেন কার সঙ্গে কথা কইছেন—আরও কত কি করছেন। এইভাবে ভোর হয়ে গেল, আমিও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। ঠাকুরও এদিকে ঠিক সহজ মানুষের মতন হয়ে গেলেন। সকালে নানা কথাবার্ত্তা হল, তখন তাঁকে দেখে আর মনেই হয় নি যে এই মানুষই রাত্রে অমন করছিলেন, তাঁর সবই অদ্ভুত। বাইরে দেখতে সাধারণ মানুষের মতন কিন্তু বাবা ও যেন একেবারে কাঁচা খেকো দেবতা। স্বামীজি, মহারাজ প্রভৃতি সকলকে যেন একেবারে জ্যান্ত গ্রাস করে ফেলেছিলেন।"

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে পরে আস্তে আস্তে বললেন—"খুব ভাগ্য আমাদের, যে তাঁর কাছে এসে পড়েছিলাম। তিনিই কৃপা করে টেনে আশ্রয় দিয়েছিলেন।"

পরে জনৈক ভক্ত জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"মহারাজ আপনি এখনও ঠাকুরকে দেখতে পান?" এই প্রশ্ন শুনে বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ খুবই গম্ভীর হয়ে গেলেন, তাঁর যেন আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় না, পরে আস্তে আস্তে বললেন—"তা দরকার হলেই কৃপা করে দর্শন দেন।" তাঁর কথায় এমন একটা গাম্ভীর্য্য ছিল যে এ বিষয়ে কেউ আর কোন কথা উত্থাপন করতে সাহস করলেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটী কথা বলতেন—"জহুরী না হলে জহর চিন্‌তে পারে না।"—ঠাকুরের ছেলেদের মধ্যে এক এক জন যে কি উচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতিসম্পন্ন তা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। সে আজ অনেক দিনের কথা, তখন ঠাকুরের মানসপুত্র শ্রীশ্রীরাখাল মহারাজ স্থূলদেহে বর্ত্তমান। তিনি যখন বেলুড় মঠে আসতেন—তাঁর আগমনে মঠের সর্ব্বত্র যেন একটা আধ্যাত্মিক তরঙ্গের ঢেউ খেলে যেত। কি সাধু, কি ভক্ত সকলেই সেই আনন্দ সম্ভোগ করে আত্মহারা হয়ে থাকৃতেন। পূজনীয় বিজ্ঞানানন্দ মহারাজও শ্রীশ্রীমহারাজের মঠে অবস্থানকালীন প্রায়ই মঠে এসে বাসকরতেন, কিন্তু তিনি লোকজনের সঙ্গে এমন কি মঠের সাধুদের সঙ্গেও বড় একটা মেলামেশা করতেন না, আত্মারাম পুরুষ আত্মানন্দেই বিভোর হয়ে থাকৃতেন। কখন কখন মহারাজ বা মহাপুরুষ মহারাজ প্রভৃতি গুরুভাইদের সঙ্গে সেই আত্মানন্দের ভাব বিনিময় করতেন এবং পরস্পরের মধ্যে সেই আনন্দ পরিবেশন ও সম্ভোগ করতেন। সেই সময় মাঝে মাঝে এমনও হত যে মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, সারদানন্দ মহারাজ, অখণ্ডানন্দ মহারাজ, সুবোধানন্দ মহারাজ, বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ প্রভৃতি ছয় সাত জন গুরুভ্রাতার মিলন একই সময়ে মঠে হত। সে এক স্বর্গীয় দৃশ্য! সর্ব্বত্রই যেন আনন্দের হাট বসে গেছে। অনেক ভক্তও সেই আনন্দের মেলায় যোগদান করে নিজেদের জীবন ধন্য করবার জন্য মঠে সমবেত হতেন। কিন্তু পূজনীয় বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের দর্শন অনেক ভক্তের ভাগ্যেই ঘটে উঠত না। অনেকে আবার তাঁকে চিনতেনই না, কারণ তিনি বেশীর ভাগ এলাহাবাদেই নির্জ্জনে থাকৃতেন। মহারাজ কোন কোন ভক্তকে বিশেষ করে বিজ্ঞানানন্দ মহারাজকে দর্শন করতে পাঠাতেন। আর বলতেন—"হরি প্রসন্ন মহারাজ (পূজনীয় বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের পূর্ব্বনাম হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ছিল, মহারাজ প্রভৃতি সেই জন্য তাঁকে ঐ নামেই ডাকৃতেন) এলাহাবাদ থেকে এসেছেন। তাঁকে দর্শন করেছ? যাও, যাও, ঐ মহাপুরুষকে দর্শন করে এস। তিনি

ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, বস্তু লাভ করে বসে আছেন। ব্রহ্মজ্ঞান তাঁর মুঠোর ভেতর। আত্মস্থ হয়ে আগুন হয়ে বসে আছেন, ওকে চেনা বড় মুস্কিল। ইনি বড় একটা ধরা দিতে চান না।" মহারাজ নিজে জহুরী ছিলেন, তাই তিনি জহর চিনে তার ঠিক ঠিক কদর করতেন।

শ্রুতিতে আছে—"স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্মবেদ—ব্রহ্মৈব ভবতি' ইত্যাদি, অর্থাৎ যিনি সেই পরম ব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মস্বরূপই হন। আর শাস্ত্রে এ-ও রয়েছে যে, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের অবস্থিতিই জগতে প্রভূত কল্যাণের কারণ। পুত্রৈষণাদি তাঁদের কিছুই থাকে না। যতদিন তাঁরা এ নরজগতে বর্ত্তমান থাকেন, কেবল-মাত্র লোককল্যাণচিকীর্ষাকে আশ্রয় করেই শরীর ধারণ করেন এবং তাঁরা বাহ্যতঃ কোন লোককল্যাণকর কার্য্য করুন আর না-ই করুন, তাঁদের স্থিতি মাত্রেই জগতের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তদীয় অন্তরঙ্গ পার্ষদগণকে ব্রহ্মনিষ্ঠ হওয়ার পরে লোককল্যাণ-সাধনে নিযোজিত করেছিলেন। জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে এ দৃষ্টান্ত অতি বিরল। স্বামীজিকে সমাধি হতে টেনে এনে ঠাকুর বলেছিলেন—"এখন ঐ সব চাবি দেওয়া রইল। এখন তোকে জগতের হিতের জন্য কাজ করতে হবে। আবার যখন মায়ের কাজ শেষ হবে তখন তিনিই চাবিকাঠি খুলে দেবেন, বুঝলি?" ঠাকুর তাঁর প্রত্যেক পার্ষদকেই ব্রহ্মজ্ঞানে একবার অধিষ্ঠিত করে পরে জগতের হিতসাধনে নিয়োজিত করেছিলেন এবং নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম অন্তে স্বধামে নিয়ে গিয়েছেন। পারত্রিক কল্যাণ-সাধন করেই তাঁরা ক্ষান্ত হতেন না। ঐহিক মঙ্গল সাধনের জন্যও তাঁরা সদা ব্যগ্র থাকতেন—তাই ছিল ঠাকুরের নির্দ্দেশ। পূজ্যপাদ বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ এলাহাবাদে একটী দাতব্য চিকিৎসালয়ের সাহায্যে লোকহিতকর কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। সেখানে তিনি সাধারণতঃ লোকজনের সঙ্গ যতটা সম্ভব পরিহার করে নির্জ্জনে আত্মানন্দে বিভোর হয়ে থাকতেন। কোন কোন ভগবদ্ পিপাসু—যাঁরা তাঁর পূত সঙ্গ লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন, তাঁরা পরম ভক্তিভাজন বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের জীবনাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এ অনিত্য সংসারে শ্রীভগবানই যে একমাত্র সার বস্তু এ ভাব হৃদয়ে সম্যক্‌রূপে ধারণা করে জীবন ধন্য করেছেন। তখনও তাঁর নিকট দীক্ষারূপ কৃপা পাওয়ার সৌভাগ্য কারও ঘটে নাই। কারণ তিনি দীক্ষাদি দিতে একেবারেই নারাজ ছিলেন। কিন্তু মহাপুরুষ মহারাজের দেহত্যাগের পর হতে তাঁর সেই ভাব ক্রমে পরিবর্ত্তিত হতে আরম্ভ হয়। তখন হতে দীক্ষাপ্রার্থী কেহ উপস্থিত হলে তিনি মন্ত্রদীক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন—"আমি ঠাকুর ও মা ছাড়া আর কিছুই জানিনে। আমার দীক্ষা আর কিছুই নয়—আমি কেবল তাঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেই। তারপর ঠাকুরের সঙ্গে জানাশুনা হয়ে গেলে নিজেরাই তোমরা যা যা দরকার, তাঁদের কাছ থেকে চেয়ে নেবে।" ক্রমে ক্রমে তাঁর ভেতর এই ভাব এতই পরিস্ফুট হল যে কেহই তাঁর নিকট কৃপাপ্রার্থী হয়ে ফিরে যেত না। জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকেই তিনি কৃপাবারি সিঞ্চনে নবজীবন দান করেন। নিজ দৈহিক অসুস্থতা বা অস্বচ্ছন্দতার কথা একেবারে বিস্মৃত হয়ে আধ্যাত্মিক রত্নপেটিকার অমূল্য রত্নরাজী অক্লান্তভাবে দিনের পর দিন—মাসের পর মাস—বৎসরের পর বৎসর—আপামর সাধারণে বিতরণ করতে লাগলেন। ভারতের ও ভারতের বাইরেও বিভিন্ন স্থানে গিয়ে তিনি অকাতরে সকলকে ধর্ম্মোপদেশ ও ধর্ম্মজীবন দানে ধন্য করেছিলেন। তাঁর ভেতর এমনই এক ঐশী প্রেরণা এসেছিল, দীক্ষাদি ব্যাপারে তাঁর

এই অদ্ভুত ভাবান্তর সকলকেই স্তম্ভিত করে দিয়েছিল।

১৯৩৬ সালের প্রথম ভাগে তিনি এলাহাবাদ হতে কয়েক দিনের জন্য বেলুড় মঠে এসেছিলেন। মঠে নিত্য বহু নরনারী তাঁর নিকট ধর্ম্ম-জীবন লাভ করবার জন্য উপস্থিত হত এবং সচল তীর্থস্বরূপ তাঁর পদপ্রান্তে বসে ধর্ম্মোপদেশ লাভ করে কৃতকৃতার্থ হত। সেই সময় একদিন বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ মঠের দ্বিতলের এক প্রকোষ্ঠে বসে আছেন—সবে মাত্র অনেকের দীক্ষাদি শেষ হয়েছে, তিনি একাকী আপন-মনে উত্তরাস্য হয়ে চেয়ারে উপবিষ্ট—সামনের দরজা খোলা, মঠের জনৈক সন্ন্যাসী তাঁকে ভক্তিভরে প্রণাম করে তাঁর চরণপ্রান্তে উপবেশন করে জিজ্ঞাসা করলেন—"মহারাজ, আপনার শরীর কেমন?" বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ তখন যেন একটু আন্‌মনা, প্রশ্ন শুনে নিজেকে যেন সামলে নিয়ে আস্তে আস্তে বললেন—"আর দাদা শরীর, এখনও আছে এই পর্য্যন্ত। এই দেখছ তো লোকজনের ভিড় ভাড়? কত লোককেই ঠাকুর নিয়ে আস্‌ছেন! এই ভাবেই চলবে এখন যতদিন ঠাকুর এ শরীর রাখেন।" এই বলে চুপ হয়ে গেলেন। তখন সন্ন্যাসী পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন—"মহারাজ, আপনি যে এমন হাত খুলে দীক্ষাদি দেবেন তাতো কখনও ভাবিনি। আপনার এ ভাবান্তর দেখে আমরা তো অবাক্ হয়ে গেছি। এ ভাবান্তর কেমন করে হল মহারাজ? আপনি তো আগে আগে ভক্তদের কাছেই আসতে দিতেন না। অথচ এখন তো আপনি কাউকে ফেরাচ্ছেন না। সকলেই আপনার কৃপা পাচ্ছে। মহাপুরুষজী শেষ দিকটায় যেমন করতেন ঠিক তেমনি ভাব আপনার ভেতরও এসেছে।"

এই কথা শুনে বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর চোখ বুজেই বলতে লাগলেন—"মহাপুরুষ মহারাজকে তো দেখেছ? তাঁর শেষ-জীবনে তিনি যেন করুণার অবতার হয়ে গিয়েছিলেন। অমন দয়া, প্রেম, ভালবাসা ও কৃপার ভাব আর কারও দেখিনি। তাঁকে দেখে আমার যেন চোখ খুলে গেছে। তিনি জীবোদ্ধারের জন্য তিল তিল করে নিজের দেহপাত করে গেলেন, শেষদিন পর্য্যন্ত কেউ তাঁর কৃপা হতে বঞ্চিত হয় নি, যেন স্বয়ং ঠাকুরই তাঁর শরীর আশ্রয় করে জীবোদ্ধার করে গেলেন। মহাপুরুষজীর সেই ভাবটীই আমার ভেতরে ঢুকে গেছে, তাঁর দেহ-ত্যাগের পর আমার কেবলই তাঁর দয়ার কথা মনে হত, আহা কি দয়া জীবের প্রতি! আজ তিনি বেঁচে থাক্‌লে আরও কত লোককে কৃপা করতেন! আমার কেবলই তাই মনে হচ্ছিল। এখন ঠাকুর যেন আমার ঘাড় ধরে মহাপুরুষজীর সেই অসমাপ্ত কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। ঠাকুরের যেমন আদেশ হবে, তাই তো করতে হবে? আমাদের আর কি আছে? ঠাকুর মা যেমন করাচ্ছেন তেমনিই করছি।"

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর যুগ-প্রবর্ত্তনের সহায়করূপে যাঁদের তিনি সঙ্গে করে এনেছিলেন তাঁদের প্রত্যেককেই কোন না কোন সুনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মে নিয়োজিত করেছিলেন এবং সেই সেই কাজ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সকলকে ক্রমে নিজের কাছে আকর্ষণ করে নিয়ে গেছেন। সেই জন্যই আমরা দেখতে পাই, মাত্র ৩৯ বৎসর বয়সে স্বামীজি এই ধরাধাম ত্যাগ করলেন। লৌকিক দৃষ্টিতে মনে হয়, আহা স্বামীজি আরও কিছুকাল যদি বেঁচে থাকতেন তবে জগতের কত কল্যাণই না হত, তিনি আরও কত কাজই না করতেন! সাধারণ মানবের পক্ষে বয়সের মাপকাঠিতে কাজের তুলনা সম্ভব হতে পারে কিন্তু দেবাদিষ্ট পুরুষদের

কথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাঁরা জগতে আসেন বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য এবং সেই কাজটুকু শেষ হলেই চলে যান স্বধামে এবং 'স্বে মহিম্নি' প্রতিষ্ঠিত হয়ে অবস্থান করেন। বিগত ১৪ই জানুয়ারী বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের নবনির্ম্মিত মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকার্য্য সমারোহে সুসম্পন্ন হয়। পূজ্যপাদ বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ স্বহস্তে "ঠাকুর আত্মারামকে" নব মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত এবং ঠাকুরের মর্ম্মর মূর্ত্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে এসে বলেছিলেন—"এবার আমার কাজ শেষ হল। স্বামীজি আমার উপর যে কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন, সে দায়িত্ব আজ আমার মাথা থেকে নেমে গেল। স্বামীজির নির্দ্দেশানুসারে আমি ঠাকুরের মন্দিরের নক্সা তৈয়ার করেছিলাম। স্বামীজিও তাই দেখে খুব খুশী হয়ে বলেছিলেন—'পেসন, (স্বামীজি আদর করে তাঁকে "পেসন" বলে ডাকতেন) এই মন্দির আমি দেখে যেতে পারব না, ততদিন আমার শরীর থাকবে না, তবে এ মন্দির যে হবে তা নিশ্চয়। মন্দির হলে তখন আমি সূক্ষ্মদেহে আকাশ হতে দেখব। আর তোকেই এই মন্দিরের কাজ করতে হবে। আজ স্বামীজির ইচ্ছায় এই মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল, স্বামীজিও সূক্ষ্মদেহে এই মন্দির দেখে খুব আনন্দিত হয়েছেন। আমারও কাজ ফুরল।" তিনি অতি গম্ভীর ও শান্তভাবে এই কথাগুলো বলেছিলেন কিন্তু শ্রোতাদের মধ্যে বোধ হয় কেহই ভাবতে পারেন নি যে বাস্তবিকই তাঁর এই কথাগুলোর পশ্চাতে এমন কঠোর সত্য নিহিত ছিল এবং তিনি এত শীঘ্রই শ্রীগুরুর পদে মিলিত হবেন। শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠার দিন তিনি অকাতরে বহুলোককে কৃপা করেছিলেন। তাঁর কৃপার ভাণ্ডার সকলের জন্য সদা উন্মুক্ত ছিল। যাঁরা ভাগ্যবান্ তাঁরাই সেই কৃপা লাভ করে নিজ নিজ জীবন ধন্য করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর জ্যোতির্ম্ময় আধ্যাত্মিক আলোকবর্ত্তিকার দ্বারা যে কয়েকটী জীবনদীপ প্রজ্বালিত করেছিলেন কালবশে ক্রমে ক্রমে প্রায় সব দীপগুলিই লোকলোচনের অন্তরালে চলে গেল। আজ সহস্র সহস্র নরনারী তাঁদের অদর্শনে নিজ নিজ জীবন-বর্ত্ম ঘোর তমসাচ্ছন্ন মনে করছেন। এই অকূল ভবসাগরে নিজেদের আধ্যাত্মিক জীবনতরী আজ যেন একেবারে কর্ণধারশূন্য। জীবনের ধ্রুবতারা যেন কোন্ কালমেঘের অন্তরালে লুক্কায়িত। আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হয় বটে, কিন্তু এই নৈরাশ্যের ঘন অন্ধকারের পেছনে রয়েছে আমাদের একমাত্র আশাস্থল শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদদের অলৌকিক আদর্শ। দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীমূলে শ্রীশ্রীঠাকুর যে আধ্যাত্মিক হোমানল "জগদ্ধিতায়" প্রজ্বালিত করেছিলেন এবং যে হোমানলে তিনি স্বামীজি প্রমুখ কয়েকটী অনাঘ্রাত জীবন আহুতি দিয়েছিলেন, সেই হোমানল সপ্ত জিহ্বা বিস্তার করে আজ সমগ্র জগৎ আলোকিত করেছে, সেই হোমানল আজিও নির্ব্বাপিত হয় নি। শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে উৎসর্গীকৃতজীবন শত শত সন্ন্যাসী ও ভক্ত-হৃদয়কন্দরে আজও উহা দাউ দাউ করে জ্বলছে এবং জ্বলবে আরও শত শত বৎসর ধরে। তাইত দূরদ্রষ্টা ঋষি স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন—"এই যে আধ্যাত্মিক তরঙ্গ জগতে এসেছে, এ অবাধে চলবে এখনও সাত আট শ বছর, এর অপ্রতিহত গতি রোধ করে কার সাধ্য ?" এখন শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর সঙ্ঘ-শরীরে বর্ত্তমান থেকে শত শত বৎসর জগতের কল্যাণ সাধন করবেন। নব নব জীবন আহুতি দিয়ে সেই আধ্যাত্মিক হোমানল জগতের হিতের জন্য জ্বালিয়ে রাখবেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-যুগের ইতিহাসে আজ এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হল। এই শুভক্ষণে প্রত্যেক সন্ন্যাসী ও ভক্ত নরনারীর কর্ত্তব্য নিজ নিজ হৃদয়-দেউলে শ্রীভগবানের পূজা-প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা এবং ত্যাগ, তিতিক্ষা, পবিত্রতার অর্ঘ্য নিত্যই পরম দেবতার চরণে অর্পণ করা।

করুণাময়

শ্রীরামেন্দু দত্ত

অশেষ করুণাময়—

আঘাতে আঘাতে হানিয়া ব্যাঘাত
চাহ জাগাইতে ভয়।
সে ভয়ে চমকি সুখের শয়নে
ঘুম ছুটে যায় চকিত নয়নে
আলস জড়িমা ত্যজিয়া করমে
পুন অভিরুচি হয়!
নূতন করিয়া মনে পড়ে যায়
তোমারে যে দয়াময়।

প্রায় ভুলে যাওয়া প্রজ্ঞা ফিরিয়া
আসে প্রলয়ের রাতে
কবে ছেড়ে দেওয়া হাত খানি তব
পুনরায় লভি হাতে।
কতদিন পরে মনে হয় এই
ধরার আধারে কোনো সুখ নেই
মিছা ছেলেখেলা এই মোহমেলা
ধরণীর আঙিনাতে।
চন্দ্র তারকা না হেরি গগনে
ঘন-অমানিশা রাতে।

বিলাস লালসে স্বপন আলসে
শাশ্বত লাগে মনে
সে ভুল ভাঙ্গিতে এই লীলা কি গো
খেলিছ সঙ্গোপনে?
সবার আড়ালে লুকাইয়া, ভাব
এ প্রলয়ের মাঝে দেখিতে কি পাব?
ওগো সুচতুর, চতুরালী তব
কেবলই ভক্ত সনে?
শিখিচূড়া বাঁশী লুকাতে পারোনি
প্রলয়ের গরজনে।

পঞ্চদশী

অনুবাদক পণ্ডিত শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়

দ্বিতীয় প্রকরণ

পঞ্চমহাভূত বিবেক

(টীকাকার কৃত মঙ্গলাচরণ)

নত্বা শ্রীভারতীতীর্থবিদ্যারণ্যমুনীশ্বরৌ।
পঞ্চভূতবিবেকস্য ব্যাখ্যানং ক্রিয়তে ময়া॥

শ্রীভারতীতীর্থ ও শ্রীবিদ্যারণ্য এই দুই মনীশ্বরকে প্রণাম করিয়া আমি এই 'পঞ্চমহাভূত বিবেক' নামক পঞ্চদশীর দ্বিতীয় প্রকরণের—যাহাতে ব্রহ্ম হইতে পঞ্চমহাভূতের বিবেচন এবং পঞ্চমহাভূত হইতে ব্রহ্মের বিবেচন বর্ণিত হইয়াছে, তাহার ব্যাখ্যান করিতেছি :—

ব্রহ্ম হইতে পঞ্চভূতের এবং পঞ্চভূত হইতে ব্রহ্মের বিচারদ্বারা পৃথক্করণ প্রতিজ্ঞা

সদদ্বৈতং শ্রুতং যৎ তৎ পঞ্চভূতবিবেকতঃ।
বোদ্ধুং শক্যং, ততো ভূতপঞ্চকং
প্রবিবিচ্যতে॥১

অন্বয়—যৎ সৎ অদ্বৈতম্ শ্রুতম্, তৎ পঞ্চভূত বিবেকতঃ বোদ্ধুম্ শক্যম্, ততঃ ভূতপঞ্চকম্ প্রবিবিচ্যতে।

অনুবাদ—সামবেদের অন্তর্গত ছান্দোগ্য উপনিষদে যে সৎস্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মের কথা শুনা যায়, তাহা পঞ্চভূতের বিচার করিলে বুঝিতে পারা যায়, সেই হেতু প্রকৃষ্টরূপে পঞ্চভূতের বিচার করা যাইতেছে।

টীকা—ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকে (৬।২।১) উদ্দালক মুনি আপনার পুত্র শ্বেতকেতুকে বলিতেছেন—"সৎ এব সৌম্য ইদম্ অগ্রে আসীৎ একম্ এব অদ্বিতীয়ম্"—'হে ভদ্র, সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ একই[১] অদ্বিতীয়[২] সৎস্বরূপ[৩] ব্রহ্ম[৪] ছিল[৫],

১ 'একই'—'এক' অর্থে 'একভাবের' বলিয়া স্বগত-ভেদরহিত, 'ই' শব্দদ্বারা বুঝান হইতেছে—অন্যের সম্বন্ধ বিনাই, ইহার দ্বারা স্বজাতীয় ভেদরহিত বুঝা গেল।

২ অদ্বিতীয় অর্থাৎ বিজাতীয় ভেদরহিত। এস্থলে কেহ এইরূপ আপত্তি করিতে পারেন যে সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল ব্রহ্ম ছিলেন, একথা অসিদ্ধ, কেননা শুদ্ধ ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টি অসম্ভব। সৃষ্টির উপাদান মায়া যে ব্রহ্মে ছিল, একথা শ্রুতি নিজেই স্থানান্তরে বলিতেছেন—"মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্" (শ্বেতাশ্বতর উ)—মায়াকেই সৃষ্টির উপাদান বলিয়া জানিবে এবং পরমাত্মাকে মায়ী বলিয়া জানিবে। তাহা হইলে ব্রহ্মের সহিত মায়া থাকিলে, ব্রহ্ম কি প্রকারে অদ্বিতীয় হইলেন ?

তদুত্তরে বলা হইয়া থাকে যে প্রলয়কালে সেই মায়া বা মিথ্যা সৃষ্টিশক্তি বা সৃষ্ট্যুপাদান ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয় না বলিয়া প্রলয়কালে ব্রহ্ম অদ্বিতীয়। যেমন ব্যক্তিগত প্রলয়কালে অর্থাৎ সুষুপ্তিতে আত্মায় যে মিথ্যা অবিদ্যা থাকে আত্মার সহিত তাহার ভেদ, আপনার দৃষ্টিতে বা অপরের দৃষ্টিতে বা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা প্রতীত হয় না। সেই হেতু সেই সুষুপ্তিকালে আত্মাকে অদ্বিতীয় বলিয়া প্রতীতি করা যায়, ব্রহ্মও সেইরূপ অদ্বিতীয়। আর সৃষ্টিকালে জগৎ ব্রহ্মে আরোপিত বা কল্পিত বলিয়া ব্রহ্মের অদ্বিতীয়তার বাধা হয় না।

৩ 'সৎ' অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এই তিন কাল দ্বারা অবাধিত বা অপরিচ্ছিন্ন।

৪ ব্রহ্ম শব্দের অর্থ 'বৃহৎ'—মায়া এবং মায়াকার্য্যাপেক্ষা অধিক ব্যাপক অর্থাৎ নিরপেক্ষ ব্যাপক বস্তুর নাম ব্রহ্ম।

৫ 'ছিল' বলিতে যে অতীতকালের সহিত সম্বন্ধ বুঝায়, তাহা কেবল কালসংস্কারযুক্ত শিষ্যকে বুঝাইবার জন্য। কাল নামক দ্বিতীয় বস্তুর সেইরূপে স্বীকার করা হইল বলিয়া দ্বৈতাপত্তি হইল না।

অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি ছয় প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ পরিদৃশ্যমান্ এই জগৎ প্রথমে তৎকারণ ব্রহ্মরূপেই ছিল, যেমন ঘট আপনার উৎপত্তির পূর্ব্বে মৃৎপিণ্ডরূপে থাকে, সেইরূপ। এই শ্রুতি বচনদ্বারা জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে জগতের যে তৎকারণ রূপে অর্থাৎ সৎস্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপে থাকার কথা শুনা যায়, সেই ব্রহ্ম মনোবচনের অগোচর বলিয়া অর্থাৎ জাতি, গুণ, ক্রিয়া, নাম ও সম্বন্ধ ইত্যাদি সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিত বলিয়া সেই ব্রহ্মকে আপনা হইতেই অর্থাৎ বিনা বিচারে ঘটাদি বস্তুর ন্যায় অনুভব করিতে পারা যায় না, সেই হেতু ব্রহ্মের উপাধি ধরিয়া অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপে অপ্রবিষ্ট ব্যাবর্ত্তক চিহ্ন ধরিয়া ব্রহ্মকে বুঝিতে হয়, যেমন গৃহোপরি উপবিষ্ট আগন্তুক কাককে লইয়া গৃহের নির্দ্দেশ হইতে পারে। যেহেতু পঞ্চভূত সেই ব্রহ্মের (বিবর্ত্তরূপ) কার্য্য[১] এবং সেই রূপে ব্রহ্মের উপাধি, সেইহেতু সেই পঞ্চভূতের বিচারদ্বারা ব্রহ্মকে বুঝাইবার জন্য উপোদ্ঘাতরূপে পঞ্চভূতের বিচার করিবার প্রতিজ্ঞা করিতেছেন। "স্বার্থং মনসি নিধায় তদর্থমর্থান্তরবর্ণনমুপোদ্ঘাতম্"। প্রতিপাদ্য বিষয়টিকে মনে রাখিয়া তাহার প্রতিপাদনের সুবিধার জন্য অগ্রে বিষয়ান্তরের বর্ণনের নাম উপোদ্ঘাত। এস্থলে অদ্বিতীয় ব্রহ্মের প্রতিপাদনের জন্য—শিষ্য বুদ্ধিতে আরোপণ করিবার জন্য, সেই উদ্দেশ্যটিকে মনে রাখিয়া তাহার সিদ্ধির জন্য পঞ্চভূতের বিচার প্রভৃতি উপোদ্ঘাত বলা হইতেছে। ১।

[১] পঞ্চভূতকে যে নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের কার্য্য বলা হইল, তাহার অভিপ্রায় এই যে ব্রহ্মের সত্তা ও প্রকাশ লইয়াই পঞ্চভূতের সত্তা ও প্রকাশ, অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত পঞ্চভূতের অন্বয়ব্যতিরেক সম্বন্ধ, ব্রহ্মকে পাইলেই পঞ্চভূতের সত্তা ও প্রকাশ, না পাইলে নহে। সেই পঞ্চভূত ব্রহ্মস্বরূপে অপ্রবিষ্ট ব্যাবর্ত্তক অর্থাৎ ব্রহ্মলক্ষণ পঞ্চভূতে না থাকিলেও পঞ্চভূত ব্রহ্মকে আকাশকুসুম, শশশৃঙ্গ প্রভৃতি একান্ত অসৎ বস্তু হইতে পৃথক্ বলিয়া বুঝাইয়া দেয়। এই হেতু পঞ্চভূত ব্রহ্মের উপাধি। আবার সেই উপাধির সহিত ব্রহ্মের তাদাত্ম্য সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া উভয়ের পরস্পর বিবেকের প্রয়োজন।

অপঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূতের গুণ ও কার্য্যের বিবরণ

আকাশাদির গুণ বর্ণন

পঞ্চভূতের গুণসমূহের নাম ও ভূতোৎপন্ন কার্য্যাদি

সেই প্রসঙ্গে আকাশাদি পঞ্চভূতের মধ্যে স্ব স্ব গুণ দ্বারা যে পরস্পরের ভেদ আছে, তাহা বুঝাইবার জন্য সেই পঞ্চভূতের গুণসমূহের বর্ণন করিতেছেন :—

শব্দস্পর্শৌ রূপরসৌ গন্ধো ভূতগুণা ইমে।
একদ্বিত্রিচতুঃপঞ্চ গুণা ব্যোমাদিষু ক্রমাৎ ॥২

অন্বয়। শব্দস্পর্শৌ রূপরসৌ গন্ধঃ ইমে ভূতগুণাঃ (ভবন্তি)। ব্যোমাদিষু ক্রমাৎ একদ্বিত্রিচতুঃপঞ্চগুণাঃ (ভবন্তি)।

অনুবাদ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ এই কয়েকটি পঞ্চভূতের গুণ; আকাশ প্রভৃতি পঞ্চভূতে যথাক্রমে এক, দুই, তিন, চারি এবং পাঁচটি গুণ আছে। ('গুণ' শব্দের অর্থ যাহা দ্রব্য বা কর্ম্ম নহে, অথচ সমবায় সম্বন্ধে দ্রব্য মাত্রেরই আশ্রিত, তাহা)।

টীকা—ভাল, এই পাঁচটি গুণ কি সকল ভূতেরই আছে অর্থাৎ এক এক ভূতের কি পাঁচ পাঁচ গুণ অথবা এক একটি ভূতের এক একটি গুণ আছে? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন এই উভয় প্রকারই নহে। কিন্তু অন্য এক তৃতীয় প্রকার। এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—আকাশ প্রভৃতি পঞ্চভূতে যথাক্রমে এক, দুই ইত্যাদি। (তাৎপর্য্য এই—আকাশে শব্দ, বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ, তেজে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, জলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং পৃথিবীতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ আছে)।

এক্ষণে সেই অন্য তৃতীয় উপায়রূপ প্রকারান্তর স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—

পঞ্চভূতের গুণসমূহের বিভাগ

প্রতিধ্বনির্বিয়চ্ছব্দো বায়ৌ বীসীতি শব্দনম্।
অনুষ্ণাশীতসংস্পর্শো বহ্নৌ ভুগুভুগুধ্বনিঃ॥৩
উষ্ণঃ স্পর্শঃ প্রভা রূপং জলে চুলুচুলুধ্বনিঃ।
শীতঃ স্পর্শঃ শুক্লরূপং রসো মাধুর্য্যমীরিতম্॥৪
ভূমৌ কড়কড়াশব্দঃ কাঠিন্যং স্পর্শ ইষ্যতে।
নীলাদিকং চিত্ররূপং মধুরাম্লাদিকো রসঃ॥৫
সুরভীতরগন্ধৌ দ্বৌ গুণাঃ সম্যগ্বিবেচিতাঃ

অন্বয়—বিয়চ্ছব্দঃ প্রতিধ্বনিঃ (ভবতি)। বায়ৌ 'বীসী' ইতি শব্দনম্, অনুষ্ণাশীতসংস্পর্শঃ (ভবতঃ); বহ্নৌ ভুগুভুগুধ্বনিঃ, উষ্ণঃ স্পর্শঃ, প্রভা রূপম্ (ভবন্তি)। জলে চুলুচুলুধ্বনিঃ, (পাঠান্তরে বুলুবুলুধ্বনিঃ) শীতঃ স্পর্শঃ, শুক্লম্ রূপম্, রসঃ মাধুর্য্যম্ ঈরিতম্। ভূমৌ কড়কড়াশব্দঃ, কাঠিন্যম্ স্পর্শঃ ইষ্যতে, নীলপীতাদিকম্ চিত্ররূপম্, মধুরাম্লাদিকঃ রসঃ, সুরভীতর গন্ধৌ দ্বৌ (ভবন্তি)। (ইতি) গুণাঃ সম্যক্ বিবেচিতাঃ।

অনুবাদ—আকাশের এক গুণ, শব্দমাত্র, তাহা প্রতিধ্বনি বা শব্দপ্রতিবিম্ব, বায়ুতে 'বীসী' বা সোঁ সোঁ এই বর্ণাত্মক অনুকরণ শব্দদ্বারা কথঞ্চিৎ ব্যক্ত 'ধ্বনি'—শব্দ ১ (১) এবং অনুষ্ণ—অশীত স্পর্শ (২) এই দুই মাত্র গুণ; অগ্নিতে 'ভুগুভুগু' ধ্বনি-শব্দ (১), উষ্ণ স্পর্শ (২) ও প্রভা রূপ (৩) এই তিন গুণ। জলে 'চুলুচুলু' (বা বুলু বুলু) এইরূপে অনুকরণীয় ধ্বনি শব্দ (১), শীতল স্পর্শ (২), শুক্ল-রূপ (৩) ও মাধুর্য্য রস (৪) এই চারিটি গুণ কথিত হইয়া থাকে। পৃথিবীতে 'কড়কড়া' এইরূপে অনুকরণীয় ধ্বনি শব্দ (১), কঠিন স্পর্শ (২), নীল প্রভৃতি বিচিত্ররূপ (৩), মধুরাম্লাদি রস (৪), সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ এই দুই গন্ধ (৫)। এই প্রকারে পঞ্চভূতের গুণসমূহ সম্যক্ প্রকারে বিচার করা হইল অর্থাৎ গুণদ্বারা পঞ্চভূতের পরস্পর প্রভেদ বিবেচিত হইল।

টীকা—আকাশে এক শব্দই গুণ, আকাশের গুণরূপ সেই শব্দ হইতেছে প্রতিধ্বনিরূপ। বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ এই দুইটি গুণ আছে। তন্মধ্যে বায়ুতে যে শব্দ আছে, তাহা সেই শব্দের অনুকরণ শব্দদ্বারা দেখাইতেছেন—"বীসী ইতি শব্দনম্"—বায়ুতে 'বীসী' (বা সোঁ সোঁ) এই আকারের ধ্বনি—শব্দ আছে। এই প্রকারে অগ্নি, তেজ প্রভৃতির, শব্দের অনুকরণ শব্দদ্বারা সূচিত ধ্বনি-শব্দ আছে বুঝিয়া লইতে হইবে। সেই বায়ুর স্পর্শের কথা বলিতেছেন—'অনুষ্ণাশীত সংস্পর্শ' ইত্যাদি। বহ্নিতে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এই তিনটি গুণ আছে। তাহারা যথাক্রমে উল্লিখিত হইতেছে—"বহ্নৌ ভুগুভুগুধ্বনিঃ"।৩। জলে শব্দ হইতে রস পর্য্যন্ত চারিটি গুণ আছে; তাহাদের কথা বলিতেছেন—'জলে চুলুচুলুধ্বনিঃ'—জলে চুলুচুলু (বা বুলুবুলু) এই আকারের শব্দ, শীতল স্পর্শ, শুক্লরূপ ও মধুর রস আছে—কথিত হইয়া থাকে।৪। পৃথিবীতে শব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া গন্ধ পর্য্যন্ত যে পাঁচটি গুণ আছে, তাহার কথা বলিতেছেন 'ভূমৌ কড়াকড়া শব্দঃ' ইত্যাদি হইতে 'সুরভীতর গন্ধৌ দ্বৌ' এই পর্য্যন্ত শব্দ দ্বারা। পৃথিবীতে সুগন্ধ ও তদ্ভিন্ন অর্থাৎ দুর্গন্ধ এই দুইটি আছে। উল্লিখিত ভূতসমূহের গুণদ্বারা প্রভেদবর্ণনের সমাপ্তি করিতেছেন—"গুণাঃ সম্যগ্ বিবেচিতাঃ"—পঞ্চভূতের গুণসমূহ সম্যক্ প্রকারে বিচারিত হইল। ৫½।

১ শব্দ দুই প্রকার—বর্ণাত্মক (articulate) ও ধ্বন্যাত্মক (inarticulate)। ধ্বন্যাত্মক শব্দকে লিখিয়া প্রকাশ করিতে যাইলেই বর্ণের বা বর্ণাত্মক শব্দের সাহায্য ভিন্ন গত্যন্তর নাই। • বর্ণমালার ইহা ন্যূনতা।

পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি

এইরূপে পঞ্চভূতের, গুণানুসারে ভেদ বর্ণন করিয়া, এক্ষণে কার্য্যানুসারে ভেদ বুঝাইবার জন্য সেই সেই ভূতসমূহের কার্য্য—জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহের প্রথমে বর্ণনা করিতেছেন—"শ্রোত্রম" ইত্যাদি চরণদ্বয় দ্বারা।

শ্রোত্রং ত্বক্‌চক্ষুষী জিহ্বা ঘ্রাণং চেন্দ্রিয়পঞ্চকম্।৬
কর্ণাদি গোলকস্থং তচ্ছব্দাদি গ্রাহকং ক্রমাৎ।
সৌক্ষ্ম্যাৎ কার্য্যানুমেয়ং
তৎ প্রায়ো ধাবেদ্বহির্মুখম্ ॥৭

অন্বয়—শ্রোত্রম্, ত্বক্ চক্ষুষী, জিহ্বা চ ঘ্রাণম্—ইন্দ্রিয় পঞ্চকম্ (ভবতি)। তৎ ক্রমাৎ কর্ণাদি-গোলকস্থম্ শব্দাদিগ্রাহকম্ সৌক্ষ্মাৎ কার্যানুমেয়ম্ (ভবতি)। তৎ প্রায়ঃ বহির্মুখম্ ধাবেৎ।

অনুবাদ—শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা, ও নাসিকা—এই ইন্দ্রিয় পাঁচটি, কর্ণ প্রভৃতি গোলকে (স্থূল-দেহের বিশেষ বিশেষ অবয়বে) অবস্থিত হইয়া যথাক্রমে শব্দাদির অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের গ্রাহক হয়। এই সকল ইন্দ্রিয় অতি সূক্ষ্ম বলিয়া, (ইহাদিগকে প্রত্যক্ষ করা যায় না, ইহাদিগের) কার্য্যদ্বারা ইহাদিগের অস্তিত্বের অনুমান করিয়া লইতে হয়। ইহারা প্রায়ই বাহ্য বিষয়ে ধাবিত হয়।

টীকা—ইন্দ্রিয়সমূহ যে আছে, তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি? এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে বলিয়া, কার্য্য-লিঙ্গক অনুমানই এ বিষয়ে প্রমাণ, ইহাই বলিতেছেন। কার্য্য অর্থাৎ রূপাদিজ্ঞানরূপ ব্যাপার হইয়াছে লিঙ্গ বা 'হেতু' যে 'অনুমানে', সেই অনুমানের কথা বলিতেছেন। সেই ইন্দ্রিয়পঞ্চক সূক্ষ্ম বলিয়া, তাহা আপন কার্য্যরূপ লিঙ্গদ্বারা অর্থাৎ রূপাদিবিষয়ক জ্ঞানরূপ হেতু দ্বারা অনুমানের সাহায্যে জানিবার যোগ্য। আর সেই রূপের উপলব্ধি বা জ্ঞান করণজনিত, যেহেতু তাহা ক্রিয়া। যাহা যাহা ক্রিয়া তাহা অবশ্যই করণজনিত যেমন ছেদন ক্রিয়া—কাষ্ঠাদিকে কুঠারাদি দ্বারা দ্বিভাগে বিভক্ত করা, সেই ছেদন ক্রিয়া বলিয়া অবশ্যই কুঠারাদিকরণজনিত। সেইরূপ রূপাদির পরিচ্ছেদক জ্ঞান অর্থাৎ যে জ্ঞান রূপাদিকে রসাদি হইতে ভিন্ন বলিয়া বুঝাইয়া দেয়, সেই জ্ঞানও ক্রিয়া বলিয়া অবশ্য করণজনিত। ইহাই ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব বিষয়ে অনুমান। এইরূপ জ্ঞানের ন্যায় শব্দজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান, রসজ্ঞান, গন্ধজ্ঞানও শ্রোত্র, ত্বক্, জিহ্বা, ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের অস্তিত্ববিষয়ে অনুমানের লিঙ্গ। 'সৌক্ষ্ম্যাৎ'—ইন্দ্রিয়সমূহের সূক্ষ্মতাহেতু অর্থাৎ তাহারা অপঞ্চীকৃত ভূতের কার্য্য বলিয়া, তাহাদের দুর্লক্ষ্যতা হেতু। অপঞ্চীকৃত ভূতপঞ্চক সূক্ষ্ম, তাহারা পঞ্চীভূত স্থূলভূতের ও তাহাদের কার্য্যের, ন্যায় প্রত্যক্ষ হয় না। দশ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এবং পঞ্চপ্রাণ, সেই সূক্ষ্মভূতের কার্য্য, এই হেতু তাহারা ইন্দ্রিয়ের বিষয় নহে। এই কারণে তাহাদের অস্তিত্ব অনুমান-দ্বারা জানিতে হয়। তাহাদের স্বভাবের কথা বলিতেছেন—'প্রায়ঃ বহির্মুখম্ ধাবেৎ'—সেই জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চক সাধারণতঃ বহির্মুখ হইয়া ঘট-পটাদি বাহ্য বিষয়ের অভিমুখে দৌড়ায়। কঠোপনিষদে পঠিত হইয়া থাকে "পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ"—পরমেশ্বর শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়সমূহকে বহির্মুখ করিয়া অর্থাৎ শব্দাদি বাহ্যবিষয়প্রকাশন—সমর্থ করিয়া এবং এইরূপে তাহাদিগকে আত্মদর্শনে অসমর্থ করিয়া, তাহাদের বিনাশ করিলেন, কেন না, বহির্মুখতা তাহাদের অহিতকর বলিয়া তাহাদিগকে সেইরূপ করা একপ্রকার তাহাদের হত্যা।৭।

সমালোচনা

সুগমসাধন-পন্থা, প্রথম খণ্ড—দণ্ডি স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী প্রণীত। ৪৪১ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, সুন্দর বাঁধাই, মূল্য দুই টাকা মাত্র।

লেখকের ভাষায় জোর আছে। লেখক আকুল আগ্রহে আপাতমনোরম ভোগের ভয়াবহ পরিণাম বর্ণনা করিয়া ঈশ্বর আরাধনাতেই প্রকৃত সুখ ইহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। ঈশ্বরই জীবের গম্যস্থল, উপায়—কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি। তন্মধ্যে ভক্তিই অনায়াসসাধ্য। ভক্তিতেই মুক্তি। এই সকল প্রমাণ করিবার জন্য লেখক নারদীয় ভক্তিসূত্র, শাণ্ডিল্যসূত্র, শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা, উপনিষৎ ও বিবিধ পুরাণাদি হইতে বহু শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভক্তির বিবিধ সংজ্ঞাগুলির ব্যাখ্যা মনোরম—ভাষা প্রাঞ্জল। সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক ভক্তির লক্ষণাদিও সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

গ্রন্থে ভাবের উচ্ছ্বাস কিছু অধিক। সর্ব্বত্র ভাবের সামঞ্জস্যও রক্ষিত হয় নাই। ভাবগুলি দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে ভাল হইত।

লেখক ভক্তিলাভের উপায়, উহার অন্তরায় এবং অন্যান্য বহু জ্ঞাতব্য বিষয় ইহাতে সন্নিবিষ্ট করিয়া ভক্তিকামী গৃহস্থের প্রায় সকল প্রশ্নেরই সমাধান করিয়াছেন।

স্বামী বোধাত্মানন্দ

অগ্রদূত—বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ৪ শ্যামরত্ন লেন, কলিকাতা, নবজীবন সঙ্ঘ হতে শ্রীইলা চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ৯২ পৃষ্ঠা, মূল্য এক টাকা।

বইখানি পড়তে বেশ লাগল, ভাষাও অতি সুন্দর। অগ্রদূতে প্লেটো, সক্রেটিস, ভলটেয়ার, শোপেনহয়ার, এমার্সন, এডোয়ার্ড কার্পেণ্টার, ব্রাউনিং এই কয়টি প্রবন্ধ রয়েছে। পূর্ব্বে দেশ-পত্রিকায় এই প্রবন্ধগুলো প্রকাশিত হয়েছিল। শ্রীযুক্ত বিজয়বাবু কবি, তাঁর লেখনী বিশেষ শক্তিশালী তাতে সন্দেহ নাই। তাঁর এই প্রবন্ধগুলিতে তিনি বিশেষ করে শক্তিকেই শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন, শক্তিকেই পূজো করেছেন।

বইখানার ভূমিকায় বলেছেন—যে মানুষের চিন্তায় এবং কর্ম্মে সত্যশিব সুন্দরের প্রকাশ আমরা দেখেছি তাঁরই কাছে অতিমানুষের নৈবেদ্য পৌঁছে দেব। অপর স্থানে লিখেছেন—আমরা অতিমানুষ বলে এতকাল পূজার অর্ঘ্য দান করে এসেছি সীজার, নেপোলিয়ান ও আলেকজাণ্ডারকে। আবার একস্থানে কয়েকজনের নাম করে বলেছেন যে—এদের বাদ দিলে মানুষের ইতিহাসে গৌরব করবার থাকে কি? পুস্তকের শেষাংশে ব্রাউনিংএর একটি কবিতার উল্লেখ করে দুইটি প্রেমিক প্রেমিকার বিষয়ে লিখেছেন—যারা খেলতে এসে বারে বারে পয়সা গোনে, চলতে গিয়ে বারংবার পিছন পানে তাকায়, যারা তীরে বসে বসে কাঁপে অথচ ঝাঁপ দিতে ভয় পায়—এমন মানুষের প্রতি ব্রাউনিংএর একটা আন্তরিক বিতৃষ্ণা আছে।

ভীরুতাকে কেহই সমর্থন করে না। যে নিজে ভীরু সেও শক্তিরই সুখ্যাতি করে—যদিও বা মনে মনে শক্তিমানকে ঈর্ষ্যা বা ভয় করে। কিন্তু কথা হচ্ছে শক্তিমান বলতে আমরা কাকে বুঝি? যিনি বীরত্ব প্রকাশ করতে গিয়ে শুধু ভালবাসার পাত্রকে নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করেন অথবা যিনি একটা রাজ্য জয় করার জন্য নানাপ্রকার সংযম দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত শক্তি প্রয়োগ করে চিরকাল বীরের মতই চলে বীরের মতই জগৎ থেকে বিদায় নেন? ভালবাসা

স্বর্গীয় জিনিষ, কিন্তু সে ভালবাসাকে কেহ যেন মোহ বলে ভ্রম না করেন। প্রেমাস্পদকে সর্ব্ব-প্রকারে দৈহিক সম্ভোগ করা ভালবাসার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন নহে। প্রেমাস্পদের সুখেতে সুখ বোধ করা উচ্চতর ভালবাসা। তারপর যাঁদের নাম উল্লেখ করে তিনি বলেছেন যে এদের বাদ দিলে মানুষের ইতিহাসে গৌরবের কিছু থাকে না—আমরা বলতে চাই আরও কয়েকজন মৌলিক চিন্তাশীল মানব—যাঁদের মধ্যে সত্য শিব সুন্দরের প্রকাশ মানব সমাজ দেখেছে, তাঁদের নামও করলে ভাল হয়। আমরা আশা করি সুলেখক সাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় বিজয়বাবু তাঁর অন্য কোন পুস্তকে আদর্শ শক্তির সামঞ্জস্য দেখিয়ে বর্ত্তমান যুবক সমাজের যথার্থ কল্যাণ বিধান করবেন।

স্বামী রমানন্দ

শতদল—(কবিতা পুস্তক) শ্রীভারতচন্দ্র মজুমদার প্রণীত, নোয়াখালী হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। ১২৮ পৃষ্ঠা, দাম দেড় টাকা।

একশত বিশিষ্ট চতুর্দ্দশ-পদী কবিতাকে অবলম্বন করিয়া ইহার নামকরণ হইয়াছে শতদল। সমস্তগুলিই ঐশ্বরিক প্রেমমূলক এবং তাহাই পর্য্যায়ক্রমে সন্নিবেশিত। আজকালকার দিনে ইহা যে অত্যাশ্চর্য্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কবিতাগুলি সাধারণ পাঠকের উপযোগী ও তাহাদের মধ্যে ইহার প্রচার ব্যর্থ হইবে না বলিয়া মনে করি। কিন্তু লিখন বৈচিত্র্য বা সুষ্ঠু বৈশিষ্ট্য এমন কিছু না থাকায় সকল শ্রেণীর পাঠকের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইবে না। ভাব সম্পদ সবই পুরাতন ও মামুলী এবং একই চিন্তাধারার পুনরাবৃত্তি। রবীন্দ্রনাথের ছাপ সুস্পষ্ট। তবে সাধারণভাবে বিচার করিতে গেলে ভালই বলিতে হইবে। বিষয় বস্তুগুলি লেখক বেশ নিপুণতার সহিত ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সারল্যে কবিতাগুলি সমুজ্জ্বল। 'মিস্‌টিসিজম'এর হেঁয়ালী নাই। ছন্দ-বিচ্যুতি কোথাও দেখিলাম না, সুতরাং এ বিষয়ে লেখক অভিজ্ঞ। প্রচ্ছদ-পট মনোজ্ঞ ও তাঁহার স্বহস্ত অঙ্কিত।

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

পুষ্প-চয়ন—শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীতুলসীচরণ ঘোষ, বি-এল, ৫বি গরানহাটা লেন, কলিকাতা। উত্তম বাঁধাই, ১৫২ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। মূল্য পাঁচ সিকা।

বইখানির ভূমিকা লিখে দিয়েছেন সাহিত্য-সাম্রাজ্ঞী শ্রীমতী অনুরূপা দেবী। পুষ্পচয়ন সাতটি গল্পের সমষ্টি। গল্পগুলির কয়েকটি আমরা আগেই মাসিক বসুমতীতে পড়েছিলুম। বইখানি পড়ে আমাদের ভাল লেগেছে। ভাষা ও বর্ণনা সুখপাঠ্য। গল্পগুলিতে চরিত্র আঁকবার অল্প পরিসরেই লেখিকার কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। অযথা উচ্ছ্বাসে কোথাও সমতা নষ্ট করবার চেষ্টা করা হয় নি। ঘটনার সমাবেশ ও রচনার ভঙ্গী আমাদের ভালই লেগেছে। চরিত্রচিত্রণ চমৎকার হয়েছে।

ফ্রয়েডীয় বিশ্লেষণের ধারা ছেড়ে লেখিকা গল্পের ভিতর দিয়ে সত্য ও ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠায় চেষ্টা করেছেন। সাহিত্যের উদ্দেশ্যহীন অতি আধুনিকতার যুগে সাহিত্যকে শুধু বিশ্লেষণের বাহন না করে যাঁরা তা শিক্ষার উদ্দেশ্যে কাজে লাগাতে চান তাঁদের কাছে বইখানি আদর পাবে, সন্দেহ নেই।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী, বি-এস্ সি

স্বামী নির্ম্মলানন্দ মহারাজের মহাসমাধি

গত ২৮শে এপ্রিল মঙ্গলবার স্বামী নির্ম্মলানন্দ মহারাজ মালাবার প্রদেশে ওটাপলম্ নামক স্থানে প্রায় ৭৩ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

স্বামী নির্ম্মলানন্দ বাগবাজার বসুপাড়ার বিখ্যাত দত্তবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের নাম ছিল তুলসীচরণ দত্ত এবং পিতার নাম ৺দেবনাথ দত্ত। তিনি বাগবাজার ৺বলরাম বসু মহাশয়ের বাটীতে অল্প বয়সেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের তিরোধানের পর তিনি বরাহনগর মঠে যোগদান করেন এবং স্বামী নির্ম্মলানন্দ নামে পরিচিত হন। ইনি স্বামী বিবেকানন্দের বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিলেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজকে সহায়তা করিবার জন্য তাঁহাকে আমেরিকায় প্রেরণ করা হয় এবং ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি কয়েক বৎসর উত্তর ভারতে নানা তীর্থপর্য্যটনে ও তপস্যায় অতিবাহিত করেন। দক্ষিণ-ভারতে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজের প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্গালোর আশ্রমের কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য তিনি ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে বেলুড়-মঠ হইতে প্রেরিত হন এবং বিশ বৎসরের উপর উক্ত আশ্রমের অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া দক্ষিণ-ভারতের নানাস্থানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণী প্রচার ও মালাবর অঞ্চলে কয়েকটী আশ্রম স্থাপন করেন। তাঁহার তেজস্বিতা ও বাগ্মিতা ছিল অনন্যসাধারণ। তিনি বহু ভক্ত ও শিষ্য রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দেহাবসানে সকলেই শোক-সন্তপ্ত।

সংবাদ

রামকৃষ্ণ-মিশন, বেলুড়,—গত ইষ্টারের সময় বেলুড় মঠে স্বামী মাধবানন্দের সভাপতিত্বে রামকৃষ্ণ মিশনের ২৯তম বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভায় বহু সভ্য যোগদান করিয়াছিলেন। গত সভার কার্য্য-বিবরণী পাঠ এবং তাহা গৃহীত হইলে মিশনের সম্পাদক স্বামী বিরজানন্দ ১৯৩৭ সালের বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী পাঠ করেন। মিশনের ১৯৩৭ সালের কার্য্যের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে এবং ভারতবর্ষের বাহিরে কেন্দ্রের সংখ্যা মোট ১০০টি।

আলোচ্য বৎসরে রামকৃষ্ণ মিশন বিভিন্ন স্থানে সাময়িক এবং স্থায়ীভাবে সেবাকার্য্য করিয়াছে। পুরী ও বাঁকুড়া জেলায় বন্যা, অগ্নি-কাণ্ড ও বসন্ত মহামারীর সময় সেবাকার্য্য করা হইয়াছে।

মিশনের অধীনে সর্ব্বসমেত ৭টি ইন্‌ডোর হাসপাতাল ও নয়াদিল্লীর "যক্ষ্মা চিকিৎসালয়" লইয়া মোট ৩০টি চিকিৎসালয় আছে। বারাণসী, কন্‌খল, বৃন্দাবন, এলাহাবাদ, মাদ্রাজ, সিংহল, রেঙ্গুন, বোম্বাই, কানপুর, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি সেবাকেন্দ্র উল্লেখযোগ্য। আলোচ্য বৎসরে রেঙ্গুনের মিশন

কেন্দ্রে মোট ২৩৯৩৬৯ জন ও বারাণসীর শাখা-কেন্দ্রে মোট ৬২৬৪৩ জন রোগীকে চিকিৎসা করা হইয়াছে। ভুবনেশ্বর (উড়িষ্যা), জয়রামবাটী (বাঁকুড়া) এবং সারগাছি (মুর্শিদাবাদ) প্রভৃতি মফঃস্বল কেন্দ্রেও নানারকমভাবে সেবাকার্য্য ও চিকিৎসা করা হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে ইন্‌ডোর হাসপাতালসমূহে মোট ৯ হাজার ৭ জন রোগীর চিকিৎসা হইয়াছে। ১৯৩৬ সালে ইন্‌ডোর হাসপাতালসমূহে রোগী সংখ্যা ছিল ৭ হাজার ৭ শত ৭ জন। মূলকেন্দ্রে এবং শাখাকেন্দ্রে আউটডোর চিকিৎসালয়সমূহে ১৯৩৭ সালে মোট ১১ লক্ষ ৩৭ হাজার ৭ শত ৯৪ জন রোগীকে চিকিৎসা করা হইয়াছে। ১৯৩৬ সালে আউটডোর চিকিৎসালয়সমূহে মোট ১০ লক্ষ ২৯ হাজার ৩ শত ৪৯ জন রোগীকে চিকিৎসা করা হইয়াছিল।

মিশনের শিক্ষা বিভাগ প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত। (১) বালক বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয়, বালক বালিকা বিদ্যালয় (এক সঙ্গে), নৈশ বিদ্যালয়, বয়স্কদের জন্য বিদ্যালয় এবং শিল্প বিদ্যালয়। (২) "ষ্টুডেন্টস্ হোম" (ছাত্রাবাস) এবং অনাথ আশ্রম। মিশনের শাখা কেন্দ্রে মোট ১৯টি "ষ্টুডেন্টস্ হোম্", ৪টি "অনাথ আশ্রম", ৩টি "রেসিডেন্সিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়", ৬টি "উচ্চ বিদ্যালয়," ৪টি "প্রাথমিক বিদ্যালয়" এবং ৩টি "শিল্পবিদ্যালয়" আছে। এই বিদ্যালয়সমূহে আলোচ্য বৎসরে ছাত্রসংখ্যা ছিল মোট ৮২৫০ জন।

পল্লী অঞ্চলে মিশনচালিত বিদ্যালয়সমূহে পল্লী বালক বালিকাগণকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। পল্লী অঞ্চলের শাখা কেন্দ্রের পরিচালিত বিদ্যালয়ের মধ্যে ডায়মণ্ডহারবারের নিকটবর্ত্তী সরিষা গ্রাম, কাঁথি (মেদিনীপুর) এবং আসামের হবিগঞ্জ ও শ্রীহট্টের বিদ্যালয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। সরিষা গ্রামের বিদ্যালয়ে প্রায় পাঁচ শতাধিক বালক-বালিকা অধ্যয়ন করে।

শিল্পবিদ্যালয়সমূহে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়া হয়:—(১) মেকানিক্যাল্ এণ্ড অটোমোবাইল ইঞ্জিনীয়ারিং, (২) সূতা কাটা, বস্ত্র বয়ন, রং করা, কাপড়ের উপর রং করা (ক্যালিকো প্রিন্টিং) ও দর্জ্জির কাজ, (৩) বেতের কাজ, (৪) কাষ্ঠ শিল্প, (৫) জুতা তৈয়ারী শিক্ষা। মাদ্রাজের শিল্পশিক্ষা কেন্দ্রে মেকানিক্যাল্ এণ্ড অটোমোবাইল ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা দেওয়া হয় এবং তাহার কোর্স পাঁচ বৎসর। এই শিল্পপ্রতিষ্ঠানটি সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত। হবিগঞ্জে দুইটি জুতার কারখানা স্থাপন করা হইয়াছে। সেখানে মুচি বালকদিগকে চর্ম্ম-শিল্প সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়। হবিগঞ্জে মুচিদের সুবিধার্থে দুইটি "সমবায় ঋণ-দান সমিতি" স্থাপন করা হইয়াছে।

কলিকাতার "নিবেদিতা বালিকা-বিদ্যালয়ের" আলোচ্য বৎসরে ছাত্রী-সংখ্যা ৫২৯ জন। মাদ্রাজের বিদ্যালয়সমূহেই ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা সর্ব্বাধিক। আলোচ্য বৎসরে মাদ্রাজে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ছিল ১৭৮৩ জন।

মিশনের পরিচালনায় বিভিন্ন কেন্দ্রে মোট ৫৫টি গ্রন্থাগার আছে। রেঙ্গুনের গ্রন্থাগারে আলোচ্য বৎসরে বহুলোক আসিয়া অধ্যয়ন করিয়াছেন। মাদ্রাজ ষ্টুডেন্টস্ হোমের গ্রন্থাগারে মোট ২১ হাজার বই আছে। মিশনের সমস্ত কেন্দ্রের গ্রন্থাগারে পুস্তকের সংখ্যা প্রায় ৬৫ হাজার।

মঠের সন্ন্যাসিগণ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এবং আমেরিকা ও ইউরোপের নানাস্থানে সন্তোষজনক প্রচারকার্য্য করিয়াছেন। ইংরাজি ভাষায় "প্রবুদ্ধ ভারত" (মায়াবতী), "বেদান্ত কেশরী" (মাদ্রাজ), "মেসেজ অফ্ দি ইষ্ট" (বোষ্টন), "বেদান্ত" (সুইজারল্যাণ্ড) ও "ভয়েস অব ইণ্ডিয়া" (হলিউড), বাঙ্গলা ভাষায় "উদ্বোধন" এবং তামিল ভাষায় "শ্রীরামকৃষ্ণ-বিজয়ম্" পত্রিকা মঠ হইতে নিয়মিত পরিচালিত হইতেছে। ধর্ম্মবিষয়ক অনেক গ্রন্থও বাহির করা হইয়াছে।

মিশনের পরিচালনায় অনুন্নত শ্রেণীর উন্নয়নের জন্য কয়েকটি স্থানে কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ত্রিচুর (কোচিন) ও শেলা (খাসিয়া পাহাড়) কেন্দ্রের নাম উল্লেখযোগ্য।

আলোচ্য বৎসরে সেবাকার্য্য চালাইতে মিশনের মোট ৫ লক্ষ ৭৪ হাজার ৯ শত ৬৩ টাকা ৩ আনা ৫ পাই ব্যয় হইয়াছে।

রামকৃষ্ণ-মিশন, ইন্‌ষ্টিটিউট্ অব্ কাল্‌চার্, কলিকাতা—গত ১৬ই এপ্রিল সোমবার সন্ধ্যায় ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট্ হলে রামকৃষ্ণ মিশনের ইন্‌ষ্টিটিউট্ অব্ কাল্‌চারের

উদ্যোগে এক সভার আয়োজন হয়। স্বামী শর্ব্বানন্দ নব ভারতের আদর্শ সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। ছাত্র-ছাত্রী ও বাহিরের লোকের জনতা এত অধিক হইয়াছিল যে, হলে তিল ধারণের স্থান ছিল না, স্থানাভাবে অনেককে বাহিরে অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। রাষ্ট্রপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

স্বামী শর্ব্বানন্দ বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন যে, বর্ত্তমান পাশ্চাত্য জাতি হিংসার পথ অবলম্বন করিয়াছে। কি উপায়ে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অধিক সংখ্যক নরহত্যা করা যায় সেই দিকেই তাঁহারা গভীর গবেষণায় মগ্ন। কিন্তু হিংসার বাণী ভারতের আদর্শ নয়। ভারতের বিশেষত্ব প্রেম, শান্তি ও অহিংসা। চিরকালই ভারত এই বিশেষত্বকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আসিয়াছে। ভারতই পুনরায় পাশ্চাত্য জাতিকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিবে। দরিদ্র ভারতবর্ষে নারায়ণরূপে পূজিত হইয়া থাকে।

স্বামীজি আরও বলেন যে, দেশের মধ্যে রোমাণ্টিক্ মনোবৃত্তি বিশেষভাবে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। আধ্যাত্মিক চিন্তা আজকাল যুবকদের নিকট উপহাসের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কি নৈতিক, কি শারীরিক, কি মানসিক সকল ক্ষেত্রেই বাঙ্গলা ক্রমেই হীনপ্রভ হইয়া পড়িতেছে। বিশেষ করিয়া শারীরিক শক্তিতে বাঙ্গালীর ন্যায় পশ্চাৎপদ কোন জাতি দেখা যায় না। বাঙ্গালী জাতিকে যদি বাঁচিতে হয় তাহা হইলে বর্ত্তমান জীবন-পদ্ধতির আমূল সংশোধন করিতে হইবে। বাঙ্গালীকে বাহুবলের উপাসক হইতে হইবে। যে জাতির বাহুতে শক্তি নাই, সে জাতি রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিলেও তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না।

তিনি আরও বলেন যে, বর্ত্তমান যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে সংযমের অভাব দেখা যাইতেছে। ব্রহ্মচর্য্যকে আমাদের জাতীয় জীবনের মূলমন্ত্ররূপে গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা আমাদের জাতীয় উত্থানের পক্ষে আবশ্যক। ইহাকে অবহেলা করিয়া চলিলে জীবন-সংগ্রামে কোন জাতি টিকিয়া থাকিতে পারিবে না।

রাষ্ট্রপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয় স্বামী শর্ব্বানন্দকে তাঁহার সারগর্ভ বক্তৃতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া বলেন যে, স্বামীজি বাঙ্গলার যুবক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কিঞ্চিৎ কঠোর ভাষা প্রয়োগ করিলেও আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তিনি সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া এবং আমাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হিসাবে এরূপ কথা বলিয়াছেন। তাঁহার কথাগুলির মধ্যে যে অনেকখানি সত্য নিহিত আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। স্বার্থপরতা ও একতার অভাব আমাদের জাতির উত্থানের পক্ষে প্রধান অন্তরায়। নূতন ভারত সৃষ্টি করিতে হইলে জাতির ধমনীতে তাজা শোণিত প্রবাহিত করিতে হইবে। জাতিকে—বিশেষ করিয়া বাঙ্গালীকে শারীরিক শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া উঠিতে হইবে। কারণ শারীরিক শক্তিহীনতার জন্যই বাঙ্গালী আজ সর্ব্বত্র পরাজিত হইতেছে। বর্ত্তমানে বাঙ্গালীর সম্মুখে যে সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে তাহা পূর্ব্বের সমস্যা অপেক্ষা দশগুণ কঠিন। যুবক সম্প্রদায় যদি তাঁহাদের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। কঠোর ব্রহ্মচর্য্য হইবে বর্ত্তমান যুবক সম্প্রদায়ের উন্নতির প্রধান অবলম্বন এবং প্রত্যেক কার্য্যের ভিতর তাঁহাদিগকে আধ্যাত্মিকতার পরিচয় দিতে হইবে। যদি আমরা নৈতিক, শারীরিক ও মানসিক উন্নতি লাভ করিতে ইচ্ছা করি তবে আত্মসংযম অভ্যাস করিতে হইবে। তাহা হইলে জাতীয় স্বাধীনতা আমাদের সহজলভ্য হইয়া উঠিবে।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বেদান্ত সোসাইটি, লণ্ডন—অধ্যক্ষ স্বামী অব্যক্তানন্দ গত এপ্রিল ও বর্ত্তমান মে মাসে লণ্ডন নগরীর বিভিন্ন স্থানে নিম্নোক্ত বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন :—

"বেদান্ত ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব", "খৃষ্টীয় নীতি ও বেদান্ত", "বেদান্ত ও বিশ্বশান্তি", "য়াহুদী রাহস্যিকতা ও বেদান্ত", "বেদান্তে সমাজ ও ব্যক্তি", "বেদান্ত ও রাহস্যিকতা", "বেদান্ত ও অপৌরুষেয় দৃষ্টি", "বেদান্ত ও আত্মজ্ঞান", "বেদান্ত ও বর্ত্তমান সমাজ।"

বেদান্ত সোসাইটি, স্যান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো—অধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দ গত এপ্রিল মাসে সেঞ্চুরী ক্লাব ও বেদান্ত সোসাইটি হলে নিম্নোক্ত বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন :—

"আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক—দৃশ্য ও অদৃশ্য" "স্বর্গীয় নীতি ও স্বর্গীয় কৃপা", "ঈশ্বরাস্তিত্বের

প্রমাণ", "প্রভু ও ভৃত্যরূপী মন", "পুনর্জন্মবাদ ও মৃতোত্থান", "সৃষ্টির গল্প", "উন্নত মন ও তাহার শক্তি", "ভারতের আলোক।"

এতদ্ব্যতীত প্রতি শুক্রবার বেদান্ত সোসাইটি হলে সমাগত ভক্তগণকে তিনি ধ্যান ধারণা এবং বেদান্ততত্ত্ব-সাধন সম্বন্ধে শিক্ষাদান করিয়াছেন।

রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, বেনারস—গত ১৯৩৮ সালে বেনারস রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম তাহার গৌরবময় কর্ম্মজীবনের ৩৮ বর্ষ অতিক্রম করিয়াছে। উক্ত বৎসরের সংক্ষিপ্ত কার্য্য-বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

সেবাশ্রমের অন্তর্বিভাগে রোগীদের জন্য সর্ব্বশুদ্ধ ১৪৫টি বেড্ আছে। তাহাতে আলোচ্য বৎসরে মোট ১৪৩৭টি রোগী স্থান পাইয়াছে। অন্তর্বিভাগের দৈনিক গড়পড়তা ৯৩০৭। আলোচ্য বর্ষে সেবাশ্রমের আতুর বিভাগে ৩জন পুরুষ, ৯জন মেয়ে এবং ১১টি বাতব্যাধিগ্রস্ত রোগীকে স্থান দান করা হইয়াছে।

সেবাশ্রমের বহির্বিভাগে এই বৎসর মোট ৬১২০৬ জন রোগী চিকিৎসা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই বিভাগের দৈনিক গড়পড়তা ৪৭৫। এই বৎসরের সার্জিক্যাল রোগীর সংখ্যা মোট ১০৩৪। আলোচ্য বৎসরে মোট ১৮৪ জন বিপন্ন লোককে সাপ্তাহিক বা মাসিক সাহায্য প্রদান করা হইয়াছে। ইহাদের অধিকাংশই ভদ্রবংশীয় দুঃস্থ নরনারী। এতদ্ভিন্ন ১৪১৬ জন বিপন্ন নরনারী ও ছাত্রকে সাময়িক সাহায্য দান করা হইয়াছে।

গত বৎসরের উদ্বৃত্ত ২৮১৭২।৶২ পাই সহ এই বৎসরের মোট আয় ১০৯৫৭৫।৶১১ পাই এবং মোট ব্যয় ৭৯০৯২/১০ পাই।

রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, কন্খল—গত ৬ই মার্চ্চ হইতে কন্খল রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে তিন দিন ব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১০৩ তম জন্মোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথম দিনে বিশেষ পূজা ভোগ রাগ ভজন, দ্বিতীয় দিনে সাধুসেবা এবং তৃতীয় দিনে একটি বিরাট সভার অধিবেশন হয়। মণ্ডলেশ্বর পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য স্বামী জয়েন্দ্র পুরীজী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় দশনামী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের বহু সন্ন্যাসী এবং বিভিন্ন প্রদেশের অনেক নরনারী যোগদান করিয়াছিলেন। দশনামী সম্প্রদায়ের কয়েকজন মণ্ডলেশ্বর এবং উদাসী সম্প্রদায়ের কতিপয় সন্ন্যাসী সভায় বক্তৃতা করেন।

ঋষিকুলের ব্রহ্মচারিগণের সমবেত কণ্ঠে বেদমন্ত্র পাঠের পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের স্বামী জগন্নাথানন্দ সংস্কৃত ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী পাঠ করেন। সভাপতি তাঁহার অভিভাষণে বলেন, "শ্রুতি ও স্মৃতিতে অনেক উপাসনার কথা আছে। নিষ্কাম কর্ম্মযোগ বা ঈশ্বর উপাসনার ভাবেই রামকৃষ্ণ মিশন সেবা কাজ করে থাকেন। সন্ন্যাসের আগে কর্ম্মের বিধান আছে। সন্ন্যাসের পরও দেবসেবা, গুরুসেবা, উপাসনাদি কর্ম্ম করতে হয়। ব্রহ্ম ভিন্ন জগতে আর কিছু নেই। সুতরাং জন-জনার্দ্দনের সেবা করলে ঈশ্বরেরই সেবা করা হয়।

"রামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসিগণ বিশেষ শিক্ষিত হয়েও কেমন সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করেছেন। এঁরা যে শুধু নর-নারায়ণের সেবাই করেন, তা নয়, দেবসেবার ভাবও এঁদের মধ্যে খুবই দেখা যায়। এই দেবসেবা এঁরা পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের কাছ থেকে পেয়েছেন।

"বর্ণমালার মধ্যে আগে দ, তারপর র, তারপর শ। সুতরাং আগে দেবসেবা তারপর দেশসেবা। যদি আগে (অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি না করিয়া) দেশসেবা করতে যাও, তা হলে শব বা 'মুর্দাতে' পরিণত হবে (অর্থাৎ দেশসেবা সফল হবে না)। আগে দেবসেবা করলে দেখতে পাবে সমস্তই বশ হয়েছে, অর্থাৎ সমগ্র প্রাপ্য পেয়েছ।

"এঁদের গুরুভক্তি অতুলনীয়। গুরুভক্তি না হলে কিছুই হয় না। সন্ন্যাসী হলেও গুরুভক্তি খুব প্রয়োজন।"

মণ্ডলেশ্বর পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য স্বামী কৃষ্ণানন্দজী বলেন, "রামকৃষ্ণ পরমহংস এই বাক্যে দুটি পদ দেখা যায়। ত্রেতায় যিনি রাম, দ্বাপরে যিনি কৃষ্ণ, তিনিই রামকৃষ্ণ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে রাম ও কৃষ্ণ গৃহস্থ জীবন যাপন করে লোকের কল্যাণ করেছিলেন। এবারে রামকৃষ্ণদেব চতুর্থাশ্রম (সন্ন্যাস) গ্রহণ করে জগৎকে কল্যাণমার্গ দেখিয়ে গিয়েছেন।

"রামকৃষ্ণের পর পরমহংস পদটি আছে। হংসের একটি বিশেষ শক্তি আছে, সে ক্ষীর ও নীরকে দুভাগ করে শুধু ক্ষীরটুকু গ্রহণ করতে পারে। সেরূপ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সদসদ্

উপলব্ধি করে বিবেক-প্রতিমূর্ত্তি বিবেকানন্দ উৎপন্ন করে গেছেন। পরমহংস শব্দের আর এক প্রকার অর্থ হয়। হংস শব্দের অর্থ সূর্য্য। সূর্য্য কেবল অব্যবধান স্থানের অন্ধকার বিনাশ করেন, কিন্তু আমাদের পরমহংস মানুষের হৃদয়গুহানিহিত অন্ধকারও সমূলে বিনাশ করেন। এজন্যই তিনি পরমহংস।

"ভারতবর্ষে বহুল পরিমাণে বেদান্ত প্রচার হয়েছে ও হচ্ছে। কিন্তু ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি দেশ বেদান্ত কি, তা জানত না। পরমহংস-দেব বিবেকরূপী বিবেকানন্দকে প্রেরণ করে সে সব দেশেরও বহু লোকের হৃদয়গুহানিহিত অন্ধকার বিনাশ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ জয়ন্তী পালন করা দরকার, তাতে সকলের কল্যাণ হয়ে থাকে।"

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য মণ্ডলেশ্বর স্বামী ভাগবতানন্দ মহারাজ বলেন, "রামকৃষ্ণ পরমহংস এই বাক্যে তিনটি পদ। পর মা চ ইতি পরমা। মা মানে লক্ষ্মী মায়া, পর মানে দূরে। মায়া যাঁর কাছ থেকে দূর হয়েছে, তিনিই পরমহংস।

"রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের গুরু শ্রীমৎ তোতা-পুরীজী মহারাজ। তোতা মানে শুক। অর্থাৎ শুকদেবের মত জ্ঞানী শ্রীমৎ তোতাপুরীজী রামকৃষ্ণ পরমহংস নাম দিয়ে সাফল্যমণ্ডিত করেছেন।

" 'ন মুনেঃ' এই সূত্রের মহাভাষ্যে আছে—এক গরিব বৃদ্ধা কোন সাধুর কাছে ঐশ্বর্য্যাদি প্রার্থনা করেন। সাধু বললেন, এক বাক্যেতে যা চাইবে তাই পাবে। বৃদ্ধাটি তখন যাঞা করলে, অট্টালিকায় সোনার থালায় নাতির সঙ্গে ভাত খাব। এক বাক্যেতে পুত্র নাতি ঐশ্বর্য্য সবই আছে। ঠিক সেরূপই রামকৃষ্ণের একটি বাণীতে সমস্ত পথ সন্নিবেশিত হয়েছে। 'যত মত তত পথ।' তাঁকে কি বস্তু দিয়ে পূজা করবে?—সবই যে তাঁর। মণি মাণিক্যাদি উপহার দেবে?—তিনি যে তাঁর অধীশ্বর। কোন স্থাবর সম্পত্তি দেবে? তিনি হচ্ছেন জগদীশ্বর। তাঁর কাছে যা নেই, তাই দিয়ে তাঁকে পূজো করতে হয়। সেটি হচ্ছে মন। আমি তাই আমার মনটি তার পাদপদ্মে সমর্পণ করলাম।"

পরিব্রাজকাচার্য্য স্বামী মহেশ্বরানন্দ মহারাজ বলেন, "জ্ঞানদাতা গুরুর তুলনা নেই। পরশ-মণি লোহাকে সোনা করে বটে, কিন্তু পরশমণি করে না। কিন্তু জ্ঞানদাতা গুরু স্পর্শ না করেও তাঁর সমান গুণ শিষ্যেতে সংক্রমিত করে থাকেন। রামকৃষ্ণদেবের চরণযুগলে অনেক ভক্ত শান্তি ও জ্ঞানলাভ করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দকে তৈরী করে তিনি জগৎকে আশ্চর্য্যান্বিত করে গিয়েছেন। * * রামকৃষ্ণদেব সমস্ত স্ত্রী জাতিকে মাতৃবৎ জ্ঞান করতেন। তিনি দ্বন্দ্বাতীত ও গুণাতীত ছিলেন।"

পরিব্রাজকাচার্য্য স্বামী বিদ্যানন্দ মহারাজ বলেন, "আজকাল লোকে বলে থাকে সংস্কৃত না পড়লে জ্ঞান হয় না। কিন্তু রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সংস্কৃতের 'স' জানতেন না। তবুও তাঁর কাছে বড় বড় পণ্ডিত ন্যায় বেদান্তবাগীশরা শির নত করতেন কেন? পরমহংসদেবের অনন্ত জ্ঞান পরমাত্মাতে যোগ থাকার অফুরন্ত হয়েছিল।

"বহুরূপী গিরগিটি রং পরিবর্ত্তন করে নানা রং ধারণ করে। যারা গিরগিটির সব রং দেখে নি, তারা রং নিয়ে ঝগড়া করে। কিন্তু আমাদের পরমহংসদেব গিরগিটির সব রকম রং দেখেছিলেন এবং রংএর অতীত সত্তা ও সম্যক্ উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি কোন ধর্ম্ম মতের সঙ্গে ঝগড়া করতেন না। সকল সম্প্রদায়ের লোক তাঁর কাছে এসে শান্তি পেত।"

মোহান্ত স্বামী কৃষ্ণানন্দ মহারাজ বলেন, "এ ভারত ভূমিতে কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস স্বামীর আবির্ভাব হয়েছিল। বাল্যকাল থেকেই তিনি বিষয়কে বিষবৎ জেনেছিলেন এবং জগজ্জননীর উপাসনায় নিমগ্ন ছিলেন। * * রামকৃষ্ণ পরমহংস স্বামী দেবাস্বরূপ ছিলেন। শুনা যায়, তিনি কত জীবের দুঃখকে নিজের উপর নিয়েছিলেন। যিনি এই মহাপুরুষের উপদেশ দেশদেশান্তরে প্রচার করেছিলেন, তাঁর নাম স্বামী বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দ ছিলেন অদ্বৈতমার্গগামী। তিনি আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে নিজ আত্মাকে দেখতেন। * *"

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য মণ্ডলেশ্বর স্বামী নৃসিংহ গিরি মহারাজ বলেন, "স্বামী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মত মহাপুরুষের মহিমা কে গান করতে পারে? তিনি সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপ ছিলেন। যদি বিচার করে দেখা যায়, তা হলে মনে হয়, সাংসারিক ত্রিতাপতপ্ত জীবের জন্য মহাপুরুষগণকে

ভগবান্ থেকেও অধিক জানা আবশ্যক। * * রামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও আচরণাদি থেকে আমরা জানতে পারি, তিনি বাস্তবিকই মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি কামিনী কাঞ্চন সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করেছিলেন এবং সমস্ত স্ত্রী জাতিকে মাতৃভাবে দেখতেন। * * স্বামী বিবেকানন্দে রামকৃষ্ণদেবের শক্তিসঞ্চার সম্যক্‌রূপে প্রতিভাত হয়েছিল। সেই শক্তিবলেই তিনি দেশ দেশান্তরে ধর্ম্মপ্রচার করে গেছেন এবং সেই শক্তিবলেই মিশনের দ্বারা দীন দুঃখী জীবের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হচ্ছে। রামকৃষ্ণদেবের উৎসব ও স্মরণ যতই করা যাক না কেন, উহা কিছুতেই পর্য্যাপ্ত হবে না। আমার আন্তরিক প্রার্থনা এরূপ মাঙ্গলিক উৎসবের অনুষ্ঠান যেন সর্ব্বদাই অনুষ্ঠিত হয়।"

বিবেকানন্দ-সোসাইটি, জামসেদপুর—স্থানীয় বিবেকানন্দ-সোসাইটির উদ্যোগে গত ২০শে মার্চ্চ রবিবার হইতে ২৭শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব বিরাট সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। প্রথম দিন প্রভাতে একটি বিরাট শোভাযাত্রা সোসাইটি হইতে বাহির হইয়া সমস্ত সহর প্রদক্ষিণ করিতে থাকে। সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের বার্ত্তা প্রচারের উদ্দেশ্যে শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, জরাথুষ্ট্র, ভগবান বুদ্ধ, যীশুখৃষ্ট, শঙ্করাচার্য্য, গুরু নানক, শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক ও অবতারের বৃহৎ চিত্রসমূহ পুষ্প ও মাল্য ভূষিত করিয়া অনেকগুলি সুসজ্জিত মোটরে স্থাপিত করিয়া শোভাযাত্রায় বাহির করা হইয়াছিল। মহাপুরুষগণের বাণী ও উপদেশ অঙ্কিত অসংখ্য পতাকা শোভাযাত্রার শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিল এবং অনেক গায়ক ও কীর্ত্তনের দল সঙ্গীতের সহিত শোভাযাত্রার অনুগমন করিয়া সহর প্রদক্ষিণ করে। বেলা প্রায় ১২টার সময় সোসাইটিতে প্রত্যাগমনের পর শোভাযাত্রা শেষ হয় এবং সমাগত সর্ব্বশ্রেণীর শোভাযাত্রিগণকে অন্ন-প্রসাদ দ্বারা তৃপ্ত করা হয়।

অতঃপর ৭ দিন ধরিয়া সোসাইটিতে ও সহরের বিভিন্ন অংশে বিরাট সভার অধিবেশন হয়। এতদুপলক্ষে বেলুড়মঠ ও মিশনের অন্যান্য কেন্দ্র হইতে স্বামী মাধবানন্দ, স্বামী ঘনানন্দ, স্বামী শ্রীবাসানন্দ, স্বামী তপানন্দ, স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ ও স্বামী গম্ভীরানন্দ প্রভৃতি আমন্ত্রিত হইয়া ইংরাজী ও বাঙ্গলাতে অনেকগুলি বক্তৃতা দেন এবং বর্ত্তমান জগতে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন, সাধনা ও উপদেশের যথার্থ প্রয়োজন ও উপকারিতা প্রাঞ্জল ভাষায় সকলকে বুঝাইয়া দেন। টাটা ষ্টীল ফ্যাক্টরীর জেনারেল ম্যানেজার মিঃ জে, জে, গান্ধী, টাউন এড্‌মিনিষ্ট্রেটর মিঃ বার্ড প্রমুখ সহরের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া সকলের উৎসাহবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। সোসাইটির পরিচালিত স্কুলসমূহের কৃতী ছাত্র ও ছাত্রীগণকে পারিতোষিক প্রদান করা হয়। এতদ্ব্যতীত শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও উপদেশ সম্বন্ধে ছাত্র ও জনসাধারণের মধ্যে ইংরাজী, বাংলা ও হিন্দীতে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় যাহারা বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে ৫টি বিশেষ পারিতোষিক দেওয়া হয়।

২৭শে মার্চ্চ সোসাইটির আলয়ে সহস্রাধিক দরিদ্রনারায়ণগণকে খিচুড়ি, তরকারী, চাটনী ও মিষ্টি প্রসাদের দ্বারা তৃপ্ত করা হয়।

এতদ্ব্যতীত কয়েকদিন রাত্রিতে পদাবলী কীর্ত্তন, ভজন সঙ্গীত ও শ্রীকৃষ্ণযাত্রা প্রভৃতির ব্যবস্থা হইয়াছিল।

রামকৃষ্ণমিশন সেবাশ্রম, লক্ষ্ণৌ—গত ২০শে মার্চ্চ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসবের সভাপতি হিসাবে শিক্ষামন্ত্রী শ্রীযুক্ত সম্পূর্ণানন্দ বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন, "আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস যে, সমাজতন্ত্রে সমাজের মঙ্গল হইবে এবং সমাজতন্ত্র ও অদ্বৈত বেদান্ত পরস্পর বিরোধী নয়।" তিনি বলেন যে, ভারতে নবযুগ আসিয়াছে। ধর্ম্মকে নূতন নূতন সমস্যার মীমাংসা করিতে হইবে। ভারতের প্রয়োজন একজন নূতন লোকের। ব্যক্তিগত সুখের দাম নাই, প্রয়োজন সামাজিক সুখের। সে সুখ আনয়ন করিবে ধর্ম্ম। তিনি বলেন, "শ্রীরামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দই প্রথম স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, আমরা অমৃতের সন্তান।"

কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলার ভূতপূর্ব্ব বন্দী শ্রীযুত শচীন্দ্রনাথ সান্যাল বলেন, "বিজ্ঞান, কম্যুনিষ্ট মতবাদ এবং অন্যান্য জিনিষ ধর্ম্মকে যে আঘাত করিয়াছে, ধর্ম্মকেই তাহার জবাব দিতে হইবে। জীবনে ধর্ম্মের স্থান কোথায়, বিজ্ঞান ও অর্থনীতির সহিত উহার সম্পর্ক কি তাহা ভাবিয়া দেখা

প্রয়োজন।” দেওঘর রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠের স্বামী যাগেশ্বরানন্দ বলেন যে, ধর্ম্ম অহিফেনের কাজ করে বলিয়া যে অভিযোগ করা হয়, মহাপুরুষদের জীবনী আলোচনা করিলে তাহা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। তাঁহাদের জীবনী আলোচনা করিলে ইহাও দেখা যায় যে, ধর্ম্ম মানুষকে অলস করিয়া রাখে না—কর্ম্মপ্রেরণা যোগায়।

শ্রীরামকৃষ্ণমিশন আশ্রম, পাটনা—গত ৫ই মার্চ্চ হইতে এখানে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ জন্মবার্ষিকী উৎসব আরম্ভ হইয়াছিল।

এতদুপলক্ষে আশ্রমে প্রায় দুই সহস্র ‘দরিদ্রনারায়ণকে’ ভূরিভোজনে পরিতৃপ্ত করা হয়।

বৈকালে স্বামী মাধবানন্দের সভাপতিত্বে এক ছাত্র-সভার অধিবেশন হয়। সভায় রামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী এবং তাঁহাদের উপদেশাবলীর আলোচনা করিয়া বক্তৃতা করা হয়।

প্রথমে পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী বাবু জগৎনারায়ণ লাল বক্তৃতাপ্রসঙ্গে দুঃখ করিয়া বলেন যে, বর্ত্তমানে নাস্তিকতার প্রভাব সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হইতেছে। কলেজের আধুনিক ছাত্রদের মধ্যেই ইহার প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। ধর্ম্মকে কেহ আর আমল দিতে চায় না। তিনি আরও বলেন যে, ভগবান্‌কে যুক্তিতর্কের দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না। জগতের সেবাই ধর্ম্ম। উপসংহারে তিনি বলেন যে, যদি মানুষ জগৎকে ঠিক পথে পরিচালিত করিতে চায়, তবে তাহাদিগকে এই দুইজন মহাত্মার উপদেশ অনুসরণ করিয়া কার্য্য করিতে হইবে।

পরবর্ত্তী বক্তা মিঃ মাহদী ইমান, বার্-এট্-ল বলেন যে, প্রাদেশিকতা ভুলিয়া ভারতবাসীকে এক জাতীয় মনোভাবের মধ্যে গড়িয়া উঠিতে হইবে। এই ব্যাপারে এই দুই মহাপুরুষের নিকট হইতে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারি। রামকৃষ্ণ পরমহংস ছিলেন ভাবুক, বিবেকানন্দ ছিলেন জ্ঞানী। উভয় মহাপুরুষই জগতের সম্মুখে শান্তি এবং সর্ব্বজনীন ধর্ম্মের বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের উপদেশ অনুসরণ করিলে সাম্প্রদায়িক বিবাদ ভুলিয়া আমরা আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে সমর্থ হইব।

অধ্যাপক কালীকুমার দত্ত, এম্-এ, পি-আর-এস্, পি-এইচ-ডি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, ভারতের নবজাগরণের ইতিহাসে স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব অতুলনীয়। পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত ইতিহাস আলোচনা করিয়া তিনি বলেন—অষ্টাদশ শতাব্দী ভারতের ইতিহাসের রাজনৈতিক, আর্থিক, সামাজিক প্রভৃতি সব দিক দিয়াই এক অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বব্যাপী যে জাগরণের সাড়া দেখা দেয়, ভারতের ভাবধারাতেও পাশ্চাত্য ভাবধারার সেই সংঘাত পরিলক্ষিত হয়; দেশে নানা সমিতি স্থাপিত হইতে থাকে, জীবনযাত্রার বিভিন্ন দিকে উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন দেখা দেয় এবং জীবনের সমস্যাগুলি গুরুত্বপূর্ণ আকার ধারণ করে। এই সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্ত্তে স্বামী বিবেকানন্দ আসিয়া ভারতকে পাশ্চাত্যের মোহ হইতে রক্ষা করিয়া অতীত গৌরবের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি উদাত্ত স্বরে ঘোষণা করেন—ধর্ম্মই ভারতের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড স্বরূপ, ধর্ম্ম মানুষকে অমর করে, ইন্দ্রিয় সুখ মানবের চরম সুখ নহে, জ্ঞানই মানবজীবনের চরম কাম্য।

উপসংহারে সভাপতি আধুনিক যুগের এই দুই মহাপুরুষের জীবনের অনেক ঘটনার উল্লেখ করিয়া এবং তাঁহাদের উপদেশাবলী বিশ্লেষণ করিয়া বক্তৃতা করিলে সভা ভঙ্গ হয়।

১৪ই মার্চ্চ সন্ধ্যায় রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ জন্ম বার্ষিকী সভায় সভাপতি প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ সিংহ নিম্নলিখিত মন্তব্য করেন:—

“পণ্ডিতগণ শুধু পুস্তক পাঠ করিয়া এবং যুক্তিতর্কের মধ্য দিয়া যে বেদান্ত শিক্ষা করিয়াছেন, তাহা শুধু অপ্রয়োজনীয় নহে, তাহা সমাজের পক্ষেও ক্ষতিকর। তাহাতে মানবগণের জীবন সম্পর্কে উদাসীনতা বৃদ্ধি পায়।”

পরে তিনি বলেন, “এই দুই মহাপুরুষের শিক্ষা এবং আদর্শ অনুসরণ করিলে আমাদের মধ্যে রাজনৈতিক অধিকার প্রভৃতি সম্পর্কে যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইতেছে, তাহার হাত হইতে আমরা মুক্তি পাইতে পারিব। স্বামী বিবেকানন্দ আমাদিগকে বাস্তব ধর্ম্মের শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। বেদান্ত ভারতবাসীকে জগতের সম্মুখে মানুষ বলিয়া পরিচয় দিবার শিক্ষা দিয়াছে। ভারতবাসী কাহারও অপেক্ষা ছোট নহে।”

বর্ত্তমানে ধর্ম্ম যে অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে,

বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। হিন্দু এবং মুসলমান ধর্ম্ম মূলতঃ একই লক্ষ্যের নির্দ্দেশ করিতেছে। তথাপি মন্ত্রিগণকে মহরমের সময় কি দুশ্চিন্তার মধ্যে সময় কাটাইতে হয়, তাহা সকলেই জানেন। ঈদের সময়েও কত রকম ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি হয়। কিন্তু ভারতের এই সকল সমস্যার সমাধান শ্রীরামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দের শিক্ষা ও উপদেশ অনুসরণ করিয়া চলিলে অতি সহজেই হইতে পারে।

উপসংহারে তিনি বলেন যে, নিজের দেশবাসীর সেবা করাই সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, গয়া—স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের উদ্যোগে গত ৪ঠা, ৫ই, ৬ই ও ১৩ই মার্চ্চ গয়াধামে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ জন্মোৎসব প্রতিপালিত হইয়াছে। ৪ঠা জন্ম-তিথি দিবসে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, ভোগরাগ ও ভজনাদির অনুষ্ঠান এবং ৫ই তারিখে নাম সঙ্কীর্ত্তনাদি হইয়াছিল। ৬ই তারিখে বিহার ব্যবস্থাপক সভার ডেপুটী প্রেসিডেণ্ট প্রোফেসর আবদুলবারি, এম্-এ, এম্-এল-এ মহাশয়ের সভাপতিত্বে স্থানীয় টাউন হলে এক বিরাট জন-সভার অধিবেশন হয়। জনাকীর্ণ সভাগৃহের মঞ্চোপরি শ্রীশ্রীঠাকুর স্বামীজীর দুইখানি বৃহৎ প্রতিকৃতি পুষ্পমাল্যে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। পাটনা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী মেধেশ্বরানন্দ প্রাঞ্জল হিন্দী ভাষায় ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও যুগাচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা প্রদান করেন। অন্যান্য বক্তাদের ভাষণও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। সভাপতি মহাশয় ওজস্বিনী ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শ জীবন ও উপদেশ অনুযায়ী চলিয়া জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় যত্নবান হইবার জন্য শ্রোতৃ-মণ্ডলীকে আবেদন করেন। সভার বৈশিষ্ট্য এই যে, বহুসংখ্যক মুসলমান ভ্রাতা সভায় যোগদান করায় ধর্ম্মসমন্বয়ের ভাব পরিস্ফুট হইয়াছিল।

১৩ই মার্চ্চ তারিখে প্রায় আট শত দরিদ্র-নারায়ণকে প্রসাদে পরিতৃপ্ত করা হয়।

এই আশ্রমের তত্ত্বাবধানে একটি হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়, দুইটি নৈশ বিদ্যালয় ও একটি ক্ষুদ্র পাঠাগার চলিতেছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্য পূজা, প্রতি শনিবার শ্রীরামনাম সংকীর্ত্তন ও প্রতি রবিবার সর্ব্বসাধারণের জন্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে ক্লাস হইয়া থাকে।

রামকৃষ্ণ মিশন, বরিশাল—বরিশালে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ত্র্যধিকশততম জন্মোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ৪ঠা মার্চ্চ শুক্রবার তিথি পূজা ও হোম হয় এবং সন্ধ্যায় আরাত্রিকের পর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও সাধন সম্বন্ধে স্বামী জগদীশ্বরানন্দ ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ যোগে বক্তৃতা দেন। ১৩ই মার্চ্চ রবিবার সমগ্র দিবস মহোৎসব হয় এবং প্রায় তিন সহস্র নরনারী ও দরিদ্রনারায়ণ প্রসাদ গ্রহণ করেন। এই দিবস সন্ধ্যায় আশ্রম প্রাঙ্গণে বিরাট জনসভায় নিউদিল্লীর স্বামী শর্ব্বানন্দ "শ্রীরামকৃষ্ণ ও যুগসমস্যা" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। অষ্টম বর্ষীয়া বালিকা কুমারী সুজাতা রায় 'শ্রীরামকৃষ্ণ' নামক একটি সুন্দর কবিতা আবৃত্তি করিয়া সভাস্থ শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। পরদিবস আশ্রম প্রাঙ্গণে একটি মহিলা সভায় স্বামী শর্ব্বানন্দ আর একটি বক্তৃতা দেন।

স্বামী শর্ব্বানন্দ স্থানীয় ব্রজমোহন কলেজে বর্ত্তমান জীবনে নীতির আবশ্যকতা সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা, ধর্ম্মরক্ষিণী সভায় উপাসনাতত্ত্ব ও সাধনতত্ত্ব সম্বন্ধে ২টি বক্তৃতা, (অশ্বিনীকুমার) টাউন হলে হিন্দু সমাজের সমস্যা ও তাহার প্রতিকার বিষয়ে একটি বক্তৃতা দেন এবং জগদীশ আশ্রমে গীতা ও ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি সমবেত নরনারীগণকে রামকৃষ্ণ আশ্রমে উপদেশ প্রদান এবং ভক্তদিগের সহিত ধর্ম্ম-প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন। স্বামী জগদীশ্বরানন্দ সহরের বিভিন্ন স্থানে তিনটি ম্যাজিক্ ল্যাণ্টার্ণ বক্তৃতা দিয়াছিলেন। জনসাধারণের নিকট এই বক্তৃতাগুলি অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘ, বসিরহাট—শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সঙ্ঘের উদ্যোগে বসিরহাটে শ্রীরামকৃষ্ণোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। শনিবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ পূজা ভোগরাগাদি হয়, সন্ধ্যায় কলিকাতাস্থ ভারত-সঙ্গীত বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণ শ্রীরামনাম কীর্ত্তন করেন।

রবিবার সমস্ত দিন ব্যাপী উৎসব হয়। প্রাতঃকাল হইতে কীর্ত্তন, পূজা, হোম, আরাত্রিক ও প্রসাদ বিতরণ চলিতে থাকে। সন্নিকটস্থ ও দূরস্থ গ্রাম সকল হইতে দলে দলে ভক্তগণ মধ্য রাত্রি পর্য্যন্ত উৎসবে যোগদান করেন। ভারত-সঙ্গীত বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণ সমস্ত দিন ধরিয়া মধ্যে মধ্যে সুমধুর কীর্ত্তন-সঙ্গীতে সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন। বৈকালে স্বনামধন্য ব্যারিষ্টার মিঃ বি, সি, চ্যাটার্জ্জী মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি বিরাট জনসভা হয়। সভায় ধনী, দরিদ্র, বৃদ্ধ, যুবা, মহিলা, পুরুষ বহু জনসমাগম হয়। বেলুড় মঠের স্বামী সুন্দরানন্দ, স্বামী সিদ্ধাত্মানন্দ, প্রসিদ্ধ বক্তা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীমতী উমাশশী দেবী প্রভৃতি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও বাণী বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

সন্ধ্যার পর বিবেকানন্দ-সোসাইটির সহকারী সম্পাদক শ্রীযুত তারকনাথ রায় মহাশয় ছায়াচিত্র সহযোগে "শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ" বিষয়ে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের কয়েকজন সন্ন্যাসী ও কলিকাতাস্থ বহু সম্ভ্রান্ত মহিলা ও ভদ্রমহোদয় উৎসবে যোগদান করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, শিলচর—গত ১৫, ১৬ এবং ১৭ই এপ্রিল শিলচর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্ম মহোৎসব সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ১৫ই শুক্রবার গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুলের হলে ডাঃ প্রফুল্লরঞ্জন গুপ্ত এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন মহাশয়ের পৌরোহিত্যে একটি সভা হইয়াছিল। গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র শ্রীকৃষ্ণকুমার নাথ একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ছাত্রদের প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় এই প্রবন্ধটিই প্রথম হইয়াছিল।

পরে ব্রহ্মচারী বিরজাচৈতন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে কিছু বলেন। তৎপর নারায়ণগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী সম্পূর্ণানন্দ ওজস্বিনী ভাষায় একটি সুদীর্ঘ সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং যুবক ছিলেন। তিনি যুবকগণকে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে জীবন গঠন করিতে উৎসাহিত করেন এবং বেদান্ত জীবনে সাধন করিলে জগৎ সমস্যার সমাধান করিয়া শান্তি আনিতে যুবকগণকে উদ্বুদ্ধ করেন।

১৭ই এপ্রিল স্থানীয় মহিলাগণ শ্রীযুক্তা কুঞ্জকুমারী দত্তের সভানেত্রীত্বে এবং মালতি শ্যাম মহাশয়ার উৎসাহে একটি সভা আহ্বান করেন। কুমারী চামেলীকুসুম দাস "শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের গার্হস্থ্য জীবন ও সন্ন্যাস জীবনের সমন্বয়" সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। কুমারী সাগরিকা শ্যাম "রামকৃষ্ণপরমহংসদেব" কবিতা আবৃত্তি করেন। মেয়েদের প্রতিযোগিতায় নবকিশোর বালিকা-বিদ্যালয়ের ছাত্রী রতি খাতুন প্রথম পুরস্কার এবং প্রীতিকণা বানার্জ্জি দ্বিতীয় পুরস্কার পান। এই উপলক্ষে স্বামী সম্পূর্ণানন্দের বক্তৃতা খুবই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, আরারিয়া—গত ৩ই মার্চ্চ আরারিয়া (পূর্ণিয়া) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব নির্ব্বিঘ্নে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এতদুপলক্ষে ৪ঠা মার্চ্চ ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী ও স্বামী বিবেকানন্দের ষোড়শোপচারে পূজা, ভোগ ও হোমাদি ক্রিয়া সুসম্পন্ন হয়। পরে ৬ই মার্চ্চ শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব হয়।

ভোর ৫টা হইতে রাত্র ৯টা পর্য্যন্ত আনন্দোৎসব চলিয়াছিল। ভোরে মঙ্গলারতি ও ঊষাকীর্ত্তন হয়। তৎপরে দুইটি বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী কীর্ত্তন-পার্টী সহ "যে রাম যে কৃষ্ণ, সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ" এইটি দেখাইবার জন্য হস্তিপৃষ্ঠে ঠাকুরের প্রতিকৃতির উভয় পার্শ্বে রাম ও কৃষ্ণের প্রতিকৃতি সাজাইয়া শোভাযাত্রা বাহির করা হয়। শোভাযাত্রায় স্থানীয় এস্-ডি-ও প্রমুখ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। অনন্তর দরিদ্রনারায়ণ সেবার পর অভ্যাগত ব্যক্তিগণ প্রসাদ গ্রহণ করেন।

স্বামী বাসুদেবানন্দের সভাপতিত্বে আশ্রমের বার্ষিক সভার অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে প্রায় তিন শতাধিক লোক উপস্থিত ছিলেন। ইহাতে রিপোর্ট পাঠ হওয়ার পর প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতাদি হয়।

ভ্রমসংশোধন—এই সংখ্যার ২৪৬ পৃষ্ঠায় "মধ্য-ইউরোপে বেদান্ত" শীর্ষক প্রবন্ধের লেখকের নাম স্বামী জ্যোতিশ্বরানন্দ স্থলে স্বামী যতীশ্বরানন্দ হইবে।

বেলুড়মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির

বেলুড়মঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সুরম্য মন্দিরটীর উদ্বোধন কার্য্য গত জানুয়ারী মাসে সম্পন্ন হইয়াছে, এবং অন্যূন পঞ্চাশ সহস্র নরনারী ঐ উৎসবে সম্মিলিত হইয়াছিলেন, এ সংবাদ জনসাধারণ অবগত আছেন। আগামী দুই মাসের মধ্যেই সমগ্র মন্দিরটীর নির্ম্মাণ-কার্য্য সমাপ্ত হইবে। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রচারিত "যত মত তত পথ" রূপ মহান্ আদর্শের প্রতি দুইটী মার্কিন মহিলার শ্রদ্ধা-ভক্তির জলন্ত নিদর্শন স্বরূপ ঐ মন্দির দীর্ঘকাল জগতে বিরাজমান থাকিবে। স্বামী বিবেকানন্দের একটী চিরপোষিত স্বপ্ন এতদিনে সফল হইল।

সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্যে মন্দিরটী শুধু বঙ্গদেশের নহে, সমগ্র উত্তর ভারতের স্থাপত্যশিল্পের এক অতুলনীয় সম্পদ বলিয়া পরিগণিত হইবে। গত দুইমাসে বহু পাশ্চাত্য ও এতদ্দেশীয় মনীষী শতমুখে ইহার প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। ইহার সম্পূর্ণ গর্ভ মন্দিরটী এবং নাট মন্দিরটীর অনেকাংশ প্রস্তর-মণ্ডিত হওয়ায় আশা করা যায় যে ইহা বহুশত বর্ষ স্থায়ী হইবে। প্রধানতঃ এই স্থায়িত্বের উদ্দেশ্যেই মন্দিরটী পূর্ব্বসঙ্কল্পানুযায়ী ইটের না করিয়া আংশিকভাবে পাথরের করা হইয়াছে। ইহার ফলে কিন্তু মন্দিরনির্ম্মাণের ব্যয় প্রায় দেড়গুণ হইয়া গিয়াছে। ঐ অতিরিক্ত ব্যয় নির্ব্বাহার্থ আমরা সহৃদয় ভক্তসাধারণের নিকট আবেদন করিয়াছিলাম। কিন্তু এ পর্য্যন্ত অতি সামান্য অর্থই আমরা ঐ জন্য প্রাপ্ত হইয়াছি। মন্দিরের জন্য ইতিমধ্যে যে দেনা হইয়াছে তাহা পরিশোধ করিতে এবং অবশিষ্ট অত্যাবশ্যক কাজগুলি শেষ করিতে আমাদের আরও এক লক্ষ টাকার আশু প্রয়োজন। এই অবস্থায় আমরা চিন্তাশীল মহানুভব দেশবাসি-গণের নিকট পুনরায় সাহায্য ভিক্ষা করিতেছি। আমরা সবিনয়ে একটী বিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। উহা এই যে, আজ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রভাব সমগ্র সভ্যজগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আমাদের বিশ্বাস তাঁহার এই স্মৃতি-মন্দির জগতের ধর্ম্মদ্বন্দ্ব দূর করিবার পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করিবে। এদেশে উদারচেতা দানশীল ধনীর অভাব নাই। তাঁহারা যদি পূর্ব্বোক্ত কথাটী মনে রাখেন তাহা হইলে আমাদের প্রার্থিত লক্ষমুদ্রা অনায়াসে সংগৃহীত হইতে পারে। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ও স্বামী বিবেকানন্দের সহস্র সহস্র অনুরাগী ভক্তগণের ন্যায়, তাঁহাদের নিকটও আমরা বিশেষ ভাবে আবেদন করিতেছি। কেহ যেন সমালোচনাচ্ছলে একথা বলিবার সুযোগ না পান যে ভারতবর্ষ তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আধুনিক যুগাচার্য্যকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে জানে না।

স্বামী বিরজানন্দ

সম্পাদক, রামকৃষ্ণমঠ,

পোষ্ট, বেলুড়মঠ, জেলা হাওড়া।

৩০।৪।৩৮

শ্রীমৎ স্বামী শুদ্ধানন্দ মহারাজ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নবনির্ব্বাচিত অধ্যক্ষ

ধর্ম্মে সাম্রাজ্যবাদ

সম্পাদক

বর্ত্তমানকালে রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র যেমন সাম্রাজ্যবাদের তাণ্ডব নৃত্য দেখা যাইতেছে, স্মরণাতীত কাল হইতে মানুষের ধর্ম্মরাজ্যেও বিশ্বময় তেমন সাম্রাজ্যবাদের প্রাধান্য চলিয়াছে। জগদ্ব্যাপী একচ্ছত্র সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া সকল দেশের রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতিকে আপন আপন জাতিগত স্বার্থসাধনে নিয়োজিত করা সাম্রাজ্যবাদী জাতিসমূহের লক্ষ্য, আর পৃথিবীর সকল ধর্ম্মের ভস্মরাশির উপর আপন আপন ধর্ম্মের বিরাট সৌধ নির্ম্মাণ করাই ধর্ম্ম-জগতের হিট্‌লার মুসোলিনীদের উদ্দেশ্য। এই উভয়বিধ সাম্রাজ্যবাদ মানবজাতির যত অনিষ্ট করিয়াছে, পৃথিবীর সকল আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গম ভূমিকম্প জলপ্লাবন ও মহামারী সম্মিলিতভাবেও আজ পর্য্যন্ত মানুষের তত অনিষ্ট করিতে পারে নাই। রাষ্ট্রনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের ফলে জগতে মানুষের উপর মানুষের যে উৎপীড়ন হইয়াছে, ধর্ম্মের সাম্রাজ্যবাদের কৃপায় মানুষের উপর মানুষের নিপীড়ন তদপেক্ষা কম হয় নাই। মানুষের এই স্বেচ্ছাচার স্বাধীন চিন্তার কণ্ঠরোধ করিয়া মানব-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ উপাদান ধর্ম্মকে কলঙ্কিত করিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে আহূত বিশ্বধর্ম্ম-মহাসম্মেলনের অন্যতম সভাপতিরূপে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন, "কোনও ধর্ম্ম যখন মানবজাতির উপর তাহার শিক্ষা চাপাইয়া দিবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, তখন আর উহা ধর্ম্ম থাকে না, তখন উহা হইয়া পড়ে স্বৈরাচার—ইহাও এক প্রকার সাম্রাজ্যবাদ। এইজন্য দেখিতে পাই, পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে ধর্ম্মজগতে চলিয়াছে ফ্যাসিজমের তাণ্ডব-নৃত্য—অনুভূতিহীন পদভারে উহা মানবাত্মাকে দলিত মথিত করিতেছে!"

ইতিহাস প্রমাণ দেয় যে, ইস্‌লামধর্ম্মের একচ্ছত্র সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য দুর্দ্ধর্ষ তাতার জাতি খৃষ্টানদের মহাতীর্থ জেরুজালেম্‌ বেথেলহাম্‌ প্রভৃতি

দখল করিয়া তাহাদের তীর্থযাত্রা বন্ধ করিয়াছিল। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ সমগ্র ইউরোপের খৃষ্টানেরা ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া বহু বৎসর পর্য্যন্ত মুসলমানদের বিরুদ্ধে 'ধর্ম্মযুদ্ধ' (!) চালাইয়াছিল। মুসলমানেরা খৃষ্টানদের সহর-পল্লী নররক্তে রঞ্জিত করাই ধর্ম্ম মনে করিত, আবার খৃষ্টানেরা মুসলমানদের জনপদ লুণ্ঠন করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিত! তাতারগণ আটলান্টিক মহাসাগরের তীর হইতে প্রশান্ত মহাসাগরের তীর পর্য্যন্ত পাঁচশত বৎসর যাবৎ রক্তের বন্যা প্রবাহিত করিয়াছিল। সমগ্র উত্তর ভারতের মন্দির মঠ বিহার সংঘারাম প্রভৃতি তাহাদের অত্যাচারে নিশ্চিহ্ন হইয়াছিল। তাহাদের উৎপীড়নেই জোরোয়াষ্টারের অনুগামী পারসীকগণ পশ্চিমভারতে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। খৃষ্টান ও মুসলমান উভয়েই ইহুদীদিগকে "ঈশ্বরের শত্রু" মনে করিয়া শত শত বৎসর তাহাদের উপর যে অবর্ণনীয় অত্যাচার করিয়াছে, ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। রোমকদের আক্রমণে ইহুদীদের পবিত্র মন্দিরসমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ইহুদীরাও সুবিধা পাইলেই খৃষ্টান ও মুসলমানদের উপর অকথ্য উৎপীড়ন করিত। ধর্ম্মগুরু পোপের অধীনস্থ বহু ক্যাথলিক্ সম্প্রদায়ের সঙ্গে প্রটেস্‌ট্যান্ট প্রমুখ সম্প্রদায়সমূহের বিরোধের ফলে ইউরোপে যে পরিমাণ নর-রক্তপাত হইয়াছে, পৃথিবীর সকল যুদ্ধে আজ পর্য্যন্তও তত রক্তপাত হয় নাই। ডাইনী সন্দেহে বহু খৃষ্টান মহিলাকে জীবন্ত দগ্ধ করা হইয়াছে। খৃষ্টীয় যোড়শ শতাব্দীতে ফরাসীর "ধর্ম্মযুদ্ধ", জার্ম্মানীর বিখ্যাত "ত্রিশ বৎসরের যুদ্ধ" (Thirty Years' War), "স্পেনের পাষণ্ড দলনার্থ স্থাপিত বিচারালয়" (Spanish Inquisition) প্রভৃতি ধর্ম্মের কলঙ্ক। একমাত্র স্পেনের এই বিচারালয়েই লক্ষাধিক লোক দণ্ডিত হইয়াছিল। মধ্যযুগে ইউরোপে প্রচলিত খৃষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে সমালোচনা করা ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক ছিল। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পোপ তৃতীয় আলেক্‌জেণ্ডারের আদেশমত ইউরোপের গোঁড়া খৃষ্টানরাজগণ প্রচলিত ধর্ম্মের সন্দেহবাদিগণকে সন্ধান করিয়া শাস্তি দিতেন। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে খৃষ্টধর্ম্মের "অবিশ্বাসি"-গণকে শাস্তি দেওয়ার ভার ডমিনিকান্ সম্প্রদায়ের সাধুদের উপর অর্পণ করা হয়। ইহাতে মানুষের উপর যে অত্যাচার হইয়াছে তাহা অবর্ণনীয়। এইরূপ অসংখ্য ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া দেখান যাইতে পারে যে, ধর্ম্মের সাম্রাজ্যবাদিগণ এক একটী ধর্ম্মমতকে সারাবিশ্বের সকল মানবের একমাত্র ধর্ম্মরূপে প্রচার করিতে যাইয়া পৃথিবীতে বারংবার মহাউপদ্রব সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা সুদীর্ঘকাল এই সুন্দর পৃথিবীকে নর-শোণিতে পঙ্কিল করিয়াও তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধন করিতে সক্ষম হন নাই।

যাঁহারা শান্তিপূর্ণভাবে কোন একটী ধর্ম্মকে একমাত্র 'বিশ্বধর্ম্মে' (World religion) পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের চেষ্টাও সাফল্য-মণ্ডিত হয় নাই। বৌদ্ধধর্ম্মকে সমগ্র বিশ্ববাসীর একমাত্র ধর্ম্মরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে অশোক কণিষ্ক ধর্ম্মপাল প্রভৃতি বৌদ্ধরাজগণের বিরাট উদ্যম সফল হয় নাই। মধ্যযুগে ইউরোপের প্রভাবশালী রাজন্যবৃন্দের সহায়তায় পৃথিবীর সকল মানুষকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া একটী বিশ্বগির্জ্জা (World Church) গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা হইয়াছিল কিন্তু ক্রমবর্দ্ধমান যুক্তিবাদের চাপে ইহা বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। অধুনা খৃষ্টধর্ম্ম সাম্রাজ্যবাদের বাহনে পরিণত! পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু তাঁহার আত্মজীবনীতে ইংলণ্ডের-গির্জ্জাকে (Church of England) ইংরাজ জাতির রাষ্ট্রীয় রাজনীতিক বিভাগ (State Political Department) বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন!

তাহার মতে সরকারী সাহায্যপুষ্ট খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকগণ সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক।* মুসলমানদের "বিশ্ব-ইসলাম" (Pan-Islam) মতবাদ গাজী মুস্তাফা কামালপাশার কৃপায় তুরস্কের শেষ খলিফা আবদুল মজিদের সিংহাসনচ্যুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হইয়াছে বলিলেই চলে। এই সকল বিষয় আলোচনায় স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, পৃথিবীর সকল ধর্ম্মকে উচ্ছেদ করিয়া কোন একটী ধর্ম্মের পক্ষে সার্ব্বভৌম প্রতিষ্ঠালাভ অতীত যুগে সম্ভব হয় নাই। পক্ষান্তরে প্রায় সকল প্রাচীন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ই ধর্ম্মের সাম্রাজ্যবাদীদের অত্যাচার প্রতিরোধ করিয়া আজও বাঁচিয়া আছে। বর্ত্তমানে পৃথিবীর সর্ব্বত্র ক্রমেই অধিকসংখ্যক নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের আবির্ভাব দেখা যাইতেছে। প্রাচীন নবীন সকল সম্প্রদায়ই স্ব স্ব স্বাধিকার ও স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণে এ যুগে সম্পূর্ণ সচেতন। সুতরাং ধর্ম্মের সাম্রাজ্যবাদিগণ যত চেষ্টাই করুন না কেন, বর্ত্তমানকালেও জগতে কোন ধর্ম্ম-সম্প্রদায় বিশেষের একচ্ছত্র প্রাধান্য স্থাপনের কোন সম্ভাবনা আছে বলিয়া বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ মনে করেন না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে তথাপি প্রায় প্রত্যেক ধর্ম্মকে সমগ্র বিশ্ববাসীর একমাত্র ধর্ম্মরূপে পরিণত করিবার চেষ্টার আজও বিরাম নাই। জগতের সকল মানুষকে আপনভাবে ভাবিত করিয়া তুলিবার একটা অদম্য আকাঙ্ক্ষা মানুষের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষ আপনার মত অপরের উপর চাপাইবার চেষ্টা করে। কিন্তু এই অনন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ জগতে এরূপ চেষ্টার সাফল্যলাভের কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টান মুসলমান প্রভৃতি সম্প্রদায় স্ব স্ব প্রাধান্য স্থাপনের জন্য একে অন্যের ধর্ম্মমতকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করিতে এখনও সদা-সচেষ্ট। আবার এই সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় সংখ্যাতীত সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া আপন আপন মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে বদ্ধপরিকর। প্রায় প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়েই এই শ্রেণীর লোক আছেন। ধর্ম্মজীবন যাপন অপেক্ষা ধর্ম্মসম্প্রদায় বিশেষের একাধিপত্য স্থাপনই ইঁহাদের কাম্য। ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের শক্তিশালী ব্যক্তিগণ ধর্ম্মকে ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করিয়া রাষ্ট্রনীতিক অর্থনীতিক সমাজনীতিক, সংঘগত—এমন কি ব্যক্তিগত স্বার্থসাধন উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করিয়াই ধর্ম্মে সাম্রাজ্যবাদ আনয়ন করিয়াছেন। ধর্ম্মমাত্রেরই উদ্দেশ্য মানুষের পশুপ্রবৃত্তি নষ্ট করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত দেবত্বকে ফোটাইয়া তোলা, মানুষে মানুষে অসাম্য অনৈক্য বিরোধ নষ্ট করিয়া সাম্য মৈত্রী প্রেমের ডোরে সকলকে আবদ্ধ করা। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ধর্ম্মের তথাকথিত রক্ষকগণের মধ্যে অধিকাংশই এই মহান্ আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ধর্ম্মকে মানুষের উপর মানুষের অত্যাচারের প্রধান অস্ত্ররূপে পরিণত করিয়াছেন। জগতের ধর্ম্মমাত্রই চূড়ান্ত সাম্য সমত্ব একত্ব ও অভেদত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত; সর্ব্বভূতে সমদর্শন জীবেপ্রেম করুণা ত্যাগ দয়া দান পরোপকার ইন্দ্রিয়সংযম ন্যায়নীতি ইহার ভিত্তি, কিন্তু ইহারই নামে মানুষের দুর্ব্বুদ্ধি অসাম্য ভেদ বৈষম্য অবিচার উৎপীড়নের প্রশ্রয় দিতেছে। প্রেমাবতার খৃষ্ট বলিয়াছেন, "তোমার প্রতিবেশীকে আপনার মত দেখ।" আর ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহারই উপাসক লণ্ডনের প্রধান ধর্ম্মযাজক মহাশয় আমেরিকার দক্ষিণ উপনিবেশসমূহে (The Southern Colonies of America) প্রচলিত দাসত্ব-প্রথা সমর্থন করিয়া লিখিয়াছিলেন, "খৃষ্টধর্ম্ম পাপ ও শয়তানের হস্ত হইতে মানুষকে নিষ্কৃতি দান করে, অসৎকামনা ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও অস্বাভাবিক বাসনার অধীনতা হইতে মানুষকে মুক্ত করে;

* "Jawaharlal Nehru—an autobiography. Page 375.

কিন্তু খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণ বা খৃষ্টান হওয়ার জন্য তাহাদের পূর্ব্বতন বাহ্যিক অবস্থা—উহা স্বাধীনতাই হউক বা দাসত্বই হউক—কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হয় না।'* কথিত আছে, রাশিয়ার জার্ জন্ দি টেরিবেল্ নিয়মিতভাবে গির্জ্জায় যাইয়া নতজানু হইয়া প্রার্থনা করিতেন এবং অধিকাংশ সময় ধর্ম্মালোচনায় কাটাইতেন, আবার তিনিই অন্ধকারময় কারাকক্ষে যাইয়া কয়েদীদের উপর উৎপীড়ন দেখিতে ভালবাসিতেন। ধর্ম্মের মধ্যে এই প্রকারে অধর্ম্ম প্রবেশ করিয়া ধর্ম্মকে কলঙ্ক-মলিন করিয়াছে।

হিন্দুধর্ম্মেও দেখা যায়, এক শ্রেণীর ধর্ম্মের নায়কগণ ধর্ম্ম ও বিগ্রহলাভেচ্ছারূপ গুরুতর অপরাধের জন্য শূদ্র ও অন্ত্যজ জাতিকে "শরীরভেদ" "জিহ্বাচ্ছেদ" প্রভৃতি দণ্ডদণ্ড প্রদান করিয়াছেন। আজও তাঁহাদের বংশধরগণ ঈশ্বরের নামে, আত্মিক উন্নতির নামে, পারলৌকিক কল্যাণের নামে অজ্ঞ জনসাধারণকে অগণন বিধি-নিষেধের ক্রীতদাসে পরিণত করিয়া আপনাদের কায়েমী স্বার্থ চরিতার্থ করিতেছেন। হিন্দুদের মধ্যে কোন বিশেষ কুলে জন্মগ্রহণ করার জন্য মানুষের উপর কি অমানুষিক অত্যাচারই না হইয়াছে ও হইতেছে! জন্মান্তরবাদের বিকৃত ব্যাখ্যামূলে সংখ্যাতীত নরনারীকে অচল অনাচরণীয় অস্পৃশ্য নামে অভিহিত করিয়া তাহাদের সর্ব্ববিধ উন্নতির দ্বার চিরতরে রুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। সত্য বটে, অনেক অস্পৃশ্য ধর্ম্মাচার্য্য আজও অনেক মন্দিরে ব্রাহ্মণদের উপাস্য দেবতার সঙ্গে একাসনে পূজিত হইতেছেন, কিন্তু সে কেবল তাঁহাদের অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবে, হিন্দুসমাজ তাঁহাদিগকে উৎপীড়নই করিয়াছে—সাহায্য করে নাই। হিন্দুদের মধ্যে শত শত নিপীড়িত জাতির পক্ষে জীবিকার্জ্জনের জন্য আজও সম্মানজনক বৃত্তি অবলম্বন করিবার উপায় নাই। আজও শতভাবে তাহারা মানবসুলভ অধিকার হইতে বঞ্চিত। তাহাদের উঠিবার কোন উপায় নাই—পালাইবার কোন পথ নাই। ধর্ম্মের নায়কগণ ধর্ম্মবেদীর উপরে বসিয়া বলেন, "পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ", "শিব এব সদা জীবো জীব এব সদা শিবঃ", "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু", কিন্তু বেদী হইতে নামিয়াই বলেন, "তুই জন্মেছিস হীনকুলে, তোকে থাকতে হবে এ জন্মের মত হীন হয়ে।" আশ্চর্য্য যে, দেশশুদ্ধ লোক শত শত শতাব্দী যাবৎ মন্ত্রমুগ্ধবৎ এই উপদেশ শুনিয়া আজও তাঁহাদের স্বার্থে ইন্ধন যোগাইতেছে। বর্ত্তমানকালেও হিন্দুসমাজে এই শ্রেণীর ধর্ম্মব্যবসায়ীদের যথেষ্ট প্রভাব আছে। ইঁহারা মূর্খ ক্ষত্রিয় রাজার সহায়তা পাইলে ঠিক সাম্রাজ্যবাদীদের মতই এ যুগেও ধর্ম্মের নামে মানুষের উপর যে অত্যাচার চালাইতেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কেবল হিন্দুদের মধ্যে নয়—মুসলমানদের মধ্যেও এই প্রকার ধর্ম্মনায়কের অভাব নাই। সর্ব্ববিধ সংস্কারবিরোধী এই শ্রেণীর নেতৃবৃন্দ ধর্ম্মের নামে অজ্ঞ জনসাধারণকে উত্তেজিত করিয়া বিরোধ সৃষ্টি করিতে সিদ্ধহস্ত। ভারতের হিন্দু-মুসলমান-বিরোধ এই শ্রেণীর নেতাদেরই কুকীর্ত্তি! এই দৃশ্য দেখিয়া পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু তাঁহার আত্ম-জীবনীতে লিখিয়াছেন, "হিন্দু-মুসলমান শিখ প্রত্যেকেই স্ব স্ব ধর্ম্ম-বিশ্বাসের গর্ব্ব করিয়া থাকে এবং পরস্পরের মাথা ফাটাইয়া তাহা প্রমাণ করে। ধর্ম্ম বলিতে যাহা দেখা যায়—অন্ততঃ প্রণালীবদ্ধ ধর্ম্ম আমরা ভারতে ও অন্যান্য দেশে যাহা দেখি, তাহা আমার নিকট বিভীষিকাপদ। আমি প্রায়ই তাহার নিন্দা করি, এবং উহা সমূলে উৎখাত করিতে ইচ্ছা হয়। সর্ব্বত্রই ইহা অন্ধবিশ্বাস ও প্রতিক্রিয়াশীল যুক্তিহীন মতবাদ ও গোঁড়ামি কুসংস্কার শোষণ ও কায়েমী

* "Moral Man and Immoral Society" by Reinhold Niebuhr's. Page 78.

স্বার্থরক্ষার প্রশ্রয় দিয়া থাকে।"* স্বামী বিবেকানন্দও পঞ্চমুখে ধর্ম্মের নামে এই গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতার নিন্দা করিয়াছেন। তাঁহার পুস্তকাবলী ও বক্তৃতাসমূহ ধর্ম্মের নামে শোষণ অত্যাচার ও স্বার্থসংরক্ষণের বিরুদ্ধবর্ণনায় পরিপূর্ণ। চিকাগো ধর্ম্মমহাসভার প্রথম দিনের অধিবেশনে সকল ধর্ম্মের প্রতিনিধিগণের সমক্ষে তিনি উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন, "সাম্প্রদায়িকতা, সঙ্কীর্ণতা ও উহাদের ফলস্বরূপ ধর্ম্মোন্মত্ততা এই সুন্দর পৃথিবীকে বহুকাল ধরিয়া আবত্তাধীন করিয়া রাখিয়াছে। এই ভীষণ পিশাচ যদি না থাকিত তাহা হইলে মানবসমাজ আজ পূর্ব্বাপেক্ষা কতদূর উন্নত হইত। কিন্তু, ইহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়াছে, এবং আমি সর্ব্বতোভাবে ইহাই আশা করি যে, এই ধর্ম্মসভার সম্মানার্থ অদ্য যে ঘণ্টাধ্বনি চতুর্দ্দিকে ঘোষিত হইল, এই ঘণ্টানিনাদ সর্ব্ববিধ ধর্ম্মোন্মত্ততা, তরবারি অথবা কুতর্কাদির দ্বারা উদ্ঘাটিত বহুবিধ নির্য্যাতন পরম্পরার এবং একই চরমলক্ষ্যে অগ্রসর ব্যক্তিগণের মধ্যে সর্ব্ববিধ অসদ্ভাবের সমূলে নিধনসমাচার ঘোষণা করুক।"†

স্বামীজির এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বাণী সফল হইতে চলিয়াছে। যেমন রাষ্ট্রনীতিক ও অর্থনীতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বময় প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে, ঠিক তেমন ধর্ম্মরাজ্যে ধর্ম্মসম্প্রদায় বিশেষের একাধিপত্য স্থাপন, ধর্ম্মের নামে অত্যাচার অবিচার ও শোষণের বিরুদ্ধে ক্রমেই পৃথিবীর সর্ব্বত্র গণ-আন্দোলন বিস্তারলাভ করিতেছে। ধর্ম্মের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া স্বার্থ সাধনের জন্য হিংসা বিরোধ ও অনৈক্যের প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য একদিকে যেমন একদল লোক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করিয়াছেন, অপরদিকে ধর্ম্মকে ঐ সকল অনর্থ হইতে মুক্ত করিবার জন্য জগতের বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় যুগযুগান্তের বিরোধ ভুলিয়া ক্রমেই ঐক্যবদ্ধ হইতেছে। অনেকস্থলে দেখা যায়, মানুষ যাহাকে অকল্যাণকর বলিয়া মনে করে, তাহা হইতেও কল্যাণ বা শুভফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। সোভিয়েট রাশিয়ার নিরীশ্বরবাদের প্রভাবে তথাকার গোঁড়া খৃষ্টান ক্যাথলিক্ ব্যাপ্‌টিষ্ট ইহুদী ও মুসলমানগণ আশ্চর্য্যজনকভাবে একতাবদ্ধ হইয়া তাহাদের ধর্ম্মসম্প্রদায়সমূহকে অত্যাচার ঈর্ষা বিদ্বেষ পরধর্ম্ম অসহিষ্ণুতা প্রভৃতি হইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। জার্ম্মানীতে ক্যাথলিক্ প্রটেস্‌ট্যাণ্ট ও ইহুদীদের মধ্যে কলহ লাগিয়াই থাকিত, এ জন্য রাষ্ট্রনায়ক হিট্‌লার জাতীয় ঐক্যের পরিপন্থীজ্ঞানে এই তিনটী ধর্ম্মকেই "কোণঠাসা" করিতে চেষ্টা করেন, ইহার ফলে এই ধর্ম্মত্রয় এখন তথায় একতাবদ্ধ হইয়া ধর্ম্মের নামে অনৈক্য ও বিরোধ উৎপাদনের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য চালাইতেছে।* প্রাচীন আরবী ভাবাপন্ন ইস্‌লামপন্থীদের পরধর্ম্ম অসহিষ্ণুতা ও সর্ব্ববিধ সংস্কার বিমুখতা তুরস্কের জাতীয় জীবন-গঠনের পথে পর্ব্বতপ্রমাণ বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়াছিল। রাষ্ট্রনায়ক কামাল পাশা ইস্‌লামধর্ম্ম হইতে এই মহাঅনর্থরাশিকে নির্ব্বাসন করিয়া নব্য তুরস্ককে জগতের উন্নত জাতিসমূহের সমকক্ষ করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন। তুরস্কের মুসলমান ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে ঐক্য রক্ষার জন্য তথাকার প্রধান মন্ত্রীর অধীনে "ধর্ম্ম সংক্রান্ত কমিটি" (Committee on Religious Affairs) নামক একটী বিভাগ স্থাপন করা হইয়াছে। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ তুরস্কের ধর্ম্মসম্প্রদায়সমূহ এখন পারস্পরিক প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পরধর্ম্ম অসহিষ্ণুতা ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে আন্দোলন

* Jawaharlal Nehru—an autobiography Page 374

† চিকাগো বক্তৃতা, ৪ পৃষ্ঠা।

* "Faiths and Fellowship" by A. Douglas Millard, Pages 81- 82.

চালাইতেছে।* জাপানের বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে "বৌদ্ধ সম্প্রদায় সম্মেলন" (Alliance of Buddhists' Sects) নামক স্থায়ী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। জাপানের বৌদ্ধ শিন্তো ও খৃষ্টানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠাই তথাকার বিখ্যাত "নিপ্পন (জাপান) ধর্ম্ম আন্দোলনের" (Nippon Spirit Movement) উদ্দেশ্য। জাপ জাতিকে একতাবদ্ধ করিয়া সকল বিষয়ে "জাপানী করণ" এই আন্দোলনের অন্তর্নিহিত লক্ষ্য।† ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে লণ্ডন নগরীতে "ধর্ম্মমতসমূহের বিশ্ব-কংগ্রেসের" (World Congress of Faiths) অধিবেশন হইয়াছে। ইহাতে পৃথিবীর সকল ধর্ম্মের প্রতিনিধিগণ বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়কে সংঘবদ্ধ করিয়া বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে কলিকাতায় শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিক "বিশ্বধর্ম্ম মহাসম্মেলনে" পৃথিবীর সকল ধর্ম্মের প্রতিনিধিগণ জগতের ধর্ম্মবিরোধ চিরতরে দূর করিবার উপায় স্বরূপে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনালোকে আলোকিত সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়বাদের মহত্ত্ব বর্ণন করিয়াছেন। বর্ত্তমান ভারতের হিন্দুদের প্রতিনিধিমূলক "হিন্দু মহাসভা" হিন্দুধর্ম্মসম্প্রদায়-সমূহের মধ্যে একতা স্থাপন এবং ধর্ম্মের নামে এক শ্রেণীর উপর অপর শ্রেণীর সর্ব্ববিধ অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিশেষভাবে প্রচার কার্য্য চালাইতেছে। জগৎময় এই সকল আন্দোলন অদূর ভবিষ্যতে ধর্ম্মের সাম্রাজ্যবাদের অবসান সূচনা করিতেছে।

ধর্ম্মমাত্রই—বিশেষ করিয়া বেদান্ত চূড়ান্ত সাম্যবাদ বা সমানাধিকারবাদের সমর্থক। রাষ্ট্রনীতিক বা অর্থনীতিক সাম্যবাদ ইহার নিকট দাঁড়াইতেই পারে না। বেদান্ত বলেন, "যিনি (আপনা হইতে অভিন্ন) আত্মাতেই সমুদয় সৃষ্ট পদার্থকে দর্শন করেন এবং সকল পদার্থে আত্মস্বরূপ অনুভব করেন, তাহাতে অর্থাৎ এই অভিন্নভাবে দর্শনের ফলে তিনি কাহাকেও ঘৃণা করিতে পারেন না।"* কারণ, এ স্থলে অপরকে ঘৃণা করা বা অপরের অনিষ্ট সাধন করা আর আপনি আপনাকে ঘৃণা করা বা আপনি আপনার অনিষ্ট সাধন করা একই কথা। বেদান্ত কেবল মানুষ নয় অধিকন্তু সকল প্রাণীকে পর্য্যন্ত আত্মদৃষ্টিতে আপনা হইতে অভিন্ন বলিয়া জ্ঞান করিতে শিক্ষা দেয়। বেদান্ত বলেন, "অভেদ দর্শনং জ্ঞানং" সর্ব্বভূতে অভেদ দর্শনই জ্ঞান, ভেদ দর্শন অজ্ঞানজনিত। কেবল বেদান্ত নয়, এই সমদর্শনে মানুষকে স্থিত করাই সকল ধর্ম্মের সার্ব্বজনীন লক্ষ্য। বেদান্ত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এই তত্ত্ব প্রচার করে, অন্যান্য ধর্ম্ম পরোক্ষভাবে এই সত্যে সমর্থন করে। আধুনিক সাম্যবাদিগণ মানব-সমাজে অর্থনীতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করিতে চান কিন্তু ধর্ম্ম চায় মানুষের সকল বিভাগকে একত্ব ও অভেদত্বের আদর্শে নিয়ন্ত্রিত করিতে। ধর্ম্মমাত্রই মানুষে মানুষে একত্ব ও অভেদত্বের প্রচারক। ধর্ম্মের কায়েমী স্বার্থবাদিগণ মানুষের পারমার্থিক জীবন হইতে ব্যবহারিক জীবনকে পৃথক্ করিয়াই ধর্ম্মকে সাম্যভ্রষ্ট করিয়াছে। এমন কোন ধর্ম্ম নাই যাহা আত্মদৃষ্টিতে সকল মানুষকে অভেদ জ্ঞান করিতে শিক্ষা দেয় না। তথাপি ব্যবহার ক্ষেত্রে যে মানুষে মানুষে অসাম্য অনৈক্য ও বিরোধ দেখা যায়, এজন্য দায়ী তাঁহারা—যাঁহারা ধর্ম্মকে আপনাদের স্বার্থসাধনে প্রয়োগ করেন—যাঁহারা ধর্ম্ম লইয়া খেলা করেন। দেখা যায়, রাজনীতিক বা অর্থনীতিক সাম্যবাদের আবরণে

* "Factors in Turkey's Cultural Transformation" by Henry E. Allen. Page 214

† Present-Day Nippon. No. 11-1935. Pages 73—74.

* "যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥"
ঈশ'উঃ ৬।

নসাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণের নামেও এক শ্রেণীর লোক অসাম্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ।পন স্বার্থ চরিতার্থ করেন। এজন্য যেমন াম্যবাদ বা জনসাধারণের স্বার্থ দায়ী নয়, তেমন ম্মের নামে যে অনৈক্য বিরোধ উৎপাদন ও স্বার্থ ।ধনের চেষ্টা দেখা যায়, তজ্জন্য ধর্ম্ম দায়ী নয়। র্ত্তমান বিজ্ঞান মানুষের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির যথেষ্ট পকরণ যোগাইতেছে, আবার ইহার সাহায্যেই ভীষণ ারণাস্ত্র সকল নির্ম্মিত হইতেছে। এ স্থলে বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগের জন্য যেমন বিজ্ঞান দায়ী নয়, ধর্ম্মের অপপ্রয়োগের জন্য তেমন ধর্ম্মও দায়ী নয়। মানুষ হস্ত পদ চক্ষুর সাহায্যে মন্দ কাজ করে বলিয়া এ গুলি নষ্ট করিতে পরামর্শ দেওয়া কি বুদ্ধিমানের লক্ষণ? কথা এই, জগৎময় মানুষের মনের উপর ধর্ম্মের অসাধারণ প্রভাব দেখিয়া স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করা এক শ্রেণীর মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। দেখা যায়, নরহত্যাকারিগণ পর্য্যন্ত ধর্ম্মের পোষাক পরিয়া ধার্ম্মিক সাজিয়া আত্মগোপন করে। পৃথিবীর সকল দেশে এবং সকল কালেই সমাজের এক শ্রেণীর শক্তিমান্ ব্যক্তি তাঁহাদের স্বার্থসাধনের জন্য ধর্ম্মের মুখোস পরিয়া মানুষের উপর নির্ম্মম অত্যাচার করিয়াছেন। শিক্ষাবিস্তারের ফলে গণ-জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে এই শ্রেণীর ধার্ম্মিকদের ধর্ম্মের মুখোস ক্রমেই খসিয়া পড়িতেছে। ধর্ম্ম এ যুগে কায়েমী স্বার্থবাদীদের কবল মুক্ত হইয়া সর্ব্বসাধারণের সাধারণ সম্পদরূপে পরিণত হইতেছে। ধর্ম্মের সাম্রাজ্যবাদিগণ—ধর্ম্মহীন গুরু পুরোহিত ব্রাহ্মণ মোল্লা মৌলবী পাদরী ও সাধুত্বহীন সাধুগণের প্রভাব ক্রমেই কমিতেছে। জগৎময় রাষ্ট্র সমাজ ও ধর্ম্মে অধিকার নিরাকৃত জাতিমাত্রই তাহাদের লুপ্ত অধিকারের দাবী করিতেছে। মানবের অধিকার মানবাত্মার মহত্ত্ব সম্বন্ধে জনসাধারণ ক্রমেই সচেতন হইতেছে। এ যুগে কোন মানুষকে তাহার জন্মগত অধিকার বঞ্চিত করিয়া রাখা সম্ভবপর নহে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "একচেটিয়া অধিকারের দিন চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং প্রত্যেক অভিজাত জাতির কর্ত্তব্য—নিজের সমাধি নিজে খনন করা; আর যত শীঘ্র তাঁহারা এ কার্য্য করেন ততই তাঁহাদের পক্ষে মঙ্গল। যত বিলম্ব করিবে, উহা তত পচিবে আর উহার মৃত্যুও তত ভয়ানক হইবে।"* বিশ্বময় সাম্যবাদ ও সমানাধিকারবাদের বিজয়ডঙ্কা বাজিয়া উঠিয়াছে। ধনতান্ত্রিক সমাজের শোষণের বিরুদ্ধে যেমন লোকমত গঠিত হইতেছে, ধর্ম্মের নামে একচেটিয়া প্রভুত্ব ও অত্যাচারের বিপক্ষেও তেমন জনমত ক্রমেই মস্তকোত্তোলন করিতেছে। এই জনমতের প্রভাব উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া ধর্ম্ম রাষ্ট্র সমাজকে সর্ব্ববিধ অসাম্য বিরোধ ও উৎপীড়ন নির্ম্মুক্ত করিয়া জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকল মানবকে চূড়ান্ত সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা ও প্রীতির সম্বন্ধে আবদ্ধ করুক, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

* ভারতে বিবেকানন্দ, ৩৩৭ পৃষ্ঠা।

পূজারী ও দেবতা

শ্রীমতী অপর্ণা দেবী

পূজারী ঃ—

হে মোর দেবতা ! হে মোর দেবতা !
এ পূজারী চিরদিন—
অন্ধকারায় বন্ধ রহিত—
পাষাণের মাঝে লীন।
মৃন্ময়রূপে ওগো চিন্ময় !
তোমারি পরশ লাগি'—
বিশ্ব তনুতে—অণুতে, অণুতে
দেবতা উঠেছে জাগি'।
নিখিল-সুষমা সজীব আজি যে,
ফুলের মাঝারে প্রাণ
লভিয়া, এসেছে চরণে তোমার
আপনা করিতে দান।
শঙ্খ ঘণ্টা উল্লাসে গাহে
তব বন্দনা গান,
ধূপ-দীপ চাহে, চরণে তোমার
নিঃশেষে নির্ব্বাণ।
আমার চিত্ত, আমার বিত্ত,
আমার নিখিল-ভূমি—
হে মোর শান্ত ! অনন্তরূপে
ভরিয়া রয়েছ তুমি।

দেবতা ঃ—

হে মোর পূজারী ! হে মোর পূজারী !
এ দেবতা চিরদিন—
অন্ধকারায় বন্ধ রহিত—
পাষাণের মাঝে লীন।
হে মোর ভক্ত ! তব আরাধনে—
তোমারি পরশ লাগি'—
জড়ের মাঝারে চেতন এসেছে ;
দেবতা উঠেছে জাগি'।
মন্দির মাঝে পাষাণ দেবতা
রহিত মৌন মূক,
ফুলের আননে গ্লানির ম্লানিমা,
ব্যর্থতা ভরা বুক।
শঙ্খ ঘণ্টা কাঁদিয়া ফিরিত
গাহিয়া বিলাপ-গীতি,
শত ধূপ-দীপ দহনের জ্বালা
নীরবে সহিত নিতি।
দেবতা জেগেছে— জাগ্রত দেব
তোমার পরাণে 'রাজে,
তাহারি পরশে দেবতা জেগেছে
নিখিল-বিশ্ব মাঝে।

অভিন্নর কথা

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অভিন্ন জন্মাবধি আমার অন্তরঙ্গ। সর্ব্বক্ষণই একত্রে কাটাই। তাহার সুখ দুঃখ আমারই সুখ দুঃখ। বিশ্বাসী, গৃহদেবতা নারায়ণের পূজা সে নিজেই করে। দুঃখ কষ্ট থাকলেও অনেকটা নির্লিপ্ত ভাব, সর্ব্বদাই আনন্দে থাকবার চেষ্টা। বন্ধু-বৎসল স্বভাব-মৃদু, বহুস্থ-কুশল বন্ধুবান্ধবদের অত্যন্ত প্রিয়। তারই চণ্ডীমণ্ডপে বন্ধুদের সকাল সন্ধ্যা বসা—দাঁড়ানো। তাহাদের খেলার আসরে সে অপাঙ্‌ক্তেয়; তার তা'তে মন বসেনা—ভুল করে। তাই তামাক সাজা আর তাদের ফরমাস খাটা তার কাজ।

কিছুদিন থেকে তাকে অন্যমনস্ক দেখছি। সবই করে কিন্তু কিছুতে যেন মন নাই,—করতে হয় তাই ক'রে যায়। সকলে পূর্ব্ববৎ আসে যায়, হাসে খেলে, সেও থাকে যন্ত্রবৎ, উৎসাহহীন। আমি সেটা অনুভব করি ও তার সঙ্গে ভোগও করি।

একদিন নিভৃতে তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, "কি ভাবো? ভেবে কিছু ফল আছে কি?" সে একটু দুঃখের ম্লান হাসি টেনে বললে—"না। —তবু দুর্ব্বল মনকে টেনে নিয়ে মনই খেলা করে। তুমি ত' সব জানো, কি আর শুনবে? সেই ঋণের কথা, যা আজ কয় বৎসর মাসিক ভাবে নিয়মিত বেড়ে চলেছে। পরিশোধের পথও পাইনা, বৃদ্ধি রোধের উপায়ও দেখিনা। এ যেন জেনে শুনে অপরাধ বাড়ানো আর অশান্তির সাজা ভোগ করা! দাদা বিদেশে,—মোটা মাইনে পান বটে, তাঁকে জানালে অনায়াসে উপায়ও হ'তে পারতো। জানাতে পারিনা—তাঁর পাঁচটি মেয়ে। তিনটির বিবাহ দিতে তিনিও ঋণভারাক্রান্ত হয়েছেন, তাঁর চিন্তাও কম নয়। সংসারের জন্য ৭০।৭৫ পাঠান, আর নিজের মাসিক খরচ বাদ বাকি টাকা ঋণ পরিশোধে যায়। তার ওপর সহসা তিনি 'অ্যাজমা' (হাঁপানি) রোগাক্রান্ত হ'য়েছেন। এ অবস্থায় আমার বা সংসারের ঋণের কথা, নিষ্ঠুরের মত তাঁকে আমি কিছুতেই জানাতে পারিনা। যা হয় হবে, এ চিন্তা আমারই থাক।

"কথাটা বললুম বটে, কিন্তু এ অবস্থায় ঘরে বাইরে উত্তেজক কারণের অভাব হয় না। একদিন একটা দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে, সেইরূপ একটা কারণে বিচলিত করায়, একাকী চণ্ডীমণ্ডপে এসে মুক্তির উপায় ভাবতে বসি। পাঁচ মিনিটেই মাথা ঘুরে-গেল। চারদিক থেকে হতাশা চেপে দমিয়ে দিতে লাগ্‌লো। ঠিক দেখলুম দেহ থেকে সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে প্রাণশক্তি দ্রুত বেরিয়ে যেন শূন্যে মিশে যাচ্ছে। খোল্‌টা কেবল বসে আছে, আর বাইরে থেকে ঝিঁঝিঁর ডাক্ ভেতরে ঢুক্‌ছে,—মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করছে।

"জোর কোরে "দূত্তোর" বলে গা ঝাড়তেই চট্‌কা ভাংলো। উঃ এ কি করছিলুম। ভেবে কি হয়? মাথা খারাপ হয়,—লোক পাগল হয়। পাগল তো দেখেছি, কি নিস্ফল নির্যাতিত জীবন। ভাবতে হয় তো ভগবান্‌কে ভাবাই ভালো। যিনি ঋণ দিয়েছেন তিনিই তা পরিশোধের উপায়ও দেবেন। আমি কি তাঁকে ছাড়া। যা হয় তিনিই করবেন।—হঠাৎ এ নির্ব্বুদ্ধিতা কেন এসেছিল! রাম্ রাম্ বলে হেসে উঠে পড়লুম। মনটা হাল্‌কা হ'য়ে গেল,—যেন বাঁচলুম। তামাক সাজতে

বসলুম। নাঃ—মিছে আর বিচলিত হওয়া নয়।”

পরে—অভিন্ন মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে বললে,—“কিন্তু মানুষ যতই বুদ্ধিমান সাজুক্—ধোপে টঁ্যাকে না। পাকা বিষয়ী বুদ্ধিমানেরা সাত-চাল ভেবে—ছক্ বেঁধে কাজ করেন,—ভাবেন আর কে পায়। কিন্তু অভাবনীয় ছিদ্রপথে তাঁকে “মাৎ” করে দেয়। ভগবানের লীলা আটঘাট বাঁধা—পালাবার পথ নেই।

“তুমি জানো—আমি কিরূপ দুর্ব্বল প্রকৃতির লোক। ‘না’ বলতে বা কা'কেও ক্ষুণ্ণ করতে পারিনা। সে জন্য বহু ত্যাগ স্বীকার ও কষ্ট বহন করতে হয়। মানুষ অবস্থা জেনেও বেহাই দেয়না—দয়া করেনা।

“দুটি জিনিষে আমার স্বাভাবিক অনুরক্তি বা টান আছে, কিন্তু রহস্য এই সেই দুটি চর্চার সুযোগ আমার নেই। তাদের দাবিয়ে আমাকে চলতে হয়। কারণ আমার নিত্যসঙ্গীদের সে সম্বন্ধে সহানুভূতি পাইনা, বা সে সম্বন্ধে বহিঃপ্রকাশ বা আলোচনা তাঁরা পছন্দ করেন না,—ব্যক্তিগত বিষয়ে প্রচ্ছন্ন ভাব পোষণ করেন। আবার সে বিষয় দুটিও বোধ হয় পরস্পর বিরোধী। এ যেন লীলাময়ের পরিহাস বা পরীক্ষা।

“তুমিই কেবল সেই দুটির কথা জানো। (১) জীবনের উদ্দেশ্য তাঁকে জানা।—সেই জানবার পথ বা উপায় অনুসন্ধান; (২) সাহিত্য চর্চা। কিন্তু অবস্থা অনুকূল নয়, তাই কোনোটিই পুষ্টির পথ পায় না। লুকোচুরি কেবল মনকে বিক্ষিপ্ত করেই রাখে—অশান্তি বাড়ায়।

“প্রকৃতিই প্রবল, তাকে চোখ ঠেরে এড়াবার জো নেই। মহাজনেরা বলেছেন—‘লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, তিন থাকতে নয়।’ তুমি জান লজ্জা আর ভয় আমার প্রকৃতিগত দুর্ব্বলতা। ইচ্ছা থাকলে কি হবে,—বাধা বিপুল। সুতরাং তীব্রতা আসতে পায় না। তীব্র ব্যাকুলতাই তাঁর কাছে এগোবার পথের পাথেয়।

“সংসারে লোকের মুখ চেয়ে কাজ করতে হয়, কে কি ভাববে—কে কি বলবে। নিজের স্বাধীনতা নামমাত্র। যার পাঁচটি মেয়ে, সে কন্যাপণ নিবারণ কল্পে সচেষ্ট হলে ও বক্তৃতা দিয়ে তার অপকারিতা বোঝাতে গেলে, বিদ্রূপভাজনই হয়ে পড়ে। লোকে বলে মেয়েগুলিকে সস্তায় পাত্রস্থ করবার চেষ্টা করা হচ্ছে; আমরা ও সব বুঝি—এত বোকা নই। আমার ঋণও সেইরূপ ও-পথের অন্যতম অন্তরায়।

“হাসচো হাসো। কিন্তু দুর্ব্বলের চিরদিনই এই দশা বন্ধু। তবে তীব্র বৈরাগ্যের কথা স্বতন্ত্র। তা যাঁর এসেছে, তিনি বিষয়ীর কথায় কাণ দেন না, তাঁর সাধনা একমুখী। দুর্ব্বল সে শক্তি কোথায় পাবে!

“তবু মাঝে মাঝে সুযোগ পেলে ‘মাড়ের বাগানে’ (রাণী রাসমণির বাগানে) চলে যেতুম। তুমি তো তা জানো—সঙ্গেই থাকতে। সেখানে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব থাকতেন, কলকেতার কত ভক্ত আসতেন, বিশেষ আমাদের বয়সী প্রফুল্লমুখ কত ভাগ্যবান যুবকেরাও থাকতেন ও মুগ্ধের মত বসে একাগ্র হয়ে ঠাকুরের উপদেশ বাণী—ঈশ্বরীয় কথা শুনতেন। সে যেন ঘরের কথা ঘরের লোকের মুখে শোনা। সহজ, সরল, সরস ও সুমধুর। কোথাও এতটুকু কাঠিন্য নেই, একেবারে বিশ্বাস নিয়ে প্রাণে গিয়ে ঢোকে,—দ্বিতীয় বার জিজ্ঞাসা করে বুঝতে হয় না। বাগানে যারা বেড়াতে এসেছিল, যাদের ও চাষ কোনো দিনই ছিলনা, শুনে তারাও নড়তে পারেনা।

“দুর্ভাগ্য,—দশমিনিটের ব্যবধানে এই আনন্দহাট বসে, কিন্তু আমার যাওয়া—কখনো কদাচ! হতভাগ্যকে ফাঁক্ বা সুযোগ খুঁজতে হয়! বাড়ীতে বন্ধু-বান্ধবেরা উপস্থিত—কি বলে অভদ্রের মত সরে পড়ি! “কালচারে” বোধ হয়

আঘাত লাগে! চক্ষুলজ্জাটাও নাকি ভদ্রতার অঙ্গ। দুর্ব্বল তার অধঃপতন পদে পদে। সজ্ঞানে কেমন নিজের সর্ব্বনাশ করে চলে। তীব্রতার অভাব। সঙ্গীরা তো কেউ ধরে রাখে নি।

"যাক্—এই দেখনা—সেদিন বলেছিলুম—'ভেবে কেবল নিজেরই অনিষ্ট করা। এই মনুষ্য-জন্ম, ভগবানের যা এতবড় দান, যাকে আশ্রয় ক'রে তাঁকেও লাভ করা যায়, যা তাঁরই মন্দির, সেই দেহমন নষ্ট করা। এমন ভুল আর ক'রব না।' এই ভাব নিয়ে কিছুদিন চল্‌লো, সঙ্গে সঙ্গে ঋণও চল্‌লো, অর্থাৎ বেড়েই চল্‌লো।

"তখন দেখি আত্মীয় বন্ধুজন সকলেই নিজেদের মধ্যে তা নিয়ে চর্চা করেন,—'তাই তো—এত দেনাই বা হয় কেনো এবং কিসে? অভিন্নকে আমরা তো জানি, কোনো আয়ই তো নেই—অন্ততঃ চোখে তো দেখতে পাই না। তবে—কিসে' ইত্যাদি।

"ঐ ছোট্ট "কিসে" টুকু, তাঁদের বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা অবলম্বনে, ভালো মন্দ অনুমান সাহায্যে, ক্রমে চরম পর্য্যন্ত সহজেই যাতায়াত করে। —সত্যই তো, "কিসে" হয়।—যাদের সঙ্গে ভালো-বাসার সম্পর্ক, তাদের সন্দেহ করবার অধিকার আছে বইকি। তবু অভিমান আসে কেনো? যাদের সাধ আহ্লাদ, ইচ্ছা পূরণের জন্যে, যাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে, যাদের ক্ষুণ্ণ করে সংসারে অশান্তির সৃষ্টি না করার জন্যে, এই দুর্বহ ভার বহন করছি, তারাই যখন বুঝছে না,—তারাও যখন সন্দেহ করছে, তখন অন্যে তো করতেই পারে! দুর্ব্বলকে তো সাজা ভোগ করতেই হবে। মুখে কিনা বলা যায়, কিন্তু সংসারের উপর বলপ্রয়োগে যে অনর্থ পাত···ছাড়া সুফলের আশা দেখি না। উপদেশ—হাসির কথা।

"সান্ত্বনা বা সুখের মধ্যে,—মা আর বড় বউ-ঠাকরুণ আমার অবস্থা বুঝছিলেন ও আমার জন্য ভাবছিলেন। এই শান্তিটুকুই ছিল আমার অবলম্বন। সহসা একদিন দেখি তার আধখানায় ফাট্ ধরেছে! বড় বউ বললেন—'সকলেই বলছে, —তা সত্যি এতই বা কিসে'……। শুনে চমকে গেলুম দেহ মন যেন নির্ভর ভূমি হারিয়ে শূন্যের সঙ্গে মিশিয়ে গেল, সব আলো যেন এক ফুঁয়ে দপ্ করে নিভে গেল। মুখে বোধ হয় হতাশের হাসির রেখা এসেছিল। ধীরে ধীরে চণ্ডীমণ্ডপে চলে গেলুম। সে অবস্থার ভাষা নেই, মাতালের মত ঝোঁকে যা করায়। তখন নিজেকে হারিয়ে ফেলা হ'য়েছে। বোধ হয় মাঝে মাঝে অভিমান কেবল যাওয়া আসা করছে। 'অ্যাঁ—যাদের জন্যে·····দূর করো—আর নয়!'

"পূর্ব্বে বলেছি না—'ভেবে কোন্ ফল—আর মিছে বিচলিত হব না।' ভগবান্ কারো প্রভুত্ব সহ্য করতে পারেন না। 'বিচলিত হব না,' তুই এত বড় কথা কোস্। তাঁর ইচ্ছার উপর উঠতে চাস্। তাঁর লীলার গতিভঙ্গ করবার স্পর্দ্ধা রাখিস্? তাঁর আটঘাট বাঁধা কাজে ফাঁকির পথ নেই। আমি বুদ্ধিমান সেজে ফাঁক খুঁজে নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিলুম। চাবুক্ মেরে ভুল দেখিয়ে দিলেন। অহংএর আশ্রয় নিয়েছিস? শরণাগতিই যে একমাত্র পথ রে।

"বড় বউ পল্লীগ্রামের মেয়ে, আট কি সাড়ে আট বছর বয়সে বধূরূপে আমাদের বাড়ী এসেছিলেন। মায়ের কাছে মানুষ। বরাবর সেই সরল নির্ম্মল বালিকাই ছিলেন। এক টাকার পয়সা গুণতে জানতেন না। 'আমি—আমার'—এ স্বার্থ বুদ্ধি কোনো দিন তাঁর মধ্যে স্থান পায় নি। সংসারে সকলের প্রতিই সমান টান, সমান ব্যবহার, সমান ভালবাসা, সমান বিশ্বাস। তাঁর কাছে দাসী চাকর,—নিজেদের দাসী চাকর ভাবতে ভুলে গিয়েছিল। আজও তাঁকে দেবী বলেই নতশিরে স্মরণ করি।

"কিন্তু তাঁর মুখে সে-দিনকার সেই "কিসে" আমাকে বজ্রসম বেজেছিল। এটা আর মনে হয়নি যে ও কথা তাঁর নিজের হতেই পারে না,—সে প্রকৃতিই তাঁর নয়। বারবার তাঁর কাণে কেহ ওই সব কথা, নানা অপ্রিয় ছন্দে শুনিয়ে তাঁর প্রাণে আঘাত করে থাকবে।—সত্যও ছিল তাই।

"যাক্, আমার 'আর বিচলিত হব না' বলার স্পর্দ্ধার পরীক্ষা হ'য়ে গেল। সে 'ঘোর' আর কাটতে পেলে না। সেই ঝোঁকেই বেরিয়ে পড়লুম—বাড়ীর মধ্যে আর গেলুম না। সংসারে পাওনা তো এই।—চাকরি? আর কেনো। আপিসেও চাকরি, সংসারেও চাকরি,—জীবনটা বিক্রী করে চাকর থেকেই যাওয়া।"

২

দূর করো,—বেরিয়ে পড়লুম। কোথায়? তা জানিনা। মনের সে অবস্থায় ভেবে চিন্তে কাজ হয় না। ভগবান্ যা হয় করবেন.—এটা বোধ হয় মনে ছিল। মনে আছে বাসনা বলে' কিছু ছিল না। মন বিষয় শূন্য—উদাস। ঐ উদাস ভাবটাই বোধ হয় তার অবলম্বন ছিল।

বেলা তখন দশটা হবে। গঙ্গার ঘাটে গিয়ে দেখি—আমাদের কুটির পান্‌সী ছেড়ে গিয়েছে,—দরকারই বা কি! যাক্—এ অবস্থায় এখানে সেখানে বা এদিক-ওদিকের অর্থই ছিল না। কোথায় যে তা নিজেও জানি না। কলকাতামুখী একখানা চলতি নৌকার মাঝি হাঁক্‌লে—"কোথায় যাবেন বাবু—আসুন।" ভিড়লো, আমিও উঠে বসলুম। নৌকা ছেড়ে দিলে।

মন যেন তার কাজ ভুলেছে, কোনো কিছুতে নেই। চক্ষু চেয়ে আছে—বিষয় অনুভূতি নেই। নৌকা দক্ষিণেশ্বর ম্যাগাজিনের এলাকা পার হয়ে রাণী রাসমণির দেবস্থানের সমুখ দিয়ে চলেছে। প্রাণ এতক্ষণ কিছুই চায়নি, কিছুই খোঁজেনি, জড়ের মতই ছিল, কোনো কথাই ভাবেনি। সহসা সে বলে উঠলো—"ঠাকুর যদি আজ থাকতেন। বস্—আর কিছু না। পরক্ষণেই পূর্ব্বাবস্থা। সে কথা ঐখানেই রয়ে গেল।

কতক্ষণ কেটেছে জানি না, একজন আরোহী বলে উঠলেন "আমাকে খালপারে বাগবাজারের ঘাটে নাবিয়ে দিও মাঝি।" শুনে আমার চট্‌কা ভাঙলো। তবে আমিও নেবে পড়ি না, আমার তো কোনো নির্দ্দিষ্ট স্থান নেই,—বাগবাজার, হুগলী সবই তো এক। নৌকা ঘাটে লাগতেই বাবুটি নেবে পড়লেন। আমার কাছে বোধ হয় দশটি পয়সা ছিল, পাঁচটি পয়সা দাঁড়ির হাতে দিয়ে আমিও নাবলুম।—তারপর?

কলকাতার তিন ক্রোশের মধ্যে বাড়ী, চাকরি বজায় রাখতে প্রায় আট দশ বছর নিত্য কলকাতায় যাতায়াত চলেছে। আপিসে যেতে যতটুকু দরকার তার অতিরিক্ত পথঘাটের সঙ্গে পরিচয়ের প্রয়োজন কোনো দিনই বোধ করি নাই। বৌবাজার কি শ্যামবাজার একলা কোনো দিন যাওয়া হয় নি—চিনিও না। বন্ধু, তুমি সবই জানো—তাই হাস্‌চো। বোধ হয় সেই দিনের কথা মনে পড়ছে—যেদিন কলকেতা থেকে দক্ষিণেশ্বরে আসবার পথটা চিনে রাখা উচিত মনে হওয়ায় পদব্রজে অতি কষ্টে বাড়ী পৌচেছিলুম। সেদিনটি আমার পক্ষে উল্লেখযোগ্য, কারণ এরূপ দুঃসাহস আর কখনো করা হয়নি! যার—"ঘর হতে আঙিনা বিদেশ" সেই মানুষ আজ লোক মুখে শোনা বাগবাজারের ঘাটে উপস্থিত। দাঁড়িয়ে থাকলে তো চলবে না।

সহসা কোথা থেকে অভাবনীয় কথা অনাহত ধ্বনির মত উদয় হোলো। কবেকার শোনা কথা অন্তরে নীরবে ছিল,—"কাঁকুড়গাছিতে ভক্ত রামদত্ত মহাশয়ের বাগানে, ঠাকুরের সমাধি মন্দির হয়েছে!"

একথা আজ কোথা থেকে সাড়া দিলে। কেনো? কই দক্ষিণেশ্বর পেরিয়ে কোনো কথাই তো আর ভাবিনি। খড়-কুটো যেমন স্রোতে ভেসে চলে সেইরূপই তো ভেসে এসে বাগবাজারের ঘাটে ঠেকেছি। তবে কি 'নেসাসিটি'। না—তা হলে তো তার পশ্চাতে চিন্তা চেষ্টা থাকতো। কই তা তো একেবারেই ছিল না। সেই একবার মাত্র রাসমণির বাগানের সামনে একপ্রকার অসম্বিতেই প্রাণ বলে উঠেছিল—"ঠাকুর যদি আজ থাকতেন।" তা হ'লে যে কি হোতো তা পর্য্যন্ত সে বলেনি। তারপর তো সে চিন্তা আর ওঠেনি,—সবটাই ব্লাঙ্ক। তবে? কাঁকুড়গাছি আবার কোথা থেকে এলো? সে কোথায়?

যার কাজ কর্ম্ম, স্থান কাল, নির্দ্দিষ্ট কিছুই থাকে না—সে সামনে যা পায় তাকেই আশ্রয় করে। ব্যাপারটা কিন্তু উলটো হোলো, কাঁকুড়-গাছিই যেন আমাকে পেয়ে বসলো—যাই—সেখানেই প্রণাম করে যাই। কিন্তু সে কোথায়? কোনো পথই যে জানিনা। গাড়োয়ানেরা জানে—কিন্তু গাড়ি ভাড়ার পয়সা নাই। তবে দিকটা শোনা আছে শিয়ালদা-রেলের পূর্ব্ব পারে, নারকোলডাঙ্গার এলাকায়। নারকোলডাঙ্গাও জানি না। যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে পূবমুখো তো যেতেই হবে। ধীরে ধীরে পা বাড়ালুম।

পূর্ব্বদিক্ হ'লেই হ'ল। তারপর যে কোথায় গিয়ে ঠেক্‌বো, সে সব ভাবনা আর ওঠেনি। আবার সেই উদাস অনির্দ্দেশ গতি! ত্বরা বা বিলম্বের দাসত্ব নেই। গতি যেন নিজের গরজে নিয়ে চলেছে। সম্মুখে পথ পড়ে আছে—বাধাও নাই। অনন্ত হলেও ক্ষতি নাই।

রেল লাইন এসে গেল, যেন পট পরিবর্ত্তন হ'ল। দাঁড়িয়ে পড়লুম! এতক্ষণে একবার মাথা তুলে চারিদিকে চেয়ে দেখলুম। কোন্ পথ ধরে এসেছি, তাঁও জানিনা। হঠাৎ নারকোল গাছের প্রাচুর্য্য চোখে পড়ায় চট্‌কা ভাঙলো,—নিশ্চয়ই নারকোলডাঙ্গা। এ পর্য্যন্ত কাকেও কোনো কথা একবার জিজ্ঞাসা করিনি, আবশ্যকই বা কি।

রেল লাইন পার হয়ে আবার রাস্তা,—তার দুধারে বাগানই বেশী। বসতবাটী বিরল। বেলা বোধ হয় দ্বিতীয় প্রহর, গ্রীষ্মকাল, রৌদ্র প্রচণ্ড—ঝাঁ ঝাঁ করছে। চারিদিক নিস্তব্ধ এক একবার এক একটা কাকের ডাক্ শোনা যাচ্ছে। পথ প্রায় জনশূন্য। দিনের বেলাই উদাস ভাব এনে দেয়। দুদিকে সারি সারি বাগান ঘন বাঁশ বন আর এই জনহীন নিস্তব্ধতা ও উদাস আবহাওয়া সহসা মনকে নাড়া দিয়ে, বহুদিনের একটা বিস্মৃত কথা জাগিয়ে দিলে।

ভক্ত রামদত্ত মহাশয় একদিন ঠাকুরকে বলেছিলেন—"আপনি প্রায়ই বলেন, সংসার থেকে একটু তফাতে, নির্জ্জনে কিছুদিন ধ্যান ধারণা করে নিতে হয়, তাই ইচ্ছা করেছি—ধ্যান ধারণার সুযোগের জন্যে স্বতন্ত্র একটু নির্জ্জন স্থান দেখে বাগান করি।" ঠাকুর তাতে বললেন—"বেশতো, এ বেশ কথা, কিন্তু স্থানটি এমন নিভৃতে হওয়া চাই, যেখানে সাতটা খুন হলেও কেউ টের পায় না।"

এইরূপ শুনেছিলুম। যেখানে উপস্থিত হ'য়েছি সেই অঞ্চলটি আর তার জনশূন্য নিস্তব্ধ পারিপার্শ্বিক সেই চিত্রটিই যেন প্রকট করলে। নিশ্চয়ই রাম বাবুর সেই বাগান এইখানেই কোথাও হবে,—কিন্তু বড়-রাস্তার উপর কখনই নয়। মন বলছে এইখানেই। কিন্তু কোথায়? পথ জন-বিরল। আরো একটু এগুলুম। দক্ষিণে একটা গলি পথ কিছুদূর চলে গিয়েছে, প্রান্তে ফটক দেখা যাচ্ছে আর বাঁশঝাড়। নিস্তব্ধ দ্বিতীয় প্রহরেই সেদিকে পা বাড়াতে ভয় হয় সন্ধ্যার পর নিশ্চয়ই পারি না। গলির দুধারে অন্যান্য বাগানের বেড়া। সখ করে এই গলির মধ্যে—লোকচক্ষের অন্তরালে লোক বাগান করবে কেনো!

পা কিন্তু সেই গলির মধ্যেই ঢুক্‌লো। বেশ মনে আছে—নিজের ইচ্ছায় নয়। বড় রাস্তা ছেড়ে, অজানা একটা সামান্য গলির মধ্যে সে ঢুকতে যাবে কেনো! কিন্তু মনের যেন গত্যন্তর ছিল না।

তুমি জানো, চিরদিনই আমি কিরূপ ভীতু লোক। কাকেও না বলে কারো অধিকারের এক গাছি দূর্ব্বা পর্য্যন্ত সংগ্রহ করবার সামর্থ্য আমার নাই। গেট পর্য্যন্ত পৌঁছে বুকটা দুর্‌ দুর্‌ করতে লাগলো। কোথায় যাচ্ছি! জানা নেই শোনা নেই জনমানবের চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই। কেউ জিজ্ঞাসা করলে কি বলবো? অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে থাকতেও ভয় ও অস্বস্তি বাড়ছে, কিন্তু ফিরতেও তো পারছি না! দু'তিন মিনিটের পথ বই ত' নয—ফিরলেই তো এ অসোয়াস্তিকর অবস্থা কেটে যায়। পারছি কই! কেনো যে—তাও বুঝতে পারছি না। যেন যেতেই হবে। গেট্‌ বন্ধ নয—ভেজান রয়েছে। একটু ঠেলতেই খুলে গেল। ঢুকে ভেজিয়ে দিলুম।

এতক্ষণে চোর যেন বন্দী হ'ল। আর স্বপক্ষে কোনো কৈফিয়ৎই রইল না। আমার যে কোনো অসদভিপ্রায় নাই, এ সাফাই আর কে এখন বিশ্বাস করবে! কারো দেখা পেলে সরাসরি তাঁর কাছে গিয়ে আলাপ করতুম,—কার বাগান জিজ্ঞাসা করে' যেন বাঁচতুম—হালকা হতুম। গেটের ভিতর-পিঠে দাঁড়িয়ে চারদিক চেয়ে দেখলুম—কেহ কোথাও নেই। ভয় যেন অপরাধীকে পেয়ে বসলো। যা হবার তা তো হয়েই গেছে—ফেরবার ইচ্ছাও তো জোর করছে না। কি করি? পা বাড়াতেই—বাগানের শুষ্কপত্রাচ্ছাদিত পথ, মর্‌মর্‌ শব্দ করে উঠলো। সেই শব্দেই প্রাণটাকে চমকে দিলে,—পাছে কেউ টের পায়। অথচ লোক দেখতে পেলে বাঁচি। দুর্ব্বল মনের বিচিত্র প্রকাশ!

কিন্তু মন্দির কই—ঠাকুরের সমাধি মন্দির? তবে কি এ বাগান নয়? মন যে বল্‌ছে—এই বাগানই। মন কেনো বলে! খোঁজা নেই, অনুসন্ধান নেই, প্রথম যে বাগানে ঢুকে পড়েছি, সেইটিই যে রামবাবুর সেই বাগান, তার মানে কি! মন ফিরতেও দিচ্ছে না।—একটু এগিয়ে দেখি।

এগোতেই পূব-পশ্চিমে লম্বা একটি ছোট পুষ্করিণী, তার চারদিকে রাস্তা! পুষ্করিণীর পূর্ব্ব পারে পশ্চিম মুখো একটি ছোট পাকা কুটুরী—চুণকাম করা।

সন্তর্পণে পা ফেলে,—ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে পুষ্করিণীর পশ্চিম পারে—সেই ওপারের কুটুরীর ঠিক্‌ সামনাসামনি উপস্থিত হলুম। ভয়ে ভয়ে যে কেনো,—সেটা দুর্ব্বল মনই জানে। লোক নেই জন নেই—বলা নেই কওয়া নেই, এরূপ অসময়ে পরের বাগানে ঢোকার অপরাধ, মনটা যে সর্ব্বক্ষণই অনুভব করছিল।

এইবার কুটুরীটির দিকে সোজাসুজি চাইলুম,—দ্বার উন্মুক্ত। একি! ঠাকুর যে! প্রাণ আনন্দে আহা আহা করে উঠলো।—ধন্য ভক্ত, একেবারে যেন জীবন্ত মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন! সেই প্রফুল্ল মুখ, সেই কাপড—সেই তেমনি কাঁধে ফ্যালা। আবার দেখলুম! একি! হাওয়ায় দাড়ির দুই এক গাছি চুলও মৃদু মৃদু নড়ছে। আশ্চর্য্য! যেমনটি দেখেছি হুবহু সেই মূর্ত্তি।

বোধ হয় এই মাত্র কেহ পূজা করে গেছেন। মূর্ত্তির সম্মুখে সুন্দর আসন, তাম্রকুণ্ড, কোষাকুষি শঙ্খ ঘণ্টা, পুষ্পপাত্র, নৈবেদ্যাদি রয়েছে।

কি সাদৃশ্য! এমন জীবন্ত মূর্ত্তি ভক্তের ইচ্ছা পূরাতেই সম্ভব হয়েছে। ধন্য ভক্ত! সেই আনন্দময় মূর্ত্তি আবার দেখছি, নিকটে গিয়ে দেখবার সাহস নেই। তিন চার মিনিট এই প্রাণারাম দর্শনই চল্‌ছে আর সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তির গঠন দক্ষতা উপভোগ —

সহসা লোকের আওয়াজ পেয়ে কেঁপে উঠলুম;

—"কেগা আপনি, কি দেখছেন ?" থতমত খেয়ে বলে ফেললুম—"ঠাকুরকে দেখছি। এইটিই কি রামদত্ত মশার বাগান ?" এই বলতে বলতে লোকটির দিকে চললুম। মনের সে অবস্থা, সে পরমক্ষণ বাধা পেয়ে সেইখানেই শেষ হয়ে গেল। অপরাধীর মত অগ্রসর হলুম,—কি জানি কি বলবেন।

তিনি বাগানের উত্তরপূর্ব্ব কোণে দাঁড়িয়ে। একটু লম্বা বলা চলে, কৃষ্ণবর্ণ আদুড়গা, কাঁধ পর্য্যন্ত লম্বা চুল, পরিধান একখানি সাধারণ ধুতি মাত্র, খালি পা, কৃষ্ণবর্ণের উপর একগোছা ধপধপে যজ্ঞোপবিত খুবই সুস্পষ্ট। আমার উপর তাঁর অবাক বিস্ময় দৃষ্টি।

নিকটে না পৌছুতেই—"কি দেখছিলেন" বললেন।

"পরমহংসদেবের কি মূর্ত্তিই"···

"মূর্ত্তি ? কোথায় ? কি বলছেন ?"

তাঁর কথাগুলির উচ্চারণ ভঙ্গীতে যেন সন্দেহের সুর। দৃষ্টিও যেন কেমন—যেন পাগল ঠাওরাচ্ছেন। আমি তো আগাগোড়াই নিজের মনে অপরাধী ছিলুমই, তবু সাহসে ভর করে বললুম—

"কেনো ঘরের মধ্যে তবে" ··

তখন বোধ হয় সত্যই তিনি আমাকে পাগল ঠাউরে বললেন—"ঘর তো বন্ধ, চাবি এই আমার কাছে রয়েছে। ঘরের মধ্যে রূপার বাসন-কোসন রয়েছে·· দেখবেন কি।"

সত্যই একগোছা চাবি তাঁর কোমরে ঝুলছিল। তাঁর কথা শুনে আমি চমকে গেলুম, বুক ঢুব ঢুব করে উঠলো। অব্যবহিত পূর্ব্ব কথা ভেবে নয়। লোকটির ভাব দেখে সে সব তখন ঘুলিয়ে গেছে। তিনি ঠিকই আমার মতলব বা মাথা খারাপ, ভাবছেন।

নড়ছেন না, বলছেন—"বড় জোর এক ঘণ্টা হবে, পূজাদি সেরে ঘর বন্ধ কোরে খেতে গিয়েছিলুম, আপনি ওসব কি" ··

তখন তাঁকে কথা না বাড়াতে দিয়ে, নিজের গরজেই বললুম—"এই তো এখান থেকে বিশ পাও নয়, আপনি নিজেই দেখুন না একবার—আমারো তো ভুল হতে পারে, আসুন।" আমিই অগ্রসর হলুম, তিনিও সঙ্গে এলেন।

ঘরের সামনে উপস্থিত হয়ে—ঘরটির পশ্চিম ও দক্ষিণ উভয় দ্বারই উন্মুক্ত দেখে, শঙ্কিত মূঢ়ের ন্যায় তিনিও নির্ব্বাক, আর ঘরের মধ্যে ঠাকুরের সেই প্রাণ জুড়ানো মূর্ত্তির চিহ্নমাত্র কোথাও না দেখতে পেয়ে আমিও বিমূঢ়,—যেন কেমন হয়ে গেলুম। একটু সামলে বললুম—"মশাই, আপনার জিনিষপত্রগুলা সব ঠিক্ আছে কি না আগে দেখে নিন।"

তখন তাঁর পূর্ব্বভাবের যেন পরিবর্ত্তন এসেছে। চটকা ভাঙার মত বললেন—"সে সব আমার সামনেই রয়েছে—ঠিক আছে। কিন্তু কয় বৎসর নিত্য এই কাজ করছি এমন ভুল তো কোনো দিন ঘটে নি।—ভুলই বা কেনো বলি, এক ঘণ্টা আগেকার কথা.—আমার বেশ মনে আছে, আমি তালা বন্ধ করেছি, তার পর তা টেনে দেখে নিজে নিশ্চিন্ত হয়েছি। এটি আমার অভ্যাস। তা না হলে চাবি আমার ঘুনশিতে আসবে কি ক'রে ? ঠাকুর ঘরের তালা খোলবার পর চাবি তালাতেই আটকানো থাকে। পূজাদি শেষ হলে, তালা দিবার পর, চাবি কোমরে ফিরে আসে। খুব মনে হচ্ছে, আজো তাই ক'রেছি, নচেৎ চাবি কোমরে এলো কি কোরে। দুটো দোরই খোলা রইলো, আংটায় খোলা তালা ঝুলতে লাগল'—আর চাবি আমার কোমরে এসে গেল ! কেবল চাবির গোছাটা তালা থেকে খুলে নিয়ে চলে' গেলুম ! পাগল তো নই মশাই !" · ···

"ঘরের জিনিষ-পত্র সব ঠিক আছে" শোনবার পর আমার আর ওসব কথা শোনবার ইচ্ছাও ছিল না, আবশ্যকও ছিল না। আমার প্রাণকে

তখন একমাত্র চিন্তা অধিকার ক'রে রয়েছে—"ঠাকুরের সে মূর্ত্তি কই!" একবার নয়, এক সেকেণ্ড নয়—বার বার ফিরে ফিরে দেখেছি। পুষ্করিণীর দৈর্ঘ্য বিশ গজের কমই হবে। গ্রীষ্মের দ্বিতীয় প্রহরের দিগন্ত উদ্ভাসিত আলোক,—নূতন চুনকাম করা ঘর, অল্প পরিসর কক্ষের পশ্চিম ও দক্ষিণের দ্বার সম্পূর্ণ উন্মুক্ত থাকায় শঙ্খ, ঘণ্টা, কোষাকোষী পর্য্যন্ত সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল, আর মনুষ্য প্রমাণ সেই শ্রীমূর্ত্তি কি ভুল দেখার কথা। কিন্তু কই? প্রাণ এতক্ষণ নিশ্চয়ই কেঁদে গড়াগড়ি দিত, কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতির সান্নিধ্য, সংস্রব, সঙ্গ, দুর্ব্বল মানুষের চিরদিনই অন্তরায়।

বললুম—"কত বড় বড় সাবধানী লোক এর চেয়ে কত মারাত্মক ভুল করে ফেলেন। জেনে শুনে তো কেউ করেন না। তাতে আর হয়েছে কি? যা ঘটবার তা ঘটেই যায়। কোনো ক্ষতি হয় নাই, এইটাই বড় কথা।"

"আপনি বুঝতে পারছেন না মশাই, তালা যে আমি নিজের হাতে বন্ধ করেছিলুম।"

"বেশ তো, সে কথা ভেবেই বা আর ফল কি? যাক্ ও কথা।"

লোকটি পূজারী ব্রাহ্মণ, শিক্ষিতও নয় বলেই মনে হয়। আমার কথা তাঁর মনের মত হল না, আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বললেন,—"আপনি তো বেশ বললেন মশাই—যাক্ ও কথা। যায় কই? নিজেকে অবিশ্বাস করি কি করে,—আমি যে নিজের হাতে ঘর বন্ধ করেছি মশাই।"

বারবার সেই এক কথা। অন্য সময় বোধ হয় বিরক্তিকর হ'ত, আজ কিন্তু উপভোগ্যই লাগছিল, আমার প্রাণের তারে সে সুর বেসুরো বোধ হচ্ছিল না। তবু বললুম—"জগতে ভুলচুকও যেমন সত্য, আবার অভাবনীয় ঘটনাও কখনো কখনো ঘটতেও তো শুনতে পাই। যা বুঝতে পারি না তা নিয়ে আর ভেবে ফল কি? ও ছেড়ে দিন।...এখন বলুন তো এইটি কি রামদত্ত মশায়ের কাঁকুড়গাছির বাগান?"

"হাঁ তাঁরই যোগোদ্যান। আর এইটি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের সমাধি মন্দির। আচ্ছা—তা আপনি কে,—কোথা থেকে এসেছেন? অনেকেই তো আসেন আপনাকে তো আগে কখনো দেখিনি। বাবুকে কি বলবো?"

আমি সহাস্যে বললুম—"বাবুকে বলবার দরকারই বা কি? এই তো বললেন কতলোক আসেন, আমিও সেইরূপ একজন। ঠাকুরের সমাধি ক্ষেত্রে প্রণাম করে যাবার ইচ্ছায় এসেছিলুম।"

"না মশাই—আপনার পরিচয় আমার চাই। তিনি যে নিত্য খবর নেন,—আমাকে সব বলতে হয়। তার আজ যে আমার কেমন ধোঁকা লাগছে। হঠাৎ দূরে থেকে পুকুরের পশ্চিম পারে আপনাকে দেখে যখন জানতে চাই—'কে গা আপনি—কি দেখছেন?' তখন যেন বলেছিলেন,—'ঠাকুর দেখছি।' কি দেখছিলেন বলুন ... বাবুও একদিন তাঁকে দেখেছেন।"

শুনে অন্তরটা বোধ হয় কেঁপে উঠলো। কি বল্‌বো? না—আর বাড়াবাড়ি নয়। মুখে হাসি এনে বললুম—"আপনার বাবুর মত ভক্তের পক্ষে সবই সম্ভব, সে ভক্তির কণামাত্র পেলে লোক কৃতার্থ হয়ে যায়। ঠাকুরের সমাধি মন্দিরের মধ্যে যদি তাঁর সেই প্রেমময় মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে—তাই দেখছিলুম।"

কথাটা তাঁর, যে ঠিক্ বিশ্বাস হ'লনা তা তাঁর কথায় বার্ত্তায় বুঝতে পারলুম, কিন্তু আমিও ওকথা এড়িয়ে গেলুম। বললুম—"একটু জল খাওয়াবেন?"

এতক্ষণ ক্ষুধাতৃষ্ণা বোধই ছিলনা,—তখনও ছিলনা। বোধ হয় প্রসঙ্গটা চাপা দিবার জন্যই জল চেয়েছিলুম।

বললেন—"তা দিচ্ছি,—রাত্রে কিন্তু এইখানেই ঠাকুরের প্রসাদ পেতে হবে। বাবুর সঙ্গে দেখা না করে যাওয়া হবে না, তিনি বড় খুসি হবেন।"

বললুম—"মাপ করবেন, আজ তা সম্ভব নয়। অন্যদিন দেখা যাবে। আজ তো আলাপ হয়ে রইলো।"

"না মশাই—সেটি হবেনা। বাবু আমার উপর বড় রাগ করবেন—অসন্তুষ্ট হবেন। আর আপনার মত লোক ঠাকুরের প্রসাদ না পেয়েই বা" ·

"আহা, আপনি ও কথা কেনো বলছেন, ঠাকুরের প্রসাদ তো রয়েছে—আপনি কি আমাকে শুধুই জল দিবেন?—বিশেষ কাজে বেরিয়েছি যে, —বাড়িতে যে"··

"তা এই রোদে—এখন তো আর কোথাও, · আচ্ছা আগে জল খান—"

তিনি কলাপাতে কোরে ঠাকুরের প্রসাদী শশা, কলা, পেপে, শাকালু, বাতাসা আর একটি ঘটি ক'রে জল, আমাকে দিলেন। সিক্ত মনে মাথায় ঠেকিয়ে প্রসাদ পেয়ে জল খেলুম। মুহূর্ত্তে দেহমন স্নিগ্ধ—শীতল।

* * * * *

একি? পরক্ষণেই,—যে কথা, যা সব মন থেকে মুছে গিয়েছিল, এতক্ষণ যার আভাস পর্য্যন্ত মনের অধিকারে প্রবেশপথ পায়নি, সেই মা সেই বাড়ি চোখের সামনে মূর্ত্ত হ'য়ে যেন ডাক্ দিলে —"ফিরে আয়"। সর্ব্বোপরি সারা অন্তরটা বলে উঠলো—"সত্বর বাড়ী যা"। দৈববাণী কোনদিন শুনি নাই,—কিরূপ হয় জানিনা। কিন্তু অন্তরের এরূপ প্রবল তাড়নাও কখনো অনুভব করি নাই। সে যেন সারা স্নায়ু ধরে সবলে টানছে। দেহমন চঞ্চল হ'য়ে উঠলো। ফেরবার জন্য সে কি ব্যাকুলতা,—মুহূর্ত্ত বিলম্বও অসহনীয়!

ঠাকুর, একি পরিহাস।

আজ যখন নৌকা রাণী রাসমণির মন্দির সম্মুখে, তখন তো আমার কোন চিন্তা, কোনো জ্ঞানই ছিলনা, কোথা হতে অবচেতনা সহসা সাড়া দিয়ে উঠলো—"ঠাকুর যদি আজ থাকতেন?" কেনো যে একথা এসেছিল, কি অভাব বোধ হয়েছিল, তারও সুস্পষ্ট ধারণা আমার ছিল বলেও বোধ হয় না। এতটুকু ব্যাকুলতা কি কাতরতা তার মধ্যে গোপন ছিল কিনা—তাও তো জ্ঞানতঃ বলতে পারিনা। হে ভাবরূপী ভাবগ্রাহী অন্তর্যামী, তুমিই অন্তরে বসে ও কথা বলিয়ে থাকবে, আবার হে অহেতুক কৃপাসিন্ধু, তুমিই ব্যবস্থা কোরে সে অভাব মেটালে! এ অভাগার প্রতি একি অনির্ব্বচনীয় করুণা!—"সাপ হয়ে কামড়াও রোজা হয়ে ঝাড়ো।" এমন ব্যথার ব্যথী আর কে আছে? কোথায় পাবো?

কিন্তু এ আবার কি। বাড়ী ফেরবার জন্যে মাকে দেখবার জন্যে প্রাণের এ কি ছটফটানি!

দু'চার কথায় পূজারীর কাছে বিনীতভাবে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। তিনি বোধ হয় বল্‌লেন—"এই প্রচণ্ড রোদে ভারি কষ্ট হবে, এখানে যান বাহন কিছুই পাবেন না। একটু রোদ পড়লে"··

আমার সে অবস্থা তো কাকেও বোঝাতে পারব না! সে টান্,—অন্তরের সে বৈদ্যুতিক গতি-বেগ যে কোনো বাধাই মানে না! কিন্তু পথ তো জানি না, যে পথে এসেছি তাও তো দেখি নাই! সে যে ঠাকুরই এনেছিলেন! এখন?

ফটকের বার-পিঠে পা দিতেই—গাড়ির শব্দ পেলুম। দেখি একখানি ঘোড়ার গাড়ি পূর্ব্বদিক থেকে পশ্চিম মুখো চলেছে, আরোহী নাই। গাড়ি থামাতে থামাতে বল্‌লে—"বাবু যাবেন নাকি—কোথায় যাবেন?"

বললুম—"দক্ষিণেশ্বর"

"আসুন, আমার বরানগরের বেণী সাব আস্তাবলের গাড়ি।"

"আমার যে ভাই বাড়ি পৌছে ভাড়া দিতে হবে, সঙ্গে নাই।"

"আসুন,—কতটা আর? তাই হবে।"

"আমাকে একটু শিগ্‌গীর পৌছে দিতে হবে ভাই।"

"আজ্ঞে আমারও তাড়া আছে বাবু, কোন্ সকালে না খেয়ে বেরিয়েছি"—

গাড়িতে উঠতেই সে ঘোড়াকে চাবুক মেরে সজোরে হাঁকিয়ে দিলে।

আশ্চর্য্য—যে লোকের চির অভ্যাস (ভীতু বলেই হোক,—বা যে কারণেই হোক) গাড়োয়ানকে বলা—"ঘোড়াকে চাবুক টাবুক মারবার দরকার নেই—দেশ যাচ্ছে," আজ তার মুখে সে ক' একবার এলনা।

* * * *

থাক্—আর কেনো। তুমি ত বন্ধু পূর্ব্বাপর সব কথাই জানো। সেই দিন থেকে মনটা আমার ঠিকানায় নেই, যেন কেমন হ'য়ে আছি। উচিত অনুচিত ঠিক করতে পারছি না।

বন্ধু সহাস্যে বললেন—"নিজের জানা জিনিষই তো উপভোগ করতে ভালো লাগে। পেট ভরে থাকলে, গরু কত আরামে ছাওয়ায় শুয়ে নিশ্চিন্তে চোখ বুজে জাবর কাটে, দেখনি!—পাতানো সংসার হ'লেও, মা বস্তুটি স্বতন্ত্র, তাঁকে মনোকষ্ট দিতে নাই,—তাই বোধ হয়"—

অভিন্ন অন্যমনস্ক ভাবে বললে—"ঠাকুরই জানেন। জয় শ্রীরামকৃষ্ণ।"

অসমীয়া গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার পরিকরগণের কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অধ্যাপক শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার, এম্-এ, পি-আর্-এস্, পি-এইচ্-ডি, ভাগবতরত্ন

(৪) শ্রীচৈতন্যের আসাম ভ্রমণ

শ্রীচৈতন্য কোন সময়ে আসামে গিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। কয়েকখানি অসমীয়া, সংস্কৃত ও বাংলা গ্রন্থে এইরূপ বর্ণনা আছে। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের সাতখানি প্রাচীন জীবনীতে এবিষয়ে ইঙ্গিত পর্য্যন্ত নাই।

ভট্টদেব তাঁহার সৎসম্প্রদায় কথায় (৩০ পৃঃ) শ্রীচৈতন্যের আসাম ভ্রমণ সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনা দিয়াছেন, "পাচে মহাপ্রভু তৈর পরা আসি করতিয়ার তীরে রহিলা। পাচে যেথন রাজা নরনারায়ণ হই উপর দেশর পরা অনেক লোকক নমাই আনি শঙ্করক গোমোস্তা পাতি রাজ্য বসাইবে দিছে মাত্র, তেথনে চৈতন্য ভারতী প্রভু মাধবদর্শনে মণিকূট আসিলা। বরাহকুণ্ডর উপরে গোঁফাত বহি মাধব দর্শন হৈল। পাচে রত্নেশ্বর বিপ্রক শরণ লগাই ভাগবত পঢ়াই বত্নপাঠক নাম দি মাধববন্ধাবত ভাগবত পঢ়িবে দিলা, আরু যাত্রা মহোৎসব সংকীর্ত্তন কর্ম্মকো মাধবর দ্বারা প্রবর্ত্তাইলা, পাচে মহাপ্রভু পরশু কুঠারে যাই নামর নির্ণয় লেখি ব্রহ্মকুণ্ডত স্নান করি উলটি আসি সেই

গাফাতে রহিলা। পাচে মাগুরির কণ্টভূষণক আর ঋষিশেখরক, কণ্টহার কন্দলীক শরণ লগাই ভাগবত পঢাইলা। পাচে হাতে বীণা ধরি গাই নারদর শ্রেষ্টা দেখাইলা। সেই বেলা দামোদরে মাধব দেখিতে মণিকুটে যাই তাঙ্ক দেখি ভূর্ণভলাভ ভৈলা বুলি প্রণাম করি বোলে "হে মহাপ্রভু, মঞি দরিদ্র ব্রাহ্মণে কিছো আশীষ মাগোঁ।" চৈতন্য বোলে "কেন মতে তুমি দরিদ্র ভৈলা?" দামোদরে বোলে "স্বদেশের পরা নামি আহন্তে তাঁতীমরাত নোকা বুরি সর্ব্বস্ব উঠিল। তিনটী প্রাণী—ঝাঁজিত ধরি দিগম্বরে তরিলোঁ। পাচে শঙ্করে বস্ত্র তিনথানি পরিধান করাই নিকটে রাখিছে।" পাচে চৈতন্য বোলে "হে দামোদর নশ্বর বস্তুত খেদ নকরা। তুমি ঈশ্বরের পার্ষদ। লক্ষ্মীর কোজে গৌতমর বংশত জন্মিছা। পুন তান করে তিনি পীঠত পূজ্য হুই নিজ ঐশ্বর্য্যকে পাইবা। এই বহস্য কহি তাঙ্ক তত্ত্বজ্ঞান দি উডেষাক গৈলা।"

এই বিবরণে বিশ্বাস না করিবার প্রধান কারণ এই যে, গেট সাহেবের মতে ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে ও গুণাভিরাম ও রবিন্‌সন মতে ১৫২৮ খৃষ্টাব্দে রাজা নরনারায়ণ সিংহাসনাধিরোহণ করেন। গেট সাহেব বলেন যে, নরনারায়ণ ১৪৬৮ শক বা ১৫৪৬ খৃষ্টাব্দে আসাম আক্রমণ করেন; শ্রীচৈতন্য ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে তিরোধান করেন। সুতরাং নরনারায়ণের আসাম আক্রমণের পরে শ্রীচৈতন্যের আসাম ভ্রমণ করা অসম্ভব হয়।

কৃষ্ণ ভারতীর সন্ত নির্ণয়ে শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে অনেক অপ্রামাণিক উক্তি আছে তাহা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। ঐ গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের আসাম ভ্রমণ সম্বন্ধে আছে যে, শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবন হইতে কামরূপে মাধব দর্শন করিতে আগমন করেন। "ইতি কামরূপ দেশত যেমতে চৈতন্য গোসাই প্রবর্ত্তনি সম্প্রদায় ঈশ্বর ভক্তি পিণ্ড সরণ, ভজন, হরিনাম ভাগবত গীতা জাত্রা মহোৎসব প্রবর্ত্তিলা তাহাক সুনা। এহি কামরূপদেশ প্রায় জঙ্গল আছিল। ব্রাহ্মণ সজ্জন ন ছিল। পাছে নরনারায়ণ চিলা রায় দুভাই কামরূপের রাজা হইল। মাধবর থানর মঠ বান্ধিলে[১]। পাছে কামরূপ উক্ত দেখিবেই তাতে মণিরামপুর কৈল্যাণপুর বনিয়া ব্রহ্মপুর-বেদর বরদয়া এই সকল দেশর ব্রাহ্মণ, কায়স্থ কুলীন জাতি মগি সকলক বসাইলেক। সেই বেলা রাম দামোদর, শঙ্কর, মাধব, হরিদেব কামরূপক আসিলা, দেব দামোদরের সত্রে তাতি মারাং নায় বুরি, সর্ব্বস্ব নষ্ট হইল, চারি প্রাণী পাত্রঝা জিত ধরি রহিল। পাছে শঙ্কর রামরাম গুরু মাধব দরশন করিবাক আসিল। তাতে রত্নপাঠকর মুখে ভাগবত শুনি রত্ন পাঠকত সুধিলা। হে গুরু কোন শাস্ত্র পড়া। পাছে রত্ন পাঠকে কহিলেক বোলে এইতো শ্রীভাগবত আমারেই দেশত শ্রীচৈতন্য গোসাঞি প্রচারিল। আমাক কৃপা করি মাধব দুয়ারে পাঠ করিবাক আজ্ঞা করিল। এতেকো আমি পড়োঁ। এহি কথা সুনি পুনু শঙ্করে গোমস্তায়ে সোধাবোলহ গুরু চৈতন্য গোসাঞি কোন ঠায় থাকে আমি তঞক দেখা পাঞো। এহি সুনি রত্ন পাঠকে বোলে চৈতন্য গোসাঞি এই মাধবর মণিকূটর গোফাতে আছিল। এখন জগন্নাথক গৈল। এহি কথা সুনি শঙ্কর গোমস্তা রাম রাম গুরু দুইজনে আনচি বোলে গুরু চলা গঙ্গাস্নান করি জগন্নাথ দরশন করি চৈতন্য গোসাঞিক সেহি থানত লগে পাইব।" মাধবের মন্দিরের সম্মুখের ঘর যদি রাজা নরনারায়ণ ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন ও তাহার পর শঙ্করের সহিত রত্ন পাঠকের কথাবার্ত্তা হয়, তাহা

১ রাজা নরনারায়ণ মাধবের মন্দিরের সম্মুখের ঘরটী ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। সোনারাম চৌধুরী লিখিত "কামরূপত কোচ রাজার কীর্ত্তি চিন্" প্রবন্ধ, "চেতনা" মাসিক পত্রিকা, ফাগুন ১৮৪৫ শক, ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ।

হইলে এই সময়েরও পরে শঙ্কর কি করিয়া পুরীতে শ্রীচৈতন্যের দর্শন পাইবেন? শ্রীচৈতন্য ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে তিরোধান করিয়াছেন।

কৃষ্ণ আচার্য্য "সন্ত বংশাবলীতে নৃসিংহকৃত্য" নামে একখানি বইয়ের উপর নির্ভর করিয়া নিম্নলিখিত পদ লিখিয়াছেন। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের আসাম ভ্রমণের কথা পাওয়া যায়. কিন্তু তিনি কখন আসামে গিয়াছিলেন তাহা জানা যায় না।

তের হন্তে প্রভু কামরূপে গৈয়া
মণিকূট গীরি পাইলা।
বরাহ কুণ্ডর উপর গোঁফাত
চৈতন্য প্রভু রহিলা॥
বত্ন পাঠকক শরণ লগাই
ভাগবত পাঠ দিলা।
মাণ্ডবী গ্রামর কণ্ঠ ভূষণক
কণ্ঠহার কন্দলীক।
কবিচন্দ্র দ্বিজ কয় কবি শেখরত
চৈতন্য নাম দিলেক॥
যাএঃ মনোসের সংকীর্ত্তন ধর্ম্ম
মণিকূটে প্রবর্ত্তাই।
তৈর পরা আসি মৌন হুয়া বৈ'লা
ওডেষা নগর পাই॥ ৯৩—৯৫ ত্রিপদী।

কৃষ্ণ আচার্য্যের উক্তির সহিত সত্ত্বনির্ণয়ের বর্ণনার মিল আছে। উভয় গ্রন্থেই পাওয়া যায় যে, শ্রীচৈতন্য বরাহ কুণ্ডের উপর রত্নেশ্বরকে 'শরণ' দেন, কণ্ঠভূষণকে ভাগবত পাঠের উপদেশ দেন ও কণ্ঠহার কন্দলিকে কৃপা করেন। তারপর কবিশেখর ব্রহ্মাকে নামধর্ম্ম দান করিয়া তথা হইতে উড়িষ্যায় গমন করেন।

প্রদ্যুম্নমিশ্র নামক কোন ব্যক্তির লেখা বলিয়া কথিত "শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যোদয়াবলী" নামক সংস্কৃত গ্রন্থে আছে যে, শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণের পরেই শান্তিপুর হইতে শ্রীহট্ট গমন করেন এবং এক ব্রাহ্মণীর অনুরোধে তিনি "চণ্ডীমেকাং লিখিত্বা তু প্রদোত্তস্মৈ যথেপ্সিতাম্" (৩।৩৩)। তৎপরে প্রভুর পিতামহী বলিলেন—"তোমার পিতামহের পৌত্রেরা কি খাইয়া বাঁচিবে?' প্রভু বলিলেন, "পালয়ামি ভবৎ পৌত্রান্ সসন্তানিহ স্থিতঃ" (৩।৩৫)। সেখান হইতে প্রভু কৈলাস যাইয়া অমৃতকুণ্ডে স্নান করিলেন।[১]

এই বিবরণ সত্য নহে। কেন না, শিবানন্দ সেন ও বাসুদেব ঘোষ শান্তিপুরে উপস্থিত ছিলেন ও তাঁহারা পদে লিখিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্য শান্তিপুর হইতে সোজা নীলাচলে যান। শ্রীচৈতন্যের সমস্ত চরিতগ্রন্থেও শান্তিপুর হইতে নীলাচলে যাইবার কথা আছে।

আধুনিক অসমীয়া লেখক শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া তাঁহার "শ্রীশঙ্করদেব আরু শ্রীমাধবদেব" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"শ্রীচৈতন্যই দক্ষিণ প্রদেশত ধর্ম্ম প্রচার করি তার পরা এবার মণিপুরলৈ আহি, তাতো ধর্ম্ম প্রচার করি সন্ন্যাসী বেশেরে আসমলৈ আহি হাজোতে

১ এই বিবরণ অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মহাশয় সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু তিনি "শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্ব্বাঞ্চল পরিভ্রমণ' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্য যখন অধ্যাপকরূপে শ্রীহট্টে গিয়াছিলেন, তখন চণ্ডী লিখিয়া দিয়াছিলেন—সন্ন্যাসের পর নহে। তিনি শ্রীহট্টের প্রাচীন কবি রূপরাজ কৃত "গৌরাঙ্গসন্ন্যাস", ময়মনসিংহের এক গ্রন্থকার রচিত "স্বরূপ চরিত", নামধাম-বিহীন লেখকের "শ্রীচৈতন্যবিলাস," 'শ্রীচৈতন্য রত্নাবলী," "প্রাচীন রসতত্ত্ব বিলাস" ও "মনঃসন্তোষিণী" হইতে প্রমাণ তুলিয়া শ্রীচৈতন্যের আসাম ভ্রমণ বর্ণনা করিয়াছেন। প্রদ্যুম্ন মিশ্রের "শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যোদয়াবলী" যে জাল বই ও উল্লিখিত বাংলা বইগুলি যে বিশ্বাস্য নহে, তাহা আমি "ব্রহ্মবিদ্যায়" ১৩৪২ সালের আশ্বিন সংখ্যায় দেখাইয়াছিলাম। তত্ত্বনিধি মহাশয় অগ্রহায়ণ সংখ্যায় তাহার একটি প্রতিবাদ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিবাদ খণ্ডন করিয়া আমি উক্ত পত্রিকায় ১৩৪৩ বৈশাখ সংখ্যায় আর একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছি। তাহার কোন উত্তর তিনি দেন নাই।

কছুদিন আছিল (১২৩ পৃঃ)।" দক্ষিণ ভ্রমণের পর শ্রীচৈতন্য ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তে স্থিত আসামে গিয়াছিলেন, একথার প্রমাণ কোন প্রাচীন গ্রন্থে পাই নাই বলিয়া ইহা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না।

আমার মনে হয় শ্রীচৈতন্য কোন সময়ে আসামে গিয়াছিলেন। তিনি যদি তথায় একেবারেই না যাইতেন, তাহা হইলে এতগুলি কিম্বদন্তির সৃষ্টি হইতে পারিত না।

হেমচন্দ্র দেব গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন—"কামরূপ বিভাগে হাজো অঞ্চলে মহাপ্রভু আসিয়াছিলেন এই জনশ্রুতি। হাজোতে মণিকট নামে একটি ছোট পাহাড় আছে এবং তাহার শিখরদেশে হয়গ্রীব মাধবের দেবালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। পাদদেশে একটি গহ্বর আছে এবং তাহার সন্নিকটে বরাহ কুণ্ড। এই গহ্বরটীকে লোকে "চৈতন্য ঘোপা" বলিয়া থাকে এবং চৈতন্যদেব কিয়ৎকাল এই গহ্বরে বাস করিয়াছিলেন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে"। (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩২২-৪, পৃঃ ২৪১—২৪৮)।

শ্রীচৈতন্য যদি কোন সময়ে আসামে যাইয়া থাকেন, তাহা হইলে বৃন্দাবন হইতে ফেরার পথে তথায় যাওয়াই অধিক সম্ভব। কেননা তাঁহার অন্যান্য সময়ের ভ্রমণের অনেকটা নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায়, কিন্তু বৃন্দাবন হইতে ফেরার পথে বারাণসীতে দুইমাস থাকার পর (চৈঃ চঃ ২।২৫।২) অর্থাৎ চৈত্র মাস পর্য্যন্ত থাকার পর তিনি কোন সময়ে পুরীতে ফিরিলেন, তাহা জানা যায় না। ঐ সময়ে তাঁহার একবার আসামে যাওয়া অসম্ভব নহে।

৫। শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে অন্যান্য কিংবদন্তি—রামচরণ ঠাকুর লিখিয়াছেন যে যখন কবিরের মৃতদেহ লইয়া তাঁহার হিন্দু ও মুসলমান শিষ্যদের মধ্যে বিবাদ বাধে তখন শ্রীচৈতন্য আসিয়া ঐ শব কাঁধে করিয়া গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দেন। যথা—

চৈতন্য গোসাই হেন কথা শুনিলন্ত।
শীঘ্র বেগ করি তেঁহো খেদি আসিলন্ত॥
কবিরর শব তুলি কান্ধত লইলন্ত।
চৈতন্য গোসাই তাঙ্ক ভাসালা গঙ্গাত॥
যবনর রাজা সুরথান মহামতি।[১]
শুনিলন্ত হেন বিটো কথাক সম্প্রতি॥
চৈতন্যক নিয়া পাছে সুধিলন্ত কথা।
কবিরর শব কিক বইলা তুমি তথা॥
হেন শুনি বুলিলে চৈতন্য মহাবীর।
কিছু ভাগবত কথা শুনায় মহাধীর॥
ব্রাহ্মণ ক্ষেত্রিয় আমি নহোঁ চারি জাতি।
দশো দিশে গৈল দেখা আমার খিয়াতি॥
চারিয়ো আশ্রমি দেখা নুথি কোহোঁ আমি।
নোহো ধর্ম্মশীল দান ব্রত তীর্থ গামি॥
দৈবকীর পুত্র যিটো গোপী ভর্ত্তা স্বামী।
তাহার দাসর দাস দাস ভৈলোঁ আমি॥[২]
শাস্ত্রমত দেখাই নৃপতির আগে কৈলা।
অনন্তরে আপুনার ঘরে চলি গৈলা॥
[৩২৪৪—৪৮ পদ]

১ সুরথান = সুলতান।

২ উদ্ধৃত অংশ নিম্নলিখিত সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদ—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নো বা বর্ণী ন চ গৃহপতি র্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিল-পরমানন্দ পূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপী ভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাস-দাসানুদাসঃ॥
(পদ্যাবলী ১৪)।

এই শ্লোকটী পদ্যাবলীর ইণ্ডিয়া আফিসের পুথিতে, এসিয়াটিক সোসাইটীতে রক্ষিত দুইখানি পুথি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৫২৮ সংখ্যক পুথিতে শ্রীচৈতন্যের রচনা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ডাঃ সুশীলকুমার দে মহাশয় উহার রচয়িতা অজ্ঞাত বলিয়াছেন (ডাঃ দে পদ্যাবলী, ৭৪ সংখ্যক শ্লোক ও তাহার পাদটীকা)। জয়ানন্দ

কবির ১৫১৮ খৃষ্টাব্দে পরলোকে গমন করেন বলিয়া কথিত হয়। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের বিবরণ (২।১৬।২৭৯ ও ২।১৭।২) বিশ্বাস করিলে বলিতে হয় যে, শ্রীচৈতন্য তাঁহার সন্ন্যাসের ষষ্ঠ বর্ষে অর্থাৎ ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে শরৎকালে বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করেন ও ১৫১৬ খৃষ্টাব্দের ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে কাশীতে ছিলেন। ১৫১৫ ও ১৫১৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ব্যবধান বেশী নহে। চরিতামৃতের বিবরণ অথবা কবিরের মৃত্যুর তারিখ নির্দ্দেশে দুই এক বৎসর এদিক ওদিক হওয়া বিচিত্র নহে। সুতরাং কাল হিসাবে এঘটনা ঘটা অসম্ভব নহে।

শ্রীচৈতন্যের কাশী ভ্রমণের তারিখের সহিত কবিরের মৃত্যুর তারিখ ও শ্রীচৈতন্যের সুপ্রসিদ্ধ একটি উক্তির সহিত রামচরণ ঠাকুর বর্ণিত শ্রীচৈতন্যের কথার মিল পাওয়া যাইতেছে। রামচরণ ঠাকুর ঘটনাটীকে সত্য প্রমাণ করার জন্য বলিয়াছেন—

মাধব দেবর মুখে যিমত শুনিলোঁ।
তান বাক্য পালি মই তেহুয় লিখিলোঁ॥
(৩২৬৩ পদ)।

রামচরণ ঠাকুরের শঙ্কর চরিত হইতে সেকালের ভ্রমণ বৃত্তান্ত সম্বন্ধে একটী প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায়। গয়া হইতে দশ দিন হাঁটিয়া শঙ্কর গঙ্গাতীরে পৌছিয়াছিলেন, গঙ্গাতীর হইতে একুশ দিনে শ্রীক্ষেত্রে গিয়াছিলেন (১৮৩১ পদ)। ইহা হইতে শ্রীচৈতন্যের গমনাগমনে কতদিন লাগিয়াছিল তাহার একটা ধারণা করা যাইতে পারে।

উক্ত লেখক রূপ সনাতন সম্বন্ধে কয়েকটী নূতন কথা বলিয়াছেন। শঙ্কর যখন প্রথমবার তীর্থ-ভ্রমণে যান, তখন শ্রীক্ষেত্র হইতে আড়াই মাস

(৮৫ পৃঃ) উহা শ্রীচৈতন্য কর্তৃক কথিত বলিয়াছেন। প্রাচীন অসমীয়া গ্রন্থেও উহা শ্রীচৈতন্যের উক্তি বলিয়া পাওয়া যাইতেছে। সেই জন্য এটীকে কৃষ্ণদাস কবিরাজ শিক্ষাষ্টকের মধ্যে না ধরিলেও শ্রীচৈতন্যের রচনা বলিয়া অনুমান করি।

চলার পর তাঁহার সহিত রূপ সনাতনের দেখা হইয়াছিল। সে সময়ে দুই ভাইয়ের হাতে মন্দিরা (বাদ্যযন্ত্র) ছিল। শঙ্কর বলিতেছেন—

তোরা দুই ভাই আইলা কিবানই
হাতত মন্দিরা আছে।
কিবা ধর্ম্ম তোরা সকলে আচরা
কৈয়ো মোক সাঁছে সাঁছে॥
রূপ বোলে চাই কি কৈবো গোসাঞি
তুমি জগতর নাথ।
ছদ্মরূপ ধরি আসিছা শ্রীহরি
নো করা মোক অনাথ॥
রামচরণ ঠাকুর ১৯২১ পদ।

শঙ্করের সহিত সাক্ষাৎকারের বলেই দুই ভাই সংসার ত্যাগ করেন। যথা—

প্রভাততে পাছে লরিল শঙ্কর
দুই ভায়ো এড়িলা ঘর।
রূপের যে ভার্য্যা পরমা সুন্দরী
করন্ত বহু কাতর॥ ১৯২৫ পদ।

শঙ্কর কৃপা করিয়া রূপের ভার্য্যাকেও সঙ্গে লইলেন। তিনি বলিলেন—

আনা এহি কন্যা এন্তে মহাধন্যা
শান্তি মাঝে অগ্রগণী।
বঙ্গ হুয়া চাই আসিবে দু ভাই
মাতিলন্ত তেন শুনি॥
আসোক বুলিয়া তান নিজ জায়া
পাছে লগ করি নিলা।
পরম কৌতুকে শ্রীমন্ত শঙ্কর
উত্তম তীর্থ দেখিলা॥
১৯২৭-২৮ পদ।

শঙ্করের সঙ্গে রূপ সনাতন সীতা-কুণ্ডে গিয়াছিলেন। কয়েকটী তীর্থ ভ্রমণের পর শঙ্কর-দেব রূপ সনাতনকে বিদায় দেন। যথা—

বিদায় করিয়া রূপ সনাতন গৈল।
শঙ্করর চরণর ধূলা মূচি লইল॥ ১৯৫৫ পদ।

ভূষণ দ্বিজ কবি যে ভাবে রূপ সনাতনের প্রসঙ্গ লিখিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় না যে শঙ্কর তাঁহাদিগকে কৃপা করিয়াছিলেন। ভূষণ বলেন যে, আলিনগরে এক সন্ন্যাসী শঙ্করকে রূপ সনাতনের কথা বলিয়াছিলেন। যথা—

দুইকো দুই আপুনার নাম কহিলন্ত।
সন্ন্যাসী বোলন্ত মোর শুনিও বৃত্তান্ত॥
আছা রূপ সনাতন পরম ভকত।
বৈরাগ্য তেজিলা রাজ্য ভোগ আছে যত॥
বৃন্দাবনে আনন্দে আছন্ত দুই ভাই।
হাতত মন্দিরা কৃষ্ণ লীলা গুণ গাই॥
কেবল ভক্তির ভাগ কহিলত যুগতি।
অনন্তরে শঙ্করে পুছিলা তাঙ্ক মতি॥

৫৬১-৬৩।

রূপ ও সনাতন তাঁহাদের গ্রন্থাদিতে শ্রীচৈতন্যকে বন্দনা করিয়াছেন। শঙ্করের কথা কোথাও স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। শ্রীরূপের বিদগ্ধ-মাধব নাটকের প্রস্তাবনায় সূত্রধার বলিতেছেন-- "অদ্যাহং স্বপ্নান্তরে সমাদিষ্টোঽস্মি ভক্তাবতারেণ ভগবতা শ্রীশঙ্করদেবেন।"

ভক্তাবতার ভগবান্ শঙ্করদেব স্বপ্নে আদেশ দিয়াছেন যে, মুকুন্দের লীলাকাহিনী বর্ণনা করিয়া বিভিন্ন দেশ হইতে সমাগত ভক্তদের প্রাণ রক্ষা কর। "ভক্তাবতার শঙ্করদেব" বাক্য দেখিয়া মনে হয়, এখানে আসামের মহাপুরুষ শঙ্করদেবকেই বুঝি লক্ষ্য করা হইয়াছে। কিন্তু টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্তী উদ্ধৃত অংশের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, শ্রীশঙ্করদেবেনেতি ব্রহ্মকুণ্ড তীরবর্ত্তিনা গোপীশ্বর নাম্না"। বিদগ্ধ-মাধবে মাধুর্য্য রস ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে; শঙ্করদেব জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তির উপদেষ্টা, দাস্য ভক্তির উপাসক; তিনি যে এইরূপ নাটক লিখিতে আদেশ দিবেন, সে সম্ভাবনা অল্প।

রামচরণ ঠাকুর ও ভূষণ শ্রীবৃন্দাবনধামবাসী এক বৃন্দাবন দাসের নাম করিয়াছেন। শঙ্কর মাধবকে বৃন্দাবন যাইতে বলিয়া বলিতেছেন—

বৃন্দাবন দাস আছে তাহাক দেখিবা।
হুইমুই মোর কথা প্রমাণ করিবা॥
কেবল ভক্তির ভাগ কহিয়াছো আমি।
হোবে নহে তাক গৈয়া সুধি চাইয়া তুমি॥

(রামচরণ ২১৩৮ পদ)।

ভূষণ বলেন—

আসা একে লগে সবে যাত্রা বৃন্দাবন।
আছা বৃন্দাবন দাস হৈবো দরিশন॥
যি সব ভক্তির ভাব করিবোঁবেকত।
হুই মুই পুছি তান্তে লৈবোঁহো সম্মত॥

(ভূষণ ৫৭৩ ৪)।

এই বৃন্দাবন দাস শঙ্করের অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ও বৃন্দাবনবাসী, সুতরাং ইনি শ্রীচৈতন্য ভাগবতের লেখক হইতে পারেন না। ঈশ্বর দাসের চৈতন্য ভাগবতে আছে যে, শ্রীচৈতন্যের পুরী যাওয়ার পরেই এক বৃন্দাবন দাস হস্তীকে হরিনাম দিবার জন্য মত্ত বলরামকে অনুরোধ করিয়াছিলেন (৪৭ অধ্যায়)। সম্ভবতঃ শ্রীচৈতন্যের পরিকর-গণের মধ্যে শ্রীচৈতন্য ভাগবতের লেখক ছাড়া অন্য এক বৃন্দাবন দাস ছিলেন।

সঙ্গীতে পরিবর্ত্তন

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি-এল্

একজন পণ্ডিত সঙ্গীতকে যাবতীয় কলাবিদ্যার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলে আবার সর্ব্বাপেক্ষা নূতন বলেছেন। তার মানে বুঝতে গিয়ে যদি কেউ মনে করেন সঙ্গীত প্রাচীনকালে যেমন আনন্দ দিয়েছিল, এখনো তেমনি দিচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও দিবে; কাজেই তাকে আমরা চিরনূতন ছাড়া আর কি বলব?—তা হলে অবশ্য আমাদের বলবার কিছু নেই, কিন্তু আসল কথাটা হচ্ছে পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিত সঙ্গীতের যে দিকটা লক্ষ্য করে তাকে সর্ব্বাপেক্ষা নূতন কলাবিদ্যা বলেছেন, সে দিকটা হচ্ছে সঙ্গীতের চির পরিবর্ত্তনশীলতা।

কথাটা অবশ্য পাশ্চাত্য সঙ্গীত সম্বন্ধেই বলা হয়েছিল, কারণ পণ্ডিতটী ছিলেন নিজে ইউরোপীয় এবং সঙ্গীত বলতে ইউরোপে শুধু পাশ্চাত্য সঙ্গীতকেই বুঝায়। কিন্তু ভারতীয় সঙ্গীতে যদি এই পণ্ডিতের জ্ঞান থাকত, তবে তিনি স্পষ্টই দেখতে পেতেন যে তাঁর উক্তি ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধেও সমান ভাবে প্রযোজ্য। শুধু ইউরোপ বা ভারত বলে নয়, যে কোন দেশেই সঙ্গীতের অনুশীলন বজায় আছে, সেই দেশেই সঙ্গীত ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত হচ্ছে;—তফাৎ এই কোন যুগে হয়ত কোন দেশে পরিবর্ত্তনগুলি ছোটখাট রকমের হচ্ছে আবার অন্য দেশে সেই সময়েই গুরুতর পরিবর্ত্তন সাধিত হচ্ছে। যাদের সভ্যতা, সামাজিক রীতিনীতি এবং রুচির মধ্যে বহুকাল যাবৎ কোন পরিবর্ত্তন ঘটেনি, তাদের সঙ্গীতও বহুকাল এক ভাবেই আছে এতে সন্দেহ নেই; কিন্তু সে সঙ্গীতকে সঙ্গীতকলার পর্য্যায়ভুক্ত করা ঠিক হবে কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।

পরিবর্ত্তনের ফলে সব সময়েই সঙ্গীতের উন্নতি সাধিত হয় কি অবনতি ঘটে, তা নিয়ে আমি বিচার করতে চাইনা। তবে একথা আমি অকুণ্ঠভাবে বলতে পারি যে পরিবর্ত্তনের বলেই সঙ্গীত বেঁচে থাকে। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে সঙ্গীতকে দু'রকম বলা হয়েছে,—এক, মার্গী-সঙ্গীত এবং অপর, দেশী সঙ্গীত।

· · · · ····· · তত্র মার্গঃ স উচ্যতে।
যো মার্গিতো বিরিঞ্চাদ্যৈঃ প্রযুক্তো ভরতাদিভিঃ।
দেবস্য পুরতঃ শম্ভোর্নিয়তাভ্যুদয়প্রদঃ॥
দেশে দেশে জনানাং যদ্‌রুচ্যা হৃদয়রঞ্জকম্।
গানং চ বাদনং নৃত্যং তদ্দেশীত্যভিধীয়তে॥

(সং রত্নাকর)।

মার্গী-সঙ্গীত বাঁধাধরা আইন কানুনের অধীন। তাকে মুক্ত করবার অধিকার কাউকেও দেওয়া হয়নি। বোধ হয় তারই ফলে অপর একজন শাস্ত্রকারকে দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়েছে যে, মার্গী-সঙ্গীত "সাম্প্রতং নৈব গোচরম্" অর্থাৎ তার মৃত্যু হয়েছে। হবারই কথা, কারণ মার্গী-সঙ্গীত যে যুগে লোপ পেয়েছে, সে যুগে ভারতের সামাজিক জীবন যথেষ্ট পরিমাণে সক্রিয় ও সচল ছিল এবং সেই সমাজ স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে শুধু মার্গী-সঙ্গীতের খাতিরে তার অপরিবর্ত্তনীয় আইনের শৃঙ্খলে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখতে রাজী হয়নি। এইভাবে দেশী সঙ্গীতের সৃষ্টি হতে লাগল। দেশী সঙ্গীতে আমরা মার্গী-সঙ্গীতের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ

দেখতে পাই, তাকে শুধু বিশেষ বিশেষ সঙ্গীতকর্ত্তার যথেচ্ছাচার বলে উড়িয়ে দেওয়া চলবে না। সমাজের রুচি এবং অবস্থার দাবীতেই এই বিদ্রোহ ঘোষিত হয়ে থাকে।

যে সব কারণে মার্গী সঙ্গীতকে হঠিয়ে দিয়ে দেশী সঙ্গীত তার আসন দখল করেছিল, সেইসব কারণেই আবার এক যুগের দেশী সঙ্গীতকে দূরে সরিয়ে দিয়ে পরবর্ত্তী যুগের দেশী সঙ্গীত প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। নবপ্রবর্ত্তিত সঙ্গীত কিছুদিন স্থায়ী হবার পরেই তার মধ্যে কিছু প্রাচীনতার ভাব আসে, আর সঙ্গে সঙ্গেই একজন লোক তাকেই মার্গী সঙ্গীত বলে পরিচিত করতে চায়, অন্ততঃ classical musicএর সম্মান দিবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় যদি জাতি এবং সমাজে সজীবতার অভাব না থাকে তবে আবার নূতন দেশী সঙ্গীতের উদ্ভব হয়। এইভাবে যুগে যুগে আমাদের সঙ্গীতে যে সব পরিবর্ত্তন সাধিত হয়েছে তার একটা মোটামুটি ধারণা যদি আমাদের মধ্যে থাকে, তবে আমার মনে হয়, সঙ্গীতের ক্ষেত্রে আজ চারদিকে এই যে বিবাদ বিসংবাদ চলছে তা অনেক পরিমাণে দূর হবে। এই উদ্দেশ্যে আজ আমি কয়েকটা কথা আপনাদের সামনে উপস্থিত করছি; আপনাদের মধ্যে অনেকেরই হয়ত এই সব কথা জানা আছে, তা'হলেও আমি আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি :—

১। একটু আগেই মার্গী সঙ্গীতের প্রয়োগ কর্ত্তা বলে যে ভরতের উল্লেখ করা হয়েছে, নাট্যশাস্ত্রকার ভরত আর তিনি একই ব্যক্তি কি না তা আমি জানি না। তবে নাট্যশাস্ত্রে আমরা সঙ্গীতের যে বিবরণ পাই তাতে 'রাগ' বা 'রাগিণী' কথার কোন নাম গন্ধই নেই; অথচ আমরা জানি ভারতীয় সঙ্গীত রাগমূলক।

২। ভরতের পরে অনেক শতাব্দী অতীত হয়ে যাবার পর সঙ্গীত-রত্নাকর লিখিত হয়, বোধ হয় দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। এই গ্রন্থে আমরা 'রাগ' কথাটী পাই, কিন্তু 'রাগিণী' বলে কোন কিছু পাওয়া যায় না। রত্নাকরকর্ত্তা শার্ঙ্গদেবের পূর্ব্বে আরো অনেক শাস্ত্রকার সঙ্গীতের গ্রন্থ লিখে গেছেন, রত্নাকরেই তাঁদের অনেকের নাম রয়েছে এবং শার্ঙ্গদেব নিজেই লিখেছেন, তাঁর পূর্ব্বাচার্য্যদের গ্রন্থের সারাংশ অবলম্বন করে তিনি তাঁর সঙ্গীত রত্নাকর রচনা করেছেন। তিনি পূর্ব্বাচার্য্যদের রচনায় রাগিণী কথার উল্লেখ পেলে নিশ্চয়ই নিজের গ্রন্থেও লিখে রাখতেন। কিন্তু তা যখন করেন নি তখন আমরা ধরে নিতে পারি, 'রাগ' ও 'রাগিণী' হিসাবে রাগের বিভাগ শার্ঙ্গদেবের আমলের পরে হয়েছিল।

৩। মধ্যযুগের আগেকার কোন গ্রন্থে রাগ রাগিণীর ধ্যান ও রূপবর্ণনা এবং তদনুযায়ী চিত্ররচনার কথা আমরা পাই না। অথচ অন্ধভাবে অনেকে এগুলিকে অতি প্রাচীন বলে মনে করেন। মধ্যযুগের সঙ্গীতশাস্ত্রীরা যথেষ্ট পরিমাণে কল্পনার আশ্রয় নিয়েছিলেন, আর তার ফলে রাগ রাগিণী, পুত্ররাগ পুত্রবধূরাগিণী ইত্যাদি ক্রমে রাগের বিভাগ সাধিত হয়েছিল; কিন্তু একজনের বা একযুগের কল্পনা সকলের দ্বারা এবং সবযুগে মেনে নেওয়া হয় নি; এই জন্যই আমরা দেখতে পাই একমতে যা রাগ অপরের মতে তা-ই রাগিণী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৪। 'রাগিণীর' সঙ্গে তুলনায় 'রাগে' গাম্ভীর্য্য বেশী। রাগের আরোহণ অবরোহণ অপেক্ষাকৃত সরল এবং তাতে স্বরের সূক্ষ্ম এবং আলংকারিক প্রয়োগও অনেক কম। কোন বিশেষ রাগে একযুগে হয়ত রাগের রাগত্বব্যঞ্জক এই সব নিয়ম রক্ষা করা হয়েছিল বলে তার 'রাগ' নাম সার্থক হয়েছিল, কিন্তু পরবর্ত্তী আমলে আবার হয়ত সেই নিয়ম ভঙ্গ করার দরুণ সেটী রাগিণীতে পরিণত হয়ে গেল। পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের বৈশিষ্ট্য রক্ষার পক্ষে

একদল উৎসাহী লোকের চেষ্টা উপেক্ষা করে পরবর্ত্তী যুগে এইভাবে রাগ রাগিণীর রূপে পরিবর্ত্তন সাধনের দৃষ্টান্ত আমাদের সঙ্গীতে এত বেশী যে বোধ হয় আজকালকার প্রচলিত কোন রাগই সে দৃষ্টান্তের বাইরে পড়ে না।

৫। ভিন্ন ভিন্ন যুগে রাগ রাগিণীর রূপে পরিবর্ত্তন ঘটবার ফলে সেই সেই যুগের সঙ্গীত কর্ত্তাদের নামে এক এক মতবাদের সৃষ্টি হয়েছিল। শার্ঙ্গদেবের পূর্ব্বে নানা সময়ে অনেকগুলি মতের সৃষ্টি হয়; রত্নাকরে তাদের নাম পাওয়া যায়; রত্নাকরের পরেও আরো অনেক মত প্রচলিত হয়েছে। এইসব মতবাদ শিবমত, ব্রহ্মমত, বিষ্ণুমত, ভরতমত, নারদমত, কল্লিনাথমত, হনুমন্মত ইত্যাদি নামে পরিচিত। 'পরিচিত' অর্থে আমি বলতে চাই না যে আজকালকার কোন সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি এই সব মতের মানে বুঝিয়ে দিতে পারেন। এমন কি অনেকের মতে যে হনুমন্মতের অনুযায়ী সঙ্গীত আজকাল প্রচলিত, সেই মতটাই ব্যাখ্যা করে কেউ বুঝিয়ে দিতে পারেন না। সুতরাং এই সব মত কেবল নামেই পর্য্যবসিত হয়েছে। কোন না কোন সময়ে এই সব মতগুলির কোন না কোনটার নিশ্চয়ই কিছু সার্থকতা ছিল। কিন্তু সে সময়ের সঙ্গীত এখন নেই, কাজেই সেই সময়ের মতের কোন মূল্যও এখনকার সঙ্গীতে নেই।

৬। বেশী প্রাচীনকালের কথা ছেড়ে দিয়ে গত দুই এক শতাব্দীর কথা ধরুন। দু'শ বছর আগে একখানা সঙ্গীতগ্রন্থ রচিত হয়, তার নাম 'তোফেতুল হিন্দ'; আর এখন থেকে মাত্র একশ' বছর আগে আর একখানা গ্রন্থ লিখিত হয়, তার নাম 'নগমাতে আসফি'। এই উভয় গ্রন্থেরই লিখিত বিষয় পণ্ডিত ভাতখণ্ডে তাঁর "হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতিতে" উল্লেখ করেছেন; তাতে আমরা দেখতে পাই 'নগমাতে আসফি', 'তোফেতুলহিন্দের' যাবতীয় উক্তি ভুল বলে প্রমাণ করেছে। আসল কথা এক শতাব্দীর মধ্যেই আমাদের সঙ্গীতে এত অদল বদল হয়ে গিয়েছিল যে এই দুই সময়ের দুই গ্রন্থে কোন মিল দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু মজার ব্যাপার এই, যে যার নিজের আমলে প্রচলিত তথাকথিত প্রাচীন সঙ্গীতকে বহুকালের প্রাচীন এবং শুদ্ধ নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীত বলে মনে করেছেন; 'নগমাতের' লেখক কল্পনাই করতে পারেন নি যে একশ' বছরে এমন পরিবর্ত্তন ঘটতে পারে।

৭। কেবল রাগের রূপই যে পরিবর্ত্তিত হয়েছে, তা' নয়, গীত রীতিও সব যুগে এক রকম থাকে নি। আজ যে সব রীতিকে আমরা অতি প্রাচীন বলে মনে করছি সেগুলিও ভারতীয় সঙ্গীতের সুদীর্ঘ ইতিহাসে অতি আধুনিক। ধ্রুপদ খেয়াল ইত্যাদি মুসলমান আমলের আগে ছিল না। সঙ্গীত রত্নাকরে যে সব গীত রীতির নাম পাই যথা —শুদ্ধা, ভিন্না, বেসরা, সাধারণী ইত্যাদি, তাদের নামগন্ধও এখনকার সঙ্গীতে নেই।

৮। মুসলমান প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সঙ্গীতে, বিশেষতঃ উত্তর ভারতের সঙ্গীতে গুরুতর পরিবর্ত্তন সাধিত হয়েছে। দক্ষিণী সঙ্গীতে সে প্রভাব ততটা অনুভূত হয় নি। গত তিন চার শতাব্দীর মধ্যে দক্ষিণী সঙ্গীতে বিশেষ কোন অদল বদল হয় নি, এই কথার সঙ্গে যদি আমরা স্মরণ রাখি যে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের একখানি চার পাঁচ শতাব্দী পূর্ব্বেকার রচিত গ্রন্থে দক্ষিণী সঙ্গীতের অনুরূপ শাস্ত্রব্যবস্থা দেখতে পাওয়া যায়, তবে এ কথা অনুমান করা অন্যায় হবে না যে সে যুগে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে প্রায় এক ধরণের সঙ্গীতই প্রচলিত ছিল এবং সেই সঙ্গীতের কতকটা রূপ আমরা এখনকার দক্ষিণী সঙ্গীতে দেখতে পাচ্ছি। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সেই শাস্ত্রগ্রন্থের নাম রাগতরঙ্গিনী। তরঙ্গিনীর বর্ণিত শ্রীরাগ আর

মাদ্রাজ অঞ্চলেব বর্ত্তমানে প্রচলিত শ্রীরাগ একই এবং সে শ্রীরাগ হচ্ছে আমাদের এখনকাব হিন্দুস্থানী পদ্ধতি অনুসারে কাফি ঠাটের বাগ। বাগ বাগিণী, এবং তাদেব শ্রেণী বিভাগ ছাড়া গাত বীতিও মুসলমান প্রভাবে আজ উত্তব ও দক্ষিণ ভাবতে অনেক তফাৎ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই সব কথাব পব যদি কোন প্রাচীন শিল্পেব ভক্ত সত্যই বুঝতে পাবেন যে আমাদেব বর্ত্তমান হিন্দুস্থানী বীতি অপেক্ষা দাক্ষিণাত্যেব বীতিগুলিই বেশী প্রাচীন এবং সঙ্গীত-শাস্ত্র অনুসাবে অধিকতব শুদ্ধ, তবে তিনি হিন্দুস্থানী চালেব গান ছেড়ে দক্ষিণী চাল ধবতেন কি? আমাব ত ভবসা হয় না। কাবণ এ পর্য্যন্ত কোন উত্তব ভাবতীয়কেই দক্ষিণী চাল শুনে মুগ্ধ হতে দেখিনি; আশ্চর্য্যান্বিত হয়েছেন অনেকেই দক্ষিণী ওস্তাদদেব ক্ষিপ্রতায় এবং স্বব বচনায়।

প্রচলিত রীতি ত্যাগ কববাব বিরুদ্ধে আমবা যে মনোবৃত্তির পবিচয় পাই তাব মূলে অনেক সময়েই প্রাচীনেব প্রতি নিষ্ঠা নয়—যে ভাবটা মজ্জাগত হযে গেছে সেটা মানুষ সহজে ছাড়তে চায় না, এমন কি অনেক সময় ছাড়াটা যুক্তিসঙ্গত মনে হলেও। প্রচলিত বীতিকে ধবে থাকবাব এইটাই আসল কাবণ। কিন্তু যুক্তিহীন সংস্কাব যতই মজ্জাগত হউক, পরিবর্ত্তনেব স্রোতের মুখে সে প্রায়ই টিকতে পাবে না; আব এই কারণেই অন্যান্য বিষয়েব মত আমাদের সঙ্গীতেও বিভিন্ন যুগে এত নানাবকমের পবিবর্ত্তন, এত নানারকমেব সৃষ্টি সম্ভবপব হযেছে।

বর্ত্তমান যুগেও আমাদেব সঙ্গীতে এই বকম পবিবর্ত্তন আসছে, ভবিষ্যতেও আসবে। এব গতিবোধের চেষ্টা কবে কোন লাভ নেই ত বটেই, তা ছাড়া এ বকমেব চেষ্টার কোন সার্থকতাও নেই। যিনি পবিবর্ত্তন বা নূতন সৃষ্টির পথে বাধা জন্মাতে চান, দেখতে হবে তিনি যে জিনিষটা বক্ষা কবতে চান সেটি কি। তিনি যদি দেখতে পান, পবিবর্ত্তন বন্ধ না হলে আমাদেব সঙ্গীতের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং মূল নীতি নষ্ট হয়ে যাবে তবে তাঁর চেষ্টা সার্থক। কিন্তু শুধু একটা বিশেষ চাল বা ঢঙ্‌ একটা বিশেষ বাগরূপ বা ঐ ধবণের কোন কিছুব পক্ষ হয়ে লড়াই কবার মধ্যে আমি কোন সার্থকতা দেখতে পাই না; কারণ এগুলিও কোন গত যুগেব পবিবর্ত্তনের ফলেই এসেছিল এবং তখন এদেবই গতিরোধেব জন্য তখনকাব তথাকথিত প্রাচীনপন্থীবা চেষ্টা ক'বে বিফল হয়েছিলেন।*

* অল ইণ্ডিয়া কাল্‌চারেল ইউনিটি কনফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশনে পঠিত।

বেলুড়ের নূতন মন্দির দেখিয়া

শ্রীরামেন্দু দত্ত

স্বামীব স্বপ মূরতি ধ'বেছে, জাগোবে নিদ্রাতুব—
বেলুড়ের বাণী ভাবত পাবায়ে গিয়েছে অনেক দূব!
কল-কোলাহল-হলাহলে ভবা সহর সৌধ হ'তে
ধুয়ে যায় মলা শান্ত মূরতি পূত ভাগীবথী স্রোতে—
হেথায় সমীর নহেক অধীর উগ্র গন্ধে গানে
দুঃখ-তাপিত হৃদয় ছুঁইয়া শীতল করিয়া আনে
শ্বেত মর্ম্মব বেদীর উপর যোগাসনে সমাসীন—
পাষাণ মূরতি পরমহংস পবমব্রহ্মে লীন!

পতঞ্জলি ও কৈবল্য

স্বামী বাসুদেবানন্দ

অতীত ও অনাগত বাসনা, সংস্কার, ক্রিয়া, ফল ও ভোগরূপ পদার্থ স্বরূপতঃ বিদ্যমানই থাকে। ধর্ম্মের অধ্বাভেদ হেতু কাল ব্যবধানে মনে হয় যেন তারা নেই। দ্রব্যের লাক্ষণিক বা কালিক পরিণামের অধ্বাভেদ তিনটি—(১) অনাগত—যা ভবিষ্যৎ অভিব্যক্তিক, (২) অতীত—যে অভিব্যক্তিক দ্রব্য অনুভূত হয়ে গ্যাছে, এবং (৩) বর্ত্তমান—হচ্চে ব্যাপার উপারূঢ় অর্থাৎ যা অনুভূত হচ্চে। এই ত্রিবিধ পরিণামী বিষয়ই আমাদের জ্ঞানের বিষয়। যদি তারা নির্ব্বিষয় হতো তা হলে তারা জ্ঞানারূঢ় হতো না। অসতের জ্ঞান হয় না। অতএব অতীত ও অনাগত বর্ত্তমানকে আশ্রয় করে থাকে।

কিন্তু বেদান্তীরা একটা প্রশ্ন করে থাকেন—অধিকরণহীন ভ্রান্তি জ্ঞানারূঢ় হয় না বটে, কিন্তু সর্পেতে রজ্জু-ভ্রান্তি জ্ঞানারূঢ় হয় কি না? ভ্রান্তি শব্দের অর্থজ্ঞান যখন আমাদের আছে তখন নিশ্চিত ভ্রান্তি জ্ঞানারূঢ় হয়, কিন্তু কিসের জ্ঞান হয় না একটা মিথ্যা জ্ঞানের। সেই জন্য ভ্রান্তি জিনিষটা সৎ না অসৎ কিছুই বোঝবার জো নেই।

পরিণামবাদীরা বলেন, 'ভাব পদার্থ তিন প্রকার—(১) দ্রব্য, ক্রিয়া ও শক্তি।' ক্রিয়াদ্বারাই দ্রব্য পরিণাম প্রাপ্ত হয়, অতএব ক্রিয়া পরিণামের নিমিত্ত। ক্রিয়ার অব্যক্তাবস্থা হচ্চে শক্তি, সেই জন্য এ হলো দ্রব্যের নৈমিত্তিক। শক্তি অবস্থা থেকে বিকশিত হয়ে পুনরায় সেই শক্তি অবস্থায় যাওয়ার নাম পরিণামের নিমিত্ত ক্রিয়া। পরিণাম যদি ক্রিয়া হয় এবং তার নৈমিত্তিক যদি শক্তি হয়, তা হলে স্থির দ্রব্য বলে ত কিছু নেই। না—নেই। চন্দ্রালোক নদী বক্ষে মূর্চ্ছিত হয়ে রয়েচে—বোধ হচ্চে যেন সেটা একটা স্থির সত্তা, কিন্তু সেটাও নিরন্তর ক্রিয়া। কঠিন তরল, গুরু প্রভৃতি যা কিছু স্থির সত্তা বলে আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয়, ক্ষণিক পরিণামের জ্ঞান হলে, তার নিরন্তর অধ্বাভেদগুলি বেশ বোঝা যায়। বাস্তবিক আমরা যাকে স্থির বলি, তা মাত্র অলাতচক্রবৎ—অসংখ্য ক্ষণিক ক্রিয়ার সমাহার বা সমষ্টি। শক্তিভাব তমঃ, তা থেকে ক্রিয়ার আরম্ভ রজঃ, বহুক্ষণব্যাপী সদৃশ ক্রিয়া হেতু, জ্ঞানারূঢাবস্থা বা প্রকাশ ভাব স্থিতি বা সত্ত্ব, পুনরায় শক্তিভাব প্রাপ্তি তমঃ—এ প্রবাহে জগৎ চলচে। মৃত্তিকায় ঘটজননশক্তি বা ঘটত্ব নামক যোগ্যতাবচ্ছিন্ন সংস্কার রয়েচে, কুম্ভকার কেবল তাকে স্বীয় ইচ্ছা শক্তি এবং ঘটস্মৃতির দ্বারা জ্ঞানারূঢ় বা প্রকাশ ভাব করে দেয়। একটা বিষয় মনে করতে হয়ত দেরী হতে পারে, কিন্তু যেক্ষণে স্মরণ হয়, সেইক্ষণেই তা বোধারূঢ় হয়। একজন রূপকার একখানি চিত্র আঁকতে হয়ত অনেক দেরী করে, অপরে হয়ত খুব শীগ্‌গির তা প্রস্তুত করতে পারে—তার কারণ একজনের স্মৃতির দেশকালাদির আবরণ বা প্রত্যক্ষকালে অমনোযোগ খুব অধিক, অপরের খুব কম। যে কুম্ভকারের ঘটস্মৃতি অভ্যাসের দ্বারা যত শুদ্ধ বা অস্পষ্টতাহীন, সে তত ঘট নির্ম্মাণে পটু। যাঁর স্মৃতি সমাধিশুদ্ধ, তিনি ক্ষণমাত্র কারণে কার্য্যকে দর্শন করে অভিব্যক্তি দিতে পারেন। Old Testament ঠিকই বলেচেন, "And God said, let there be light and there was light."

ত্রিগুণাত্মক সেই অধ্বাত্রয় অর্থাৎ ত্রিকালাবচ্ছিন্ন ধর্ম্ম—ব্যক্ত বা স্থূল এবং সূক্ষ্ম বা অলক্ষ্য।

সূক্ষ্মধর্ম্ম ছয় প্রকার—পঞ্চতন্মাত্র ও অস্মিতা। পরমার্থতঃ এরাও ত্রিগুণস্বরূপ। ব্যাস একটি শাস্ত্রানুশাসন বলছেন, "গুণানাং পরমং রূপং ন দৃষ্টি পথমৃচ্ছতি। যত্তু দৃষ্টিপথং প্রাপ্তং তন্মায়েব সুতুচ্ছকম্॥"—গুণের যে পরমরূপ তা দৃশ্য হয় না, যেটুকু দৃশ্য হয় তা মায়ারই ন্যায় তুচ্ছ। এখানে বেদান্তীরা জিজ্ঞাসা করবেন, 'দৃশ্যমান জগৎ যদি মায়ারই ন্যায় তুচ্ছ হয়, তাহলে এই ত্রিগুণাত্মক জগতের স্বরূপ কী? কার্য্য কারণেরই অনুরূপ, তা হলে জগৎ কারণ যে প্রধান, তা কিং স্বরূপ?' আবার জিজ্ঞাসা হতে পারে, 'অস্থিরেতে যে স্থিরের ভান, তা অসৎ, কিন্তু তা জ্ঞানারূঢ় হয় কি করে?' কাজেকাজেই বলতে হয়, 'অচল ভাব আত্মার স্বভাব এবং যা কিছু প্রধান-তন্ত্র সবই ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার ন্যায় তুচ্ছ; যোগাচারী বৌদ্ধেরা জগৎ অসৎ বা "অবস্তু" বলেন, কিন্তু অদ্বৈত বেদান্তীরা মায়াকেও "অবস্তু" বলেন না, তাঁরা বলেন, "সদসদ্‌ভ্যাম্ অনির্ব্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানবিরোধি-ভাবরূপং যৎকিঞ্চিৎ।" এই মায়া দেবাত্মশক্তি। এই ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্ম অধিকরণে জগদ্রূপ ব্যবহারিক সত্তার প্রকাশ দেন। পারমার্থিক দৃষ্টিতে জগৎ সুতুচ্ছ, কিন্তু তা স্বরূপতঃ অচল ব্রহ্মই।

সবই যদি ত্রিগুণাত্মক হয়, তবে বস্তুতত্ত্ব একরূপে দৃশ্য হয় কেন?—যদিও সর্ব্ববস্তুই ত্রিগুণ-মিশ্রিত তথাপি সেই মিশ্র বস্তু সকলের পৌনঃ-পুনিক সাদৃশ্য পরিণামই বস্তুর একত্বরূপ দৃশ্যের কারণ। "বিশ্ব মনের কল্পনা"—বশিষ্ঠ প্রভৃতি দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদীদের ঐ মতের বিরুদ্ধে পতঞ্জলি স্বীয় মত স্থাপনের চেষ্টা করেছেন "একই বস্তু চিত্তভেদ-হেতু তারা বিভিন্ন পন্থা অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিভিন্ন বলে বোধ হয়।" ব্যাস বলছেন, "বস্তু সমান হলেও, তাতে ধার্ম্মিকের নিকট সুখজ্ঞান হয়, অধার্ম্মিকের নিকট দুঃখজ্ঞান হয়, অবিদ্বানের নিকট তাতে মূঢ়জ্ঞান হয়, সম্যগ্‌দর্শীর নিকট তার স্বরূপজ্ঞান হয়। কাজে কাজেই চিত্তের অনুযায়ী একই বিষয় সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং চিত্ত ও বিষয়ও ভিন্ন।"

দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদীরা বলেন, বিরাট বিশ্ব সমষ্টি-মনের বিক্ষেপ সৃষ্টি বলে প্রত্যেক ব্যষ্টি মনের নিকট তার একটা দিক সমান, কিন্তু প্রতি ব্যষ্টি-মনের উপাধির বৈচিত্র্য হেতু সেই সামান্য বস্তুতে বিশিষ্টভাবের আরোপ হয়। উদাহরণ স্বরূপে বলা যেতে পারে যে আমি যেমন আমার সমস্ত চিত্তবৃত্তির সমষ্টি। আমি এই বিশ্বের সর্ব্ববস্তুকে, সত্য-জ্ঞান আনন্দই হোক বা পরমাণুর সমষ্টিই হোক বা প্রধানই হোক একটা সাম্যভাবে দেখতে পারি, আবার সেটা সত্য বলে জানা সত্ত্বেও বিভিন্ন উপাধিযোগে আমার অন্তঃকরণে ব্যষ্টিরূপে বিভক্ত করে বিভিন্ন প্রেক্ষা-ভঙ্গিতে এই জগৎকারণের পরীক্ষা করতে পারি; এবং ওই বিভিন্ন প্রেক্ষাভঙ্গিকালে, অন্তঃকরণে জগতের একটা সামান্য জ্ঞান থাকলেও তার বিচিত্র উপাধি হেতু জগৎ সম্বন্ধে তাতে বিভিন্ন অন্বীক্ষা (concept) বা অন্বীক্ষাভাস (Pseodo-concept) এসে উপস্থিত হতে পারে। শিশুকাল হতে প্রৌঢ় বয়স পর্য্যন্ত একই মনে আকাশের একটা দিক সামান্য, কিন্তু সেই একই মনের প্রকাশের তারতম্যানুযায়ী আকাশ সম্বন্ধে লোকের বিভিন্ন জ্ঞান হচ্চে। এই সব বেদান্তীরা আরও বলেন, 'দ্রষ্টা ও দৃশ্য যদি দুটো পৃথক পদার্থ ধরা যায়, তাহলে পরস্পর সাবয়বত্ব প্রযুক্ত উভয়ই ঘটবৎ পদার্থের ন্যায় নশ্বর হয়ে পড়ে। কিন্তু দ্রষ্টা বা পুরুষ তো ঘটবৎ হতে পারেন না।'

পতঞ্জলি চিত্ত ও বিষয় দুটো পৃথক সত্তা দেখাবার জন্য আরও একটা সূত্রে (৪।১৬) বলছেন, "বস্তু এক চিত্তের অধীন নয়, তা যদি হয়, তা হলে লোকটা যখন অন্ধ হয়ে গেল, তখন বস্তুর রূপ সকলের নিকট আত্যন্তিকভাবে লোপ পায় না। তা যখন পায় না, অন্য চিত্তের কাছে উপলব্ধ

হয়, তখন বুঝতে হবে চিত্ত ও বিষয় পৃথক।" পক্ষান্তরে দৃষ্টি-সৃষ্টি-বাদীরা বলেন, 'কোনও না কোনও মন ছাড়া যখন দৃশ্য থাকে না, তখন মন ছাড়া দৃশ্যের পৃথক সত্তা নেই, দৃশ্য সমষ্টি-মন হিরণ্যগর্ভের বিক্ষেপ।' কিন্তু কেন বস্তু, জ্ঞাত বা অজ্ঞাত বলে বোধ হয় সে সম্বন্ধে পতঞ্জলি বলচেন, "বাহ্য বিষয় যদি ইন্দ্রিয় দিয়ে গিয়ে চিত্তকে উপরঞ্জিত না করে, তা হলে বস্তুর জ্ঞান হয় না, যদি উপরঞ্জিত করে তবেই জ্ঞান হয়।" ব্যাস বলেন, "অয়স্কান্ত মণি বা চুম্বক যেমন লৌহকে, তার উপাদান পরমাণুতে একটা বিশিষ্ট কম্পন সৃষ্টি কোরে পরিণমিত করবার পর আকর্ষণ করে।" ঠিক বিষয়ও নিজের তন্মাত্র প্রবাহ ইন্দ্রিয়ের ভেতর দিয়ে চালিত করে অন্তঃকরণে একটা বিশিষ্ট বেদনরূপ পরিণাম সৃষ্টি কোরে তাকে নিজেদের দিকে আকর্ষণ করে। তখন চিত্ত যে বিষয়ে উপরক্ত সে বিষয়ের জ্ঞান হয়, বাকি অজ্ঞাত থাকে। যাঁরা বলেন, 'চিত্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে বেরিয়ে এসে বিষয়ে বৃত্তিলাভ করে'—তার মানে এ নয় যে চিত্তটা একেবারে দেহের বাইরে এসে বিষয়ে অবস্থান করে—এর অর্থ, চিত্তের বহির্বিষয়ক বৃত্তি বা উপরক্তি হয়। এথেকে এটাও বেশ বোঝা যায় যে চিত্তের পরিণাম হয়।

চিত্তের যিনি প্রভু অর্থাৎ পুরুষ তাঁর অপরিণামত্ব হেতুই, তাঁর সম্বন্ধীয় যে চিত্তবৃত্তি সকল তা সর্ব্বদাই জ্ঞাত। চিত্ত পরিণামী বলে, কেবল বর্ত্তমান ক্ষণাবচ্ছিন্ন বৃত্তিগুলিই জ্ঞাত হয়, আর অতীত ও অনাগত বৃত্তিগুলি অজ্ঞাত থাকে, কারণ চিত্ত সেগুলিতে উপরক্ত থাকে না। কিন্তু পুরুষ জ্ঞানস্বরূপ, এই জ্ঞান সর্ব্বদা একটা পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয়ে অহংএর সৃষ্টি করচে, প্রত্যেক বুদ্ধ্যারূঢ় বৃত্তির মূলে এই অহংজ্ঞান এবং এই অহংএর বিষয় যে নাহং তাও জ্ঞান সাপেক্ষ; কাজেকাজেই বুদ্ধির অহং এবং নাহং উভয় বৃত্তির মূলে জ্ঞান সদা বর্ত্তমান অর্থাৎ নিত্য। পরিণামী বৃত্তিগুলি যেন এই নিত্য জ্ঞানের উপাধি। কাজেকাজেই জ্ঞানস্বরূপ পুরুষ সদা জ্ঞাতা। অতঃপর তিনি যদি সদা জ্ঞাতা হন, তা হলে নিশ্চয়ই অপরিণামী। যদি তিনি পরিণামী হতেন তা হলে তাঁর নিশ্চিত অতীত, বর্ত্তমান এবং অনাগত অদ্ধা (কালিক পরিণামের স্তরত্রয়) থাকত এবং অতীত ও অনাগত অবস্থায় তাঁর স্ব স্ব রূপের উপলব্ধি হোত না। কিন্তু এরূপ কখনও হতে পারে না, সুষুপ্তিতেও একটা সুখের জ্ঞান থাকে। কাজেকাজেই জ্ঞানস্বরূপ পুরুষ অতীত ও অনাগত হীন—সদা বর্ত্তমান, সেইজন্য তিনি সদা জ্ঞাতা, সেইজন্য অপরিণামী।

অনেকে বলেন, আগুন যেমন জ্যোতির্ম্ময় এবং অপরের প্রকাশক, চিত্তও সেইরূপ। কিন্তু তা নয়। আগুন স্বয়ং জ্যোতিঃ নয়—কারণ আগুন নিজেকে জানে না। যার জ্ঞান আছে, তারই কাছে আগুন জ্যোতির্ম্ময় এবং অপর জিনিষের প্রকাশক। চিত্তও ঠিক সেইরূপ। চিত্তও জ্ঞানের বিষয় বলে স্বয়ং জ্যোতিঃ বা স্বাভাস হতে পারে না। চিত্তকে দেখায় যেন জ্ঞানী, কিন্তু তা নয়, চিত্ত হচ্ছে অতি সূক্ষ্মভূত মহত্তে পুরুষ-জ্যোতির প্রতিবিম্ব—চাঁদের মত পরাবর্ত্তিত আলোক (reflected light)। চিত্ত স্বাভাস নয় তার একটা প্রমাণ—চিত্ত একই সময়ে স্বরূপ ও পররূপ গ্রহণ করতে পারে না! এর দ্বারা মাধ্যমিক মত "ভূতির্যেষাং ক্রিয়াসৈব কারকঃ সৈব চোচ্যতে" যার অনুভূতি, ক্রিয়া এবং কারক একই—এরূপ যে চিত্ত—অনুভব বিরুদ্ধ। একমাত্র জ্ঞানই (পুরুষ) স্বরূপ ও পররূপে সামান্যভাবে অবস্থান করেন, সেইজন্য তিনি স্বয়ংজ্যোতিঃ।

কোনও কোনও বৌদ্ধেরা বলেন, 'পুরুষ-রূপ দ্রষ্টা-সামান্য স্বীকারের প্রয়োজন কী? যদি বলা যায় একটি ক্ষণিক চিত্তের দ্রষ্টা হচ্ছে আর এক চিত্তবৃত্তি। দেখাও যায়, পূর্ব্ব চিত্তকে পরচিত্তের দ্বারা জানতে হয় এবং পূর্ব্বে যে-চিত্তে আমার সুখ দুঃখ হয়েছিল,

বর্ত্তমান চিত্তবৃত্তির দ্বারা তাকে আমরা জানি।' না, তা হতে পারে না, কারণ পূর্ব্ব-চিত্তবৃত্তি ও পর-চিত্তবৃত্তি একই চিত্তের কালিক ও ধার্ম্মিক পরিণাম, এক চিত্তকে (বুদ্ধিকে) অপর চিত্ত (বুদ্ধি) দিয়ে জানলে, তাকে আবার কোন চিত্ত (বুদ্ধি) দিয়ে জানা যাবে—তাতে অতিপ্রসঙ্গ বা অনবস্থা দোষ হয়। বুদ্ধি-বুদ্ধেঃ = বুদ্ধির দ্রষ্টা অন্য বুদ্ধি। তা ছাড়া অসংখ্য বুদ্ধি কল্পনা হেতু, অসংখ্য প্রকার স্মৃতির কল্পনা করতে হবে এবং ঐ সকলের সাংকর্য্য (মিশ্রণ) হেতু কোনও একটা স্মৃতির স্পষ্ট ধারণা হবে না। ব্যাস জিজ্ঞাসা করেন—"এইরূপ চিত্তান্তর কল্পনা করলে, বৌদ্ধদের কেই বা মহানির্ব্বেদের জন্য, বিয়োগের জন্য, অনুৎপত্তির জন্য, প্রশান্তির জন্য গুরোরন্তিকে 'ব্রহ্মচর্য্যং চরিষ্যামি' একথা বলবে?"

পতঞ্জলি বলচেন—অপ্রতি সংক্রমা অর্থাৎ যিনি যেন সংক্রামিত হয়েচেন বলে বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক হন নি। (এ যেন ঠিক মায়াবাদীদের বিবর্ত্ত পরিণাম)। সেই চিতি বা জ্ঞানশক্তি বুদ্ধিকে চেতনের ন্যায় (তদাকারাপত্তি) করে। তখন সেই প্রতিবিম্বিত চৈতন্যে বুদ্ধির স্ববুদ্ধি সংবেদন হয় অর্থাৎ 'আমি ভোক্তা' এইরূপ সংবেদন বা খ্যাতি বা অবিশিষ্টা আত্মভূতা বুদ্ধি হয়। সেইজন্য চৈতন্যের স্থান সম্বন্ধে ব্যাস একটি শ্লোক উদ্ধার করচেন—"ন পাতালং ন চ বিবরং গিরিণাং নৈবান্ধকারং কুক্ষয়ো নোদধীনাম্। গুহা যস্যাং নিহিতং ব্রহ্মশাশ্বতং বুদ্ধিবৃত্তিমবিশিষ্টাং কবয়ো বেদয়ন্তে॥"—যে গুহাতে শাশ্বত ব্রহ্ম নিহিত আছেন, তা পাতাল, গিরিবিবর, অন্ধকার বা উদধীর কুক্ষি নয়, কবিরা তাকে অবিশিষ্টা বুদ্ধি বৃত্তিকে বলে থাকেন।

চিত্তের আর একটি লক্ষণ হচ্চে সর্ব্বার্থ। কেন?—না, সে বিষয়ের প্রতিও যেমন উপরক্ত ও তার দ্বারা অনুরঞ্জিত হয়, আত্মার প্রতিও সেইরূপ উপরক্ত ও তার দ্বারাও সেইরূপ অনুরঞ্জিত হয়। আর সে অনুরক্ত ও উপরঞ্জিত হয় বলে সে নিজেই নিজের বিষয়ও বটে। *সেইজন্য ব্যাস* বলচেন যে চিত্ত বিষয় ও বিষয়ীর গ্রাহক, চেতন ও অচেতন স্বরূপাপন্ন বিষয়াত্মক হলেও অবিষয়াত্মকেরই মত, অচেতন হয়েও চেতনের মত, স্ফটিকের ন্যায় সর্ব্ব-বিষয়ের উপরাগী বলে সর্ব্বার্থ। চিতি বা দর্শনশক্তির সহিত উপরঞ্জন হেতু ভ্রান্ত বুদ্ধির নিকট, চিতি ও চিত্তকে এক বলে বোধ হয়। বৌদ্ধেরা এখানে ভ্রম করেন, তাঁরা বলেন, "অভিন্নোঽপি হি বুদ্ধ্যাত্মা বিপার্য্যাসতি দর্শনৈ। গ্রাহ্য গ্রাহক সংবিত্তি—ভেদবানিব লক্ষ্যতে॥"—বুদ্ধি ও আত্মা অভিন্ন, বিপর্য্যয় দর্শন হেতু গ্রাহ্য ও গ্রাহকরূপ সংবেদন ভেদবান বলে লক্ষিত হয়।

চিত্তের আর একটি লক্ষণ হচ্চে পরার্থ। লোকে দেখা যায়, যা কিছু সংহত্যকারিত্ব অর্থাৎ বহু জিনিষের সংহতিতে গঠিত, তার নিজের কোনও স্বার্থ থাকে না, তা পরার্থ অর্থাৎ পরের ভোগের নিমিত্ত হয়। প্রখ্যা (সত্ত্ব), প্রবৃত্তি (রজঃ) এবং স্থিতি (তমঃ) গুণের সংহতিতে প্রকৃতি এবং এই প্রকৃতিজাত চিত্ত আবার অসংখ্য বাসনাদ্বারা চিত্রিত হলেও, বস্তুর সংহতি বলে তার নিজের কোনও স্বার্থ নেই। চিত্তে সুখ হলেও তাতে চিত্তের ভোগ হয় না, চিত্তে জ্ঞান হলেও তাতে তার অপবর্গ লাভ হয় না, সেইজন্য চিত্ত পরার্থ অর্থাৎ পুরুষের প্রয়োজনে লাগে। পুরুষ অসংহত বলেই তিনি ভোক্তা এবং প্রকৃতি ও প্রকৃতিজাত সমস্ত বস্তুই সংহত বলে পুরুষের ভোগ্য। কাজে-কাজেই বিজ্ঞানবাদীদের বিজ্ঞানে সংহতত্ব আছে বলে তা স্বার্থ হতে পারে না, তাও পরার্থ অর্থাৎ পুরুষের ভোগের নিমিত্ত।

যাঁরা বিশেষদর্শী অর্থাৎ পুরুষকে দর্শন করেচেন, তাঁদের আর আত্মভাব-ভাবনা থাকে না। আত্ম-ভাবভাবিত যোগীর লক্ষণ কি? ব্যাস বলচেন—

"যথা প্রাবৃষি তৃণাঙ্কুরস্যোদ্ভেদেন তদ্বীজসত্তাঽনুমীয়তে, তথা মোক্ষমার্গশ্রবণেন যস্য রোমহর্ষাশ্রুপাতৌ দৃশ্যেতে, তত্রাপ্যস্তি বিশেষ দর্শন-বীজমপবর্গ ভাগীয়ং কর্ম্মাভিনির্বর্ত্তিতম্ ইত্যানুমীয়তে"—যেমন প্রাবৃট কালে তৃণাঙ্কুরের উদ্ভেদ দর্শনে তদ্বীজ সত্তার অনুমান হয়, সেইরূপ মোক্ষমার্গ শ্রবণে যাঁদের রোমহর্ষ অশ্রুপাত দেখা যায়, সেখানে বুঝতে হবে যে পূর্ব্বজন্ম সুকৃতি নিষ্পাদিত অপবর্গভাগী বিশেষ দর্শন বীজ নিহিত আছে।

জ্ঞানীর আত্মভাবভাবনা বিশেষরূপে নিবৃত্তি হয়, আর অরুচি হয় কার—না, যার, "স্বভাবং মুক্ত্বা তদাবাদ্ যেষাং পূর্ব্বপক্ষে রুচির্ভবতি অরুচিশ্চ নির্ণয়ে ভবতি"—দোষ হেতু স্বভাব ত্যাগ করে যাদের আত্মবিরোধী পূর্ব্বপক্ষে রুচি হয়, তাদেরই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব নির্ণয়ে অরুচি হয়। আর আত্মদর্শন হলে, যোগীর আত্মভাবনা বিবেকরূপ নিম্নখাতের ভিতর দিয়ে কৈবল্যরূপ এক উচ্চভূমিতে (প্রগ্ভার) রুদ্ধ হয়ে বিলীন হয়। তথাপি সেই বিবেকের ছিদ্র পথে ক্ষীয়মাণ সংস্কার সকল হতে ব্যুত্থান প্রত্যয় সকল সাধন পথে উঠতে থাকে। ঐ সকল প্রত্যয়ের হান বা নাশ পূর্ব্বে যে ক্লেশহানের কথা বলা হয়েছে, ঠিক তারই মত নাশ করতে হবে। অর্থাৎ বিবেক কালেও যে সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংস্কার উঠবে, তাদের ক্রমাগত জ্ঞান সংস্কারের দ্বারা দগ্ধবীজবৎ করে দিতে হবে।

প্রসংখ্যান হচ্ছে বিবেকখ্যাতি জনিত সার্ব্বজ্ঞ্য-সিদ্ধি, ব্রাহ্মণ যখন তাতেও অকুসীদ হন অর্থাৎ তাও প্রার্থনা করেন না, তখন সেই বিরক্ত যোগীর সর্ব্বথা-বিবেকখ্যাতি হয়। এই সর্ব্বথা-বিবেক-খ্যাতি কালে ধর্ম্মমেঘ নামক সমাধি উপস্থিত হয়—এসময় আর কোনও প্রত্যয়ই উৎপন্ন হয় না। এই ধর্ম্মমেঘ সমাধি উপস্থিত হলে ক্লেশমূল কর্ম্মাশয় সকলের নিবৃত্তি হয়। একেই বেদান্তের জীবন্মুক্ত অবস্থা বলে। জীবন্মুক্ত যোগী যদি শরীর রাখতে ইচ্ছুক হন, তা হলে নির্ম্মাণ চিত্তদ্বারা কার্য্য করেন এবং এই কার্য্য বন্ধনের হেতু হয় না। তখন জ্ঞানের সর্ব্বাবরণ মল অপসারিত হওয়ায় তা অনন্তস্বরূপ হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞেয় অল্প হয়ে পড়বে। আমাদের জ্ঞান দেহের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বলে, জ্ঞেয় জগৎটাই প্রকাণ্ড বলে বোধ হয়। কিন্তু জ্ঞান অসীম হলে জগৎটাকে বোধ হবে যেন তাতে একটা বিন্দু—আকাশে যেমন খদ্যোত।

ক্লেশমূল সংস্কার বিনষ্ট হলে, আর জন্ম হয় না কেন, সে সম্বন্ধে বিজ্ঞান ভিক্ষু একটি কৌতুককর শ্লোক রচনা করেছেন—"অন্ধোমণিমবিধ্যৎ তমনঙ্গুলি রাবয়ৎ। অগ্রীবস্তং প্রত্যমুঞ্চৎ তমজিহ্বো-ঽভ্যপূজয়দ্" ইতি—অন্ধ মণিসকল বিদ্ধ করেছে, অনঙ্গুলি তা গ্রথিত করেছে, অগ্রীব তা গলে ধারণ করেছে, আর অজিহ্ব তাকে প্রশংসা করেছে এইরূপ ভাবে তখন জগৎটা উপলব্ধ হয়। ক্লেশমূল সংস্কার বিনষ্ট হলে ধর্ম্মমেঘ সমাধি হতে কৃতার্থগুণ সকলের অর্থাৎ বুদ্ধিচিত্তাদিকারা হলে অর্থাৎ বুদ্ধির যখন ভোগ ও অপবর্গরূপ অর্থ কৃত হয়েছে, তখন পরিণাম ক্রম সমাপ্ত হয়। ক্রম কি?—না, যা ক্ষণের প্রতিযোগী অর্থাৎ ক্ষণব্যাপীয়া যে ধর্ম্ম উদিত হয়, তাই ক্ষণ প্রতিযোগী। এই ধর্ম্মের নিরন্তরতাই হচ্ছে ক্রম (succession)। ক্রমই ক্ষণরূপকালাবকাশের নিরূপক। একটা বস্তুর পরিণামের অবসান পর্য্যন্ত যা গ্রাহ্য তাই ক্রম।

ভোগাপবর্গ সিদ্ধ হলেই পুরুষের অর্থ শূন্য হয়ে যায় অর্থাৎ চাওয়া বা পাওয়ার আর কিছুই থাকে না। পুরুষ ত্রিগুণাত্মক-প্রকৃতিতে যখন অর্থশূন্য হয়ে যান তখন সেই পুরুষার্থ শূন্য-গুণ-সকল তখন প্রতি-প্রসব বা প্রলয় প্রাপ্ত হয়। একেই বলে কৈবল্য অথবা বুদ্ধি-উপাধি-সম্বন্ধ-শূন্য কেবলা চিতিশক্তি।

ওঁ শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু

স্বপ্ন

৺মোহিতকুমার সেন

সে'দিন শারদ সাঁঝে
ঘন বনানীর ছায়ে
কি কথা ভাবিতেছিনু নাহি তাহা মনে ;
ধীরে ধীরে সন্ধ্যারবি—
রচিয়া রঙ্গীন স্বপ্ন—
ঢলিলা পশ্চিমাঞ্চলে দিগন্ত শয়নে।
থামিয়াছে কোলাহল,
বিহগ-কূজন-গীতি,
রাখালের সকরুণ বাঁশীর সুস্বর ;
নীরব ধরণী-তল ;
বহিয়া বহিয়া রহে,—
মর্ম্মরিয়া শুষ্কপর্ণ—মরুৎ মন্থর।
অবারিত চিন্তাস্রোত
সহসা পাইল বাধা,
চকিতে ফিরায়ে মুখ উঠিনু চমকি ;
কম্পিত অন্তরে চাহি'
আমার সম্মুখ-পানে
গোধূলির স্বল্পালোকে দেখিলাম—এ কি।
দীর্ঘকায়, শ্বেত শ্মশ্রু,
বিরাট মূরতি এক
দাঁড়াইয়া যোদ্ধৃবেশে সম্মুখে আমার,
উন্নত ললাট তটে
দুইটি বিরল রেখা,
তেজোদীপ্ত চক্ষুর্দ্বয় শোভে নীচে তার,
প্রশান্ত-মূরতি তাঁর,
সস্মিত আননখানি,
বলিষ্ঠ বাহুতে শোভে বর্শা ভয়ঙ্কর,
অপলক নেত্রে চাহি'
সুন্দর সে' মুখ পানে,
নীরবে রহিনু বসি',—কম্পিত অন্তর।

চাহি' মোর মুখপ্রতি
কহিলা গম্ভীর স্বরে,—
শুনিয়া জুড়া'ল মোর তৃষিত শ্রবণ,—
শুনিলাম সুধাস্বরে,
ধীর কণ্ঠে,—"শুন বৎস,
সম্মুখে অনন্তকাল—অনন্ত জীবন,
দুর্লঙ্ঘ্য নগেন্দ্রমালা,
দুর্গম কান্তার মরু,
সম্মুখে দুস্তর ওই মহা পারাবার ;—
অনন্ত গগনতলে
করাল জীমূত মালা
উলঙ্গিনী শ্যামা প্রায় জীবনে তোমার
নাচিছে তাণ্ডব নৃত্য।
শুন বৎস! 'শক্তি' আমি
দুর্ব্বল মানব-হৃদে শক্তিদাতা আমি
মানব বিবেকরূপে ;
হয়োনা অধীর বৎস,
মানব-পরীক্ষাস্থল জীবন-সংগ্রামে ;
লহ ধর্ম্ম-অস্ত্র মম,
ভবিষ্য জীবনে তব
এই অস্ত্রে জয়ী তুমি হ'বে ধরাধামে।
কিন্তু,—সদা রেখো মনে—
হইলে বিপথ-গামী
পাপের সংঘর্ষে হ'বে ভীষণ শাণিত ;
এ' বর্শা-ফলক দীপ্ত
হইবে সুতীক্ষ্ণতর,
ইহাতে তোমারই ধ্বংস হইবে সাধিত।"
জলদ-গম্ভীর ভাষে
এ' কথা কহিয়া মূর্ত্তি
মিলাইল মহাব্যোমে।
জাগিনু তখন,
শ্রবণ-কুহর হ'তে
ধীরে মিলাইল—বৎস,
সম্মুখে অনন্তকাল, অনন্ত জীবন।

খোকা মহারাজ

জনৈক ভক্ত

একদিন "স্বামি-শিষ্য-সংবাদ" পড়িয়া আমার বড়ই ইচ্ছা হইল যে শিষ্য যেমন স্বামীজির পদ পূজা করিয়াছিলেন আমিও ঐরূপ করিব। পথে কিছু ফুল ও মিষ্টি কিনিয়া মঠে গিয়া হাজির হইলাম। দেখিলাম, খোকা মহারাজ সদ্যস্নাত হইয়া গৈরিক বস্ত্রে শোভা পাইতেছেন। প্রণাম করিয়া আমার অভিপ্রায় জানাইলাম। তিনি শয্যোপরি উপবিষ্ট হইলেন, পদ-যুগল মেঝের উপর রহিল। আমি পুষ্প ও মাল্যদ্বারা তাহা শোভিত করিতে লাগিলাম। তৎপরে ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সন্দেশ প্রদান করিলাম। তিনি গ্রহণ করিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমি প্রসাদ পাইলাম।

পূজনীয় খোকা মহারাজের নিকট হইতে ধ্যান ভজন সম্বন্ধে বেশী উপদেশ আমি পাই নাই। এ সম্বন্ধে কথা উঠিলে প্রায়ই তিনি বলিতেন "খুব সকালে উঠে জপ করবি।" অধ্যয়নে উৎসাহ এবং ব্রহ্মচর্য্যের উপর খুব জোর দিতেন। একদিন ইষ্টকে ধ্যান করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে কিছুক্ষণ ধ্যান করিতে বলিয়াছিলেন। মাঝে মাঝে বলিতেন, "চিন্তাই ধ্যান।" এক দিন নিমন্ত্রিত হইয়া তিনি আমাদের কলিকাতার হোষ্টেলে আসিয়াছিলেন। সেদিনও ধ্যানে তন্ময় হতে পারি না বলায় তিনি আমার বুকে হাত দিয়া চক্ষু বুজিয়া "জয় শ্রীগুরু" ২।৩ বার জোরে উচ্চারণ করিয়া মনে মনে কি বলিয়াছিলেন। আমি খুব আশা করিয়াছিলাম, আমার হয়ত কোনরূপ একটা অনুভূতি তখন তখনই হইয়া যাইবে। কিন্তু ইহা এমনভাবে পাইবার জিনিষ নহে। ভগবান্ ন্যায়বিচারক, যাহার যে জিনিষ প্রাপ্য নহে তাহাকে তাহা দিবেন কেন? তিনি আমাকে স্নেহ, আদর, আলিঙ্গন যখন যা দিয়া পারিয়াছেন ভগবানের দিকে টানিবার চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণবের তিনের দয়া সত্ত্বেও একের অর্থাৎ মনের দয়া বিনে আমি পড়িয়া রহিলাম।

তাঁহার উপদেশ ছিল শিশুর মত সরল ও মর্ম্মস্পর্শী। শিশুর মত লোকেই তাহা বুঝিতে ও কার্য্যে পরিণত করিতে পারিত। সত্য সূর্য্যের আলোর মতই সহজে মিলে। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন, "আমি একথা খুব ভাল করিয়াই বিশ্বাস করি যে, যাহা আমার দ্বারা সম্ভব হইয়াছে, তাহা একটি বালকের পক্ষেও সম্ভব। একথা বলার উপযুক্ত হেতুও আমার আছে। সত্যের অনুসন্ধানের উপায় বা সাধন যেমন কঠিন তেমনই সহজ। উহা আত্মাভিমানীর নিকট অসম্ভব বলিয়া মনে হইলেও একটি নির্দ্দোষ বালকের পক্ষেও সম্ভব।" একথা বলার ভিত্তি এই যে, আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানের জন্য শরীরের বল অথবা বুদ্ধির প্রাগল্ভ্য ত দরকার নয়ই পরন্তু উহারা বাধা, এবং সত্যের ভিত্তি নিহিত, সরলতা ও পবিত্রতার মধ্যে, যাহা নির্দ্দোষ শিশুর মধ্যে অপর্য্যাপ্ত।

একবার বেলুড় মঠে ৺দুর্গাপূজার সময়ে আমি মঠে ছিলাম। আমি রাত্রে তাঁহার ঘরে শুইতাম। প্রায়ই রাত্রে তাঁহার প্রসাদ ও সেবা আমার প্রাপ্য হইত। তখন দেখিয়াছি তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্য ছিল কিরূপ। সকালে কোনদিন আমি তাঁহার পূর্ব্বে উঠিতে পারি নাই। সুতরাং মনে হয় তিনি ৩।৩৷৷ টার সময় উঠিতেন। কেন না আমরা

তখন মঠের ঘণ্টার সঙ্গে ৪টার সময় উঠিয়া পূজার কার্য্যে সাহায্য করিতাম। উঠিয়া তিনি তামাক খাইতেন পরে পায়খানায় যাইতেন। তৎপর ঠাকুর ঘরে প্রণাম করিয়া নিজের বিছানার উপরে অথবা গঙ্গার ধারের বারান্দায় প্রায় ৯।১০টা অবধি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন। ধ্যান করিতেন না জপ করিতেন তিনিই জানেন। তবে প্রায়ই দেখিয়াছি, বিহ্বল দৃষ্টিতে একদিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। তারপর স্নান সারিয়া ঠাকুর ঘরে প্রণাম করিয়া আসিয়া পুস্তক পাঠ করিতেন অথবা ঐরূপভাবে থাকিতেন। খাবার ঘণ্টা পর্য্যন্ত এইরূপ। পুনরায় ২॥টা ৩টার সময়ে পায়খানায় যাইতেন। তারপর হইতে রাত্রে আহারাদি পর্য্যন্ত কোন দিন বা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন, কোনদিন বা বেড়াইতে যাইতেন। আমরা ঐ সময়েই কথাবার্ত্তা কহিতাম। আহারাদির পর রাত্রিতে শয়ন করিতেন। যাক্, তিনি কিরূপ সরল উপদেশ দিতেন তাহা বলি:—একদিন সন্ধ্যার পরে আমি ও আমার এক বন্ধু তাঁহার সেবা করিতেছি। বন্ধুটি হয়ত কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তিনি উত্তরে বলিলেন, "তুই যদি তোর ছোট ছোট ভাইবোনদের কোন জিনিষ দিস্ তারজন্য কি কিছু ফেরৎ চাস্? ভগবান্‌কে ভালবাসতে হবে ঐ রকম। 'ঠাকুর, তোমাকে দেহ মন প্রাণ সব দিলাম, তুমি আমাকে পায়ে রেখো। আমি আর কিছু চাই না'।" কথাগুলি আমরা সকলেই জানি এবং চেষ্টা করিয়াও ঐরূপ-ভাবে ফলত্যাগ করিয়া সেবাদি কর্ম্ম করিতে পারি না, অথচ নির্দ্দোষ শিশু ইচ্ছা করিলে এই উপদেশ সহজে পালন করিতে পারে। আমি যখন কিছু দিয়া ফেরৎ চাই, তখন সকলেই ঐরূপ করে এই ভাবিয়া আমি নিশ্চিন্ত হই, কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হই এই ভাবিয়া যে, আমাকে নিন্দা না করিয়াও যদি কেহ আমার সামনে অপর কাহারও প্রশংসা করে তখনই আমার ভিতর কালি হইয়া যায় এবং আমি সেই প্রশংসায় মন খুলিয়া যোগ দিতে পারি না।

আমার বন্ধুটি বলিলেন, "মহারাজ, আপনারা বরাহনগর মঠে কিরূপে থাকতেন?

"সে আর কি বলব। স্বামীজি ও অন্যান্য সকলে সাধন ভজন করতেন, আমি বাসনমাজা, ঘর ঝাট দেওয়া, এই সব করতাম।"

আমরা আরও শুনিবার আগ্রহ করিলে বলিলেন, "স্বামীজি মেজের উপর বিচালি পেতে শুতেন, আরও কত কি করতেন, এই সব তোরা বই পড়ে দেখিস্।" নিজের সম্বন্ধে কিছুই বলিবেন না দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা, আপনার কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হয়েছে?" তিনি বলিলেন, "কখন কখন অনুভব হয় বটে নীচ থেকে উপরের দিকে একটা কি যেন সুর্ সুর্ করে যাচ্ছে।" আমরা আরও কিছু বলিবার জন্য চাপিয়া ধরিলাম কিন্তু তিনি আর কিছুই বলিলেন না। আমার ইচ্ছা ছিল তাঁহার নির্ব্বিকল্প সমাধি হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করি কিন্তু সাহসে কুলাইল না।

কাম দমন কিভাবে করিতে হইবে তাহা কোনদিন সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করি নাই, লজ্জা করিত। কিন্তু চিঠিতে বহুবার জিজ্ঞাসা করিয়াছি। তদুত্তরে কখনও জানাইয়াছেন, "পূর্ব-দিকে গেলে পশ্চিমদিক্ পেছনে পড়ে থাকে, সুতরাং ঐ দিকে কোন নজর না দিয়ে যে পথে চলেছিস্ সেই পথে চলে যা। কিছুদিন পরে দেখবি কাম কোথা দিয়ে চলে গেছে, টেরও পাস নি।" কখনও লিখিয়াছেন, "মহামায়ার ইচ্ছা না হলে কিছু হবার উপায় নেই। মহামায়া যাকে যখন যেভাবে রাখেন সেই ভাবেই থাকতে হবে। তিনি যখন কৃপা করে আমাদের দোষ ছাড়ায়ে দেবেন, তখনই গেল।" কখনও বলিয়াছেন,

"তাঁর নিকট আন্তরিক প্রার্থনা কর, তবেই হবে। আন্তরিক প্রার্থনা কাকে বলে—না, কাঁদাকাটা করে তাঁর নিকট নিজের ব্যথা জানান।" কখনও বা লিখিয়াছেন, "কেন হবে না? তুই ঠাকুরের লীলাসঙ্গীর সঙ্গী, সর্ব্বদা মনে এই জোর রাখবি।"

সেবার পূর্ব্ববঙ্গ হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমাদের নিকট গল্প করিয়াছিলেন যে, সোনারগাঁ মঠে স্বামীজির জন্মতিথির দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরে তিনি বসিয়া আছেন, হঠাৎ দেখিলেন, স্বামীজি আসিয়া উপস্থিত। তাঁহার কপালে বড় বড় চন্দনের ফোঁটা। ফোঁটাগুলি কে দিল জিজ্ঞাসা করাতে স্বামীজি উত্তর দিয়াছিলেন, মাদ্রাজের সব ভক্তেরা দিয়াছে। জামতাড়া রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে যখন তিনি জীবন-সংশয় রক্তা-মাশয়ে ভুগিতেছিলেন, তখনও তাঁর ঐরূপ দিব্য দর্শন হইয়াছিল। ঘটনাটি আমি তাঁর সেবক অ— মহারাজের নিকট শুনিয়াছি। অ— মহারাজ বাতাস করিতেছিলেন, মহারাজ তাঁহাকে হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "অ—, দেখিস কি, সবে দাঁড়া, ঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, মহারাজ, এরা সব এসেছেন। তুই কি দেখতে পাচ্ছিস নে?" ঐ সময়ে সম্ভবতঃ জানিতে পারিয়াছিলেন যে ঐ রোগে তাঁহার দেহত্যাগ হইবে না। তাই পরে অ— মহারাজকে বলেছিলেন যে, ঠাকুর তাঁকে বলেছেন যে, এই রোগ শীঘ্রই সারিয়া যাইবে, কোন চিন্তা নাই।

তিনি ইচ্ছা করিলে মনের কথা বুঝিতে পারিতেন বলিয়া আমার বিশ্বাস। একদিন একটি ছেলে তাঁহার পদসেবা করিতে ছিল, আমি নিকটে বসিয়াছিলাম। আমার মনে বড়ই ইচ্ছা হইল যে, আমি তাঁহার হাত টিপি। ইচ্ছাটি খুব তীব্র হইয়া উঠিয়াছে এমন সময়ে তিনি আমার দিকে তাকাইয়া বলিয়া উঠিলেন, কিরে, হাত টিপ্‌বি নাকি, বলিয়া হাত আগাইয়া দিলেন। অন্য দিবস তিনি কফি খাইতেছিলেন। পূর্ব্বেই আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি খাইব কি না? আমি না বলিয়াছিলাম। তারপর তিনি যখন খান, তখন আমার বড়ই ইচ্ছা হইয়াছিল যে আমি একটু প্রসাদ পাই। কিন্তু তিনি সব খাইয়া ফেলিলেন ও পাত্রটা আমাকে ধুইতে দিলেন। আমি দেখিলাম, পাত্রে সামান্য তখনও আছে। আমি মনে মনে বলিলাম, ঐটুকুও যদি আমায় দিতেন। ইহা মনে করিতেই অদ্ধপথ হইতে ডাকিয়া বলিলেন, "উহার ভিতরে একটুখানি আছে খেয়ে দেখ বেশ মিষ্টি লাগবে।" অবশ্য ঘটনা দুটি বিশ্লেষণ করিলে হয়ত কাকতালীয়বৎ মনে হইতে পারে কিন্তু তখন আমার ঐরূপই মনে হইয়াছিল।

তাঁহার সম্বন্ধে আর একটি গল্প অন্যান্য স্বামীজিদের নিকটে শুনিয়াছিলাম। গল্পটি তাঁহাকে দিয়া যাচাই করিয়া লইয়াছিলাম, সুতরাং এখানে বলা যাইতে পারে। তাঁহার সাধন অবস্থায় এক সময়ে তিনি হিমালয়ের কোন নিভৃত কুটীরে তপস্যা করিতেছিলেন। এই সময়ে তিনি জ্বরে ভুগিতেছিলেন। জ্বর হঠাৎ বাড়িয়া যায় ও তিনি অচৈতন্য হইয়া পড়েন। চৈতন্য হইলে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য একটু জল খাইবেন কিন্তু উঠিয়া কুজা হইতে জল ঢালিয়া লইবেন এমন শক্তি নাই। কোনক্রমে উঠিয়া কুজা হইতে জল ঢালিয়া লইতেছেন, এমন সময়ে আর পারিলেন না, ঢলিয়া পড়িলেন। বড় দুঃখ হইল, অভিমান করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশে বলিলেন, "হায় ঠাকুর, একটু জল ঢালিয়া খাইব, এমন শক্তিও রাখ নাই।" রাত্রি প্রভাত হইল। সকালে হঠাৎ একটা গোলমালে জাগরিত হইয়া দেখেন আর এক কাণ্ড। "মহারাজ, এ মহারাজ দরওয়াজা খুলিয়ে।" তিনি উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। দেখিলেন, ব্রহ্মচারিবেশী একজন লোক। কি

এই জিজ্ঞাসা করাতে লোকটি তাঁহার সেবা করিতে চাহিল। তিনি বলিলেন, "প্রয়োজন নেই।" তথাপি লোকটি জোর করে দেখিয়া তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। লোকটি বলিল, সে গঙ্গাজীতে তর্পণ করিবার জন্য দুইদিন যাবৎ এই জনহীন দেশে আসিয়াছে। গতকল্য রাত্রে দুর্গামাঈ স্বপ্ন তাকে দর্শন দিয়া বলেন যে, তর্পণ করিয়া তাহার যে কাজ হইবে তাহা অপেক্ষা ঐ স্থানে এক সাধুর 'বুখার' হইয়াছে, তাঁহাকে সেবা করিলে বেশী ফল হইবে। সকালে উঠিয়াই তাই সে এখানে আসিয়া দেখে সবই সত্য। খোকা মহারাজের চক্ষু দিয়া দর দর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। নিজেকে সম্বরণ করিয়া লোকটিকে নানারূপে বুঝাইয়া ফিরাইয়া দিলেন। পরদিন শেষরাত্রে লোকটি আবার আসিয়া উপস্থিত। সেদিনও নাকি রাত্রে দুর্গামাঈ তাহাকে ঐ কথা বলিয়া সেবা করিবার জন্য পাঠাইয়াছেন। সেবা সে করিবেই, কিছুতেই ছাড়িবে না। খোকা মহারাজও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, কিছুতেই সেবা করিতে দিবেন না। তাহাকে খুব ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, নিশ্চয়ই দুর্গামাঈ অন্য কোন সাধুর কথা বলিয়াছেন, নহিলে তাহার ত সেবার কোন প্রয়োজন নাই। লোকটি চলিয়া গেল। খোকা মহারাজ প্রার্থনা করিলেন, "ঠাকুর আমাকে আর প্রলোভনে ফেল না। না বুঝে অভিমান করেছিলাম, অভিমান ভাঙ্গলে, ভালই হল। আর লোভ দেখিও না।" লোকটি তার পরের দিনও আসিয়াছিল। পরে আর আসে নাই।

উপনিষদ্-প্রসঙ্গ

শ্রীঅম্বিকাচরণ দত্ত, এম্-বি

উপনিষদের ঋষি গাহিতেছেন—

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ। ওঁ ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ। স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভিঃ। ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

হে দেবগণ, আমরা কর্ণদ্বারা যেন সর্ব্বদা জগতের মঙ্গলধ্বনি শুনিতে পাই। আমরা চক্ষুদ্বারা যেন সর্ব্বদা জীবের মঙ্গল প্রত্যক্ষ করি। আমরা যেন সর্ব্বদা ধীর স্থির শুদ্ধ দেহে তোমাদের স্তুতি করিতে পারি। দেবতাদিগের প্রীতিকর কর্ম্ম সম্পাদনোপযোগী আয়ু যেন আমরা প্রাপ্ত হই। অর্থাৎ জগতে যেন সর্ব্বদা শান্তির অনাবিল আনন্দধারা প্রবাহিত হয়। জীব সকল যেন নিরাময় হয়। কাহারও যেন কখনও দুঃখ ভোগ করিতে না হয়। প্রীতির প্রেমামৃত ধারা যেন নিরন্তর জগৎ পরিপ্লাবিত করে। উপরোক্ত ঋষিবাক্য যেন সর্ব্বদা আমাদিগের হৃদয়-মন্দিরে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে এবং আমাদিগের সকল কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত করে।

অথর্ব্ববেদীয় মুণ্ডকোপনিষদে কথিত হইয়াছে যে, একদা অঙ্গিরস নামক ঋষির নিকট গৃহস্থপ্রধান শৌনক যথাবিধি উপনীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি।" ভগবন্, কাহাকে জানিলে এই সমস্ত জগদ্-ব্যাপার অবগত হওয়া যায়?

শৌনক গৃহস্থ এবং সাংসারিক কার্যে ব্যাপৃত। ইহার পূর্ব্বে তিনি অনেক স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছেন। ব্যাকুলভাবে বিশ্বব্যাপার অবগত হইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। বিভিন্ন প্রকার গুরুর নিকট বিভিন্ন প্রকার উপদেশ শ্রবণ করিয়াছেন। কিন্তু সামান্য সামান্য ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা ভিন্ন অসীম সংসার-সাগরের বিন্দুমাত্রও সন্ধান করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সে যে অনন্ত, মানবের ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ জীবনে কিরূপে এক একটি করিয়া সমস্ত ঘটনাবলীর মীমাংসা করা সম্ভব হইতে পারে? আমরা আমাদিগের যাহা পরম-প্রিয়, অর্থাৎ দেহ ও মন, তাহারই শতাংশের এক অংশেরও সংবাদ রাখি না, সুতরাং কিরূপে অপরের এবং তথাকথিত সমগ্র বিশ্বের সংবাদ অবগত হইব। এই হেতু শৌনক সমষ্টিকে জানিবার জন্যই ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন এবং ঋষির নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্, এমন কিছু জিনিষ আছে কি যাহা জানিতে পারিলে বিশ্বের সমস্ত ব্যাপার জ্ঞাত হওয়া যায়? যদি থাকে আমাকে তাহা উপদেশ করুন।" শৌনক মনে মনে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, যে নিশ্চয়ই এই বিশ্বপ্রপঞ্চের মূলে এমন একটা কিছু রহস্য লুক্কায়িত রহিয়াছে যাহা জানিতে পারিলে আর কিছু জানিবার অবশিষ্ট থাকিবে না। সুতরাং তিনি তাহাই জানিতে ব্যগ্র হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের উত্তরে ঋষি বলিলেন, "দ্বে বিদ্যে-বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ।" ব্রহ্মবিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন যে দুইটি বিদ্যা জীবের জ্ঞাতব্য, যথা পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা।

"তত্রাপরা ঋগ্‌বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ব-বেদঃ শিক্ষাকল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষ-মিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে" অর্থাৎ ঋগ্‌বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা (উচ্চারণ যতি ইত্যাদির বিদ্যা), কল্প (যজ্ঞ পদ্ধতি), ব্যাকরণ, নিরুক্ত (বৈদিক শব্দ সমূহের ব্যুৎপত্তি ও তাহাদিগের অর্থ যাহার দ্বারা জানা যায়) ছন্দ ও জ্যোতিষ, ইহারা অপরাবিদ্যা। আর যাহাদ্বারা অক্ষর ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে অর্থাৎ সাক্ষাৎ ভগবদুপলব্ধি হয় তাহাই পরাবিদ্যা নামে কথিত হয়। ইহার পরই শ্রুতি বলিতেছেন এই পরাবিদ্যা দ্বারা যে অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র, অর্থাৎ মূলরহিত চক্ষু কর্ণ ও হস্তপদ বিরহিত নিত্য বিভু ও সর্ব্ব-ব্যাপী যে ব্রহ্মকে জানিতে পারা যায় তিনিই ভূত-যোনি অর্থাৎ সর্ব্বকারণ-কারণ এবং সমগ্র বিশ্ব-প্রপঞ্চ তাহা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। ইহার ঠিক পরবর্ত্তী শ্লোকে শ্রুতি আরও পরিস্ফুট করিয়া বলিতেছেন—

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ
যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি।
তথাঽক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্॥

অর্থাৎ ঊর্ণনাভি (লূতাকীট) যেরূপ আপনার শরীর হইতে স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া তন্তুরাশি বহির্গত করে এবং পুনরায় তাহা আত্মসাৎ করে, পৃথিবীতে যেরূপ ওষধি সকলের উৎপত্তি ও লয় হয়, জীবদেহ হইতে যেরূপ কেশলোমাদি উৎপন্ন হয়, অক্ষর ব্রহ্ম হইতেও সেইরূপ এই চরাচর বিশ্ব প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে।

এইখানে আসিয়া আমরা শৌনকের প্রশ্নের উত্তর পাইলাম। শ্রুতি বলিতেছেন, ব্রহ্ম হইতেই এই চরাচর জগৎ প্রাদুর্ভূত হইতেছে এবং লূতা-কীট অর্থাৎ মাকড়সা যেরূপ আপনার শরীর হইতে তন্তুরাশি বহির্গত করিয়া আবার তাহা স্বেচ্ছাক্রমে আত্মসাৎ করে, সেইরূপ এই বিশ্ব-প্রপঞ্চ ও ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া তাহাতেই আবার লয়প্রাপ্ত হইতেছে। তিনিই সমস্ত

জগতের মূল কারণ এবং সমগ্র জগৎ তাঁহাতেই অবস্থিত। সুতরাং তাঁহাকে জানিতে পারিলে জগতের কিছুই অজ্ঞাত থাকে না। এবং পরা-বিদ্যাই সেই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের মূল উৎস পর-ব্রহ্মকে জানিবার একমাত্র উপায়। সুতরাং পরা-বিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ হইলেই সমস্ত জাগতিক ব্যাপার অবগত হইতে পারা যায়। অন্য কিছুরই অপেক্ষা থাকে না ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য্য।

গীতা বলিয়াছেন—

"যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।"

অর্থাৎ ব্রহ্মকে লাভ করিলে অন্য কিছুই লাভের বিষয় থাকে না এবং সেই অবস্থায় গুরুতর দুঃখ কষ্ট উপস্থিত হইলেও লোকে তাহা দ্বারা বিচলিত হয় না। সুতরাং ভগবদুপলব্ধিই জীবের একমাত্র উপজীব্য।

উল্লিখিত শ্লোকগুলি আলোচনা করিলে আমরা কয়েকটি বিষয় অবগত হইতে পারি। প্রথমতঃ আধ্যধর্ম্ম ও সাধনার বিশেষত্ব এই যে, সমগ্র জগৎকে এক অখণ্ড সত্তা স্বরূপে অর্থাৎ সমষ্টি-ভাবে দেখাই ইহার প্রধান লক্ষ্য। এই সমষ্টি অর্থাৎ ঈশ্বর, অথবা এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ স্বরূপকে অবগত হইতে পারিলে ব্যষ্টি জগতের ক্ষুদ্র ব্যাপার-গুলি আর পৃথকভাবে তাহার দৃষ্টির বিষয় হয় না। সমষ্টিকে জানিলে ব্যষ্টি আপনিই জ্ঞাত হইয়া যায়। এই জন্যই ভারতীয় দার্শনিক ও সাধকবর্গ ব্যষ্টির দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া, এই ব্যষ্টির ভাবগুলি যে সাধারণ ভাবের অন্তর্গত, তাহারই অনুসন্ধানে বহির্গত হ'ন। অর্থাৎ এই বিশ্বপ্রপঞ্চের যে মূল কারণ অথবা যাঁহাকে জানিতে পারিলে সমস্ত বিশ্বতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়, সেই অনাদ্যা আদ্যাশক্তির অনুসন্ধানই তাঁহাদিগের সাধনার প্রধান লক্ষ্য হয়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দৃষ্টি ইহা অপেক্ষা স্বতন্ত্র। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ বাহির হইতে ভিতরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইঁহারা জগতের পদার্থ নিচয় বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহারা অণুপরমাণুগত গুণ ও ভেদ আবিষ্কার করিতেছেন। সমস্ত পদার্থের গতি ও স্থিতি পরিমাপ করিয়া তাহার কারণ অনুসন্ধানের জন্য অগ্রসর হইতেছেন। এক কথায় ইঁহারা ব্যষ্টি হইতে সমষ্টির দিকে যাইবার প্রয়াস পাইতেছেন এবং ইঁহাদের সিদ্ধান্তগুলিও ধীরে ধীরে আমাদিগের সিদ্ধান্তের সহিত মিলিয়া যাইতেছে। ভারতীয় মনীষিগণ প্রথমেই জগতের মূল কারণ সেই ব্রহ্মকে জানিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সমগ্র দৃষ্টি প্রত্যক্ষ ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি নিপতিত না হইয়া একেবারে সেই ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী, অখিল সংসারের ধাত্রীর দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। তাঁহারা একস্থানে অবস্থিত হইয়া সমগ্র বিশ্বব্যাপার একসঙ্গে দর্শন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অর্থাৎ যাহাকে ইংরাজীতে বলে "From the standpoint of the Absolute"

আমরা কোনও নদী অথবা সরোবরের তীরে দাঁড়াইয়া স্থলভাগে দৃষ্টিপাত করিলে শ্যামল ভূমি ও বৃক্ষলতা ইত্যাদি ব্যতীত জলরাশি দেখিতে পাই না। আবার জলভাগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে অমনি তাহার অভ্যন্তরে দেখিতে পাই, বৃক্ষের শাখা প্রশাখা ফল পুষ্প হইতে আরম্ভ করিয়া মূল অবধি শ্যামলভূমি পর্য্যন্ত সেখানে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট; আবার ভূমি হইতে আরম্ভ করিয়া অনন্ত তারকা-স্তবক-মণ্ডিত নভোমণ্ডল পর্য্যন্ত স্তরে স্তরে সুসজ্জিত; কিন্তু স্থলে যাহা ঊর্দ্ধমুখ, জলে তাহাই অধোমুখ, আবার স্থলে যাহা অধোমুখ জলে তাহাই ঊর্দ্ধমুখ। তত্ত্বময়ীর তত্ত্ব সাগরে যাঁহারা ডুবিয়াছেন তাঁহাদিগের দৃষ্টিও এইরূপ। তাঁহারা মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি না চাহিয়া চাহিয়াছেন সেই ব্রহ্মময়ীর প্রতি, দেখিয়াছেন তাঁহারই চিদ্ঘনানন্দ কলেবরের

প্রতি রোমকূপ-বিবরে অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জল বুদ্‌বুদের মত নিরন্তর উদ্ভূত হইয়া আবার তাঁহারই কারণ শরীরে বিলীন হইতেছে।

এইখানে আসিয়াই সাধকগণ বলিয়াছেন—"ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্॥" এই সংসার একটি প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষস্বরূপ। ইহার মূল ঊর্দ্ধে, শাখা প্রশাখা নিম্নে। ইহা অব্যয় অর্থাৎ অনন্ত কাল স্থায়ী।

এমার্সন

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

সক্রেটিশকে যেমন গ্রীসের শ্রেষ্ঠজ্ঞানী বলা হয়, তেমনি এমার্সন নব্যজগৎ আমেরিকার শ্রেষ্ঠ মনীষী। যদি কেহ পাশ্চাত্যের একটী মাত্র লেখককে জানিতে ইচ্ছা করেন তবে তাঁহার এমার্সনই পড়া উচিত। ডাঃ জে, টি, সাণ্ডারল্যাণ্ডের এই মন্তব্য যে কতদূর সত্য তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম্ম, সমাজ প্রভৃতি প্রায় সমস্ত আবশ্যকীয় বিষয়ে এমার্সনের সারগর্ভ চিন্তারাশি অতুলনীয়। সেক্ষপিয়রের পরেই এমার্সনের বচনাদি অধিকভাবে ইংরাজি ভাষায় উদ্ধৃত হয়। তাঁহার অমূল্য গ্রন্থাবলী পৃথিবীর সর্ব্বদেশেই সাগ্রহে পঠিত হয় এবং জগতের প্রায় সমস্ত গ্রন্থাগারেই তাঁহার পুস্তকাবলী স্থান পাইয়াছে। টোকিও ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে একটী পৃথক এমার্সন ক্লাশ আছে। এই প্রবন্ধে এমার্সনের জীবন ও বাণী সংক্ষেপে আলোচিত হইবে।

এমার্সন, হেন্‌রি থোরো ও ওয়াল্ট্ হুইটম্যান, কংকড়ের (Concord) এই মনীষিত্রয়ের প্রভাব মার্কিনদেশে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কিন্তু থোরো, হুইটম্যান, এলানপো, লংফেলো, হুইটিয়ার প্রভৃতি অপেক্ষা এমার্সনই মার্কিনদেশে বেশী জনপ্রিয় ও শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন। আমেরিকা অপেক্ষা ইংলণ্ডেও তাঁহার প্রভাব সমধিক কিম্বা অধিকতরও বলা যাইতে পারে। র‍্যাল্‌ফ ওয়াল্ডো এমার্সন বোষ্টন সহরে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ২৫শে মে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৮৮২ খৃঃ ২৭শে এপ্রিল প্রায় উনাশি বৎসর বয়সে কংকড়ে দেহরক্ষা করেন। তাঁহার সাতজন পূর্ব্বপুরুষ নিউ ইংলণ্ডস্থ গির্জ্জাসমূহের মিনিষ্টার ছিলেন। তাঁহার পিতা উইলিয়াম এমার্সন ছিলেন বোষ্টনের একটী গির্জ্জায় পাদ্রী এবং র‍্যাল্‌ফ ওয়াল্ডো তাঁহার আটটী সন্তানের মধ্যে চতুর্থ। অষ্টমবর্ষ বয়সে ওয়াল্ডোর পিতৃবিয়োগ হয়। স্বামিহীনা মাতা অসচ্ছল অবস্থার মধ্যে ছেলেমেয়েদের প্রতিপালন ও শিক্ষা প্রদান করেন।

১৮১৭ খৃঃ তিনি বোষ্টনে স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া হার্ভার্ড কলেজে প্রবেশ করেন এবং ১৮২১

খৃষ্টাব্দে বি, এ, পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। বি, এ, পাশ করিবার পরেই বোষ্টন সহরের একটী বালিকা-বিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষকতার কার্য্য গ্রহণ করেন। কিন্তু স্কুলের নিয়ম কানুন ও বাঁধাবাঁধির কৃত্রিম জীবন তাঁহার অসহ্য হইল। তাঁহার স্বাধীন ও ধর্ম্মপরায়ণ চিত্ত প্রকৃতির সহবাসে শান্তির রাজ্যে বিচরণ করিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিল। তিন বৎসর পর এই চাকুরী ত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম-সাধন ও ধর্ম্ম-প্রচার করিবার মানসে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। এই ধর্ম্মভাব তাঁহার মজ্জাগত ছিল এবং ইহা তিনি পুরুষানুক্রমে পাইয়াছিলেন। ১৮২৫ খৃঃ তিনি ডাঃ চ্যানিংএর নিকট ধর্ম্ম শিক্ষা লাভের জন্য কেম্ব্রিজের ডিভিনিটি (Divinity) স্কুলে ভর্ত্তি হন কিন্তু স্বাস্থ্যের অভাবে এবং যক্ষ্মারোগের আক্রমণাশঙ্কায় অধ্যয়ন হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বৎসরখানিক অন্যত্র তাঁহাকে বায়ু পরিবর্ত্তনে যাইতে হয়। স্বাস্থ্যলাভ পূর্ব্বক তিনি বোষ্টনে প্রত্যাগমন করিয়া নানা গির্জ্জায় প্রায় চারি বৎসর ধর্ম্ম-প্রচার করেন। ১৮২৯ খৃঃ কংকডের এলেন টাকার নামক এক ক্ষীণকায় সুন্দরী যুবতীর সহিত তাঁহার পরিণয় হয়। কিন্তু ১৮৩২ খৃঃ তাঁহার পত্নী বিয়োগ হয় এবং সেই শোকে তিনি এত অভিভূত হইয়া পড়েন যে, গির্জ্জার (অধ্যক্ষ) পাদ্রীপদ ত্যাগ করিয়া স্বাধীনভাবে অধ্যয়ন, গ্রন্থ রচনা ও বক্তৃতাদি কার্য্যে শেষ জীবন কাটাইতে মনস্থ করিয়া তিনি বোষ্টন সহরের প্রান্তে অদূরে কংকড় নামক প্রাকৃতিক দৃশ্য-পূর্ণ স্থানে আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৩৫ খৃঃ শরৎকালে প্লাইমাউথের লিডিয়া জাক্সন নামক মহিলার সহিত তাঁহার দ্বিতীয় বিবাহ হয় এবং এই পত্নীর গর্ভে তাঁহার কয়েকটী সন্তান-সন্ততি জন্ম গ্রহণ করে। তাঁহার নিউ ইংলণ্ডস্থ কংকড়ের গৃহটী পত্রপুষ্পশোভিত বৃহৎ উদ্যানের মধ্যে অবস্থিত ছিল। এই স্থানে তিনি জীবনের প্রায় পঞ্চাশ বৎসর অতিবাহিত করেন। শান্তি-নিকেতন যেমন রবীন্দ্রনাথের এবং রাইডাল মাউন্ট যেমন ওয়ার্ডস্‌ ওয়ার্থের, তেমনি কংকড় ছিল এমার্সনের সাধনার স্থান। বোষ্টন সহরের জনতা ও কোলাহল হইতে বিশ মাইল দূরে কংকড পল্লীর নীরবতা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে এমার্সনের প্রকৃত মহত্ত্ব প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। বিভিন্ন দেশের মনীষিগণ এই পুণ্যস্থান দর্শনে গমন করেন।

কংকডস্থ উদ্যানবেষ্টিত গৃহ ক্রয় করিবার পর তিনি এই সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন :—"জমি ও বাড়ীর মূল্য আমি দিয়াছি বটে কিন্তু এই বাগানের মধ্যে কত রঙের ফুল, কত রকমের পাখী, তাহাদের সুমিষ্ট স্বর, এই কুলুকুলু নিনাদিনী নদী, সুন্দর সূর্য্যাস্ত ও সূর্য্যোদয়—এই সকল মূল্যবান বস্তু ত আমি বিনামূল্যে পাইয়াছি।"

এমার্সন এইস্থানে শীতের ৩.৪ মাস নানাস্থানে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেন এবং বৎসরের বাকী সময় অধ্যয়ন, গভীর চিন্তা ও প্রবন্ধাদি লিখিয়া কাটাইতেন। ভারতের আশ্রমে আর্য্যঋষিগণ যেমন অন্তর্মুখীন জীবন অতিবাহিত করিতেন, তেমন ছিল কংকড়ে এমার্সনের জীবন সদা উচ্চ-চিন্তামগ্ন। তিনি সাধারণতঃ পূর্ব্বাহ্নে গৃহমধ্যে অধ্যয়ন ও চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন এবং অপরাহ্নে গৃহের বাহিরে বনে বাগানে একাকী, কখনও কচিৎ কোন সঙ্গীর সহিত বেড়াইতে বেড়াইতে শিশুর ন্যায় প্রকৃতির সঙ্গ করিতেন। কখনও বা নদীর ধারে ঘাসের উপর শয়ন করিয়া আকাশের দিকে নিরীক্ষণ করিতেন এবং তখন তাঁহার মন প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য্যে এত তন্ময় হইত যে, তাঁহার বাহ্য-জ্ঞান থাকিত না। তিনি লিখিয়াছেন যে, এরূপ শান্তি ও স্বাধীনতা, আনন্দ ও তৃপ্তি জগতের আর কোন কিছুতে পান নাই। তাঁহার অনৈক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ব্রনশন অলকট্ বলেন, এমার্সনের সহিত অপরাহ্ণে

যিনি অন্ততঃ একবার ভ্রমণ করিয়াছেন তিনি ভাগ্যবান। তখন তিনি যেন অন্য জগতের লোক হইয়া যাইতেন। তাঁহার এই সময়ের আনন্দ-মূর্ত্তি মানুষের হৃদয়ে নবজীবন ও নূতন প্রেরণা সঞ্চার করিত। তাঁহাকে তখন দেখিলে বিশ্বাসের অনল-মূর্ত্তি বলিয়া মনে হইত। অন্য একজন (যিনি এমার্সনকে ভালরূপে জানিতেন) বলেন যে, এমার্সনের গৃহে সদাই প্রাতঃকাল। প্রকৃতির শিশুর ন্যায় তাঁহার মন এত সদানন্দ, সরল ও স্বাধীন ছিল যে, তাঁহার গৃহে নিরানন্দ ও অশান্তি স্থান পাইত না এবং লোকে শ্রান্ত, ক্লান্ত ও তাপিত প্রাণে আসিয়া এই শান্তিধামে হৃদয় শান্তিপূর্ণ করিয়া ফিরিত। তাই এমার্সনের লেখার মধ্যে শোক, দুঃখ ও নিরুৎসাহের কথা নাই। তিনি সকলের নিকট আশা ও উৎসাহের বাণী প্রচার করিয়াছেন।

কংকর্ডের ঋষি প্রথমবার ইউরোপ ভ্রমণে বহির্গত হইয়া কার্লাইল, কলেরিজ, শোয়েডেনবুর্গ প্রভৃতি মনীষীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। কার্লাইলের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠ ও চিরস্থায়ী হয়। কার্লাইল ও এমার্সনের সাক্ষাতের সময় শোনা যায়, বহুক্ষণ দুইজন মনীষী নিস্তব্ধ ছিলেন। বিদায়ের সময় কার্লাইল এমার্সনকে একখানি ভগবদ্ গীতার ইংরাজি অনুবাদ উপহার দেন। উহা পাঠ করিয়া এমার্সন ভারতীয় সাহিত্যের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এবং ক্রমে ক্রমে অধিকভাবে ভারতীয় ভাবে ভাবান্বিত হইতে থাকেন। কার্লাইল এমার্সনের প্রবন্ধাদি ইংলণ্ডে প্রচার করেন এবং এমার্সনও কার্লাইলের পুস্তকাদি আমেরিকায় প্রচার করেন। কার্লাইলকে ইংলণ্ডের এমার্সন এবং এমার্সনকে আমেরিকার কার্লাইল বলা হয়। এমার্সনের বহুমুখী প্রতিভা ও চিন্তার অসীম মৌলিকতার জন্য তাঁহাকে বেকন, প্লেটো, গেটে প্রভৃতির সহিতও তুলনা করা হইয়াছে।

১৮৩৩ খ্রীঃ এমার্সন ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিয়া বৃদ্ধা মাতার সহিত কংকর্ডে বাস করেন। সেই সময় বোষ্টন সহরে একটী হল ভাড়া লইয়া প্রত্যেক বৎসর শীতকালে তিনি বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার বক্তৃতাগুলিতে প্রথমতঃ শ্রোতা অল্পই আসিত। বোষ্টনের Society of Natural History এবং Mechanics Institute এ তিনি প্রথম বক্তৃতাবলী প্রদান করেন। অল্প শ্রোতা দেখিয়া তিনি বিষণ্ণ হইয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়, কারণ ফিংকিনাটী সহর হইতে একবার বক্তৃতার নিমন্ত্রণ আসিলে তিনি উদ্যোক্তাকে লিখিয়াছিলেন—"মহাশয়, আমার বক্তৃতার জন্য একটী ছোট হলের বন্দোবস্ত করিলেই ভাল হইত, কারণ আমার বক্তৃতা শুনিতে যতলোক আসিবে তাহাতে এই হলের এক অংশও পূর্ণ হইবে না।" তাঁহার সারগর্ভ বক্তৃতা জনসাধারণের বোধগম্যও হইত না। একবার মেকানিকস্ ইনষ্টিটিউটে বক্তৃতা দিবার কালে দুই বন্ধু (মেকানিক) তাঁহার বক্তৃতার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া কানে কানে একজন অপরকে বলিতেছিল—"ভাই, তোমার কি মনে হয় না, আমরা যদি মাথার উপর দাঁড়াইতাম, এঁর বক্তৃতা আরও ভালভাবে বুঝিতে পারিতাম।' বক্তারূপে তাঁহার খ্যাতি ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করে।

১৮৩৬।৩৭ সালে তিনি বোষ্টনের ম্যাসনিক টেম্পলে যে বক্তৃতাগুলি দেন তাহাতে অধিক সংখ্যক শ্রোতার সমাবেশ হয় এবং উহা উচ্চ প্রশংসা-লাভ করে। বক্তৃতার মধ্য দিয়া তাঁহার ব্যক্তিত্ব শ্রোতার মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিত এবং তাহাদের জীবনে জাগরণ আনিত। ১৮৩৮ খ্রীঃ তিনি হার্ভার্ড কলেজে "The American Scholar" সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় যে বক্তৃতা দেন তাহাতে তিনি শীঘ্র আমেরিকার একজন শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল মনীষিরূপে খ্যাতিলাভ করেন।' ১৮৩৯ খৃঃ

কেম্ব্রিজের ডিভিনিটি স্কুলে ঐতিহাসিক খ্রীষ্টধর্ম্মের দোষাবলী প্রদর্শন করিয়া তিনি যে উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা দেন তাহাতে পাদ্রীগণের তুমুল প্রতিবাদ উপস্থিত হয়। তিনি প্রতিবাদে নিষ্প্রভ বা পশ্চাৎপদ হইলেন না এবং অন্তরের মধ্যে মুক্তির অন্বেষণ করিতে এবং মানুষের মধ্যে দেবত্বের অধিষ্ঠান দর্শন করিতে সকলকে আহ্বান করেন। তাঁহার চিন্তারাশি এত হৃদয়স্পর্শী ছিল যে, লোকে তাহা বুঝিতে না পারিলেও বিশ্বাস করিত। ঐহিক জীবনের অপূর্ণতার দ্বারা মানুষের কোন স্থায়ী ক্ষতি হয় না—তিনি এই আশ্বাসের বাণী প্রচার করিয়া সকলকে নৈতিক পরিপূর্ণতা লাভের জন্য উদ্বুদ্ধ করিতেন এবং নিজেও উহা সাধনা দ্বারা লাভ করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, "উহা লাভ করাই আমার জীবনের একমাত্র আদর্শ। উহার জন্যই সমাজ হইতে দূরে আছি। উহার অভাবে কত বিনিদ্র রজনী যে অশ্রুপাত করিয়াছি তাহা কেবল ঈশ্বরই জানেন। অশ্রুপাতে অনেক রাত্রিতে আমার উপাধান সিক্ত হইয়াছে।"

১৮৪৭ খ্রীঃ এমার্সন দ্বিতীয়বার গ্রেটব্রিটেন পরিভ্রমণে যাইয়া লণ্ডন, লিভারপুল, এডিনবার্গ, ম্যাঞ্চেষ্টার প্রভৃতি শহরে বহু শ্রোতার সম্মুখে বক্তৃতা প্রদান করেন। এইবার তিনি প্যারিসেও গিয়াছিলেন। ১৮৪৮ খ্রীঃ জুলাই মাসে প্রাচীন জগৎ হইতে স্বদেশে ফিরিয়া তিনি গ্রন্থ প্রকাশে প্রবৃত্ত হন। লেখকরূপেও তাঁহার খ্যাতি ধীরে ধীরে বিস্তৃত হয়। Nature নামক তাঁহার প্রথম পুস্তকের মাত্র ৫০০ কপি দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরে বিক্রয় হয়। অবশ্য বর্ত্তমানে তাঁহার পুস্তকাবলী পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমাদৃত হইতেছে। সেক্স্‌পিয়রের নাটকাবলী প্রথমতঃ আদৌ বিক্রয় হইত না। প্রবন্ধ ব্যতীত তিনি কবিতাও লিখিয়াছেন। তাঁহার প্রথমজাত সন্তানের মৃত্যুতে Threnody নামক একটী সুন্দর কবিতা লিখিয়াছেন। শেষ বয়সে তিনি মার্কিন রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে অশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মান পাইয়াছিলেন। ১৮৬৬ খ্রীঃ হার্ভার্ড কলেজের কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে 'ডক্টর অব্ ল' এই ডিগ্রী প্রদান করেন এবং ১৮৭০ খ্রীঃ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অনেকগুলি পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা দেন। ১৮৭২ খ্রীঃ তাঁহার বাসগৃহ দগ্ধ হয় এবং জনসাধারণ অর্থ সংগ্রহ করিয়া উহা পুনর্নির্ম্মাণ করিয়া দেন। এই বৎসর তিনি তৃতীয়বার বিদেশ ভ্রমণে যাত্রা করিয়া মিশরদেশ অবধি গমন করেন। বার্দ্ধক্যে তাঁহার স্মৃতিশক্তি ও দৈহিক বলের হ্রাস হয় কিন্তু তাঁহার চরিত্র সর্ব্বদাই উন্নত এবং মন জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত শান্ত ও সৌম্য ভাবাপন্ন ছিল। আমেরিকার প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক হেনরি ভান্ ডাইক এমার্সনকে বিদ্বান ব্রাহ্মণের সহিত তুলনা করিয়াছেন।

এমার্সন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কারে যোগ না দিলেও এই সকল ব্যাপারে আন্তরিক সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেন। ১৮৫৬ খ্রীঃ তিনি বলেন, 'হয় দাসত্ব প্রথা তুলিয়া দিতে হইবে, নচেৎ আমাদের স্বাধীনতাও ত্যাগ করা উচিত।' তাঁহার বক্তৃতা ও লেখা প্রায় একই রকমের ছিল। তাঁহার লিখিবার প্রণালীর বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি একটী বিষয় মনে রাখিয়া মন হইতে অন্য চিন্তা সরাইয়া দিতেন এবং এই বিষয়ে যে সকল চিন্তা মনে উদিত হইত তাহা তাঁহার চিন্তা-ভাণ্ডারে সঞ্চয় করিতেন। বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেন যে, কোন বিষয়ে বলিবার বা লিখিবার পূর্ব্বে সেই বিষয়ে তাঁহার চিন্তাগুলি অসম্বদ্ধ থাকে কিন্তু মন স্থির করিবার সঙ্গে সঙ্গেই চিন্তারাশি শ্রেণীবদ্ধ হইয়া মনে ভাসিয়া উঠে। এমার্সনের চিন্তার বিশেষত্ব এই যে, তিনি কোনও সমালোচনার বা প্রতিবাদের উত্তর দেন নাই। তিনি সহজ, সুন্দর ও সত্য চিন্তাগুলি পাঠককে উপহার দিয়াই নিশ্চিন্ত। এমন সার্ব্বভৌমিক

উদার দৃষ্টিতে তিনি বিষয়গুলির আলোচনা করিয়াছেন যে, সব শ্রেণীর লোক তাহা গ্রহণ করিতে পারিবেন। তিনি সাধারণ নগণ্য মানুষকেও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন এবং তাহাদের কথা ধীরভাবে শ্রবণ করিতেন; কারণ তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, শিক্ষিত ও শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীর নগণ্য মানুষের নিকটও কিছু না কিছু শিখিবার আছে। তিনি বলিতেন, 'ধর্মভাব মানুষের সহজাত, উহা নষ্ট হইবার নহে। উহাকে উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে ফেলিয়া ভালভাবে পরিচালনা করিলে উহা সমৃদ্ধ ও পূর্ণ হইবে।' তিনি মহাপুরুষগণের জীবনী ও প্রাচীন গ্রন্থাবলী পড়িতে ভালবাসিতেন এবং কোন পুস্তক অন্ততঃ এক বৎসর (প্রকাশের পর) পুরাতন না হইলে তাহা পড়িতে নিষেধ করিতেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে, অসত্য ও অগভীর কোন চিন্তাই জগতে স্থায়ী হয় না, তাই তিনি চীনের কনফুসিয়াস, পারস্যের হাফিজ, গ্রীসের প্লেটো ও সক্রেটিশ, ভারতের ঋষিদের লিখিত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করিতেন। তিনি বলিতেন, "আমাদের অন্তরে উচ্চ চিন্তাগুলি সুপ্ত আছে, সেগুলি জাগ্রত করিবার জন্যই এই সকল গ্রন্থ অধ্যয়ন ও চিন্তা করা উচিত। প্রকৃতির সংস্পর্শে থাকিলে উচ্চ চিন্তা মনে অনায়াসে অধিক জাগ্রত হয়।" কনফুসিয়াস বলিয়াছেন, "অধ্যয়ন ব্যতীত চিন্তা যেমন অর্থহীন, তেমনি চিন্তা ব্যতীত অধ্যয়নও নিষ্ফল। মানব-লিখিত গ্রন্থ অপেক্ষা প্রকৃতির পুস্তক অধ্যয়নে উপকার অধিক।"

এমার্সন হিন্দুদের ন্যায় ক্রমবিকাশবাদ ও আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, "মানুষ হইবার জন্য একটী পোকা বহু শরীর ধারণ করে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অনেক যুগের জন্মের অভিজ্ঞতার ফলে মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব হয়।" আবার তিনি ক্রমবিকাশ ও ঈশ্বরের সৃষ্টি—এই উভয় বাদের মধ্যে কোন বিরোধ দেখেন নাই। তাঁহার মতে ঈশ্বরের অলঙ্ঘ্যনীয় ইচ্ছাশক্তিই ক্রমবিকাশের পথে প্রকাশিত হইতেছে। ভগবানের সূক্ষ্ম ইচ্ছা স্থূল আকার পরিগ্রহ করিবার প্রণালীকে ক্রমবিকাশ বলা যাইতে পারে। তাঁহার "Society and Solitude," "Conduct of Life" প্রভৃতি পুস্তকের ভাব ও ভাষা অতি চমৎকার। এমার্সনকে আমেরিকার আচার্য্য বা বাইবেল বলা যাইতে পারে। তিনি বলিয়াছেন, "নিজের জীবন সংযত ও উন্নত করিবার জন্য যাহা যাহা আবশ্যক তাহা মানুষের অন্তরেই নিহিত রহিয়াছে। মানুষ একটু অন্তর্মুখীন হইলেই তাহা বুঝিতে পারে, মানুষ নিজেই নিজের ভাল মন্দ করিতে পারে—অন্য কেহ নহে।"

মানুষ যাহা কিছু জানে বা জগতে যাহা কিছু আছে তাহার সদৃশ সত্তা মানবাত্মার মধ্যেই আছে। কাজেই বহির্জগতের বস্তু অধ্যয়ন না করিয়া মানুষ যদি অন্তর্জগতে আত্মার অন্তরতম প্রদেশে ডুবিয়া অন্বেষণ করে, সে সমস্ত জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে। জীবনের উদ্দেশ্যই বোধ হয়, নিজেকে নিজের সহিত উত্তমরূপে পরিচিত করা। "The highest revelation is that, God is in every man অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ভগবান্ বিরাজমান, ইহাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান।"

এমার্সনের কয়েকটী অমূল্য বাণী পাঠককে উপহার দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। "যিনি অন্নদান করেন, তিনি অল্প লোকেরই সেবা করেন, কিন্তু যিনি সত্যপালন করেন, তিনি সকলের সেবা করেন।" "কবি, দার্শনিক ও সাধুর নিকট সকল বস্তুই পবিত্র, সমস্ত কার্য্যই লাভজনক, সবদিনই শুভ, সব মানুষই মহৎ।" "ভগবান্‌কেই চিন্তা কর, তাঁহাকেই ভালবাস, তাহা হইলে তুমি যেখানে যাইবে, তাহাই তীর্থস্বরূপ হইবে, তুমি যেখানে বাস করিবে, তাহাই মন্দিরে পরিণত হইবে।"

"তুমি মুখে কিছু বলিও না, তুমি যাহা তাহা তোমার শরীরে এবং শিরোদেশে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত এবং তাহা এত উচ্চৈঃস্বরে কথিত হইতেছে যে, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা কেহই শুনিতে পাইতেছে না।" "প্রত্যেক সমস্যার সমাধানে আমাদের অসন্তোষ স্থায়ীভাবে দূর হয় না, তাহার কারণ এই যে, আত্মা অমর, এই নশ্বর বিশ্বের কোন বস্তুই ইহাকে চির-তৃপ্ত করিতে পারে না।" "সত্যের প্রকৃত সম্মান দিতে হইলে কায়মনোবাক্যে সত্যের সেবা করা কর্ত্তব্য।"

ভুবনের গান

শ্রীঅমরেশ দত্ত

একদা ভুবন-পথে,—
যে-গান শুনেও রয়েছি স্তব্ধ,
রয়েছি তন্দ্রাকুল।
সে গান আজিকে ধ্বনিয়া উঠেছে প্লাবিয়া
আমার বুকের মাঝে,
সেই সুরধারা উঠেছে প্লাবিয়া
হৃদয়ের দুই কূল।

আমার মর্ম্মদ্বারে,—
হেনেছে সে ফুলশর, দিয়েছে পরাণে
মন্দ মধুর দোলা,
অলখে রহিয়া কহিছে সে ডাকি
আমার কানে কানে :
ওঠ ওগো ওঠ জেগে ;
ঝংকারে তাই উঠেছে রণিয়া,
যা ছিলো হৃদয়ে তোলা।

এতদিন যাহা করেছিনু ভয়
ভয়ার্ত্ত জীব সম ; ভেবেছিনু যাহা জ্বালিবে পরাণে
মৃত্যুর হোমানল।
সে আজ ঢেলেছে জাহ্নবীধারা,
স্নিগ্ধ অমিয়ময়,
সে মোরে দিয়েছে জীবনের মোহ
বাণী তার কল কল,

এতোদিন আমি বসেছিনু শুধু,
অন্ধ বধির সম, ভুলেছিনু আমি—
আমি সারা পৃথিবীর ;
আমার বর্ণে বিফল আঘাত করি'
ফিরেছে সে মহাগান,
পশুসম শুধু ক্ষুধা-নিবারণে
হয়েছিনু অস্থির।

ফাল্গুন মোর এসেছে আজিকে
সুন্দর নিরুপম, অন্ধ কুঁড়িটী
ফুটিয়াছে মোর প্রাণে।
আপন গন্ধে আমারে ভুলেছি তাই,
ভুলিয়াছি আর বেদনা নিরন্তর।
পাগল—হয়েছি চরম পাগল—
সেই ভুবনের গানে।

হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভ

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী হইতে ১৩ই এপ্রিল পর্য্যন্ত পুণ্যতীর্থ হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভ হইয়াছে। এই উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে লক্ষ লক্ষ সাধু-সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ নরনারী এই পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছিলেন। এই স্থানটী হিমালয়স্থিত কেদারনাথ ও বদরীনারায়ণ তীর্থে যাইবার দ্বারস্বরূপ বলিয়া শৈব ও শাক্তগণ ইহাকে 'হরদ্বার' এবং বৈষ্ণবগণ 'হরিদ্বার' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। এখানে সর্ব্বতীর্থ-স্বরূপিণী গঙ্গা হিমালয় হইতে প্রথম মর্ত্যধামে অবতীর্ণা, এইজন্য ইহার অপর নাম 'গঙ্গাদ্বার'।

হরিদ্বারে ব্রহ্মকুণ্ড সর্ব্বপ্রধান তীর্থক্ষেত্র। কুম্ভযোগের সময় এই স্থানে স্নান করাই কুম্ভের প্রধান অঙ্গ। এখানে প্রজাপতি ব্রহ্মার যজ্ঞে বিষ্ণু আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। এ পুণ্যক্ষেত্রে গঙ্গা ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে প্রবেশ করেন। ব্রহ্মা কমণ্ডলু হইতে যেস্থানে গঙ্গাধারাকে মুক্তি দিয়াছিলেন, সেই স্থানে ব্রহ্মকুণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে। কপিল মুনিও এইস্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন। কুণ্ডের পার্শ্বে প্রস্তরচিহ্নিত 'হর কি প্যারী' 'হরি কি প্যারী' বা 'হরি কি চরণ' আছে। সম্প্রদায়ভেদে ইহা হর-পাদপদ্ম বা হরি-পাদপদ্ম জ্ঞানে পূজিত। তীর্থযাত্রিগণ ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানান্তে এই পাদপদ্ম দর্শন করেন।

ব্রহ্মকুণ্ডের সৌন্দর্য্য প্রকৃতই অবর্ণনীয়। কুণ্ডের তীরেই মনসার পাহাড়। ইহার শীর্ষদেশে মনসা দেবীর মন্দির এবং পাদদেশ হইতে সোপানাবলী কুণ্ডের একদিকের ঘাটে আসিয়া নামিয়াছে। অপরদিকে নাতিবৃহৎ বাঁধান চাতাল। এখানে দানবীর বিরলার নবনির্ম্মিত 'ক্লক্-টাউয়ার' স্থানটীর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে। পাহাড়টীর পাদদেশস্থিত কয়েকটী সুদৃশ্য মন্দিরের গাত্র ধৌত করিয়া স্বচ্ছসলিলা সুনীল গঙ্গার একটী প্রবাহ ব্রহ্মকুণ্ড হইয়া খরস্রোতা গঙ্গার বৃহৎ প্রবাহে যাইয়া মিলিত হইয়াছে। যাত্রীদের পূজার্চ্চনার সুবিধার জন্য কুণ্ডের পার্শ্বেই উচ্চ স্থানে একটী বাঁধান বৃহৎ 'প্লাটফর্ম্ম'। কুম্ভের কয়দিন এখান হইতে যতদূর দৃষ্টি চলে দেখা যাইত, ধর্ম্মকে জীবনে প্রত্যক্ষভাবে যেন রূপায়িত করিবার জন্যই চতুর্দ্দিকে জন-সমুদ্র আকুল আগ্রহে তরঙ্গাকারে ছুটিয়া চলিয়াছে! প্লাটফর্ম্ম হইতে ব্রহ্মকুণ্ড ও অনতিদূরে চণ্ডীর পাহাড়ের দৃশ্য মনোরম। নিবিড় বনাকীর্ণ এই পাহাড়টীতে চণ্ডিকাদেবী, বিশ্বেশ্বর মহাদেব প্রভৃতির মন্দির আছে। ব্রহ্মকুণ্ডের মধ্যস্থলে একটী গোলাকৃতি ছোট মন্দির। অনেকে স্নানের সময় ইহা প্রদক্ষিণ করেন। কুম্ভের সময় সন্ধ্যা হইতে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত এই মন্দিরটীর দ্বিতলের বারান্দায় ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন প্রদর্শিত হইয়াছে। ভগীরথ অগ্রে চলিয়াছেন, গঙ্গাদেবী তাঁহার পশ্চাৎ যাইতেছেন, উভয়েই যেন জীবন্ত। কুণ্ডসংলগ্ন ক্ষুদ্র সেতুর উপর হইতে ব্রহ্মকুণ্ডে অগণন মৎস্য-বিচরণের দৃশ্য উপভোগ্য। ব্রহ্মকুণ্ডের দক্ষিণ পার্শ্বে আর একটী বিস্তীর্ণ বাঁধান চাতাল। ইহার এক দিকে অট্টালিকা শ্রেণী এবং অপর দিকে সুনীল গঙ্গা ভীমনাদে প্রবল-বেগে প্রবাহিতা। প্রত্যহ অপরাহ্ণ হইতে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত এই মনোরম স্থানটী সভা, কথকতা ও ভজন-সঙ্গীতে মুখরিত থাকে। কুম্ভ উপলক্ষে এখানে সর্ব্বদা অস্বাভাবিক জনতা ছিল। চাতালের সন্নিকটে গঙ্গাগর্ভের একটী ক্ষুদ্র চড়ায় এক দল

স্বেচ্ছাসেবক তাঁবু খাটাইয়াছিলেন। রাত্রিকালে শত শত বিদ্যুতালোকে চাতালটী অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। সন্ধ্যায় ব্রহ্মকুণ্ডে পতিত-পাবনী গঙ্গার জাঁকজমকপূর্ণ আরাত্রিক ও প্রদীপ-ভাসানের দৃশ্য চমৎকার। অসংখ্য প্রদীপ ও পুষ্প স্বচ্ছসলিলা গঙ্গাবক্ষে তরঙ্গের তালে তালে নৃত্য করিতে করিতে চলিয়াছে। কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তিগদ্‌গদচিত্তে অনেকে দাঁড়াইয়া এবং অনেকে ধ্যানস্তিমিতনেত্রে গঙ্গাতীরে বসিয়া আছেন। এই গভীর ভাবোদ্দীপক দৃশ্য দর্শকের মনকে এক অজানার রাজ্যে লইয়া যায়। কুম্ভ উপলক্ষে সাধুদের শোভাযাত্রা ও যাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য গঙ্গাবক্ষে কয়েকটী অস্থায়ী সেতু নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। এই সেতুগুলিতে সর্ব্বদা লোকের ভিড় লাগিয়াই থাকিত। কুম্ভের সময় সেতু হইতে চারিদিকের দৃশ্য যথার্থই মনোরম আকার ধারণ করিয়াছিল।

ব্রহ্মকুণ্ড ভিন্ন হরিদ্বারে প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত কয়েকটী দর্শনীয় স্থান আছে। গঙ্গাতীরে কুশাবর্ত্ত-ঘাটে যাত্রিগণ স্নান আহ্নিক শ্রাদ্ধতর্পণাদি করেন। এই স্থানে গঙ্গা মহর্ষি দত্তাত্রেয়ের কুশ ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন, তিনি গঙ্গা-প্রবাহকে ফিরাইয়া আনিয়া কুশ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া পাণ্ডারা বলেন। ব্রহ্মকুণ্ডের নিকটেই ভীমগড়ায় একটী মন্দিরে ভীমেশ্বর মহাদেব ও একটী কুণ্ড আছে। পঞ্চপাণ্ডবের মহাপ্রস্থানের সময় ভীম এই স্থানে গদা ফেলিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ। হরিদ্বারে অন্যান্য দর্শনীয় স্থানের মধ্যে মায়াদেবীর মন্দির বিখ্যাত। ইহাতে ত্রিমস্তকধারিণী চতুর্ভুজা দুর্গামূর্ত্তি ও সম্মুখে অষ্টবাহু সর্ব্বনাথ শিব পূজিত। এতদ্ভিন্ন নির্লোকেশ্বর শিব, বিলোকেশ্বর শিব, গৌরীকুণ্ড, সূর্য্যকুণ্ড, ঋষিকুলের মহাদেব ও কয়েক মাইল উত্তরে সপ্তধারা যাত্রীরা দর্শন করেন।

হরিদ্বারের খালের (canal) অপর তীরে আদি গঙ্গাতটে কনখল। এখানে গঙ্গা ত্রিধারায় বিভক্ত হইয়া চলিয়াছেন। চণ্ডীর পাহাড়ের পাদদেশ দিয়া প্রবাহিতা নীলধারার তটদেশ নির্জ্জন রমণীয় স্থান। এখানকার উপলখণ্ড সমূহের উপর বসিয়া অনেকে ধ্যান জপ করেন। কনখলের দক্ষিণে দক্ষালয়ে দক্ষেশ্বর শিব এবং অনতিদূরে সতীকুণ্ড যাত্রীদের বিশেষ দ্রষ্টব্য তীর্থক্ষেত্র। সতীকুণ্ডে পতিনিন্দা শ্রবণে সতী দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন কনখলের দক্ষিণ সীমায় মায়াপুর নামক স্থানে আর্য্য-সমাজীদের গুরুকুলের বিবিধ প্রতিষ্ঠান দর্শনীয়।

হরিদ্বারের ১৪ মাইল উত্তরে গঙ্গার একধারে ঋষিকেশ ও অপর ধারে স্বর্গাশ্রম ও লছমনঝোলা। এখানে গঙ্গা হিমালয় পর্ব্বত হইতে কলনাদে মর্ত্ত্যে অবতরণ করিতেছেন। এই অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যমণ্ডিত তপোক্ষেত্রে শত শত সাধু-সন্ন্যাসী তপস্যা করিতেছেন। ঋষিকেশে ছত্র, ভরতের মন্দির, কৈলাস আশ্রম, লছমনঝোলায় লক্ষ্মণ ও সত্যনারায়ণের মন্দির এবং স্বর্গাশ্রমে গঙ্গাতীরে সাধুদের ভজন কুটির প্রভৃতি দর্শন তীর্থযাত্রার অঙ্গ। কুম্ভ যাত্রীমাত্রই এই সকল স্থান দর্শন করিয়াছেন। এ জন্য কুম্ভের সময় এই তীর্থক্ষেত্র-সমূহে যাত্রীদের খুব জনতা হইয়াছিল।

কুম্ভযোগের উৎপত্তি সম্বন্ধে পৌরাণিক উপাখ্যান আছে যে, দেবাসুরের সমুদ্রমন্থনকালে ধন্বন্তরি সমুত্থিত হইয়া একটী অমৃতপূর্ণ কুম্ভ দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট দিয়াছিলেন। ইন্দ্র উহা তৎপুত্র জয়ন্তের হস্তে দিলে তিনি কুম্ভ লইয়া স্বর্গে পলায়ন করেন। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য ইহা জানিতে পারিয়া দৈত্যগণকে কুম্ভ হস্তগত করিতে আদেশ করেন। ফলে কুম্ভ লইয়া দেবাসুরে যুদ্ধ হয় এবং দেবগণ পরাজিত হন। দেবগণ মনুষ্যলোকের মধ্যে হরিদ্বার, প্রয়াগ, উজ্জয়িনী ও নাসিকে এবং দেবলোকের আটটী স্থানে কুম্ভ লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। কথিত

আছে যে, দেবগণের হস্তচ্যুত হইয়া মর্ত্ত্যলোকের ঐ চারিটী স্থানে কুম্ভ হইতে কিছু সুধা পড়িয়া গিয়াছিল। ভগবান্ মোহিনীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সমস্ত সুধা দেবগণের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। দেবলোক মানুষের অগম্য, দেবকুম্ভে মানুষের যাইবার উপায় নাই। দেবলোকের দ্বাদশ দিন মর্ত্ত্যলোকের দ্বাদশ বৎসর তুল্য। কুম্ভ লইয়া দ্বাদশ দিন ও রাত্রিব্যাপী যুদ্ধ হয় এবং দ্বাদশটী স্থানে কুম্ভ রক্ষিত হইয়াছিল। এ জন্য প্রতি দ্বাদশ বৎসর অন্তর মর্ত্ত্যলোকের চারিটী স্থানে কুম্ভ হইয়া থাকে। এবার একাদশ বৎসর পর কুম্ভের বিশেষ যোগ হইয়াছিল। দেবাসুরের যুদ্ধের সময় দেবগণের মধ্যে বৃহস্পতি, সূর্য্য, চন্দ্র ও শনি কুম্ভ রক্ষা করিয়াছিলেন। এ জন্য এই দেবতাগণ বিভিন্ন রাশিতে অবস্থান করিলে বিভিন্ন স্থানে কুম্ভযোগ হয়। বৃহস্পতি কুম্ভরাশিতে এবং সূর্য্য মেষরাশিতে সংক্রমণকালে হরিদ্বারে, অমাবস্যা তিথিতে বৃহস্পতি মেষ রাশিতে এবং চন্দ্র ও সূর্য্য মকর রাশিতে অধিষ্ঠিত হইলে প্রয়াগে, অমাবস্যা-যোগে বৃহস্পতি সূর্য্য ও চন্দ্র কর্কট রাশিতে অবস্থিত হইলে নাসিকে এবং অমাবস্যা তিথিতে বৃহস্পতি সূর্য্য ও চন্দ্র তুলা রাশিতে সংযুক্ত হইলে উজ্জয়িনীতে পূর্ণকুম্ভযোগ হইয়া থাকে। প্রতি তিন বৎসর অন্তর এই চারিটী স্থানের এক একটীতে অৰ্দ্ধকুম্ভ হয়। অৰ্দ্ধকুম্ভেরও যোগ আছে।

অনেকে বলেন, বৌদ্ধদের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ "ধম্মসংগীতি" বা ধর্ম্ম-সম্মেলনের অনুকরণে হিন্দু-ভারতকে সংঘবদ্ধ রাখিবার জন্য আচার্য্য শঙ্কর কুম্ভমেলার প্রবর্ত্তন করেন। শঙ্করের পূর্ব্বে কুম্ভমেলার অনুষ্ঠান হইত কিনা তাহা সঠিক জানা যায় না। তবে আচার্য্য শঙ্করের প্রবর্ত্তিত দশনামী সন্ন্যাসীদের চেষ্টায় যে কুম্ভমেলা বিরাট আকার প্রাপ্ত হইয়া নিখিল ভারতের হিন্দুধর্ম্ম-সম্প্রদায়-সমূহের সম্মেলন ক্ষেত্ররূপে পরিণত হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। শঙ্করের মনে অখণ্ড হিন্দু-ভারত সংগঠনের একটী পরিকল্পনা ছিল। তিনি বিশাল ভারতের চারিপ্রান্তে চারিবেদ প্রাধান্যে চারিটী মঠ স্থাপন করিয়া তৎপ্রবর্ত্তিত সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের সাহায্যে হিন্দুগণকে ঐক্যবদ্ধ রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এ জন্য হিন্দুর মহাসম্মেলনক্ষেত্রস্বরূপ কুম্ভ দূরদর্শী আচার্য্য শঙ্করেরই কীর্ত্তি বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

কুম্ভে আচার্য্য শঙ্করের দশনামী সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়েরই প্রাধান্য। শঙ্করের চারিজন প্রধান শিষ্য চারিধামের চারি মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন। রামেশ্বরে শৃঙ্গগিরি মঠের অধ্যক্ষ তোটকাচার্য্যের পুরী ভারতী সরস্বতী, বদরিকাশ্রমে জ্যোসী মঠের অধ্যক্ষ আচার্য্য মণ্ডন মিশ্রের গিরি পর্ব্বত ও সাগর, দ্বারকায় সারদা মঠের অধ্যক্ষ আচার্য্য পদ্মপাদের তীর্থ ও আশ্রম এবং পুরুষোত্তমে গোবর্দ্ধন মঠের অধ্যক্ষ আচার্য্য হস্তামলকের বন ও অরণ্য নামক দশজন বিশেষ বিশেষ লক্ষণবিশিষ্ট শিষ্য হইতে দশনামী সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছে। বর্ত্তমানে সাগর অরণ্য ও পর্ব্বত বিশেষ দেখা যায় না। দশনামী সন্ন্যাসীরা সাধারণতঃ বেদান্ত-পন্থী ও অদ্বৈতবাদী।

কুম্ভে দশনামী সন্ন্যাসীদের সাতটী প্রধান আখড়ার কর্তৃত্ব দেখা যায়। দশনামী সন্ন্যাসী-মাত্রই এই আখড়াগুলির কোন না কোনটীর অন্তর্ভুক্ত। আখড়া সাতটীর নাম, যথা—নিরঞ্জনী, নির্ব্বাণী, যূনা, অটল, আনন্দ, আবাহন ও অগ্নি। পর্য্যায়ক্রমে ইহাদের বর্ত্তমান মণ্ডলেশ্বরদের নাম, যথা—স্বামী নরসিংহ গিরি, স্বামী জয়েন্দ্র পুরী, স্বামী পরমানন্দ গিরি, স্বামী ভাগবতানন্দ গিরি, স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি, স্বামী মুরলীধরানন্দ গিরি। অগ্নি যূনা আখড়ার অন্তর্ভুক্ত। অনেকের মতে আবাহনও যূনা আখড়ার অন্তর্গত। যূনা আখড়ায় নেপাল ও পঞ্চনদ প্রদেশের অনেক

সন্ন্যাসিনী আছেন। মণ্ডলেশ্বর সকলেই শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। ইঁহারা মন্ত্রদীক্ষা ও সন্ন্যাস দান করেন। আখড়া সাতটীর অন্তর্ভুক্ত সুখড়, কখড, ভৈরব, আলেখ্ প্রভৃতি নামীয় কয়েকটী উপ-আখড়া আছে।

নিরঞ্জনী ও নির্ব্বাণী আখড়ায় অনেক নাগা-সন্ন্যাসী আছেন। কোন কোন স্থানে অটল আখড়ায়ও নাগা সাধু দেখা যায়। নামরূপের জগৎ ও তদন্তর্গত পাঞ্চভৌতিক দেহ ইঁহাদের নিকট ভস্মে পরিণত, এ জন্য ইঁহারা সর্ব্বাঙ্গে ভস্মলেপন করেন। আপনাদিগকে নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত নিরাবরণ ব্রহ্মস্বরূপ ভাবনার সহায়ক মনে করিয়া নাগারা সম্পূর্ণ উলঙ্গ থাকেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে সময় সময় কৌপীন ধারণ করেন। নাগাদের কৌপীনের নাম নাগফণী। ইঁহারা অনেকে মাথায় জটা রাখেন। এক এক প্রকার জটার এক এক নাম আছে, যথা—পাকান জটার নাম নাগজটা, আলগা জটার নাম শম্ভুজটা, ছোট জটার নাম বাবরান। নাগাদের শিষ্য করিবার প্রথা নাই। ইহারা দীক্ষাগুরুর আশ্রয় ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হন। ইহাকে দেবপক্ষ গ্রহণ বলে। নাগারা অনেকে আখড়ায় থাকেন এবং অনেকে পরিব্রাজক-রূপে ভ্রমণ করেন। ইঁহাদের মধ্যে আলেখিয়া, ঊর্দ্ধবাহু, দঙ্গলী প্রভৃতি শ্রেণী-বিভাগ আছে। নাগা সন্ন্যাসীদের বীরত্ব, ত্যাগ, তিতিক্ষা, সংযম ও বৈরাগ্য প্রশংসনীয়। কথিত আছে, মুসলমানদের অত্যাচার হইতে মঠ, আখড়া ও সাধু-সন্ন্যাসীকে রক্ষা করিবার জন্য নাগা-সন্ন্যাসীর সৃষ্টি হয়। জয়পুর রাজ্যে এখনও নাগাসৈন্য আছে।

আখড়া ভিন্ন ভারতের বিভিন্ন স্থানে অনেক মঠেও সন্ন্যাসীরা অবস্থান করেন। এই মঠগুলির মধ্যে আচার্য্য শঙ্করের স্থাপিত চারিধামের চারিটী মঠের প্রাধান্যই বেশী। প্রত্যেক মঠে স্বতন্ত্র বেদ, তীর্থ, ক্ষেত্র, গোত্র, দেব ও মহাবাক্য আছে। দশনামী সন্ন্যাসীমাত্রকেই এই সকল বিষয়ে পরিচয় দিতে হয়। আখড়া ও মঠে প্রভেদ আছে। মঠের উপর মোহন্তের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব। আখড়ার আচার্য্য বা মণ্ডলেশ্বরকে সকলের মত গ্রহণ করিয়া কাজ করিতে হয়।

সন্ন্যাসীরা আখড়া ও মঠ উভয় স্থানে এবং দণ্ডীরা কেবল মঠে থাকেন। স্ত্রী পুত্রাদি বর্জ্জিত ব্রাহ্মণ ভিন্ন কেহ দণ্ডী হইতে পারেন না। শিখা-সূত্র ত্যাগ এবং দণ্ড, কমণ্ডলু ও গেরুয়া বস্ত্র গ্রহণ করিয়া দণ্ডী হইতে হয়। দণ্ডটী গেরুয়া বস্ত্রাবৃত এবং যজ্ঞোপবীত জড়িত থাকে। দণ্ডীরা দণ্ডকে পরমপদার্থ বলিয়া ভাবনা করেন। দণ্ডীদের মতে ভারতী সম্প্রদায়ের অর্দ্ধাংশ এবং সরস্বতী তীর্থ ও আশ্রম শঙ্করের প্রকৃত শিষ্য এবং অবশিষ্ট সাড়ে ছয় শ্রেণী স্বধর্ম্মভ্রষ্ট। ইঁহারা দণ্ড গ্রহণ করিয়া উল্লিখিত চারিটী উপাধির এক একটী গ্রহণ করেন। দণ্ডীরা অগ্নি স্পর্শ ও ব্রাহ্মণ ভিন্ন কাহারও অন্ন ভোজন করেন না। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ দ্বাদশ বৎসর পর দণ্ডত্যাগ করিয়া পরমহংস আশ্রম অবলম্বন করেন। দণ্ডিগণের মধ্যে কুলাচারী দণ্ডী, দণ্ডী পরমহংস, ঘড়বাড়ী দণ্ডী প্রভৃতি শ্রেণীভেদ আছে।

সন্ন্যাসিগণের মধ্যে সাধারণতঃ কুটীচক, বহূদক, হংস ও পরমহংস সম্প্রদায় প্রধান। ভ্রমণাদির সামর্থ্য না থাকিলে কুটীচক এবং সামর্থ্য থাকিলে বহূদক সন্ন্যাসের ব্যবস্থা। হংস-সন্ন্যাসী ব্রহ্মলোকে যাইয়া এবং পরমহংস-সন্ন্যাসী ইহলোকেই তত্ত্ব-জ্ঞান লাভের কামনা করেন। এই সম্প্রদায়সমূহ মোক্ষাভিলাষী। পরমহংসের দলকে মণ্ডলী বলে। পরমহংস-মণ্ডলীর অধ্যক্ষের উপাধি স্বামী। উল্লিখিত চারি প্রকার সন্ন্যাসীর মধ্যে অধুনা পরমহংস-সম্প্রদায়ের সংখ্যাই বেশী। দণ্ডী পরমহংস ও অবধূত পরমহংস ভেদে দুই শ্রেণীর পরমহংস-সন্ন্যাসী আছেন।

ক্রমশঃ

পঞ্চদশী

অনুবাদক পণ্ডিত শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়

৩। *জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ আভ্যন্তর বিষয়েরও গ্রাহক*

'তাহারা সাধারণতঃ বহির্মুখ হইয়া ঘটপটাদি বাহ্যবিষয়ের অভিমুখে দৌড়ায়'—ইহার দ্বারা যে সূচিত হইয়াছে, ইন্দ্রিয় কোন কোন সময়ে আভ্যন্তর বিষয়ও গ্রহণ করে, সেই আভ্যন্তরবিষয়গ্রাহকতা দুই শ্লোকে বর্ণনা করিতেছেন :—

কদাচিৎ পিহিতে কর্ণে শ্রূয়তে শব্দ আন্তরঃ।
প্রাণবায়ৌ জাঠরাগ্নৌ জলপানেঽন্নভক্ষণে ॥৮
ব্যজ্যন্তে হ্যান্তরাঃ স্পর্শা মীলনে চান্তরং তমঃ।
উদ্গারে রসগন্ধৌ চেত্যক্ষাণামান্তরগ্রহঃ ॥৯

অন্বয়—কদাচিৎ কর্ণে পিহিতে প্রাণবায়ৌ জাঠরাগ্নৌ (যঃ) আন্তরঃ শব্দঃ (অস্তি, সঃ) শ্রূয়তে। জলপানে অন্নভক্ষণে চ আন্তরাঃ স্পর্শাঃ (অভি) ব্যজ্যন্তে। মীলনে চ আন্তরম্ তমঃ (উপলভ্যতে); উদ্গারে চ রসগন্ধৌ গৃহ্যেতে। ইতি অক্ষাণাম্ আন্তরগ্রহঃ (ভবতি)।

অনুবাদ—কিন্তু কোন সময়ে কর্ণদ্বার রুদ্ধ করিলে প্রাণবায়ুতে ও জাঠরাগ্নিতে যে আভ্যন্তর শব্দ আছে, তাহা শুনিতে পাওয়া যায়। জলপান করিলে এবং অন্নভক্ষণ করিলে শীতোষ্ণাদিরূপ আভ্যন্তর স্পর্শ পরিস্ফুট হয়। চক্ষুনিমীলন করিলে ভিতরের অন্ধকার এবং উদ্গার উঠিলে ভিতরের রস ও গন্ধ অনুভূত হয়। এই প্রকারে ইন্দ্রিয়গণ আভ্যন্তরীণ গুণ গ্রহণ করিয়া থাকে।

টীকা—"কদাচিৎ কর্ণে পিহিতে"—কোনও সময়ে কর্ণের অপিধান বা হস্তাদির দ্বারা আচ্ছাদন করিলে পর, "প্রাণবায়ৌ জাঠরাগ্নৌ চ"—প্রাণবায়ুতে এবং জাঠরাগ্নিতে বিদ্যমান (আন্তর শব্দ শ্রুত হয়)। *"জলপানে অন্নভক্ষণে চ"—জলপান করি*বার কালে এবং অন্নভক্ষণসময়ে, "আন্তরঃ স্পর্শঃ (অভি)ব্যজ্যন্তে"—আভ্যন্তরীণ স্পর্শসকল অভিব্যক্ত হয়। (আভ্যন্তরীণ রূপাদি দেখাইতেছেন)—"মীলনে চ আন্তরং তমঃ"—চক্ষু নিমীলিত করিলে অভ্যন্তরের অন্ধকারের উপলব্ধি হয়। 'উদ্গারে চ রসগন্ধৌ (গৃহ্যেতে)'—উদ্গার উঠিলে আভ্যন্তরের রস ও গন্ধ অনুভূত হয়। "ইতি অক্ষাণাম্ আন্তরঃ গ্রহঃ"—এই প্রকারে ইন্দ্রিয়সমূহের আভ্যন্তর বিষয়ের গ্রহণ বা অনুভব হয়। 'অক্ষাণাম্'—এই শব্দে কর্তৃকারকে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে, যেমন 'রামের বনগমন' এইস্থলে রাম গমন ক্রিয়ার কর্তা এবং বন হইতেছে গমন ক্রিয়ার কর্ম্ম, সেইরূপ 'আন্তর বিষয়' হইতেছে গ্রহণ ক্রিয়ার কর্ম্ম এবং 'ইন্দ্রিয়' হইতেছে সেই গ্রহণ ক্রিয়ার কর্তা।

(৩) কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বর্ণন

(ক) পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ব্যাপার

এইরূপে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ব্যাপার বর্ণনা করিলেন; তদনন্তর যাঁহারা কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, সেই নৈয়ায়িকদিগকে লক্ষ্য করিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিবার জন্য সেই অস্তিত্বের সমর্থকহেতুস্বরূপ তাঁহাদের ব্যাপারসমূহ বর্ণনা করিতেছেন :—

পঞ্চোক্ত্যাদানগমনবিসর্গানন্দকাঃ ক্রিয়াঃ।
কৃষিবাণিজ্যসেবাদ্যাঃ পঞ্চস্বন্তর্ভবন্তি হি ॥১০

অন্বয়—উক্ত্যাদানগমনবিসর্গানন্দকাঃ (ইতি) পঞ্চ ক্রিয়া (প্রসিদ্ধাঃ) (ভবন্তি)। কৃষিবাণিজ্যসেবাদ্যাঃ পঞ্চসু হি অন্তর্ভবন্তি।

অনুবাদ—সেই পাঁচটি ক্রিয়া সর্ব্বজনবিদিত ভাষণ, গ্রহণ, গমন, মলোৎসর্গ ও আনন্দ বা মৈথুন। কৃষিবাণিজ্যসেবাদি সকল কর্ম্ম এই পাঁচটির অন্তর্গত।

টীকা—উক্তি, আদান, গমন, বিসর্গ ও আনন্দ এই পাঁচটি শব্দের দ্বন্দ্বসমাস। সেই ভাষণ, আদান, গমন, মলত্যাগ ও মৈথুন নামক পাঁচটি ক্রিয়া প্রসিদ্ধ অর্থাৎ সর্ব্বজনবিদিত, এইরূপে 'প্রসিদ্ধ" এই শব্দের অধ্যাহার করিয়া অর্থ করিতে হইবে। (শঙ্কা) ভাল, কৃষিকর্ম্ম প্রভৃতি আরও আরও কর্ম্ম ত' রহিয়াছে, তাহা হইলে কি হেতু বলা হইল, সেই ক্রিয়া পাঁচটি বৈ নহে? (সমাধান) কৃষি, বাণিজ্য, সেবা, ধাবন, আকুঞ্চন, প্রসারণ ইত্যাদি সমস্ত ক্রিয়া উক্ত পাঁচটি ক্রিয়ারই অন্তর্গত।

(খ) কর্ম্মেন্দ্রিয়গণের নাম, অস্তিত্বে প্রমাণ ও স্থান

ভাল, কোন্ কোন্ ইন্দ্রিয় (যথাক্রমে) ঐ সকল ক্রিয়া উৎপাদন করে? এই হেতু বলিতেছেন—

বাক্‌পাণিপাদ পায়ূপস্থৈরক্ষৈস্তৎক্রিয়াজনিঃ।
মুখাদিগোলকেষ্বাস্তে তৎকর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চকম্॥১১

অন্বয়—বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থৈঃ অক্ষৈঃ তৎ-ক্রিয়াজনিঃ (ভবতি)। তৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চকম্ মুখাদিগোলকেষু আস্তে।

অনুবাদ—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়দ্বারা সেই সেই ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়। সেই কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচটি মুখাদি গোলকে (অভিব্যক্তি স্থানে বা আধারে) অবস্থিত।

টীকা—"বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থৈঃ অক্ষৈঃ"—বাক্ প্রভৃতি পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা "তৎ ক্রিয়াজনিঃ" (ভবতি)—সেই সকল ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়।' 'ভবতি' এই ক্রিয়াপদের অধ্যাহার করিয়া অর্থ করিতে হইবে। এ স্থলেও একটি কার্য্যলিঙ্গক অনুমান আছে, তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে—যথা বচনরূপ ক্রিয়া করণজনিত (প্রতিজ্ঞা), যেহেতু তাহা ক্রিয়া; (হেতু); যেমন ছেদনাদি ক্রিয়া, (উদাহরণ)। সেই কর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চকের স্থানসমূহ বর্ণনা করিতেছেন:—"মুখাদিগোল-কেষু আস্তে'—সেই সকল ইন্দ্রিয় 'মুখাদি' গোলকে অবস্থান করে। এস্থলে মুখাদি বলিতে কর, চরণ, মলদ্বারছিদ্র ও শিশ্নছিদ্র লক্ষিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।১১

৪। মনের বর্ণন

(১) মনের কার্য্য, স্থান ও অন্তরেন্দ্রিয়রূপতা

এক্ষণে উক্ত দশেন্দ্রিয়ের প্রেরকরূপে প্রসঙ্গ-ক্রমে উপস্থিত মনের কার্য্য ও স্থান প্রদর্শন করিতেছেন:—

মনো দশেন্দ্রিয়াধ্যক্ষং হৃৎপদ্মগোলকে স্থিতম্।
তচ্চান্তঃকরণং বাহ্যেষ্ব স্বাতন্ত্র্যাদ্বিনেন্দ্রিয়ৈঃ॥১২

অন্বয়—দশেন্দ্রিয়াধ্যক্ষম্ মনঃ হৃৎপদ্মগোলকে স্থিতম্ (ভবতি); তৎ চ ইন্দ্রিয়ৈঃ বিনা বাহ্যেষু অস্বাতন্ত্র্যাৎ অন্তঃকরণম্ উচ্যতে।

অনুবাদ—উক্ত দশপ্রকার ইন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষ মন হৃৎপদ্মরূপ গোলকে অবস্থিত। সেই মন ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যব্যতিরেকে বাহ্য শব্দাদি-বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারে না বলিয়া সেই স্বতন্ত্রতাভাব বশতঃ মনকে অন্তঃকরণ বা আভ্যন্তর ইন্দ্রিয় বলা হয়।

টীকা—"হৃৎপদ্মগোলকে স্থিতম্"—মন একই সময়ে সমগ্র শরীরে ব্যাপ্ত থাকিলেও হৃদয় (heart) মনের প্রধান নিবাসস্থান বলিয়া মনকে হৃৎপদ্মগোলকে অবস্থিত বলা হইল। (সেই হৃদয় বা heart দেখিতে অধোমুখ পদ্মকোরক সদৃশ)। কক্ষমধ্যস্থিত দীপালোক কক্ষমধ্যে ব্যাপ্ত থাকিলেও দীপশিখাকেই যেমন তাহার মুখ্যস্থান বলা হয়, ইহাও সেইরূপ। মনকে কেন অন্তরিন্দ্রিয় বলা

হয়, তদ্বিষয়ে হেতুপ্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন—"তৎ চ ইন্দ্রিয়ৈঃ বিনা" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা।

(২) মন দশ ইন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষ ও সত্ত্বাদি গুণত্রয়যুক্ত

মন যে দশ ইন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষরূপ, এই কথা স্পষ্ট করিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন :—

অক্ষেষ্বর্থার্পিতেষ্বেতদ্ গুণদোষবিচারকম্।
সত্ত্বং রজস্তমশ্চাস্য গুণা বিক্রিয়তে হি তৈঃ ॥১৩

অন্বয়—অক্ষেষু অর্থার্পিতেষু এতৎ গুণদোষবিচারকম্ (ভবতি)। সত্ত্বম্ রজঃ তমঃ চ অস্য গুণাঃ ভবন্তি ; হি (যতঃ) তৈঃ (গুণৈঃ) বিক্রিয়তে।

অনুবাদ—জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ যখন আপন আপন বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ প্রাপ্ত হয়, তখন এই মন সেই সেই বিষয়ের গুণদোষের বিচারক হয়। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি মনের গুণ, যেহেতু এই তিন গুণবশতঃই মন বৈরাগ্যাদি বিবিধ প্রকারের বিকারপ্রাপ্ত হয়।

টীকা—"অক্ষেষু অর্থার্পিতেষু" (সৎসু)—ইন্দ্রিয় সকল (অর্থাৎ চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ রূপাদি নিজ নিজ বিষয়ে স্থাপিত হইলে "এতৎ গুণদোষ বিচারকম্ (ভবতি)"—এই মন 'ইহা সমীচীন, ইহা অসমীচীন ইত্যাদি রূপে গুণদোষবিচারক হইয়া থাকে। এইরূপ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে—আত্মা অর্থাৎ চিদাভাসযুক্ত অন্তঃকরণ যে চৈতন্যের উপাধি, সেই চৈতন্য, জ্ঞানমাত্রেই প্রমাতা বা সকল জ্ঞানের আশ্রয়স্বরূপ, বলিয়া তাহা সকল জ্ঞানের প্রতি সাধারণ (কারণ), আর চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ রূপাদি বিষয়ের জ্ঞানমাত্র উৎপাদন করিয়াই ক্ষান্ত হয়, তাহাদের অন্য কোনও কার্য্য অবশিষ্ট থাকে না। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত আত্মা এবং বর্ণিত ইন্দ্রিয়গণদ্বারা রূপাদিবিষয়গত গুণদোষের বিচার সম্ভবপর হয় না, কিন্তু সেই গুণদোষবিচার স্পষ্টই প্রতীত হয়, এবং তাহা প্রকারান্তরে উপপন্ন হয় না বলিয়া, অবশেষে মনকেই সেই গুণদোষ বিচারের কারণ বলিয়া মানিতে হয়। যেমন কোনও পুষ্টদেহ পুরুষ দিবাভাগে ভোজন করে না, ইহা নিশ্চিতরূপে জানা গেলে সেই পুষ্টতা ভোজনরূপ কারণ বিনা কারণান্তর দ্বারা সম্ভাবিত নহে বলিয়া তাহার রাত্রিকালীন ভোজন কল্পনা করিতে হয়, এস্থলেও সেইরূপ। সেই পুষ্টতার অসম্ভবশঙ্কাজ্ঞানকে ন্যায়শাস্ত্রে "অর্থাপত্তি" প্রমাণ বলে এবং রাত্রি ভোজনরূপ যথার্থ জ্ঞানকে অর্থাপত্তি প্রমা বলে। মন—বৈরাগ্য, কাম প্রভৃতি অনেক প্রকার বৃত্তিবিশিষ্ট, ইহা দেখাইবার জন্য মন যে সত্ত্বাদি-গুণবিশিষ্ট, তাহা দেখাইতেছেন—"সত্ত্বং রজস্তমশ্চাস্য" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা। সেই সত্ত্বাদি যে মনের গুণ, তদ্বিষয়ে হেতুপ্রদর্শন করিতেছেন—"হি তৈঃ বিক্রিয়তে"—যেহেতু, সেই সেই সত্ত্বাদি গুণদ্বারা মন বৈরাগ্যাদি বিকার প্রাপ্ত হয়, ইহাই অর্থ। ১৩।

সমালোচনা

রূপায়তন—(কবিতা-পুস্তক) শ্রীবীরেন্দ্র কুমার গুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক—ডি, এম, লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৪৪ পৃষ্ঠা, দাম এক টাকা।

পুস্তকে ২৮টি ছোট কবিতা আছে। কবিতাগুলি পড়ে মনে হল—এই তরুণ কবির সত্যই লেখার শক্তি আছে। তাঁর কবিতা—

"মর্ম্মর নির্ব্বাক আমি বাণীহীন ছিলাম মলিন
মোর স্বষ্ট কবিতার আকাশে চাহিয়া"

আমার মনকেও বাণীহীন করিয়া দিয়াছে। বীরেন্দ্রকুমার তাঁহার এই প্রথম-লিখিত কবিতা-গুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করায় তাঁহাকে চিনিবার সুযোগ হইল। পুস্তকখানি সুন্দর, ছাপা ও সুচিত্রিত।

রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর

মূর্খ কে—লেখক ও প্রকাশক শ্রীবৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য। প্রাপ্তিস্থান—বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। চারটি গল্পে ১৫৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। দাম এক টাকা।

বইখানি পড়ে খুবই আনন্দ হল এইজন্যে যে, সাহিত্যিকদের দৃষ্টি প্রেমত্রিকোণের গোলক ধাঁধাঁর বাইরেও এসে পড়ছে। জনসাধারণের জীবন মরণের যুদ্ধকে বাঙালী সাহিত্যিকরা বিশেষ অবজ্ঞার চোখেই দেখেন। তাঁরা শুধু যৌবনের রঙিন নেশাতেই মশগুল হয়ে থাকতে চান। এতে আমরাও অভ্যস্ত হয়ে গেছি। ভাবতেও ভুলে গেছি, গল্পে উপন্যাসে আর কিছুর স্থান থাকতে পারে।

অন্নসমস্যা আমাদের দিন দিন জটিলই হচ্ছে। দৈনন্দিন জীবনযুদ্ধে আমরা শুধু হটেই যাচ্ছি। খেয়াল তবু আমাদের হচ্ছে না যে এখনও ফ্যাশন আর কাল্চারের মিথ্যা মোহকে আঁকড়ে না ধরে কঠিন বাস্তবতার পথে নেবে না দাঁড়াতে পারলে জাতটার মরতে আর বেশী দেরী হবে না। বৈদ্যনাথ বাবু গল্পের ভিতর দিয়ে দেখাতে চেষ্টা করেছেন, কি করে আমরা আমাদের কৃষি শিল্প বাণিজ্য পরের হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত রিক্ততার আনন্দে দিন কাটাচ্ছি। গল্পের ভিতর দিয়ে আমাদের সত্যকারের ইতিহাসই লেখা হয়েছে। এ গল্প নয়। পুরুষরা যেমন ব্যবসা বাণিজ্য পরের হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন, ঘরে মা লক্ষ্মীরাও তেমনি উৎকল দ্রৌপদীর হাতে ঘরকন্নার সমস্ত ভার তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত আলস্যে সময় কাটাবার সুযোগ করে নিয়েছেন।

আমরা প্রত্যেক বাঙালীকে বইখানি পড়ে দেখতে অনুরোধ করি। ভাষার পুরোনো ধারা হয়তো সকলের ভাল না লাগতে পারে কিন্তু ভাববার বিষয় অনেক পাবেন বইখানিতে। শেষের দুটি গল্প—গোপীনাথ খণ্ডাইৎ ও কাল্লুরাম খৈতান চমৎকার হয়েছে। গল্প দুটির বর্ণনা ও বিষয় খুবই ভাল। পড়তে পড়তে নায়কদের কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্তের জন্য যেমন আনন্দ পেয়েছি দুঃখও পেয়েছি তেমনি ভেবে যে, এরাই তো শত সহস্র হয়ে বাঙলার শিক্ষিত সমাজ ছেয়ে আছে।

বইখানি বাঙলার মনীষিসমাজে যথেষ্ট আদর পাবে, সন্দেহ নেই।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী, বি-এস্‌সি

চাঁদের রামধনু—শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী, বি-এস্‌সি লিখিত ও বিচিত্রিত। বুকল্যাণ্ড, পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক, ১ শংকর ঘোষ লেন, কলিকাতা। ৫৩ পৃষ্ঠা, দাম ছয় আনা।

বইখানি পড়িয়া আনন্দ লাভ করিলাম। ইহা যে শিশুসাহিত্যের একটি সম্পদ হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পুস্তকের গল্প ও চিত্রাবলী বালক বালিকা মাত্রেরই চিত্তাকর্ষণ করিবে। লেখকের সরলভাষায় ও চিত্রে একটি স্বাস্থ্যকর ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। পুস্তকের ছাপা ও বাঁধাই মনোরম।

আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীরণদাসুন্দর পাল, এম্-এ

ধর্ম্মসমন্বয় ও ঠাকুর রামকৃষ্ণ—শ্রীভারতচন্দ্র মজুমদার প্রণীত। নোয়াখালী হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। ৫৯ পৃষ্ঠা, দাম আট আনা।

গ্রন্থকার অতি সহজ সুন্দর ও প্রাঞ্জল ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও তৎপ্রচারিত সর্বধর্ম-সমন্বয় আলোচনা করিয়াছেন। মাঝে মাঝে শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তিসমূহ উদ্ধৃত করাতে পুস্তকখানা আরও মনোরম হইয়াছে।

প্রচ্ছদপটে শ্রীরামকৃষ্ণের রেখাচিত্র গ্রন্থকার স্বহস্তে অঙ্কন করিয়াছেন। ফটো ও হাফটোন চিত্রে অভ্যস্ত চোখে এই রেখাচিত্র তেমন ভাল দেখাইবে না।

পুস্তকের ছাপা প্রশংসনীয়।

দুধের ব্যবসা—শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক—নিউ বুক ষ্টল, ৯, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। ১৮৪ পৃষ্ঠা, দাম দেড় টাকা।

নিত্যনারায়ণ বাবু বাংলা সাহিত্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ। তিনি ইংলণ্ডে দুধের ব্যবসা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে ডেনমার্ক হল্যাণ্ড রাশিয়া ইতালি প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের কৃষিপদ্ধতি ও দুধের কারখানা দেখে এসেছেন। দুধের ব্যবসা সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা তিনি এ পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছেন।

বর্তমান বেকার সমস্যার দিনে শিক্ষিত বাঙালী যুবকদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হলে দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হবে। পাশ্চাত্য দেশে বিজ্ঞানের নিত্য নূতন আবিষ্কার হচ্ছে আর সে সব আবিষ্কারকে তারা জীবনসংগ্রামে প্রয়োগ করে সমগ্র পৃথিবীর উপর আধিপত্য করছে। স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছা ছিল, ভারতে ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আলোচনা হয় এবং কর্মক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রয়োগ হয়।

নিত্যনারায়ণ বাবু এ পুস্তকখানা প্রকাশ করে বাংলা সাহিত্যের এবং বাঙালী জাতির বিশেষ উপকার করেছেন। বর্তমান কঠোর জীবন-সংগ্রামে বাধ্য হয়েই বাঙালী যুবকদের দৃষ্টি এইসব দিকে আকৃষ্ট হবে।

পুস্তকে ২৮ খানি ছবি আছে। ছাপা কাগজ বাঁধাই চমৎকার।

স্বামী প্রেমঘনানন্দ

সংবাদ

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন—রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভূতপূর্ব প্রেসিডেণ্ট পরমপূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের তিরোধানের পর পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শুদ্ধানন্দ মহারাজ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রেসিডেণ্ট, শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজ ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট এবং শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দ মহারাজ সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীমাতৃমন্দির, জয়রামবাটী—গত ১৯শে বৈশাখ সোমবার অক্ষয়তৃতীয়া দিনে জয়রামবাটী গ্রামে শ্রীশ্রীমাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠার ষোড়শ বার্ষিক মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে সপ্তাহ কাল ব্যাপিয়া নানাস্থান হইতে সাধুভক্তের সমাগমে শ্রীমন্দির আনন্দ রোলে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। উৎসব দিনে শ্রীশ্রীমার একটী বৃহৎ তৈল চিত্র পুষ্পপত্রে সজ্জিত করা হইয়াছিল। দিন রাত্রি পূজা, পাঠ, ভজন, প্রসাদ বিতরণ চলিয়াছিল এবং জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে প্রায় দেড় হাজার ব্যক্তি প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছেন। সন্ধ্যারতির পর কোতলপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বনমালী দে ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ভক্তগণ শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলা বিষয়ক কীর্ত্তন করিয়া সকলকে বিশেষ আনন্দ দান করিয়াছিলেন। গত ১৪ই বৈশাখ শনিবার ভক্তগণ শ্রীমন্দিরে মিলিয়া শ্রীশ্রীমহামায়ার অর্চ্চনা করিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বালিয়াটী (ঢাকা)—গত ৮ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার বালিয়াটী শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎব সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের ষোড়শোপচারে পূজা, ভোগ, হোম, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ও নগর সঙ্কীর্ত্তনাদি যথারীতি সুসম্পন্ন হয়

এবং প্রায় দুই সহস্র দরিদ্রনারায়ণ ও ভক্ত পরিতোষ সহকারে প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্ণে পাকুটীয়ার হাইস্কুলের হেড্‌মাষ্টার শ্রীযুক্ত বিজয়গোবিন্দ নিয়োগী মহাশয়ের সভাপতিত্বে সেবাশ্রমের বার্ষিক সভার অধিবেশনে "বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ের" ছাত্র ও "সারদামণি বালিকা বিদ্যালয়ে"র ছাত্রীদিগকে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সভায় স্থানীয় মঠের স্বামী বুদ্ধাত্মানন্দ, হাইস্কুলের হেডপণ্ডিত শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র কাব্যতীর্থ ও শ্রীযুক্ত মাখনলাল গোস্বামী প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রচারিত সেবাধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সভাপতি মহাশয় এতদঞ্চলের কর্ম্মী যুবকগণকে প্রশংসা করেন এবং তাঁহাদিগকে অধিকতর উৎসাহের সহিত নরনারায়ণের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে উৎসাহিত করেন।

রামকৃষ্ণ-সৎসঙ্গ, সাতক্ষীরা (খুলনা)—গত ২৪শে বৈশাখ হইতে দিবস চতুষ্টয় সাতক্ষীরা রামকৃষ্ণ-সৎসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় দিনে ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। প্রথম দিনের অধিবেশনে 'অমৃতবাজার পত্রিকার' সম্পাদক শ্রীযুত তুষারকান্তি ঘোষ এবং দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে সাতক্ষীরার সব্ ডিভিসনাল্ মুন্‌সেফ্ শ্রীযুত প্রসাদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতিত্ব করেন। বেলুড় মঠের স্বামী গিরিজানন্দ ও স্বামী হরিহরানন্দ, সাতক্ষীরার শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুত নির্ম্মলকুমার ঘোষ, শ্রীযুত কৃষ্ণচন্দ্র বসু, শ্রীযুত রূপনাথ বসু, শিয়ালদহ কোর্টের সিনিয়র মুন্‌সেফ শ্রীযুত বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, শিয়ালদহের উকিল শ্রীযুত রামজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ও সভাপতি মহাশয়দ্বয় শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, চাঁদপুর (ত্রিপুরা)—২৪শে বৈশাখ ৭ই মে শনিবার ভগবান্ রামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ লীলাসহচর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের তিরোধান উপলক্ষে চাঁদপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে পূজাদি অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যাহ্নে বিশেষ পূজার পর প্রায় ৩০০ জন ভক্তের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। পরে অপরাহ্ণে স্বামী শ্রীবাসানন্দের নেতৃত্বে এক আলোচনা সভা হয়। চাঁদপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ ব্রহ্মচারী যামিনীকুমার ও শ্রীযুত অশ্বিনীকুমার দে মহাশয় শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের জীবনী আলোচনা করেন। তৎপরে স্বামী শ্রীবাসানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুর, স্বামীজী ও বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের জীবনী আলোচনা করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

রামকৃষ্ণ-মিশন, সোনারগাঁ (ঢাকা)—গত ৪ঠা জুন হইতে ৬ই জুন পর্য্যন্ত সোনারগাঁ (ঢাকা) রামকৃষ্ণ মিশনে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রথম দিবস পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ষোড়শোপচারে পূজা, হোম ও ভজন সঙ্গীত হয় এবং অপরাহ্ণে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রেবতীকুমার স্মৃতিতীর্থ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন এবং শ্রীযুক্ত রমণীকুমার দত্তগুপ্ত, বি-এল্ "উপনিষদে ভক্তি" সম্বন্ধে একটী সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। দ্বিতীয় দিবস মাথুরলীলা কীর্ত্তন হয় এবং শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার সেন মহাশয় প্রাঞ্জল ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করেন। অপরাহ্ণে "সোনার বাংলার" সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীকিশোর গুহ মহাশয়ের সভাপতিত্বে মিশনের বার্ষিক সভার অধিবেশন হয়। সভায় স্থানীয় মিশনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত উমানন্দ দত্ত মহাশয় মিশনের বার্ষিক কার্য্য বিবরণী পাঠ করেন, স্বামী সম্পূর্ণানন্দ, শ্রীযুক্ত রমণীকুমার দত্তগুপ্ত এবং সভাপতি মহোদয় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও বাণীর বিভিন্ন দিক্ সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। তৃতীয় দিবস নিমাই সন্ন্যাস কীর্ত্তন হয় এবং অপরাহ্ণে ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী জপানন্দের সভাপতিত্বে জনসভার অধিবেশন হয়। সভায় শ্রীযুক্ত রমণীকুমার দত্তগুপ্ত, শ্রীযুক্ত উমানন্দ দত্ত ও স্বামী জপানন্দ "গৃহস্থের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ" সম্বন্ধে আবেগময়ী বক্তৃতা দেন। সভার পর দেড় হাজার নরনারী পরিতৃপ্তির সহিত প্রসাদ গ্রহণ করেন। বেলুড় মঠের স্বামী জ্যোতিস্বরূপানন্দ ও স্বামী বেদানন্দ এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, সরিস্তাবাদ (ফরিদপুর)—বিগত ৩১শে বৈশাখ শনিবার সরিস্তাবাদ রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে একটী উৎসবের

অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা, আরতি, ভোগ, গীতাপাঠ, চণ্ডীপাঠ, ষোড়শ প্রহর কীর্ত্তনানন্দ ও কালীপূজা যথানিয়মে সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রায় সহস্রাধিক দরিদ্রনারায়ণ ও তিন চারি শত ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছেন। বেলা ৪ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত বাবু অশ্বিনী কুমার দে মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক ধর্ম্মসভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় প্রায় তিন চারি শত লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। আশ্রমের বর্ত্তমান সেবাইৎ ব্রহ্মচারী ভোলানাথ শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী সম্বন্ধে প্রাঞ্জল ভাষায় এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দান করিয়া উপস্থিত জনমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। আশ্রমের সভ্য শ্রীযুক্ত শশধর চক্রবর্ত্তী এবং নরেন্দ্র নাথ চন্দ মহাশয় শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। ২রা জ্যৈষ্ঠ সোমবার বেলা ২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত মৌলবী হাবিবর রহমান সাহেবের সভাপতিত্বে একটী ইস্‌লাম ধর্ম্ম-সভার অধিবেশন হয়। মৌলবী মোবারেক আলি ও ছামছেল হক্‌ সাহেব ইস্‌লাম ধর্ম্ম ও আশ্রমের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন। তৎপর বেলা ৪ ঘটিকার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর স্বামীজী ও শ্রীশ্রীমার প্রতিকৃতি লইয়া ব্যাণ্ডপার্টি ও নানাপ্রকার বাদ্যসহ প্রায় দুইশত লোক শোভাযাত্রা সহকারে নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ প্রদক্ষিণ করিয়া রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় আশ্রমে ফিরিয়া আসেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বেলাড়ি (হাওড়া)—গত ২৭শে চৈত্র রবিবার শ্রীশ্রীঠাকুরের বার্ষিক জন্মতিথি উৎসব প্রতিপালিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে প্রায় ৬০০ ভক্ত ও দরিদ্র নারায়ণকে প্রসাদে পরিতৃপ্ত করা হয় এবং রাত্রিতে জনসভায় তমলুক শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের স্বামী বিশোকাত্মানন্দ ছায়াচিত্রযোগে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও বাণী প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করেন।

তারাগুনিয়া (চব্বিশ পরগণা)—স্বর্গীয় কালীদাস ঘোষ মহাশয়ের দেবোত্তর সম্পত্তির একস্‌জিকিউটর ও সেবাইত শ্রীযুক্ত ননীলাল ঘোষ, শ্রীযুক্ত মাখনলাল ঘোষ, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রভৃতির উদ্যোগে গত ১৯শে বৈশাখ তারাগুনিয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে বেলুড় মঠের স্বামী মুক্তাত্মানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ষোড়শোপচারে পূজা করেন এবং মধ্যাহ্নে দরিদ্রনারায়ণের সেবা এবং অপরাহ্ণে একটী সভা হয়। সভায় স্বামী যোগীশ্বরানন্দ, স্বামী জগন্নাথানন্দ ও স্থানীয় কয়েকজন ভদ্রলোক বক্তৃতা করেন।

স্বামী নিখিলানন্দ—নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটির স্থাপয়িতা ও অধ্যক্ষ স্বামী নিখিলানন্দ গত ১২ই জুন রবিবার বেলুড় মঠে উপস্থিত হইয়াছেন। ১৯৩২ সনে তিনি আমেরিকায় প্রেরিত হইয়া রোড আইল্যাণ্ডের অন্তর্গত প্রভিডেন্স নগরের বেদান্ত সোসাইটিতে কিছুকাল প্রচার কার্য্য করেন। ১৯৩৩ সনে নিউইয়র্কে একটী কেন্দ্র স্থাপন করিয়া তথাকার জনসাধারণের মধ্যে বেদান্তের সার্ব্বভৌমিক বাণী প্রচারে তিনি বিশেষ সাফল্য লাভ করিয়াছেন। ইতোমধ্যে স্বামীজি দুইবার ইউরোপে গমন করিয়া বিভিন্ন দেশে বেদান্ত প্রচার করিয়াছেন। তিনি বেলুড়মঠে কিছুদিন অবস্থান করিবেন।

ভ্রম-সংশোধন—পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত বেলঘরিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার উদ্বোধনের প্রথম পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হইয়াছে। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে সংবাদ পাইলাম যে, তাঁহার পিতা ৺তারকনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কর্ম্মস্থান যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত ইটাওয়া নামক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বেলঘরিয়ায় তাঁহার ভদ্রাসন ছিল।

তাওধর্ম্মের রহস্য

সম্পাদক

মহাত্মা লাউৎসা প্রবর্ত্তিত তাওধর্ম্ম চীনদেশে দুইটি বিভিন্ন দিক দিয়া বিস্তার লাভ করিয়াছে। "দক্ষিণ মতবাদ" (Southern School) তাও-ধর্ম্মের প্রাচীন পদ্ধতিকে আজ পর্য্যন্তও অবলম্বন করিয়া আছে। পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে ইন্দ্রজাল ও কুসংস্কারের সঙ্গে এই মতবাদ একার্থবোধক। "উত্তর মতবাদ" (Northern School) তাও-ধর্ম্মের নব্য সংস্করণ। দার্শনিক আলোচনা সহায়ে ধ্যান-ধারণাদির পন্থা-নির্দ্দেশ এই মতের বিশেষত্ব। এই ধর্ম্মমতের ভিতর দিয়া চৈনিক জাতির চিন্তা-ধারা বিশেষভাবে অভিব্যক্ত।

তাওমতাবলম্বী এই জগৎকে শূন্য বলিয়া চিন্তা করেন এবং বিশ্বাস করেন যে, একটি সুনির্দ্দিষ্ট মৌলিক শক্তি সমুত্থিত অদৃষ্ট কর্ম্ম-প্রণালী দ্বারা এই বিরাট যান্ত্রিক (Mechanistic) শূন্যতা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। এই মতে মানুষের জীবনের উপরও ইহার প্রভাব স্বীকৃত। এ জন্য অপ্রতিরোধ, শান্তি ও অহিংসা এই ধর্ম্মমতের প্রধান শিক্ষা। তাওধর্ম্ম স্বীকার করে যে, পঞ্চভূত (ধাতু, কাষ্ঠ, জল, অগ্নি ও পৃথিবী) দ্বারা কাল ও পাত্র নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, এবং এই জগৎ যে নিয়ম-প্রণালী বরণ করিয়া লইয়াছে, মানুষের জীবনও তাহা দ্বারাই পরিচালিত হইতেছে মনুষ্যজীবনাপেক্ষা জগতের অস্তিত্ব দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলেও মানুষের ন্যায়ই এই পরিদৃশ্যমান জগতের আদি ও অন্ত বর্ত্তমান। ব্যক্তিগত জীবনের ন্যায় বিশ্বজনীন জীবনেরও ইচ্ছা এবং কার্য্যশক্তি আছে। মানুষের শক্তি সসীম বলিয়া অসীম বিশ্ব-শক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া চলা তাহার পক্ষে অপরিহার্য্য। এই নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করিলে মানুষকে প্রতি পদবিক্ষেপে পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। চীনদেশে মাহন্তিক উপাসনার আতিশয্যের মূলে তাওধর্ম্মের এই দার্শনিকতার প্রভাব বিদ্যমান।

ধনের দেবী, স্বাস্থ্যের দেবতা, জ্ঞানের দেবতা, যুদ্ধের দেবতা, ধর্ম্মগুরু লুং থাং পিন প্রভৃতির পূজা তাওধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রচলিত। এতদ্ব্যতীত চীনের এক এক প্রদেশে এক এক শ্রেণীর অসংখ্য দেবদেবী তাওসম্প্রদায় কর্তৃক অদ্যাবধি পূজিত হইতেছেন। ধন-সম্পত্তি, সন্তান-সন্ততি, স্বাস্থ্য, জ্ঞান ও শান্তিলাভ এই সকল দেব-দেবী পূজার উদ্দেশ্য। দক্ষিণ চীনে তাওদেব-দেবীগণের নিকট মানত করা হয়। ধনবান্ ব্যক্তিগণ কোন দেব বা দেবীর নিকট কোন কিছু প্রার্থনা করিয়া সফলকাম হইলে তাঁহাকে পর্য্যাপ্ত ভোজ্য দ্রব্য প্রদান করেন এবং গরীব লোকেরা সাধারণতঃ দেবদেবীকে আফিম ও চর্ব্বি ভোগ দিয়া থাকেন। অপ্রধান দেবদেবীগণের মুখে ভোগস্বরূপে চর্ব্বি মাখিয়া দেওয়া হয় ও ভিক্ষুকরা বিগ্রহের মুখ হইতে উহা সংগ্রহ করে। ক্যাণ্টন সহরের অনেক মন্দিরে প্রধান প্রধান দেব-দেবীগণের সেবক ও সেবিকারূপে যে সকল দেবদেবী আছেন, তাঁহারা মৃতব্যক্তির নিকট সংবাদ লইয়া যান বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। এ জন্য মন্দিরে এই সকল দেবদেবীর নিকট অনেকে তাঁহাদের মৃত আত্মীয়দের নামে পত্র রাখিয়া যান। রোগমুক্তির জন্য অনেকে তাওপুরোহিতের শরণাপন্ন হইয়া থাকেন। পুরোহিতগণ রোগীর বাড়ী যাইয়া নানাপ্রকার মাঙ্গলিক পূজানুষ্ঠান দ্বারা গৃহ পবিত্র এবং দেবতার কুদৃষ্টি হইতে গৃহস্থকে রক্ষা করেন। তাওদিগের ধারণা যে, যথাযথ ধ্যান ও রাহস্যিক উপাসনা দ্বারা মানুষ অস্বাভাবিক ক্ষমতা বা নানা-প্রকার সিদ্ধাই বা শক্তির অধিকারী হইতে পারে। "দক্ষিণ মতবাদী" গোঁড়া সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল। বলা বাহুল্য যে, তাওধর্ম্মের উচ্চ দার্শনিক তত্ত্বের সহিত এই ধর্ম্ম-বিশ্বাসের কোন সম্বন্ধ নাই।

তাওধর্ম্মমতের অন্তর্গত অনেক গুপ্তসমিতি আছে। স্মরণাতীত কাল হইতে আজ পর্য্যন্তও চৈনিক জাতির সামাজিক ও রাষ্ট্র-জীবন এই সকল সমিতির কার্য্যাবলীর দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবান্বিত। চীনদেশের ইতিহাস সংগঠনে এই সমিতিসমূহের একটি বিশেষ অংশ আছে। তাওধর্ম্মোক্ত রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় অভিমত হইতে এই সমিতিগুলি জন্মলাভ করিয়াছে। তাওধর্ম্ম প্রচার করে যে, যে নিয়মের বশে এই জগৎ পরিচালিত, দেশের রাজা সেই নিয়মের প্রতীক, এবং তাঁহার শাসন পরিচালনের সঙ্গে সমগ্র দেশের মঙ্গলামঙ্গল ওতপ্রোতভাবে সম্বন্ধাবদ্ধ। তাওগণের নিকট রাজা স্বর্গের দেব সন্তান। তিনি স্বর্গস্থ দেবতার অভিপ্রায় পূর্ণ করিবার জন্য এই পৃথিবীতে আসিয়াছেন। যদি তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য না করেন, তাহা হইলে দেশে নানাপ্রকার অনর্থ ঘটিয়া থাকে। পক্ষান্তরে রাজা যদি তাঁহার কর্ত্তব্য করেন তাহা হইলে রাজ্যে শান্তি, সমৃদ্ধি ও সুখ বিরাজ করিয়া থাকে। জাতীয় বা প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা মাত্রই তাওসম্প্রদায়ের নিকট রাজার অধর্ম্মজনিত দৈব অভিশাপ বলিয়া গণ্য এবং এ জন্য আবশ্যক মনে করিলে তাঁহারা অধার্ম্মিক রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার স্থলে কোন ধার্ম্মিক রাজাকে অভিষিক্ত করিতে চেষ্টা করেন। এই জন্য যখন কোন রাজার শাসনের ফলে চীনদেশে শান্তি বিরাজ করে, তখন গুপ্তসমিতিসমূহ নিষ্ক্রিয় থাকে, কিন্তু যখন দেশে অশান্তির আবির্ভাব হয়, তখন রাষ্ট্রীয় ব্যাপার লইয়া এই গুপ্তসমিতিগুলি মত্ত হইয়া পড়ে। গুপ্তসমিতি মাত্রই তাওপুরোহিতের নেতৃত্বে পরিচালিত। সাধারণতঃ রাজবংশসম্ভূত পুরোহিত-গণ গুপ্তসমিতিসমূহের অধ্যক্ষ। ইঁহারা দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নানাপ্রকার রাহস্যিক পূজার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন এবং সকল শ্রেণীর দেশবাসিগণ ইহাতে যোগদান করেন। এই গুপ্তসমিতিসকল কতকগুলি বিশেষ নিয়মা-

ধীনে পরিচালিত; সমিতির প্রত্যেক সভ্যকে এই নিয়ম মান্য করিয়া চলিতে হয়। সভ্যগণ স্বর্গকে পিতা এবং বসুন্ধরাকে মাতারূপে ভাবনা করেন এবং একে অপরকে রক্ত সম্বন্ধে সম্বন্ধান্বিত আত্মীয় বলিয়া মনে করেন। এ জন্য পরস্পরকে বিপদের সময় সাহায্য করা এই সমিতির সভ্যগণের পক্ষে বাধ্যতামূলক। অনেক সময় ইঁহারা ধনবানের অর্থ লুণ্ঠন করিয়া গরীবদের মধ্যে বিতরণ করিয়া থাকেন।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এইরূপ একটি গুপ্তসমিতির সভ্যগণ "সাংঘাই পেকিং এক্সপ্রেস" ট্রেন আটক করিয়া কয়েকজন খ্যাতনামা ধনবান্ বিদেশীর অনেক টাকা লুণ্ঠন করিয়াছিলেন, এবং যে স্থানে এই দস্যুতা সংঘটিত হইয়াছিল তথায় তাঁহারা নিম্নলিখিত মর্ম্মে প্রকাশ্যভাবে এক বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন:—"ধনবান্দের নিকট আমাদের টাকা পাওনা আছে। দরিদ্র ব্যক্তিরা পর্ব্বতের উপরে আমাদের আড্ডায় আসিয়া আমাদের নববর্ষের উৎসব-ভোজে যোগদান করিবেন।" কোন স্থানে ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যে খুব বেশী পার্থক্য দেখিলে তথাকার সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে গলদ আছে বলিয়া এই সমিতি নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করেন এবং অনেক সময় প্রকাশ্যভাবে উচ্চৈঃস্বরে বলেন, "ধনীদের টাকা লুট করিয়া গরীবদের দাও এবং স্বর্গের 'তাও'কে সাহায্য কর।" চীনদেশের অধিকাংশ দস্যুতার মূলে এই গুপ্তসমিতিসমূহ বিদ্যমান। সমিতির সভ্যগণ অবস্থাধীনে দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া শান্তভাবে তাওধর্ম্মের মাহাত্ম্য, সমাজ উন্নয়ন ও গঠনমূলক রাজনীতি প্রচার করেন। বিখ্যাত চৈনিক নেতা চ্যাং তাও লিং তাওধর্ম্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়কে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়াও একটি প্রভাবশালী গুপ্তসমিতির অধিনায়ক ছিলেন।

চীনদেশের আধুনিক গুপ্তসমিতিসমূহ "শ্বেত পদ্ম সম্প্রদায়" (White Lotus Sect) হইতে উদ্ভূত। চৈনিক ভাষায় ইহাকে "পৈ লিয়েন চাও" বলে। বৌদ্ধধর্ম্ম এই সম্প্রদায়ের ভিত্তি হইলেও বর্ত্তমানে ইহা তাওমতবাদ দ্বারা বিশেষ প্রভাবান্বিত। মঙ্গোল-রাজত্বের প্রথম ভাগে এই সম্প্রদায় প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং ফলে মিং-রাজত্ব আরম্ভ হয়। প্রথম মিং-সম্রাট নিজে একটি গুপ্তসমিতির সভ্য ছিলেন, কিন্তু রাজত্ব লাভ করিয়া এই সমিতিকে দমন করিতে চেষ্টা করেন। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, মাঞ্চুরাজ ড্রাগন-সিংহাসনে আরোহণ করিলে পুনরায় তিনি এই সমিতিকে সমর্থন করেন। এই প্রভাবশালী গুপ্তসমিতিকে দমন করিবার চেষ্টা করিলে মাঞ্চু-রাজত্বের শেষভাগে ইহার বিশটির অধিক শাখা-কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এই দলগুলির অধিকাংশ অদ্যাবধি মধ্য ও দক্ষিণ-চীনে তত্রত্য রাষ্ট্রের আতঙ্করূপে বর্ত্তমান। এই সমিতিসমূহ আজ পর্য্যন্তও মুষ্টিযুদ্ধ, যাদুবিদ্যা এবং রহস্যিক শক্তিতে বিশ্বাসপরায়ণ। চীনদেশের বিখ্যাত "বক্সার বিদ্রোহে"র সময় এই মুষ্টিযুদ্ধ প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করে। এই সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রনৈতিক ধারণা গণতন্ত্রমূলক হইলেও বিশিষ্ট অভিজাত ব্যক্তিগণের দ্বারা দেশ-শাসন ইঁহাদের নিকট স্বর্গের নির্দ্দেশ বলিয়া পরিগণিত। এই গুপ্তসমিতিসমূহের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যমূলে পরিচালিত। পীতনদীর উপত্যকা-প্রদেশে এইরূপ অনেকগুলি প্রতিপত্তিশালী গুপ্তসমিতি আছে। দস্যুদলের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করাই ইহাদের প্রধান উদ্দেশ্য। ইহাদের মধ্যে "স্যান্হো হুউ" নামক দলটি বিশেষ বিখ্যাত। গত দেড়শত বৎসরের মধ্যে এই দল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আটবার যুদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে বিশ্ব-বিখ্যাত চৈনিক নেতা ডক্টর সান্ ইয়াৎ সেন এইরূপ একটি আধুনিক শক্তিশালী দলের অধিনায়ক

ছিলেন। এই দলের কার্য্যাবলীর ফলেই মাঞ্চু-রাজবংশের পতন হয়। প্রধানতঃ দক্ষিণ-চীনেই এই দলের কার্য্যাবলী সীমাবদ্ধ ছিল। বিখ্যাত "টং যুদ্ধ" (Tong War) এই দলের গৃহবিবাদের ফল। চীনের এই গুপ্তসমিতিসমূহের আদর্শ বিভিন্ন হইলেও চৈনিক রাষ্ট্রনীতি নিয়ন্ত্রণে ইহাদের প্রভাব আজও অসাধারণ। চীনের বিখ্যাত "ছিং প্যাং" বা "ব্লু সোসাইটি"র অনুকরণেই বর্ত্তমান ইটালীতে "ফ্যাসিষ্ট ব্লুসার্ট সোসাইটি" গড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়া ঐতিহাসিকগণ মত প্রকাশ করেন।

অধুনা চীনদেশে যে সকল ধর্ম্ম-সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিয়াছে, উহাদের অধিকাংশই তাওমতবাদের আদর্শ অবলম্বনে দুর্নীতির হস্ত হইতে দেশকে রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর। চীনের "মো মো ছিয়াও" বা "স্পর্শ-সমিতি" নামক একটি ধর্ম্মসম্প্রদায় নগ্নতাকে প্রশ্রয় দিয়া থাকে। এই সম্প্রদায়ের স্ত্রী-পুরুষ অন্ধকারে নগ্নদেহে একত্র বসিয়া ইন্দ্রজাল-বিদ্যা সহায়ে বহুবিধ রাহস্যিক উপাসনা করেন। "ছৈ লি ছাও" বা "বিবেক সমিতি" নামীয় একটি সম্প্রদায় মাদক দ্রব্য সেবনের বিরুদ্ধে বর্ত্তমানে জোরের সহিত প্রচার কার্য্য চালাইতেছে। যদিও তাওধর্ম্ম এই সমিতির মতবাদের ভিত্তি, তথাপি এই মতাবলম্বিগণ বৌদ্ধধর্ম্ম ও কনফুসিয়াস ধর্ম্মের সহিত ঐক্যসূত্র স্থাপন করিতে কৃতসংকল্প। ক্যাথলিক ধর্ম্মোক্ত পুরোহিতের নিকট পাপ স্বীকার এই ধর্ম্মমতের অঙ্গ হিসাবে গৃহীত। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, "বিবেক সমিতির" সভ্যগণ তাঁহাদের রক্ষক জ্ঞানে শৃগাল, নেউল, শজারু, সর্প ও মূষিকের পূজা করিয়া থাকেন। "তাও তে হুই" সম্প্রদায় কনফুসিয়াস মতমূলক হইলেও ইহা তাও মতদ্বারা বিশেষ প্রভাবান্বিত। এই মতাবলম্বিগণ অপদেবতার প্রকোপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া স্বাস্থ্য এবং অর্থাদি প্রাপ্তির জন্য তাও মতাবলম্বীদের অনুকরণে কনফুসিয়াস মতের উচ্চ তত্ত্বসমূহ উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিয়া থাকেন।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে উ ফু ইং নামক শানটাংএর জনৈক বিচারক প্রাচীন "উত্তর তাও" মতবাদের আধুনিক সংস্করণরূপে 'তাও য়্যুয়ান' বা 'তাও কলেজ' নামক একটি সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করেন। চীনদেশে প্রচলিত কনফুসিয়াস ধর্ম্ম, তাওধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, মুসলমানধর্ম্ম ও খৃষ্টধর্ম্মের মধ্যে সমন্বয় প্রতিষ্ঠা এই মতবাদের বিশেষত্ব। সকল ধর্ম্মকেই এই সম্প্রদায় ঈশ্বরলাভের উপায় বলিয়া প্রচার করেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে এই সম্প্রদায় কর্ত্তৃক "বিশ্বলাল স্বস্তিক সমিতি" প্রবর্ত্তিত হয়। সকল প্রকার জনহিতকর কর্ম্ম, দরিদ্র, রুগ্ন ও অসহায় নরনারীকে সর্ব্ববিধ সাহায্যদান ও সেবা করা এই সমিতির উদ্দেশ্য। বর্ত্তমানে চীনদেশের সর্ব্বত্র তাও য়্যুয়ান ও স্বস্তিক সমিতির শাখা স্থাপিত হইয়াছে। এই অভিনব সংঘের ক্রমবর্দ্ধমান কার্য্যাবলীর ভিতর দিয়া চৈনিক জাতীয় জীবনের সর্ব্বতোমুখী জাগরণের অভিব্যক্তি প্রকটিত।

ডেকার্টের সংশয়

শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ

ডেকার্ট বর্ত্তমান পাশ্চাত্ত্য দর্শনের প্রবর্ত্তক। এই উক্তির তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে প্রথমে বর্ত্তমান কালীন দর্শন ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী দর্শনের বিশেষত্ব জানা দরকার। পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাসকে সাধারণতঃ তিনভাগে বিভক্ত করা হয়—যথা আদি যুগের দর্শন, মধ্যযুগের দর্শন ও বর্ত্তমান যুগের দর্শন। পাশ্চাত্ত্য দর্শনের জন্ম গ্রীসদেশে এবং আদি যুগের প্রায় সকল দার্শনিকই গ্রীস্‌দেশীয় ছিলেন বলিয়া আদি যুগের দর্শনকে গ্রীস্ দেশীয় দর্শনও বলা হয়। সক্রেটিস্, প্লেটো ও এরিষ্টেটল এই যুগের প্রধান দার্শনিক ছিলেন। দর্শনের পথ একমাত্র বিচার। যে মত বিচারগ্রাহ্য কেবলমাত্র তাহাই দার্শনিকের গ্রহণীয়। আদি যুগের দার্শনিকগণ একমাত্র বিচার শক্তি দ্বারা দর্শনের প্রধান প্রধান সমস্যাগুলির যথাশক্তি সমাধান করিয়াছিলেন। প্লেটো ও এরিষ্টেটলের গবেষণা এত উচুদরের ছিল যে তাঁহাদের প্রভাব এমন কি বর্ত্তমান যুগে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

মধ্যযুগ বাইবেলের যুগ। এই যুগের বহু দার্শনিকই ধর্ম্মপ্রচারক ছিলেন। দর্শন ধর্ম্মশাস্ত্রেরই এক অংশে পরিণত হইয়াছিল। বাইবেল যে শুধু দর্শনকেই গ্রাস করিয়াছিল এমন নহে, উহা রাজনীতি সমাজনীতি প্রভৃতি সকল নীতিরই প্রধান বিচারক হইয়াছিল। স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন বিচার লোপ পাইয়াছিল। বাইবেলের বিরুদ্ধে কেহ কোন মত প্রকাশ করিতে পারিত না। বাইবেলের উক্তিগুলি কোন দার্শনিক বিচারের দ্বারা সমর্থন করিতে না পারিলেও বাইবেলের প্রাধান্য তাঁহাদের স্বীকার করিতে হইত। বহু স্বাধীনচেতা মহাপুরুষ বাইবেলের বিরুদ্ধে স্বাধীন মত প্রকাশ করিয়া অকালে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। দার্শনিকদের একমাত্র কাজ ছিল বাইবেল ব্যাখ্যা। বাইবেলে একই সমস্যার পরস্পর বিরোধী দুই সিদ্ধান্ত থাকিলে দার্শনিকের উভয় সিদ্ধান্তকেই সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে হইত। স্বাধীন চিন্তার অভাবে দর্শন আর দর্শন রহিল না। চিন্তার স্বাধীনতা ছিল না বলিয়াই এই যুগকে অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগও বলা হয়।

স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার অধিকার মানুষের জন্মগত। এই অধিকার হইতে কেহ কোন দিন তাহাকে বঞ্চিত করিতে পারে না। অন্ধবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া সে বেশীদিন থাকিতে পারে না। তাহার মনে যে সকল প্রশ্ন উদিত হয় সেই সকল প্রশ্নের উত্তর সে নিজেই বিচার দ্বারা প্রদান করিতে সচেষ্ট হয়। সকল বিশ্বাসই সে নিজের বিচার-মাপকাঠি দ্বারা প্রথমে পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করিতে চাহে। বাইবেল-বাক্যই হউক অথবা ভগবদ্ বাক্যই হউক, সে সকল বাক্যই বিচার করিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে। যে সকল বাক্য বিচারগ্রাহ্য নহে সে সকল বাক্য তাহার নিকট অসার ও ভিত্তিহীন। কাজেই বাইবেলের প্রাধান্য বেশী দিন রহিল না। মানুষের মন বাইবেলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। এই বিদ্রোহেই বর্ত্তমান দর্শনের উৎপত্তি। রাজনীতি, সমাজনীতি ও বিজ্ঞানের সহিত দর্শনও বাইবেলের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিল।

বর্ত্তমান যুগকে সোনার যুগ বলা হয়। এই যুগ স্বাধীনতার যুগ। স্বাধীন চিন্তা ও সংস্কারের সপক্ষে সংগ্রাম এই যুগের বিশেষত্ব। স্মৃতি ও শ্রুতি

দার্শনিকের বিচারালয়ে আনীত হইল এবং দুইই দার্শনিকের হাতে চিরদিনের জন্য তাহাদের প্রাধান্য হারাইল। বিশ্বাসের স্থান বিচার গ্রহণ করিয়া বসিল। যাহাকিছু বিচারগ্রাহ্য তাহাই বিশ্বাস যোগ্য। বিশ্বাসের পরিবর্তে বিচারই সত্য নির্দ্ধারণের একমাত্র উপায় নির্দ্ধারিত হইল। যাহা জ্ঞান-রাজ্যের বাহিরে তাহা দর্শনেরও বাহিরে। ডেকার্টই যে প্রথম স্মৃতি ও শ্রুতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন তাহা নহে, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক মনীষিগণ দর্শন ও বিজ্ঞানকে সংস্কারের কবল হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু ডেকার্টই প্রথম দর্শনের প্রধান প্রধান সমস্যাগুলির সমাধান অতিশয় শৃঙ্খলার সহিত করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান যুগে ডেকার্টের পূর্ব্বে প্রকৃতপক্ষে কেহ দার্শনিক ছিলেন না। দর্শন সংস্কারের হাত হইতে মুক্ত হইয়াছিল বটে কিন্তু প্রকৃত পথপ্রদর্শকের অভাবে নিশ্চল হইয়া পড়িয়াছিল। ডেকার্টই প্রথম দর্শনের প্রধান প্রধান সমস্যাগুলির সমাধান করিবার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। এই সব কারণের জন্যই ডেকার্টকে বর্ত্তমান দর্শনের প্রবর্ত্তক বলা হয়।

মানুষের মনে নিরন্তর প্রশ্ন উঠিতেছে—জগৎ কি? আমি কে? আমার জীবনের আদর্শই বা কি? মানুষ যে পর্য্যন্ত না এই সকল প্রশ্নের সম্যক্ উত্তর প্রদান করিতে পারে সে পর্য্যন্ত তাহার মনে একটা অসহনীয় অশান্তি। মানুষ প্রথম এই সকল প্রশ্নের উত্তরের জন্য নিজের সাধারণ জ্ঞান অথবা শ্রুতি ও স্মৃতিজ্ঞানের উপরই নির্ভর করিয়া থাকে; কিন্তু পরে জ্ঞানবৃদ্ধির সাথে তাহার এই নির্ভরতাও কমিতে থাকে। শেষে তাহার জীবনে এমন একটা সময় আসিয়া পড়ে যে, সে আর নিজের সাধারণ জ্ঞান বা স্মৃতি ও শ্রুতিজ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারে না। তাহার মনে সংশয় জাগিয়া উঠে, সমস্যার উদয় হয়। মানুষ তখন সত্যানুসন্ধিৎসু হইয়া উঠে। এই সমস্যার সমাধান ও সংশয় দূরীকরণই দর্শন। এই দর্শনেই মানুষ তাহার অন্তরের জটিলতম প্রশ্নগুলির উত্তর পাইয়া থাকে।

ডেকার্টের মনে প্রথম মানুষের এই স্বাভাবিক অথচ জটিল প্রশ্নগুলি উদিত হইল। তাঁহার মনে সত্যানুসন্ধিৎসা প্রবলভাবে জাগিয়া উঠিল, তিনি এই সকল প্রশ্নগুলির যথার্থ উত্তর পাইবার জন্য প্রথমে শ্রুতি ও স্মৃতি দুইই আলোচনা করিলেন, কিন্তু তাহাতে যথার্থ জ্ঞানের সন্ধান পাইলেন না। তিনি দেখিতে পাইলেন যে, স্মৃতি ও শ্রুতি দুইই লোকের অসার ও ভিত্তিহীন মতামতে পরিপূর্ণ এবং ঐ মতগুলি প্রায়ই পরস্পর বিরোধী ও অনুভূতি দ্বারা সমর্থন যোগ্য নহে। তিনি ইতিহাস বিজ্ঞান ও ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি সকল শাস্ত্রই বিচার করিয়া দেখিলেন কিন্তু কোন শাস্ত্রই তাঁহার সূক্ষ্ম বিচারে টিকিল না। ডেকার্ট গণিতশাস্ত্র ও জ্যামিতি পাঠ করিয়া অতিশয় আনন্দলাভ করিলেন, কেননা গণিতশাস্ত্র ও জ্যামিতির সিদ্ধান্তগুলি নির্ভুল ও সন্দেহের বাহিরে। একটি ত্রিভুজের দুটি বাহু সমান হইলে যে ভূমিসংলগ্ন কোণ দুটি সমান হইবে ইহা সংশয়াতীত। তিনি ভাবিতে লাগিলেন কি উপায়ে জ্যামিতির এই বিশ্লেষণ দর্শনে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। তিনি খুঁজিতে লাগিলেন এমন একটা বিশুদ্ধ স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান, যাহার বিশ্লেষণে সকল জ্ঞানই জ্যামিতির সিদ্ধান্তের ন্যায় স্বতঃসিদ্ধ হইবে। ডেকার্ট তাঁহার নিজের ইন্দ্রিয়লভ্য জ্ঞান বিশ্লেষণ করিয়া সত্যের সন্ধান পাইলেন না। তাঁহার মনে প্রশ্ন উঠিল—কে জানে আমি যখন পদার্থসমূহকে প্রত্যক্ষ করিতেছি তখন আমি স্বপ্ন দেখিতেছি না? কে জানে আমি রজ্জুতে সর্পভ্রম করিতেছি না?

এইরূপে ডেকার্টের মনে গভীর সংশয় জাগিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, বিশুদ্ধ, স্বতঃসিদ্ধ এবং

অবাধিত জ্ঞানই একমাত্র জ্ঞান। এই জ্ঞান লাভ করিতে হইলে সর্ব্ববিধ সংস্কার হইতে মুক্ত হইতে হইবে। যাহা আমরা পরিষ্কারভাবে জানিব তাহাই একমাত্র সত্য। বিশুদ্ধ জ্ঞানকে সত্য বলিয়া গ্রহণ কবিতে যদি আমাদের স্মৃতি, শ্রুতি ও সকল শাস্ত্র, এমন কি যাহা চিরদিন সত্য বলিয়া মানিয়া আসিয়াছি তাহাও যদি মিথ্যা বলিয়া পরিত্যাগ কবিতে হয় তাহাও করিতে হইবে। ডেকার্টের মনে গভীর সংশয় জাগিয়াছিল বটে কিন্তু তিনি সংশয়বাদী ছিলেন না। তিনি অন্যান্য সংশয়বাদীর ন্যায় জ্ঞান অসম্ভব বা কোন কিছুই বিশুদ্ধভাবে জানা যায় না, একথা সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। তিনি সংশয়েব মধ্যেই বিশুদ্ধ জ্ঞানেব পরিচয় পাইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, আমি জগতেব সকল জিনিষই সন্দেহ করিতেছি, কিন্তু আমাব সন্দেহ সম্বন্ধে ত কোন সংশয় আমাব নাই। আমি যে সন্দেহ কবিতেছি এ বিষয়ে ত আমাব কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু চিন্তা করিতে না পাবিলে সন্দেহ কবা যায় না। সকল জিনিষই মিথ্যা হইতে পাবে কিন্তু আমি যে চিন্তা করিতেছি ইহাত ধ্রুব সত্য। ডেকার্ট এই চিন্তার ভিতবেই দর্শনের এক গভীব তত্ত্ব আবিষ্কাব কবিয়া ফেলিলেন।

এই 'চিন্তাব' ভিতবেই তিনি আত্মজ্ঞানেব সন্ধান পাইলেন। তিনি বলিলেন, আমি চিন্তা করিতেছি, সুতরাং আমি আছি। আমি না থাকিলে অর্থাৎ আমাব সত্তা না থাকিলে আমি কি চিন্তা করিতে পারি? এই আত্মজ্ঞান অনুমান লভ্য নহে। আত্মার সত্তা অনুমান দ্বারা প্রমাণ করা যায় না। ইহা স্বয়ংসিদ্ধ। আমি না থাকিলে অনুমান করিবে কে? কাজেই আমার 'চিন্তা' আমার অস্তিত্বের উপর নির্ভর করিতেছে। কিন্তু এদিকে যেমন আমি না থাকিলে চিন্তা করিতে পারি না, অন্যদিকে তেমন আমি যে আছি ইহা চিন্তা না করিলে বুঝিতে পারি না। আত্মা পদার্থবিশেষ এবং চিন্তা তাহার গুণ। দ্রব্য ব্যতীতও গুণ নাই, গুণ ব্যতীতও দ্রব্য নাই। গুণ সর্ব্বদাই দ্রব্যাশ্রিত। দ্রব্যের অস্তিত্বও গুণের ভিতরে প্রকাশিত। দুই পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া আছে। এক অন্য ব্যতীত অজ্ঞেয়। দ্রব্যের অনেক গুণ আছে, কিন্তু দ্রব্যের এমন একটি গুণ রহিয়াছে যেটি না থাকিলে দ্রব্যের দ্রব্যত্বই থাকে না। সেই গুণটি দ্রব্যেব স্বরূপ বা স্বগুণ। জলের অনেকগুণ রহিয়াছে; কিন্তু জলের শৈত্য গুণ না থাকিলে জল আর জল থাকে না। শৈত্যগুণই জলেব স্বরূপ। সেইরূপ চিন্তাই আত্মার স্বগুণ। 'চিন্তা' না থাকিলে আত্মার অস্তিত্ব থাকে না এবং আত্মা না থাকিলেও 'চিন্তা' থাকে না। এই আত্মজ্ঞান অতি সহজ ও স্বভাবসিদ্ধ। ইহা স্বয়ং পরিস্ফুটিত।

ডেকার্ট বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, কিরকম ভাবে অন্য সকল পদার্থও এইরূপ বিশুদ্ধ ভাবে জানা যাইতে পারে। তিনি দেখিলেন যে, তাঁহাব তিন প্রকারের জ্ঞান রহিয়াছে, যথা—বিষয় জ্ঞান, কাল্পনিক জ্ঞান ও ঈশ্বর জ্ঞান। বিষয় জ্ঞান তিনি বিষয় হইতে লাভ করিয়াছেন। কাল্পনিক জ্ঞান তাঁহার স্বকৃত জ্ঞান। সোনার পাহাড়েব ন্যায় কোন পদার্থ পৃথিবীতে নাই। তিনি নিজেই দ্রব্যজ্ঞানের সাহায্যে এই কাল্পনিক জ্ঞান সৃষ্টি করিয়াছেন। ঈশ্বর জ্ঞান—অসীমতার জ্ঞান বা পূর্ণতার জ্ঞান। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এই জ্ঞান কোথা হইতে আসিল। প্রত্যেক কার্য্যেরই কারণ রহিয়াছে। ভাব কখনও অভাব হইতে আসিতে পারে না। কারণ ব্যতীত কোন কার্য্যই হইতে পারে না। কার্য্যে যে সকল গুণ রহিয়াছে সেই সকল গুণ কারণে থাকা চাই। কার্য্যের গুণ কারণের গুণ হইতে কখনও অধিক হইতে পারে না; কেননা তাহা হইলে কার্য্যের কতগুলি

গুণ থাকিবে যাহাদের কোন কারণ নাই। বিষয়-জ্ঞান বিষয় হইতে আসিয়াছে, কিন্তু এই ঈশ্বরজ্ঞান কোথা হইতে আসিয়াছে? এই জ্ঞান বিষয় হইতে আসিতে পারে না, কেননা বিষয় সসীম। কাহারও মতে সসীম হইতেই অসীমতার জ্ঞান পাওয়া যায়। সসীম পদার্থের সহিত সসীম পদার্থ কল্পনায় যোগ করিয়া চলিতে থাকিলে এমন এক সুদূর স্থানে আসিয়া পড়া যায় যে যাহার বাহিরে আর যাওয়ার সাধ্য থাকে না। এই সুদূরতার জ্ঞানই অসীমতার জ্ঞান। ডেকার্ট এই মত গ্রহণ করিতে পারিলেন না, সসীমের সহিত সসীম যোগ করিয়া কখনও অসীম পাওয়া যাইতে পারে না। সসীমের সমষ্টি সর্ব্বদাই সসীম। অধিকন্তু, কল্পনা-শক্তি অনুসারে বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন অসীম থাকিবে। কিন্তু অসীম এক এবং অদ্বিতীয়। বিভিন্ন অসীম থাকিলে অসীম সসীমেই পরিণত হইয়া থাকে।

কাহারও মতে অসীম সসীমের বাহিরে। এই মতও ডেকার্ট সমর্থন করিতে পারিলেন না। অসীম যদি সসীমের বাহিরে থাকে, তাহা হইলে সসীমের দ্বারা অসীম সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। অসীম সসীমের বাহিরে থাকিলে সসীমের মাঝে অসীমের জ্ঞান কখনও সম্ভবপর হইতে পারে না। এই অসীমতার জ্ঞান যেমন সসীম বিষয় হইতে আসিতে পারে না, তেমন এই জ্ঞান মানুষ নিজেও সৃষ্টি করিতে পারে না, কেননা মানুষ সীমাবদ্ধ জীব। সে তাহার অস্তিত্বের জন্য অনেক জিনিষের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। সুতরাং অসীমের জ্ঞান মানুষ কেবল মাত্র অসীম ও পূর্ণবস্তু হইতেই লাভ করিতে পারে। এই অসীম ও পূর্ণবস্তুই ঈশ্বর। ঈশ্বর না থাকিলে ঈশ্বরের জ্ঞানও থাকিতে পারে না। যেহেতু ঈশ্বরের জ্ঞান রহিয়াছে সেই হেতু ঈশ্বরের অস্তিত্বও রহিয়াছে। ঈশ্বরই ঈশ্বরজ্ঞানের একমাত্র কারণ।

ডেকার্টের এই মতবাদের বিরুদ্ধে অনেকে আপত্তি তুলিলেন। বস্তুজ্ঞানই বস্তুর অস্তিত্বের প্রমাণ নহে। আমার পকেটে একশত টাকা আছে—ইহা কল্পনা করিতে পারি বলিয়াই যে প্রকৃত পক্ষে আমার পকেটে একশত টাকা আছে ইহা বলা চলে না। কাজেই ঈশ্বরজ্ঞানই যে ঈশ্বরের অস্তিত্বে প্রমাণ একথা যুক্তিসঙ্গত নহে। ডেকার্ট এই আপত্তি খণ্ডন করিলেন। সাধারণ বস্তুর জ্ঞানই যে সাধারণ বস্তুর অস্তিত্বের প্রমাণ নহে একথা ঠিক কিন্তু ঈশ্বরজ্ঞানই যে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ ইহা অস্বীকার করা যায় না। পূর্ণের কোন অভাব থাকিতে পারে না। পূর্ণের সত্তা না থাকিলে পূর্ণ অভাববিশিষ্ট হইয়া পড়ে। অধিকন্তু পূর্ণের সত্তা না থাকিলে অপূর্ণেরও সত্তা থাকিতে পারে না। সত্তাবান সসীম ও অপূর্ণ পদার্থ সমূহ কারণভূত। অসীম ঈশ্বরই এই সকল পদার্থের একমাত্র আদি কারণ। ঈশ্বর স্বয়ম্ভূ। এই অসীমের সত্তা আছে বলিয়াই অপূর্ণ পদার্থ সমূহ সত্তাবান। ডেকার্ট পূর্ব্বে আত্মজ্ঞানের সন্ধান পাইয়াছেন। এই আত্মজ্ঞানের ভিতরেই তিনি আবার ঈশ্বর জ্ঞানের সন্ধান পাইলেন। জীব-আত্মা সসীম ও অপূর্ণ। অসীমের জ্ঞান না থাকিলে সসীমের জ্ঞান সম্ভবপর নহে। ঈশ্বর-জ্ঞান অনুমানলভ্য নহে। ইহা আত্মজ্ঞানের ভিতরেই নিহিত আছে। ডেকার্ট এইরূপ ভাবে ঈশ্বরের সত্তা প্রমাণ করিলেন।

ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান ও চিরমঙ্গলময়। ঈশ্বরের সৃষ্ট এই জগৎ প্রপঞ্চই তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বশক্তিমত্তার পরিচয় প্রদান করিতেছে। এখানে প্রশ্ন উঠিল, চিরমঙ্গলময় ঈশ্বরের সৃষ্ট জগতে অমঙ্গলের স্থান রহিয়াছে কেন? যদি ঈশ্বর অমঙ্গলও সৃষ্টি করিয়া থাকেন তবে তাঁহাকে চিরমঙ্গলময় বলা চলে না। যদি ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কোন অমঙ্গল-সৃষ্টিকারী শক্তির সত্তা মানিতে হয় তবে ঈশ্বর উহা দ্বারা সীমাবদ্ধ হইয়া পড়েন। ডেকার্ট এই সমস্যাও অতি

সুচারুরূপে সমাধান করিলেন। তিনি বলিলেন, আমরা স্থূল দৃষ্টিতে যে সকল প্রাকৃতিক অমঙ্গল দেখিতে পাই সেই সকল সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে দেখা যাইবে যে প্রকৃত অমঙ্গল নহে। জগতে কোন প্রকৃত অমঙ্গলের স্থান নাই। যে সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগকে আমরা অমঙ্গল বলিয়া মনে করি সেই সকল দুর্য্যোগ আছে বলিয়াই মানুষ তাহার বুদ্ধি ও শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ সাধন করতে সমর্থ হইতেছে।

ঈশ্বর চিরসত্যাশ্রয়। আমাদের ভিতরে যে সকল শক্তি রহিয়াছে সেই সকল শক্তি আমরা ঈশ্বরের নিকট হইতে পাইয়াছি। ঈশ্বর আমাদিগকে প্রবঞ্চিত করিতে পারেন না, কাজেই ঈশ্বর প্রদত্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা যে সকল জ্ঞান লাভ করি তাহা সত্য ব্যতীত মিথ্যা হইতে পারে না। ঈশ্বর প্রদত্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা জড়জগতের জ্ঞান লাভ করি বলিয়া আমাদের জড়জগতের জ্ঞানও সত্য। পরিদৃশ্যমান জগৎ সৎ। ঈশ্বরের সত্যাশ্রয়তাই ইহার অস্তিত্বের প্রমাণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির

স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দ

মন্দির,
তব মন্দির,
গগন ভেদিয়া উঠেছে ঊর্দ্ধে
গর্ব্বোন্নত শির,
তব মন্দির।

অচল অটল নির্ব্বাক মুখে
কালজয়ী হয়ে জগতের বুকে
হিমাচল সম রহিবে দাঁড়ায়ে
নীরব মহান্ ধীর,
তব মন্দির।

রুক্ষ পাষাণে রূপের গরিমা
ফুটেছে বিশ্ব শিল্প মহিমা,
স্বপন লোকের নহে কল্পনা
এ যে বিস্ময় ধরণীর,
তব মন্দির।

ভক্তি প্রেমের শাস্ত্র শিখায়
জ্ঞানের দীপ্তি কর্ম্ম বিভায়
মণ্ডিত তার অঙ্গন তলে
শ্রদ্ধায় নত শির,
তব মন্দির।

স্নিগ্ধ শীতল করুণা পাথার
জীবন মুক্ত পরশে যাহার
প্রেমের পুতলি পরম আশ্রয়
জীবন মরণ সন্ধির,
তব মন্দির।

বিভেদ জগতে শান্তি আনিতে
মানব ধর্ম্মে সবারে মিলাতে
উদার মহান্ মিলন তীর্থ
বিশ্বের মহা শান্তির,
তব মন্দির।

বিশ্ব মানব মিলিবে হেথায়
এ মহা যুগের মিলন মেলায়
শান্তি পাইবে শান্ত হইবে
প্রেমের তীর্থ অবনীর,
তব মন্দির।

শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ অনুধ্যানে

স্বামী অপূর্ব্বানন্দ

গীতামুখে হৃষীকেশ বলেছেন — "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ। জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি।" শ্রদ্ধাবান্, একনিষ্ঠ এবং সংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করে অচিরে পরমশক্তি অর্থাৎ মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন। ধর্ম্মের নিগূঢ়তত্ত্ব উপলব্ধি করতে হলে প্রত্যেক *মোক্ষকামীকেই শ্রদ্ধাবান্ হতে হবে। এই শ্রদ্ধারূপ* নৌকায় চড়ে সংযমের হাল ধরে বসে থাকলে এ জীবন-নদীর খরস্রোত উত্তাল তরঙ্গ ও শত ঝঞ্ঝাবাত অকুতোভয়ে অতিক্রম করে সাধক অচিরে পরপারে পৌঁছে যাবে—যেখানে চিরশান্তি ও আনন্দনিলয় সেই অমৃতধাম। শাস্ত্রে এই শ্রদ্ধা 'গুরবেদান্ত বাক্যেষু বিশ্বাস' রূপে কীর্ত্তিত হয়েছে। গুরু ও বেদান্ত-বাক্যে বিশ্বাসই হল চরম আধ্যাত্মিক অনুভূতির একমাত্র উপায়। রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রভৃতিতে উৎকর্ষলাভ করতে অন্য পন্থা থাকতে পারে কিন্তু ধর্ম্মরাজ্যে এগুবার একমাত্র পথ হল গুরু ও বেদান্তবাক্যে অচল অটল বিশ্বাস। শ্রীরামকৃষ্ণ চরণে উৎসর্গীকৃত জীবন স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের জীবনে আমরা দেখতে পাই এই শ্রদ্ধার পূর্ণ বিকাশ। শ্রীগুরুদেবের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালনই যেন তাঁর জীবনের চরম ব্রত ছিল। দক্ষিণেশ্বরের ঋষি অষ্টাদশ বর্ষীয় বালক হরিপ্রসন্নের হৃদয়ে সাধনার যে বীজ বপন করেছিলেন, সেই বীজ ক্রমে পত্রপুষ্প সুশোভিত হয়ে ফলভারে নত প্রকাণ্ড মহীরুহরূপে পরিণত হয়েছিল এবং উত্তরকালে শত শত নরনারী সেই মহীরুহের অমৃতফল আস্বাদন করে জীবন ধন্য করেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটি কথা বলতেন—"ফুল ফুটলে ভ্রমর আপনিই এসে জুটে।" তাই আমরা দেখতে পাই সর্ব্বভাবঘনমূর্ত্তি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট নানাভাবের সাধকগণের আগমন। তাই তো *সিদ্ধপীঠ দক্ষিণেশ্বরে নানাদেশ হতে বিশ্বদেবতার* পূজারিগণ ভক্তিনম্রচিত্তে পূজার অর্ঘ্য নিয়ে এসে হাজির হতেন। কারও আগমন ব্যর্থ হত না। সকল পথের পথিকই শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট নিজ নিজ পথের সন্ধান পেয়ে আপ্তকাম হয়ে যেতেন। আর পেতেন এমন ইঙ্গিত ও প্রেরণা যাতে নিজ নিজ অভীষ্ট সিদ্ধ হয়ে যেত। জ্ঞানী, ভক্ত, যোগী, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব সকল ভাবের ভাবুকই নিজ নিজ ধর্ম্মজীবনে একটি নূতন আলোক পেতেন এবং সেই 'সত্যং শিবং সুন্দরম্'এর সংস্পর্শে এসে অমৃতের আস্বাদ সম্ভোগ করে কৃতার্থ হয়ে যেতেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিক্ষার একটা বৈশিষ্ট্য ছিল—তিনি কারও ভাব নষ্ট করতেন না এবং 'যাকে যেমন তাকে তেমন' ভাবে শিক্ষা দিতেন। সাধকগণ তাঁর নিকট আসা মাত্রই ঠাকুর তাঁর অলৌকিক আধ্যাত্মিক দৃষ্টি সহায়ে কে কোন্ ঘরের লোক তা অনায়াসে বুঝতে পারতেন এবং তদনুসারে প্রত্যেককে নিজ নিজ সাধনরাজ্যে অগ্রসর হতে সাহায্য করতেন। যে সকল বালক ভক্ত উত্তরকালে তাঁর যুগ-প্রবর্ত্তনের সহায়ক হয়েছিলেন, তাঁদের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ ছিল যেন আরও বিচিত্র রকমের এবং তাঁদের শিক্ষার ধারাও ছিল

স্বতন্ত্র। প্রথম সাক্ষাতের সময় হতেই ঠাকুর তাঁদের সঙ্গে চিরপরিচিত পরম আত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার করতেন, তাঁদের সকল ভার যেন চিরতরে নিজের উপর টেনে নিতেন এবং সুনিপুণ ভাস্করের ন্যায় দিনের পর দিন মাসের পর মাস বৎসরের পর বৎসর ধরে অদ্ভুত ধৈর্য্য সহকারে নিজ যোগবিভূতিসহায়ে সেই বালক ভক্তগণের আধ্যাত্মিক জীবন সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর করে গড়ে তুলতেন। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ সন্তানগণ আজ সমগ্র মানবজাতির আদর্শ। জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি ও যোগের অপূর্ব্ব সম্মিলন সেই রামকৃষ্ণ-শিষ্যগণ আজ মানবত্বের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। কি অদ্ভুত টানই না ছিল ঠাকুরের তাঁর বালক ভক্তদের প্রতি। নরেন্দ্র অনেকদিন ঠাকুরের নিকট আসে নাই, ঠাকুর নিজে গিয়ে হাজির নরেন্দ্রের খোঁজ নিতে—ইত্যাদি আরও কত ঘটনাই না লিপিবদ্ধ রয়েছে।

পূজনীয় বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ একদিন কথা-প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "ঠাকুর আমাদের জন্য কতই না ভাবতেন! তাঁর নিকট অনেকদিন না গেলে তিনি কাউকে দিয়ে ডেকে পাঠাতেন এবং খোঁজ খবর নিতেন। শরৎ মহারাজ মাঝে মাঝে ঠাকুরের খবর নিয়ে আমার কাছে আসতেন। একবার অমনি-ধারা তিনি ডেকে পাঠাতে তাঁকে দর্শন করতে দক্ষিণেশ্বরে যাই। গিয়ে দেখি, সে দিন তাঁর কাছে লোকজন বড় একটা কেউ নেই। আমি তাঁর ঘরে যেতেই তিনি যেন একটু অনুযোগের সুরে বললেন, 'কিরে, কেমন আছিস্? আজকাল যে আসাযাওয়া একেবারে কমিয়ে দিয়েছিস! ডেকে পাঠালেও আসিস নে!' আমি বললুম, 'সব সময় আসতে ইচ্ছা হয় না তাই আসি নে।' তাতে ঠাকুর একটু হেসে হেসে বললেন, 'তা বেশ। আচ্ছা, একটু আধটু ধ্যানট্যান করিস তো?' আমি বললুম, 'ধ্যান করবার তো চেষ্টা করি কিন্তু ধ্যান হয় কোথায়? ধ্যান তো মশাই মোটেই হয় না।' ঠাকুর তাতে যেন একটু আশ্চর্য্য হয়ে বললেন, 'বলিস কিরে? ধ্যান হয় না? কেন হবে না? নিশ্চয় হবে।' তারপর খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে আছি, দেখি তিনি আর কি বলেন। দেখতে দেখতে তাঁর মুখ-চোখের ভাব একেবারে পাল্‌টে গেল। তিনি খুব গম্ভীর-ভাবে বললেন, 'আচ্ছা, যা তো এখন পঞ্চবটীতে, ওখানে গিয়ে ধ্যান কর।' এই বলেই আমার আপাদমস্তক দেখতে লাগলেন। পরে বললেন, 'আচ্ছা, আয় তো একবার এদিকে।' আমি তাঁর কথামত এগিয়ে আসতেই তিনি আমায় জিব দেখাতে বললেন এবং জিবে আঙুল দিয়ে কি যেন দাগ কেটে দিলেন। তারপর বললেন, 'যা এবার পঞ্চবটীতে।' আমিও তাঁর কথামত পঞ্চবটীর দিকে আস্তে আস্তে চলে গেলুম। এদিকে ঠাকুর আমায় ছুঁয়ে দেওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত শরীর যেন অবশ হয়ে যেতে লাগল। আর যেন পা চলে না, এমনি অবস্থা। কোন রকমে তো পঞ্চবটীতে গিয়ে বসলুম। তারপর আমার আর কিছু হুঁশ ছিল না, যেন একটা নেশার ঘোরে অনেক সময় কেটে গেল। যখন জ্ঞান হল তখন দেখি ঠাকুর কাছে বসে আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন আর মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসছেন। খানিকপরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিরে ধ্যান হল?' আমি বললুম, 'হাঁ আজ তো ধ্যান হয়েছে।' তখন ঠাকুর বললেন, 'এখন রোজই হবে দেখবি। কিছু দর্শন টর্শন হল?' ইত্যাদি। সেদিন ঠাকুরের সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা হয়েছিল, তারপর তিনি সঙ্গে করে তাঁর ঘরে নিয়ে এসে খুব আদর করে খেতে দিয়েছিলেন, তাঁর ঘরে তখন তিনি আর আমি, আর কেউই ছিল না, সাধন ভজন সম্বন্ধে তিনি অনেক অনেক গুহ্য কথা সেদিন বলেছিলেন। আমি তো তাঁর কথাবার্ত্তা শুনে আদর পেয়ে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলুম। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, আহা, তিনি আমার জন্য কত ভাবেন, আমার

ধারণাই ছিল না। তিনি ওখানে বসে বসে আমার জন্য এত ভাবনা করেন। তাঁর কৃপার তুলনা নেই। ঠাকুর কথায় কথায় সেদিন বলেছিলেন, 'দেখ, মেয়েমানুষের দিক্‌ মাড়াসনে, খুব সাবধানে থাকবি। সংসারের আঁচটিও যেন গায়ে না লাগে। সোনার মেয়েমানুষ হলেও সেদিকে ফিরে তাকাবি নি। তোকে একথা কেন বলছি জানিস? তোরা হলি মায়ের লোক, তাঁর অনেক কাজ তোদের করতে হবে, কাকে ঠোকরানো ফল মায়ের পূজায় লাগে না রে! তাই বলছি খুব সাবধানে থাকবি।' ”

শ্রীশ্রীঠাকুরের এই উপদেশ বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন, বুঝিবা ঐ মাহেন্দ্রক্ষণেই সেই 'আশ্চর্য্য বক্তা' ঠাকুরের কাছে হরিপ্রসন্নের জীবনের পূর্ণাভিষেক চিরতরে হয়ে গেল এবং সেই মুহূর্ত্ত হতেই 'কুশলী' শিষ্য শ্রীগুরুপদে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিবেদন করে সমগ্র জীবনব্যাপী সাধনার অতলজলে ডুব দিলেন। যে পর্য্যন্ত না শ্রেষ্ঠ 'রত্নধন' লাভ হয়েছিল ততদিন পর্য্যন্ত এই ডুবুরির সন্ধান পেয়েছিল খুব অল্প লোকই। শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই অমোঘ স্পর্শ ও উপদেশ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের জীবনে কি ভাবে রূপায়িত হয়েছিল তা আমরা ক্রমে ক্রমে দেখাবার চেষ্টা করব।

দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীমূলে দ্বাদশ বর্ষব্যাপী কঠোর তপস্যার পর ঠাকুর যখন সর্ব্বধর্ম্মে ও সর্ব্বভাবে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, যখন তিনি সমাধির নেশায় আপন ভোলা, তখন শ্রীশ্রীজগদম্বার আদেশ হল —'ওরে, তুই এখন ভাবমুখে থাক।' তাই মায়ের শিশু মায়ের নির্দ্দেশ মত ভাবমুখে থেকে লোক-কল্যাণে প্রবৃত্ত হলেন। কিন্তু কে তাঁর ভাব বুঝবে? যে আধ্যাত্মিক সম্পদ তিনি আহরণ করেছিলেন তার গ্রাহক কোথায়? তাই তিনি মা'কে ধরে বসলেন—"মা বিষয়ী লোকদের সঙ্গে কথা বলে বলে মুখ একেবারে জ্বলে গেল! আর যে পারিনে মা। তুই তোর শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তদের এনে দে, যারা এখানকার ভাব বুঝবে।" অনেক সময় তিনি প্রাণের আবেগে কুঠির উপর থেকে আরতির সময় চীৎকার করে ডাকতেন "ওরে, তোরা কে কোথায় আছিস আয়!" তাঁর আকুল আহ্বানে ক্রমে ক্রমে ভক্তগণ দক্ষিণেশ্বরে সমাগত হতে লাগলেন, ঠাকুরও তাঁর সেই আধ্যাত্মিক জ্ঞান-ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়ে যাঁর যেমন ভাব তদ্রূপ প্রয়োজনানুসারে প্রত্যেককে সেই রত্নরাজী অকাতরে বিতরণ করতে এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে সকলের আধ্যাত্মিক জীবন গড়ে তুলতে লাগলেন। ঠাকুরের শিক্ষার ধারাই ছিল এক স্বতন্ত্র প্রকারের, ভালবাসাই ছিল তাঁর শ্রেষ্ঠ উপাদান। তিনি ভালবেসে সকলকে আপনার হতেও আপনার করে নিতেন। উত্তরকালে বাবুরাম মহারাজ তাঁর মাকে বলেছিলেন, "ঠাকুর আমাকে যেমন ভালবাসেন তুমি কি তেমন ভালবাসতে পার?" তাতে বাবুরাম মহারাজের মা খুবই আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে বলেছিলেন, "বলিস কিরে! মার চাইতেও কি কেউ বেশী ভালবাসতে পারে?"

কিন্তু ঠাকুরের স্বর্গীয় ভালবাসা মা বাপ ও অন্যান্য আপনজনের পুঞ্জীকৃত ভালবাসাকেও ম্লান করে দিত, তাই ঠাকুরের বালকভক্তগণ মায়ের কোল ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন ঠাকুরের কোলে। পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন, মান-যশাদির সব আকর্ষণকে পদদলিত করে তাঁরা ঠাকুরের চরণে নিজেদের চিরতরে অশুল্কদাসরূপে বিকিয়ে দিয়েছিলেন। ঠাকুরও স্বর্গের নন্দনকানন হতে যে কয়টি অফুটন্ত ফুল আহরণ করে এনেছিলেন স্বর্গের পবিত্র সৌরভে মর্ত্ত্যধামকে আমোদিত করবেন বলে—সেই সব অস্ফুটকোরক তাঁর প্রেম পরিসিঞ্চনে এবং তাঁর স্নেহ শিশিরসম্পাতে ফুটে উঠেছিল অপূর্ব্ব শোভাধারণ করে। আর ঠাকুর

সেই সব মধুভরা ফুলের হার নিবেদন করেছিলেন মায়ের চরণে।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তদের মধ্যে যাঁদের ত্যাগের আদর্শ ও সেবার বাণী প্রচারের জন্য নির্দ্দিষ্ট করেছিলেন, তাঁদের শিক্ষা গোড়াগুড়ি হতেই ছিল স্বতন্ত্র ধরণের। ঠাকুর তাঁদের প্রথম আগমনের পর হতেই কামিনীকাঞ্চনত্যাগরূপ আদর্শে সর্ব্বদা অনুপ্রাণিত করতেন—যাতে তাঁরা উত্তরকালে তাঁর গৈরিক পতাকাবহনের সামর্থ্য লাভ করতে পারেন। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ ছিলেন তাঁদের অন্যতম। শ্রীগুরুদেবনির্দ্দিষ্ট কাম-কাঞ্চন ত্যাগের আদর্শ তাঁর প্রাণে কি গভীর রেখাপাত করেছিল তা তাঁর একদিনকার কথা-প্রসঙ্গে বেশ ফুটে উঠেছিল। আমরা ক্রমে সেই কথারই অবতারণা করব।

১৯৩৭ সালের প্রথমভাগে শ্রীমদ্ অখণ্ডানন্দ মহারাজের অকস্মাৎ দেহত্যাগের পর শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের অধিনায়কত্বের গুরুভার পড়েছিল শ্রীমদ্ বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের উপর। তখন হতে তিনি মঠ-মিশনের নানা কার্য্যব্যপদেশে প্রয়োজনানুসারে প্রায়ই বেলুড় মঠে আগমন করতেন। বিশেষ করে শ্রীশ্রীঠাকুরের নূতন মন্দির নির্ম্মাণের কার্য্য তত্ত্বাবধান করবার জন্যও তাঁকে ঘনঘন মঠে আসতে হত। তাঁর শুভাগমনে সমগ্র মঠ আনন্দকোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠত, আর মঠে নিত্যই বহুতীর্থযাত্রীর ভিড় লেগে থাকত। ১৯৩৭ সালের গরমের সময় এমনিধারা তিনি একবার মঠে এসে কয়েকদিন বাস করছেন। রোজই বহু ভক্তের দীক্ষাদি হচ্ছিল। সকাল হতে অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত সর্ব্বক্ষণই ভক্তগণ তাঁর কৃপা ও উপদেশ পাবার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকতেন। আর তিনিও নিজ শরীরের প্রতি বিন্দুমাত্র লক্ষ্য না করে অকাতরে সকলের আশা ও আকাঙ্ক্ষা মেটাতে সদা তৎপর থাকতেন।* একদিন বেলা প্রায় সাড়ে এগারটা হবে, তিনি মঠের উপরে তাঁর নির্দ্দিষ্ট কক্ষে একটু বিশ্রাম করছেন। সকালে অনেক দর্শনাকাঙ্ক্ষী ও দীক্ষাপ্রার্থী উপস্থিত ছিলেন। সকলকেই তিনি পরিতৃপ্ত করেছেন, তাই শ্রান্ত ও অবসন্ন দেহে একটু শুয়ে আছেন। ঘরের সামনের দরজা বন্ধ। একজন সেবক মৃদু পাখা সঞ্চালনে বাতাস করছিলেন এবং মঠের আর দুজন সন্ন্যাসী তাঁর পদসেবার রত। প্রাণের ইচ্ছা যে এই সুযোগে তাঁর একটু পূত-সঙ্গ লাভ করবেন। বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ পূর্ব্বাস্য হয়ে শুয়ে আছেন, চক্ষু মুদ্রিত কিন্তু তাঁর মন যে কোন্ ভাবরাজ্যে বিচরণ করছে তা কে জানে? মুখমণ্ডলে একটি দিব্য জ্যোতিঃ ফুটে উঠেছে। কথাবার্ত্তা খুবই সামান্য বলছেন, তা-ও সাধারণ ভাবের। নিকটস্থ সন্ন্যাসীদের লক্ষ্য করে তিনি কথা কইতে সুরু করলেন, "দেখ সন্ন্যাস জীবন বড় কঠোর জীবন। বিশেষ করে যারা ঠাকুরের সন্ন্যাসী তাঁদের জীবন সর্ব্ব-বিষয়ে আদর্শস্থানীয় হওয়া চাই। কায়মনো-বাক্যে কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ সন্ন্যাসীদের এক-মাত্র আদর্শ। নইলে কেবল বিরজা হোম করে গেরুয়া পরে সন্ন্যাসী হলে তো হবে না? আত্মজ্ঞান লাভ করা দাদা চারটেখানি কথা? কামিনীকাঞ্চনে এতটুকুও আসক্তি থাকলে তা হবার জো নেই। যত ধ্যানই কর, যত জপই কর, কি কাজকর্ম্মই কর বা খুব পাণ্ডিত্য অর্জ্জনই কর, কিছুতেই কিছু হবে না, যদি না ঐ আদর্শকে আঁকড়ে ধরে না থাকতে পার। ঠাকুর যে বলতেন, 'সন্ন্যাসী এমন কি স্ত্রীলোকের পট পর্য্যন্ত দেখবে না', আর কাঞ্চন কাকবিষ্ঠার ন্যায় ত্যাগ করতে হবে। কামিনী আর কাঞ্চন এ দুয়ের মধ্যে এমন নিকট সম্বন্ধ যে একটি জুটলেই অপরটি ঠিক এসে জুটবে, কেউ রোখতে পারবে না। তা বলে যে স্ত্রীলোকদের ঘৃণা করতে হবে, অবজ্ঞার চক্ষে দেখতে হবে, তা নয়। বরং তাঁদের খুব বেশী সম্মানের চক্ষে দেখবে—

মন্দিরে যে মা আছেন ঠিক তেমনি। তাঁরা মায়ের জাত, তাঁদের দূর হতে প্রণাম করবে। তোমরা যে সন্ন্যাসী, তাই তো তোমাদের জীবনাদর্শ এরূপ। কদাপি তাদের সঙ্গে মেলামেশা করবে না।”

জনৈক সন্ন্যাসী। মহারাজ, আমাদের যেমন পাঁচরকমের কাজকর্ম্মের ভিতর থাকতে হয় তাতে মেয়েদের সঙ্গে একেবারে না মিশে তো পারা যায় না। অনেক সময়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্য হয়ে মেয়েদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলতে হয়। যখন কোন সেবাকার্য্যে আমরা যাই বা হাসপাতালে কাজকর্ম্ম করি, তখন তো মহারাজ শতচেষ্টা করলেও মেয়েদের সঙ্গে একেবারে না মিশে পারা যায় না।

মহারাজ। তা সত্যি বটে, কাজকর্ম্মের ভেতর থেকে মেয়েদের একেবারে বাদ দেওয়া বড়ই মুস্কিল। তবে কি জান? কাজ তো ঠাকুরেরই আর ঐ যে সন্ন্যাসীর পক্ষে উপদেশ তা-ও ঠাকুরের। এ দুয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য করে নিতে হবে। যখন নেহাৎ দরকার হয় তখন একটু আধটু কথাবার্ত্তা বলতে হবেই, তা-ও খুব সাবধানে, সেই রকম মেলামেশা আর কতক্ষণ? কিন্তু তার অতিরিক্ত যেন না হয়। আমার বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে, তোমরা কাজকর্ম্ম বন্ধ করে ঘরের দরজায় খিল দিয়ে বসে থাক। কাজকর্ম্ম করবে চিত্তশুদ্ধির উপায় জ্ঞানে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজ নিজ জীবনাদর্শের দিকে দৃষ্টি স্থির রাখতে হবে, অনেক সময় বিপদ এত অতর্কিতভাবে এসে পড়ে যে, তখন আর সামলাবার সময় থাকে না। আমার কিন্তু, একএকবার এ-ও মনে হয় যে, স্বামীজি এইসব কাজকর্ম্মের প্রবর্ত্তন করে মহা অনর্থের সূচনা করেছেন, এতে জগতের লোকের খুব উপকার হচ্ছে সন্দেহ নেই কিন্তু যারা এই সব কাজকর্ম্ম করছে, তাদের জীবন খুবই বিপদসঙ্কুল করে দিয়েছেন। তবে এ-ও খুবই সত্যি যে, বসে বসে পশ্চিমে সাধুদের মতন কুড়েমি করে আর পাঁচরকম গল্পগাছা করে সময় নষ্ট করার চাইতে এই সব সেবাদি কাজকর্ম্মে মনকে লিপ্ত রাখা সহস্রগুণে শ্রেয়। কিন্তু যারা ঠিক ঠিক সাধনভজন করতে পারে, সর্ব্বক্ষণ ভগবৎ চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকতে পারে, তাদের এসব কাজকর্ম্মের কোনই দরকার নেই। একদিন স্বামীজির সঙ্গে আমার এ বিষয় নিয়ে খুবই কথাবার্ত্তা হয়েছিল।

এই পর্য্যন্ত বলে পূজনীয় বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ স্বামীজির ঘরের দিকে তাকালেন। তিনি যে ঘরে শুয়েছিলেন সে ঘরের ও স্বামীজির ঘরের মাঝের দরজাটা বন্ধ ছিল। তবু তিনি স্বামীজির ঘরের দিকে এমনিভাবে তাকিয়ে রইলেন যেন তাঁর দৃষ্টি মাঝের দেয়াল ও বন্ধ দরজা ভেদ করে স্বামীজির ঘরের ভেতরেই গিয়ে পৌছুল। পরে তিনি বলতে লাগলেন, “স্বামীজি তাঁর ঘরে বসেছিলেন। তখন মাঝের এই দরজাটা খোলা থাকত। আমরা এদিক দিয়েও স্বামীজির ঘরে যাতায়াত করতুম। আমার কিছু দিন যাবৎ মনে হচ্ছিল যে, স্বামীজি তো দেশ বিদেশে ঘুরে কতশত বক্তৃতাদি দিয়ে এলেন, তাঁকে সব রকমের লোকজনের সঙ্গেই মেলামেশা করতে হত, মেয়েদের সঙ্গেও। তখন স্বামীজির সঙ্গে তাঁর প্রেম শিষ্যারাও ছিলেন, তাই আমার মনে হত যে, স্বামীজি যা করে এলেন একি ঠিকঠিক ঠাকুরের ভাবানুযায়ী? তিনি কেন এত সব মেয়েদের সঙ্গে মিশলেন? এই সব খুবই মনে হচ্ছিল, তাই একদিন স্বামীজিকে নিরিবিলি পেয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, ‘আচ্ছা আপনি তো পাশ্চাত্য দেশে গিয়ে মেয়েদের সঙ্গেও মেলামেশা করেছেন? কিন্তু ঠাকুরের শিক্ষা তো অন্য রকম ছিল; তিনি তো বলতেন যে, সন্ন্যাসী মেয়ে মানুষের পট পর্য্যন্ত দেখবে না। আমাকেও তিনি বলেছিলেন যে, খবরদার, কখনও মেয়েদের সঙ্গে মিশবি নি, হাজার ভক্তিমতী হলেও না, তাই এই সব কথা

আমার প্রায়ই মনে হচ্ছিল যে আপনি কেন এমন ধারা করলেন।'

"আমার কথা শুনে স্বামীজি হঠাৎ খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন। তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আমার তো তখন খুব ভয় হতে লাগল যে কি বলতে কি বলে ফেললুম, তাঁর মুখচোখ একেবারে লাল হয়ে উঠল। তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন, 'দেখ, পেসন্, ঠাকুরকে তুই যতটুকু বুঝেছিস ঠাকুর কি ততটুকুই? আর তুই ঠাকুরকে কতটুকুই বা বুঝেছিস! জানিস, ঠাকুর আমায় স্ত্রীপুরুষের ভেদ মেরে দিয়েছেন। আত্মাতে আবার স্ত্রীপুরুষ কিরে? তাছাড়া ঠাকুর এসেছেন সারা দুনিয়ার জন্য। তিনি কি বেছে বেছে কেবল পুরুষদের উদ্ধার করতেই এসেছেন? তিনি সকলকেই উদ্ধার করবেন, স্ত্রীপুরুষ সকলকেই। তোরা নিজ নিজ বুদ্ধির মাপকাঠিতে মেপে ঠাকুরকে এত ছোট করতে চাস? তাঁর কৃপা এ দুনিয়ার সব নরনারী তো পাবেই, তাঁর কৃপার প্রভাব অন্য লোকেও গিয়ে পৌঁছুবে। তিনি তোকে যা বলেছেন তা তো আর মিথ্যা নয়! সেও সত্যি। তিনি তোকে যে ভাবে উপদেশ দিয়েছেন তুই সেভাবেই চলবি। কিন্তু আমাকে বলেছেন অন্যরকম। বলেছেন কিরে, দেখিয়ে দিয়েছেন। আমায় তিনি নিজে হাত ধরে যাই করাচ্ছেন তাই আমি করছি।'

"এই বলতে বলতে স্বামীজি যেন একটু শান্তভাব ধারণ করলেন। আমি তো স্বামীজির ঐ মূর্তি দেখে ভয়ে একেবারে জড়সড় হয়ে পড়েছিলুম। আমার মুখ দিয়ে আর কথা বেরুচ্ছিল না, তাই দেখে স্বামীজির যেন একটু দয়া হল। তিনি একটু হাসিমুখে বললেন, 'মেয়েদের ভেতর সেই আত্মশক্তি না জাগলে কি কখনও কোন জাত জাগে, না কোন জাত উঠতে পারে? আমি তো সারা দুনিয়াটা ঘুরে দেখলুম। সব দেশেই মেয়েদের প্রায় একই অবস্থা, বিশেষ করে আমাদের এ পোড়া দেশে। তাই তো এ জাতের এত অধঃপতন, মায়েরা জাগলেই দেখবি যে সমগ্র জাতটা আবার জেগে উঠেছে। তাই তো রে মা এসেছেন। মার আসার পর থেকেই সব দেশের মেয়েদের ভেতর জাগরণের সাড়া পড়ে গেছে। আরও কত হবে দেখবি।'

"স্বামীজি আরও কি সব বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে কে এসে পড়াতে স্বামীজি তাঁর সঙ্গেই কথা বলতে সুরু করলেন, আমিও তাঁর ঘর থেকে চলে এলুম। স্বামীজি এমন জোরের সঙ্গে সব বলছিলেন যে, তাঁর কথার ওপর আর কথা বলতেও সাহস হয় নি। কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল যে, ঠাকুর আমায় যেমন বলেছেন আমি তেমনিই করে যাব। স্বামীজির কথা স্বতন্ত্র, তিনি হলেন ঠাকুরের প্রধান যন্ত্রস্বরূপ। বাস্তবিকই তো ঠাকুরকে স্বামীজি যেমন বুঝেছেন তেমনটি আর কে বুঝতে পারবে? তাঁকে দিয়েই ঠাকুর তাঁর সব কাজ করিয়ে নিয়েছেন। স্বামীজি একজনই হয়। আমরা তো আর স্বামীজি হতে পারব না! তবে স্বামীজিকে এও দেখেছি যে, তিনি তাঁর মেম শিষ্যাদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন বটে, কিন্তু নূতন সাধু ব্রহ্মচারীদের তিনি কখনও তাঁদের কাছে যেতে দিতেন না। কোন জিনিষপত্র পাঠাতে হলেও হয় তো তিনি নিজে যেতেন বা বড়দের মধ্যে কাউকে পাঠাতেন। এমন কি, তাঁর গুরুভাইদের মধ্যেও সকলকে তাঁদের কাছে পাঠাতেন না।"

এই সব কথা বলতে বলতে বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের মনপ্রাণ যেন ক্রমেই স্বামীজির ভাবে ভরপুর হয়ে গেল। এখন খালি স্বামীজির কথাই চলতে লাগল। "আমি স্বামীজিকে যেমন ভাল-বাসতুম তেমন ভয়ও করতুম। যখন দেখতুম যে, স্বামীজির মেজাজ একটু অন্য রকমের তখন পাশ কাটিয়ে চলে যেতুম। স্বামীজি হয় তো ডাকতেন,

পেসন্ পেসন্, শোন, এদিকে আয়। আমি দূর থেকেই বলতুম, এখন মশাই কাজে খুব ব্যস্ত আছি, পরে আসব। এই বলে সরে পড়তুম।"

খানিকক্ষণ চুপ করে চোখ বুজে থেকে পরে আবার বললেন, 'স্বামীজি এখনও তাঁর ঐ ঘরে আছেন। আমি তো তাঁর ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় খুব পা টিপে টিপে চলি যাতে তাঁর কোন রকম অসুবিধে না হয়। আর তাঁর ঘরের দিকে বড় একটা তাকাইনে পাছে চোখাচোখি দেখা হয়ে যায়।'

এই কথা শুনে জনৈক সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করলেন, 'মহারাজ আপনি এখনও স্বামীজিকে দেখতে পান?'

মহারাজ। তিনি রয়েছেন আর দেখতে পাব না? তিনি ঐ সামনের বারান্দায় বেড়ান, ছাতে পায়চারি করেন, নিজের ঘরে গান করেন, আরও কত কি করেন। আমি আগে আগে যখন মঠে আসতুম বেশীর ভাগই ঐ ছোট ঘরটিতে থাকতুম। আমি তো পারতপক্ষে বারান্দার দিকের দরজাই খুলতুম না। স্বামীজি প্রায়ই ঐ বারান্দায় বেড়ান। তিনি এক এক সময় এক এক ভাবে থাকতেন। একবারের ঘটনা বেশ মনে আছে। তখন স্বামীজি স্থূলশরীরে বেঁচে আছেন। একদিন তিনি ভাবের ঘোরে সারা রাত ঐ বারান্দায় গান গেয়ে গেয়ে বেড়িয়েছিলেন। গানটির এক লাইনই সারা রাত গেয়েছিলেন—মা ত্বং হি তারা, তুমি ত্রিগুণধরা পরাৎপরা। বেশীর ভাগই 'মা ত্বং হি তারা' এই গাইতেন। স্বামীজির যখন এমনি ধারা ভাব হত তখন কেউই তাঁর কাছে যেতে সাহস করতেন না। স্বামীজি ঐ এক লাইন গান গাইছেন আর পায়চারি করছেন। এক একবার গান গাইতে গাইতে কেঁদে আকুল, আওয়াজ যেন আর বেরোয় না, আর পা-ও যেন চলে না। ভোর পর্য্যন্ত ঐ ভাবে কাটিয়েছিলেন। স্বামীজি বাইরে এক জ্ঞান কর্ম্ম এই সব প্রচার করতেন কিন্তু ভেতরে ছিল পুরোপুরি ভক্তির ভাব। তাঁর ভেতরটা খুবই কোমল ছিল। বাইরে সিংহবিক্রম কিন্তু প্রাণ ছিল মায়ের চাইতেও কোমল। আর গুরুভাইদের প্রতি কি ভালবাসাই না তাঁর ছিল, বিশেষ করে মহারাজকে তিনি খুবই ভালবাসতেন, আর খুব মান্যও করতেন। ঠিক 'গুরুবৎ গুরু পুত্রেষু' এই ভাব। তা বলে কারও একটু দোষ বা ত্রুটি দেখলে তা সইতে পারতেন না। যে মহারাজকে এত ভালবাসতেন, সেই মহারাজকেও একবার এমন গালমন্দ করলেন যে, মহারাজ তো কেঁদে আকুল। অবশ্য সে ব্যাপারে দোষ ছিল পুরোপুরি আমারই। মহারাজ আমায় বাঁচাতে গিয়ে নিজের উপর দোষটা টেনে নিয়েছিলেন। তখন গঙ্গার ধারে পোস্তা ও ঘাটের কাজ হচ্ছে। স্বামীজি আমায় বলেছিলেন, 'পেসন্, সাম্‌নে একটা ঘাট হওয়া খুব দরকার এবং সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গার ধারে পোস্তাও খানিকটা বাঁধতে হবে। তুই একটা প্ল্যান করে আমায় একটা estimate (খরচের আন্দাজ) দিবি তো। কত কি খরচা পড়ে দেখব।' আমি তো একটা প্ল্যান করলুম এবং কত খরচ পড়বে তারও একটা হিসাব দিলুম। estimate (খরচের আন্দাজ)টা ভয়ে ভয়ে ধরে স্বামীজিকে প্ল্যান দেখিয়ে বললুম, 'এই হাজার তিনেক টাকা হলেই সব হয়ে যাবে। স্বামীজিও তাতে ভারি খুসী। মহারাজকে ডেকে বললেন, কি বল রাজা, এই সামনাটাতে একটা ঘাট ও পোস্তা হলে বেশ হবে। পেসন্ তো বলছে যে তিন হাজার টাকায় হয়ে যাবে। তুমি বল তো কাজ সুরু হতে পারে।' মহারাজও বললেন যে, তিন হাজার টাকায় হয় তো এ টাকা যোগাড় হয়ে যাবে। সেই অনুসারে কাজ তো আরম্ভ হল, আমিই কাজকর্ম্ম দেখা-শুনা করছি—হিসাবপত্র সব মহারাজই রাখতেন আর টাকা পয়সার চেষ্টাদিও তিনিই করতেন,

কাজ যত এগুচ্ছে স্বামীজিরও খুব আনন্দ। মাঝে মাঝে তিনি হিসাব পত্র দেখেন এবং টাকা পয়সা আছে কিনা খোঁজ খবর করেন। এদিকে কাজ যত এগুতে লাগল ততই সেই তিন হাজার টাকায় আর কুলোয় না, আমি তো বেগতিক দেখে তখন মহারাজকে গিয়ে বললুম, 'দেখুন, আমি তো স্বামীজিকে ভয়ে ভয়ে বলেছিলুম যে তিন হাজার টাকায় কাজ শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু এ কাজ শেষ হতে খরচ ঢের বেশী হবে, এখন কি উপায় বলুন?' মহারাজ নেহাৎ ভাল মানুষ ছিলেন। আমার অবস্থা দেখে তাঁর খুবই দয়া হল। তিনি বললেন, 'তার আর কি করা যাবে? কাজে যখন হাত দেওয়া হয়েছে, যে করেই হোক শেষ করতেই হবে। তুমি তার জন্য ভেবো না, কাজ যাতে ভালভাবে হয়, তাই তুমি কর।' আমি তো তখন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। কিন্তু মনে মনে ভয় আছে যে, কখন স্বামীজির গালাগাল খেতে হবে। এমনি সময় একদিন স্বামীজি কাজের খরচ-পত্রের হিসাব দেখতে চাইলেন। মহারাজ হিসাব-পত্র খুবই সুন্দর ভাবে রাখতেন। হিসাব দেখতে দেখতে স্বামীজি যখন দেখলেন যে, তিন হাজার টাকার বেশী খরচ হয়ে গেছে অথচ কাজ শেষ হতে তখন ঢের বাকী, তখন তিনি মহারাজের উপর খুব একচোট নিলেন। মহারাজ একটি কথাও বললেন না, চুপচাপ সব সয়ে গেলেন। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তাঁর ভারি দুঃখ হয়েছিল, স্বামীজি খাতাপত্র দেখে ঘরে চলে যেতেই তিনি আস্তে আস্তে নিজের ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে দিলেন। এদিকে নিজের ঘরে গিয়ে একটু পরেই স্বামীজিরও মনে হল যে, মহারাজকে এতটা কড়া কথা বলা ঠিক হয় নি। তাঁর মনেও তখন ভারি অনুতাপ এসেছিল। আমি তো পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবই দেখছিলুম আর ভাবছিলুম। আমার জন্যই মহারাজকে এতটা মনঃকষ্ট পেতে হল। স্বামীজি হঠাৎ আমায় ডেকে বললেন, 'দেখ তো পেসন্, রাজা কি করছে?' আমি মহারাজের ঘরের কাছে গিয়ে দেখি যে, সব দরজা জানালা বন্ধ, আমি দুএকবার 'মহারাজ' 'মহারাজ' বলে ডাকলুম কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া গেল না। স্বামীজিকে তাই এসে বলতে স্বামীজি খুবই উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'তুই তো ভারি বোকা! তোকে বললুম দেখতে যে রাজা কি করছে, আর তুই কি না এসে বলছিস যে, তার ঘরের সব দরজা জানালা বন্ধ। দেখ শিগগির, রাজা কি করছে।' আমি আবার এসে ডেকে ডেকে সাড়া না পেয়ে আস্তে আস্তে দরজা খুলে দেখি যে, মহারাজ নিজ বিছানায় শুয়ে বালিসে মুখ গুঁজে ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদছেন। আমি আস্তে আস্তে তাঁর কাছে এসে বললুম, 'মহারাজ, আজ আপনি আমার জন্যই এত কষ্ট পেলেন।' মহারাজ তখনও কাঁদছিলেন। আস্তে আস্তে মুখ তুলে বললেন, 'দেখ তো, হরিপ্রসন্ন, আমার কি দোষ বলতো। অথচ তিনি এক এক সময় এমন কড়া কথা বলেন যে তা আর সওয়া যায় না। আমার তো এক এক সময় মনে হয় যে, এসব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে চলে যাই পাহাড়ে।'

আরও দু এক কথার পর আমি স্বামীজির কাছে ফিরে এসে বললুম যে, মহারাজ শুয়ে শুয়ে কাঁদছেন। ঐ কথা শুনে স্বামীজি একেবারে পাগলের মতন ছুটে মহারাজের ঘরের দিকে গেলেন। আমিও পেছনে পেছনে গেছি। দেখি যে স্বামীজি মহারাজের ঘরে গিয়েই একেবারে মহারাজকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলছেন, 'রাজা রাজা, আমায় ক্ষমা কর। আমি কি অন্যায়ই না করেছি! তোমায় গালাগাল করেছি। তুমি আমায় ক্ষমা কর।' মহারাজ ততক্ষণ নিজকে সামলে নিয়েছেন কিন্তু স্বামীজিকে অমন ধারা কাঁদতে দেখে তিনি তো অবাক্। তিনি কি যে করবেন, কি যে বলবেন কিছুই বুঝতে পারছিলেন না।

শেষটায় বললেন, 'স্বামীজি আপনি অমন করছেন কেন? আমায় গালাগাল দিয়েছেন তাতে হয়েছে কি? আপনি আমায় ভালবাসেন বলেই তো এই সব কথা বলেছেন?'

স্বামীজি তখনও মহারাজকে বুকে জড়িয়ে ধরে আছেন, আর বলছেন, 'না, তুমি আমায় ক্ষমা কর। তোমায় ঠাকুর কত আদর করতেন। কখনও তিনি তোমায় একটা কড়াকথাও বলেন নি। আর আমি কিনা ছাই কাজের জন্য তোমায় গালাগাল করলুম, তোমার মনে কষ্ট দিলুম? আমি আর তোমাদের সঙ্গে থাকবার যোগ্য নই। চলে যাই হিমালয়ে, কোথাও গিয়ে নির্জ্জনে থাকব।'

মহারাজ বললেন, সেকি স্বামীজি, আপনার গালাগাল তো আমাদের আশীর্ব্বাদ। আপনি কোথায় চলে যাবেন? আপনি যে আমাদের মাথা। আপনি চলে গেলে আমরা কি নিয়ে থাকব?

এই রকম অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হয়ে দুজনেই শান্ত হলেন। সে দিনকার দৃশ্য আর জীবনে ভুলতে পারব না। স্বামীজিকে এমন অধীর হয়ে কাঁদতে আমি আর কখনও দেখি নি। তাঁদের একের প্রতি অন্যের কি টান, কি ভালবাসা! স্বামীজি গুরুভাইদের সকলকে এত বেশী ভালবাসতেন যেন মায়ের মতন, সেইজন্যই কারও এতটুকু দোষ বা ত্রুটি দেখতে পারতেন না। তিনি চাইতেন, তাঁর গুরুভাইরা সকলেই তাঁর মত হোক। স্বামীজির ভালবাসার তুলনা নেই।"

স্বামীজি মহারাজ প্রভৃতি ঠাকুরের সন্তানদের পরস্পরের প্রতি ভালবাসা এক স্বর্গীয় সম্পদ! শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘরূপ বিরাট সৌধ প্রেমরূপ ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত এবং যতদিন এই ভিত্তি সুদৃঢ় থাকবে ততদিন এই সৌধ কালের প্রবাহকে ব্যাহত করে সুমেরুবৎ অচল অটল থাকবে।

অস্পৃশ্যতা

শ্রীহরদয়াল নাগ

ধর্ম্মের নামে অস্পৃশ্যতা হিন্দু-সমাজকে যেরূপ নানা জাতি, উপজাতি, সম্প্রদায় ও শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছে, এরূপ আর কোন সমাজে দেখা যায় না। একথা সত্য যে, বিশাল মানব-সমাজই ধর্ম্মান্ধতা নিবন্ধন নানা জাতিতে বিভক্ত, কিন্তু অস্পৃশ্যতা হিন্দু-সমাজকে যেরূপ পৃথিবীর মানব সমাজে অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছে, এরূপ আর কুত্রাপি নাই। যেরূপ উচ্চাঙ্গের হিন্দু নিম্নবর্ণের হিন্দুদিগকে ঘৃণা করেন, তদ্রূপ সমগ্র ভারতবাসীকে ভারতের বাহিরের অন্যান্য জাতিরা ঘৃণা করেন। রেলগাড়ীতে, জাহাজে, হোটেলে, খাওয়ায়, বসায় ভারতবাসীরা অন্যান্য জাতির নিকট অস্পৃশ্য। সে দিন দক্ষিণ-আফ্রিকার কোন এক উচ্চপদস্থ মুসলমান কোন এক আফিসের নীচতলা হইতে উপর তলায় উঠিবার সময় সামান্য একজন যান-চালকের হস্তে অস্পৃশ্য বলিয়া অপমানিত হইয়াছেন। আজ ভারতবাসী বিশ্ব-সমাজে জাতিহীন, শক্তিহীন এবং সকলের সঙ্গে বসিবার অযোগ্য। আজ ভারতবাসীর কেবল যে জগৎ-সভায় স্থান নাই এরূপ নহে, সে স্বাধীনতা বর্জ্জিত, ধর্ম্মে পতিত, কর্ম্মভ্রষ্ট, দারিদ্র্য-প্রপীড়িত। আজ ভারতবাসী আধ্যাত্মিক সম্পদ পরিহার করিয়া পার্থিব সম্পদের প্রলোভনে পথভ্রান্ত। ধ্রুব সত্যের অনুগমন করিলে কলও

সুনিশ্চিত কিন্তু অধ্রুব অসত্যের অনুগমন কেবল অনিশ্চিত নহে, আশু ফল লাভ হইলেও উহা পরিণামে বিষময়। হিন্দুসমাজ অসত্য অস্পৃশ্যতার বিষময় পরিণাম ভোগ করিতেছে। উচ্চাঙ্গের হিন্দু নিম্নাঙ্গের হিন্দুকে বলিতেছেন, "আমায় ছুঁইস্ না।" মন্দিরের পূজারিঠাকুর শাস্ত্রানুসারে না হইলেও লোকাচার অনুসারে পূজাদাতাদিগকে নির্দ্দেশ করেন, "তুমি অস্পৃশ্য, তোমাকে মন্দিরের বাহিরে অনেক দূরে থাকিতে হইবে; তুমি স্পৃশ্য হইলেও তোমার ঠাকুর ছোঁয়ার অধিকার নাই।" ইত্যাদি। গোঁড়া হিন্দু তাহার অবোধ বালককে বলিতেছেন, "বাবা, আমি স্নান করিয়াছি, আহ্নিক করিব। তুমি আমাকে ছুঁয়োনা।" ব্রাহ্মণেতর জাতিরা যদি ঠাকুর স্পর্শ করে তবে ঠাকুরের জাতি যায়, জীবনান্তও হয়। আবার ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিশেষ প্রণালীতে স্নাত হইয়া জীবন্ন্যাস হইলেই তাঁহার জাতি ও জীবন ফিরিয়া আসে। জগন্নাথ যখন রথে চড়িয়া স্পৃশ্য অস্পৃশ্য সকল জাতির স্পর্শ গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার জাতিও যায় এবং প্রাণান্তও হয়, আবার ব্রাহ্মণের হাতে স্নান করিয়া সজীব হইলে পূজা পাইতে তাঁহার অধিকার জন্মে। পৌরোহিত্যের আধিপত্য ও অধিকার ন্যূনাধিক প্রায় সকল ধর্ম্মেই আছে কিন্তু স্পৃশ্যাস্পৃশ্যের ন্যায় অবিচার হিন্দু ধর্ম্ম ভিন্ন আর কোন ধর্ম্মে নাই। কেবল মানুষের নিকট মানুষবিশেষ অস্পৃশ্য এমন নহে, কতকগুলি স্থানও অস্পৃশ্য, যথা, পাইখানা, যে সকল স্থানে খাদ্যাবশিষ্ট ফেলা হয়, পগার প্রভৃতি স্থানে গেলে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইতে হয়।

স্পৃশ্যাস্পৃশ্য

যখন একজন আর একজনকে বলে, "তুমি আমাকে ছুঁয়োনা", তখন ভাষা ও ভাবের মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। "ছুয়োনা আমাকে" ভাষা বক্তাকে অস্পৃশ্য ঘোষণা করিতেছে। কিন্তু বক্তা মনে করিতেছেন, তিনি এত পবিত্র যে, কোন অস্পৃশ্য ব্যক্তি তাঁহাকে স্পর্শ করিলে তাঁহার পবিত্রতা নষ্ট হইবে। ইহাকেই বলে ভাবের ঘরে চুরি। তবে এমন সময় ছিল যখন একজন নিজকে অস্পৃশ্য ঘোষণা করিয়া সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার এবং অনেকানেক সুখ সুবিধা ভোগ করিতে পারিতেন। নিম্নাঙ্গের হিন্দুরা প্রকৃত প্রস্তাবেই বিশ্বাস করিত যে, তাহারা যদি কোন দেবমন্দিরে প্রবেশ করে, কি দেবদেবী স্পর্শ করে, কি কোন উচ্চাঙ্গের হিন্দুকে ছোঁয়, তাহা হইলে পরলোকে তাহাদিগকে নরকবাস ও নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। হিন্দু সমাজে মানুষের স্পৃশ্যাস্পৃশ্য অবস্থা আচার দ্বারা করা হইয়াছে, জন্মগত নহে। শিক্ষা-দীক্ষা দ্বারা ঐ অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হয় না, বরঞ্চ রক্ষিত হয়। এক সময়ে শিক্ষা-দীক্ষার বলে ক্ষত্রিয়রাজা বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণ হওয়া সম্ভব হইয়াছিল, নারদ শূদ্রার গর্ভজাত দাসীপুত্র হইয়াও দেবর্ষিরূপে দেবগণের নিকট সর্ব্বপ্রকার সম্মান পাইয়াছিলেন। বর্ত্তমান যুগে অস্পৃশ্য জাতি ও বর্ণব্রাহ্মণদের মধ্যে অনেক শিক্ষিত ও পরম বৈষ্ণব আছেন, কিন্তু তাঁহাদের শিক্ষা ও দীক্ষা তাঁহাদিগকে উচ্চবর্ণের হিন্দুদিগের নিকট স্পৃশ্য করিতে পারিতেছে না। পক্ষান্তরে বৈষ্ণবদের মধ্যেও জাতিভেদ ও সম্প্রদায়ভেদের অভাব নাই। একজাতি অপর জাতির নিকট অস্পৃশ্য, এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায় হইতে স্পৃশ্যাস্পৃশ্য সংস্কার দ্বারা বিভক্ত। বৈরাগী বৈষ্ণবদের মধ্যেও স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্য আছেন। অনেক অস্পৃশ্য বৈরাগী বৈষ্ণব আপন দীক্ষাগুরুর নিকট অস্পৃশ্য। অস্পৃশ্য জাতির বৈষ্ণবেরা হরিগুণ গান করিয়াও স্পৃশ্য হইতে পারেন না, অস্পৃশ্যই থাকিয়া যান। যখন একজন উচ্চবর্ণের হিন্দু একজন নিম্নবর্ণের হিন্দুকে অস্পৃশ্য বলিয়া মনে করেন, তখন সেই মনোবৃত্তিকে ঘৃণা

বলিলে অন্যায় হয় না। এই ঘৃণা আবার জন্মগত সংস্কারাবদ্ধ। ব্রাহ্মণের পুত্র চণ্ডালের পুত্রকে অস্পৃশ্য বলিয়া ঘৃণা করিতে সংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ না করিলেও পারিবারিক ও সামাজিক শিক্ষা-দীক্ষা তাঁহাকে ঐ সংস্কার হইতে অব্যাহতি দেয় না। বাহ্য দৃষ্টিতে দেখা যায় যে, অস্পৃশ্যতায় ঘৃণার ভাব আছে এবং "ছুঁইস্ না আমাকে" ধর্ম্ম ঘৃণার ধর্ম্ম। তবে অস্পৃশ্যতা সম্পূর্ণরূপে ঘৃণার উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলেও ইহার মূলে যে আভিজাত্যের অপব্যবহার আছে তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। আমি স্পৃশ্য অর্থাৎ উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তুমি অস্পৃশ্য অর্থাৎ নিম্নবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ; সুতরাং তুমি আমাকে, কি আমি তোমাকে ছুঁইলে আমার পবিত্রতা নষ্ট হইবে। এই বংশগত আমিত্ব অহঙ্কারের মূলে একমাত্র স্পৃশ্যাস্পৃশ্য অবিদ্যা। যখন 'আমি' কে? আমি মনে করি, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার বাড়ী, আমার ঘর, তখন সেই 'আমি' দেহ ভিন্ন আর কিছুই নহে। দেহাত্মজ্ঞানেই মানুষ বড় ছোট, স্পৃশ্যাস্পৃশ্য, ধনী দরিদ্র বিবেচিত হইয়া থাকে। মানবসমাজে দেহাত্মবোধক 'আমির' অভাব নাই। যখন আমি বলি, আমার হাত, আমার পা, তখনও 'আমি' দেহাত্ম-বোধকই বটে। এই দেহকেই হিন্দুশাস্ত্র অন্নময়-কোষ বলে। যখন আমি বলিতেছি যে, আমার দেহ, এই 'আমি' শাস্ত্রোক্ত প্রাণময়কোষের 'আমি'। এই 'আমি' দেহাতীত না হইলেও ইহাকে দেহের স্থূলাংশ বলা চলে না।

আবার আর এক 'আমি' আসিয়া বলিতেছে, 'আমার প্রাণ'। ইনি মনোময়কোষের 'আমি', ইনিও দেহের স্থূলাংশ নহেন। প্রাণ মন উভয়েই দেহের সূক্ষ্মাংশ। তবে মন প্রাণ হইতেও সূক্ষ্মতর এবং দেহের চালক। এই মন বহুরূপী। এক মনই রূপান্তর ধারণ করিয়া বলিতেছে, আমার মন। প্রকৃত প্রস্তাবে এই মনই আমিত্ব জ্ঞানের সমস্ত 'আমি'; দেহে মন ভিন্ন অন্য কোন 'আমি' নাই। এই মন দেহবাসী হইলেও এত সূক্ষ্ম যে, তাহার প্রবেশ অধিকার না আছে দৃশ্যমান জগতে এমন কিছুই নাই। কল্পনা-রাজ্যে ইহার অধিকার ও শক্তি অসাধারণ। এই মন রাবণের অভ্যন্তরে থাকিয়া কেবল ভোগ-পিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্য সীতা হরণ করিয়াছিল এবং দেবর্ষি নারদের অভ্যন্তরে থাকিয়া হরিনাম ও বিশ্বপ্রেম বিলাইয়াছিল জগতের মঙ্গলের জন্য। প্রভুত্বপ্রিয় মন সুবিধা পাইলে সেবাব্রত মনকে দাসত্ব শৃঙ্খলে বাঁধিতে কুণ্ঠিত হয় না। কতিপয় প্রভুত্বপ্রিয় ও শক্তিশালী মন জন-সাধারণের উপর প্রভুত্বসুখ চরিতার্থ করিবার জন্য যে অস্পৃশ্যতা সৃজন করিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। জনগণের উপর প্রভুত্ব ও জনগণকে শাসন করিবার জন্য তাহাদের মধ্যে ভেদবুদ্ধি জন্মান যেরূপ প্রকৃষ্ট উপায় এরূপ আর কিছুই নহে। আমি অধম, অস্পৃশ্য, ব্রাহ্মণকে ছুঁইলে আমার পাপ হইবে ও আমার পরকাল নষ্ট হইবে ইত্যাদি বুদ্ধিদ্বারা প্রভুদাস সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে। আবার দাসজাতির মধ্যে সাম্প্রদায়িক অস্পৃশ্যতা দ্বারা নানারূপ বিভাগ শাসনের পক্ষে খুবই অনুকূল।

অস্পৃশ্যতা হিন্দু-সমাজকে এরূপ ভাবে বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছে যে, ইহাকে সঙ্ঘবদ্ধ একটি দেহ মনে করিবার কোন সুবিধা নাই। হিন্দু সমাজের 'ছুঁইস না আমাকে" আমিত্বপূর্ণ। এই 'আমি' এত পৃথকত্ব জ্ঞানপূর্ণ যে নিষিদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণ করিলে, কি কোন আচার বিরুদ্ধ কাজ করিলে, কি কোন অস্পৃশ্যের সহিত সংশ্রব করিলে মানুষ অস্পৃশ্য হইয়া যায়। যে 'আমি'র মুখে দেহাতীত সত্তা থাকিলে মনে কিছুই নাই, সেই 'আমি'র ধর্ম্মকে মৌখিক ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? অনেক হিন্দু এরূপ জ্ঞানহীন ও অস্পৃশ্যতাসর্ব্বস্ব যে, তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না যে 'আমি' কে?

প্রাকৃতিক ক্রমবিকাশের পথে

ক্রমবিকাশের পথে কত যে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য আছে তাহা মানুষ বুঝিতে ও নিবাকরণ করিতে পারে না। হিন্দুসমাজের সম্প্রদায়বিশেষের অস্পৃশ্যতা-মূলক মনোবৃত্তি প্রকৃতির বিচিত্র খেয়াল ভিন্ন আর কি হইতে পারে? এরূপ মনোবৃত্তি আর কোন দেশে, কি আর কোন জাতিতে, কি সমাজে দৃষ্ট হয় না। প্রাণী-জগতে সর্ব্বপ্রথমে স্বেদজ অর্থাৎ মলজ প্রাণী, যথা মশা জন্মিয়াছিল। এই মশার সর্ব্বাংশ মলময়। ইহা মল হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া রক্তপানে কিছু সময় সজীব থাকিয়া আবার মলে পরিণত হয়। স্পৃশ্যাস্পৃশ্য জ্ঞানহীন মশা যখন চণ্ডালের রক্ত পেটে লইয়া ব্রাহ্মণের অঙ্গে হুল বসায়, তখন কি ব্রাহ্মণ মশাকে "ছুঁইস্ না আমাকে" বলিয়া সরিয়া যান, না মশা মারিয়া চণ্ডালের রক্ত গায়ে মাখেন? ম্যালেরিয়াবাহী মশার কামড়ের পাপ স্নানে ঘুচে না। অনেক সময় মশার কামড়ের প্রায়শ্চিত্ত শ্মশানে করিতে হয়! মাছি সম্বন্ধেও ঐ এক কথা হইলেও মাছির বাহাদুরী অনেক বেশী। মাছি মলমূত্র ও অস্পৃশ্যদের বাড়ীতে অন্নাদি আহার করিয়া পরে ব্রাহ্মণ বাড়ীতে আহার করে এবং ব্রাহ্মণগণকে প্রসাদ দেয়! মলজ মলবাহী মাছির প্রসাদ না খাইয়া কাহারও পরিত্রাণ নাই! মলজ প্রাণীর পর অণ্ডজ প্রাণী। পাখীগুলি প্রায় সমস্তই অণ্ডজ প্রাণী। কাক সর্ব্বভুক এবং সকল জাতির ভাতই খায়। কাকের স্পৃশ্যাস্পৃশ্য জ্ঞান একেবারেই নাই, অথচ কাক অস্পৃশ্য নহে। ব্রাহ্মণের রন্ধনশালায় দেবমন্দিরে কাকের গমনাগমনের অধিকার যথেষ্টই আছে। কাক-প্রসাদী জলাদি পানে ও খাওয়ায় অনেক স্পৃশ্য হিন্দুদের বিশেষ কোন আপত্তি দেখা যায় না। অতঃপর জরায়ুজ চতুষ্পদ কুকুর। কুকুর মানুষের মল ভক্ষণ করে। জরায়ুজ পশুদের মধ্যে কুকুরের ন্যায় ঘৃণ্য জীব আর দেখা যায় না। কিন্তু প্রভুভক্ত কুকুর হিন্দু-সমাজের হরিভক্ত অস্পৃশ্য জাতীয় মানুষ অপেক্ষা অধিকতর আদরণীয়। স্পৃশ্যাস্পৃশ্য সকল জাতির উচ্ছিষ্ট ও বিষ্ঠাভোজী কুকুরের স্পর্শকরা খাদ্য খাইলে উচ্চাঙ্গ হিন্দুদের জাতি যায় না, কিন্তু একজন পরম বৈষ্ণবভাবাপন্ন তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতীয় মানুষের ছোঁয়া জল খাইলে ব্রাহ্মণকে জাতি-চ্যুত হইতে হয়! বিড়াল কাঁচা পচা মাছ মাংস ও পোকাভোজী হইলেও গৃহপালিত পশুদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুলীন। বিড়াল স্পৃশ্যাস্পৃশ্য নির্ব্বিশেষে সকলেরই উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করে এবং বিড়ালের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিতে আপত্তি করিলে কোন হিন্দুরই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে না। কুকুর একটুকু সতর্কতার সহিত চলিলে অনায়াসে বিড়ালের স্থান অধিকার করিতে পারে। রামঠাকুর ব্রাহ্মণ, রামা মেথর তাঁহার মলমূত্র পরিষ্কার করিয়া অতিকষ্টে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। রামা মেথর রাম ঠাকুরের কিরূপ সেবা করিতেছে তাহা রাম ঠাকুর ভাবিতেছেন না বলিয়াই আজ তাঁহার মনে মেথরের প্রতি অফুরন্ত ঘৃণা। ঐ সমস্ত অধম প্রাণী হইতেও রামা মেথর অধম। রাম ঠাকুর যে ঘৃণা দ্বারা রামা মেথরের সেবার প্রতিদান ও পুরস্কার দিতেছেন, ইহা প্রাকৃতিক ক্রমবিকাশের অন্তরায়।

নৈসর্গিক নির্ব্বাচন

(Natural selection)

জীব-জগতে মানব জাতিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ক্রম-বিকাশের পথে মানব জাতি কোথা হইতে কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। হিন্দু-সমাজ ভিন্ন পৃথিবীর সর্ব্বত্রই মানবীয় বীজ অঙ্কুরিত হইয়াই নৈসর্গিক নির্ব্বাচনাধীনে মানব সমাজ গঠিত হইয়া আসিতেছে। যে সমস্ত মানবীয় বীজ মানবীর গর্ভে পতিত হইতেছে তৎসমস্তই একই

আধার হইতে আসিতেছে। বীজ যখন অঙ্কুরিত হইয়া মানবশিশুতে পরিণত হয়, তখনও বৈষম্য থাকে না। ব্যাঘ্রপালিত মানব-শিশুকে যথাসম্ভব ব্যাঘ্র প্রকৃতি লাভ করিতে দেখা গিয়াছে। মানুষের পালিত ব্যাঘ্রশিশু অনেক পরিমাণে মানুষের স্বভাব পাইয়া থাকে। তদ্রূপ অস্পৃশ্যতা হিন্দুসমাজে পোষা স্বভাবে পরিণত হইয়াছে। কেহই অস্পৃশ্যতাকে স্বধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করে না। যদি ইহাকে স্বধর্ম্মও বলা যায় তথাপি ইহা জন্মগত স্বধর্ম্ম নহে—পোষা স্বধর্ম্ম।

অস্পৃশ্য মেথরের ঘরে মেথর জন্মে না, জন্মে মানব-শিশু। এই মানব-শিশু মেথর পরিবারে ও মেথর পাড়ায় প্রতিপালিত, শিক্ষিত ও দীক্ষিত হইয়া মেথরে পরিণত হয়। রাজপথে সদ্যোজাত একটি ব্রাহ্মণ-শিশু যদি মেথর-পরিবারে ও মেথর পাড়ায় ঐ ভাবে প্রতিপালিত হয় ও শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করে, তবে সেই ব্রাহ্মণ-শিশুটিও মেথর হইয়া যায়। তদ্রূপ রাজপথে সদ্যোজাত একটি মেথর-শিশুও ব্রাহ্মণ-পরিবারে, ব্রাহ্মণপাড়ায় প্রতি-পালিত হইয়াও শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করিয়া ব্রাহ্মণ হইতে পারে। ইহা দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, মানবীয় বীজে কোন স্পৃশ্যাস্পৃশ্য নাই; জন্মিবার পূর্ব্বে কেহ স্পৃশ্য কি অস্পৃশ্য ছিল না, জন্মমুহূর্ত্তেও কেহ ব্রাহ্মণ কি মেথর নহে, কেবল সংসর্গ ও শিক্ষা-দীক্ষার দোষে মানব-শিশু ব্রাহ্মণ অথবা মেথরে পরিণত হইয়া থাকে। হিন্দুসমাজের বৈষম্য অথবা কলঙ্ক এই অস্পৃশ্যতার অত্যাচারে কত অস্পৃশ্য হিন্দু যে মুসলমান ও খৃষ্টান হইয়া গিয়াছে তাহা নির্ণয় করা অসাধ্য। নৈসর্গিক নির্ব্বাচন বলিতে আমি ডারউইন হইতে বর্ত্তমান বানার্ডস পর্য্যন্ত দার্শনিক পণ্ডিতগণের জড়বাদের কথা বলিতেছি না।

সর্ব্ববাদিসম্মত মনস্তত্ত্বের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, মন সকল ইন্দ্রিয়ের রাজা হইলেও প্রকৃতির অধীন। প্রকৃতি নিশ্চয়ই পুরুষের অধীন, কিন্তু মনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ প্রকৃতির সহিত। প্রকৃতিই মনকে গঠন ও যথাযোগ্য শক্তি দান করে। কিন্তু শৃঙ্খলিত মনের উপর প্রকৃতির প্রভাব খুবই অল্প। যে সংস্কার মেথরের মনকে বলিতেছে, "তুমি অস্পৃশ্য মেথর, মলমূত্র পরিষ্কার করাই তোমার একমাত্র কর্ম্ম ও ধর্ম্ম," সেই সংস্কার যে মেথরকে নৈসর্গিক নির্ব্বাচনে বাধা দিতেছে, তাহা মেথর একেবারেই অনুভব করিতে পারিতেছে না। পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণের সংস্কার ব্রাহ্মণের মনকে বলিতেছে, "অস্পৃশ্য মেথরকে ঘৃণা করাই তোমার ধর্ম্ম ও কর্ম্ম।" এই আভিজাত্যের অহঙ্কার ব্রাহ্মণের মনকে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের পথ হইতে দূরে রাখিতেছে। যাহার নিকট কালাপানি পার হওয়া নিষিদ্ধ, কারণ কালাপানির অপর পারে সমস্তই অস্পৃশ্য, তাহার অস্পৃশ্যতা সংস্কারে শৃঙ্খলিত মনকে প্রকৃতি কি শক্তি দান করিতে পারে? তাই আজ হিন্দুর মন পঙ্গু। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই নৈসর্গিক নির্ব্বাচন মানব সমাজকে নানা প্রকারে উন্নতির পথে অগ্রসর করিতেছে, আর অস্পৃশ্যতা হিন্দুসমাজকে নৈসর্গিক নির্ব্বাচন জনিত উন্নতি হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিতেছে।

দেহাতীত বিজ্ঞান

হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। কোন ঘটনাই ঘটে না, সমস্তই সময়ের স্রোতে আসে যায়। উত্থান পতন জগতেরই রীতি। পরিবর্ত্তনশীল জগতে অবিরত পরিবর্ত্তন চলিতেছে। একদিন ভারতের দেহাতীত বিজ্ঞান সমস্ত জগৎ আন্দোলিত করিয়াছিল। বেদ ছিল বিশ্ববিজ্ঞান ও মানব-ধর্ম্মশাস্ত্র।

জগৎ দ্বিবিধ, স্থূল জগৎ ও সূক্ষ্ম জগৎ। সূক্ষ্মজগৎই আধ্যাত্মিক জগৎ বলিয়া পরিচিত।

বর্ত্তমান জড়বাদ আধ্যাত্মিক জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলেও আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান পৃথিবী হইতে একেবারে লোপ হয় নাই। ভারতবর্ষ এই আধ্যাত্মিক অর্থাৎ দেহাতীত বিজ্ঞানের আদি স্থান। দেহাতীত বিজ্ঞানে অস্পৃশ্যতার কোন স্থানই নাই। পুরুষ অর্থাৎ পরমাত্মা সর্ব্বগত। জীবরূপে জীবদেহে তাঁহারই প্রকাশ জীবাত্মানামে পরিচিত। সাগরের জল ও ঘটের জলে যেরূপ প্রভেদ, পরমাত্মায় জীবাত্মারও সেইরূপ প্রভেদ। ঘট ভাঙ্গিলে জল যখন সাগরে মিশিয়া যায় তখন যেমন কোন ভেদ থাকে না, জীবাত্মা ও জীবদেহরূপ ঘট ভাঙ্গিয়া গেলে মুক্তি লাভ করে। ঘটের জলও ক্রমগতি ও ক্রমপবিত্রতা লাভ ভিন্ন সাগর জলের সহিত সাযোজ্য অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে না। বর্ত্তমান জীববিজ্ঞান পরমাত্মার ও জীবাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না বটে, কিন্তু জড়বাদের স্বীকৃত এনার্জ্জি (energy) অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ শক্তি যে দেহ-গৃহে বাস করেন তাহা জীব-বিজ্ঞানের অস্বীকৃত নহে। যাঁহারা মনে করেন যে, এই দেহই আদি, এই দেহই মধ্য এবং এই দেহই শেষ, তাঁহাদের *নিকট আমার কিছুই বলিবার নাই।*

দেহস্থিত এই নিত্য সত্তা যে একটা বিশ্বব্যাপক নিত্য সত্তার অংশ ইহাও এক প্রকার স্বীকৃত। দেহাতীত বিজ্ঞান অর্থাৎ বিদেহ বিজ্ঞান পরমাত্মার সহিত দেহস্থিত জীবাত্মার সাক্ষাৎকার ঘটায়। ইহাকেই সাধারণতঃ আত্মসাক্ষাৎকার বলা হয়। মনকে বিষয় ভোগ হইতে যতই প্রত্যাহার করা যায়, ততই উহা পবিত্রীকৃত ও আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান হইয়া আত্মসাক্ষাৎকারের পথে অগ্রসর হইতে থাকে। এই অবস্থাই বিজ্ঞানময় কোষ। দেহধারী দেহাতীত বিজ্ঞান বলে আত্মসাক্ষাৎ করিলে আর কোন ভেদজ্ঞান থাকে না। দেহাভিমান-প্রসূত "ছুঁইস না আমাকে" ধর্ম্মের ন্যায় মনের অপবিত্রতা আর কি হইতে পারে?

আনন্দময় কোষ

দেহাভিমানী মানুষ যখন তথাকথিত অপবিত্র দেহ স্পর্শ করিয়া স্নান করে, তখন তাহার মনে একটা আনন্দের উদ্ভব নিশ্চয়ই হয়। এই আনন্দ শুধু ক্ষণস্থায়ী নহে, ইহা অবিদ্যাপ্রসূত। যখন ইন্দ্রিয় সকল শিথিল হইতে থাকে তখন দেহাভিমানেরও ভাঁটা লাগিয়া যায়।

দেহাভিমানের জোয়ার ভাঁটা লাগিলে আর ফিরে না। আমি বড় তুমি ছোট, আমি স্পৃশ্য তুমি অস্পৃশ্য, আমি প্রভু তুমি দাস ইত্যাদি মনোবৃত্তিজনিত যে আনন্দ, ক্ষণভঙ্গুর দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার অবসান হয়। কোন ইন্দ্রিয় সুখই আনন্দ নহে। অস্পৃশ্য লোককে ছুঁইলে মনে যে গ্লানি আসে, তাহা মনের কাল্পনিক গ্লানি, প্রকৃত গ্লানি নহে। সাধারণ জলে স্নান করিলে ঐ গ্লানি অপনোদনজনিত যে সুখ হয়, তাহা ক্ষণস্থায়ী, সুতরাং উহা আনন্দ নহে। হিন্দুসমাজে কেবল যে কতকগুলি লোক অস্পৃশ্য তাহা নহে, বহু দ্রব্য ও কর্ম্মও অস্পৃশ্য। যে ভাত না খাইলে হিন্দুরও মরিতে হয়, তাহা উদরের বাহিরে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ উচ্ছিষ্ট। একটা ভাত কাপড়ে পড়িলে কাপড় অপবিত্র হইয়া যায়। আবার ভাতটি যতক্ষণ থালায় থাকে ততক্ষণ খাওয়া চলে। কিন্তু থালার বাহিরে আসিলেই ভাতটি একেবারে অস্পৃশ্য, উচ্ছিষ্ট হয়। গোঁড়া হিন্দু এত অসংখ্য কাল্পনিক অস্পৃশ্যতা দ্বারা পরিবেষ্টিত যে, উহার শেষ নাই। কিন্তু তিনি যদি একবার আধ্যাত্মিক গঙ্গাজলে স্নান করেন, তাহা হইলে তাহার আর ঐ গ্লানি ভোগ করিতে হয় না। তখন তাঁহার জ্ঞান-চক্ষু খুলিয়া যাইবে, বিষ্ঠায় চন্দনে সমজ্ঞান জন্মিবে, স্পৃশ্যাস্পৃশ্য আপনপর কোন ভেদজ্ঞান থাকিবে না, তখন সকলই আপন হইয়া যাইবে এবং মনে অভেদানন্দ প্রবেশ করিবে, তখন আর 'আমি' 'তুমি' ভেদজ্ঞান থাকিবে না, এক সচ্চিদানন্দ

ভিন্ন জগতে আর কিছুই নাই, এই জ্ঞান আসিয়া সকল বৈষম্য নষ্ট করিয়া ফেলিবে। আমরা সকলেই সেই এক মহান সচ্চিদানন্দ হইতে উদ্ভূত হইয়াছি, আবার তাহাতেই মিশিয়া যাইব। আমরা কেবল পথের পথিক এবং আমাদের পার্থিব আবাস স্থান-সমূহ ও এই দেহগুলি কেবল সাময়িক পান্থশালা। এইরূপ বিজ্ঞান জন্মিলে পূর্ণানন্দ লাভ করে। এই অবস্থা প্রাপ্তিকে আনন্দময় কোষে অবস্থিতি বলে।

পরিণাম

জন্মের পর মৃত্যু যেমন অনিবার্য্য উদ্ভবের পর পরাভবও তেমনি অবশ্যম্ভাবী। প্রকৃতির আবর্ত্তনে হিন্দুসমাজে অস্পৃশ্যতা উদ্ভূত হইয়াছিল, আজ আবার সেই প্রকৃতির আবর্ত্তনেই তাহা লয়প্রাপ্ত হইতেছে। অস্পৃশ্য জাতিরা বলিতেছে, "আমরা ত' অস্পৃশ্য নই, যাহারা আমাদিগকে অস্পৃশ্য বলিয়া ঘৃণা করিতেছে, তাহারাই অস্পৃশ্য।" রেলে জাহাজে হাটে বাজারে সম্মিলনে সর্ব্বত্র অস্পৃশ্যতার মাথায় লগুড়াঘাত পড়িতেছে!

তবে একথাও সত্য যে অস্পৃশ্যতা মরিয়াও মরিতেছে না। অস্পৃশ্যতার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াও দেহত্যাগ করিতেছে না। গোঁড়ারা এখনও তাহা রক্ষা করিবার চেষ্টা ছাড়িতেছেন না। কিন্তু প্রকৃতির কুঠারাঘাত অব্যর্থ। আজ না হয় কাল অস্পৃশ্যতা মরণ সুনিশ্চিত। বুদ্ধদেবের প্রভাবে অস্পৃশ্যতা একবার মরিয়াছিল বটে কিন্তু আবার বাঁচিয়া উঠিল। গৌরাঙ্গ দেবের বিশ্বপ্রেম অস্পৃশ্যতাকে মুমূর্ষু করিয়াছিল, কিন্তু একেবারে মারিতে পারে নাই। তাই আজ তাঁহার প্রেমের হাটে অস্পৃশ্যতাজনিত ঘৃণা মিশ্রিত প্রেম বিকাইতেছে। অবশেষে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যে মহামানব সম্মিলনের অমোঘ পাঞ্চজন্যের বাণী বিশ্বমানবকে শুনাইয়াছেন, তাহা অস্পৃশ্যতার জন্মকোষ্ঠীর মৃত্যুলগ্নের সহিত একেবারে মিলিয়া গিয়াছে! অস্পৃশ্যতাকে এবার চিরবিদায় গ্রহণ করিতেই হইবে। এই ভারতেই অস্পৃশ্যতার উদ্ভব, আবার এই বিশ্বমৈত্রীকামী ভারত ভূমিতেই তাহার অন্তর্লীলার সময় উপস্থিত। এই যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব বিশ্বপ্রেমাপ্লুত চিত্ত মহাত্মা গান্ধীও বিশ্ব-কল্যাণ কামনা করিয়া অস্পৃশ্যতার নিধন-সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

সত্যবীর

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী, কবিরত্ন, বি-এ

পাহাড়ের মহাধ্যানে, আকাশের নীলিমায়,
সাগরের মহাগান, বিরাটের বীথিকায়,
কালজয়ী শুচিতায় প্রাণ ছুটে যেথা যায়,
মিলনের মহাকেন্দ্রে আনন্দের দেখা পায়!
এক ফোঁটা অমৃতের প্রাণভরা পরশনে।
জ্যোতির্জ্যোতিঃ জ্ঞানময় নিমেষের দরশনে,
ভরপূর প্রাণখানি, মরণের কোথা ভয়?
ফিরে বীর কি নির্ভীক বিশ্বখানি করে জয়!
ধরণীর রূপ রস জীবনের যা সম্পদ্,
হৃদিভরা ভালোবাসা, মোদের যা কিছু সৎ।
গুণের সুস্থায়ী গন্ধ, প্রাণের পরশ কম,
মোদের যা কিছু প্রিয়, আর কাম্য অনুপম।
অযাচিত সব তার; সব তারে দিয়ে সুখ,
তার মুখ পানে চেয়ে সহে যাই সব দুখ।

আমরা আর কতদিন?

পণ্ডিত শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ

কোন জাতিই কোন জাতির ধ্বংসসাধন করিতে পারে না, যদি সে জাতি আত্মহত্যা না করে। কোন জাতি অন্য একটী জাতির দেশ অধিকার করিল, তাহাদের বলিষ্ঠ পুরুষগণকে বিনষ্ট করিল, সেই জাতির সকলকে ভৃত্যে পরিণত করিল, স্ত্রীগণকে দাসী বা পত্নীরূপে গ্রহণ করিল, তাহাদের সর্ব্বস্ব হরণ করিল, তাহাদের স্বাধীন অবস্থার স্মৃতিচিহ্নগুলি পর্য্যন্ত বিনষ্ট করিল, তাহাদের ইতিহাস প্রবাদ—সকলই বিলুপ্ত করিল, তাহাদের বেশভূষা আচার ব্যবহার পরিবর্ত্তিত করিয়া দিল, কিন্তু তথাপি সেই জাতি নির্ম্মূল হয় না, যদি সেই জাতির অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ আত্মহত্যা না করে। পরশুরাম একুশবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন শুনা যায়, কিন্তু তথাপি ক্ষত্রিয় জাতি নির্ম্মূল হয় নাই; কারণ, অবশিষ্ট বা পলাতক ক্ষত্রিয়গণ তাহাদের নিজত্ব ভুলিয়া যায় নাই, অর্থাৎ আত্মহত্যা করে নাই। এইরূপ ক্রিশ্চান

মুসলমান শক হুন প্রভৃতি জাতি বহু চেষ্টা করিয়াও কোন জাতিকে নির্ম্মূল করিতে পারে নাই, যেখানে সে জাতি আত্মহত্যা করে নাই। যেখানে কোন জাতি নির্ম্মূল হইয়াছে, সেখানে সেই জাতির আত্মহত্যাই কারণ হইয়াছে। এই আত্মহত্যা পরপ্রণোদিত বা বাধ্যতামূলক হইলেও হইবে না, ইহা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হওয়া আবশ্যক। কারণ, বাধ্যতামূলক যে কোন কার্য্যই করা যাইবে, তাহার প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী, এই জন্য বাধ্যতামূলক আত্মহত্যাতেও জাতি মরে না। জাতি মরে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আত্মহত্যায়। আর কোন জাতিকে এই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আত্মহত্যা-ব্যাপারে ব্যাপৃত করিতে হইলে সেই জাতিকে কৌশলে, শিক্ষা দীক্ষা সাহায্যে ও সহানুভূতির দ্বারা এমন অবস্থায় উপনীত করা আবশ্যক, যে অবস্থায় সে স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে অপ্রেরিত হইয়া নিজেই নিজেকে বিনষ্ট করে, অর্থাৎ নিজের জাতিগত ব্যক্তিত্ব বা নিজ জাত্যভিমান ভুলিয়া যায়, বা বর্জ্জন করে, তাহার পূর্ব্বপুরুষগণের কেবলই দোষ দর্শন করে, তাহার আচার বিচারকে ঘৃণা বা নিন্দা করে, তাহার শিক্ষা দীক্ষা ধর্ম্ম ও জ্ঞানভাণ্ডারকে মূর্খতা বর্ব্বরতা বলিয়া উপহাস ও উপেক্ষা করে; কারণ, তাহা হইলেই সেই জাতির আত্মহত্যা-যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইবে, তাহা হইলেই সেই জাতির ধ্বংস অবধারিত ও অবশ্যম্ভাবী হইবে। বস্তুতঃ এইরূপে কোন এক জাতি আত্মহত্যা না করিলে, নিজেকে অন্য জাতি বলিয়া হৃদয়ঙ্গম না করিলে, কোথাও না কোথাও সে জাতির বীজ একটা না একটা থাকিয়া যায়, আর তাহা হইতেই সেই জাতির আবার আবির্ভাব হয়, সে জাতির সমূল ধ্বংস সাধন আর হয় না। ইহা একটী নিয়ম, ইহার ব্যভিচার নাই, ইহা যুক্তিসিদ্ধ, ইহা পরীক্ষাসিদ্ধ, এবং নিঃসন্দিগ্ধ।

এখন এই নিয়মটী স্মরণ করিয়া আমরা একবার আমাদের অবস্থাটী ভাবিয়া দেখি, দেখি আমরা কোন্ অবস্থায় উপনীত হইয়াছি। আমরা দেখিতেছি—বিধাতার ইচ্ছায় আমরা আজ বিজিত পরাজিত লাঞ্ছিত অপমানিত পদদলিত এবং হৃতসর্ব্বস্ব, কিন্তু তথাপি আমরা বিনষ্ট বা বিলুপ্ত হই নাই, তথাপি এই অবস্থাতেও আমরা যথাসম্ভব সুখের প্রয়াসী, আমাদের পুনরভ্যুদয়ে বিশ্বাসী। অথচ এই দুরবস্থার কথা ভাবিয়াও আমরা আর আমাদিগকে ব্যথিত করিতে চাহি না। অন্যায়পূর্ব্বক অপর কর্ত্তৃক লাঞ্ছনাতেও আমরা আমাদের নিজের দোষই দেখি, এবং মনে শান্তি আনয়ন করি, প্রতিবিধান করিবার চেষ্টাকেও পাপ বলিয়া মনে করিয়া থাকি। বলিদানের পশুর ন্যায় বিল্বপত্রভক্ষণে উদ্যত হইতেছি! এ অবস্থাতেও আমাদের ধ্বংস হইতেছে না। ৬০ কোটি হিন্দু আজ কয়েক শত বৎসরে ২৫ কোটিতে পরিণত হইয়াছি, তথাপি আমাদের ধ্বংস হইতেছে না। আর যদি ধ্বংসই হয়, তাহা হইলে কি অনুপাতে কবে হইবে, তাহাও বুঝিয়া উঠিতে পারা যাইতেছে না।

কিন্তু এক্ষণে, ইহা বুঝিবার একটী সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, আমাদের অনিবার্য্য ধ্বংসের একটী অব্যভিচারী লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। তাহাতে বোধ হয়—আর অধিকদিন আমাদের জাতি জগতে থাকিবে না, যে হারে আমরা ৬০ কোটি হইতে ২৫ কোটিতে পরিণত, সে হারের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে, সুতরাং আমাদের অন্য জাতিতে পরিণত হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই; কারণ, আমরা আমাদের আত্মহত্যার পথ পরিষ্কার ও প্রশস্ত করিয়া ফেলিয়াছি। যেহেতু, আমরা এখন দিন দিন নিজেরাই নিজেদের ধর্ম্মকর্ম্ম আচার ব্যবহার বিদ্যাবুদ্ধি বলবীর্য্য সকল বিষয়ের নিন্দায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিতেছি। আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা এমনভাবে চলিয়াছে যে, যাহার দ্বারা আমরা আমাদের নিজস্ব রক্ষা করিতে পারিব, সেই সকলই আজ আমরা

নিন্দা বা ঘৃণা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই শিক্ষার ফলে এমনই সত্যনিষ্ঠা আমাদের বদ্ধমূল হইয়াছে যে, আমরা যাহা না বুঝিব, তাহা আর আমরা মানিব না বলিয়া ধর্ম্মবিষয়েই বিরুদ্ধবাদী বা স্বেচ্ছাচারী হইতেছি। অন্য বিষয় না বুঝিয়াও মানি, কিন্তু ধর্ম্ম বিষয় না বুঝিয়া মানিব না বলিয়া কৃতসংকল্প হইয়াছি। এইরূপ আমাদের এই সত্যনিষ্ঠা আজ পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে, এই শিক্ষার ফলে এমনই উদারতা অর্জ্জন করিয়াছি যে, আমরা আর আমাদিগকে কোন শুদ্ধ জাতির সন্তান বলিয়া বিবেচনা করি না। আমাদের ধর্ম্মকর্ম্ম আচার বিচার প্রভৃতি যুক্তি ও পরীক্ষামূলক হইলেও, আমাদিগের জাতি বা শোণিত শুদ্ধ রাখিবার জন্য আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ প্রাণপাত চেষ্টা করিয়া গেলেও আমরা আর কোন একটী অমিশ্রিত জাতির সন্তান নহি বলিয়া স্থির করিয়া থাকি। মস্তকের অস্থি মাপিয়া, কঙ্কাল দেখিয়া, বর্ণ বিবেচনা করিয়া, কেশ লোম শ্মশ্রু প্রভৃতি বিচার করিয়া, আমরা নানাজাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন বলিতেও উৎসাহিত হইয়া থাকি। অথচ কেবল দেশভেদেই যে আকৃতির পরিবর্ত্তন হয়, তাহা লক্ষ্য করিতে ইচ্ছা করি না। আজ এই শিক্ষার গুণে স্বজাতির মধ্যে পূর্ব্বপ্রথানুসারে যৌন- সম্বন্ধকে আমরা মহাভ্রম বলিয়া বুঝিতেছি। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ বিদেশে গিয়া বিজাতীয়া বিধর্ম্মী সুন্দরী সঙ্গিনী করিয়া বংশের উন্নতিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন। কেবল পুরুষ কেন, কোন কোন বিদুষী বিদেশী বিধর্ম্মীর অঙ্কে আত্মসমর্পণ করিয়া বলিষ্ঠ সন্তান লাভের জন্য যত্নবতী হইতেছেন। এই শিক্ষার গুণে আমরা বলিতেছি—অবাধ প্রেমদ্বারাই আত্মবিকাশের পথ প্রশস্ত হয়, ইহাতেই অনন্ত ক্রমোন্নতির পথ উন্মুক্ত হয়, যতই অন্যায় অধর্ম্ম করি না ক্রমোন্নতির ফলে আমাদের উন্নতি হইবেই হইবে, অধোগতির কোন সম্ভাবনাই নাই, বৈরাগ্য কাপুরুষের ধর্ম্ম, অসংখ্য বন্ধনের মধ্যে মুক্তিলাভ করিতে হইবে। যদি পুনর্জ্জন্মই হয়, তাহা হইলে এই উন্নতির আশার সংস্কার পরজন্মে আমাদিগকে উন্নতই করিবে, কিন্তু অন্যায় কর্ম্মের ফল যে অনুতাপ ও তজ্জন্য যে অধোগতি তাহা স্বাভাবিক ও অপরিহার্য্য হইলেও সেটী চিন্তা করিতে চাহি না। বৈরাগ্য ও সংযমে যে সুখ ও শান্তি দেখা যায়, তাহা বুঝিবার অবকাশও আজ আর নাই।

যচ্চ কামসুখং লোকে দিব্যং যচ্চ মহৎ সুখম্।
তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতি ষোড়শীং কলাম্॥

মহাভারতের এই পুনঃ পুনঃ ঘোষণার প্রতি আমরা কোন আস্থাই প্রদর্শন করি না। সকল প্রকার বিরুদ্ধ কর্ম্ম, বিরুদ্ধ চিন্তার আনুকূল্যের জন্য কতকগুলি অসুরস্বভাব বিদেশীর সিদ্ধান্ত অবলম্বনে আমরা সেই চরম তত্ত্বকে 'সমসত্তাক একানেকস্বরূপ' বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহি। ধর্ম্মের স্বেচ্ছাচারিতার জন্য একের মধ্যে বহু ও বহুমধ্যে একের উপাসনাই পথ বলিয়া নির্দ্দেশ করি। কিন্তু সম্পূর্ণ বিরুদ্ধভাব যে বুদ্ধির অতীত অনির্ব্বাচ্য বিষয়, তাহা বুঝিতে চাহি না। আজ আমরা সাধু সংযত সচ্চরিত্রের সম্মান না করিয়া অসাধু অসংযত অসচ্চরিত্রের পূজায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। সভাপতি সমাজপতি নেতার নির্ব্বাচনের জন্য, জাতীয় প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের জন্য, চরিত্রের দিকে আর দৃষ্টিপাত করি না। ক্ষমতাশালী ধনশালী দুর্ব্বৃত্ত হইলেও তাঁহাকেই মর্য্যাদা দান করি। "পাপকে ঘৃণা কর পাপীকে ঘৃণা করিও না" বলিয়া বিজ্ঞতা ও মহানুভবতার পরিচয় দিই। কিন্তু ইহাতে যে পাপানুষ্ঠান রহিত হয় না, তাহা বুঝি না। পাপ যে অনুষ্ঠাতৃভিন্ন থাকে না, অনুষ্ঠাতার প্রায়শ্চিত্ত না হইলে যে পাপ যায় না, তাহা আর আমরা ভাবি না। নিজের স্ত্রীকে উচ্ছৃঙ্খল স্বাধীনতা দিয়া সুশ্রীযুবতী পরস্ত্রীহরণের পথ পরিষ্কার করিতেছি। শিল্পকলার সৌন্দর্য্য উপভোগের জন্য জননী জাতির উলঙ্গিনী মূর্ত্তি